জুল ভের্ন অমনিবাস

দুর্বার ও আশ্চর্য অভিযান গ্রন্থমালা

জুল ভের্ন (১৮২৮-১৯০৫)

জুল ভের্ন অমনিবাস

৪

দুর্বার ও আশ্চর্য অভিযান গ্রন্থমালা

অ নু বা দ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দে' জ পা ব লি শিং ।। ক ল কা তা ৭ ০ ০ ০ ৭ ৩

প্রথম প্রকাশ :
মাঘ ১৪০০
জানুয়ারি ১৯৯৪

স্বত্ব :
কৌশল্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ :
পূর্ণেন্দু পত্রী

ISBN - 81-7079-534-6

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শব্দগ্রন্থন :
অরিজিৎ কুমার
লেজার ইম্প্রেশন্স
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক :
স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

আশি টাকা

পৃথিবী যখন বাড়ে

কুবায় জন্মেছিলেন ইতালো কালভিনো, কিন্তু এস্পানিওলে না-লিখে লিখেছিলেন ইতালীয় ভাষায়, সম্ভবত যুদ্ধোত্তর ইতালির সবচেয়ে উত্তেজক ও উন্মাদক লেখক, যাঁর মধ্যে ছিলো একটা অত্যন্ত-সজীব অন্তহীন ছেলেমানুষির ভাব, যার ফলে যখন তিনি গভীর-গম্ভীর দার্শনিক বিষয়ের অবতারণা করতেন, তখনও তা থাকতো কৌতুকে আর রঙ্গে ভরা। কেউ-হয়তো কোনো-একদিন বলবেন জুল ভের্ন কতটা মাতিয়েছিলেন ইতালো কালভিনোকে, কালভিনোর ছেলেবেলায় ; কিছু-কিছু তাঁরও আছে কল্পবিজ্ঞান কাহিনী কিন্তু একেবারেই অন্যরকম, সম্পূর্ণ ভিন্ন তার স্বাদ।

জুল ভের্ন-এর *দুর্বার ও আশ্চর্য অভিযান গ্রন্থমালা* আজ পড়তে-পড়তে কখনও-কখনও ইতালো কালভিনোর কথা মনে না-প'ড়েই পারে না। তাঁর একটা ছোট্ট বই আছে, *অদৃশ্য-সব নগরী*, আশ্চর্য আর বারে-বারে পড়ার মতো একটি বই ; তাতে একজন রাজার কাছে ব'সে-ব'সে আশ্চর্য সব দেশে-বিদেশে ঘোরার বিবরণ দিচ্ছেন বিখ্যাত একজন পর্যটক, আর যতই তিনি একের পর এক সেই-সব কোন-দূরের শহর-নগরের কথা বলতে-বলতে চাক্ষুষ, আর সজীব ক'রেই রাজার কাছে *কথার মধ্য দিয়েই ভাষার মধ্য দিয়েই* সে-সব শহরকে উপস্থিত ক'রে দিচ্ছেন, আর রাজার অভিজ্ঞতার মধ্যে ভিড় ক'রে আসছে একের পর এক শহর — আর, অবাক কাণ্ড! — যতই রাজার অভিজ্ঞতার মধ্যে ঢুকে পড়ছে নতুন দেশ নতুন নগর, সম্প্রসারিত হ'য়ে যাচ্ছে রাজার পৃথিবী, ততই সে-সব হারিয়ে যাচ্ছে পর্যটকের কাছ থেকে, তার পৃথিবী হ'য়ে উঠছে হ্রস্ব, ছোট্ট, একরত্তি।

না, জুল ভের্ন এমনতর কোনো গল্প সত্যি লেখেননি, কিন্তু আমাদের মাঝে-মাঝেই মনে প'ড়ে যায় তাঁর সমকালীন পাঠকদের কথা, যারা ফ্রান্সের গাঁয়ে-গঞ্জে ব'সেই দৈনন্দিন কাজকর্মের ফাঁকে-ফাঁকে গোগ্রাসে প'ড়ে যাচ্ছিলো এইসব দুর্বার অভিযানের দ্বিশতাধিক বই, আর ছয় মহাদেশে — ছয় মহাদেশেই বা কেন বলি — জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে পাঠকরা বেরিয়ে পড়ছিলো কাল্পনিক সব চরিত্রদের সঙ্গে ; এ-সব পর্যটকদের কেউ-বা অনিচ্ছুক, কেউ-বা উৎসুক, আর ক্রমেই বড়ো হ'য়ে যাচ্ছিলো পাঠকদের পৃথিবী ; ফ্রান্সের গাঁয়ে ব'সেই তারা পৌঁছে যাচ্ছিলো আফ্রিকার নিবিড় অরণ্যে, আমাজোনের অববাহিকায়, হিমালয়ের চুড়োয়, দানিউবের তীরে। জুল ভের্ন-এর নিজের পৃথিবী কি তার ফলে ছোটো হ'য়ে যাচ্ছিলো? একই জায়গায় দু-বার তিনবার চারবার যদি তিনি তাঁর পাঠকদের নিয়ে যান, তবে কি তারা ব'লে উঠবে না, এ-কী, নতুনত্ব

কই ? এ-তো চেনা, পড়া, একই কাহনের পুনরাবৃত্তি ! জুল ভের্নকে তাই অনবরতই ভাবতে হচ্ছিলো নতুন জগতের কথা — নতুন পৃথিবী, অচেনা পৃথিবী, কোনো রোমাঞ্চকর পৃথিবী — যেখানে কখনও কোনো মানুষের পা পড়েনি, কিংবা যেখানে মানুষ গিয়ে এমন হুলুস্থুলু কাণ্ড ফেঁদেছে যে পুরোনো পৃথিবীর আগাপাশতলা খোলনলচে সব বদলে-বদলে যাচ্ছে !

সে-ই কবে, ১৬৩৬ সালে, চমৎকার বাঁধাই ক'রে জেরারড মেরকাটোর আর ইয়ন হার্ট প্রকাশ করেছিলেন মানচিত্রের একটি সংগ্রহ, *কার্টোগ্রাফির* এক বিস্ময়কর প্রস্তাবনা, যার মুখপত্রে ছিলো বিশালদেহী অ্যাটলাস-এর ছবি, আস্ত জগৎটাকেই সে ধ'রে রেখেছিলো তার কাঁধের ওপর । সম্ভবত সেই-থেকেই, মানচিত্রের বইয়ের একটা প্রতিশব্দ হ'য়ে উঠেছিলো *অ্যাটলাস* । সেই সময়, সপ্তদশ শতাব্দীতে, শুধু-কেবল বিশাল বড়োলোকরাই কোনো *অ্যাটলাসের* 'বিলাসিতা' করতে পারতো । ওলন্দাজ *কার্টোগ্রাফাররা* তখন তাদের পৃষ্ঠপোষকদের কাছে রোজ, *নিত্য*, এমন-এক জগৎ উপস্থাপিত করছিলো, সমুদ্রে-যারা-ঘুরে-বেড়ায় সেই নাবিকেরা যে-জগতের দিগন্তকে ক্রমশই — এবং দ্রুতবেগেই — বিস্ফারিত ক'রে দিচ্ছিলো । কিন্তু বইয়ের পাতায় রেখা-রং-তুলির বাহার-ফোটানো দেশবিদেশের ছবি কখনও কারু জানবার স্পৃহাকে সম্পূর্ণ চরিতার্থ করতে পারেনি — যতই কেন-না তাতে থাক অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশর উল্লেখ — কিংবা যতই কেন-না ভিন্ন-ভিন্ন রঙে আঁকা হোক নদীসমুদ্র পাহাড়পর্বত কুমেরু-সুমেরু, যতই কেন-না ভূত্বকের স্তরপরম্পরাকে দেখানো হোক বর্ণালির বিচ্ছুরণে ! লোকের ঔৎসুক্য বা কৌতূহল কতটাই-বা মিটতো শুধু মানচিত্র দেখে-দেখে ? যারা জগতের খবর জানবে ব'লে বুভুক্ষু, প্রুস্তের কথামতো বাড়ি থেকে এক-পা না-বেরিয়েও যারা ঘুরে আসতে চায় সারা জগৎ, তারা ইংরেজিভাষার কবি ডিলান টমাসের ভাষায় *অ্যাটলাস-খাদক* যদি-বা হয়ও, কতটা তাদের মেটে এই সাধ : *দেখবো এবার জগৎটাকে...* ।

অন্য অনেক ধরনের রচনায় হাত পাকাবার পর, একদিন কোনো-এক শুভক্ষণেই সম্ভবত জুল ভের্ন ভেবেছিলেন এই ক্রম-সম্প্রসার-প্রবণ জগৎকে ফুটিয়ে তুলবেন তাঁর লেখায়, আর শুধু-যে লোকে তাঁর উদ্ভাবিত চরিত্রদের সঙ্গে-সঙ্গে নানা উপায়ে — বেলুনে, ডুবোজাহাজে, শাম্পানে, আকাশযানে, কামানের গোলায়... — জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে হানা দেবে তা নয়, তারা রোমাঞ্চিত হবে, উদ্বেলিত হবে, আশা-নিরাশায় ছটফট করবে বিভিন্ন দুর্ধর্ষ অভিযানে — অ্যাডভেনচারে ।

আর তাদের পৃথিবী ক্রমেই বড়ো হ'তে-হ'তে হয়তো সব কল্পনাকেও ছাপিয়ে যাবে !

এই-যদি বেলুনে চেপে আমরা উধাও হ'য়ে গেছি আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে, নীলনদের অববাহিকায়, আরব-বেদুয়িনের দেশে, পরক্ষণেই আমরা চ'লে এসেছি ভারতবর্ষে — হাতির পিঠে চ'ড়ে (সে-হাতিও আবার সত্যিকার হাতি নয়, কলের হাতি, বাষ্পে-চলা হাতি), দেখেছি নেপালের তরাই বা ফল্গুনদীর তীর্থযাত্রীদের । যদি আমরা

কখনও ডুবোজাহাজ-আকাশযান-স্বতশ্চল শকটে কল্পনাকেও-হারমানানো দ্রুতবেগে ছুটে গেছি, আমেরিকার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত, মার্কিন মুলুকের সীমানা ছাড়িয়ে চ'লে গেছি গাল্‌ফ অভ মেহিকোতে, তবে পরক্ষণেই, সবিস্ময়ে, আবিষ্কার করেছি নীল দানিউবের জল কিন্তু সত্যি-সত্যি নীল নয়, বরং গেরি, আর ভিয়েনা থেকে দৌড় দিয়েছি — প্রায় কৃষ্ণসাগর লক্ষ্য ক'রেই — দূরে-কোথাও ।

আর তা তো আমরা একসময়ে করিনি । যদি ১৯০২ সালে, বিংশশতাব্দীর গোড়ায়, উঠে পড়েছি একের-ভেতরে-তিন কোনো বাহনে, যেটা সমান-অনায়াসে চলবে জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে তবে অন্য বইতে এসে পড়েছি সিপাহি বিদ্রোহের অব্যবহিত পরের ভারতবর্ষে, তখনও উত্তাল তখনও বিক্ষুব্ধ, তখনও নানাসাহেবের সন্ধানে চুঁড়ে বেড়াচ্ছে ইংরেজ ফৌজ, এবং তার পরেই হয়তো তারও একশো বছর পেছিয়ে গেছি ইতিহাসে, এসে পৌঁছেছি হাঙ্গেরিতে, যখন এবং যেখানে, অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের রমরমা সত্ত্বেও হাঙ্গেরীয়দের সঙ্গে আলেমানদের খুব-একটা সদ্ভাব আর বনিবনাও ছিলো না ।

কল্পবিজ্ঞান অ্যাডভেনচার ফাঁদতে ব'সে জুল ভের্ন কিন্তু জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষেই শুধু আমাদের নিয়ে যাননি, নিয়ে গেছেন ইতিহাসেরই বিভিন্ন চোরাগলিতে — কিংবা উদ্বেল মুহূর্তে । আর, শুধু কি ভাবছিলেন বিজ্ঞান কতটা দিতে পারে আমাদের ? এও কি ভাবেননি যে, প্রয়োগ আর পৃষ্ঠপোষকতার চাপে বিজ্ঞান কতটা সর্বনাশও করতে পারে আমাদের — শুধু যে একক মতিচ্ছন্ন ব্যক্তিবিশেষই সর্বনাশের আয়োজন করতে পারে, তা-ই নয়, রাষ্ট্র বা কোনো দুষ্কৃতকারীদের সংঘও হাতিয়ে নিতে পারে সব আবিষ্কার — আর তা ব্যবহার করতে পারে অন্য অনেক মানুষের বিরুদ্ধে ।

বিজ্ঞান অনেক দেয়, অনেক নেয় । একের পর এক অচেনা ভূখণ্ডে যাচ্ছি অনবরত এই দুর্বার-সব আশ্চর্য অভিযানে, সেইসঙ্গে কষ্টও কি হচ্ছে না যে ঠিক এইভাবে আর-কখনও এ-সব জায়গায় আমরা পা ফেলতে পারবো না — কেননা উদ্ভাবনীনৈপুণ্যে-বলীয়ান জুল ভের্নকে প্রতিবারেই নতুন ক'রে ভাবতে হচ্ছে আবার কীভাবে কী ক'রে — পুনরাবৃত্তির একঘেয়েমিকে বাদ দিয়ে — পাঠককে নিয়ে-যাওয়া যায় নতুন-নতুন জায়গায়, অতীতে বা ভবিষ্যতে ।

আমরা কিন্তু *অমনিবাসের* এই চতুর্থ খণ্ডে ইওরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়া — এই চার মহাদেশে ঘুরে বেড়িয়েছি, আর *অ্যাটলাস-খাদক* জুল ভের্ন-এর কল্পনার উদ্ভাবনীনৈপুণ্য দেখে বারে-বারেই মুগ্ধ হ'য়ে গেছি ।

৯ পৌষ ১৪০০ — মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা

আপরোর ইন ইণ্ডিয়া

ফাইভ উইক্‌স ইন এ বেলুন

দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড

দ্য সিক্রেট অভ ভিলহেল্ম স্টোরিৎস

আপরোর ইন ইণ্ডিয়া

১

কানপুরের দানব

১

দু-হাজার মোহর পুরস্কার

'জানা গিয়াছে যে সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নেতা নবাব ধুন্ধুপন্থ বর্তমানে বম্বাই রাজ্যের কোনো স্থানে লুক্কায়িত রহিয়াছেন। যে বা যাহারা তাঁহাকে জীবিত বা মৃত ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে বা তাহাদের দুই হাজার মোহর পুরস্কার দেওয়া হইবে...'
১৮৬৭ সালের মার্চ মাসের ছয় তারিখে ঔরঙ্গাবাদের বাসিন্দারা এই বিজ্ঞপ্তিটি পড়লে। গোদাবরী নদীর তীরে নিরিবিলি একটা জীর্ণ বাংলো বাড়ির দেয়ালেও এই বিজ্ঞপ্তিটা টাঙানো ছিলো : হঠাৎ দেখা গেলো কোত্থেকে এক ফকির এসে বিজ্ঞপ্তিটির সামনে দাঁড়ালে; বড়ো-বড়ো হরফে ধুন্ধুপন্থের আগুনজ্বালা নাম ছাপা ছিলো, বম্বাইয়ের রাজ্যপালের নাম ছিলো ঘোষণাপত্রের তলায় : সেটাও ছিন্ন হ'লো মুহূর্তে।

কী চায় এই ফকির ? সে কি ভেবেছে ওই রক্তরাঙা নামটা ছিঁড়ে ফেললেই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি ওই অগ্নিগর্ভ মানুষটাকে ভুলে যাবে ? একটা ছেঁড়া কাগজের মতো সময়ের ঘূর্ণিহাওয়া তাকে এতদূরে উড়িয়ে নিয়ে যাবে যে কোনোকালে কেউ আর তার সন্ধান পাবে না ? না কি বিজ্ঞপ্তিটা নষ্ট ক'রে ফেললেই ১৮৫৭ সালের এই অভ্যুত্থানের কথা মানুষ ভুলে যাবে ?

এ-সব ভাবতে যাওয়াটাও পাগলামি ছাড়া আর-কিছু নয়। ক-টা সে ছিঁড়বে ? দেয়ালে-দেয়ালে, গাছের গায়ে, স্তম্ভে-মিনারে—সর্বত্র রাশি-রাশি ঘোষণাপত্র ছড়িয়েছেন বম্বাইয়ের রাজ্যপাল। প্রাসাদ, মন্দির, সরাই—কিছুই বাদ যায়নি। তা ছাড়া ট্যাঁড়া পিটিয়ে সারাক্ষণ চেঁচিয়েছে নকিব নগর-গ্রামের পথে-পথে, যাতে দীনতম দরিদ্রটিও পুরস্কারের এই অঙ্ক জেনে লোভে প'ড়ে ধুন্ধুপন্থকে ধরিয়ে দেয়।

সত্যি যদি ধন্ধুপন্থ বম্বাইয়ের আশপাশে কোথাও আশ্রয় নিয়ে থাকেন, তাহ'লে এই বিপুল উদ্যোগে হয়তো তাঁকে ধরা প'ড়ে যেতেই হবে। তাহ'লে হাজার-হাজার ঘোষণাপত্রের মধ্যে মাত্র একটাকে ছিঁড়ে ফেলে ফকিরটি কোন পরমার্থ সাধন করলে ? শুধু রোষ আর ঘৃণার তৃপ্তিসাধন, তা ছাড়া আর কী ? বিরক্তিভরে ভুরু কুঁচকে ঠোঁট বাঁকিয়ে সে এবার ঢুকে পড়লো শহরে, তারপর ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলো।

গঙ্গার তলদেশে সমগ্র ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগের নাম দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণাপথ : বম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কতগুলি প্রদেশ নিয়ে দাক্ষিণাত্য গঠিত। আর সেই

প্রদেশগুলির মধ্যে প্রধান-একটি হ'লো ঔরঙ্গাবাদ, একদা যা সমগ্র দক্ষিণাপথেরই রাজধানী ছিলো। সপ্তদশ শতকে মুঘল সম্রাট ঔরঙজীব যখন এখানে তাঁর দরবার বসিয়েছিলেন তখন এখানে লোকসংখ্যা ছিলো এক লক্ষ। এখন হায়দরাবাদের নিজামের হ'য়ে ইংরেজরা এই প্রদেশ শাসন করে : লোকসংখ্যা এখন মাত্র হাজার পঞ্চাশ। এখানকার জল-হাওয়া আর স্বাস্থ্য ভালো, তা ছাড়া অতীত গরিমার প্রচুর জমকালো স্মৃতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এখানে। গোদাবরীর তীরে রয়েছে ঔরঙজীবের মস্ত প্রাসাদ, শাহ্জাহানের বেগম মমতাজের স্মৃতিসৌধ, আর বিখ্যাত চার মিনার—মুঘল স্থাপত্যকর্মের উজ্জ্বল নিদর্শন।

ঔরঙ্গাবাদের মিশ্র জনসাধারণের মধ্যে এই ফকির সহজেই আত্মগোপন করতে পারলে। ভারতে পীর-ফকির বা সাধু-সন্ন্যাসীর সংখ্যা অসংখ্য, সয়ীদ কি মুসাফির কি মুশকিল-আসান কত যে ঘুরে বেড়ায় তার সীমাসংখ্যা নেই ; ভিক্ষে তারা চায় না, তারা দাবি করে ; হিন্দু মুসলমান সকলেই সমভাবে তাদের শ্রদ্ধা করে। আমাদের এই ফকিরটি পাঁচ ফিট ন-ইঞ্চি লম্বা, বয়েস চল্লিশের বেশি নয়, সুন্দর কোনো মরাঠা হবে হয়তো —মুখ দেখে অন্তত তা-ই মনে হয় : সারা মুখে বসন্তের দাগ ; স্বাস্থ্য উপচে পড়ছে সর্বাঙ্গে। ক্ষিপ্র ও নমনীয় ; ভালো ক'রে লক্ষ করলে দেখা যাবে তার বাঁ হাতে একটা আঙুল নেই। চুল লাল, মাথায় পাগড়ি, গায়ে নামে-মাত্র ডোরাকাটা পশমের জামা, কোমরে বস্ত্রখণ্ড বাঁধা, পায়ে জুতো নেই। বুকে দুটি উল্কি-কাটা, হিন্দু পুরাণের ধ্বংসের দেবতার স্মারক উল্কি দুটি : নৃসিংহাবতার, আর ভয়ংকর শংকরের ত্রিনয়ন জ্বলজ্বল করছে বুকে।

সেদিন সন্ধেবেলায় মস্ত সাড়া পড়েছে ঔরঙ্গাবাদে, বিশেষ ক'রে তার বস্তি এলাকায়। আবালবৃদ্ধবনিতা—ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়, গোরা সেপাই, ভিখিরি, চাষী —সবাই হাত-পা নেড়ে পাঁচ মুখে কথা কইছে : কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে, কে পাবে এই বিশাল ইনাম, এই বিপুল পুরস্কার—এটা এখন তাদের চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার হেতু।

এদের মধ্যে এই ফকিরই বোধহয় কেবল ওই বিপুল পুরস্কারের প্রত্যাশা ও লোভ করছিলো না। নিঃশব্দে হাঁটছে সে ঔরঙ্গাবাদের সরু ঘিঞ্জি রাস্তায়, মাঝে-মাঝে উৎকর্ণ হ'য়ে শুনছে লোকজনের কথাবার্তা, চোখের তারা দুটি কখনও জ্ব'লে উঠছে ধ্বক ধ্বক ক'রে।

'দু-হাজার মোহর ইনাম মিলবে ধুন্দুপন্থকে দেখতে পেলে,' বললে ভিড়ের মধ্যে উত্তেজিত একজনে।

'দেখতে পেলে বোলো না,' আরেকজন বললে, 'বলো যে ধরতে পারলে। দেখা আর ধরা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিশ।'

'তা ঠিক, রক্তপাত না-ক'রে ধরা দেবার পাত্তর সে নয়।'

'কিন্তু এই-যে শুনলাম নেপালের জঙ্গলে সে মারা গেছে।'

'মিথ্যে জনরব মাত্র ! ওর মতো ধূর্তলোক আর হয় না, মৃত্যুর খবর রটনা ক'রে

দিলে নিরাপদ হবে ভেবেই ওই গুজবটি ছড়িয়েছে ।'

'বাঃ, শুনলুম যে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত হয়েছে—'

'ওটাও একটা ধাপ্পা, লোকের চোখে ধুলো দেবার ফন্দি ।'

এ-কথা শুনেও ফকিরের মুখের একটি পেশীও কুঞ্চিত হ'লো না । কিন্তু লোকটা যখন আরো বিশদ ক'রে সব বললে, তখন শুনতে-শুনতে তার ভুরু কুঁচকে গেলো, আর চোখ দুটো ধ্বক-ধ্বক ক'রে জ্বলতে লাগলো ।

'১৮৫৯ সালে যে ধুন্ধুপন্থ তার ভাই বালাজি রাও আর গোণ্ডার রাজা দেবী বক্স সিংকে নিয়ে নেপালে একটা দুর্গম জায়গায় ছাউনি ফেলেছিলো, এ-খবর ঠিক । সেখানে সে যখন দেখলে যে চারপাশ থেকে ইংরেজ সেপাইরা তাদের ঘিরে ধরেছে, তখন তারা ভারত-চিন সীমান্তের দিকে চ'লে যেতে চেষ্টা করে । যাবার আগে রটিয়ে দিয়ে যায় যে তারা সবাই মারা গিয়েছে ! রটনাটা লোকে যাতে সত্যি ব'লে মেনে নেয়, সেইজন্যে এমনকী একটা মিথ্যে অন্ত্যেষ্টির অবতারণাও তারা করেছিলো । আসলে কিন্তু বাঁ-হাতের একটা আঙুল কেটে কবর দেয়—'

'এত-সব তুমি জানলে কী ক'রে ?'

'আমি যে সেখানে ছিলাম । ধুন্ধুপন্থের অনুচরেরা আমাকে বন্দী করেছিলো । দু-মাস পর আমি ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে আসি ।'

লোকটা যখন এত-সব বলছিলো ফকির তখন একবারও তার উপর থেকে চোখ ফেরায়নি । বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠছিলো তার চোখ । বাঁ-হাতটা সে চট ক'রে তার পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে ফেললে । নাকের বাঁশি দুটো ফুলে উঠলো একটু, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা গেলো ঝকঝকে দাঁতের সারি ।

'তাহ'লে ধুন্ধুপন্থকে তুমি চোখে দেখেছো ? সে তোমার চেনা লোক ?' শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজন জিগেস করলে ।

'হ্যাঁ, দেখেছি—' ধুন্ধুপন্থের প্রাক্তন বন্দী জবাব দিলে ।

'মুখোমুখি দেখতে পেলে তাকে তাহ'লে চিনতে পারবে তুমি ?'

'নিশ্চয়ই পারবো—'

'তাহ'লে,' প্রশ্নকর্তার কণ্ঠস্বরে ঈষৎ ঈর্ষা ফুটে উঠলো, 'দু-হাজার মোহর ইনামের সম্ভাবনা দেখছি তোমারই সবচেয়ে বেশি ।'

'হয়তো তা-ই,' লোকটি বললে, 'অবশ্য যদি ধুন্ধুপন্থ শেষকালে এই বম্বাইতেই এসে হাজির হ'য়ে থাকে—তবে সে এখানে এসেছে ব'লে আমার মনে হয় না ।'

'এখানে সে খামকা আসবে কেন ? আর এত দুঃসাহসই তার হবে কেন ?'

'হয়তো আবার আরেকটি বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে চায়—হয়তো সেপাইদের মধ্যেই আবার আগের মতোই বিক্ষোভ ছড়াবে সে ; কিংবা হয়তো মধ্যভারতের জনসাধারণকে খেপিয়ে তুলবে আবার ।'

'তা সরকারি ফতোয়া যখন বেরিয়েছে যে সে এখানে এসেই হাজির হয়েছে, তখন

তা-ই বোধকরি সত্যি ।'

'তা-ই যেন হয় ; ধুন্ধুপন্থ আমার মুখোমুখি এসে পড়ুক, ভগবান ব্রহ্মা যেন তা-ই করেন,' প্রাক্তন বন্দীটি দাঁতে দাঁত চেপে বললে ।

ফকির কয়েক পা পেছিয়ে গেলো, কিন্তু তাই ব'লে ধুন্ধুপন্থের প্রাক্তন বন্দীকে সে কখনও চোখের আড়াল করলে না । তখন কালো রাত নেমে এসেছে ঔরঙ্গাবাদে, তাই ব'লে পথের ভিড় কিন্তু একটুও কমেনি । ধুন্ধুপন্থ সম্বন্ধে অজস্র জনরব শোনা যেতে লাগলো । পরস্পরবিরোধী কয়েকটা খবর কেমন ক'রে যেন উড়াল দিয়ে আসতে থাকে । ধুন্ধুপন্থকে নাকি শহরের মধ্যেই কোথায় দেখা গেছে । তিনি নাকি এখনও এদিকে এসে পৌঁছোননি । আর্যাবর্ত থেকে নাকি বার্তা এসেছে যে তিনি মধ্যপথেই গ্রেফতার হ'য়ে গেছেন । রাত ন-টায় জানা গেলো তিনি শহরেরই জেলখানাতে কতগুলো ঠগির সঙ্গে কয়েদ হ'য়ে আছেন, পরদিন সকালে সূর্যোদয়ের আগেই নাকি তাঁকে তান্তিয়া টোপির মতো বিনাবিচারে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে । দশটার সময় খবর এলো তিনি নাকি আবার পালিয়েছেন জেলখানা থেকে । লোকের মনে আবার ইনামের আশা জেগে উঠলো ।

আসলে কিন্তু সবই গুজব : সত্যের লেশমাত্র নেই । ধুন্ধুপন্থের সন্ধান এখনও কেউ পায়নি । এখনও ওই ইনাম পেতে হ'লে বুকের রক্ত জল ক'রে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে ।

যে-লোকটা বলেছিলো ধুন্ধুপন্থকে সে স্বচক্ষে দেখেছে, তারই পুরস্কারটা পাবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি । অন্তত বম্বাই প্রেসিডেন্সিতে তেমন লোকের সংখ্যা খুবই কম, যারা স্বচক্ষে এই বিপুল অভ্যুত্থানের জননায়ককে দেখেছে । বরং সিন্ধিয়া, বুন্দেলখণ্ড, অযোধ্যা, আগ্রা, দিল্লি, কানপুর, লক্ষ্ণৌ এ-সব জায়গার কোনোটা হ'লে একটা কথা ছিলো । দশ বছর পরে, এখনও ধুন্ধুপন্থের অগ্নিগর্ভ নাম শুনলে সেখানকার লোক চমকে ওঠে । যদি নতুন ক'রে বিক্ষোভের আগুন জ্বালবার জন্যেই তিনি চিনদেশে আশ্রয় নেবার প্রলোভন ত্যাগ ক'রে ভারতে ফিরে আসেন, তাহ'লে দাক্ষিণাত্যই তাঁর গুপ্তসংগ্রামের নিরাপদ ঘাঁটি হ'তে পারে—কারণ এখানে অনেকটা স্বাধীনভাবে সকলের অলক্ষে তিনি চলাফেরা করতে পারবেন । বম্বাই প্রেসিডেন্সির রাজ্যপাল কী ক'রে যেন এই মৎলব টের পেয়ে তক্ষুনি তাঁর মাথার একটা দাম ধ'রে দিয়েছেন ।

কিন্তু ধুন্ধুপন্থ সম্বন্ধে কতবারই যে কত জনরব উত্থিত হ'লো ! কতবার তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া গেলো । কতবার যে তিনি ইংরেজ গোয়েন্দা-বিভাগের চোখে ধুলো দিলেন ! শেষকালে জনসাধারণের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মালো তিনি সত্যিই প্রলয়ের দেবতা রুদ্র-শংকরের প্রসাদ পেয়েছেন ।

কিন্তু তবু ঔরঙ্গাবাদ কেমন ক'রে যেন বিশ্বাস ক'রে ফেললো যে তিনি আশপাশেই কোথাও আছেন । আর যারা এই সরকারি ফতোয়ায় বিশ্বাস করলে, তাদের ভিতর একজন হ'লো সেই হতভাগ্য বন্দী, ছ-মাস যাকে ধুন্ধুপন্থের নির্যাতন শিবিরে কয়েদ ক'রে রাখা হয়েছিলো ।

বেচারা এই পুরস্কারের ঘোষণা শুনে তক্ষুনি মনে-মনে ঠিক ক'রে ফেললো যে তাঁকে ধরতে সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। পুরস্কারটাই একমাত্র কারণ ছিলো না তার কাছে —প্রতিশোধস্পৃহায় তার বুকের ভিতরটা যেন জ্ব'লে যাচ্ছিলো। পরদিন সকালেই কোতোয়ালিতে গিয়ে সে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ক'রে ধুন্ধুপন্থের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়বে —মনে-মনে এ-কথা ঠিক ক'রে সে রাত এগারোটার সময় গোদাবরীর তীরে তার ডেরার দিকে চললো। তার ডেরা আপাতত হ'লো একটা ডিঙি নৌকো—গোদাবরীর তীরে সেটা নোঙর-ফেলা। আধবোজা তার চোখ, ভুরু কুঁচকোনো, শহর ছাড়িয়ে সে চ'লে এলো নদীর দিকে। একমনে ভাবছিলো ব'লেই সে কখনোই লক্ষ করলে না যে আলখাল্লা ঢাকা এক ফকির তাকে ডালকুত্তোর মতো নিঃশব্দে ও সন্তর্পণে অনুসরণ ক'রে আসছে। ছায়ার মতো ধাবমান সেই ফকির, একবারও তাকে চোখের আড়াল করছে না।

দূরে লোকজনের সাড়া মিলিয়ে গেলো। শহরতলির নিরিবিলি রাস্তায় এসে পড়লো চিন্তামগ্ন মানুষটি। ফকিরও তার পিছন ছাড়লো না : ভাঙা দেয়ালের আড়াল দিয়ে, গাছপালার ছায়ায় লুকিয়ে, ফকির তাকে অনুসরণ ক'রে এলো। রাস্তা নিরিবিলি হ'লেও এত সাবধান হওয়া ফকিরের পক্ষে জরুরি ছিলো। কারণ একটু পরেই চাঁদ উঠলো, আর হালকা জ্যোৎস্নায় যখন আঁধার ছিঁড়ে-ছিঁড়ে গেলো ফকিরকে হয়তো তখন দেখে ফেলতে পারতো লোকটা। এমনিতে খালি পায়ে হাঁটছিলো ব'লে তার পায়ের আওয়াজ অবশ্য শোনা যাচ্ছিলো না।

লোকটা কলের মতো নদীর পাড় ধ'রে তার নৌকোর দিকে এগুলো ; এমন-সময় হঠাৎ খ্যাপা বাঘের মতো পিছন থেকে কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর। কেবল বিদ্যুতের একটা ঝলসানি দেখতে পেলে সে, একটা মালয়ী ছোরার উপর চাঁদের আলো ঝকঝক ক'রে উঠলো ! হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ হ'লো ছোরাটা, ধপ ক'রে প'ড়ে গেলো সে : নির্ভুল লক্ষ্য ফকিরের! অস্ফুট স্বরে কী যেন বলবার চেষ্টা করে লোকটা, কিন্তু কষ বেয়ে কেবল এক ঝলক তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়লো। ফকির দু-হাতে সজোরে তুলে ধরলে মুমূর্ষুর মুখ, আর নিজের মুখটা ফিরিয়ে নিলে জ্যোৎস্নায়। 'চেনো তুমি আমাকে, চিনতে পারো ?' ক্ষিপ্ত ও ক্ষুধিত বাঘের মতো ফকির গ'র্জে উঠলো।

'সে !' পুরো নামটা বলার ক্ষমতা তার ছিলো না—মাথাটা তার একপাশে হেলে প'ড়ে গেলো।

পরক্ষণেই গোদাবরীর জলে হারিয়ে গেলো মৃতদেহটা। কেমন ক'রে মৃতদেহটা ডুবে যায়, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো ফকির, তারপর দ্রুত পায়ে ফিরে এলো শহরের নিশুতি রাস্তায়।

নগরতোরণের সামনে এসে দ্যাখে সমরবাহিনীর লোক কড়া পাহারা বসিয়েছে। শহর থেকে বেরুনো নিষেধ, শহরে ঢোকাও তাই। ফকির মনে-মনে কেবল বললে, 'ঔরঙ্গাবাদ থেকে আজ রাত্রেই আমাকে চ'লে যেতে হ'বে—যে ক'রেই হোক।'

ফিরে এলো সে। নগর-প্রাচীর ধ'রে এগিয়ে গেলো কিছুটা। তারপর উৎরাই

বেয়ে উঠলো প্রাচীরের কাছে । কিন্তু দেয়ালের গা একেবারে মসৃণ—না-আছে কোনো খাঁজ-কাটা, না-বা কোনো চোখা বা ঠেলে-বার-হওয়া পাথরের পিণ্ড ; কোনো দড়ি বেয়ে হয়তো ওঠা যায়, কিন্তু তার কোমরবন্ধের কাপড়টি মাত্র কয়েক ফুট—পঞ্চাশ ফুট ওঠার কোনো প্রশ্নই ওঠে না । ফকির আশপাশে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো কী করা যায় ।

দেয়ালের আশপাশেই ক্ষীণ চন্দ্রালোকে ঝুরি-নামা মস্ত-সব গাছপালা ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে । ঘন পাতায় ঢাকা ডালপালাগুলো হাজার বাহু ছড়িয়ে দিয়েছে অন্ধকারে । লাফিয়ে একটা ডাল ধ'রে ঝুলে পড়তে পারলেই গাছ বেয়ে উঠে-যাওয়া অত্যন্ত সহজ হ'য়ে উঠবে ।

ফকির আর এক মুহূর্তও ইতস্তত না-ক'রে লাফিয়ে একটা ডাল ধ'রে ঝুলতে-ঝুলতে গাছে উঠে পড়লো, তারপর একটা ডাল টেনে নামিয়ে ঠিক দেয়ালের উপর রাখলো—অতঃপর তার ভারে বেঁকে-যাওয়া ডালটা ধ'রে দড়ির সাঁকোর মতো ঝুলতে-ঝুলতে সে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলো । শূন্যে ঝুলছে সে ডাল ধ'রে, প্রায় তিরিশ ফুট নিচে মাটি, পা দুটি যেন কোনো ভর খুঁজছে—দেয়ালের শক্ত মসৃণ গা আর কত দূরে !

এমন সময় গুড়ুম ক'রে বন্দুকের আওয়াজ হ'লো একটা—আলোর একটা ঝলসানি চ'লে গেলো তার গা ঘেঁসে ! তারপর আরো-কতগুলি বন্দুক গ'র্জে উঠলো একসঙ্গে । নিশ্চয়ই পল্টনের লোকেরা তাকে দেখতে পেয়েছে !

তার গায়ে কোনো গুলি লাগলো না, কিন্তু যে-ডালটা ধ'রে সে ঝুলে পড়েছিলো গুলির ঘায়ে সেটা ভেঙে পড়লো । ফকির টাল সামলাতে না-পেরে ডিগবাজি খেলো শূন্যে । অন্য-কোনো মানুষ হ'লে এত উঁচু থেকে প'ড়ে কিছুতেই বাঁচতো না ; কিন্তু ফকির মাটিতে প'ড়েই লাফিয়ে উঠলো, যেন ছিটকে গেলো সে তীরের মতো ; ওই গুলিবৃষ্টির মধ্যে অক্ষত দেহে সে মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে । ঔরঙ্গাবাদের বাইরে দু-মাইল দূরে গোরা সেপাইরা ছাউনি ফেলেছিলো ; সেই ছাউনি পেরিয়ে এলো সে অন্ধকারে গা ঢেকে, সন্তর্পণে । তারপর আরো-কিছুদূর এগিয়ে সে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালে, তার আঙুল-কাটা বাঁ-হাত বাড়িয়ে ধরলে সে শহরের দিকে, চাপা ক্রোধে গর্জন ক'রে উঠলো : 'এবার যারা ধুন্ধুপন্থের কবলে পড়বে, তাদের এবার কোন শয়তান এসে বাঁচায় দেখবো ! ইংরেজরা যেন জেনে রেখে দেয়, নানাসাহেবের শেষ তারা এখনও দ্যাখেনি !'

নানাসাহেব ! আগুনঝরা নামটা যেন রাতের অন্ধকারে সম্মিলিত ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটা প্রকাণ্ড চ্যালেঞ্জের মতো ফেটে পড়লো ! কেউ যেন হাতের দস্তানাটা খুলে গোটা ইংরেজ বাহিনীকে উদ্দেশ ক'রেই তাচ্ছিল্যভরে ছুঁড়ে দিয়েছে ।

২

কর্নেল মানরো

আমি, মোক্লের, ভারতে পৌঁছেছিলুম ১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের ট্রেনে ক'রে বম্বাই থেকে এলাহাবাদ হ'য়ে কলকাতা পৌঁছেছিলুম মার্চ মাসে। আমার মূল উদ্দেশ্য ছিলো : ভারত-দর্শন। বিশেষ ক'রে গঙ্গার উপকূল ধ'রে উত্তরাপথের সেই প্রাচীন নগরগুলো পরিদর্শন করার ইচ্ছে ছিলো খুব : প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন সম্বন্ধে যাতে একটা পূর্ণ ধারণা ক'রে নিতে পারি, সেই জন্যেই এই সশরীরে গমনের অভিলাষ, প্রত্যক্ষ দর্শনের উৎকাঙ্ক্ষা।

এঞ্জিনিয়ার ব্যাঙ্কস-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিলো পারীতে—শুধু পরিচয় নয়, রীতিমতো বন্ধুতা ও ঘনিষ্ঠতাই হয়েছিলো দুজনের মধ্যে। পারীতেই আমরা ঠিক করেছিলুম যে কলকাতায় এসে তার সঙ্গে দেখা করবো আমি—সে ততদিনে সিন্ধিয়া, পঞ্জাব আর দিল্লির রেলপথ স্থাপন করার তত্ত্বাবধান সম্পূর্ণ ক'রে ফেলবে। কার্যক্রম অনুযায়ীই তার কাজ শেষ হ'য়ে গিয়েছিলো— কয়েক মাসের ছুটি পেয়েছিলো সে ; আর তাই আমি যখন প্রাচীন ভারতের সন্ধানে বেরুবার প্রস্তাব করলুম, উৎসাহে ও উত্তেজনায় সে একেবারে লাফিয়ে উঠলো।

কলকাতায় আসতেই ব্যাঙ্কস তার স্থানীয় বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো। তাদের একজন ক্যাপ্টেন হুড, অন্যজন কর্নেল মানরো।

সেদিন সন্ধেবেলায় এই কর্নেল মানরোর বাড়িতে ব'সেই আমরা আড্ডা দিচ্ছিলুম। কর্নেল মানরোর বাড়িটা কলকাতার সাহেব-পাড়ায় এক প্রান্তে, গড়ের মাঠের পাশে, যেদিকে গাড়ি-ঘোড়া বা লোকজনের তেমন ভিড় নেই—ফলে কলকাতার যাবতীয় হট্টগোল থেকে উদ্ধার পেয়ে আমরা ঈষৎ আলস্যভরে নানা বিষয়ে আলোচনা করছিলুম।

কর্নেল মানরোর বয়েস বোধহয় সাতচল্লিশ ; তাঁর এই বাংলো-বাড়িটা আসলে দেখাশোনা করে অবশ্য তাঁর ডান হাত ও প্রধান অনুচর সার্জেন্ট ম্যাক-নীল : স্কটল্যাণ্ডের মানুষ, অনেক যুদ্ধেই সে মানরোর সঙ্গী হয়েছিলো—শুধু সার্জেন্ট হিশেবে নয়, তাঁর প্রধান অনুচর হিশেবে। ম্যাক-নীলের বয়েস বছর পঁয়তাল্লিশ, সুগঠিত ও শক্তসমর্থ, শ্মশ্রু-মণ্ডিত মুখমণ্ডল বেশ সুশ্রী। কর্নেলের সঙ্গে-সঙ্গে সেও ভারতীয় পল্টন থেকে অবসর নিয়েছিলো, কিন্তু পুরোনো অভ্যাসবশত এখনও সামরিক পোশাকই প'রে থাকে সবসময়।

মানরো আর ম্যাক-নীল দুজনেই পল্টন ছেড়েছিলেন ১৮৬০ সালে । কিন্তু দেশে ফিরে না-গিয়ে দু জনেই রাজধানী কলকাতার সাহের-পাড়ায় এসে একটা বাড়ি নিয়েছেন ।

ব্যাঙ্কস যখন আমাকে মানরোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়, তখন একটা বিষয়ে আমাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলো : 'খবরদার ! সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য কোরো না কিন্তু—আর, কিছুতেই এবং কখনও, নানাসাহেবের নামটাও উচ্চারণ কোরো না তাঁর সামনে ।'

কর্নেল এডওয়ার্ড মানরো স্কটল্যাণ্ডের মানুষ হ'লেও তাঁর পূর্বপুরুষ প্রায় একশো বছর আগে ভারতে এসেছিলেন । সার হেক্টর মানরো ১৭৬০ সালে বাঙালি পল্টনের বড়োকর্তা ছিলেন : সার হেক্টর অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম ছিলেন : তাঁর আমলে একবার একটা ছোটোখাটো বিক্ষোভের সূত্রপাত হ'তেই তিনি একদিনে আটাশজন বিক্ষোভকারীকে কামানের গোলায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন—১৮৫৭ সালে বারে-বারে যে-ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছিলো ।

'৫৭-র অভ্যুত্থানের সময় সার জেমস উট্রামের অধীনে কর্নেল মানরো প্রথমে কানপুর, পরে লক্ষ্ণৌ অবরোধে অংশ নিয়েছিলেন । ১৮৫৮ সালে কর্নেল মানরো নাইট-কম্যাণ্ডার হন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী কোনোদিন নামের আগে *'লেডি'* কথাটা ব্যবহার করতে পারেননি । '৫৭ সালের ২৭ শে জুন কানপুরে যে-সমস্ত বিদেশীর মৃত্যু হয়, তাঁর স্ত্রী ছিলেন তাঁদেরই একজন । সার এডওয়ার্ড (বা কর্নেল মানরো) তাঁর স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, স্ত্রীর মৃত্যুতে স্ত্রীর অকাল নিধনের জন্যে জীবনে তাঁর একটাই লক্ষ্য হ'য়ে উঠেছিলো—যেহেতু নানাসাহেব ছিলেন বিদ্রোহের নেতা, সেইজন্যে যেমন ক'রে হোক তাঁকে কোতল করতেই হবে । এটাই যেন তাঁর জীবনের চরম উদ্দেশ্য হ'য়ে উঠলো —সেইজন্যেই, যাতে কায়মনোবাক্যে নানাসাহেবের সন্ধান করতে পারেন, সমরবিভাগ থেকে তিনি অকালে স্বেচ্ছায় অবসর নিলেন । সার্জেন্ট ম্যাক-নীলও সেইসঙ্গে কর্মে ইস্তফা দিলে, আর প্রভুর সঙ্গে নানাসাহেবের সন্ধানে গোটা ভারতবর্ষ চ'ষে বেড়াতে লাগলো । কিন্তু নানাসাহেব কেবল এই দুজনের চোখেই ধুলো দেননি, সমগ্র গোয়েন্দা-বিভাগকে পর্যন্ত নাজেহাল ক'রে দিয়েছিলেন । কেউ তাঁর খোঁজ পেলে না । তিন বছর একটানা খোঁজবার পর হঠাৎ যখন জনরব উঠলো যে নানাসাহেব নেপালের জঙ্গলে প্রাণত্যাগ করেছেন, তখন সার এডওয়ার্ড আর সার্জেন্ট ম্যাক-নীল কলকাতায় এসে নিরিবিলিতে একটা বাংলোবাড়ি ভাড়া ক'রে অবসর জীবন যাপন করতে লাগলেন । কিন্তু এতদিন কেটে গেলেও সিপাহী বিদ্রোহের কথা উঠলেই তাঁর বুকের ক্ষত যেন আবার নতুন হ'য়ে ওঠে, হাত মুঠো হ'য়ে যায়, চোখের তারা ধ্বক ক'রে জ্বলে ওঠে । বাড়ি ছেড়ে বেরোন না তিনি কখনও, এমন বই তিনি স্পর্শও ক'রে দ্যাখেন না যাতে ঘুণাক্ষরেও ১৮৫৭-র কোনো উল্লেখ আছে ।

এত-সব আমাকে বলেছিলো ব্যাঙ্কস । কয়েকদিন ধ'রে বম্বাইতে যে-গুজবটা শোনা

যাচ্ছিলো যে নানাসাহেব নাকি হঠাৎ সেখানে পুনরাবির্ভূত হয়েছেন, তা সম্ভবত সার এডওয়ার্ডের কানে পৌঁছোয়নি—পৌঁছুলে তিনি হয়তো তক্ষুনি আবার নবোদ্যমে বেরিয়ে পড়তেন। এখন তাঁর বন্ধু আর সঙ্গী বলতে আছে ব্যাঙ্কস আর ক্যাপ্টেন হুড। তারাই রোজ দেখা করতে যায় তাঁর সঙ্গে ; দু-বেলা গল্পগুজব ক'রে আড্ডা দেয়, আর সার এডওয়ার্ডের বেদনাকে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

ব্যাঙ্কস আসলে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের নির্মাতা, কাজ শেষ ক'রে এখন প্রায় এক বছরের ছুটি পেয়েছে ; পরের বছর কলকাতা-মাদ্রাজ বা বঙ্গোপসাগর থেকে আরবসাগর পর্যন্ত লম্বা মস্ত-এক রেলপথ বসানো হবে, তারই প্রাথমিক খশড়া শেষ করছে। তার মাথার মধ্যে সবসময়েই কলকব্জার ঘটাং-ঘটাং বেজে চলেছে। কত-যে অদ্ভুত পরিকল্পনা তার মাথায় জাগে, তার কোনো ঠিক নেই। এই মুহূর্তে সে-যে কোনো-একটা অদ্ভুত আবিষ্কার নিয়ে তন্ময় তা তার সঙ্গে আড্ডা দিতে-দিতেই বুঝতে পারলুম। কিছুই খুলে বললে না, বোঝা গেলো হঠাৎ একদিন এক নাম না-জানা কল হাজির ক'রে সবাইকে তাজ্জব ক'রে দিতে চায়।

ক্যাপ্টেন হুড আসলে তারই বন্ধু। ১৮৫৭র বিদ্রোহের সময় সে সমরবিভাগে ছিলো : অযোধ্যা আর রোহিলখণ্ডে গিয়েছিলো সে, পরে মধ্যভারতে গোয়ালিয়র অভিযানের সময় সার হিউ রোজকে সাহায্য করেছিলো। হুডের বয়েস তিরিশের বেশি নয়, ছেলেবেলা থেকেই ভারতে আছে, বিখ্যাত মাদ্রাজ ক্লাবের সে সদস্য। তামাটে তার চুল আর দাড়ি, আর যদিও সে ছিলো গোরা বাহিনীতে—কিন্তু আসলে ভারতবর্ষই যেন তার দেশ—এবং সব দিক দিয়েই সে সম্পূর্ণ ভারতীয়—এই বিচিত্র ও বিপুল দেশকে সে মাতৃভূমির মতো ভালোবাসে। শুধু তা-ই নয়, তার মতে *স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো সে নাকি এখানেই, এখানেই, এখানেই !* পাহাড়ে চড়ার খুব শখ, ভালো শিকারি, আর দুর্ধর্ষ পথিক। এখনও হিমালয়ে ওঠবার সুযোগ তার হয়নি, কিন্তু হিমালয়ই তার শেষ স্বপ্ন। ওই তুষারমৌলির ধবল শৃঙ্গই নাকি তার সাফল্য ও সার্থকতার ঝকমকে মুকুট হবে।

ব্যাঙ্কস আর হুড অনেকবার সার এডওয়ার্ডকে নিয়ে দেশ-ভ্রমণে যাবার প্রস্তাব করেছে, কিন্তু কর্নেল অবিচল। সেদিন সন্ধেবেলায় আবার কথাটা উঠলো—সূত্র অবিশ্যি ছিলুম আমি আর ব্যাঙ্কস। আমরা যে উত্তরাপথ ভ্রমণ করার সংকল্প নিয়েছি, সে-কথা শুনে হুড বললে, 'হেঁটে না-বেড়ালে আর কী মজা ! রেলে গিয়ে মজা নেই। ব্যাঙ্কস আবার হ'ন্টন কি অশ্বতরের বিরোধী। ফলে পাল্কি বা চতুর্দোলা ছাড়া আর কীসে যাওয়া যায় ?'

'দূর-দূর,' ব্যাঙ্কস বললে, 'ও-সব আদ্যিকেলে বাহনে আবার কেউ বেরোয় নাকি !'

'কেন, তোমার ওই ঝমরঝম ঘটাংঘট রেলগাড়ির চেয়ে এখানকার গোরুর গাড়ি ঢের ভালো,' হুড জানিয়ে দিলে।

'হ্যাঁ, একটা চারচাকার গাড়ি তারা এমনভাবে টেনে নিয়ে যায় যে মনে হয় চিনসমুদ্রে টাইফুন উঠেছে'—ব্যাঙ্কস বললে ।

'তা হয়তো সেকেলে লোকজনের মনে হয়, কিন্তু তাহ'লেও ছন্দ আর দোলার জন্য চতুর্দোলাই ভালো—তোমার রেলগাড়ির চেয়ে তো ভালো—'

'চতুর্দোলা ! পাল্কি !' ব্যাঙ্কস হেসে উঠলো, 'কফিন বলো না কেন ওটাকে—ভিতরে তো মড়ার মতোই শুয়ে থাকতে হয় ।'

'কিন্তু আরাম কত ! শুয়ে ব'সে যেতে পারবে—প্রত্যেক স্টেশনে তোমাকে কেউ কাঁচা ঘুম থেকে তুলে টিকিট দেখতে চাইবে না—তাছাড়া তোমার ও-সব এক্সপ্রেস ট্রেনের চেয়ে অনেক নিরাপদও বটে !'

'সবচেয়ে ভালো হয়,' আমি বললুম, 'কেউ যদি নিজের বাড়িটা নিয়েই বেড়াতে বেরুতে পারে !'

'শামুক কোথাকার !' ব্যাঙ্কস হেসে উঠলো !

'বন্ধু-হে,' আমি বললুম, 'শামুক ইচ্ছেমতো তার খোলা থেকে বেরুতে আর ঢুকতে পারে—আর তার ওই খোলার বাড়ি নিয়েই বিশ্বভ্রমণে বেরোয় । তা শামুক হ'তে পারলে মন্দ হ'তো নাকি ! চলন্ত বাড়ি—নিজের বাড়ি নিয়ে যেতে পারছো ইচ্ছেমতো—আমার তো মনে হয় যানবাহনের উন্নতির একেবারে চূড়ান্ত স্তরে না-পৌঁছুলে তা আর সম্ভব হবে না !'

কর্নেল মানরো এতক্ষণে মুখ খুললেন ।'এ-কথা ঠিক । যদি বাড়িতে ব'সে-ব'সেই দেখতে পাই দিগন্ত ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে, কেবলই বদলে যাচ্ছে পারিপার্শ্বিক কি জলহাওয়া, তাহ'লে.......'

'তাহ'লে আর নতুন জায়গায় গিয়ে ডাকবাংলো খুঁজে মরতে হবে না—' হুড বললে, 'কে জানে বাপু অচেনা ডাকবাংলোয় অসুবিধে কত, ঠিক-মতো স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যাবে কি না, তার উপর হ্যাঙ্গামের অন্ত আছে ? স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে লিখিয়ে নিয়ে এসো—যত রাজ্যের হ্যানোত্যানো ! অথচ নিজের বাড়িটা চলতে পারলে যখন খুশি যেখানে খুশি দিব্যি খুঁটি গাড়া যেতো । বৈঠকখানা, খাবার ঘর, রান্নাঘর, লাইব্রেরি, শোবার ঘর তো আছেই—সঙ্গে নিজের পছন্দসই বাবুর্চি আছে । আহা—তেমন দিন যদি আসে, বুঝলে ব্যাঙ্কস, তেমন দিন এলেই বুঝবো যে সত্যি-সত্যি সভ্যতার অগ্রগতি হ'লো । তোমার ও-রেলগাড়ির চেয়ে একশোগুণ ভালো, এ-কথা মানবে তো ?'

'মানবো না কেন, খুব মানি । তবে এর চেয়েও ভালো বাহনের পরিকল্পনা করা যায়, সেটাও বলি এই সঙ্গে ।'

'এর চেয়েও ভালো ?'

'নিশ্চয়ই । তুমি বলেছো যে রেস্তোরাঁ-কার, স্লিপিং-কার-ওলা ট্রেনের চেয়েও তোমার চলন্ত বাড়ি ঢের ভালো—আচ্ছা, তা না-হয় মানলুম । কিন্তু লোকে তো ব্যাবসাসূত্রেও কত জায়গায় যায়, তার বেলা ? অত-বড়ো বাড়ি নিয়ে তো তুমি সব

জায়গায় যেতে পারবে না। ফলে তুমি তোমার আকল্প জানালে এক স্থপতিকে—খুদে মাপের একটা বাড়ি তৈরি করে দেবার জন্যে, আর সে তোমার ভাবনাকে কাজে তরজমা করলে—তুমি একটা বাড়ি পেয়ে গেলে, যার ভিত মাটির তলায় শিকড় গেড়ে বসেনি—এখানে-ওখানে তাকে সরিয়ে নেয়া যায়। সব আরামের ব্যবস্থাই আছে তাতে, সব রাস্তারই উপযোগী হ'লো সেটি, সরুগলিতে আটকে যাবার ভয় নেই। ধরো, আমাদের বন্ধু কর্নেল মানরোর জন্যই এ-রকম একটা সচল বাড়ি বানানো হ'লো ; তিনি আমাদের আমন্ত্রণ করলেন তাঁর বাড়িতে ক'রে আর্যাবর্তে বেড়িয়ে আসার জন্যে—শামুকদের মতোই অনেকটা—কিন্তু তার চেয়েও ভালো—খোলার সঙ্গে জন্মসূত্রেই চির-আটক নয়। ঠিকঠাক সব ব্যবস্থা হ'লো—তোমার বাবুর্চি, রান্নাঘর—কিছুই বাদ গেলো না। যাত্রার দিন ঠিকঠাক। এমন সময়—হা-হতোস্মি !— এ-বাড়ি টেনে নিয়ে যাবে কে ?'

'কেন ? গোরু-ঘোড়া-খচ্চর ?'

'ডজন-ডজন গোরু-ঘোড়া লাগবে তো তাহ'লে—'

'তাহ'লে হাতি—হ্যাঁ, হাতিই টেনে নিয়ে যাবে। তা ছাড়া হাতি হচ্ছে আভিজাত্যের প্রতীক, একেবারে দিগ্বিজয়ী রাজার মেজাজ এনে দেবে। একদল হাতি থাকবে, দিব্যি হেলতে-দুলতে গজেন্দ্রগমনে এগুবে বাড়িটা। কেমন, চমৎকার হবে না ?'

'হুঁ, চমৎকার দেখাবে বটে, কিন্তু—'

'আবার কিন্তু !—'

'এই "কিন্তুটা" বেশ বড়োই ! ওই হস্তীযূথের মতোই প্রকাণ্ড !'

'তোমাদের এঞ্জিনিয়ারদের কারবারই আলাদা। কেবল একটার পর একটা বাধার কথা তোলো—'

'সে-বাধা আবার জয়ও ক'রে ফেলি,' ব্যাঙ্কস জানালে মৃদুস্বরে।

'তাহ'লে তোমার নিজের কিন্তুটাই জয় করো দেখি !'

'করবো তো বটেই। শোনো তবে ! শুনলেন তো মানরো, ক্যাপ্টেন হুড কত-কত বাহনের নাম করলে—কিন্তু তারা প্রাণী ব'লে তাদের অসুখ-বিশুখ হ'তে পারে, কখনও ক্লান্ত হ'য়েই পড়বে-বা—আর তাদের খাদ্য—সেটা জোগাবে কে ? আসলে চলন্ত বাড়ি ব্যাপারটা তখুনি সম্ভব হবে, যখন এটা বাষ্পে বা স্টীমে চলবে !'

'আর রেললাইন দিয়ে ঘটাং-ঘটাং ঘট-ঘট ক'রে এগুবে ?' হুড কেবল কাঁধ ঝাঁকালে। 'ব্যাঙ্কস যে এ-কথা বলবে তা আমি জানতুম।'

'না, রেললাইন লাগবে না।' তক্ষুনি বললে ব্যাঙ্কস, 'লাগবে কেবল একটা উঁচু জাতের ট্র্যাকশন-এঞ্জিন—'

'শাবাশ !' হুড তারিফ ক'রে উঠলো, 'তোমার ওই চলন্ত বাড়ি যদি রেললাইনের কয়েদি না-হয়, তাহ'লে আমি ওই স্টীমের কথায় রাজি আছি।'

'কিন্তু ব্যাঙ্কস,' আমি বললুম, 'তোমার এঞ্জিনেরও খাদ্য চাই গোরু-ঘোড়া হাতির মতো—সে-খাদ্য না-পেলে তোমার ওই কলকারখানাও বিকল হ'য়ে পড়বে।'

'একটি স্টীমের ঘোড়া অনেকগুলো সত্যিকার ঘোড়ার চেয়ে বলশালী,' বললে ব্যাঙ্কস, 'আর এই অশ্বশক্তি যত-ইচ্ছে বাড়িয়ে তোলা যায় । স্টীমের ঘোড়ার অসুখ নেই, অবসাদ নেই, রোদে-বৃষ্টিতে, জলে-ঝড়ে সব অবস্থায় সব জায়গায় সে সমানভাবে এগুতে পারে । বুনো জানোয়ারের ভয় নেই তার, সাপে তাকে কাটতে পারবে না, পোকা-মাকড় হুল ফোটাতে পারবে না ; বিশ্রাম নেই, নিদ্রা নেই, একটানা সে যেতে পারবে, চাবুক লাগবে না, ধমকাতে হবে না, তাড়া দিতে হবে না । অর্থাৎ রান্না ক'রে খেতে না-চাইলে আসল ঘোড়ার চেয়ে সব দিক থেকেই ভালো এই স্টীমের ঘোড়া । একটু কেবল তেল লাগবে—কলকব্জা শড়গড় রাখার জন্যে, আর লাগবে কিছু কাঠ বা কয়লা। আর জানোই তো, মোক্লের, ভারতে বন-জঙ্গলের অভাব নেই—কাজেই কাঠের জন্যে তোমাকে একটুও হন্যে হ'তে হবে না !'

'বেড়ে বলেছো, চমৎকার !' ক্যাপ্টেন হুড বললে, 'স্টীমের ঘোড়া জিন্দাবাদ ! আমি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি ভারতের দীর্ঘ পথ ধ'রে চলেছে এক সচল প্রাসাদ—তার নির্মাতা ব্যাঙ্কস নামে এক মস্ত এঞ্জিনিয়ার—জঙ্গল ফুঁড়ে সে চলেছে, বাঘ সিংহ ভাল্লুক তার গায়ে আঁচড়টি কাটতে পারছে না, আর আমরা দেয়ালের আড়ালে ব'সে তোফা শিকার ক'রে যাচ্ছি । আঃ, ভাবতেও আমার জিভে জল এসে যাচ্ছে, ব্যাঙ্কস । আহা-রে ! যদি আর *পঞ্চাশ বছর পরে* আমার জন্ম হ'তো !'

'কেন ? পঞ্চাশ বছর পরে জন্মাতে চাচ্ছো কেন ?'

'কারণ পঞ্চাশ বছর পরেই তো তোমার স্বপ্ন সত্যি হবে—তখন আমরা বাষ্পে-চলা বাড়ি পাবো—'

'চলন্ত বাড়ি তো কবেই বানিয়েছি আমি,' ব্যাঙ্কস মৃদুস্বরে জানালে ।

'বানিয়েছো ? *তুমি ?*'

'ক—বে ! দেখলে বুঝবে যে তোমাদের সব কল্পনাকেও তা ছাড়িয়ে গেছে !'

'তাই নাকি !' হুড চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো, 'তাহ'লে আর দেরি কেন ? এসো, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি ।'

ব্যাঙ্কস, তাকে শান্ত হ'তে ব'লে, সার এডওয়ার্ড মানরোর দিকে ফিরে তাকালে । 'সার এডওয়ার্ড, যদি আজ থেকে এক মাসের মধ্যে একটা কলে-চলা বাড়ি এনে আপনার হাতে সমঝে দিই, তাহ'লে মোক্লের, হুড আর আমার সঙ্গে আপনি উত্তরাপথ বেড়াতে যেতে রাজি আছেন তো ?'

ব্যাঙ্কসের গলার আগ্রহ দেখে মানরো খানিকক্ষণ একটু সীরিয়াসভাবে ভাবলেন । 'রাজি আছি । ব্যাঙ্কস, যত টাকা লাগে দেবো—কেবল হুড যা কল্পনাও করতে পারেনি, তেমনি একটা কলে-চলা বাড়ি এক মাসের মধ্যে এনে দাও আমাদের—আমরা তাহ'লে সারা ভারত ঘুরে বেড়াবো !'

অমনি হুড তিনবার জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো । 'নেপালে শিকারটা এবার তোফা জমবে !'

ঘরের ভিতর এই শোরগোল শুনে ম্যাক-নীল অবাক হ'য়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালে।

'ম্যাক-নীল,' মানরো বললেন, 'আমরা এক মাসের মধ্যেই উত্তরাপথ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বো। তুমি সঙ্গে যাবে তো ?'

'আপনি গেলে, নিশ্চয়ই যাবো,' ম্যাক-নীল তার চিরকেলে শান্ত গলায় জানালে।

মঁসিয় মোক্লের-এর দিনপঞ্জি আপাতত শেষ

৩

ইলোরার গুহায় আঁধারে

শুধু সত্যি নয়, তার চেয়েও বেশি। মরাঠা রাজকুমার ধুন্ধুপন্থ—পেশোয়া বাজি রাও-এর সেই দুর্দান্ত দত্তকপুত্র, যিনি হয়তো সিপাহী অভ্যুত্থানের একমাত্র জীবিত নেতা—কিনা শেষ পর্যন্ত নেপালের দুর্গম অঞ্চল ত্যাগ ক'রে পরম দুঃসাহসে ও স্পর্ধায় আবার ভারতে প্রবেশ করেছেন ! শুধু দুঃসাহস নয়, ঔদ্ধত্য। বিপদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা—সে কি আজকের ? তীক্ষ্ণতম গোয়েন্দাটির চোখে অনায়াসে তিনি ধুলো দিতে পারেন, তোয়াক্কা রাখেন না কোনো-কিছুর ; কোনো ভয়ডর নেই। শেষ অব্দি দাক্ষিণাত্যে তিনি এসেছেন নতুন ক'রে বিক্ষোভের বীজ বপন করার জন্যে। যে-বণিকগোষ্ঠী ভারত দখল ক'রে ব'সে আছে, এই ডাকাবুকো মানুষটি তাদের মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বী। কেনই বা হবেন না ? বাজি রাও-এর উত্তরাধিকার কি তাঁর উপরেই বর্তায়নি ? অথচ ১৮৫১ সালে পেশোয়া যখন মারা গেলেন, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি তখন তাঁকে বার্ষিক আট লাখ টাকা বৃত্তি দিতে সরাসরি অস্বীকার ক'রে বসলো। এটা একটা কারণ বটে, কিন্তু শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থই নেই। ছত্রপতি শিবাজির স্বপ্ন হানা দেয় তাঁর চোখে বার-বার, আর সেই স্বপ্নই সর্বস্ব !

কিন্তু এখন—এখন নানাসাহেব কীসের প্রত্যাশা করবেন ? বিদ্রোহ দমিত হয়েছে—তাও আজ আট বছর হ'লো ; কম্পানির হাত থেকে ভারতের শাসনভার ক্রমশ ইংরেজ সরকারের হাতে চ'লে যাচ্ছে : জনশ্রুতি, রানী ভিক্টরিয়া নাকি ভারতেশ্বরী হবেন। পুরোনো পল্টন ভেঙে আবার নতুন ক'রে ফৌজ গড়া হয়েছে : সেই মহা-অভ্যুত্থানের কোনো চিহ্ন মাত্র নেই। তাহ'লে কি সারা হিন্দুস্থান-জোড়া এক জাতীয় বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছেন নানাসাহেব—যে-অভ্যুত্থান শুধু আর সেপাইদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না,

দেশের আপামর জনসাধারণ ও আবালবৃদ্ধবনিতা যাতে প্রচণ্ড অংশ নেবে ? কে জানে ?

ঔরঙ্গাবাদে তাঁর উপস্থিতি যে চাপা থাকেনি এটা তো স্পষ্ট বোঝা গেলো তাঁর মাথার উপর দামের লেবেল এঁটে দেয়ায় । আরো সাবধান হ'তে হবে তাঁকে, আরো হুঁশিয়ার...

সেই রাত্রে নানাসাহেব আর এক ঘণ্টা সময়ও নষ্ট করলেন না । এই অঞ্চল তাঁর নখদর্পণে ; ঠিক করলেন পঁচিশ মাইল দূরে ইলোরার গুহায় গিয়ে এক্ষুনি অনুচরদের সঙ্গে দেখা করবেন ।

ঘুটঘুটে কালো রাত । ছদ্মবেশী ফকির প্রথমে ভালো ক'রে লক্ষ ক'রে নিলে কেউ তার পাছু নিয়েছে কিনা, তারপর শাহ্‌সুফির স্মৃতিভবন মাজারটি পেরিয়ে, দৌলতাবাদের কেল্লার পাশ দিয়ে সমতল এলাকা ছেড়ে, ফকির এক বন্ধুর পাহাড়ি এলাকায় এসে পড়লো । উৎরাই এবার, কিন্তু তাই ব'লে নানাসাহেবের গতি রুদ্ধ হ'লো না । আজ রাতেই পঁচিশ মাইল পথ পেরিয়ে ইলোরায় পৌঁছুতে হ'বে । সূর্য যখন উঠলো, তখন নানাসাহেব রঞ্জাগ্রামে ঔরঙজীবের সমাধি পেরিয়ে গেছেন । তার খানিকবাদেই তিনি সেই বিখ্যাত গুহায় গিয়ে পৌঁছুলেন । পাহাড়ের গা কেটে-কেটে এই তিরিশটা গুহা বানানো হয়েছে ; পাথর কেটে ২৪টা চৈত্য বা বিহার বানিয়েছিলো এখানে স্থপতিরা, তারপর বাকিটুকু ভাস্করদের দান । এদের মধ্যে কৈলাস নামে একশিলা মন্দিরটি সবচেয়ে অবাক ক'রে দেয় : ২০ ফুট উঁচু, ৬০০ ফুট পরিধি-ওলা একটা একা-পাথরের গা কেটে এই চৈত্য নির্মিত হয়েছে । স্তম্ভ, তেকোণা চূড়ো, বর্তুল গম্বুজ—সব-কিছুর ভিত্তি যেন অতিকায় একদল হস্তীযূথ । আর তারপর পাথরের গায়ে তারা কাজ করেছে মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে । কীসের সঙ্গে তুলনা হবে এর ? মিশরের বিস্ময় পিরামিড ছাড়া আর-কোনো-কিছুর সঙ্গেই কি এর কোনো তুলনা চলে ?

কেউ থাকে না এখন এই মন্দিরে ; সময় এর মধ্যেই তার হাত বাড়িয়েছে এর দিকে, এই একহাজার বছরের পুরোনো বিস্ময়ের দিকে ।

নানাসাহেব ইলোরায় পৌঁছুলেন সকলের অগোচরে ; গভীর গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লেন তিনি সন্তর্পণে, তার পরে একটি বিরাট হস্তীমূর্তির আড়ালে এক ফাটলের মধ্যে প্রবেশ করলেন । আসলে এটা একটা নালা—বৃষ্টির জল যাতে এই নালা দিয়ে বাইরে ব'য়ে যেতে পারে, এইজন্যেই এটা তৈরি হয়েছে । কিন্তু এখন এটা শুকনো ও ফাঁকা, বিষণ্ন আঁধার ছাড়া আর-কিছু নেই এখন এই সুড়ঙ্গের মধ্যে । একটু এগিয়ে গিয়ে নানাসাহেব কি-রকম অদ্ভুতভাবে একবার শিশ দিয়ে উঠলেন, অমনি অন্ধকার ভেদ ক'রে তেমনি আরেকটি শিশের শব্দ শোনা গেলো, আর অন্ধকারের মধ্যে দূরে একজায়গায় আলো জ্ব'লে উঠলো । প্রতিধ্বনির বিদ্রূপ নয়, এই কথাই বোঝালো যেন এই আলো । পরক্ষণেই একটা ছোটো লণ্ঠন হাতে একটি ভারতীয় এসে দাঁড়ালে ।

'বাতি নিভিয়ে ফ্যালো এক্ষুনি !' চাপা স্বরে ব'লে উঠলেন নানাসাহেব ।

'*ধুন্ধুপন্থ, তুমি ?*' লোকটি বাতি নিভিয়ে ফেললে ।

'হ্যাঁ, আমিই। কিন্তু বড্ড খিদে পেয়েছে, পরে সব কথা বলবো। মনে রেখো, খাওয়াদাওয়া কথাবার্তা সবই অন্ধকারে সারতে হবে আমাদের। আমাকে হাত ধ'রে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।'

লোকটা তাঁর হাত ধ'রে নিয়ে যেতে লাগলো। ভিতরে এক জায়গায় কিছু খড় আর শুকনো পাতা বিছোনো : এতক্ষণ সে সেখানেই শুয়ে ছিলো, নানাসাহেবের সংকেতে জেগে গিয়েছে। নানাসাহেবকে ওই পত্রশয্যায় বসিয়ে রেখে সে খাবার আনতে গেলো। খাবার অতি সামান্যই : চাপাটি, শুখা মাংস আর ডাবের জল।

নানাসাহেব যতক্ষণ খেলেন, কোনো কথাই বললেন না ; বড্ড ক্ষুধার্ত আর ক্লান্ত ছিলেন ; কিন্তু তাঁর সমস্ত তেজ যেন চোখের তারায় জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো অন্ধকারে, যেন এই জ্বলন্ত চোখ দুটো কোনো তেতে-ওঠা ক্রুদ্ধ বাঘের। লোকটি সারাক্ষণ চুপ ক'রে রইলো ; নানাসাহেবকে বিরক্ত করতে চাইলে না। এ আর-কেউ নয়, বালাজি রাও, নানাসাহেবেরই ভাই, বয়েসে এক বছরের বড়ো ; দেখতে একেবারে একরকম —নানাসাহেব কে, আর কে-যে বালাজি রাও—লোকেরা অনায়াসে ভুল ক'রে বসতে পারে, *আগে থেকে না-জানলে*। দৈহিক মিল মানস-গঠনে ও কৌশল-রচনায় নৈপুণ্যের ফলেই যেন আরো সম্পূর্ণ হয়েছে। বৈদেশিক শক্তির প্রতি তীব্র ঘৃণা, বুদ্ধিতে, আর নির্মমভাবে সংকল্প সাধনে তাঁরা যেন দুই দেহে আসলে একই মানুষ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই দুজন সর্বসময় একসঙ্গে ছিলেন। আগুন যখন নিভে গেলো, দুজনেই একসঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন নেপাল-সীমান্তে। আর এখন দুজনেই আবার একই মশাল নিয়ে ভারতে ফিরে এসেছেন : লক্ষ্য এক, সার্থকতাও এক, এবং একইভাবে প্রস্তুত দুজনে।

খাওয়ার পর নানাসাহেব কিছুক্ষণ তাঁর হাতে মাথা রেখে চুপ ক'রে রইলেন। বালাজি রাও-এর ঘুম পাচ্ছিলো। কোনো কথা না-ব'লে তিনিও চুপ ক'রে রইলেন।

হঠাৎ ধুন্ধুপন্থ মাথা তুলে ভাইয়ের হাতটি চেপে ধরলেন, কথা যখন বললেন মনে হ'লো গমগমে আওয়াজ বেরিয়ে এলো কোনো গভীর গহ্বর থেকে : 'আমার নামে হুলিয়া বের করেছে ওরা! যে আমার মাথা নিয়ে যেতে পারবে, তাকে দু-হাজার মোহর ইনাম দেবে ব'লে ঘোষণা করেছে!'

মুহূর্তে বালাজি রাও সচকিত হ'য়ে উঠলেন, 'তোমার মাথার দাম তার চেয়েও অনেক বেশি, ধুন্ধুপন্থ। দু-হাজার মোহর তো আমার মাথারই দাম হবে না। কুড়ি হাজার মোহর দিয়ে যদি আমাদের ধরতে পায়, তাহ'লেই তাদের ভাগ্য বলতে হবে!'

'আর তিনমাস পর ২৩শে জুন পলাশির যুদ্ধের স্মৃতি উদ্‌যাপিত হবে। আমাদের জ্যোতিষীরা বলেছিলো, পলাশির যুদ্ধের একশো বছর হ'লে—১৮৫৭ সালে—ব্রিটিশরা হার স্বীকার করবে, সূর্যবংশের পুনরভ্যুদয় হবে তখন। একশোর জায়গায় একশো নয় বছর কেটে গেছে, অথচ ভারত এখনও যত বদমায়েশ বিদেশীর পদানত র'য়ে গেলো।'

বালাজি রাও বললেন, '১৮৫৭ তে হেরে গেলেও তার দশ বছর পরে আমাদের

জয় হবেই। ১৮২৭, '৩৭, '৪৭—প্রতি দশ বছর পর-পর বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে ভারতে। এ-বছরও আবার আগুন লাগবে চারধারে!'

'লরেন্স বেঁচে নেই, বার্‌নার্‌ড, হোপ, নাপিয়ের, হাডসন, হ্যাভলক—কেউ বেঁচে নেই আর। কিন্তু ক্যামবেল আর রোজ এখনও বহাল তবিয়তে র'য়ে গেছে—আর আছে ওই কর্নেল মানরো—ওরই পূর্বপুরুষ একদিন কামানের মুখে বিদ্রোহীদের উড়িয়ে দিয়েছিলো। ও-ই ঝাঁসির রানীকে নিজের হাতে বধ করেছে। একবার আমার হাতে পড়লে আমি তাকে দেখিয়ে দেবো সেকেন্দ্রাবাদের হত্যাকাণ্ড, বেগম মহলের রক্তপাত, বেরিলি, ঝাঁসি, মেবার, দিল্লি—কিছুকেই আমি ভুলে যাইনি। শুধু বারুদের স্তূপে আগুন ধরাতে হবে একবার, তারপর আমি পেতে চাই তাকে মুখোমুখি।'

'মানরো শুনেছি পল্টন থেকে অবসর নিয়েছে,' বালাজি রাও বললেন।

'আগুন জ্ব'লে উঠলেই আবার সে এসে যোগ দেবে। কিন্তু আমরা যদি আর আগুন জ্বালাতে না-পারি, তাকে আমি তাই ব'লে কিছুতেই ছেড়ে দেবো না। কলকাতায় তার বাংলোয় গিয়ে আমি তার রক্ত দেখবো।'

'তা না-হয় হ'লো—কিন্তু এখন?'

'এখন কাজ শুরু হবে। সারা দেশ-জোড়া অভ্যুত্থান হবে এটা। আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনী-গরিব, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাই যাতে অংশ নেয়, যাতে একযোগে সব গ্রাম-নগর দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে ওঠে—সেই চেষ্টাই করতে হবে আমাদের। আমি দক্ষিণাপথের নানা অংশ ঘুরে এসেছি—শুকনো বারুদের স্তূপের মতো প্রতীক্ষা করছে সব জায়গা, কখন একটা ফুলকি এসে পড়ে। এখন শুধু দিনক্ষণ স্থির ক'রে একযোগে সর্বত্র যাতে বিদ্রোহ শুরু হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

নানাসাহেব বুকের উপর হাত ভাঁজ ক'রে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলেন; যেন কোনো আলোকদৃষ্টির বলে সমস্ত ভবিষ্যৎ তাঁর সামনে উন্মোচিত হ'য়ে পড়েছে, তাঁর দৃষ্টি থেকে তা-ই মনে হয়। বালাজি রাও কোনো কথা বললেন না। এই ভয়ংকর হৃৎপিণ্ডে যখন আগুনের ফুলকি এসে পড়ে, তখন কেমন ক'রে মুহূর্তে শিখা জ্ব'লে ওঠে, বালাজি রাও সারাক্ষণ তা-ই দেখতে ভালোবাসেন।

নানাসাহেব যেন তাঁর স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন: 'আর-সবাই কোথায়?'

'তারা আগেকার পরিকল্পনা মতো অজন্তার গুহায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

'আর আমাদের ঘোড়াগুলো?'

'ইলোরা বড়োগামির রাস্তায় রেখে এসেছি।'

'কালোগনি আছে সেখানে?'

'হ্যাঁ, ধুন্ধুপন্থ। সবাই প্রস্তুত।'

'তাহ'লে এক্ষুনি রওনা হ'তে হবে। সূর্যোদয়ের আগেই আমাদের অজন্তায় পৌঁছুতে হবে।' নানাসাহেব বললেন, 'সাতপুরা পাহাড়ের চূড়োয় পৌঁছুতে হবে আমাদের, যাতে

ব্রিটিশের গোয়েন্দাদের আমরা প্রতিরোধ করতে পারি। তারপর ভীল আর গোণ্ডাদের জাগিয়ে তুলতে হবে আমাদের—যাতে বিন্ধ্য-পর্বতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত মুহূর্তে দপ ক'রে জ্ব'লে উঠতে পারে।'

বলতে-বলতে দুজনে হস্তীগুম্ফা থেকে বেরিয়ে এলেন। ইলোরা থেকে অজন্তার দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল—কিন্তু নানাসাহেব তো এখন আর পায়ে হেঁটে যাবেন না—বিশ্বস্ত ভৃত্য কালোগানি ঘোড়াগুলো নিয়ে মাইল খানেক দূরে জঙ্গলের মধ্যে অপেক্ষা করছে তাঁর জন্যে।

জিনের উপর উঠে ব'সেই তিনজনে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। ইলোরা ছেড়ে আসার পনেরো ঘণ্টা পরে এক সংকীর্ণ গিরিখাতের মধ্য দিয়ে সেই সপ্তবিংশতি মন্দিরের জগৎবিখ্যাত উপত্যকায় প্রবেশ করলেন নানাসাহেব। তখন কালো রাত নেমে এসেছে চারপাশে; চাঁদ ওঠেনি—কিন্তু লক্ষ তারায় ঝিকমিক ক'রে উঠেছে আকাশ: ঝোপের আড়াল দিয়ে তিনজনের ঘোড়া টগবগ ক'রে ছুটে চললো। হাওয়া থেমে আছে, গাছের পাতা স্তব্ধ, রাতটা থমথমে—ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাড়া দূর থেকে কেবল এক চঞ্চল ঝরনার কলরোল কানে আসে। আস্তে-আস্তে ঝরনার আওয়াজ স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো: সাত কুণ্ডের প্রপাত পেরিয়ে ধুলো উড়িয়ে তিনজনে আরো এগিয়ে এলেন, যেখানে কনুইয়ের মতো মোচড় খেয়ে এগিয়েছে গিরিখাত। নিচে বৌদ্ধ স্থাপত্যের আশ্চর্য সমৃদ্ধি তাঁদের চোখের সামনে উন্মোচিত হ'য়ে গেলো।

এই রহস্যময়, গরীয়ান ও চমকপ্রদ মন্দিরগুলো নানাসাহেবের নখদর্পণে। কতবার যে গোয়েন্দার তীক্ষ্ণ চক্ষু এড়াবার জন্যে এইসব গুম্ফার সুড়ঙ্গের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। তাই কোনো আলো লাগলো না...অন্ধকারেই অনায়াসে তিনি এগিয়ে যেতে পারলেন।

তারপর অজন্তায় ঢোকবার মুখে জঙ্গলে পৌঁছে নানাসাহেব সংকেত করতেই উপরে গাছের ডালপালা থেকে লুকোনো মুখগুলো উঁকি মারলে। জনাকুড়ি হবে তারা সংখ্যায়: সাপের মতো পিছলে নেমে এলো নানাসাহেবের সশস্ত্র অনুচরেরা।

'চলো!'

ধুন্ধুপন্থ তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, জানতে না-চেয়েই তারা পায়ে-পায়ে অনুসরণ করলে অশ্বারোহীদের। বিশ্বস্ত তারা, নানাসাহেবের জন্যে দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত তারা উৎসর্গ করেছে, ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দূর-দূরান্তরে ছুটে যেতে পারে তারা।

ছোটো দলটা উত্তরমুখো এগুলো—সাতপুরা পাহাড়ের গিরিখাতের দিকে। সকালবেলা নাগপুরের উপরে তারা বম্বাই-এলাহাবাদ রেলপথের কাছে গিয়ে পৌঁছুলো।

আর তখনই হঠাৎ বাঁশি বাজিয়ে ঝড়ের মতো ছুটে এলো কলকাতা এক্সপ্রেস।

নানা লাগাম টেনে ঘোড়া থামালেন, চলন্ত ট্রেনটির দিকে হাত বাড়িয়ে প্রচণ্ড গম্ভীর স্বরে ব'লে উঠলেন: 'ছুটে গিয়ে বড়োলাটকে জানিয়ে দাও নানাসাহেব এখনও বেঁচে

আছে। তাকে বোলো যে শিগ্‌গিরই রক্তের স্রোতে ভেসে যাবে এই রেলপথ—সারা হিন্দুস্থান রক্তে রাঙা হ'য়ে যাবে।'

চলন্ত বাড়ির রহস্য

মঁসিয় মোক্লের-এর দিনপঞ্জি থেকে আবার

৪

লৌহদানব *বেহেমথ*

পাঁচই মে সকালবেলায় কলকাতা থেকে চন্দননগর যাবার রাস্তায় হঠাৎ এক দৃশ্য দেখে সব লোকে একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো।

সকালবেলায় ভারতের রাজধানীর রাস্তায় অদ্ভুত একটি শকট বেরুলো, যা দেখে চারপাশে কৌতূহলী ও বিস্মিত জনতার ভিড় জ'মে গিয়েছিলো। কারণ ওই শকটটি টেনে আনছিলো এক অতিকায় হাতি; হাতিটি উচ্চতায় কুড়ি ফুট আর লম্বায় তিরিশ: তার চালচলনের মধ্যে এমন-একটা অদ্ভুত ভঙ্গি ছিলো যা দেখে রাস্তার লোকে একেবারে অবাক হ'য়ে গিয়েছিলো। তার শুঁড়টি বাঁকানো, আর শূন্যে-তোলা; মস্ত কাস্তের মতো তার দাঁত দুটি মুখ থেকে বেরিয়ে আছে; পিঠে জমকালো একটি হাওদা, অনেকটা কোনো স্তম্ভতলের মতো—মিনারের মতো ছাত তার, কাচের জানলা বসানো চারদিকে। আর এই হাতিটি দুটি আস্ত বাড়ি—না, চলন্ত বাংলো—টেনে নিয়ে আসছে—বাড়িগুলোর তলায় চারটে ক'রে চাকা; চাকার তলার দিকটাই কেবল দেখা যায়, কারণ উপরের দিকটা শক্ত খোলে ঢাকা। দুটো বাংলোই শেকল দিয়ে এমনভাবে আটকানো যাতে চলার সময় কোনো অসুবিধেই না-হয়। কিন্তু কেমন ক'রে একটা মাত্র হাতি অনায়াসে অমন দুটো বাংলো টেনে নিয়ে যাচ্ছে? তাজ্জব ব্যাপার! কলের মতো পা ফেলে-ফেলে সে আসছিলো প্রথমে, একটু পরেই গতি আরেকটু বৃদ্ধি পেলো—কিন্তু কোথাও কোনো মাহুত দেখা গেলো না, অঙ্কুশের কোনো বালাই-ই নেই যেন।

মাঝে-মাঝে গ'র্জে উঠছে হাতিটা, ভারতীয় অরণ্যে যে-বৃংহিত প্রায়ই শোনা যায়। আর একটু পরে-পরেই শুঁড়ের ভিতর থেকে ভলকে-ভলকে বেরিয়ে আসছে কালো ধোঁয়া। *অথচ, তবু এটা নাকি হাতি!* সবুজ-কালো রঙের আস্তরের তলায় ইস্পাতের কাঠামোটা ঢাকা, চোখ দুটো—আসলে দুটি বাতি—সত্যিকার চোখের মতো। আর যেখানে তার হৃৎপিণ্ড থাকার কথা সেখানে রয়েছে স্টীম এঞ্জিন।

অর্থাৎ এটাই সেই চলন্ত বাড়ি—ব্যাঙ্কস তার প্রতিশ্রুতি রেখেছে ।

প্রথম বাড়িটায় রয়েছি আমরা—কর্নেল মানরো, ক্যাপ্টেন হুড, ব্যাঙ্কস আর আমি। আর দ্বিতীয়টায় ভৃত্যমহল—সার্জেন্ট ম্যাক-নীলের তত্ত্বাবধানে । ব্যাঙ্কস তার কথা রাখতেই মানরোও তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখলেন, আর তাই কলকাতার রাস্তায় এই অদ্ভুত বাড়িটা পাঁচই মে সকালবেলায় ভ্যাপশা গরমের মধ্যে বেরিয়ে পড়েছে ।

কিন্তু, তাই ব'লে স্টীম এঞ্জিনটা হাতির মতো দেখতে হ'লো কেন ? চতুষ্পদ কোনো শকটের কথা কেউ কখনও ভেবেছিলো ? সত্যি-বলতে, প্রথম দেখে আমরাও সবাই তাজ্জব হ'য়ে গিয়েছিলুম । শেষকালে ব্যাঙ্কসের কথায় সব পরিষ্কার হ'য়ে গেলো ।

'তোমরা কেউ ভূটানের রাজাকে চেনো ?' ব্যাঙ্কস বলেছিলো আমাদের ।

'আমি চিনি,' বলেছিলো হুড, 'বরং বলা ভালো, চিনতুম—কারণ দু-মাস আগে রাজা মারা গেছেন ।'

'মরবার আগে রাজা বেঁচে ছিলেন—বেঁচে ছিলেন মানে অন্য-সকলের চেয়ে আলাদাভাবে বেঁচে ছিলেন । জাঁকজমক ভালোবাসতেন রাজা, লোককে জাঁকজমক দেখাতে ভালোবাসতেন । কোনো মর্জি হ'লে তক্ষুনি তা পূর্ণ করা চাই—তার জন্যে যত টাকা লাগে, লাগুক । অদ্ভুত সব পরিকল্পনা খেলতো তাঁর মাথায়—রাজকোষে অঢেল অর্থ না-থাকলে কবেই সেজন্যে তাঁকে ফতুর হ'য়ে যেতে হ'তো কে জানে । একদিন তাঁর মাথায় হঠাৎ একটা অদ্ভুত গাড়ির কথা খেলে গেলো—সেটা নাকি দেখতে হবে হাতির মতো । সঙ্গে-সঙ্গে তার একটা কাল্পনিক ছবি এঁকে আমার উপর সেটা বানাবার ভার দিয়ে দিলেন । বানানো হ'লো ইস্পাতের একটি কাঠামো, হুবহু হাতির মতো দেখতে —তার ভিতরে বয়লার, কলকব্জা ও ট্র্যাকশন-এঞ্জিনের যাবতীয় যন্ত্রপাতি বসালুম আমি । হাতির শুঁড়টা ইচ্ছেমতো বোতাম টিপে ওঠানো-নামানো যায়—সেটা হ'লো চিমনি—পায়ের তলায় চাকা বসানো, আর স্টিয়ারিং-এর সঙ্গে সেগুলোর যোগ রইলো ; চোখে রইলো বৈদ্যুতিক মশালের ব্যবস্থা—বাস্, হস্তিগাড়ি বানানো সম্পূর্ণ হ'য়ে গেলো । ভেবো না যে চট ক'রে বানাতে পেরেছিলুম আমি—কাজটা অত সহজ নয়—; প্রথমত প্ল্যানটা আমার ছিলো না, ছিলো এক খেয়ালি রাজার—তাই তাঁর মর্জিমতো বানাতে গিয়ে নানা মুশকিলে পড়তে হয়েছিলো আমাকে । এই অতিকায় খেলনাটির জন্যে কত রাত যে নির্ঘুম কেটেছে, তার ঠিক নেই । রাজাও এত অস্থির হ'য়ে উঠেছিলেন যে দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই আমার কারখানায় এসে কাণ্ড দেখতেন । কিন্তু কাজটা একেবারে সম্পূর্ণ হবার আগেই তিনি মারা গেলেন—নিজের আবিষ্কারটা আর ব্যবহার করতে পারলেন না । তাঁর বংশধররা আবার তেমন খেয়ালি নয়, তার উপর কুসংস্কারে ভরা, তারা গাড়িটাকে ভাবলে কোনো পাগলের প্রলাপ, বিভ্রম । তারা গাড়িটাকে বেচে দিতে পারলে বাঁচে । তাই আমি নামমাত্র দামে কর্নেল মানরোর টাকায় এটা কিনে নিলুম । এখন এই রইলো চলন্ত বাড়ি বা হস্তিগাড়ি তোমাদের তাঁবে—আশি অশ্বশক্তি এঞ্জিনটার—আশি হস্তিশক্তির কথা না-হয় না-ই তুললাম !'

'শাবাশ, ব্যাঙ্কস, তুখোড় ! বাহবা !' হুড তারিফ ক'রে উঠেছিলো, 'আমাদের মধ্যে এমন-একজন এঞ্জিনিয়ার আছে যে আসলে আবার শিল্পীও—যে আসলে লোহা আর ইস্পাতের কবিই বরং—তা কে জানতো !'

'রাজার মৃত্যুর পর গাড়িটা যখন আমার অধীনে এলো, তখন কেন যেন হাতিটাকে ধ্বংস ক'রে ফেলার মতো বুকের জোর পাইনি । তাই গাড়িটাকে আমি কোনো সাধারণ চেহারা দিইনি ।'

'ঠিকই করেছো ! কী চমৎকার হবে ভাবো তো,' হুড সোল্লাসে বলেছিলো, 'যখন আমাদের হাতি নেপালের জঙ্গলে ধুপ-ধুপ পা ফেলে যাবে—সত্যি, রাজা ছাড়া এমন ভাব কারু মাথায় আসে !'

তক্ষুনি আমাদের অভিযানের ছক কেটে ফেলা হয়েছিলো—ঠিক হয়েছিলো পাঁচই মে আমরা ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বো ।

এই ফাঁকে ব্যাঙ্কসের চলন্ত বাড়ির কলকব্জার কথা সংক্ষেপে সেরে নিই । তার পেটের মধ্যেই গাড়ির সব যন্ত্রপাতি পোরা হয়েছে—সিলিণ্ডার, পিস্টন, পাম্প, বয়লার—সবকিছু । পিছনের দিকে রয়েছে জল আর জ্বালানি । বয়লার আর জ্বালানি-খুপরির মাঝখানের জায়গাটিতে রয়েছে জ্বালানিকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলার জন্য একটি জ্বালানিবাহী যন্ত্র । বয়লার আর জ্বালানি-খুপরি বসানো সেরা জাতের ইস্পাতের স্প্রিঙের উপর, যাতে বন্ধুর রাস্তাতেও তাদের উপর বেশি চোট না-পড়ে । চাকাগুলো নিরেট ; যাতে পিছলে না-যায়, সেই জন্যে যথেষ্ট সাবধানে বানানো হয়েছে । এঞ্জিনের ক্ষমতা যদিও স্বাভাবিক ক্ষেত্রে আশি অশ্বশক্তি—কিন্তু প্রয়োজন হ'লে তাকে বাড়িয়ে দেড়শো অশ্বশক্তিতে নিয়ে গেলেও বিস্ফোরণের বা বয়লার ফেটে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই । আর সব কলকব্জার বাইরে ইস্পাতের ঢাকনা বসানো—যাতে রাস্তার ধুলোবালি ভিতরে ঢুকতে না-পারে ।

বাড়িগুলো প্যাগোডার মতো দেখতে, মিনার নেই—কিন্তু গম্বুজের গায়ে নানা কাজ করা । সামনে পিছনে প্রশস্ত বারান্দা রয়েছে । দেখে মনে হয় যেন শোনগড়ের প্যাগোডাই হঠাৎ পা গজিয়ে চলতে শুরু ক'রে দিয়েছে । এই সঙ্গে এ-কথা বলাও ভালো যে এই আশ্চর্য বাড়িটা আবার জলেও ভাসতে পারে— কারণ বাড়িগুলোর নিচের দিক হালকা একটা ইস্পাতের নৌকোর মতো তৈরি—আর হাতির পেটে স্টীমারের যন্ত্রপাতিও ঢোকানো হয়েছে । হাতির পাগুলো যেন স্টীমারের চাকা—; ফলে ভারতের মতো বিচিত্র দেশে বেড়াবার পক্ষে জলে-ডাঙায় সমানভাবে চলে এমনি একটা উভচর গাড়ি পেয়ে আমরা সবাই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলুম । ভূটানের রাজাকে ধন্যবাদ, কারণ কোনো খেয়ালি কবি ছাড়া এমন যানের কথা আর কার মাথায় আসতো ? বাংলো দুটি মাত্র আঠারো ফিট প্রশস্ত—তাই তেমন একটা জায়গা জুড়ে যাবে না । ভিতরটা ইওরোপীয় কেতায় সাজানো ; যাতে কারু বিন্দুমাত্র অসুবিধে না-হয়, ব্যাঙ্কস সেদিকে সবসময় সজাগ লক্ষ রেখেছিলো ।

কলকাতায় এসে আমি উঠেছিলুম স্পেনসার হোটেলে—সেটাই নাকি কলকাতার সবচেয়ে ভালো হোটেল। পাঁচই মে সকালবেলা হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম আমি। ততদিনে কলকাতা আমার বেশ চেনা হ'য়ে গেছে। সকালবেলায় বেড়াতে বেরুতুম, সন্ধেবেলায় স্ট্র্যাণ্ডে গঙ্গার হাওয়া খেতুম—দুপুরবেলাটা অবশ্য গরমে কাহিল হ'য়ে পড়তে হ'তো। এসপ্লানেড, গড়ের মাঠ, ফোর্ট উইলিয়াম, গঙ্গার ধারে শ্মশানঘাট, কলকাতার হাটবাজার, হুডার সাহেবের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বটানিক্যাল গার্ডেন, কালীঘাটের মন্দির, চৌরঙ্গির অদ্ভুত বাড়িগুলো, লাটসাহেবের বাড়ি, টাউন হল, হুগলির ইমামবাড়া, খিদিরপুর ডক—কিছুই আমি দেখতে বাকি রাখিনি।

হোটেল থেকে বেরিয়ে *পাল্কিগাড়িতে* ক'রে কর্নেল মানরোর বাংলোয় গিয়ে হাজির হ'য়ে দেখি ক্যাপ্টেন হুডের তুলকালাম ফুর্তির আর শেষ নেই। শেষকালে যে কর্নেল মানরো তাঁর নির্জনবাস ছেড়ে সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছেন, এই আনন্দেই সে আটখানা।

ঢং ক'রে যাবার ঘণ্টা পড়লো। স্টীম চাপানো হয়েছে পূর্ণ মাত্রায়। এঞ্জিনচালক ব'সে আছে তার আসনে, রেগুলেটরে হাত দিয়ে। তীব্র সুরে বাঁশি বেজে উঠলো এঞ্জিনের।

'চলো, *বেহেমথ*, চলো!' হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বললে ক্যাপ্টেন হুড।

আর সত্যি, *বেহেমথ* ছাড়া আর কী-ই বা নাম হ'তে পারে এই আশ্চর্য শকটের। *বেহেমথ* কথাটা হিব্রু থেকে নেয়া, আর হিব্রুরা শব্দটা ধার করেছে মিশরি *পেহেমেউ* কথা থেকে, যার মানে হ'লো অতিকায় জলহস্তী।

আমাদের এঞ্জিনচালকের নাম স্টর; বয়েস ৪০ হবে; স্টর একজন ইংরেজ, কয়েক মাস আগেও সে *'গ্রেট সাদার্ন'* রেলপথে কাজ করতো—ব্যাঙ্কস তাকে অত্যন্ত চালাক চতুর ও কর্মঠ দেখেই *বেহেমথের* চালক হিশেবে নিযুক্ত করেছিলো। ফায়ারম্যানের নাম কালু, আসলে সাঁওতাল—ধকল আর তাপ সইতে পারে ব'লে রেল কম্পানিতে তারা ফায়ারম্যানের কাজ পায়, লোহিত সাগরে যেমন আরবরা স্টীমারের কয়লা জোগানোর চাকরি নেয়। তা ছাড়া গৌমি নামে কর্নেল মানরোর এক গুর্খা ভৃত্য ছিলো। বেঁটে-খাটো, ক্ষিপ্র, চটপটে আর বিশ্বস্ত—আগে গুর্খা রাইফেল্‌সের সেপাই ছিলো—এখনও পলটনি উর্দি গা থেকে নামায়নি; —ম্যাক-নীলের মতো গৌমিও মানরোর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। ক্যাপ্টেন হুডেরও এক বিশ্বস্ত অনুচর ছিলো—ফক্স নামে এক অল্পবয়েসী ইংরেজ, প্রাণখোলা আর চটপটে—সবদিক থেকেই তারুণ্যে ভরপুর। হুডের মতো, সেও খুব ভালো শিকারী—সেই জন্যেই হুডের সে এত ভক্ত। হুডের সঙ্গে অনেকবার শিকারে গেছে সে— এ-পর্যন্ত সে বাঘ মেরেছে সাঁইত্রিশটি, আর হুড মেরেছে তার চেয়ে মাত্র তিনটি বেশি। এছাড়া ছিলো একটি নিগ্রো বাবুর্চি—নিকষ নিগ্রো ঠিক নয়, দো-আঁশলা, ফরাশি রক্তও আছে তার ধমনীতে—নাম মঁসিয় পারাজার। ভালো রান্না করতে পারে ব'লে তার গর্বের আর শেষ নেই।

সবমিলিয়ে আমাদের বাহিনীর সদস্য দশজন : সার এডওয়ার্ড মানরো, ব্যাঙ্কস, হুড, আমি—মোক্লের, ম্যাক-নীল, স্টর, কালু, গৌমি, ফক্স আর মঁসিয় পারাজার। ফ্যান আর নাইজার নামের শিকারি কুকুর দুটির কথাও অবিশ্যি উল্লেখ করা উচিত—তাদের যথাযথ স্বীকৃতি না-দিলে হুড আবার রেগে উঠবে।

হুগলি নদীর বাম তীর ধ'রে এগিয়ে যাচ্ছিলো *বেহেমথ*। হুগলি গঙ্গার পশ্চিম দিকের শাখা। গঙ্গা আসলে অদ্ভুত নদী : সমস্ত উত্তরাপথের সমৃদ্ধির উৎস সে, কিন্তু হুডের মতে এমন খেয়ালি, বদমেজাজি ও পাগল নদী নাকি খুব কম আছে—কখন যে দিক বদলাবে—কোথায় যে তার নতুন শাখা বেরুবে, তা নাকি কেউ বুঝতে পারে না। আগে নাকি রাজমহল আর গৌড়—দুই-ই ছিলো গঙ্গার তীরে, অথচ এখন তারা জলের অভাবে নাকি শুকিয়ে মরে।

শুনে বললুম, 'তাহ'লে তো কলকাতার কপালেও অনেক দুঃখ আছে !'

'কে জানে—' হুড বললে।

'না, না,' ব্যাঙ্কস বললে, 'আজকাল আর ও-সব হবে না। আমরা এঞ্জিনিয়াররা আছি কী করতে—খাল কেটে সর্বত্র জল নিয়ে যাবো !'

হুড কিন্তু ততক্ষণে নিজের বিষয় পেড়ে ফেলেছে, 'বাংলা দেশের নদীর কথা বলতেই আমার সুন্দরবনের কথা মনে প'ড়ে যায়। আহা, রোদে পিঠ দিয়ে কুমিরগুলো কেমন শুয়ে আছে চড়ায়। আর কী সুন্দর বাঘ : রাজার মতো— তেমনি অহংকারী, উদ্ধত আর মেজাজি !'

আমাদের সব কথা হচ্ছিলো *চলন্ত বেহেমথের* খাবার-ঘরে ব'সে ; ছোটোহাজরি সেরেছি আমরা একটু আগে—ফক্স দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খাবার টেবিল সাফ করছে তখন।

'ফক্স !' হুড ডাক দিলে।

'বলুন, ক্যাপ্টেন !'

'সুন্দরবনেই তো তুমি সাঁইত্রিশ নম্বরটাকে মেরেছিলে !'

'হ্যাঁ ক্যাপ্টেন—ক্যানিং থেকে দু-মাইল দূরে। সেদিন সন্ধেবেলায়—'

'বাস্, বাস্, তাহ'লেই হবে। সাঁইত্রিশ নম্বরের সব কথাই আমি জানি। তোমার আটত্রিশ নম্বরটির ইতিহাস জানবার জন্যই আমার কৌতূহল জাগছে।'

'আটত্রিশ নম্বরটি তো এখনও মারিনি, ক্যাপ্টেন !'

'মারোনি, কিন্তু একদিন মারবে তো। সেদিন আমিও আমার একচল্লিশ নম্বরটিকে শিকার করবো, ফক্স !'

লক্ষ করার বিষয় হুড বা ফক্স—কেউ এর মধ্যে একবারও বাঘ কথাটি উচ্চারণ করলে না। দরকারই বা কী ? নম্বর দিয়ে বললেই তারা পরস্পরের কথা বুঝে নিতে পারে।

একটা নাগাদ *বেহেমথ* চন্দননগর পৌঁছুলো। সারা বাংলা দেশে এই জায়গাটাই কেবল ফরাশিদের সম্পত্তি এখন। এককালে খুবই সমৃদ্ধ ছিলো, এখন চারধারে কেবল

ক্ষয়েরই চিহ্ন । লোকজনও তেমন নেই । এলাহাবাদের রেলপথ এখান দিয়ে গেলে হয়তো আবার শহরটা একটু জীবন্ত হ'তো । কিন্তু ফরাশি অঞ্চল ব'লে রেলপথ পাতা হয়েছে ঘুরিয়ে—চন্দননগরের বাইরে দিয়ে ।

আমরা ঠিক চন্দননগরের ভিতরে ঢুকিনি । শহরের তিন মাইল দূরেই আস্তানা গেড়েছিলুম । এর পরে দু-দিন ধ'রে একটানা চললে আমরা বর্ধমান পৌঁছুবো—তাই এখানে একটু বিশ্রাম ক'রে নেবার পরিকল্পনা ছিলো ।

মে মাসের নয় তারিখে বর্ধমানের প্রধান তোরণের কাছে পৌঁছুলুম আমরা ; সেই দিনটা বর্ধমানের যাবতীয় দ্রষ্টব্য স্থান দেখে নিয়ে পরদিন রামগড়ের উদ্দেশে রওনা হ'য়ে পড়লুম । এই পথ দিয়ে যাবার ফলে আমরা অবশ্য মুর্শিদাবাদ, মুঙ্গের কি পাটনা দেখতে পেলুম না, কিন্তু বারাণসীর উদ্দেশে রায়গড় হ'য়ে গেলেই তাড়াতাড়ি পৌঁছুবো ব'লে আমরা এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম ।

পনেরোই মে আমরা রামগড় পেরিয়ে গেলুম—আঠারোই মে ছোট্ট শহর চিত্রায় থামলো *বেহেমথ* ।

পথে তেমন-কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনাই ঘটেনি । গরম ছিলো প্রচণ্ড, কাজেই ছায়ায়-ছায়ায় দিবানিদ্রার চেয়ে আরামপ্রদ আর কী ছিলো ! সন্ধেবেলায় গরম কমলে আমরা সবাই মিলে আড্ডা দিতুম—কেবল কর্নেল মানরো আর সার্জেন্ট ম্যাক-নীল আমাদের আলোচনায় যোগ দিতেন না—চুপ ক'রে ব'সে-ব'সে কী যেন ভাবতেন । হয়তো *বেহেমথ* ক্রমশ বিদ্রোহের ঘটনাস্থলের দিকে এগুচ্ছে ব'লেই স্মৃতি জেগে-ওঠার ফলে কর্নেল মানরো অমন গুম মেরে গেছেন ! কে জানে !

৫

ফল্গুনদীর তীর্থযাত্রী

এখন যাকে বিহার বলে, আগে তার নাম ছিলো মগধ । বৌদ্ধ ধর্মের উজ্জ্বল দিনে মগধ ছিলো দিব্যভূমি, এখনও বহু মঠ আর বিহার তার সাক্ষী । তারা বানিয়েছিলো বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিহার ; দেশবিদেশ থেকে সবাই পড়তে আসতো ; জাতপাতের ভেদ ছিলো না । কিন্তু কয়েকশো বছর ধ'রে বৌদ্ধ শ্রমণদের জায়গা নিয়েছে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ ; তারা বানিয়েছে টোল, চতুষ্পাঠী, সেখানে সবাই নয়—অধ্যয়নের অধিকার শুধু ব্রাহ্মণদের । গঙ্গাস্নান, জগন্নাথ মন্দিরের উৎসব, কাশীযাত্রা—এইসব পুণ্যকর্মের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখানেও নানা অনুষ্ঠান হয় ।

আমাদের বাষ্পেচলা বাড়ি (ওরফে *বেহেমথ*) এখন বিহারে এসে পড়েছে । প্রচণ্ড গরম ; তপ্ত হাওয়া জানলার বাইরে স্বচ্ছ শিখার মতো কেঁপে-কেঁপে ওঠে ; কখন আষাঢ় আসবে, সেই স্বপ্নে বুক বেঁধে প'ড়ে থাকে মাঠঘাটপ্রান্তর, মোহ্যমান মানুষজন ।

১৯ শে মে দুপুরবেলায় আমরা চিত্রা শহর ছাড়লুম, আর পরদিন রাত্রে এসে পৌঁছুলুম গয়ার কাছে—সারাদিন দুর্দান্ত গরম গেছে, তাপমান যন্ত্রে ১০৬° ডিগ্রিও পেরিয়ে গিয়েছিলো, তাই আমরা নদীর ধার দেখে ছায়ায়-হাওয়ায় আস্তানা করলুম । নদীটির নাম ফল্গু ; গঙ্গার মতো ফল্গু নদীতেও সবসময় পুণ্যার্থীদের ভিড় লেগেই থাকে ।

শহর থেকে মাইল দু-এক দূরে গাছপালার ভিড়ের মধ্যে আমাদের বাড়ি দুটো, থুড়ি, গাড়ি দুটো, থামানো হয়েছিলো । সেখানে তারপর সারা দিন বিশ্রাম । পরদিন সকালে চারটে নাগাদ আমরা গয়া শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লুম—দুপুরবেলার রোদের তাতের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই এত ভোরে বেরিয়ে পড়েছিলুম আমরা—আমরা, মানে ব্যাঙ্কস, ক্যাপ্টেন হুড আর আমি । কর্নেল মানরো *বেহেমথেই* থেকে গেলেন ।

গয়া হিন্দুদের খুব নামজাদা তীর্থস্থান ; রাস্তায়-ঘাটে পুণ্যার্থীদের ভিড়ে চলার উপায় নেই, সারা বছরই এমনি মারাত্মক ভিড় থাকে এখানে । তবু এরই মধ্যে দিয়ে কোনোমতে পথ ক'রে নিয়ে আমরা গিয়ে একে-একে বোধিদ্রুম, বিষ্ণুমন্দির ও আরো-সব দ্রষ্টব্য স্থান দেখে এলুম । লোকজনের ভিড়ে কোনোখানেই তিষ্ঠোবার জো নেই । অবশেষে সব দেখেশুনে আমরা এলুম ফল্গু নদীর তীরে, যেখানে নদীর জলে গয়ার পাথর ধুয়ে যাচ্ছে । সেখানে যা ভিড় তা অবর্ণনীয় : নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, চাষী-জমিদার, শৌখিন বাবু আর গরিব রায়ত, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, পারিয়া, ব্রাহ্মণ, সবল রাজপুত, কাহিল বাঙালি, জোয়ান পঞ্জাবি আর সুদর্শন সিন্ধি—কেউ পাল্কিতে, কেউ বলদে-টানা গাড়িতে, কেউ উটের পিঠে এসে এখানে হাজির হয়েছে । ভারতের কোনো অঞ্চল বাদ পড়েনি । তাঁবু ফেলেছে কেউ, কেউ ডালপালা দিয়ে কুটির বানিয়ে নিয়েছে, কেউ-বা তার গাড়ির ভিতরেই আশ্রয় নেবে দরকার হ'লে ।

'উঃ, কী ভিড় ।' হুড ব'লে উঠলো ।

'আজ আর ফল্গু নদীর জল খাওয়া যাবে না,' ব্যাঙ্কস সব দেখে-শুনে মন্তব্য করলে।

জিগেস করলুম, 'কেন ?'

'কারণ এর জলকে পবিত্র ব'লে মনে করে হিন্দুরা—দলে-দলে গিয়ে এরা আজ স্নান করবে ; আর কাদা করবে সবখানে, টলটলে জলও ঘোলা ক'রে দেবে ; গঙ্গায় যেমন করতো । কলকাতায় দ্যাখোনি ?'

'আমরা কি ভাটির দিকে নাকি ?' আমাদের ডেরার দিকে আঙুল দেখিয়ে হুড আঁৎকে ওঠার ভঙ্গিতে বললে ।

'না, না,' তার কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে ব্যাঙ্কস হেসে উঠলো, 'আমরা অনেক উপরে রয়েছি —ঘোলাজল ওখানে পৌঁছুবে কী ক'রে ?'

এই ভিড়ের মধ্য দিয়েই আমরা অতি কষ্টে এগিয়ে চললুম । ছাই-মাখা সাধু, নগ্ন

সন্ন্যাসী, আলখাল্লা-ঢাকা ফকির, ভাং খেয়ে বুঁদ-হয়ে থাকা ভক্ত—দেখে আমার বিস্ময়ের আর শেষ থাকে না। কোথাও দেখলুম শিবের ভক্তরা তীর দিয়ে হাত-পা বিঁধছে ক্রমাগত, আর সেই হাত-পা দিয়ে বেরুনো রক্ত জিভ দিয়ে চেটে খাচ্ছে বিষাক্ত সাপেরা। দেখে আমার বুকের রক্ত যেন হিম হ'য়ে গেলো। নিশ্বাস রোধ হ'য়ে আসে প্রায়। তাড়াহুড়ো ক'রে চ'লে আসবো, ব্যাঙ্কস আমাকে হাত ধ'রে থামালে—'যাচ্ছো কোথায় ? পুজোর সময় হ'লো—দেখে যাই !'

তার কথা শেষ হবার আগেই ভিড়ের মধ্যে এক ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হ'লো, ডান হাত তুলে সে বাড়িয়ে ধরলো উদয়সূর্যের দিকে, আর প্রথম আলোকরেখা বেরিয়ে এলো গয়ার মস্ত শিলাতলের উপর থেকে। সেটাই বুঝি সংকেত ছিলো, অমনি দলে-দলে নরনারী পুণ্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। সমবেত মন্ত্রোচ্চারণের কোলাহল উঠলো ফল্গু নদী থেকে, আর তারই মধ্যে স্নানার্থীরা দিব্য জলে যেন এই মরদেহ ও অমর আত্মা ধুয়ে-মুছে দেবতার সান্নিধ্যের জন্য তৈরি হ'য়ে নিলে। কারণ জল থেকে উঠেই তারা কৈলাসে যাবে দেবসন্নিধানে।

আমরা আর দেরি না-ক'রে আমাদের আস্তানায় ফিরে এলুম। ছোটোহাজরি তৈরি ছিলো : খাবার টেবিলে ব'সে আমরা এই কল্পনাতীত দৃশ্যের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করতে লাগলুম। ইতিমধ্যে রোদের তেজ বাড়তে লাগলো ক্রমশ, আর চারপাশ যেন এই গরমে ধুঁকতে লাগলো। যেন আমাদের সর্ব ইন্দ্রিয়কে ভোঁতা ও নিস্তেজ ক'রে সূর্যের প্রখর রথের চাকা চ'লে গেলো আমাদের উপর দিয়ে।

সারাদিনে আর-কোনো ঘটনাই ঘটলো না। পরদিন সকালে রওনা হবো ব'লে ঠিক ছিলো, তাই স্টর, কালু আর গৌমি জ্বালানি আর জলের ব্যবস্থা করতে বেরিয়েছিলো সন্ধেবেলায়। তারা সব ব্যবস্থা ক'রে ফিরে এলো।

দিনের বেলা আবহাওয়া ছিলো শুকনো, কিন্তু রাতের বেলা ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ ঝুলে রইলো আকাশে, আর্দ্রতা এত বেড়ে গেলো যে ঘেমে-নেয়ে আমাদের কষ্ট যেন শতগুণ বেড়ে গেলো। রাত নটার সময়েই আমরা আচ্ছন্নের মতো গিয়ে শুয়ে পড়লুম—সব কেমন যেন ঝিম ধরা অথচ তবু কিন্তু ঘুম আসছিলো না।

হঠাৎ রাত একটা নাগাদ দূরাগত মর্মর শুনতে পেলুম আমি বিছানায় শুয়ে-শুয়ে। ভাবলুম, বুঝি বৃষ্টি হবে, তাই বজ্রবিদ্যুতের আনাগোনা শুরু হ'লো। কিন্তু তা তো নয়। গাছের একটা পাতাও কাঁপছে না, সব থম মেরে আছে, হাওয়া মোটেই নেই। উঠে আমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকালুম। অন্ধকার—কিছুই দেখা যাচ্ছে না—অথচ সেই দূরাগত ধ্বনি তখনও কানে আসছে। ফল্গু নদীর জল শান্ত নিস্তরঙ্গ ; আকাশে বজ্র-বিদ্যুতের কোনো চিহ্ন নেই। কীসের শব্দ তাহ'লে এটা ? বুঝতে পারলুম না। কিন্তু অবসাদে তখন এমন অবস্থা যে বাইরে বেরিয়ে ভালো ক'রে সন্ধান করার মতো মনোবল নেই। আমি আচ্ছন্নের মতো ঢুলতে লাগলুম—এবং মাঝে-মাঝে তন্দ্রার ভিতর কেবল সেই রহস্যময় আওয়াজ কানে আসতে লাগলো, আর-কিছুই না।

ঘন্টা দুয়েক পর অন্ধকার যখন ফিকে হ'য়ে আসছে, তখন হঠাৎ আমি ধড়মড় ক'রে উঠে বসলুম। বাইরে বারান্দা থেকে কে যেন এঞ্জিনিয়ারকে ডাক দিচ্ছে: 'মিস্টার ব্যাঙ্কস!'

'কী চাই?'

'আপনি দয়া ক'রে একবার বাইরে আসবেন?' স্টরের গলা।

আমি গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালুম। কর্নেল মানরো বারান্দাতেই ছিলেন, হুডও পরক্ষণে এসে হাজির।

'কী ব্যাপার? ব্যাঙ্কস জিগেস করলে।

'একবার কেবল তাকিয়ে দেখুন ওদিকে,' স্টর বললে।

তখন এতটা আলো হয়েছে যে নদীর পাড় আর সামনের রাস্তা আবছা মতো দেখা যায়। তাকিয়ে দেখি কয়েকশো সাধু-সন্ন্যাসী রাস্তার উপর শুয়ে আছে।

'এরা তো কালকের সেই তীর্থযাত্রী দেখছি!' হুড বললে।

জিগেস করলুম, 'কিন্তু এরা এখানে কী করছে?'

'হয়তো সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করছে—তারপর সূর্যের পুজো করবে আর-কি!' বললে হুড।

'উঁহু, আমার তা মনে হয় না,' বললে ব্যাঙ্কস, 'তাই যদি উদ্দেশ্য হবে তো গয়া ছেড়ে অ্যাদ্দুরে এখানে আসবে কেন? আমার ঘোরতর সন্দেহ হয় যে তারা এখানে এসেছে—'

'*বেহেমথকে দেখতে*,' বাধা দিয়ে বললে হুড, 'কারণ *বেহেমথ* যথারীতি তাজ্জব ক'রে দিয়েছে তাদের! তারা হয়তো শুনেছে যে মস্ত একটা হাতি—অতিকায় এক হাতি—এত-বড়ো যে কেউ কোনোদিন অমনটি দ্যাখেনি—এসেছে এখানে, তাই তারা হাতিটাকে তারিফ করতে এসেছে।'

ব্যাঙ্কস মাথা নাড়লে, 'তারিফ করতে এসে থাকলেই সবদিক থেকে মঙ্গল!'

'কেন? আবার কীসের ভয়—' জিগেস করলেন মানরো।

'হয়তো রাস্তা আটকে বসবে এরা—কে জানে!'

'যা-ই করো, অতি সাবধানে। খুব হুঁশিয়ার। এ-সব সাধু-সন্ন্যাসীর গায়ে যেন আঁচড়টি না-লাগে!'

'কালু!' ব্যাঙ্কস হাঁক পাড়লে, 'আগুন জ্বেলেছো?'

'হ্যাঁ, সাহেব!'

'ভালো ক'রে স্টীম চাপিয়ে দাও।'

তখন সাড়ে-তিনটে বাজে। ক্রমশ পুবদিক আলো হ'য়ে উঠছে। *বেহেমথের* শুঁড় থেকে পেঁচিয়ে কালো ধোঁয়া উঠছে, মাঝে-মাঝে গর্জন ক'রে উঠছে *বেহেমথ*। কিন্তু সমবেত জনতা তাকে কিংবদন্তির ঐরাবত ব'লেই মেনে নিলে। দলে-দলে এগিয়ে আসতে লাগলো তারা সামনে—কিছুটা ভয়ে, কিছুটা সম্ভ্রমের সঙ্গে—আর এসে, হাতির

পায়ের সামনে দণ্ডবৎ হ'য়ে প'ড়ে রইলো ।

চারটের সময় পুরো স্টীম পাওয়া গেলো, থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো *বেহেমথ* । ব্যাঙ্কস নিজেই স্টরের সঙ্গে হাওদায় গিয়ে বসলে । সে নিজেই চালাবে *বেহেমথকে* । বারান্দা থেকে মানরো চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সাবধান, ব্যাঙ্কস ; এদের গায়ে যেন আঁচড়টিও না-লাগে ।'

উত্তরে *বেহেমথ* তীক্ষ্ণ স্বরে শিটি দিলে, আর তারও উত্তরে সেই বিপুল ভিড় সমস্বরে প্রচণ্ড চেঁচিয়ে উঠলো ।

'পথ ছেড়ে দাও, পথ ছেড়ে দাও !' ব্যাঙ্কস চেঁচিয়ে বললে । চাকাগুলো অর্ধেক ঘুরে এলো, *বেহেমথের* শুঁড় দিয়ে এক ঝলক শাদা ধোঁয়া বেরিয়ে এলো । মুহূর্তে ভিড় দু-ভাগ হ'য়ে গেলো ! *বেহেমথ* কয়েক পা এগিয়ে গেলো ।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলুম, 'সাবধান ব্যাঙ্কস, দেখে—' বারান্দা থেকে ঝুঁকে প'ড়ে দেখতে পেলুম জনা দশ-বারো বিষম ভক্ত রাস্তায় শুয়ে পড়েছে চিৎপাত হ'য়ে—উদ্দেশ্য এই অতিকায় শকটের চাকার তলায় পিষে-যাওয়া ।

মানরো চেঁচিয়ে তাদের বললেন, 'সরো-সরো, স'রে দাঁড়াও !'

'কী আহাম্মক এগুলো ! *বেহেমথকে* কি এরা জগন্নাথের রথ পেয়েছে যে দেবতার রথের তলায় ম'রে গিয়ে স্বর্গে যেতে চায়,' হুড রেগে উঠলো !

ব্যাঙ্কসের ইঙ্গিতে কালু স্টীম বন্ধ ক'রে দিলে । সেই ভক্তরা যে ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠবে কোনো কালে, তেমন কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না । এদিকে ভিড় তাদের চেঁচিয়ে খুব উৎসাহ দিচ্ছে শুয়ে থাকতে ! ব্যাঙ্কস কি-রকম বিমূঢ়, লজ্জিত আর অসহায় বোধ করলে ।

হঠাৎ কী-একটা ফন্দি খেলে গেলো তার মাথায় । বয়লারের তলায় যে কতগুলো পাইপ ছিলো, তা দিয়ে হুশহুশ ক'রে স্টীম ছেড়ে দিলে সে তাদের লক্ষ্য ক'রে, আর সেই সঙ্গে বাঁশির তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ বারে-বারে জনতার কোলাহল চিরে দিলে ।

এটাই কিন্তু কাজে লাগলো ! গরম বাষ্প পিচকিরির মতো গায়ে পড়তেই তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠলো তারা চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে । রথের তলায় চাপা পড়তে কোনো ভয় নেই তাদের, কিন্তু এ-রকমভাবে মিছেমিছি ঝলশে আধপোড়া হ'য়ে যেতে চায়নি তো তারা ।

ভিড় স'রে দাঁড়ালো, *বেহেমথ* এগিয়ে গেলো কয়েক পা, তারপর রাস্তা ফাঁকা দেখে বাষ্পের মেঘের মধ্য দিয়ে সেই স্তম্ভিত জনতার চোখের সামনে থেকে *বেহেমথ* কোন দূরে মিলিয়ে গেলো ।

৬

বারাণসীতে কয়েক ঘণ্টা

এখন কেবল খোলা বড়ো রাস্তা প'ড়ে আছে আমাদের *চলন্ত বাড়ির* সামনে ; সাসারাম হ'য়ে গঙ্গার ডান তীর ধ'রে একেবারে বারাণসী পর্যন্ত নিয়ে যাবে আমাদের এই রাস্তা। রোটাসের কাছে পেরিয়ে এলুম শোন নদী—আরা আর দিনাজপুরের কাছে এসে সব শাখা নিয়ে যে গঙ্গায় এসে মিশেছে। গাজিপুরের গোলাপবন, মুঘলসরাইয়ের রেলপথ, পঁয়ত্রিশ মাইল দূরের গোমতীর অধিত্যকার জৌনপুর—সব পেরিয়ে এলো *বেহেমথ*।

বারাণসী গঙ্গার বাম তীরে ; এখানে নয়, এলাহাবাদে আমাদের গঙ্গা পেরুতে হবে। বাইশে মে রাত্রে *বেহেমথ* গঙ্গার তীরে শিবির ফেলেছিলো, তেইশে সকালবেলায়—ঠিক ছিলো—আমরা বারাণসী দেখতে যাবো। তীরে অনেকগুলো নৌকো নোঙর-করা, ঠিক ছিলো এরাই আমাদের নিয়ে যাবে।

এ-সব জায়গায় আগে অনেকবার ঘুরেছেন কর্নেল মানরো, তাই তাঁর আর দেখার কিছু ছিলো না ; তবু প্রথমে তিনি ঠিক করেছিলেন আমাদের সঙ্গেই প্রাচীন শহরে বেড়াতে যাবেন, কিন্তু পরে ম্যাক-নীলকে নিয়ে গঙ্গার তীর ধরেই বেড়াতে যাবেন ব'লে ঠিক করলেন। হুড আগে কিছুদিন বারাণসীতে ছিলো, এই সুযোগে সে তার পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেলো। ফলে আমি আর ব্যাঙ্কসই কেবল বারাণসীর ঘিঞ্জিগলি, বিপুলবপু ধর্মের ষাঁড়, জীর্ণ মন্দির আর বিখ্যাত ঘাটগুলো দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়লুম।

অন্য-সব প্রধান নগরের মতো বারাণসীতেও ১৮৫৭ সালে বিক্ষোভের আগুন জ্বলেছিলো, আর সেই বিদ্রোহ কেমন ক'রে কর্নেল মানরো ও ম্যাক-নীল কঠোর ও নির্দয়ভাবে দমন করেছিলেন, নৌকোয় ব'সে-ব'সে সেই কাহিনীই আমাকে শোনাচ্ছিলো ব্যাঙ্কস। 'হয়তো কর্নেল মানরো বিক্ষোভের কোনো চিহ্নমাত্র দেখতে চান না ব'লেই শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এলেন না,' ব্যাঙ্কস তার ধারণা ব্যক্ত করলে।

আমাদের নৌকো তখন ধীরে ভেসে চলেছে, আর বাম তীরে বারাণসী তার জীর্ণ গোল গম্বুজ, শ্যাওলাজমা প্রাসাদ, ত্রিশূল-বসানো মন্দির আর স্নানার্থী-ভিড়-করা ঘাট সমেত উম্মোচিত হ'য়ে পড়েছে। 'এই প্রথমবার কাশী দেখতে যাচ্ছো তুমি,' ব্যাঙ্কস বললে, 'কিন্তু আশা কোরো না যে এই পুরোনো শহরটিতে তিনশো বছরের পুরোনো স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখতে পাবে। কিংবা পাবে শুধুমাত্র নিদর্শনই। কিন্তু তাতে অবাক হ'য়ো না। কতবার যে আগুন আর তরবারি খেলা করেছে এই শহরে, তার ইয়ত্তা নেই। বিদেশীরা লুঠতরাজ করেছে, আগুন জ্বালিয়ে সব পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিয়েছে। কিন্তু তাহ'লেও কাশী তোমার কাছে অদ্ভুত ঠেকবে, ব'লে রাখলুম। এ-রকম

শহর তুমি আগে কখনও দ্যাখোনি ।’

নাপোলির নীল জলের মতো জল এখানকার । দূরে, নৌকো থেকেই তাকিয়ে দেখলুম, অদ্ভুত-সব বাড়িঘর জলের উপর ঝুঁকে আছে, একেবারে জলের থেকে উঠে গেছে কতগুলো বাড়ির সিঁড়ি । দেখতে পেলুম চৈনিক ধরনে নির্মিত একটি ভাঙাচোরা বুদ্ধমন্দির—গম্বুজ, বুরুজ আর মিনার-বসানো ; দেখতে পেলুম মসজিদ আর মন্দির —মন্দিরের চুড়োয় শিবলিঙ্গ বসানো, মসজিদের গম্বুজে আরব্য লতাপাতার কাজ । ঘাটে-ঘাটে স্নানার্থীর ভিড় : অনেকটা যেন ফল্গু নদীর স্নানের দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি ।

অবশেষে আমাদের নৌকো মণিকর্ণিকা ঘাটে এসে থামলো । ঘাটের পাশে কত জ্বলন্ত চিতা থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশে ; সেই চিতার আগুন আর ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে সন্তর্পণে এসে আমরা শহরে পা দিলুম ।

সারাটা দিনই কেটে গেলো শহর দেখতে । দেখলুম শহরের বিরাট স্তম্ভ ও স্মৃতিমন্দিরগুলি, আরব্য বাজারের মতো অন্ধকার-ভরা ঘিঞ্জি দোকানবাড়ির সারি ; সূক্ষ্ম মশলিন, রেশমি কিংখাব, জরি-করা রেশমি বসন— এই সবই এখানে সবচেয়ে বেশি বেচাকেনা হয় ; রাস্তাগুলি ঘিঞ্জি, আর দিনের বেলাতেও অন্ধকার—ধর্মের ষাঁড় ছাড়া কোনোদিন যে সূর্যের আলো এখানে এসে ঢোকে তা মনে হয় না । আর তারই মধ্যে দিয়ে বেহারারা হুম্-হুম্ ক'রে আমাদের পাল্কি ব'য়ে নিয়ে চললো । এই গরমে আমাদেরই কষ্ট হচ্ছিলো, কিন্তু তাদের মুখে কোনো নালিশ নেই । তা তারা না-হয় পাল্কি বওয়ার জন্যে টাকা পাবে, কিন্তু যে-বাঙালিটি সেই থেকে ফেউয়ের মতো আমাদের পাছু নিয়েছে, তার ধূর্ত ও তীক্ষ্ণ চোখে আর যা-ই থাক, অর্থলাভের কোনো আশা নেই । সে কেন এমনভাবে অনুসরণ করছে আমাদের ? মণিকর্ণিকা ঘাটে যখন নামি, তখন আমি ব্যাঙ্কসের সঙ্গে কী নিয়ে যেন আলোচনা করছিলুম, আর সেই সময় আমি হঠাৎ জোরে কর্নেল মানরোর নাম ব'লে ফেলি । এই বাঙালি লোকটা তখন ঘাটে দাঁড়িয়ে ছিলো —হঠাৎ মানরোর নাম শুনে সে যেন চমকে ওঠে । তখন আমি সেদিকে তেমন নজর দিইনি, কিন্তু এখন এই পাছু-নেয়া টিকটিকিটিকে দেখতে-দেখতে সেই কথা হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো । কে সে ? আমাদের বন্ধু, না শত্রু ? জানি না । শুধু এটুকু জানি মানরোর নাম শুনেই সে আমাদের পাছু নিয়েছে । আর তাইতেই মনে হয় সে আদৌ আমাদের বন্ধু নয়, দুশমন ।

আমাদের পাল্কি তখন ঔরঙজীবের সেই মসজিদের কাছে গিয়ে থেমেছে—আগে এখানে নাকি ছিলো এক বিষ্ণুমন্দির, কিন্তু ঔরঙজীব সেই মন্দিরের ধ্বংসস্তূপেই তাঁর এই বিরাট মসজিদ রচনা করেছিলেন । মিনারের উপরে কাউকে উঠতে দেয়া হয় না, কারণ এর মধ্যেই দুটি মিনার পিসার স্তম্ভের মতো হেলে পড়েছে—কোনো সংরক্ষণ ব্যবস্থা না-থাকলে যে-কোনো দিন ধ্ব'সে পড়তে পারে ।

মসজিদের ভিতর থেকে বেরিয়েই আবার দেখি সেই বাঙালিটি বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে । তার দিকে তাকাতেই সে চোখ নামিয়ে নিলে । কিন্তু সন্দেহ আরো পাকা হবার

আগে আমি ব্যাঙ্কসকে এ-বিষয়ে কিছু বলতে চাচ্ছিলুম না।

বিশ্বেশ্বর মন্দির, মণিকর্ণিকা ঘাট, আকবরের তৈরি সেই বিখ্যাত মানমন্দির, বানরবহুল দুর্গাকুণ্ড—সব দেখে যখন আবার আমরা নৌকোয় উঠতে যাবো, তখন আবার দেখি সেই বাঙালিটি আমাদের পিছু-পিছু আসছে। সেও কি নৌকোয় ক'রে ওপারে যাবে নাকি ? কোথায় আমাদের শিবির, তা-ই কি সে দেখতে চায়। ব্যাপারটা তো বড্ড গোলমেলে ঠেকছে।

ফিশফিশ ক'রে বললুম, 'ব্যাঙ্কস, ও-লোকটা নিশ্চয়ই একটা টিকটিকি। সারা রাস্তা লোকটা শুধু আমাদের পিছু-পিছু এসেছে।'

ব্যাঙ্কস বললে, 'আমিও তাকে লক্ষ করেছি ; তুমি কর্নেলের নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা যে তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠেছিলো তা আমার নজর এড়ায়নি।'

'কিন্তু তাকে এড়াবার—'

'না, এ-সম্বন্ধে আমাদের কিছুই করার নেই। বরং আমরা যে তাকে সন্দেহ করেছি তা যেন ও জানতে না-পারে—আর তাছাড়া লোকটা তো এইমাত্র উধাও হ'য়ে গেলো।'

ওই বাঙালিটির ছোট্ট ডিঙিটা ততক্ষণে সত্যি গঙ্গার অত নৌকো ও বজরার আড়ালে মিলিয়ে গিয়েছিলো। ব্যাঙ্কস আমাদের নৌকোর মাঝির দিকে ফিরলে ; উদাসীনতার ভান ক'রে বললে, 'ওই লোকটাকে তুমি চেনো ?'

'না তো, এই তাকে প্রথম দেখতে পেলাম—' আমাদের মাঝি বললে।

রাত নেমে এলো আস্তে-আস্তে। নানা রঙের লণ্ঠন-জ্বলা নৌকোর সারি ; মাঝিদের গলায় গান ; বাম তীরে ঝলমল ক'রে উঠলো হাউই, আতশবাজি ও রংমশাল : সব মিলিয়ে যেন স্বপ্নের মতো মনে হ'লো বারাণসীর গঙ্গাকে। এই আশ্চর্য রঙের ঝরনা ক্ষণিকের জন্যে আলো ক'রে তোলে কালো আকাশ, তারপর আবার অন্ধকার ছড়িয়ে যায় সবখানে।

শিবিরে ফিরে এসে দেখি কর্নেল মানরো আর সার্জেন্ট ম্যাক-নীল ততক্ষণে ফিরে এসেছেন। ব্যাঙ্কস ম্যাক-নীলকে জিগেস করলে তাদের অনুপস্থিতির সময় বিশেষ-কিছু হয়েছে কিনা।

'না তো,' উত্তর দিলে ম্যাক-নীল।

'কোনো সন্দেহ-জাগানো লোককে আশপাশে ঘুর-ঘুর করতে দ্যাখোনি এখানে?'

'না। কেন, আপনি কি কোনো-কিছু আশঙ্কা করছেন নাকি—'

'বারাণসীতে একটা লোক আমাদের পিছন নিয়েছিলো—,' বললে ব্যাঙ্কস, 'লোকটাকে দেখে আমার মোটেই ভালো লাগেনি।'

'টিকটিকি ? কোথাকার লোক সে ?'

'লোকটা বাঙালি। কর্নেল মানরোর নাম শুনেই লোকটা আমাদের পাছু নেয়'—

'আমাদের সঙ্গে তার আবার কী দরকার ? কী চায় সে ?'

'জানি না, ম্যাক-নীল । তবে আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে । কড়া নজর রাখতে হবে আশপাশে ।'

'হুঁ !' ম্যাক-নীল বললে, 'তাহ'লে তা-ই করবো ।'

৭

এলাহাবাদ

বারাণসী থেকে এলাহাবাদের দূরত্ব বড়োজোর আশি মাইল । চব্বিশে সকালেই আমরা এলাহাবাদের উদ্দেশে রওনা হ'য়ে পড়লুম, ঘণ্টায় তিন-চার মাইল মাত্র বেগে, অর্থাৎ *বেহেমথ* যথার্থই গজেন্দ্রগমনে চলছিলো তখন । আসলে কলকাতায় আমাদের দিন যেমন কাটতো, এই *চলন্ত বাড়িতেও* তেমনিই কাটছে : ছোটোহাজরি, মধ্যাহ্নভোজ, দিবাতন্দ্রা, সান্ধ্যভোজ—সবই একইভাবে হচ্ছিলো নিত্য, কেবল দিগন্ত বদলে যাচ্ছিলো তার মধ্যে ; দৈনন্দিন কাজ ছিলো রোজই একরকম, শুধু পারিপার্শ্বিক কেবলই বদলে-বদলে যাচ্ছে ।

কাশিম-সুলেমানের সমাধিস্তম্ভ, চুনার দুর্গ, মির্জাপুর সব পেরিয়ে আমরা যখন যমুনা ও গঙ্গার সংগমস্থলে এসে পৌঁছুলুম তখন ২৫ শে মে সন্ধে সাতটা । নদী পেরুতে অবশ্য খুব অসুবিধে হ'লো, সারি-সারি নৌকো দিয়ে ভাসা সেতু চ'লে গেছে এপার-ওপার, টিকিয়ে-টিকিয়ে তারই উপর দিয়ে চ'লে এলো *বেহেমথ* : এলাহাবাদে আর না-ঢুকে আমরা শহরতলিতেই সে-রাতটা কাটিয়ে দেবো স্থির করলুম ।

পরের দিন আমরা সবাই বেরুলুম শহর দেখতে । ঠিক ছিলো এলাহাবাদ থেকেই আমরা উত্তরমুখো এগুবো নাকবরাবর । কানপুর-লক্ষ্ণৌ যাতে পথে না-পড়ে, মানরো যাতে কিছুতেই অস্বস্তিতে না-পড়েন, সেদিকে আমরা লক্ষ রাখবার চেষ্টা করছিলুম ।

বিখ্যাত খশরুবাগ আর আকবরের প্রকাণ্ড কেল্লাটা ছাড়া এলাহাবাদে সেই অর্থে বিশেষ-কিছু দেখার ছিলো না, যদিও তার ভূদৃশ্য ছিলো অতীব সুন্দর । বেড়াতে বেরিয়ে আমি আর ব্যাঙ্কস এবার প্রথম থেকেই সাবধানে লক্ষ করছিলুম কেউ আমাদের অনুসরণ করছে কিনা । কিন্তু না, এখানে সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়লো না ।

আমরা আলাদা-আলাদা দলে বেরিয়েছিলুম । আগের মতোই আমি আর ব্যাঙ্কস গিয়েছিলুম শহর দর্শনে, মানরো আর ম্যাক-নীল আশপাশে ঘুরে বেড়াতে, আর হুড গিয়েছিলো ক্যান্টনমেণ্টে তার পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে । ফিরে এসে দেখি

মানরো আগেই ফিরে এসে আমাদের অপেক্ষা করছেন। তাঁর চোখের তারা অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, যেন কোনো বিষম প্রতিজ্ঞায় জ্ব'লে উঠেছে। হঠাৎ কী-যে হ'লো আমরা কিছুই বুঝতে পারলুম না। ম্যাক-নীল তখনও ফেরেনি ; মানরো তাকে নাকি কোথায় জরুরি কাজে পাঠিয়েছেন। কাজেই কিছু যে জিগেস ক'রে জানবো, তারও উপায় ছিলো না।

খাবার টেবিলে মানরো সাধারণত দু-চারটে কথা বলতেন। কিন্তু আজ তিনি রইলেন অস্বাভাবিক গম্ভীর। বোঝা গেলো তিনি ম্যাক-নীলের প্রতীক্ষা করছেন। ব্যাপার কিছু বুঝতে না-পেরে হুড জিজ্ঞাসু চোখে আমাদের দিকে তাকালে ; কিন্তু আমরা কীই বা জানি যে বলবো।

অস্বাভাবিক স্তব্ধতার মধ্যে আমাদের সান্ধ্যভোজ শেষ হ'লো ; তারপর হঠাৎ মানরো ব'লে উঠলেন, 'ব্যাঙ্কস, হুড—আর আপনিও মঁসিয় মোক্লের—দয়া ক'রে আমার সঙ্গে একটু ক্যানটনমেন্ট অব্দি যাবেন ?'

তক্ষুনি আমরা তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। খানিক দূর যাবার পর হঠাৎ মানরো রাস্তার পাশে একটা থামের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। থামটার গায়ে একটা সরকারি ফতোয়া আঁটা।

'এটা প'ড়ে দ্যাখো'—মানরো বললেন।

ফতোয়াটা আসলে দু-মাস আগের সেই বিজ্ঞপ্তি, যাতে বম্বাই প্রেসিডেন্সির রাজ্যপাল নানাসাহেবের মাথার মূল্য নির্ধারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে জানিয়েছিলেন নানাসাহেব নাকি বম্বাইতে হাজির হয়েছেন। বিজ্ঞপ্তিটা দেখে ব্যাঙ্কস আর হুড তাদের হতাশা চাপতে পারলে না। এই দু-মাস তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে খবরটা চেপে রাখার, কিন্তু কে জানতো যে হঠাৎ তা এমনিভাবে খোদ মানরোরই চোখে প'ড়ে যাবে।

'ব্যাঙ্কস,' সার এডওয়ার্ড বললেন, 'তুমি এই বিজ্ঞপ্তিটার কথা জানতে ?'

ব্যাঙ্কস কোনো কথা বললে না।

'দু-মাস আগেই তুমি জানতে পেরেছিলে যে নানাসাহেব বম্বাই প্রেসিডেন্সিতে এসে হাজির হয়েছে, অথচ আমাকে সে-কথা একবারও বলোনি !'

ব্যাঙ্কস ভেবে পেলে না এ-কথার উত্তরে কী বলা যায়।

হুড বললে, 'জানতুম কর্নেল, যে এমন একটা বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে। কিন্তু আপনাকে সে-কথা বললে কী হ'তো ? নানাসাহেব যে সত্যি-সত্যি বম্বাই এসেছে, তা আপনি জানতেন কী ক'রে ? মাঝখান থেকে আপনার মনে কষ্ট দিয়ে কী লাভ হ'তো ?'

'ব্যাঙ্কস,' মানরোর মুখ যেন মুহূর্তে মন্ত্রবলে পরিবর্তিত হ'য়ে গেছে, 'নানাসাহেবের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াবার অধিকার যে কেবল আমারই আছে, এ-কথা কি তুমি ভুলে গেছো ? আমি যে কলকাতা ছেড়ে তোমাদের সঙ্গে বেরিয়েছি তা তো কেবল এইজন্যই যে নেপালের কাছাকাছি যেতে পারবো। নানাসাহেব মারা গেছে, এ-কথায় আমার মোটেই কোনোদিন বিশ্বাস হয়নি। তার মৃত্যুর খবরটা সত্যি না মিথ্যে, তা আমি নিজে যাচাই ক'রে দেখতে চেয়েছিলুম !'

ব্যাঙ্কস এতক্ষণে মুখ খুললে । 'আপনাকে কেন ও-কথা বলিনি, জানেন সার এডওয়ার্ড ? নানাসাহেব যে বম্বাই এসেছে এ-কথা আমি আদৌ বিশ্বাস করিনি ।'

কর্নেল মানরো এ-কথা শুনে একটু চুপ ক'রে রইলেন । তারপর বললেন, 'আমি ম্যাক-নীলকে এলাহাবাদের গবর্নরের কাছে পাঠিয়েছি এ-সম্বন্ধে সব তথ্য জোগাড় ক'রে আনার জন্যে । নানাসাহেব সত্যি বম্বাই এসেছে কি না, তা আমরা এক্ষুনি জানতে পাবো ।'

'ধরুন যদি জানা গেলো যে সত্যি সে বম্বাই এসে হাজির হয়েছে, তখন ? তখন আপনি কী করবেন ?' ব্যাঙ্কস উৎকণ্ঠায় ভ'রে গিয়ে জিগেস করলে ।

'তাহ'লে এক্ষুনি আমি বম্বাই চ'লে যাবো ।'

'এই আপনার স্থির সিদ্ধান্ত ? কিছুতেই নড়চড় হবে না ?'

'কিছুতেই না । তোমরা বরং আমাকে ছাড়াই *বেহেমথকে* নিয়ে এগোও— আমি আজ রাতেই বম্বাইয়ের ট্রেন ধরবো ।'

'কিন্তু একা নয়, কর্নেল । আমরাও আপনার সঙ্গে থাকবো ।' ব্যাঙ্কস ব'লে উঠলো ।

'নিশ্চয়ই—আমরা আপনাকে একা যেতে দেবো না, কর্নেল,' হুড জানালে ।

'কর্নেল মানরো,' আমি বললুম, 'আপনি আমাকেও বন্ধু হিশেবে সঙ্গে নেবেন তো ?'

'নিশ্চয়ই, মঁসিয় মোক্লের । আজ রাতেই আমরা সবাই মিলে এলাহাবাদ ছাড়বো—', ব্যাঙ্কস আমাকে জানালে ।

'তার আর দরকার হবে না,' পিছনে কার গম্ভীর গলা শোনা গেলো ।

সবাই এক সঙ্গে পিছন ফিরে তাকালুম । দেখি সার্জেন্ট ম্যাক-নীল হাতে একটা খবর-কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । 'এই-যে, এটা প'ড়ে দেখুন,' মানরোর দিকে কাগজটা বাড়িয়ে ধরলো সে, 'আপনাকে এটা দেখাতে বললেন গবর্নর ।'

সার এডওয়ার্ড প'ড়ে শোনালেন : *'বম্বাই প্রেসিডেন্সির রাজ্যপাল এতদ্দ্বারা ৬ই মার্চের বিজ্ঞপ্তিটি খারিজ করিয়া জানাইতেছেন যে গতকল্য সাতপুরা পর্বতে ইংরেজ বাহিনীর সহিত একটি ক্ষুদ্র কিন্তু প্রচণ্ড সংঘর্ষে ধুন্ধুপন্থ ওরফে নানাসাহেব নিহত হইয়াছেন । লক্ষ্ণৌ এবং কানপুরের বাসিন্দারা মৃতদেহটি শনাক্ত করিয়াছে । মৃতদেহের বাম হাতের একটি অঙ্গুলি ছিন্ন : নকল অন্ত্যেষ্টির সময় উহা কর্তিত হইয়াছিল । এ-বিষয়ে এখন আর কোনো সন্দেহ নাই যে নানাসাহেবের নিকট হইতে ইংরেজদের আর-কোনো ভয় নাই ।'*

পড়তে-পড়তে মানরোর গলা কেমন যেন ফাঁকা হ'য়ে গেলো । কাগজটা তাঁর হাত থেকে খ'সে প'ড়ে গেলো । আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলুম । নানাসাহেবের মৃত্যু সম্বন্ধে আর-কোনো সংশয়ই নেই ।

মানরো একটু চুপ ক'রে থেকে শেষটায় গম্ভীরভাবে ব্যাঙ্কসকে বললেন, '[illegible] উত্তরে যাবার আগে একবার কানপুর হ'য়ে যাওয়া যায় না ?'

'আপনি কানপুর যেতে চান ?'

'হ্যাঁ, শেষবারের মতো কানপুর হ'য়ে যেতে চাই আমি, তারপর উত্তরদিকে যাবো আমরা—উত্তরদিকে !'

৮

কানপুর পেরিয়ে

একদা অযোধ্যা ছিলো ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রদেশগুলির অন্যতম ; এখন তার গুরুত্ব কিঞ্চিৎ কমেছে বটে, কিন্তু সমৃদ্ধি রয়েছে আগের মতোই । জেনারেল উট্রামের চক্রান্তের ফলে নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্ শেষ পর্যন্ত যখন ১৮৫৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির আনুগত্য স্বীকার ক'রে নিলেন, তখন থেকেই বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিলো । তাই কয়েকমাস পরেই লক্ষ্ণৌ আর কানপুর প্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়েছিলো । লক্ষ্ণৌ অযোধ্যার রাজধানী, কিন্তু কানপুর এই প্রাচীন রাজ্যের একটি প্রধান নগর ।

বিপুল নীলখেত পেরিয়ে গঙ্গার ডান তীর ধ'রে আমরা কানপুর পৌঁছুলুম ২৯শে মে সকালবেলায় । কানপুরের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ষাট হাজার, আয়তন মাইল পাঁচেক । শহরে একটি সামরিক ক্যানটনমেন্ট আছে—প্রায় সাত হাজার লোক থাকে সেখানে । কানপুর অত্যন্ত পুরোনো শহর হ'লে কী হবে, সেই অর্থে কোনো দ্রষ্টব্য স্থান এখানে নেই । তবু তিরিশে মে সকালবেলায় আমরা আমাদের শিবির ছেড়ে শহরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম : ব্যাঙ্কস, ক্যাপ্টেন হুড আর আমি, আর তদুপরি সঙ্গে রয়েছেন সার এডওয়ার্ড মানরো ও সার্জেন্ট ম্যাক-নীল ।

আর যেতে-যেতেই ব্যাঙ্কস আমাকে কানপুরের বিক্ষোভের কথা শোনালে । কেমন ক'রে মিরাট আর দিল্লির বিদ্রোহের কথা পৌঁছুতেই কানপুর বারুদের মতো ফেটে পড়লো, কেমন ক'রে কানপুরের দীর্ঘ অসন্তোষ ও রোষ বিদেশীদের বিন্দুমাত্র ক্ষমা করেনি, কেমন ক'রে বিবিঘরে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিলো নারী ও শিশুদের—যাদের মধ্যে একজন ছিলেন লেডি মানরো ও তাঁর মা, আর কেমন ক'রেই বা জেনারেল হ্যাভলকের বাহিনীর আগমন-সংবাদ পেয়ে বিবিঘরের বন্দীদের উপর নতুন ক'রে নিগ্রহ ও অত্যাচার শুরু হয় ! রক্ত-রাঙা সে-সব দিন ; শুনতে-শুনতে যেন অনুভব করলুম নিয়তির কোনো রক্তরাঙা সংকেত বিপদ জ্ঞাপন ক'রে ভেসে উঠলো আমার সামনে । ব্যাঙ্কস আরো বলেছিলো যে কর্নেল মানরো যখন দু-দিন পরে কানপুর পৌঁছুলেন তখন কোনোই চিহ্ন দেখলেন না তাঁর স্ত্রী ও শাশুড়ির । আর তারপর থেকেই মানুষটা যেন কেমন হ'য়ে

গেলেন, নানাসাহেবের উপর প্রতিশোধ নেয়া ছাড়া আর-কোনো কাজই যেন তাঁর করার রইলো না ।

এই কানপুরে পৌঁছেই মানরো প্রথমে গেলেন তাঁদের বাংলোবাড়ির দিকে, যে-বাড়িতে লেডি মানরো তাঁর শৈশব ও কৈশোর কাটিয়েছেন একদা, সে-বাড়িতেই বিক্ষোভের সময় সেই প্রবল ভীষণ রণরোলের মধ্যে অস্বস্তিতে ও আশঙ্কায় তিনি দিন কাটিয়েছিলেন । শহরতলির ধারেই এই বাড়িটা, ক্যানটনমেণ্টের খুব কাছে। কিন্তু এখন ভাঙাচোরা ইটকাঠ ছাড়া আর-কিছুই নেই সেখানে ; সমস্তই জীর্ণ, পরিত্যক্ত ও বিমর্ষ —যেন একটা হানাবাড়ি ; আগাছা গজিয়েছে চারপাশে, দেখাশোনা না-করার ফলে সমস্তটাই যেন কোনো চিরস্থায়ী দুঃখের প্রতিভাস এনে দেয় । আর এই ভগ্নস্তূপের মধ্যেই মানরো নীরবে ঘুরে-ঘুরে বেড়ালেন ঘণ্টাখানেক, যেন হারানো দিনগুলো আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছেন তিনি বারে-বারে, কিন্তু তাঁর হাত এড়িয়ে সেগুলো যেন বারে-বারেই পালিয়ে যাচ্ছে । শেষটায় যেন এক হ্যাঁচকা টানে নিজেকে তিনি ছিনিয়ে আনলেন সেই স্মৃতিজাগা ভাঙাচোরার মধ্য থেকে, দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন বিবিঘরের দিকে—যেখানে, শোনা যায়, লেডি মানরোকে নাকি শেষ দেখা গিয়েছিলো । আর সেইখানে শোকে ও বেদনায় মোহ্যমান ও আর্ত মানুষটির মুখে যেন সান্ত্বনাহীন কোনো আকুলতা ফুটে উঠলো । শেষটায় আমরা অনেক চেষ্টার পরে সার এডওয়ার্ডকে ওই ভয়ংকর জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে এলুম । কিন্তু তার আগে একবার একটা বড়ো পাথরের গায়ে আমার চোখ পড়লো, কে যেন সঙিনের খোঁচায় সেই পাথরের গায়ে ছোট্ট কিন্তু অগ্নিগর্ভ একটি কথা খোদাই ক'রে গেছে ; সারা রাস্তা এই কথাগুলো আমার মনে হানা দিলে : '*কানপুর মনে রেখো ।*'

শিবিরে যখন ফিরে এলুম, তখন এগারোটা বাজে । সবাই কী-রকম স্তব্ধ হ'য়ে আছে, যেন একটা চাপা শোকের ছায়া সকলেরই মুখে । তাড়াতাড়ি এখন কানপুর ছাড়তে পারলে যেন বেঁচে যায় সবাই । কিন্তু *বেহেমথের* এঞ্জিনের দু-একটা ছোটোখাটো মেরামতির কাজ বাকি ছিলো, সেগুলো সারতে-সারতে একদিন লেগে যাবে । ফলে বাকি দিনটুকু আমার আর-কিছুই করণীয় ছিলো না, সেইজন্যেই আমি ঠিক করলুম একাই গিয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে ঘুরে আসবো । কারণ ব্যাঙ্কস ঠিক করেছিলো কিছুতেই আর লক্ষ্ণৌ হ'য়ে যাবে না—সেখানে গেলে সার এডওয়ার্ড মানরো হয়তো আরো-বিমর্ষ হ'য়ে পড়বেন বিদ্রোহের যাবতীয় স্মৃতি দেখে।

দুপুরবেলায় একটি লোক্যাল ট্রেন ধ'রে আমি অযোধ্যার এই রাজধানীর উদ্দেশে রওনা হ'য়ে পড়লুম । সপ্তদশ শতকের সব স্থাপত্য, হিন্দু, চৈনিক, আরব্য ও ইওরোপীয় স্থাপত্যের মিশোলই লক্ষ করা যায় প্রধানত । কাইজারবাগ, ফরিদাবাগ, সেকেন্দ্রাবাদ, হজরত গাউজের বুলভার, কৈফিয়াতুল্লার কেল্লা—এইসব বিখ্যাত জায়গাগুলো সরেজমিন দেখে আমি কানপুর ফিরে এলুম ।

পরদিন ৩১শে মে আবার আমাদের যাত্রা শুরু হ'লো ।

'অবশেষে,' বললে ক্যাপ্টেন হুড, 'সত্যিকার যাত্রা শুরু হ'লো আমাদের — এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ তো নিছকই কেবল ফাঁকা আওয়াজ—আসল মজা তো জঙ্গলে, সেখানে বাঘ-সিংহ-হাতি-গণ্ডার-গণ্ডায় গণ্ডায় ঘুরে বেড়াচ্ছে...'

'ওর কথায় কান দিয়ো না, মোক্রের,' ব্যাঙ্কস বললে, 'উত্তর-পশ্চিমে আরো কতগুলো খুব নামজাদা শহর আছে—দিল্লি, আগ্রা, লাহোর....'

'ও-সব ছোটো-ছোটো খুপরিগুলো আবার নামজাদা হ'লো কবে থেকে ?' হুড ব'লে উঠলো, 'আসল জায়গা তো নেপালের জঙ্গল, ভয়ংকর তরাই—এ-সব । অন্তত আমার মতে তো আজকেই আমাদের সত্যিকার যাত্রা শুরু হ'লো ।' ব'লে, সে চেঁচিয়ে হাঁক পাড়লে, 'ফক্স !'

'এই-যে, ক্যাপ্টেন !' ফক্স এসে হাজির হ'লো ।

'ফক্স ! সব বন্দুক, রাইফেল, রিভলভারগুলো সাফসুফ ক'রে রেখে দাও, যাতে ঘোড়া টিপলেই গুলি বেরোয় !'

'তৈরিই তো আছে সব—টোটাভরা, গুলিভরা, তেল-দেয়া...'

'সব তৈরি ?'

'সব ।'

'সব *আরো-তৈরি* ক'রে রাখো তাহ'লে ।'

'তা-ই করবো তাহ'লে !'

'ভেবো না, ফক্স ! শিগগিরই তোমার ওই অসমাপ্ত উজ্জ্বল তালিকায় আটতিরিশ নম্বরটি যোগ হ'য়ে যাবে !'

'আটতিরিশ নম্বর !' হঠাৎ ফক্সের চোখের তারা আলো হ'য়ে উঠলো । 'তার জন্যে আমি যে-ছোট্ট গোলাটা তুলে রেখেছি, সে-সম্বন্ধে তার নালিশ করার কিছুই থাকবে না ।'

'যাক । সব ঠিকঠাক ক'রে রাখো !'

ফক্স একেবারে গোড়ালি ঠুকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন ক'রে চ'লে গেলো আবার তার বন্দুকের ঘরে !

অযোধ্যা আর রোহিলখণ্ডের পশ্চিম দিয়েই নেপালের উদ্দেশে যাচ্ছিলুম আমরা ; পথে নদীনালা বর্জন করার জন্যে একটু ঘুরতে হবে বটে, কিন্তু তাতে *বেহেমথের* জ্বালানি জোগাড় করার অনেক সুবিধে হবে—কারণ এদিকটায় বন-জঙ্গল নেহাৎ কম নেই ।

এখানে বলা ভালো যে কানপুর ছাড়ার পর থেকেই কর্নেল মানরো আবার অত্যন্ত স্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছেন ; আগের মতোই কথা বলেন খাবার টেবিলে, আমাদের আড্ডা ও তর্কাতর্কিতে যোগ দেন—অথচ এটাও ঠিক যে ভিতরে-ভিতরে নেপালের অরণ্যদেশ তাঁকে যেন চুম্বকের মতো টানছিলো । মাঝে-মাঝে আমার বিষম সন্দেহ হ'তো নানাসাহেবের নিধনসংবাদ তিনি মোটেই বুঝি বিশ্বাস করেননি ; অবশ্য এ-সম্বন্ধে তিনি কিছু মুখ ফুটে বলতেন না ব'লে আমরাও কোনো উচ্চবাচ্য করতুম না ।

জুন মাসের তিন তারিখে আচমকা ভীষণ গরম পড়লো ; এমন অসহ্য গরম এর আগে কিন্তু কখনোই পড়েনি । রাস্তার দু-ধারে যদি মস্ত-সব গাছপালা মাঝে-মাঝে ছায়া না-ছড়িয়ে দিতো, তাহ'লে সেই হাওয়াহীন লু-বওয়া গরমে আমরা বোধহয় জ্যান্তই ঝলসে যেতুম । হয়তো এত গরম ব'লেই জন্তুজানোয়াররা এমনকী রাত্তিরেও তাদের ডেরা ছেড়ে বেরোয় না—অন্তত কোনো শিকার না-পেয়ে হুড গজগজ ক'রে যা বললে, তার সারমর্ম প্রধানত ছিলো তা-ই ।

পরদিন সকালবেলায় পশ্চিম দিগন্ত কেমন যেন অস্বচ্ছ ও ঝাপসা দেখালো, আর তারপরেই আমরা সেই আশ্চর্য দৃশ্য দেখলুম, লোকে যাকে মরীচিকা বলে—আকাশের গায়ে যেন ফুটে উঠলো কোনো মিনার-গম্বুজওলা আশ্চর্য প্রাসাদের সারি, যা আসলে নিছকই দৃষ্টিরই বিভ্রম ছাড়া আর-কিছু নয় । এখানকার মরীচিকায় খেজুরকুঞ্জের ছায়াঘেরা টলটলে দিঘিজল দেখা যায় না, বরং দেখা যায় এইসব আকাশপ্রাসাদ, আর নীল-নীল মেঘের চুড়ো । আর সঙ্গে-সঙ্গে পাঁচ-ছশো বছর আগেকার মধ্যযুগের কথা মনে প'ড়ে গেলো আমার । এই বিভ্রমকে এমনই সত্যি *ঠেকে*, এইসব মস্ত কেল্লাকে এমনই চেনা *ঠেকে* যে মনে হয় আমরা বুঝি মধ্যযুগের-ইওরোপের কোনো বীরপুরুষের দুর্গপ্রাকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি । আর *বেহেমথ* যত সেদিকে এগিয়ে গেলো, ততই সেই আকাশে-জেগে-ওঠা প্রাসাদনগরী ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেলো ; পূর্ব দিগন্ত থেকে উঠলো সবিতা, আর সাত ঘোড়ার রথ যত ছুটে আসতে লাগলো তত তার পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে গেলো সেই প্রতিসরিত মায়ানগর ।

'এর মানে কী, বুঝতে পারছো তো, মোক্রের ?' ব্যাঙ্কস বললে, 'ঋতু পরিবর্তনের পূর্বাভাস । আবহাওয়া বদল হবে এবার । শিগ্‌গিরই বর্ষা শুরু হবে । আমার মনে হয় দু-এক দিনের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মেঘ দেখতে পাবো আমরা ।'

ব্যাঙ্কস ভুল বলেনি । সন্ধেবেলাতেই পশ্চিম দিগন্ত মেঘে ও বাষ্পে অস্পষ্ট ও আবছা হ'য়ে গেলো ; বিদ্যুৎ-ভরা এই কালো-মেঘ দেখতে-দেখতে এগিয়ে আসে মৌশুমিতাড়িত হাওয়ার সঙ্গে, আর তুলকালাম প্রচণ্ড ঝড় চারপাশে হুলুস্থুল বাধিয়ে দেয় ।

সারাদিন ধ'রে এই বাষ্পমেঘময় আবহাওয়ারই বিষম প্রস্তুতি চলেছিলো ; ঘুরে-ঘুরে হলুদ বালির স্তম্ভ উঠে যাচ্ছিলো আকাশে, আর আলো প'ড়ে সেই ঘূর্ণ্যমান বালুস্তম্ভ ঝলসে উঠছিলো বারে-বারে, মনে হচ্ছিলো আমরা যেন কোনো নিরীহ ও নির্দোষ অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়ে চলেছি, যা পোড়ায় না কিছুই, শুধু যেন চারপাশ আলো ক'রে দেয় ।

সন্ধে সাতটা নাগাদ একটি ঝুরিনামা ছায়াঢাকা অশ্বত্থকুঞ্জের কাছে এসে *বেহেমথ* থামলো । এইখানেই ছায়ায় রাত কাটানো হবে ব'লে ঠিক করা হ'লো । পরদিনও যদি এ-রকম বিষম গরম পড়ে, তাহ'লে আস্ত দিনটাই কাটানো হবে এখানে, পরে রাতের বেলায় অপেক্ষাকৃত কম গরমের মধ্যে আবার রওনা হওয়া যাবে ।

ক্যাপ্টেন হুডের মৎলব কিন্তু ছিলো অন্যরকম । 'ফক্স ! গৌমি ! এখন তো মাত্র

সাতটা বাজে—অন্ধকার ঘন হবার আগেই—এসো, জঙ্গল থেকে একটু ঘুরে আসি । আপনিও আসবেন না কি, মঁসিয় মোক্লের ?'

আমি কোনো উত্তর দেবার আগেই ব্যাঙ্কস ব'লে উঠলো, 'হুড, তুমি বরং আজ আর শিকারের খোঁজে না-ই বা বেরুলে । লক্ষণ মোটেই ভালো ঠেকছে না আমার । ঝড় এসে গেলে শেষকালে কিন্তু ফিরে আসতে বিস্তর বেগ পাবে । বরং কাল যদি আমরা এখানে থাকি, তখন না-হয় বেরিয়ো—'

বাধা দিয়ে হুড বললে, 'কিন্তু কাল তো দিনের আলো থাকবে । রাতের অন্ধকার ছাড়া কি আর শিকার কখনও জমে নাকি ?'

'তা আমি জানি, হুড । কিন্তু আজকের রাতটা কেন যেন মোটেই সুবিধের ঠেকছে না আমার । তবু যদি যেতে চাও তাহ'লে বেশি দূরে যেয়ো না । ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বনের মধ্যে ঘুটঘুট্টে অন্ধকার হ'য়ে যাবে তখন হয়তো ফেরবার পথ গুলিয়ে ফেলবে ।'

'না, না, তোমার অযথা ভয়ের কিছু নেই । এখন তো মাত্র সাতটা বাজে—আমি দশটার মধ্যেই ফিরে আসবো, কথা দিচ্ছি ।'

ফক্স আর গৌমিকে নিয়ে তক্ষুনি ক্যাপ্টেন হুড বেরিয়ে পড়লো ; আর অমনি পরক্ষণেই গাছের আড়ালে তাদের আর দেখা গেলো না । সারা দিনের গরমে আর ধকলে আমি এতই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলুম যে আমি আর তাদের সঙ্গে গেলুম না ।

বেহেমথের এঞ্জিনের আগুন কিন্তু নিবিয়ে ফেলা হ'লো না ; কোনো জরুরি অবস্থা দেখা দিলে যাতে চটপট রওনা হ'য়ে পড়া যায়, সেইজন্যে ব্যাঙ্কস এঞ্জিনকে সম্পূর্ণ নিবিয়ে ফেলতে নিষেধ করেছিলো ।

বেশ সুন্দর সন্ধেটা । আমরা একটা ছোট্ট ঝরনার ধারে গিয়ে ব'সে বিশ্রাম করতে লাগলুম । পশ্চিমের জ্বলন্ত সূর্য ছায়া ফেলেছে ঝরনার জলে ; আর অদ্ভুত এক গাঢ়-নীল রঙে ছুপিয়ে দিয়েছে আকাশ ; ঘন বাষ্পমেঘে-ঢাকা একটা পুরু পর্দা যেন ঝুলে আছে পৃথিবীর উপর ; হাওয়া নেই, তবু ওই মেঘগুলো ক্রমেই ধীরে এগিয়ে আসছে অলক্ষিতে—যেন কোনো আপন চলার ছন্দেই গভীর গম্ভীর বেগে তারা ধাবমান ।

আটটা পর্যন্ত ঝরনার ধারে শুয়ে-ব'সে আড্ডা দিলুম আমরা, কেবল ব্যাঙ্কস মাঝে-মাঝে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হ'য়ে যাচ্ছিলো । শেষকালে যখন অশ্বত্থ গাছের তলায় অন্ধকার জমাট বেঁধে নিরেটকালো হ'য়ে গেলো, তখন আমরা উঠে পড়লুম । সেই ঝুলন্ত ঘন মেঘ তখন একেবারে কাছে এসে পড়েছে । আকাশ এত গম্ভীর শান্ত যে কেমন থমথমে ঠেকছে । একটাও পাতা কাঁপছে না –সব স্থির, অনড় ও নিষ্কম্প । কেমন যেন একটা ভয়-ধরানো ভাব আছে চারপাশে—এই গুম-হ'য়ে থাকাটা যেন কোনো অচিকিৎস্য ব্যাধির লক্ষণ ; যেন ছিলা টান ক'রে ব'সে আছে সমস্ত আবহাওয়া—হঠাৎ টংকার দিয়ে উঠবে ।

আর, সত্যিই, টংকার আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী । ফুলে ফেঁপে উঠছে মেঘমালা, যেন

কোনো উদ্যত অতিকায় জন্তু পেশী টান ক'রে নেবার আগে আড়মোড়া ভেঙে নিচ্ছে। ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘগুলো একটা-আরেকটার দিকে চুম্বকের টানে এগিয়ে যাচ্ছে—তারপর একসময় একটানা নিকষ কালো মেঘ ছাড়া মাথার উপর আর-কিছু রইলো না।

সাড়ে-আটটার সময় সেই কালো পর্দা চিরে ফেঁড়ে টুকরো-টুকরো ক'রে বিদ্যুতের শিখা লকলক ক'রে উঠলো; গুনে-গুনে ঠিক পঁয়ষট্টি সেকেণ্ড পরে বাজ ফেটে পড়লো ভয়ংকর, আর তার গম্ভীর গুমগুমে আওয়াজ যেন আমাদের লক্ষ্য ক'রে ভীষণ বেগে গড়িয়ে এলো।

'ষোলো মাইল দূরে'—ঘড়ি থেকে চোখ তুলে বললে ব্যাঙ্কস, 'ঝড় শুরু হ'লো। কিন্তু একবার যখন খ্যাপা হাতির মতো শিকল খুলে বেরিয়েছে তখন দেখতে-না-দেখতে এখানে এসে পড়বে। আর দেরি নয়, এক্ষুনি ভিতরে চলো সবাই।'

'কিন্তু ক্যাপ্টেন হুড? তাঁর কী হবে?' সার্জেন্ট ম্যাক-নীল জিগ্যেস করলে।

'বজ্রই তো তাকে ডাক দিয়েছে,' বললে ব্যাঙ্কস। 'বুদ্ধিমানের মতোই সে বাজের হুকুম তামিল করবে ব'লেই আশা করি।'

আমরা *বেহেমথের* বারান্দায় এসে বসলুম।

৯

অগ্নিকুণ্ডলী

হিন্দুস্থানও ব্রাজিলের মতো এই গর্ব করতে পারে যে তারও ঝড়, বৃষ্টি, কালো মেঘের কোনো তুলনাই হয় না। অন্তত রাগি, বদরাগি একটি ঝড় যে আশু আসন্ন, সে-বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ ছিলো না। তাপমান যন্ত্রও তা-ই বললে। হঠাৎ অন্তত দু-ইঞ্চি নেমে গিয়েছে পারদের স্তম্ভ।

'হুডদের জন্যে ভারি দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার,' মানরো বললেন, 'ঝড় আসছে, রাত্রিও আসন্ন, অন্ধকারও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। শিকারিরা অনেক সময় খেয়াল না-ক'রেই শিকারের পিছু-পিছু অনেক দূরে চ'লে যায়। ওরা ফিরে আসতে পারবে তো?'

'হুড একটা আস্ত পাগল!' বললে ব্যাঙ্কস, 'কোনো যুক্তির কথায় ওকে কর্ণপাত করানো ভগবানেরও অসাধ্যি। যাওয়াটাই ওর অন্যায় হয়েছে।'

বললুম, 'কোনোভাবে ওদের কোনো সংকেত করতে পারি না আমরা?'

'নিশ্চয়ই পারি। এক্ষুনি আমি বৈদ্যুতিক মশাল জ্বেলে দিচ্ছি,' বললে ব্যাঙ্কস।

ম্যাক-নীল জিগেস করলে, 'আমি ক্যাপ্টেন হুডের খোঁজে বেরুবো?'

'না-না,' মানরো বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন, 'অন্ধকারে এই বনজঙ্গলে ওদের তো খুঁজে পাবেই না, মাঝখান থেকে নিজেই আবার হারিয়ে যাবে!'

ব্যাঙ্কস বোতাম টিপতেই *বেহেমথের* মস্ত চোখ দুটো মশালের মতো আলো হ'য়ে

উঠলো, আর সেই আলো প'ড়ে অশ্বত্থ বনের সামনেটা থেকে অন্ধকার যেন লাফিয়ে ভয় পেয়ে স'রে গেলো। অনেক দূর থেকেই এই আলো হুডের চোখে পড়া উচিত।

হঠাৎ এমন সময় প্রবল পরাক্রান্ত হাওয়া এলো সবেগে, বাঁকিয়ে দিলে গাছের ডগা, নুয়ে পড়লো ডালপালা সমেত ঝাঁকড়ামাথা অশ্বত্থবন, নুয়ে পড়লো আর লাফিয়ে উঠলো স্প্রিঙের মতো, আর সেই স্তম্ভের মতো সারি-সারি অশ্বত্থের মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া বেজে উঠলো যেন কোনো গম্ভীর আকুল অর্গ্যান।

ঝড় এলো এতই আচম্বিতে যে মনে হ'লো যেন ফেটে পড়লো বিস্ফোরণের মতো। ঝ'রে পড়লো রাশি-রাশি হলুদপাতা, মরা ডাল—হাওয়া তাদের তাড়িয়ে নিয়ে এলো আমাদের শকট পর্যন্ত। আমরা তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ ক'রে দিলুম। কিন্তু তখনও বৃষ্টি পড়লো না।

'টাইফুন যে!' ব্যাঙ্কস যেন আরো আতঙ্কিত হ'য়ে উঠলো, 'স্টর! কালু কোথায়?'

'শেষ জ্বালানিটুকু চুল্লিতে ফেলছে এখন কালু।'

'ঝড় থেমে গেলে আমাদের কাঠ কুড়িয়ে নিতে হবে—হাওয়া যেন বিনি মাইনের কাঠুরের মতো সব কেটেকুটে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিচ্ছে—আমাদের অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিলে। যা-ই হোক, তুমি চুল্লিটা সব সময় গনগনে ক'রে রেখো—যাতে চট ক'রে রওনা হ'তে পারি।'

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে অনবরত, আর বারে-বারে গ'র্জে উঠছে বাজ। গরম হাওয়া ব'য়ে যাচ্ছে জোরে, যেন কোনো গনগনে উনুনের ঢাকা খুলে বেরিয়েছে সে। মাঝে-মাঝে বারান্দায় এসে আমরা অশ্বত্থবনের দিকে তাকাচ্ছি—আঁকাবাঁকা ডালপালাগুলো যেন ঝলসে-ওঠা আকাশের গায়ে আঁকা কোনো ভীষণ চিত্রকরের এক অফুরান স্তব্ধ কালো আর্তনাদেরই প্রতিভাস।

হুডের জন্যে আমাদের দুর্ভাবনা ক্রমশ বেড়েই চললো। রাত যখন নটা, শুরু হ'লো মুষলধারে বর্ষণ। আর সেই আকাশভাঙা বাদলের মধ্যে প্রচণ্ড ঘূর্ণিহাওয়া রাশি-রাশি ঝরাপাতা উড়িয়ে নিয়ে চ'লে যাচ্ছে কোনো প্রকাণ্ড খ্যাপার মতো! প্রতি মুহূর্তে ছিঁড়ে যাচ্ছে মেঘ, অবিরাম বিদ্যুতের শাসানি আর গর্জনে। আমরা ভিতরে এসে বারান্দার দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলুম। বাইরের বিদ্যুৎজ্বলা চীৎকৃত আলোর ঠিক উলটো যেন আমাদের বৈঠকখানা, শান্ত স্নিগ্ধ এক অন্ধকার ছেয়ে আছে সারা ঘরে।

হুডদের জন্যে আমাদের উদ্বেগ আর অস্বস্তি ক্রমশই বেড়ে উঠছিলো। এই ঝড়ের মধ্যে গাছতলায় আশ্রয় নিলেও তো তাদের রেহাই নেই। গাছ ভেঙে পড়তে পারে, বাজ ফেটে পড়তে পারে তাদের উপর।

আর এ-কথা আমার মনে জেগে উঠতেই ভীষণ শব্দ ক'রে প্রচণ্ড বজ্রপাত হ'লো—ঠিক যেন আমাদের মাথার উপর এবার; আর পরক্ষণেই একটা পোড়া গন্ধে সারা ঘর ভ'রে গেলো।

'বাজ পড়লো !' ম্যাক-নীল আতঙ্কে ভ'রে গেলো ! 'কাছেই !'

'স্টর ! কালু ! পারাজার !' ব্যাঙ্কস চেঁচিয়ে ডাক দিলে ।

তিনজনে ছুটে এসে ঢুকলো আমাদের ঘরে ; ব্যাঙ্কস অলিন্দে গিয়ে দাঁড়ালো দেখবার জন্যে । 'দ্যাখো ! দ্যাখো !' চেঁচিয়ে উঠলো সে ।

রাস্তার ঠিক বামপাশে, প্রায় দশ হাত দূরে, একটা মস্ত অশ্বত্থ গাছ মাটিতে উলটে প'ড়ে গেছে । তার মস্ত ডালপালাগুলো পড়েছে আশপাশের গাছপালার গায়ে, আর প্রবল হাতে কে যেন ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছে গাছটার, সেই ঝুরি আর ছাল হাওয়ায় এঁকে-বেঁকে যাচ্ছে ভীষণ সাপের মতো । সোজাসুজি পড়েছে বাজটা, আর একেবারে চিরে, টুকরো ক'রে ফেলেছে অত-বড়ো গাছটাকে ।

'বড্ড বেঁচে গেলো আমাদের স্টীম হাউস,' বললে ব্যাঙ্কস, 'এখানেই থাকতে হবে আমাদের, ফাঁকায়—ওই গাছপালার তলায় গিয়ে আশ্রয় নেয়ার চেয়ে এখানেই আমরা অনেক বেশি নিরাপদ !'

ব্যাঙ্কসের কথা শেষ হবার আগেই চীৎকার শোনা গেলো পিছনে । তবে কি হুডরা ফিরে এলো ?

স্টর বললে, 'এ তো পারাজারের গলা !'

সত্যি, বাবুর্চি পারাজারেরই গলা ; পিছনের অলিন্দ থেকে চেঁচিয়ে ডাকছিলো সে আমাদের । তক্ষুনি হন্তদন্ত হ'য়ে আমরা ছুটে গেলুম । গিয়ে কী দেখলুম ! দেখলুম : আমাদের থেকে প্রায় দুশো হাত দূরে ডান দিকে অশ্বত্থ বনে আগুন ধ'রে গিয়েছে । এর মধ্যেই উঁচু ডালপালাগুলো যেন কোনো জ্বলন্ত পর্দার আড়ালে ঢাকা প'ড়ে গেছে । শুধু তা-ই নয়, সেই আগুন উদ্বাহু হ'য়ে নৃত্য করতে-করতে এগিয়ে আসছে আমাদের এই স্টীম হাউসেরই দিকে । সর্বনাশ আসন্ন । এই ক-দিন এই জ্বলন্ত প্রখর তাপ আর শুকনো গরম হাওয়া গাছপালার আর্দ্রতা শুষে নিয়েছে, গাছপালা ঘাসবন আর ঝোপঝাড় এতই শুকনো ও দাহ্য হ'য়ে উঠেছে যে মুহূর্তে এই বিপুল বনও বুঝি আদিম সর্বভুক অগ্নিদেবতার জঠরে চ'লে যাবে । অগ্নিকুণ্ডলীর দ্রুত অগ্রসর দেখে এটা বুঝতে মোটেই অসুবিধে হ'লো না যে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের গোটা শিবির ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে । এই ভীষণ বিপদের সামনে প'ড়ে আমাদের স্তম্ভিত মুখ থেকে কোনো কথাই বার হচ্ছিলো না । শেষকালে মানরো শান্ত গলায় বললেন, 'ব্যাঙ্কস, এই বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করার ভার তোমার উপর ।'

ব্যাঙ্কস বললে, 'উদ্ধার আমাদের পেতেই হবে । এই দাবানল নেভাবার ক্ষমতা যখন আমাদের নেই, তখন এই অগ্নিকুণ্ডের ত্রিসীমানা থেকে চম্পট দিতে হবে আমাদের ।'

'আর ক্যাপ্টেন হুড ? তাঁর কী হবে ?' জিগেস করলে ম্যাক-নীল ।

'এখন তাদের জন্যে কিছুই করার উপায় নেই । এক্ষুনি যদি তারা এখানে এসে না পৌঁছোয়, তাহ'লে তাদের ফেলে রেখেই আমাদের রওনা হ'য়ে পড়তে হবে ।'

'কিন্তু তাদের ফেলে চ'লে-যাওয়া আমাদের উচিত হবে না, ব্যাঙ্কস,' বললেন মানরো।

'ফেলে চ'লে-যাওয়া নয়—প্রথমে *বেহেমথকে* এই আগুনের খপ্পর থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে— পরে তাদের আমরা খুঁজে বার করবো।'

ব্যাঙ্কসের কথা যে যুক্তিযুক্ত, এ-কথা অস্বীকার করতে পারলেন না মানরো। 'তা-ই করো তাহ'লে।'

'স্টর! এক্ষুনি এঞ্জিনে গিয়ে বোসো! কালু—স্টীম চাপিয়ে দাও—'

হাতির শুঁড় দিয়ে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে এলো।

ততক্ষণে দাবানল প্রায় পঞ্চাশ হাত এগিয়ে এসেছে। এত বড়ো-বড়ো গাছগুলোকে যেন মুহূর্তে জঠরে পুরে দিচ্ছে ওই সর্বগ্রাসী আদিম দেবতা। বন্দুকের গুলির মতো শব্দ ক'রে ফুটছে ডালপালা, আগুনের তীরের মতো ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে চারপাশে — আর গাছ থেকে গাছে, লাফিয়ে চ'লে যাচ্ছে আগুন।

ব্যাঙ্কস বললে, 'আর সময় নেই। এক্ষুনি রওনা হ'তে হবে।'

মানরো বললেন, 'ইশ, যদি হুডরা ফিরে আসতো!'

'সিটি বাজাও—বাঁশি বাজাও।' চেঁচিয়ে বললে ব্যাঙ্কস, 'হয়তো বাঁশির শব্দ শুনতে পাবে তারা!'

গ'র্জে-ওঠা বাজ, বৃষ্টির ঝমঝম, শব্দ-ক'রে-ফুটে-ওঠা ডালপালার আওয়াজ ছাপিয়ে বাঁশির তীক্ষ্ণ-প্রবল চীৎকারে হাওয়া বারে-বারে কেঁপে উঠলো। নিশ্চয়ই অনেক দূরে গিয়ে পৌঁছেছিলো সেই বাঁশির শব্দ। কিন্তু হুড, ফক্স বা গৌমির কেনো চিহ্নই নেই কোথাও।

'ব্যাঙ্কস,' মানরো অস্থিরভাবে ব'লে উঠলেন, 'আরো কয়েক মিনিট অপেক্ষা করো, ব্যাঙ্কস!'

অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় ব্যাঙ্কস বললে, 'বেশ, আর তিন মিনিট কেবল অপেক্ষা করবো আমি—যদিও ওই তিন মিনিটে কিন্তু পুরোপুরি আগুনের পাল্লায় চ'লে যাবে *বেহেমথ*!'

দু-মিনিট কেটে গেলো। আগুনের হলকা পৌঁছুলো বারান্দায়; ইস্পাতের খোল গরমে তেতে যেন লাল হ'য়ে উঠেছে। আরো-অপেক্ষা-করা নিছক পাগলামি ছাড়া আর-কিছু নয়।

'স্টর! এঞ্জিন চালিয়ে দাও!'

'আরে!' ম্যাক-নীল চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো।

'ওই তো ওরা!' ব'লে উঠলেন কর্নেল।

রাস্তার ডান দিক থেকে ক্যাপ্টেন হুড আর ফক্সকে দেখা গেলো; গৌমিকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে আসছে তারা।

'মারা গেছে নাকি?'

'না। ঠিক ওর পাশেই বাজ পড়েছিলো—বন্দুকটা হাত থেকে ছিটকে প'ড়ে চুরমার, বাঁ-পা-টা একেবারে অবশ হ'য়ে গেছে!'

'ব্যাঙ্কস, *বেহেমথ* ওই বাঁশি না-বাজালে আমরা বোধহয় কিছুতেই ফিরে আসতে পারতুম না!'

'শিগ্‌গির করো! জলদি!' ব্যাঙ্কস চ্যাঁচালে।

হুড আর ফক্স লাফিয়ে উঠলো আমাদের এই অদ্ভুত গাড়িতে, আর গৌমি প্রায় পঙ্গু হ'য়ে পড়লেও তখনও সংজ্ঞা হারায়নি— ধরাধরি ক'রে তাকে এনে তার কামরায় শুইয়ে রাখা হ'লো।

তখন প্রায় সাড়ে-দশটা বাজে। ব্যাঙ্কস আর স্টর হাওদায় গিয়ে বসলো; আর, তিন আলোর ঝলকানির মধ্যে এগিয়ে চললো *বেহেমথ'*, দাবানল, *বেহেমথের* বৈদ্যুতিক মশাল, আর বিদ্যুৎজ্বলা আকাশ—এই তিনরকম আলোর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললো আমাদের অতিকায় ইস্পাতি হাতি, তার শুঁড় থেকে বেরিয়ে এলো কালো ধোঁয়ার সর্পকুণ্ডলী।

দু-এক কথায় হুড তার অভিযানের বর্ণনা দিলে। কোনো বন্য জন্তুর দেখাই তারা পায়নি, চিহ্নমাত্রও না। এদিকে ঝড় যখন এলো, অন্ধকার যে তাদের তখন এত তাড়াতাড়ি ঢেকে ফেলবে তা তারা কেউই আশঙ্কা করেনি। তারা তখন মাইল তিনেক দূরে গেছে, এমন সময় বাজের শব্দ গ'র্জে ওঠে মাথার ওপর। তক্ষুনি ফিরে-আসার চেষ্টা করে তারা, কিন্তু সেই ঝুরি-নামা ডালপালা-ভরা অশ্বত্থ বনে তারা আতঙ্কিত হ'য়ে আচমকা আবিষ্কার করে যে তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে। ঝড় ততক্ষণে রেগে উঠে গাছপালার ঝুঁটি ধ'রে নাড়াচ্ছে। এতদূরে তারা চ'লে গিয়েছিলো যে *বেহেমথের* বৈদ্যুতিক মশালের আলো সেখানে পৌঁছোয় না। পথ হারিয়ে ফেলে তারা কেবলই গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো, কেমন ক'রে যে *বেহেমথে* পৌঁছুবে বুঝতেই পারেনি। ততক্ষণে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে, এমনকী ডালপালা ও নিবিড় পাতার চন্দ্রাতপ ভেদ ক'রে অঝোর ধারায় ঝরতে লেগেছে সেই বিষম বৃষ্টি—ভিজে তারা যেন ঝোড়ো কাক হ'য়ে গেলো একেকজনে। আর এমন সময় এক প্রচণ্ড ঝলসানিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেলো তাদের, ঠিক যেন মাথার ওপরেই বাজ ফেটে পড়লো বিষম রোষে, আর গৌমি সংজ্ঞা হারিয়ে চিৎপাত হ'য়ে প'ড়ে গেলো মাটিতে, ক্যাপ্টেন হুডের পায়ের তলায়। তার বন্দুকটা তার হাত থেকে কে যেন হ্যাঁচকা টানে ছিনিয়ে নিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেললে, কুঁদোটা ছাড়া ধাতুনির্মিত খোলনলচের কিছুই আর থাকলো না। প্রথমটায় তারা ভেবেছিলো গৌমি বুঝি ম'রেই গেলো, কিন্তু পরীক্ষা ক'রে বুঝলো যে ওই ভীষণ বিদ্যুৎ তার গায়ে ব'য়ে যায়নি—কাছে পড়েছে, আর সেই ধাক্কায় তার পা-টা অসাড় হ'য়ে গেছে। বেচারার হাঁটবার ক্ষমতাই ছিলো না; তারা তাকে ধরাধরি ক'রে ব'য়ে নিয়ে এলো, সেই কালো বনের মধ্যে দিয়ে কোনোমতে সামনে এগুতে লাগলো। দু-ঘণ্টা তারা সেই আঁধারবনের গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সংশয়ে পা চলেনি; থেমে

বোঝবার চেষ্টা করেছে কোথায় পৌঁছেছে, তারপর আবার শুরু করেছে তারা সেই হতাশ কুচকাওয়াজ। অবশেষে যখন তারা একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছে, এমন সময় কোথায় যেন তীক্ষ্ণ ধাতব স্বরে বাঁশি বেজে উঠলো, *বেহেমথের*। তার মিনিট পনেরোর মধ্যেই তারা এসে পৌঁছুলো—আরেকটু দেরি হ'লে *বেহেমথ* হয়তো তাদের ফেলে রেখেই চ'লে যেতো।

হুড যতক্ষণে তাদের ওই দুর্বিপাকের বর্ণনা দিলে, *বেহেমথ* ততক্ষণে প্রশস্ত মসৃণ অরণ্যপথ ধ'রে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু দাবানলও যেন তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগুচ্ছে; হাওয়ার গতি যদি বদলে যায়, তাহ'লে এই অবস্থায় আমাদের বিপদের আর শেষ থাকবে না। লাফিয়ে-লাফিয়ে এগিয়ে আসছে আগুন—পিছু-নেয়া কোনো বিষম ভয়ের মতো—আর *বেহেমথ* যেন প্রাণপণে ছুটে চলেছে তার হাত এড়াবার জন্যে। হঠাৎ কিন্তু সত্যিই বদলে গেলো হাওয়ার গতি, ছাই আর ফুলকি উড়লো ঘূর্ণি দিয়ে চরকির মতো পাক খেয়ে-খেয়ে, আর আগুনের বেগ যেন আরো বেড়ে গেলো!

ব্যাঙ্কস তক্ষুনি *বেহেমথের* গতি বাড়িয়ে দিলে, কিন্তু সেই চঞ্চল অগ্নিকাণ্ডের কাছে শেষ পর্যন্ত তাকে যেন হার মানতেই হবে। আমরা আতঙ্কে ও ভয়ে কেবল সেই প্রচণ্ড, অবিশ্বাস্য, ভয়ংকর দাবানলের দিকে তাকিয়ে আছি! অসহায়ের মতো সমস্ত বোধ আর চেতনা যেন টান হ'য়ে প্রতীক্ষা করছে ভীষণ মুহূর্তের, কখন পথ আটকে দু-পাশের অরণ্যেই জ্ব'লে ওঠে আগুন; এমন সময়, তখন সাড়ে-এগারোটা হবে, ঠিক যেন *বেহেমথের* মাথার উপর বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়লো বাজ! কী সর্বনাশ! স্টর আর ব্যাঙ্কস যে হাওদায় রয়েছে! আমি ভয়ে চোখ বুঝে ফেললুম।

বাজটা কিন্তু সরাসরি হাওদার উপর পড়েনি; *বেহেমথের* লম্বা পাখার মতো কানে পড়েছে, আর ওই ইস্পাত শুষে নিয়েছে সব বিদ্যুৎ। এঞ্জিনের কোনো বিপদ হয়নি। বরং সেই বিকট বজ্রনাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে *বেহেমথ* যেন তার শুঁড় তুলে বার কয়েক বাঁশি বাজিয়ে তার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘোষণা ক'রে দিলে!

ক্যাপ্টেন হুড ফুর্তিতে লাফিয়ে উঠলো! 'রক্তমাংসের হাতি হ'লে কখন ডিগবাজি খেয়ে পড়তো, চার পা শূন্যে তুলে গড়াগড়ি যেতো! কিন্তু দেখেছো আমাদের *বেহেমথকে*—বজ্রবিদ্যুৎ ঝড়বৃষ্টি দাবানল কাউকেই কোনো পরোয়া করে না।'

আরো-আধঘণ্টা এগুবার পর আমরা এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেলুম। জ্বলন্ত গাছপালার আলোয় দেখা গেলো সারি-সারি ভীত ও কাতর, আতঙ্কিত ও মরীয়া জীবজন্তু—দাবানলের হাত থেকে পালাবার জন্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে তারা—কোনোদিকেই দৃক্‌পাত করছে না মোটেই। আর তাদের দেখে হুড কেবল সশব্দে কপাল চাপড়াতে লাগলো। যখন সে শিকারে বেরিয়েছিলো, তখন কারু ল্যাজের ডগাটিও চোখে পড়েনি—অথচ এখন যখন চায় না, তখন তারা পাল্লার মধ্যে ছুটোছুটি ক'রে মরছে! পোড়া কপাল আর কাকে বলে?

রাত একটার সময় আমাদের অবস্থা আরো শোচনীয় হ'য়ে উঠলো। হাওয়া হঠাৎ

তিনবার পাক খেয়েই বদলালো দিক, উড়ে গেলো ফুলকি আর ছাই, আর ওপাশের প্রস্তুত ও আগ্রহী অশ্বত্থ বনেও ধ'রে গেলো আগুন। অর্থাৎ *বেহেমথ* মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে, এবং সামনে ও দু-পাশে লেলিহান শিখা উঠে গেছে ঊর্ধ্বে, উদ্বাহু হ'য়ে নৃত্য করছে যেন ভয়ংকর আহ্লাদে। এই আগুনের কুণ্ডের মাঝখান দিয়েই এগুতে হবে আমাদের : দুই ধারে গনগনে বিপুল উনুন, তার মধ্য দিয়ে ছুটে যেতে হবে *বেহেমথকে* কোনো জাদুজানা অতিকায় ঐরাবতের মতো। হিন্দুদের বজ্রের দেবতা ইন্দ্রের হাতি ছাড়া কে আর উদ্ধার পাবে এই সংকট থেকে ?

ব্যাঙ্কস কিন্তু হাল ছাড়েনি। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় তারই মধ্য দিয়ে সে পূর্ণবেগে চালনা করলে *বেহেমথকে*, দু-পাশে গর্জমান জ্বলন্ত উনুন, প্রজ্বলন্ত ডালপালার উপর দিয়ে ঘুরে-ঘুরে যাচ্ছে *বেহেমথের* চাকা, আর জ্বলন্ত দম-বন্ধ-করা আবহাওয়া ঢেকে ফেলছে আমাদের।

এইভাবে কতক্ষণ কেটেছিলো, জানি না। হঠাৎ...হঠাৎ একঝলক খোলা হাওয়া যেন শোঁ-শোঁ ক'রে ব'য়ে গিয়ে আমাদের ব'লে গেলো, 'বিপদ আর নেই !' রাত তখন দুটো বাজে। আমরা অবশেষে সেই অশ্বত্থ বন পেরিয়ে এসেছি। আমাদের পিছনে প'ড়ে রয়েছে সেই বিশাল অরণ্যদেশ, যেখানে শিখা কেবল ছড়িয়েই যাবে নৃত্য করতে-করতে, শেষ অশ্বত্থ গাছটা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ অব্দি সেই আগুনের নাচ আর থামবে না।

সকালবেলায় ঝড় থেমে গেলো—যেমন হঠাৎ এসেছিলো, তেমনিই হঠাৎ তার রোষ আর আক্রোশ মিলিয়ে গেলো দিগন্তে—যেন এই ভয়ংকর কয়েক ঘণ্টায় নিজেকে সে একেবারে নিঃশেষ ক'রে ফেলেছে।

বেহেমথ যখন বিশ্রামের জন্যে থামলো, তখন বেলা বারোটা বাজে, আর আমরা অবিরাম চ'লে রেওয়া প্রদেশের কাছে এসে পড়েছি।

১০

ক্যাপ্টেন হুডের পরাক্রম

সেদিন সারাদিন আমরা গত রাতের ধকল কাটিয়ে ওঠবার জন্যে বিশ্রাম নিলুম এখানে, রাতটাও তাই। এই দুর্যোগ, বিপৎপাত আর অবসাদের পর বিশ্রাম আমাদের পক্ষে নিতান্তই জরুরি হ'য়ে পড়েছিলো।

অযোধ্যা রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে এসেছি অবশেষে ; এখন আমরা যাবো উর্বর ও শ্যামল রোহিলখণ্ডের মধ্য দিয়ে। দিল্লি পুনরুদ্ধারের পর এইখানে সিপাহী বিদ্রোহের শেষ আগুন জ্ব'লে উঠেছিলো—পরে সার কলিন ক্যামবেল তাঁর বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংঘর্ষে লিপ্ত হন ; অনেকক্ষণ পর্যন্ত, একেবারে শেষ রক্ত বিন্দুটুকু দিয়ে,

বিদ্রোহীরা সার কলিনকে রুখেছিলো ।

রাস্তা এখানে সমতল ও সোজা ; অনেক স্রোতস্বিনী ও ছোটো-ছোটো শাখানদী আছে বটে, অনেকগুলোই তাদের সেচের সুবিধের জন্যে কৃত্রিম উপায়ে মনুষ্যনির্মিত —কিন্তু সেগুলো অনায়াসেই পেরুতে পারবে *বেহেমথ* । অল্পক্ষণের মধ্যেই যে নেপালের পর্বতগাত্র আমাদের চোখে পড়বে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই ।

বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে আরেকদিক থেকে ভালোই করেছিলুম আমরা । গৌমির বাঁ-পায়ের অসাড় ভাবটা ছিলো সাময়িক ; সেবা ও সংবাহনের ফলে সে আবার সুস্থ হ'য়ে উঠলো—সেই মারাত্মক দুর্ঘটনার কোনো চিহ্নই আর রইলো না । শুধু দুর্যোগের কিছু চিহ্ন রইলো *বেহেমথের* লম্বা কানে—মনে আছে, বাজ পড়েছিলো গর্জন ক'রে, রেগে ; আমরা ভেবেছিলুম বুঝি হাওদার উপরেই এসে পড়েছে ! তখন *বেহেমথ* তার লম্বা কানের ডগা দিয়ে সব বিদ্যুৎ শুষে নিয়েছিলো—আর তার ওই ইস্পাতের কানে কতগুলো ছোটো-বড়ো ছ্যাঁদা হ'য়ে গিয়েছিলো কেবল ।

আটই জুন সকালবেলায় রোহিলখণ্ডের একটা ছোট্ট গ্রাম ছেড়ে আবার আমরা ধীরে-ধীরে রেওয়ার দিকে এগিয়ে চললুম ; রেওয়া তখন মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে । রাস্তা বৃষ্টি-ভেজা, পিছল, সেইজন্যেই দ্রুতবেগে যাবার উপায় ছিলো না ।

হুড আগের দু-দিন তার শিকারি কুকুর ফ্যান আর নাইজারকে নিয়ে বন্দুক হাতে বেরিয়েছিলো বটে, কিন্তু এমন-কোনো হিংস্রভীষণ প্রবল জন্তু তার চোখে পড়েনি যাতে তার শিকারের ক্ষুধা আর রোমাঞ্চলিপ্সা এতটুকু তৃপ্ত হয় । হয়তো সেইজন্যেই সে এতই বিরক্ত ও হতাশ হ'য়ে পড়েছিলো যে আট তারিখে শিকারের একটা মস্ত সুযোগ তার হাতছাড়া হ'য়ে গেলো ।

বেহেমথ তখন যেখান দিয়ে যাচ্ছে, তার দু-পাশে ঘন বাঁশবন দেখেই বোঝা যায় গ্রাম বা লোকালয় কাছেই । আর বাঁশবনের আশপাশে শতরঞ্জের ছকের মতো আল-বাঁধা প'ড়ে আছে জলা ধানখেত । স্টর ব'সে ছিলো হাওদায়, *বেহেমথ* আস্তে গজেন্দ্রগমনে চলেছে, শুঁড় থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে হালকা সুন্দর ধোঁয়ার রাশি —আশপাশের বাঁশবনের উপরে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী ।

হঠাৎ এমন সময় আশ্চর্যসুন্দর ক্ষিপ্রতায় কী-একটা জানোয়ার একলাফে হাতির ঘাড়ে উঠে বসলো ।

'চিতাবাঘ ! চিতাবাঘ !' চেঁচিয়ে উঠলো স্টর ।

চীৎকার শুনে হুড একলাফে বন্দুক হাতে বেরিয়ে এলো বারান্দায় । 'চিতাবাঘ !' তারও গলা থেকে চীৎকার উঠলো ।

চেঁচিয়ে বললুম, 'দেখছো কী ? গুলি করো !'

'গুলি করার সময় ঢের পাবো,' ব'লে হুড বন্দুক তুলে তাগ ক'রে ধরলো ।

কর্নেল মানরো, ব্যাঙ্কস আর আমি তখন বারান্দায় বেরিয়ে এসেছি । চিতাবাঘ আসলে বাংলাদেশের গরীয়ান রাজাবাঘের মতো অত-বড়ো নয়, তেমন মহিমা তার নেই ;

কিন্তু ক্ষিপ্রতায়, গায়ের জোরে আর হিংস্রতায় সে মোটেই কম যায় না। আমাদের হাতি দেখে নিশ্চয়ই ঠ'কে গিয়েছে চিতাটা। সাহসে ভর ক'রে লাফিয়ে পড়েছে মুহূর্তে, ভেবেছে জ্যান্ত মাংসেই বুঝি বসাবে থাবা আর দাঁত, কিন্তু তার বদলে-এ কী কাণ্ড! —এ যে লোহার হাতি! দাঁত-নখই বরং ভেঙে যাবার জোগাড়। চিতাটা যেন এভাবে ঠ'কে গিয়ে আরো খেপে গেলো, নকল হাতিটার মস্ত কান দুটো আঁকড়ে ঝুলে থাকলো সে একটু, এক্ষুনি আবার লাফিয়ে প'ড়ে বাঁশবনে ঢুকে যাবে বুঝি।

হুড তার বন্দুক ধ'রে তেমনি তাগ ক'রেই আছে—ভঙ্গিটা : ও আর কী, গুলি করলেই হ'লো। হঠাৎ চিতাটা তাকে দেখতে পেলে ; গর্জন ক'রে উঠলো সে একবার, তারপর আবার উঠে বসলো হাতির কাঁধে। নিয়তির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, এটা তার অজানা নেই ; কিন্তু তাই ব'লে সে পালিয়ে যাবার কোনো চেষ্টাই করলে না। বরং বারান্দায় লাফিয়ে পড়ারই মৎলব বুঝি তার।

হুড চিতাটার গা থেকে চোখ না-সরিয়েই আমাকে জিগেস করলে, 'মোক্লের, তুমি কখনও চিতাবাঘ মেরেছো?'

'না।'

'মারতে চাও একটা?'

বললুম, 'হুড, আমি চাই না যে তুমি এ-রকম একটা বাঘ মারার গৌরব থেকে বঞ্চিত হও—'

'ফুঃ,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি হুডের, 'এ আবার একটা বাঘ নাকি। নাও, একটা বন্দুক তুলে নিয়ে চিতাটার কাঁধ লক্ষ্য করো ; তাগ ফশকালে আমি না-হয় চিতাটা লাফাবার সঙ্গে-সঙ্গে গুলি করবো—'

'তাহ'লে তা-ই হোক।'

ফক্স আমার হাতে একটা দোনলা বন্দুক তুলে দিলে। বন্দুকটা তুলে নিয়ে চিতাটার কাঁধ লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়লুম। গুলিটা তার কাঁধ ঘেঁসে চ'লে গেলো—খুব বেশি হ'লে একটু ছ'ড়ে গিয়ে থাকবে সম্ভবত, সঙ্গে-সঙ্গে চিতাটা হুড়মুড় ক'রে লাফিয়ে পড়লো মাটিতে।

'এঞ্জিন থামাও, এঞ্জিন থামাও!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলে ব্যাঙ্কস, আর স্টর তক্ষুনি ব্রেক ক'ষে *বেহেমথকে* থামিয়ে দিলে। বারান্দা থেকে লাফিয়ে নামলে হুড আর ফক্স, ঝোপটার দিকে ছুটে গেলো বন্দুক উঁচিয়ে। রুদ্ধশ্বাস ও উৎকর্ণ কয়েকটা মিনিট কেটে গেলো, কিন্তু সব চুপচাপ, গুলির কোনো আওয়াজই পাওয়া গেলো না। একটু পরেই শিকারি দুজন ফিরে এলো।

'হাওয়া হ'য়ে গেছে। কোথাও কোনো পাত্তা নেই,' হুড চেঁচিয়ে জানালে, 'ঘাসের উপর এমনকী রক্তের একটা ফোঁটা অব্দি নেই।'

বললুম, 'আমারই দোষ। তুমি নিজে চিতাটাকে গুলি করলে এমনভাবে পালাতে পারতো না। তোমার তো আর তাগ ফশকাতো না!'

'বাজে বোকো না !' বললে হুড, 'আমি ঠিক জানি তোমার গুলি ওর গায়ে লেগেছিলো—তবে ঠিক কাঁধে লাগাতে পারোনি !'

'আমার ঊনচল্লিশ কি আপনার একচল্লিশ নম্বর হওয়া ওর কপালে লেখা ছিলো না,' ফক্স কিঞ্চিৎ মনমরাভাবে জানালে ।

'দূর-দূর !' চেষ্টা ক'রে হুড তার গলায় ঔদাসীন্য আনলে, 'চিতা তো আর সত্যিকার বাঘ নয়—মার্জারকুলের সেরা জীব হ'লে কি আর আমি অমনভাবে মোক্লেরকে গুলি করতে দিতুম !'

'যাক, যা হবার হয়েছে,' সার এডওয়ার্ড মানরো বললেন, 'এদিকে ছোটোহাজরি তৈরি—সবাই টেবিলে এসে বোসো, টাটকা খাবারের চেয়ে সান্ত্বনা কি আর কিছুতে আছে !'

'ছোটোহাজরিতেই সান্ত্বনা মিলবে, আশা করি,' বললে ম্যাক-নীল, 'তবে সব দোষ আসলে ফক্সের !'

'আমার ?' ফক্স হকচকিয়ে গেলো ।

'নিশ্চয়ই !' বললে ম্যাক-নীল, 'মোক্লেরকে যে-দোনলাটা তুমি দিয়েছিলে তার টোটা ছিলো ছ-নম্বর—ওতে কি আর পাখি ছাড়া আর-কিছু মেলে ?' ব'লে ম্যাক-নীল দোনলাটার ভিতর থেকে দ্বিতীয় টোটাটা বের ক'রে আনলে । দেখা গেলো, তার কথাই সত্যি !

'ফক্স !' হুড ডাক দিলে ।

'বলুন !'

'দিন-দুই বন্দী থাকতে হ'বে তোমায় ।'

'আচ্ছা, ক্যাপ্টেন !' ব'লে ফক্স নিজের কামরার দিকে চ'লে গেলো—আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আর মুখ দেখাবার ইচ্ছে নেই তার । নিজের এই ভুলে লজ্জায় তার প্রায় মাথা কাটা গেছে ।

পরদিন ক্যাপ্টেন হুড, গৌমি আর আমি রাস্তার ধারে সমভূমিটার উপর শিকার করতে বেরুলুম । কয়েক ঘণ্টার জন্য থেমেছে *বেহেমথ*, সেই ফাঁকেই এই সফরি । সারা সকালটা ঝমঝম বৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু দুপুরবেলায় আকাশ একেবারে ঘন-নীল—হালকা শাদা নির্জল মেঘ ছাড়া আর-কিছু নেই আকাশে । এই শিকারের প্রেরণা অবিশ্যি মঁসিয় পারাজারের—ছোটোহাজরির সময় সে জানিয়েছিলো তার ভাঁড়ার নাকি প্রায় ফাঁকা। তাই ফ্যান আর নাইজারকে নিয়ে আমরা তিনজনে শিকারে বেরিয়েছি ।

কিন্তু দু-ঘণ্টা ধ'রে এদিক-ওদিক ঘুরেও কোনো লাভ হ'লো না । কেবল কয়েকটা খরগোশ আমাদের দেখে ভয়ে কানখাড়া ক'রে শাঁৎ ক'রে ছুটে মিলিয়ে গেলো দূরে । জায়গাটা আসলে এত ফাঁকা যে শিকারের সন্ধান পাওয়াই দুষ্কর । না আছে জঙ্গল, না-বা কোনো ঝোপঝাড়—কেবল দূরে-দূরে চাষীদের গ্রাম আর গোলাবাড়ি কালো ফুটকির মতো দেখা যায় । হুড অবিশ্যি কোনো হিংস্র জন্তুর আশায় বেরোয়নি, মঁসিয় পারাজারের

শূন্য ভাঁড়ার পূর্ণ করাই তার উদ্দেশ্য । কিন্তু বেলা চারটে অব্দি যে আমরা একবারও কোনোকিছুকে গুলি করতে পারলুম না, তা অবশ্য মোটেই আমাদের দোষ নয় ।

কিন্তু হুড তবু এমনি আপশোশ প্রকাশ করতে লাগলো যে আমি তার পস্তানি শুনে বার-বার তাকে সান্ত্বনা আর আশা দিলুম । 'মিলবে, শিকার মিলবে—আলবৎ মিলবে । এখন না-মিলুক, পাহাড়ি জায়গায় জঙ্গলে তো মিলবেই !'

'তা অবিশ্যি ঠিক । নেপালের জঙ্গলে যদি কিছু না-মেলে তো হাত কামড়ানো ছাড়া আর-কিছুই করার থাকবে না !....কটা বাজে এখন ?'

'প্রায় পাঁচটা ।'

'পাঁচটা ! অথচ কিছুই পেলুম না এখনও !'

'সাতটার আগে শিবিরে ফেরার দরকার নেই । ততক্ষণে হয়তো—'

'উঁহু, আমাদের কপালটাই খারাপ । আর জানো, মোক্লের, কপালই হ'লো সব সাফল্যের মূল !'

'পরিশ্রম, ধৈর্য বা অধ্যবসায়ও ।' আমি বললুম, 'খালি হাতে ফিরবো না, এ-রকম একটা প্রতিজ্ঞা করলে হয় না ? তোমার কী মনে হয় ?'

'কী মনে হয় ?' হুড যেন অত্যন্ত বিস্মিত হ'লো এ-কথা শুনে, 'সেটাই তো মনোভাব হওয়া উচিত শিকারিদের !'

তখন অবশ্য আমরা তিনজনে সামনে যা পেতুম, তাকেই আক্রমণ করতুম—মেঠো ইঁদুর কি কাঠবেড়ালিও বোধহয় ছাড়তুম না কিছুতেই । আসলে এখানকার সব পশুপক্ষীই বোধহয় আমাদের মৎলব জেনে গিয়েছিলো আগেভাগে, তাই সবাই পালিয়েছে—এমনকী একেবারে নিরীহ *গোবেচারা* পাখিগুলো অব্দি চোখে পড়ছে না ।

ধানখেত ধ'রেই আমরা এগুলুম । একবার রাস্তার এপাশ ধ'রে গেলুম খানিকটা, আবার ওপাশের ধানখেত ধ'রে ফিরে এলুম । উদ্দেশ্য, যাতে শিবির ছেড়ে খুব-একটা দূরে গিয়ে না-পড়ি । কিন্তু সবই বৃথা হ'লো । বন্দুকের বদলে হাতে শৌখিন বেড়াবার ছড়ি থাকলেও হ'তো—আমাদের অবস্থার কিছু উনিশ-বিশ হ'তো না । এদিকে প্রায় সাড়ে ছটা বেজে গেলো !

হুডের দিকে তো তাকানোই যাচ্ছে না । বিড়বিড় ক'রে কী যেন বকছে আপন মনে, বোধহয় সমস্ত পশুপক্ষীকেই অভিসম্পাত দিচ্ছে । সত্যি, কোনো শিকারির এমন অবস্থার কথা কল্পনাও করা যায় না ।

আমরা তখন শিবির থেকে মাইল তিনেক দূরে । বাঁশবনের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা ঘোরা পথে আমরা শিবিরের দিকে ফিরে আসছি । তখনও সূর্য ডোবেনি দিগন্তে, তবে মেঘের তলায় চাপা প'ড়ে গেছে । সেইজন্যেই পথটা একটু ঝাপসা ঠেকছে ।

হঠাৎ এমন সময় আচম্বিতে আমাদের ডানপাশের ঝোপে গর্‌র্‌র্ ক'রে একটা বিষম গর্জন শোনা গেলো । আমার বুকটা এমনভাবে ধ্বক ক'রে কেঁপে উঠলো যে আমি থমকে থেমে গেলুম । হুড আমার হাতটা চেপে ধরলে । ফিশফিশ ক'রে বললে

'বাঘ !' তারপরেই একটা বিশ্রী শপথ বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে, 'কিন্তু আমাদের বন্দুকে যে কেবল ছররা গুলি ভরা—একটাও বুলেট নেই !'

কথাটা নিদারুণ সত্যি । আমাদের তিনজনের কারুর কাছেই একটাও টোটা নেই। তাছাড়া থাকতোও যদি, তবু তখন বন্দুকে নতুন ক'রে টোটা ভরার সময় পাওয়া যেতো না । কারণ গর্জনটা শোনবার পরেই দেখি গুলতি থেকে বেরুনো মারবেলের মতো প্রচণ্ড বেগে বাঘটা ঝোপের আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো—ঠিক আমাদের হাত বিশেক দূরে আঁকাবাঁকা রাস্তার মোড়ে এসে বসলো ।

রাজা বাঘ ; দৃঢ় প্রচণ্ড শরীর, তেজপূর্ণ, মস্ত, ভয়ানক, সুন্দর, নমনীয় পেশী, প্রকাণ্ড থাবা, ক্ষিপ্রতায় হিংস্রতায় তার তুলনা নেই ।

এমন ভয়ংকর অবস্থায় কি এর আগে কেউ কখনও পড়েছিলো ?

বাঘটাকে দেখবামাত্র আমার হাতটা বন্দুক সমেত কেঁপে উঠলো । লম্বায় ন-দশ ফুট হবে, বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে কালো আর হলদের ডোরা-কাটা জ্বলন্ত-উজ্জ্বল এই বিরাট মার্জারবংশীয়ের মুখটায় সূর্যের লাল রশ্মি এসে পড়েছে : চোখ দুটো রয়েছে ছায়ায় —অন্ধকারে বেড়ালের চোখের মতো জ্ব'লে উঠেছে সবুজ-ভীষণ ভয়ানক দুটি পোকরাজ । ল্যাজটা ন'ড়ে উঠছে চঞ্চল হিল্লোলে । এমনভাবে গুঁড়ি মেরে বসেছে যেন এক্ষুনি লাফিয়ে পড়বে ।

হুড কিন্তু মোটেই চঞ্চল হয়নি । বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরেছে সে ততক্ষণে, আর বিড়বিড় ক'রে এক অদ্ভুত শুকনো গলায় ব'লে চলছে : 'ছ-নম্বর টোটা ! ছ-নম্বর টোটা দিয়ে একটা বাঘকে গুলি করা ! একেবারে চোখে গুলি করতে না-পারলে......'

কথা শেষ করার আর সময় পেলে না হুড । বাঘটা লাফালো না । বরং আস্তে-আস্তে রাজার মতো এগিয়ে এলো অরণ্যের সেই হিংস্র মহিমা । গৌমিও পিছন থেকে বন্দুক তুলে তাগ ক'রে আছে—তারও বন্দুকে ছর্‌রার কার্তুজ ভরা ।

'একটুও নোড়ো না কেউ, কোনো শব্দ কোরো না,' ফিশফিশ ক'রে বললে হুড, 'তাহ'লেই বাঘটা লাফিয়ে এসে পড়বে আমাদের দিকে । আর লাফ দিলেই কোনো রক্ষা নেই ।'

আমরা নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম ।

আস্তে পায়ে-পায়ে এগুতে লাগলো সেই ডোরা-কাটা বেড়াল, চোখ দুটো সে একবারও সরাচ্ছে না আমাদের উপর থেকে, ঝোলা চোয়ালটা যেন মাটি-ছোঁয়া । হুডের সঙ্গে তার দূরত্ব বুঝি দশ হাতও নেই । হুড কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে নির্ভীক ও নিষ্কম্প, যেন কোনো প্রস্তরমূর্তি—তার সারা প্রাণ যেন তার চোখের তারায় এসেই সংহত হয়েছে ।

ভীষণ মুহূর্তটি আসন্ন, তিনজনের কেউই সম্ভবত আর বেঁচে থাকবো না ; কিন্তু এতেও হুডের বুক বোধহয় ধ্বক-ধ্বক করছে না । এক-এক ক'রে পাঁচ পা এগিয়ে গেলো হুড । কেমন ক'রে যে আমি নিজেকে সামলে রাখলুম জানি না, আরেকটু হ'লেই বোধহয় চেঁচিয়ে বলতুম তাকে গুলি ছুঁড়তে । কিন্তু না, হুড বলেছিলো, একমাত্র ভরসা

চোখে গুলি ক'রে বাঘটাকে অন্ধ ক'রে ফেলতে পারলে, আর সেইজন্যে গুলি করার আগে তাকে খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

বাঘটা আরো তিন-পা এগিয়ে এলো, তারপর ধনুকের ছিলার মতো টান হ'য়ে গেলো তার সর্বাঙ্গ, এক্ষুনি লাফাবে—

সজোরে গ'র্জে উঠলো বন্দুক, তার পরেই আরেকটা গুলির শব্দ : 'গুড়ুম, গুড়ুম !'

দ্বিতীয় গুলিটা যেন বাঘের গায়ে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে-করা। বাঘটা কেবল বার দুয়েক গড়ালো মাটিতে, যন্ত্রণা আর ক্লেশ-মেশানো গর্জন উঠলো দু-তিন বার, তারপরেই স্থির হ'য়ে প'ড়ে রইলো মাটিতে ।

'চমৎকার !' হুড উল্লসিত, 'বন্দুকটায় ছররা ছিলো না, জানো ! না, ফক্সকে ধন্যবাদ দিতেই হয় !'

'তাও কি সম্ভব ?' আমি তো তাজ্জব ।

'নিজের চোখেই দ্যাখো,' বলতে-বলতে সে ফাঁকা টোটাটা বার ক'রে আনলে বন্দুক থেকে—সত্যি, সেই নতুন টোটা, যা ছিলো সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ, দাঁত দিয়ে চামড়া কেটে যে-টোটা বন্দুকে ভরতে হয় !

ব্যাখ্যা করার আর দরকার হ'লো না । সব বুঝতে পারলুম । দুটো দোনলা বন্দুক ছিলো হুডের—একই রকম দেখতে । ফক্স ভুল ক'রে একটায় ছররা গুলি ভরেছিলো, আরেকটায় ভরে ছিলো শিশের গুলি ! এই ভুলের দরুন আগের দিন বেঁচেছে চিতাবাঘের জীবন, আর আজকে বাঁচলো আমাদের !

'সত্যি,' হুড বললে, 'জীবনে আর-কোনো দিন মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসে দাঁড়াইনি !'

আধ ঘণ্টা পরে আমরা যখন শিবিরে ফিরে এলুম, ফক্সকে ডেকে পাঠালে হুড —তারপর কী হয়েছে, সব তাকে খুলে বললে ।

শুনে ফক্স বললে, 'ক্যাপ্টেন, তাহলে দু-দিনের বদলে আমার চারদিন বন্দী হ'য়ে থাকা উচিত—কারণ আমি দু-দুটো ভুল করেছি ।'

'আমারও তা-ই মত,' হুড তক্ষুনি বললে, 'কিন্তু তোমার ভুলের জন্যেই যেহেতু একচল্লিশ নম্বর আমার হস্তগত হ'লো, সেইজন্যে আমার মতে এই মোহরটা তোমার প্রাপ্য—'

'আর আমারও মত হ'লো এই যে মোহরটা মুহূর্তে পকেটস্থ ক'রে ফেলা,'—সোনার টাকাটা পকেটে ঢোকাতে-ঢোকাতে বললে ফক্স ।

১২ই জুন সন্ধেবেলায় একটা ছোট্ট গ্রামে গিয়ে পৌঁছুলুম আমরা ; ভারতের সব পাড়াগাঁর মতোই এই গ্রামও দেখতে একই রকম : দুঃস্থ জলাশয়, মশা-মাছির উৎসব, কাদায়-ডোবা মোষ, পাঁজরা-ওঠা গোরু, বুভুক্ষু সংসারের ভাঙা কুঁড়ে ঘর, নিষ্ফল ডাঙায় রাঙা ধুলোর ওড়াউড়ি । এই গ্রাম থেকেই পরদিন সকালে আমরা রওনা হবো : আর নব্বুই মাইল দূরে, উৎরাইয়ের কোলে নেপাল—আমাদের লক্ষ্য তারই অরণ্যদেশ ।

১১

এক বনাম প্রকাণ্ড তিন

কয়েক দিন কেটে গেছে ; অবশেষে উত্তর ভারতের প্রথম উৎরাই বেয়ে উঠে যাচ্ছি আমরা ; আর ধীরে-ধীরে উঠে গেছে উৎরাইগুলো, যেন একেবারে জগতের শেষ চুড়োয় গিয়ে পৌঁছেছে তারা । কিন্তু উৎরাই এখানে চোখে পড়ে না ; *বেহেমথ* প্রায় যেন অগোচরেই ক্রমশ উঠে যাচ্ছে, আমরা তা বুঝতেও পারছি না । ঝোড়ো আর বৃষ্টি-ভেজা আবহাওয়া, তবে তাপমাত্রা সহ্যের সীমা পেরোয়নি । রাস্তা এখনও দুর্গম নয় ; তবে *বেহেমথের* কাছে আবার দুরধিগম্যই বা কী আছে ?

হিমালয়ের শুভ্র-নীল চুড়োর কাছে এসে পড়েছি আমরা, কিন্তু আবহাওয়ার জন্যে এই আকাশছোঁয়া গিরিমালা স্পষ্ট ক'রে দেখবার জো নেই । অথচ যতই তিব্বতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, জমি ততই বন্য ও এবড়োখেবড়ো হ'য়ে উঠেছে ! তালীবন ছিলো এতক্ষণ দিগন্তে, এবার চোখের সামনে হলদে-সবুজ কলাগাছের সারি ; আর রাশি-রাশি বাঁশঝাড় । ঝলমলে ম্যাগনলিয়া, স্নিগ্ধ মেপল, দীর্ঘ ওক, মস্ত বাদাম গাছ, ইণ্ডিয়া রবারের বন, হাওয়ায়-কাঁপা পাইন বন, উৎফুল্ল জেরানিয়াম, রডোডেনড্রন আর লরেল—রাস্তার দু-পাশে এই আশ্চর্য নিবিড় বনানী চোখে পড়ে—যখন বৃষ্টি আর যখন রোদ, যখন তরুণ সকাল আর ছায়াঢাকা দূরসন্ধ্যা—সবসময়েই এই দৃশ্য ভাঁজের পর ভাঁজ খুলে অফুরন্ত সৌন্দর্যের সংকেত পাঠিয়ে দেয় । তারই মাঝে-মাঝে বাঁশ-বেতের ছোটো-ছোটো খোড়োবাড়ি-ওলা ছোটো-ছোটো গ্রাম চোখে পড়ে—তবে যতই উপরে উঠছি জনালয় ততই ক'মে যাচ্ছে । মাঝে-মাঝে ছাইরঙা ঝাপসাধূসর আকাশ ভেঙে বর্ষা নামে, আমরা বাধ্য হ'য়ে স্টীম হাউসের বৈঠকখানায় ব'সে আড্ডা দিই, তাশ খেলি, গল্পগুজব করি ।

মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে সরাইখানা, নিচু চৌকো বাংলোবাড়ি, দু-কোণায় দুটো স্তম্ভ উঠেছে ; ভিস্তিওলা, বাবুর্চি আর খানশামা ছাড়া আর-কেউ থাকে না এ-সব সরাইয়ে । এ-সব সরাইয়ে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি থাকতে হ'লে বিশেষ পারমিট নিতে হয় ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে ।

সতেরোই জুন এমনি-একটি সরাইয়ের কাছে আমরা আস্তানা গেড়েছি, আর সরাইখানার অভ্যাগতরা *বেহেমথের* দিকে বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ ভরা ঈর্ষাতুর চোখে তাকিয়ে আছে । বেশ সাড়া প'ড়ে গেছে তাদের মধ্যে । সরাইখানায় অভ্যাগত তখন নেহাৎ কম ছিলো না : এমন নয় যে কোনো ইংরেজ অফিসার নেপাল থেকে ফিরছেন, বা কোনো হিন্দু সওদাগর লাহোর বা পেশোয়ার পেরিয়ে সদলবল নিয়ে আফগানিস্তান যাবার উদ্যোগ করছে । সরাইখানায় ছিলেন গুজরাটের এক ছোটো রাজ্যের রাজা কুমার গুরু সিং, জাঁকজমক-সহকারে ভারত-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তিনি । একাই যে তিনি

সরাইখানার সবগুলি ঘরই দখল ক'রে ছিলেন তা নয়—আশপাশের কুটিরগুলোতেও তাঁর অনুচর পরিচারকদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিলো ।

কুমারের অনুচরদের সংখ্যা কম ক'রেও পাঁচশো হবে। বড়ো-বড়ো গাছের তলায় দুশো রথ দাঁড়িয়ে আছে সারি-সারি ; কোনো রথের বাহন জিব্রা, কতগুলো আবার মোষে টানে, তাছাড়া রয়েছে প্রকাণ্ড তিনটে হাতি—হাতিগুলোর উপর জমকালো হাওদা বসানো, আর ছিলো গোটা কুড়ি উটের একটা বহর । বহরে কিছুরই অভাব নেই—আছে ওস্তাদ গায়ক ও বাদ্যকর, তরুণী নর্তকী, এমনকী কয়েকজন বাজিকর—কুমারের অবসর বিনোদনের উপায় তারা । উপরন্তু আছে তিনশো বেহারা ও দুশো শান্ত্রী ।

কৌতূহলী হ'য়ে সন্ধেবেলায় আমি একবার কুমারের তাঁবুর আশপাশ থেকে ঘুরে এলুম । কিন্তু কুমারের দর্শন পাওয়া গেলো না । স্বাধীন রাজা তিনি, ইংরেজদের তোয়াক্কা করেন না, সহজে কি আর তাঁর দর্শন মেলে ?

ঠিক ছিলো, পরদিন সকালবেলায় আমরা রওনা হবো । পাঁচটায় কালু *বেহেমথের* চুল্লিতে আগুন জ্বালাবার উদ্যোগ করলে । আমরা একটা ছোট্ট ঝরনার ধারে বেড়াতে গেলুম । মিনিট চল্লিশ পরে বয়লার তপ্ত হ'য়ে ফোঁশ-ফোঁশ ক'রে উঠলো, স্টর যাত্রার উদ্যোগ ক'রে হাওদায় গিয়ে উঠে বসলো । এমন সময় জনা পাঁচ-ছয় ভারতীয় এসে হাজির । রেশমি কুর্তার উপর শাদা উত্তরীয় জড়ানো, মাথায় জরির কাজ-করা পাগড়ি : সঙ্গে জনা-বারো সেপাই—বন্দুক ও তলোয়ার হাতে । একজন শান্ত্রীর হাতে একটা সবুজ পাতার মুকুট, তার মানে এঁদের মধ্যে রাজবংশীয় কেউ আছেন ।

রাজবংশীয় ব্যক্তিটি আসলে স্বয়ং কুমারসাহেব । বয়েস তাঁর বোধকরি পঁয়ত্রিশ, মরাঠা আদল মুখে, চিবুক কঠোর ও তীক্ষ্ণ । কুমার আমাদের যেন তাঁর চর্মচক্ষুতে দেখতে পেলেন না । সোজা এগিয়ে গেলেন অতিকায় *বেহেমথের* দিকে—স্টর তখন *বেহেমথকে* আস্তে-আস্তে চালাচ্ছে । একটু তাকিয়ে রইলেন কুমার তার দিকে, তারপর স্টরকেই সরাসরি জিগেস করলেন, 'কে বানিয়েছে এটা ?'

স্টর আঙুল দিয়ে ব্যাঙ্কসকে দেখালো—ব্যাঙ্কস তখন পাশেই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সঙ্গে ।

কুমার গুরু সিং চমৎকার ইংরেজিতে আস্তে, যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ব্যাঙ্কসকে জিগেস করলেন, 'আপনি বানিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ, আমি,' বললে ব্যাঙ্কস !

'কে যেন বলেছিলো ভূটানের স্বর্গত রাজাসাহেবের একটা অদ্ভুত খেয়াল থেকেই...'

ব্যাঙ্কস ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে ।

কুমার একটু কাঁধ ঝাঁকালেন, 'যখন জ্যান্ত রক্ত-মাংসের হাতি পাওয়া যায়, তখন খামকা একটা কলের হাতি বানিয়ে কী লাভ ?'

'হয়তো,' বললে ব্যাঙ্কস, 'ভূটানের রাজা ভেবেছিলেন তাঁর হাতিশালার সব হাতির চেয়ে এটা অনেক শক্তিশালী হবে ।'

'ফুঃ !' কুমারের গলায় ঘৃণা ফুটে উঠলো, 'হাতির চেয়েও শক্তিশালী ? একটা তুচ্ছ কল ?'

'অনেক বেশি শক্তিশালী,' ব্যাঙ্কস আবার বললে ।

'আপনার হাতিগুলো একে গায়ের জোরে ধাক্কা দিয়েও একটু নড়াতে পারবে না,' হুড একটু অসহিষ্ণুভাবে ব'লে উঠলো ।

'আপনি বলছেন...!' কুমার বললেন ।

'আমার বন্ধু কেবল এ-কথাই বলতে চাচ্ছেন যে দশ জোড়া ঘোড়া আর আপনার ওই তিনটে হাতি যদি একসঙ্গে এই নকল হাতিটাকে নড়াবার চেষ্টা করে, তাহ'লেও একে একফুটও নড়াতে পারবে না,' ব্যাঙ্কস যেন প্রায় ছোটোখাটো একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললে ।

'এর একবর্ণও আমি বিশ্বাস করি না,' কুমারসাহেব ব'লে উঠলেন ।

'কিন্তু বিশ্বাস না-করলে আপনি ভুল করবেন,' হুড তক্ষুনি তাঁকে জানালে ।

কুমার এতক্ষণে তাঁর ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছুলেন । বিরোধিতা তাঁর ধাতে মোটেই সয় না ।

'তাহ'লে এখানেই কি আমরা একবার পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারি ?' কুমার জিগেস করলেন ।

'নিশ্চয়ই পারেন,' ব্যাঙ্কস বললে ।

কুমার গুরু সিং বললেন, 'একটা বাজি ধরলে হয় না ? আপনাদের হাতি যে পিছু হঠবে—'

'কে বললে, পিছু হঠবে,' হুড অসহিষ্ণুভাবে ব'লে উঠলো ।

'আমি বলছি,' গুরু সিং বললেন ।

'মহারাজ কত টাকা বাজি রাখতে চান ?' ব্যাঙ্কস মৃদুস্বরে জিগেস করলে ।

'চার হাজার—অবশ্যি সে-টাকা হারাতে যদি আপনাদের গায়ে না-লাগে ।'

বাজির অঙ্কটা নেহাৎ ফ্যালনা নয় । যদিও *বেহেমথের* জয় সম্বন্ধে তার কোনো সংশয় ছিলো না তবুও খামকা এমন ঝুঁকি নিতে চাচ্ছিলো না ব্যাঙ্কস ।

'রাজি নন তো ? সে আমি আগেই জানতুম,' কুমারের গলার স্বর বিদ্রূপে ভ'রে গেলো ।

'নিশ্চয়ই রাজি,' কর্নেল মানরো এতক্ষণে কথা বললেন ।

'তাহ'লে কর্নেল মানরো চার হাজর টাকা বাজি ধরছেন ?'

'মহারাজ যদি ইচ্ছে করেন, তাহ'লে দশ হাজার টাকা বাজি ধরতে পারি ।' কর্নেল মানরো জানালেন ।

'বেশ, তাহ'লে তা-ই হোক,' তক্ষুনি উত্তর দিলেন গুরু সিং ।

ব্যাঙ্কস সার এডওয়ার্ডের হাত চেপে ধ'রে ধন্যবাদ জানালে । রাজার অসহিষ্ণুতার উত্তরে সে যে দ্বিধায় পড়েছিলো, সার এডওয়ার্ড তাকে তার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন ।

কিন্তু তার ভুরু কুঁচকে গেলো একটু সংশয়ে—কে জানে তার এঞ্জিনের শক্তি সে সত্যি ক'রে জানে কিনা।

আমরা রাস্তার একপাশে স'রে দাঁড়ালুম। বাজির খবর শুনে অনেক ভারতীয় এসে ভিড় করেছিলো সেখানে। ব্যাঙ্কস নীরবে গিয়ে হাওদায় উঠে বসলো স্টরের পাশে। *বেহেমথের* শুঁড় থেকে একঝলক ধোঁয়া বেরিয়ে এলো।

ইতিমধ্যে কুমার গুরু সিং-এর ইঙ্গিতে একদল অনুচর গিয়ে রাজার প্রকাণ্ড হাতি তিনটিকে নিয়ে এসেছে। হাতিগুলোর পিঠে আর সেই জমকালো হাওদা নেই এখন। বাংলা দেশের বিখ্যাত হাতি দাক্ষিণাত্যের হস্তীকুলের চেয়ে অনেক প্রকাণ্ড ও শক্তিশালী। তিনটি মাহুত ব'সে আছে হাতির পিঠে, হাতে অঙ্কুশ—কিন্তু হাতিগুলো এত শিক্ষিত যে ইঙ্গিত করলেই চলে, অঙ্কুশ ব্যবহার করতে হয় না। হাতি তিনটি যখন রাজার সামনে দিয়ে গেলো, তখন যেটি যূথপতি—সবচেয়ে প্রকাণ্ড সেটা—হাঁটু গেড়ে বসলো রাজার সামনে, তারপরে শুঁড় তুলে তাঁকে অভিবাদন করলে। তারপর উঠে সঙ্গীদেরও নিয়ে এসে *বেহেমথের* সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে এবং কিঞ্চিৎ বোধহয় বিস্মিতই হ'লো এই অদ্ভুত হস্তীপ্রবরকে দেখে।

হুড ভারি অধীর হ'য়ে পড়েছিলো—কৌতূহলে ও উত্তেজনায়; সত্যি বলতে আমিও একটু বিচলিত হয়েছিলুম; কিন্তু মানরো নির্বিকার—কুমার গুরু সিং-এর চেয়েও অনেক বেশি নির্বিকার।

ব্যাঙ্কস উপর থেকে বললে, 'আমরা প্রস্তুত। মহারাজ যখনই বলবেন—'

'আমি এক্ষুনি বলবো,' কুমার ব'লে উঠলেন।

কুমার ইঙ্গিত করতেই মাহুতরা অদ্ভুত একটা শিস দিয়ে উঠলো, হাতি তিনটে টান হ'য়ে দাঁড়ালো, *বেহেমথ* একটু এগিয়ে এলো।

ব্যাঙ্কস শান্ত গলায় স্টরকে বললে, 'ব্রেক ঠেলে ধরো।'

তখুনি শুঁড় দিয়ে একটু ধোঁয়া বেরিয়ে এলো, আর *বেহেমথ* স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো—অবিচল ও অকম্পিত।

মাহুত তিনজন নানাভাবে উত্তেজিত করলো হাতিদের, তারাও সর্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে ধাক্কা দিলো *বেহেমথকে*—কিন্তু *বেহেমথ* যেন একটা অনড় পাহাড়——মাটি থেকে একটুও নড়লো না সে। কুমার গুরু সিং এত জোরে তাঁর ঠোঁট চেপে ধরলেন যে ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এলো। হুড হাততালি দিয়ে উঠলো।

ব্যাঙ্কস চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলে, 'এবার সামনে এগোও।'

অমনি আবার শুড় দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে এলো, আস্তে ঘুরে গেলো *বেহেমথের* চাকা—হাতি তিনটি আস্তে-আস্তে পিছু হঠতে লাগলো—আর অনিচ্ছুক পিছু-হঠার সাক্ষী র'য়ে গেলো মাটির উপর গভীর-ক'রে-আঁকা তাদের পায়ের ছাপ! তারপরে *বেহেমথ* যখন আরো জোরে এগুলো, পাশে উলটে প'ড়ে গেলো হাতি তিনটি—কোনো বাধাই দিতে পারলে না *বেহেমথকে*। হুড চীৎকারে তার উল্লাস প্রকাশ করলে। মানরো কী-একটা

ইঙ্গিত করলেন ব্যাঙ্কসকে । ব্যাঙ্কস ব্রেক টেনে *বেহেমথকে* আবার থামিয়ে দিলে ।

রাজার প্রকাণ্ড হাতি তিনটি তখন উলটে পড়েছে মাটিতে, চিৎপাত হ'য়ে আর অসহায় ভাবে শূন্যে দুলছে তাদের পা । কুমার ততক্ষণে সেখান থেকে চ'লে গেছেন : শক্তি পরীক্ষার শেষটুকু দেখবার জন্যে আর মিথ্যেমিথ্যি অপেক্ষা করেননি ।

বেহেমথ থামতেই হাতি তিনটি করুণ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালে, তারপর যখন *বেহেমথের* পাশ দিয়ে সরাইয়ের দিকে আবার ফিরে যাচ্ছে তখন যূথপতিটি আবার হাঁটু গেড়ে বসলো, শুঁড় শূন্যে তুলে অভিবাদন করলে *বেহেমথকে* : পরাজয় স্বীকার করায় তার কোনো লজ্জা নেই, জয়ীর সম্মান সে দিতে জানে ।

একটু পরেই রাজার এক অনুচর এসে টাকার থলি তুলে দিলে মানরোর হাতে —মানরো থলিটা নিলেন বটে, তারপর মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে বললেন, 'মহারাজের অনুচরদের জন্যে আমাদের বখশিশ রইলো ।' ব'লে ধীরে গিয়ে তিনি স্টীম হাউসে উঠে পড়লেন ।

বেহেমথ ততক্ষণে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে । একটু পরেই আমরা রওনা হ'য়ে পড়লুম । এবার স্পষ্টই উৎরাই ধ'রে যেতে হবে ; কুমার গুরু সিং-এর শিবির আর সরাই খানিক পরেই পিছনে মিলিয়ে গেলো ।

পঁচিশে জুন যখন একটানা সাত দিন এগুবার পর *বেহেমথ* একটি পাহাড়ি নদীর পাড়ে থামলো, তখন আমরা সমুদ্রতল থেকে ছ-হাজার ফিট উপরে এসে পৌঁছেছি —ঠিক ধবলগিরির তলায় থেমেছে *বেহেমথ,* যার চুড়ো উঠে গেছে ২৭০০০ ফুট উপরে । কলকাতা থেকে প্রায় একহাজার মাইল দূরে এসে আমাদের উত্তর ভারত ভ্রমণের এই প্রথম পর্যায় শেষ হ'লো । এবার এই নেপালের বিষম জঙ্গলে আমাদের জন্যে কী অপেক্ষা ক'রে আছে, কে জানে ? কর্নেল মানরোর সঙ্গে তাঁর চিরশত্রু নানাসাহেবের সাক্ষাৎ হবে কি এখানে ? না কি তাঁর কাছে পুরো যাত্রাটাই মনে হবে বুনোহাঁসের পিছন-ধাওয়া ? কারণ নানাসাহেবের মৃত্যুর সংবাদ তাঁর যে মোটেই বিশ্বাস হয়নি, তা আমি কেন যেন সারাক্ষণই অনুভব করতে পারছিলুম ।

—মঁসিয় মোক্লের-এর দিনপঞ্জি আপাতত এখানেই শেষ—

১২

বহ্নিশিখা

এতদূর পর্যন্ত আমরা মঁসিয় মোক্লের-এর বিবরণী অনুসরণ ক'রে তিব্বতের পাদদেশে এসে দাঁড়িয়েছি। শীতকালটা তারা এখানেই শিবির ক'রে কাটাবে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে আমাদের গল্পের অন্য যে-পটটি উন্মোচিত হয়েছিলো এবার তার দিকেই একটু ফেরা যাক।

বেহেমথ যখন এলাহাবাদে পৌঁছোয়, তখন কী হয়েছিলো পাঠকদের নিশ্চয়ই তা মনে আছে। সেখানেই পঁচিশে মে-র একটি কাগজ থেকে কর্নেল মানরো নানাসাহেবের মৃত্যুর খবর পান। কিন্তু সত্যি কি অবশেষে এই অগ্নিগর্ভ পুরুষটি ছোট্ট একটি খণ্ডযুদ্ধে সাতপুরা পাহাড়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন ? না কি অন্য অনেকবার যেমন সত্যি-মিথ্যে গুজব ছড়িয়েছিলো, এটা তেমনি কোনো-কিছু ? এটা অবশ্য আমরা নিজেরাই আন্দাজ ক'রে নিতে পারবো যদি আবার সাতই মার্চের রাত্রিবেলায় অজন্তার গুহা থেকে বেরিয়ে-পড়া নানাসাহেব, বালাজি রাও ও তাঁর অনুচরদের পিছন-পিছন খানিকটা অনুসরণ ক'রে আসি।

সুরাটের কাছে সমুদ্রে পড়েছে তাপ্তী নদী ; কিন্তু যেখানে তার উৎস, সেখানে, তাকে ডিঙিয়ে, অজন্তা থেকে একশো মাইল দূরে, সাতপুরা পর্বতের এক গিরিখাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন নানাসাহেব—একটানা ষাট ঘণ্টা ঘোড়া ছুটিয়ে এতদূরে এসেছেন তাঁরা। জায়গাটা গণ্ডোয়ানার কাছে : গণ্ডোয়ানার পরিধি দুশো বর্গমাইল—তিরিশ লাখের উপর বাসিন্দা এখানকার—মূলত আদিবাসীদের দ্বারাই অধ্যুষিত। আর এরা এতদিন ছিলো বন্য, তবে ঈষৎ শান্ত হয়েছে ইদানীং—কিন্তু ঠিকমতো ফুলকি ছড়াতে পারলে বিস্ফোরণ ঘটাতে কতক্ষণ ? ক্ষিপ্রতায় এদের তুলনা নেই, গেরিলা যুদ্ধে এদের জুড়ি মেলে না। এরা যদি একবার নানাসাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁর অঙ্গুলিহেলনে বিদ্রোহ করে, তাহ'লে সন্দেহ নেই ইংরেজদের বিষম বেগ পেতে হবে। গণ্ডোয়ানার উত্তরে বুন্দেলখণ্ড ; বিন্ধ্য পাহাড়ের কোলে, যমুনার তীরে, এই পার্বত্য প্রদেশে নিবিড় অরণ্যে বাস করে আরেক দল প্রচণ্ড মানুষ—একদা টিপু সুলতানের হ'য়ে লড়াই ক'রে এরা বিদেশীদের প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলো। আর গণ্ডোয়ানার পূর্বে থাকে কোণ্ডরা, পশ্চিমে ভীল উপজাতি। কাজেই এইসব পার্বত্য জাতির মধ্যে আগুন ছিটোতে হ'লে যে-জায়গাটার আশ্রয় নিলে সবচেয়ে ভালো হয়, অনেক ভেবেচিন্তে শেষটায় নানাসাহেব এসে আশ্রয় নিয়েছেন সেখানেই।

পাশেই নর্মদার তীরে ছোট্ট একটা অজ পাড়াগাঁ ছিলো এককালে—এখন সেখানে কোনো বসতি নেই। সংকীর্ণ গিরিখাত দিয়ে ঘেরা সুরক্ষিত একটি অঞ্চল। গিরিজন

আদিবাসীরা বলে সেখানে নাকি এক পাগলি ঘুরে বেড়ায় কেবল—তিন বছর ধ'রে ওই পাগলি ওখানে আছে—একা-একা থাকে, আপন মনেই বিড়বিড় ক'রে সারাক্ষণ কী যেন বকে, লোকের সামনে চুপ ক'রে থাকে—সে-যে কোনদেশী স্ত্রীলোক কেউ জানে না—রাতের বেলায় মশাল হাতে তাকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় ব'লে লোকে তার নাম দিয়েছে *বহ্নিশিখা* ।

তার সম্বন্ধে নানা আশ্চর্য গুজব শুনে বালাজি রাও অনেক খবর নিলেন । কিন্তু না, একেবারে উন্মাদিনী সে, চোখে শূন্য দৃষ্টি, কানে যেন কোনো অস্ফুটভাষা শোনে, বিড়বিড় ক'রে কথা কয়, বদ্ধ উন্মাদ । এক অর্থে জীবন্মৃত । যেন কোনো অকথ্য বিভীষিকা তাকে স্বাভাবিক জগৎ থেকে কোনো অপার্থিব দুঃস্বপ্নের কোলে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে—যেখানে কোনো ভাষা নেই, দৃশ্য নেই, শব্দ নেই—যেটা নিতান্তই এক ইন্দ্রিয়হীন ভীষণ জগৎ যেন । এককালে রূপসী ছিলো, গৌরতনুতে তারই ক্ষীণ আভাস—কিন্তু সে-যে কোনকালে তা কেউ জানে না ।

পাহাড়িরা নিরীহ গোবেচারিদের দয়া দেখায় । বহ্নিশিখাকেও কেউ কিছু বলে না । খেতে দেয়, আশ্রয় দেয়, ঘুরে বেড়াতে দেয় ইতস্তত । কিন্তু কে এই রহস্যময়ী ? কতদিন ধ'রে সে এমনি উন্মাদের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে ? কোত্থেকে সে এসেছে ? প্রথম কবে এলো সে গণ্ডোয়ানায় ? কেন তার হাতে জ্বলন্ত মশাল থাকে সবসময় ? কেউ এ-সব প্রশ্নের উত্তর জানে না । মাঝে-মাঝে কয়েক মাস আবার তার কোনো খোঁজই থাকে না । কোথায় যায় সে তখন ? বিন্ধ্য-সাতপুরার পাহাড়ি জায়গা ছেড়ে চ'লে যায় সে ? বুন্দেলখণ্ডে যায় ? মালবে ? কেউ জানে না । অনেক সময় আদিবাসীরা ভেবেছে বুঝি সে ম'রেই গিয়েছে । কিন্তু হঠাৎ একরাতে আবার মশাল হাতে ফিরে এসেছে এই উন্মাদিনী । আসলে সে যেন কোনো চলন্ত প্রস্তরমূর্তি—তার মন ম'রে গেছে কবেই—এখন কবে এই জীর্ণ মনুষ্যদেহ পোকায় কাটে, তা-ই বাকি আছে ।

নানাসাহেবেরা যখন তাপ্তীর তীরে পৌঁছলেন, তখন বহ্নিশিখা আবার নিরুদ্দেশ । বালাজি রাও তার সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করলেন, কিন্তু শেষটায় সবটাই তাঁর মনে হ'লো আদিবাসীদের ভয়ার্ত কল্পনার অমূলক বিলাস । কারণ এক মাস কেটে গেলো--তবু সেখানে তার কোনো খোঁজ নেই । সেইজন্যেই নানাসাহেবের কাছে বহ্নিশিখার কথা তিনি খুলে বললেন না ।

+

পুরো একমাস—১২ই মার্চ থেকে ১২ই এপ্রিল পর্যন্ত—নানাসাহেব ওই সংকীর্ণ গিরিসংকটে আত্মগোপন ক'রে ছিলেন । উদ্দেশ্য : ইংরেজরা যাতে তাঁর কোনো হদিশ না-পেয়ে ভাবে যে তিনি নিশ্চয়ই মারা গেছেন, আর নয়তো বুনো হাঁসের পিছনে অন্যদিকে ধাওয়া ক'রে চ'লে যায় । দিনের বেলায় দুই ভাই ঘাঁটি ছেড়ে ককখনো বেরুতেন না : রাত্রে অন্ধকারে গা ঢেকে নর্মদার তীর ধ'রে দু-ভাই গ্রাম থেকে গ্রামে আদিবাসীদের মধ্যে আগুন ছিটোতে বেরুতেন—সকালে ফিরে এসে দু-ভাই আবার

আলোচনায় বসতেন কেমন ক'রে সাতপুরা ও বিন্ধ্যপর্বতের অগ্নিশিখা সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে দেয়া যায়। পুরো সিন্ধিয়া রাজ্যে, আর ভোপাল, মালব ও বুন্দেলখণ্ডে যাতে এক বিপুল বহ্ন্যুৎসব শুরু হয় তারই প্রস্তুতি চললো ধীরে, গোপনে, নিয়তির মতোই অনিবার্য যেন তার বেগ। যাতে সমস্তটাই একসঙ্গে একটা বারুদের স্তূপের মতো বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে, এই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য।

কেটে গেলো একটি মাস। ততদিনে বম্বাই প্রেসিডেন্সির রাজ্যপাল ধুন্ধুপন্থের কোনো হদিশ না-পেয়ে আশা ছেড়ে দিয়েছেন, ভেবেছেন যে নিতান্তই একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হ'য়ে তিনি ধুন্ধুপন্থের মাথার দাম হেঁকেছেন। কোনো উশকানি বা নতুন জনরব না-পেয়ে লোকের উৎসাহও ধীরে-ধীরে স্তিমিত হ'য়ে গেলো। আর গুপ্তচরেরা যখন একদিন এই খবর এনে দিলে, নানাসাহেব বেরুলেন বিদ্রোহের বীজ ছিটোতে।

১১ই এপ্রিল তাঁকে দেখা গেলো ইন্দোরে ; ১৯শে এপ্রিল শুয়ারিতে ; ২৪শে এপ্রিল মালব প্রদেশের প্রধান শহর ভীলশায় ; ২৭শে তারিখ গেলেন রাজঘর, ৩০শে সাগর-নগরে ; নর্মদার উপত্যকায় ফিরে-আসার আগে পুনে যেতে ভুললেন না ; সব শেষে গেলেন ভোপালে।

ভোপাল মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল—সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানে আগুন জ্বলেনি। নানাসাহেব আর বালাজি রাও ভোপাল পৌঁছুলেন ২৪শে মে ; সেদিন ছিলো মহরমের উৎসব ; রাস্তায় মিছিল আর শোভাযাত্রা, তাজিয়া বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে হস্তিবাহিনী, 'হা হাসান ! হা হোসেন !' ব'লে চীৎকার উঠছে থেকে-থেকে। আর তারই মধ্যে গণ্ডোয়ানার জনা-বারো গিরিজন পরিবৃত হ'য়ে যোগীবেশে নানাসাহেব ও বালাজি রাও এগিয়ে যাচ্ছেন ভোপালের রাস্তা দিয়ে। সন্ধ্যা আসন্ন, অন্ধকার হ'য়ে আসছে। এমন সময় কে যেন নানাসাহেবের কাঁধে আস্তে আলতো ক'রে হাত রাখলে। ফিরে তাকিয়ে তিনি দ্যাখেন একটি বাঙালি দাঁড়িয়ে আছে ; নানাসাহেব তাকে চিনতে পারলেন ; বিদ্রোহের সময় এই বাঙালিটি একটি ছোট্ট বাহিনীর নেতৃত্ব নিয়েছিলো। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন নানাসাহেব। বাঙালি যুবকটি ফিশফিশ ক'রে বললে, 'কর্নেল মানরো কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন।'

'কোথায় আছে সে এখন ?'

'তাঁকে কাল বারাণসীতে দেখেছি।'

'কোথায় যাচ্ছে ?'

'নেপালের সীমান্তে।'

'মৎলব ?'

'কয়েক মাস থাকবেন বোধহয় সেখানে।'

'আর তারপর ?'

'বম্বাই ফিরবেন।'

তীক্ষ্ণ একটা শিসের শব্দ শোনা গেলো। অমনি ভিড়ের মধ্য থেকে একটি লোক

এসে নানাসাহেবের সামনে দাঁড়ালে । সে আর-কেউ নয়—কালোগনি ।

'এক্ষুনি যাও,' বললেন নানাসাহেব, 'গিয়ে নেপালের পথে মানরোর দলে যোগ দাও । তার কোনো উপকার করো—দরকার হ'লে নিজের জীবন বিপন্ন করতেও পেছ-পা হোয়ো না । বিন্ধ্যপর্বতের কাছাকাছি না-আসা অব্দি কিছুতেই তার সঙ্গ ছেড়ো না । তারপর যখন সে নর্মদার উপত্যকায় এসে পৌঁছুবে—তখন—শুধু তখনই এসে আমাকে তার কথা জানিয়ে যাবে ।'

কালোগনি ঘাড় নেড়ে তক্ষুনি ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলো । দশ মিনিটের মধ্যে ভোপাল ছেড়ে সে বেরিয়ে পড়লো । আর নানাসাহেব ফিরে এলেন নর্মদার উপত্যকার দিকে—তাঁর গোপন ঘাঁটির উদ্দেশে । । পথে সারাক্ষণ নানাসাহেব চুপ ক'রে কেবল ভাবলেন মানরোর কথা ; না-জেনে সে কেমন ক'রে ক্রমশ তাঁর কবলে এসে পড়বে —যেমন ক'রে ময়ালের টানে তার মুখের কাছে এগিয়ে আসে নিরীহ জীবজন্তু । বালাজি রাওকে পর্যন্ত এ-সম্বন্ধে এতক্ষণে কিছু বলেননি । তারপর যখন পাহাড়ের মাঝখানে পরিচিত বন্যপথে এসে বিশ্রামের জন্যে ঘোড়া থামিয়েছেন, তখন তিনি আস্তে-আস্তে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেন ।

'মানরো কলকাতা থেকে বেরিয়েছে । বম্বাই আসবে নাকি শিগগিরই ।'

'বম্বাইয়ের রাস্তা একেবারে ভারত মহাসাগরে গিয়ে পড়েছে,' বালাজি রাও বললেন ।

'এবার বম্বাইয়ের রাস্তা,' নানাসাহেব স্পষ্ট ক'রে জানালেন, 'বিন্ধ্য পর্বতে গিয়ে শেষ হবে ।'

এই উত্তর আর ব্যাখ্যা করার দরকার পড়ে না ।

তখন সকালবেলা । একটা পাহাড়ি নদীর কাছে তাঁরা নেমেছেন ; এবার নদীতীর ধ'রে উঠে যাবেন । অনুচররা ঘোড়াগুলো নিয়ে আগেই এগিয়ে গেছে । চারদিক এত স্তব্ধ যে নদীর জলের ছন্দ শুনে-শুনে পাহাড় যেন তখনও ঘুমিয়ে আছে । হঠাৎ এমন সময় 'গুড়ুম' ক'রে আওয়াজ হ'লো—তারপরেই এক সঙ্গে আরো-কতগুলো বন্দুক গ'র্জে উঠলো ।

জনা-পঞ্চাশ গোরা সেপাই নিয়ে এক ইংরেজ অফিসার বন্দুক হাতে নেমে আসছে ভাটির দিকে । 'কেউ যেন পালাতে না-পারে, গুলি চালাও,' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলে বাহিনীর নেতা ।

একসঙ্গে আরেকবার গ'র্জে উঠলো বন্দুকগুলো, মাটিতে ছিটকে পড়লো কয়েকটি অনুচর । মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই পাহাড়ি নদীর জলে—আর স্রোত তাদের মুহূর্তে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো । কোলাহল ক'রে এগিয়ে এলো গোরা সৈন্যরা । এমন সময় ওই মুমূর্ষুর স্তূপের মধ্য থেকে একজন মাথা তুলে ভাঙা গলায় অভিসম্পাত দিলে, 'বিদেশীরা নিপাত যাক !' তার কষ বেয়ে রক্ত বেরিয়ে গেলো গলগল ক'রে, আর অসাড় দেহটা প'ড়ে গেলো মাটিতে ।

বাহিনীর নেতা এগিয়ে এলেন।

'এই কি নানাসাহেব ?'

'হ্যাঁ, এই-ই নানাসাহেব,' দুটি ফিরিঙ্গি জানালে—তারা কানপুরে ছিলো এক সময়, নানাসাহেবকে চিনতো।

'তাহ'লে এবার অন্যদের পাকড়াতে হবে।'

পিছন ধাওয়া ক'রে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেলো সেই সমরবাহিনী।

আর তারা জঙ্গলের মধ্যে মেলাতে না-মেলাতেই একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এক ছায়ামূর্তি—সে আর-কেউ নয়, বহ্নিশিখা।

আগের দিন সন্ধেবেলায় এই বহ্নিশিখাই নিজের আগোচরে ইংরেজ বাহিনীটির অচেতন পথপ্রদর্শক হয়েছিলো। নর্মদার উপত্যকায় সে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো একাকিনী, উদ্দেশ্যহীনা—আর উপজাতিরা যাকে বোকা ভাবতো বিড়বিড় ক'রে বারে-বারে সেই উন্মাদিনী আওড়াচ্ছিলো একটি নাম, জপমালার মতো : 'নানাসাহেব ! নানাসাহেব।' ফিরিঙ্গিদের নেতা সচমকে এই নাম শুনেই তাকে অনুসরণ করার আদেশ দেন। কিন্তু উন্মাদিনী যেন তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সচেতন ছিলো না—তাদের কোলাহল যেন একবারও তার কানে পৌঁছোয়নি, তাদের বাহিনী তার চোখে পড়েনি—তার সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন সংহত হ'য়ে কেবল একটি নামই বারে-বারে উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছে, 'নানাসাহেব !' আর তার পিছন-পিছন এসেই অবশেষে এই বাহিনী নানাসাহেবদের মুখোমুখি পড়ে, গ'র্জে ওঠে বন্দুক, ভাঙা গলায় সাতপুরা বিন্ধ্যের পাহাড়ের কোলে রক্তরাঙা কথা কটি শোনা যায় : 'বিদেশীরা নিপাত যাক।'

এর বিবরণই এলাহাবাদে ব'সে ২৬শে মে সন্ধেবেলা খবরকাগজে পড়েছিলেন কর্নেল মানরো, কারণ খবরটা তারযোগে বম্বাই থেকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে দমকা হাওয়ার মতো।

বহ্নিশিখার চোখের তারায় অদ্ভুত এক আলো জ্ব'লে উঠেছে ; মৃতদেহের স্তূপের কাছে এসে সে ঝুঁকে দাঁড়ালে ; তাকিয়ে দেখলে সেই মরণপণ-করা মানুষটির মৃতদেহ—তার সর্বাঙ্গ জুড়ে বিদেশীদের জন্য ঘৃণা। উন্মাদিনী পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো ; বুকের যেখানে গুলি বিঁধেছে সেখানে হাত রাখলে ; রক্তে তার ছিন্নবসন রাঙা হ'য়ে গেলো, কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই, অপলকে সে তাকিয়ে আছে সেই কুলিশকঠোর মরাঠা মুখটির দিকে। তারপর ধীরে-ধীরে সে উঠে দাঁড়ালে, মাথা নাড়ালে কয়েকবার, আপনমনেই—যেন গাছপালা পাহাড় জলের কাছে কিছু বলতে চায় সে, তারপর ধীরে-ধীরে হেঁটে গেলো জঙ্গলের কালো পথে। আবার এক গভীর ঔদাসীন্য তাকে ঢেকে ফেললে আগাগোড়া। আর শোনা গেলো না তার মুখ থেকে কানপুরের সেই রক্তরাঙা নামটা।

২

শার্দুল ও শয়তান

আবার মঁসিয় মোক্লের-এর বিবরণী থেকে

১

মাতিয়াস ফান খোইত

আমাদের শিবির বসানো হয়েছে ধবলগিরির তলদেশে, সমুদ্রতল থেকে প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচুতে, কলকাতা থেকে একহাজার মাইল দূরে। আমাদের ভ্রমণের প্রথম পর্যায় এখানে এসেই শেষ হয়েছে ; কয়েক সপ্তাহ বিশ্রাম গ্রহণ ক'রে অতঃপর আমরা যাবো দক্ষিণাপথে—কর্নেল মানরো পুনরায় অক্লান্ত সন্ধানে বেরুবেন তাঁর চিরশত্রু নানাসাহেবের। জানি না কোনোদিন এঁরা দুজনে পরস্পরের মুখোমুখি হবেন কিনা — হয়তো পুরোটাই এক-অর্থে বন্যহংসের পশ্চাদ্ধাবন : তবু কর্নেল মানরোর পরিকল্পনার কোনো প্রতিবাদ আমরা করিনি। হয়তো ধীরে-ধীরে সমগ্র ভারত ভূখণ্ড ভ্রমণ ক'রে আসার পর তাঁর এই জ্বালা ও যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হবে। নানাসাহেব যদি সত্যি নেপালে আশ্রয় নিয়ে থাকেন, যদি তিব্বতের সীমান্তে তরাইয়ের জঙ্গলে সেই বিদ্রোহী মানুষটি জ্বলন্ত মশালের মতো জ্ব'লে-জ্ব'লে ঘুরে বেড়ান, তাহ'লে এই জায়গাটিই যে তাঁর দেখা পাবার পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত ও অনুকূল স্থল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষের জীবন অত্যন্ত রহস্যময়—ভবিষ্যৎ কখন যে কাকে কী দেয়, তা কেউ বলতে পারে না। হয়তো সেই রহস্যধূসর ভবিতব্যের প্রতীক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর-কিছুই করণীয় নেই। তবু মাঝে-মাঝে সার এডওয়ার্ডের গম্ভীর ও থমথমে মুখের দিকে তাকালে আমার বুকের ভিতরটা যেন কেমন ক'রে ওঠে। কী-একটা চাপা বেদনা ও জ্বালা এই মানুষটিকে যুগপৎ কী-রকম অস্থির ও নিশ্চিন্ত ক'রে রেখেছে।

এই অবস্থার মধ্যে একঝলক টাটকা হাওয়ার মতো হ'লো ক্যাপ্টেন হুড। মানুষটি ভালোবাসে হই-চই ও হাস্যরোল, লোকটা সে ছটফটে ও জ্যান্ত ; প্রতিমুহূর্তেই অদ্ভুত কোনো-কিছুর পরিকল্পনা ক'রে যাচ্ছে। সার এডওয়ার্ডের সম্পূর্ণ উলটো বলা যায় তাকে। ভালোবাসে তর্কাতর্কি ও উত্তেজনা—নানা বিষয়ে কৌতূহল ও শখ রয়েছে—সার এডওয়ার্ডের মতো অমন একরোখা নয়। কেবল শার্দুলশিকারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হ'লেই মানুষটি মুহূর্তে কীভাবে যেন একেবারে অন্যরকম হ'য়ে যায়। পঞ্চাশ নম্বর বাঘ তার চাই-ই—শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে এটাই বারে-বারে সে ঘোষণা করে। এবং তার অনুচর ফক্স প্রত্যাশায় জ্বলজ্বলে হ'য়ে ওঠে।

ব্যাঙ্কস বোধহয় কর্মসূত্রে সারা ভারতবর্ষ চ'ষে ফেলেছিলো। উপরন্তু এঞ্জিনিয়ার মানুষ, বিশেষ ক'রে রেলে কর্ম করে ব'লেই ভারতের সব অঞ্চলের খবর রাখে। সে-ই আমাদের বোঝালে যে আমরা যেখানে শিবির ফেলেছি, সে-জায়গাটা শিমলা কিংবা দার্জিলিং-এর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। 'শিমলা অনেকটা স্যুইৎজারল্যাণ্ডের মতো, সুতরাং আমাদের কাছে সে ততটা নতুন নয়,' বললে সে, 'আর দার্জিলিং-এর গৌরব হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার ঝলমলে শিখর—কিন্তু বৃষ্টি বা কুয়াশায় সেটা প্রায় সবসময়েই এমন লুকিয়ে থাকে যে কাঞ্চনজঙ্ঘার অভ্যুদয় আমাদের চোখের সামনে কতদিনে হ'তো কে জানে। তার চেয়ে ধবলগিরিই বা মন্দ কী ?'

'ধবলগিরি আশ্চর্য !' সেদিনই স্বচ্ছ স্পষ্ট সকালবেলায় ধবলগিরি উন্মোচিত হয়েছিলো আমাদের সামনে—সেই আশ্চর্য তুষারমৌলি গিরিশৃঙ্গের উজ্জ্বল দৃশ্যটি আমি কোনোদিনও ভুলবো কি না কে জানে।

'তাছাড়া,' ব্যাঙ্কস আরও বললে, 'এখানে শিবির ফেলে আমরা অন্যদিক থেকেও ভালো করেছি, মোক্লের। রাস্তাটা এখানে পাহাড়ের গায়ে দুটো ভাগ হ'য়ে গেছে—পুবে আর পশ্চিমে। আর তারই ফলে আশপাশের ছোটো-ছোটো পাহাড়ি গ্রামগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে আমাদের মোটেই বেগ পেতে হবে না। সবচেয়ে কাছের গ্রামটা আমাদের স্টীম হাউস থেকে মাত্র মাইল পাঁচেক দূরে। এখানকার পাহাড়ি মানুষেরা বেশ অতিথিবৎসল—ছাগল আর ভেড়া পোষে, শটি আর গম ফলায়—প্রয়োজন হ'লে অনায়াসেই আমরা তাদের সাহায্য নিতে পারবো।'

বেহেমথ যেখানটায় আস্তানা গেড়েছে, সেটা একটা মালভূমি—মাইল খানেক লম্বা আর আধমাইলটাক চওড়া। ছোটো-ছোটো ঘন মখমলের মতো ঘাসেভরা জায়গাটা ; কোথাও-কোথাও ভায়োলেট ফুটে আছে, কোথাও-বা রডোডেনড্রনের গুচ্ছ ; ফুটেছে ক্যামেলিয়াও ; আর কোথাও সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা ওকগাছ। এই সুন্দর বাগানটার পরিকল্পনা করার জন্য প্রকৃতি-ঠাকরুনকে স্মার্না কি ইস্পাহানের মালি ডাকতে হয়নি : বরং দখিনা হাওয়ায় উড়ে এসেছে কিছু বীজ, আর এই উর্বর ভূমিতে ঝরেছে কিছু রোদ-বৃষ্টি—আর সব মিলিয়ে আপনা থেকেই যেন তৈরি হয়েছে এই সুন্দর ভূদৃশ্য।

একপাশে চ'লে গেছে ঘন বন—প্রায় আঠারো হাজার ফুট অব্দি উঠে গেছে এই নিবিড় বনানী। ওক, সিডার, বীচ, মেপল গাছের সঙ্গেই কোথাও সহাবস্থান করছে বেণুবন, কোথাও-বা কলাগাছের ঝাড়, জাপানি ডুমুর গাছ। এ-রকমই একটা ছোট্ট শাখাঝোপের ছায়ায় *বেহেমথ* জিরিয়ে নেবে কয়েক সপ্তাহ—তার সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও।

মঁসিয় পারাজারের খানাঘর থেকে সুগন্ধি ধোঁয়া ওঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে, আমরা *চলন্ত বাড়ির* বারান্দায় ব'সে-ব'সে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রোদ পোহাই আর জমাট আড্ডা দিই, মাঝে-মাঝে ধবলগিরির গগনভেদী চুড়ো চোখে পড়ে, যখন হাওয়া এসে নিচু ভারি ঝোলামেঘ আর কুয়াশা সরিয়ে দেয়।

এইভাবেই ধবলগিরিতে আমাদের ছুটি শুরু হ'লো।

+

২৬শে জুন সকালবেলায় আমার ঘুম ভাঙলো ক্যাপ্টেন হুড আর ফক্সের জ্যান্ত সংলাপ শুনে—খাবার ঘরে ব'সে তারা শশব্যস্ত ও উত্তেজিত আলোচনায় মগ্ন ছিলো। আমিও গিয়ে তাদের বৈঠকে যোগদান করলুম। ব্যাঙ্কসও তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তক্ষুনি সে-ঘরে ঢুকলো। তাকে দেখেই হুড ব'লে উঠলো : 'কী-হে ব্যাঙ্কস, তাহ'লে এখানে আর নেহাৎ দু-এক ঘণ্টার বিশ্রাম নয়—আস্ত কয়েকটি মাস কাটাতে হবে আমাদের ?'

'ঠিকই বলেছো, হুড,' চেয়ার টেনে বসতে-বসতে ব্যাঙ্কস জবাব দিলে, 'এবার ইচ্ছে-করলে তোমরা শিকারে বেরুতে পারো—*বেহেমথের* বাঁশি শুনে তোমাদের আর তাড়াহুড়ো ক'রে ফিরে আসতে হবে না।'

'শুনলে তো, ফক্স ?'

'শুনলুম, ক্যাপ্টেন,' ফক্স জানালে।

হুড বললে, 'এই তোমাদের ব'লে রাখছি, ব্যাঙ্কস, আমার ওই পঞ্চাশ নম্বরটাকে ঘায়েল না-ক'রে এই ধবলগিরি থেকে আমি আর নড়ছি না। পঞ্চাশ নম্বরটাকে চাই, ফক্স, চাই-ই। আমি ঠিক জানি হতভাগাকে ঘায়েল করা তেমন সহজ কর্ম হবে না!'

'তবু ঘায়েল তাকে করবোই আমরা,' ফক্স বিনীতভাবে জানিয়ে দিলে।

আমি জিগেস করলুম, 'কী ক'রে বুঝলে যে তাকে ঘায়েল করা তেমন সহজ হবে না ?'

'নেহাৎই আমার ধারণা, মোক্লের, তার বেশি কিছু নয়। শিকারিদের মাথায় মাঝে-মাঝে আগে থেকেই অমন ধারণা ঢুকে বসে।'

'তাহ'লে তুমি আজ থেকেই বুঝি,' ব্যাঙ্কস জিগেস করলে, 'শিকারে বেরুবার মৎলব আঁটছো ?'

'আজ থেকেই শিকারের যাবতীয় শুলুক-সন্ধান নিতে হবে—তরাইয়ের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকতে হবে ময়না তদন্ত করতে। আগে তো গিয়ে দেখতে হবে বাঘেরা আমার আগমন-বার্তায় ডেরা ছেড়ে পালিয়েছে কি না ?'

'শোনো, কথা শোনো, কী অহংকার !'

'অহংকার নয়—আমার দুর্ভাগ্যের কথা বলছি !'

'দুর্ভাগ্য ! হিমালয়ের জঙ্গলে ? তাও কি সম্ভব ?' জিগেস করলে ব্যাঙ্কস।

'দেখাই যাবে শিগগিরই !' হুড আমার দিকে ফিরলো। 'তুমিও সঙ্গে যাবে তো, মোক্লের ?'

'নিশ্চয়ই যাবো।'

'আর তুমি, ব্যাঙ্কস ?'

'আমিও যাবো,' বললে ব্যাঙ্কস, 'আর আমার মনে হয় মানরোও সঙ্গে যেতে চাইবেন—অবশ্য আমার মতো, অ্যামেচার হিশেবে, পেশাদার শিকারি হিশেবে নয়।'

'তা অ্যামেচার হিশেবে আসতে চাও আপত্তি নেই, তবে সঙ্গে গুলিভরা রাইফেল রেখো। ছড়ি ঘোরাতে-ঘোরাতে শৌখিন ফুলবাবুটির মতো জঙ্গলে যাবার মানে হয় না —লজ্জায়-অপমানে সব জন্তুই শেষটায় মুখ লুকোবে।'

'তা-ই হবে তাহ'লে,' ব্যাঙ্কস সম্মতি জানালে।

'এবারে কিন্তু, ফক্স, দেখো, কোনো ভুল যেন না-হয়। খেয়াল রেখো। আমরা কিন্তু এবার বাঘের তল্লাটে। কর্নেল, ব্যাঙ্কস, মঁসিয় মোক্লের আর আমার জন্যে চারটে এনফিল্ড রাইফেল, তোমার আর গৌমির জন্যে দুটো বুলেটভরা বন্দুক!'

'ভয় নেই, ক্যাপ্টেন,' ফক্স তাকে আশ্বাস দিলে, 'বাঘেরা নালিশ করার কোনো সময় বা কারণই পাবে না, এটাই আপনাকে জানিয়ে রাখছি!'

বেলা এগারোটা নাগাদ, অতএব, আমরা ছ-জনে যথাবিধি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জঙ্গলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম; কুকুর দুটোকে সঙ্গে নেয়া হ'লো না—কারণ এ-ধরনের শিকারে কুকুরেরা কোনো কাজেই লাগে না। স্টর, কালু আর মঁসিয় পারাজারকে নিয়ে সার্জেন্ট ম্যাক-নীল *বেহেমথেই* থেকে গেলো—সব গোছগাছ করার জন্যে। তাছাড়া এই দু-মাস একটানা চলবার পর *বেহেমথের* কলকব্জা সাফসুফ ক'রে রাখা দরকার। কোথাও কিছু বিকল হয়ে গেছে কিনা, পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে। সেজন্যে অবিশ্যি, বলাই বাহুল্য, অনেক সময় লাগবে, কারণ ভালো ক'রে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখাই ভালো। আর সে-কাজে স্টর ও কালুর সাহায্য প্রতি মুহূর্তেই কাজে লাগবে।

বৃষ্টিবাদল নেই, পরিষ্কার উজ্জ্বল দিন। পাহাড়ি পথ, পাকদণ্ডী বেয়ে ঘুরে-ঘুরে নেমে গেছে জঙ্গলের দিকে। আমাদের অবিশ্যি হাঁটতে ভালোই লাগলো, যদিও সত্যিকার জঙ্গলে গিয়ে ঢুকতে সময় লাগলো পাক্কা দেড় ঘণ্টা!

জঙ্গলে ঢোকবার আগে হুড আমাদের সবাইকে সম্বোধন ক'রে ছোটোখাটো একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললে। যেহেতু আমরা এখন হিংস্র জন্তুর ডেরায় হানা দিতে যাচ্ছি সেইজন্যে আমাদের একটু সাবধান থাকা উচিত—বাঘ মারতে গিয়ে শেষটায় বাঘেরই শিকার হ'য়ে-যাওয়াটা তেমন উপভোগ্য ঠেকবে না ব'লেই নাকি তার মনে হয়। সেইজন্যে—হুডের সুচিন্তিত পরামর্শ—আমরা যেন কিছুতেই দলছাড়া হ'য়ে না-যাই —আর, সর্বোপরি, মাথা ঠাণ্ডা রাখি যেন সবসময়।

তার মতো একজন জাঁদরেল শিকারির মুখ থেকে এই উপদেশ শুনে আমরা যথোচিত সতর্ক হলুম। বন্দুকে গুলি ভরা হ'লো, চোখ-কান রইলো খোলা ও স্পর্শাতুর, এবং ভারতীয় জঙ্গলের ভয়াবহ সর্পকুলও যাতে আমাদের পদচুম্বন না-করে, সেইজন্যে আরো-একডিগ্রি সাবধান হলুম!

সাড়ে-বারোটার পর আমরা বেশ গভীর জঙ্গলেই প্রবেশ করলুম। কাঠুরেদের পায়ে-চলার-পথ দিয়ে যাচ্ছি আমরা, সাবধানে, নিবিষ্টভাবে। ঝোপঝাড়ে কোনো টুঁ-শব্দ হ'লেই বন্দুক উঁচিয়ে ধরছি, ঝোপঝাড় ও ডালপালাগুলোকে অবলোকন করছি সন্দেহের দৃষ্টিতে: কোথায় কোনখানে কোন বেশে জঙ্গলের আচম্বিত জান্তব মৃত্যু অপেক্ষা ক'রে

আছে, কে জানে। মাঝে-মাঝে নিচু হ'য়ে মাটিতে জীবজন্তুর পায়ের দাগ দেখে বুঝছি যে ক্যাপ্টেন হুডের আশঙ্কা অমূলক—তার আগমনবার্তায় তরাইয়ের হিংস্র জন্তুরা আদপেই ডেরা ছেড়ে পালিয়ে যায়নি।

হঠাৎ হুডের মুখ থেকে একটা অস্ফুট চীৎকার শুনে আমরা সবাই স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে গেলুম। তাকিয়ে দেখি, সামনেই প্রায় কুড়ি-পা দূরে একটি অদ্ভুত *গড়ন*। কোনো বাড়ি নয়—কারণ তার না-আছে কোনো চিমনি, না-আছে কোনো জানলা। কোনো শিকারির ডেরাও নয়, কারণ তাতে কোনো ফোকর বা গবাক্ষ কিছুই নেই। বরং পাহাড়ি-কোনো মানুষের সমাধিই হবে হয়তো এটা—জঙ্গলের গভীরে এখন হারিয়ে গেছে। লম্বা একটা চুরুটের মতো আকার, পাশাপাশি গাছের ডাল বসিয়ে তৈরি-করা, মাটিতে শক্ত ক'রে বসানো, মোটা-মোটা লতা দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। গাছের ডাল পেতেই ছাত হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যায়, এটা যে বানিয়েছিলো, সে ব্যাপারটাকে মজবুত করার জন্যে কোনো-কিছু করতেই বাদ রাখেনি। ছ-ফিট উঁচু, বারো ফিট লম্বা আর পাঁচ ফিট চওড়া একটা ব্যাপার—কোনো দরজা চোখে পড়লো না ; হয়তো একটা দরজা ছিলো, কোনো দূর-অতীতে, কিন্তু এখন মোটা গাছের গুঁড়িতে ঢাকা প'ড়ে গেছে। একদিকে একটা লিভার রয়েছে, সেই লিভারটাই ছাতের উপরকার কয়েকটা লম্বা ডালকে টেনে রেখেছে, যে-ভাবে লিভারের সঙ্গে এগুলো বাঁধা রয়েছে, তাতে লিভারের ভারসাম্য একটু এদিক-ওদিক হ'লেই ডালগুলো নিচে নেমে এসে ছাতের দিকটা পুরোপুরি আটকে দেবে।

'আশ্চর্য তো! কী এটা?' আমি জিগেস করলুম।

ব্যাঙ্কস ভালো ক'রে সরেজমিন তদন্ত করলে, ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'কী আবার—নেহাৎই একটা ইঁদুরধরা ফাঁদ। অবশ্য ইঁদুরটা আসলে কী, সেটা অনুমান করার ভার তোমাদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি।'

'বাঘ ধরার ফাঁদ নাকি?' হুড জিগেস করলে।

'হ্যাঁ,' ব্যাঙ্কস বললে, '*বাঘ-ধরা-ফাঁদ*। ওই-যে গাছের গুঁড়িটা দিয়ে দরজাটা আটকানো দেখছো, গুঁড়িটা আসলে ছাতের ওই ডালগুলো দিয়ে শূন্যে উঠে ঝুলছিলো—ভিতরে কোনো জন্তু ঢুকতেই তার ভারে আপনা থেকেই সেটা নিচে নেমে এসেছে!'

'*এই-প্রথম*,' হুড বললে, 'ভারতবর্ষের জঙ্গলে আমি এ-রকম কোনো ফাঁদ দেখলুম! ইঁদুর-ধরা-ফাঁদ—হুম্ কিন্তু এ-সব-ফাঁদ-টাদ আসলি শিকারিদের যোগ্য নয় মোটেই।'

'বাঘেরও সম্মান তাতে নষ্ট,' ফক্স যোগ করলে।

'সে-কথা মানি,' বললে ব্যাঙ্কস, 'তবে যখন এ-সব হিংস্র জন্তুকে শেষ ক'রে ফেলাটাই সবচেয়ে জরুরি কাজ হ'য়ে দাঁড়ায়—ফুর্তি বা আমাদের জন্যে শিকার নয়, কোনো হিংস্র জন্তুদের ধ্বংস করাটাই যখন বাধ্যতায় পরিণত হয়, তখন যেন-তেন প্রকারেণ কাজ হাশিল করাই তো ভালো—তাছাড়া ফাঁদ পেতে ধরলে সংখ্যাতেও বেশি

পাওয়া যায় । এই ফাঁদটা আমাকে কিন্তু খুবই আকৃষ্ট করছে—অত্যন্ত চতুর-কোনো লোকের কাজ এটা, সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে এতটা কুলোতো না । এমন আশ্চর্য উদ্ভাবনী শক্তি সচরাচর দেখা যায় না ।'

এতক্ষণে কর্নেল মানরো কথা বললেন, 'আমি একটা কথা বলবো ? গাছের গুঁড়িটা নেমে প'ড়ে দরজাটা যখন বন্ধ ক'রে দিয়েছে, তখন ভিতরের ভারসাম্যটা কোনো কারণে নিশ্চয়ই নষ্ট হয়েছে । সম্ভবত আচমকা কোনো বুনো জন্তু ঢুকেছিলো ভিতরে, আর তাতেই ফাঁদের দরজাটা বন্ধ হ'য়ে গেছে ।'

'সেটা আমরা এক্ষুনি জানতে পারবো,' বললে হুড । 'আর ভিতরের ইঁদুরটা যদি এখনও জ্যান্ত থাকে—' ব'লেই হুড বন্দুক তুলে বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল ছোঁয়ালে । দেখাদেখি আমরাও সে-দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলুম ।

ক্যাপ্টেন হুড, ফক্স আর গৌমি প্রথমে ফাঁদটার চারপাশে ঘুরে দেখলে— কোথাও এতটুকু ফুটো চোখে পড়ে কি না । ভিতরটায় কী আছে, একবার যদি কোনোরকমে বাইরে থেকে দেখা যেতো !

কিন্তু কোথাও চুলমাত্র ফাঁক দেখা গেলো না ।

তখন উৎকর্ণ হ'য়ে তারা শোনবার চেষ্টা করলে ভিতর থেকে কোনো আওয়াজ আসে কি না । কিন্তু সব কী-রকম যেন গোরস্থানের মতো নিঃঝুম ও স্তব্ধ । ভারি অস্বস্তিকর ।

তখন আবার সামনে এসে গাছের গুঁড়িটা তারা পরীক্ষা করলে । দুটো মোটা লতা আঁকড়ে ধ'রে আছে গুঁড়িটা—লিভারটায় চাপ দিয়ে ওটাকে শূন্যে তুললেই ফাঁদের দরজা খুলে যাবে ।

'টু-শব্দটিও তো শুনলুম না—এমনকী নিশ্বেসের শব্দ অব্দি না,' দরজায় কান লাগিয়ে হুড শোনবার চেষ্টা করলে, 'ফাঁদটা নিশ্চয়ই ফাঁকাই প'ড়ে আছে ।'

'ফাঁকা হ'লেও সাবধানের মার নেই,' কর্নেল মানরো বাঁদিকটায় একটা গাছের গুঁড়ির উপর ব'সে পড়লেন । আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালুম ।

হুড তখন গৌমিকে ডাক দিলে । ডাক শুনেই গৌমি বুঝে নিলে তাকে কী করতে হবে । একলাফে সে গিয়ে ছাতে উঠে পড়লো, তারপর সেই লিভারটার কাছে গিয়ে আস্তে সেটাকে আঁকড়ে ধরলে—অমনি তার ভারে চট ক'রে গাছের গুঁড়িটা শূন্যে উঠে গেলো, আর গৌমি লিভারটা আঁকড়ে ধ'রে ঝুলতে লাগলো ।

যতটা ফাঁক হ'লো তাতে যে-কোনো মস্ত জন্তুও অনায়াসেই বেরিয়ে পড়তে পারে । কিন্তু ছোটো-বড়ো কোনো জন্তুরই কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না । হয়তো আমাদের কথাবার্তা ও ফাঁদের ডালপালার আওয়াজে বন্দী জানোয়ারটি ফাঁদের একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে ঘাপটি মেরে আছে—হয়তো সুযোগ বুঝে লাফিয়ে বেরুবে হঠাৎ দুম ক'রে —আর চট ক'রে জঙ্গলে মিলিয়ে যাবে ।

উত্তেজনায় আমার বুকের মধ্যেটা যেন কেমন করতে লাগলো ।

হঠাৎ দেখি, ক্যাপ্টেন হুড বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল চেপে ফাঁদের দরজার কাছে গিয়ে ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করছে । বনের ডালপালার আড়াল দিয়ে আলো এসে পড়েছে দরজার সামনে, ভিতরে কী আছে দেখতে কোনো অসুবিধেই হবার কথা নয় ।

হঠাৎ শুনতে পেলুম ভিতরে অস্পষ্ট একটু খশখশে শব্দ হ'লো, তারপরেই ঘোঁৎ ক'রে একটা গর্জন—সব যেন কেমন সন্দেহজনক । বোধহয় ভিতরে কোনো জানোয়ার ঘুমুচ্ছিলো, এখন পাশ ফিরে শব্দ ক'রে হাই তুলছে ।

হুড আরো এক-পা এগিয়ে গেলো ; ভিতরে কালো-মতো কী-একটা যেন ন'ড়ে উঠলো, বন্দুকটা তার দিকেই তাগ-করা । হঠাৎ এমন সময় কে যেন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, তার পরেই স্পষ্ট ও চমৎকার ইংরেজিতে কে যেন ব'লে উঠলো : 'গুলি করবেন না ! *দোহাই ভগবানের,* গুলি করবেন না ।' বলতে-বলতে ভিতর থেকে কে-একজন বেরিয়ে এলো ।

আমরা এতটাই অবাক হ'য়ে গিয়েছিলুম যে গৌমি লিভার ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে নামলো নিচে, অমনি ধপ ক'রে গাছের গুঁড়িটা আবার মাটিতে প'ড়ে ফাঁদের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে ।

ততক্ষণে সেই অপ্রত্যাশিত মানুষটি হুডের দিকে এগিয়ে গেছেন, স্পষ্ট স্বরে বলছেন, 'দয়া ক'রে বন্দুকটা একটু নামাবেন, আমি বাঘ নই—আপনাকে বাঘের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে না ।'

একটু ইতস্তত ক'রে হুড বন্দুকটা নামিয়ে নিলে ।

ব্যাঙ্কস এগিয়ে এলো এবার । 'কার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য পেলুম জানতে পারি কি ?'

'প্রকৃতিবিজ্ঞানী মাতিয়াস ফান খোইত—লণ্ডনের মিস্টার চার্লস রাইস আর হামবুর্গের হের হাগেনবেকের জন্যে পাচিডেরমাট, টার্ডিগ্রেডস, প্ল্যান্টিগ্রেডস, প্রোবোস্কিডেট ও কার্নিভোরা যোগাড় করতে বেরিয়েছি ।' তারপর হাত নেড়ে আমাদের দেখিয়ে বললেন : 'এঁরা— ?

'কর্নেল মানরো ও তাঁর বন্ধুবান্ধব,' বললে ব্যাঙ্কস ।

'হিমালয়ের জঙ্গলে বেড়াতে বেরিয়েছেন ?' ফান খোইত বললেন, 'সত্যি, ভারি সুন্দর জঙ্গল ।......আপনারা আমার নমস্কার নেবেন ?'

কে এই অদ্ভুত মানুষটি ? মাথায় কিছু পোকা আছে বোধহয়—নয়তো এভাবে বাঘের ফাঁদে বন্দী থেকেই ঘিলু নিশ্চয়ই ভেস্তিয়ে গেছে ।

মাতিয়াস ফান খোইতের বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি ; চোখে পুরু চশমা, তার আড়ালে চোখের তারা ঝিকমিক করছে, মসৃণ মুখ, একটু উন্নাসিক, প্রতিমুহূর্তেই অস্থির হ'য়ে আছেন, অঙ্গভঙ্গিসহকারে এমনভাবে কথা বলেন যে মনে হয় মফস্বলের রঙ্গমঞ্চের কোনো কৌতুক অভিনেতাই বুঝি-বা হবেন । চোখে-মুখে কথা বলেন, প্রতিমুহূর্তে ভঙ্গি করেন নাটকীয়, মাথাটার অন্তঃস্থলে কিছু আছে কিনা জানি না—তবে সবসময়েই মাথাটা

একটু কাৎ ক'রে আছেন ।

পরে অবিশ্যি আমরা তাঁরই মুখ থেকে জানতে পেলুম যে তিনি আগে টারডাম সংগ্রহশালায় প্রকৃতিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু শিক্ষকতায় তেমন উন্নতি করেননি। নিশ্চয়ই ছাত্রেরা ক্লাসে তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে হাস্যরোল বন্ধ করতে পারতো না ; তারা যে তাঁর ক্লাসে ভিড় ক'রে আসতো, তা নিশ্চয়ই জ্ঞানস্পৃহাবশত নয়—বরং কিঞ্চিৎ মজা ক'রে নেবার জন্যে। শেষটায় জীববিদ্যার অধ্যাপনা ছেড়ে তিনি ঈস্ট ইণ্ডিজে পশুশালায় কর্ম নিলেন—দেখা গেলো তত্ত্বকথা বলার চেয়ে পশু সংগ্রহেই তিনি অধিকতর পারঙ্গম। ক্রমে তিনি লণ্ডন ও হামবুর্গের দুটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে পশু সংগ্রহের কাজে লিপ্ত হ'য়ে পড়লেন। এখন তিনি তরাইতে এসেছেন ইওরোপ থেকে মস্ত একটা অর্ডার পেয়ে—অনেক জন্তু ধ'রে নিয়ে যেতে হবে তাঁকে। যেখানে তিনি ছাউনি ফেলেছেন, সে-জায়গাটা এই ফাঁদ থেকে মাইল দু-এক মাত্র দূরে ।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মাতিয়াস ফান খোইতের জীবনচরিত আমাদের জানা হ'য়ে গেলো, কিন্তু তবু সেই রহস্য কিছুতেই ভেদ হ'লো না তিনি কেমন ক'রে ওই ফাঁদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। শেষটায় ব্যাঙ্কস এ-বিষয়ে তাঁকে সরাসরি জিগেস ক'রে বসলো। জানা গেলো, কাল বিকেলে তিনি তাঁর ক্রাল* থেকে এই ফাঁদটা দেখতে এসেছিলেন—সঙ্গে অবশ্য ভৃত্যেরা ছিলো—কিন্তু তারা অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলো ব'লে তিনি একাই এই ফাঁদটার মধ্যে ঢুকে পড়েন। ঢুকেছিলেন লিভারটা কাজ করছে কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্য। ঢোকবামাত্র হঠাৎ কেমন ক'রে যেন তাঁর হাত লেগে দড়িটা ঢিলে হ'য়ে যায় আর তিনি আবিষ্কার করেন যে তিনি নিজের ফাঁদে নিজেই বন্দী হ'য়ে গেছেন ; এবং উদ্ধার পাবার উপস্থিত কোনো আশাই আর নেই ।

এতখানি ব'লে মাতিয়াস ফান খোইত একটু থামলেন—বোধহয় অবস্থার গুরুত্বটা বোঝবার সময় দিলেন আমাদের। তারপর আবার শুরু করলেন, 'একবার বুঝুন ব্যাপারটা—মস্ত একটা ঠাট্টা নয় কি ? প্রথমটায় এই হাসির দিকটাই আমার চোখে পড়লো : *নিজের ফাঁদে নিজে বন্দী* ! ভেবেছিলুম, আমার অনুচরেরা ক্রাল-এ ফিরে গিয়ে আমাকে না-দেখতে পেয়ে খোঁজ নিতে বেরুবে—মুক্তি পেতে বেশি দেরি হবে না। কিন্তু সন্ধে হ'য়ে গেলো, রাত হ'য়ে গেলো—তবু তাদের কোনো পাত্তাই নেই। শেষটায় তাদের জন্যে ব'সে থেকে-থেকে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েই পড়লুম। হঠাৎ কীসের শব্দ শুনে ধড়মড় ক'রে জেগে উঠে দেখি দরজা খোলা, ভিতরে আলো, এবং আমার বুক লক্ষ্য ক'রে বন্দুক তোলা ! আরেকটু হ'লেই অকালেই অক্কা পেতুম আর-কি ! মুক্তির মুহূর্ত আর মৃত্যুর মুহূর্ত এক হ'য়ে যেতো ! কিন্তু শেষটায় ক্যাপ্টেন যখন দেখলেন যে আমিও হোমো সাপিয়েনের একজন, তখন বন্দুক নামালেন। তা আপনাদের আবারও ধন্যবাদ জানাই—আমাকে মুক্তি দেবার জন্যে ।'

*ক্রাল একটা ওলন্দাজ শব্দ, তার মানে ছোট্ট গ্রাম। বিশেষ ক'রে ওলন্দাজ আফ্রিকার ছোট্ট বসতিকেই *'ক্রাল'* ব'লে অভিহিত করা হয় ।

'তাহ'লে আপনিও তরাইয়ের এদিকটায় ছাউনি ফেলেছেন ?' ব্যাঙ্কস জিগেস করলে ।

'হ্যাঁ', বললেন মাতিয়াস ফান খোইত । 'আগেই বোধহয় আপনাদের বলেছি যে আমার ক্রালটা এখান থেকে মাত্র মাইল দু-এক দূরে ; আপনারা অনুগ্রহ ক'রে সেখানে পদধূলি দিলে আমি যথার্থই কৃতার্থ হবো ।'

'নিশ্চয়ই, মিস্টার ফান খোইত,' বললেন কর্নেল মানরো, 'আমরা গিয়ে আপনার ক্রাল দেখে আসবো ।'

'শিকার করতে বেরিয়েছি আমরা,' হুড তাকে জানালেন, 'কাজেই ক্রাল-এ আপনি কী ব্যবস্থা করেছেন, দেখলে নিশ্চয়ই অনেক-কিছু শিখতে পারবো ।'

'শিকারে বেরিয়েছেন ?' মাতিয়াস ফান খোইত চেঁচিয়ে উঠলেন, 'শিকারি ? বুনো জানোয়ার খুঁজে বার করেন—সে শুধু তাদের মারবার জন্যে ?'

'হ্যাঁ, মারবার জন্যে,—' উত্তর দিলে হুড ।

'আপনি তাদের *মারেন*, আর আমি তাদের *ধরি*,' গর্বের স্বরে বললেন ফান খোইত ।

'তা আর কী করবেন ? আমাদের দু জনের দেখবার ধরন আলাদা,' বললে হুড ।

ফান খোইত অসহিষ্ণুভাবে মাথা ঝাঁকালেন কেবল । কিন্তু আমরা শিকার করতে বেরিয়েছি জেনেও তিনি তাঁর আমন্ত্রণ ফিরিয়ে নিলেন না । 'তাহ'লে চলুন, ক্রাল-এর দিকেই এগুনো যাক ।'

কিন্তু তাঁর মুখের কথা মেলাবার আগেই দূরে কাদের যেন গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো । একটু পরেই গাছপালার আড়াল থেকে উঁকি দিলে জনা ছয়েক স্থানীয় লোক।

'এই-যে—এরাই আমার অনুচর,' বললেন ফান খোইত, তারপর আমাদের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে মুখে আঙুল দিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'কিন্তু আমার ওই দুর্দশার কথা ওদের বলবেন না । আমি যে নিজের ফাঁদেই নিজে গ্রেপ্তার হ'য়ে গিয়েছিলুম, তা যেন তারা ঘুণাক্ষরেও জানতে না-পারে । তাহ'লে ওদের চোখে আমি হয়তো অনেকটাই খাটো হ'য়ে যাবো ।'

আমরা ইঙ্গিতে তাঁকে আশ্বস্ত করায় তবে তিনি শান্ত হলেন ।

ইতিমধ্যে তাঁর অনুচরদের মধ্য থেকে একজন চটপটে ও চালাক লোক এগিয়ে এলো । 'হুজুর, আমরা আপনাকে একঘন্টারও বেশি সময় খুঁজে বেড়াচ্ছি...'

'আমি এই ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলছিলুম । শোনো, এঁরা আমাদের ক্রাল দেখতে যেতে চাচ্ছেন—কিন্তু ক্রাল-এ ফেরবার আগে ফাঁদটাকে ঠিকঠাক ক'রে দাও তো ।'

অনুচরেরা তৎক্ষণাৎ ফাঁদটাকে ঠিকঠাক করতে লেগে গেলো । আমরাও ততক্ষণে ফাঁদের ভিতরটা একবার ভালো ক'রে অবলোকন ক'রে এলুম ।

সত্যি, ভারি কৌশলী ফাঁদটা । এমনকী হুড শুদ্ধু প্রশংসা না-ক'রে পারলে না । আর তার প্রশংসা শুনেই ফান খোইত পুনর্বার বললেন, 'আপনি তো দুম ক'রে গুলি ছুঁড়েই খালাশ—মেরে ফেললেই ল্যাঠা চুকে গেলো । আমাকে কিন্তু জ্যান্ত ও অক্ষত

অবস্থায় এদের পাকড়াতে হয় ।'

'তা তো বটেই—আমাদের দুজনের দেখবার ভঙ্গিটাই আলাদা,' আবারও বললে হুড ।

'আমারটাই বোধকরি আদর্শ উপায় । অন্তত জন্তুদের যদি একবার জিগেস ক'রে দ্যাখেন—'

ফান খোইতের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হুড বললে, 'আমার অবিশ্যি সে-ইচ্ছে আদৌ নেই ।'

বুঝলুম, ফান খোইত আর ক্যাপ্টেন হুডের মধ্যে অহরহ এ-রকম কথা কাটাকাটি হ'তে থাকবে । তক্ষুনি হয়তো দুজনের মধ্যে একটা ছোটোখাটো তর্ক বাধতো, কিন্তু হঠাৎ বাইরে একটা প্রবল শোরগোল উঠলো । হুড়মুড় ক'রে আমরা বেরিয়ে এলুম ।

বাইরে এসে দেখি, কর্নেলের পায়ের কাছে একটা ভীষণ বিষাক্ত সাপ দু-টুকরো হ'য়ে প'ড়ে আছে, আর সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি লোক, তার হাতে একটা গাছের ডাল । লোকটা আর-কেউ নয়, ফান খোইতের সেই সপ্রতিভ ও বুদ্ধিমান অনুচরটি । সে যদি হাতের ডালটা দিয়ে না-মারতো তাহ'লে সার এডওয়ার্ড এতক্ষণে সর্পাঘাতেই মরতেন । ভিতর থেকে আমরা যে-চীৎকার শুনেছিলুম, তা ফান খোইতের আরেকজন অনুচরের । মাটিতে প'ড়ে সে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে, কারণ আহত সাপটা সামনেই তাকে পেয়ে তক্ষুনি তাকে ছুবলে দিয়েছে ।

কর্নেল মানরোর কাছে ছুটে গেলুম আমরা ।

'আপনার লাগেনি তো ?'

'না, আমার কিছু হয়নি,' বললেন সার এডওয়ার্ড । তারপর সেই ভারতীয়টির দিকে এগিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, 'তোমাকে আমি ধন্যবাদ জানাই ।'

ভারতীয়টি ইঙ্গিতে জানালে যে সে ও-সব ধন্যবাদ-টন্যবাদের কোনো ধার ধারে না ।

'কী নাম তোমার ?' জিগেস করলেন কর্নেল মানরো ।

সেই হিন্দুটি উত্তর দিলো, 'কালোগনি ।'

২

ক্রাল

দুর্ভাগা লোকটির অতর্কিত সর্পাঘাত-মৃত্যু আমাদের উপর একটা গভীর ছাপ ফেলে গেলো । একে তো এ-রকম মৃত্যু মাত্রেই ভয়ংকর, তার উপর একদিক থেকে সে কিনা

মরলো সার এডওয়ার্ডকে বাঁচাতে গিয়ে ।

সেই কালান্তক বিষে ততক্ষণে ভারতীয়টির দেহ নীল ও শক্ত হ'য়ে গিয়েছিলো। অন্যরা তাড়াতাড়ি একটা কবর খুঁড়ে সেখানেই তাকে সমাহিত করলে, যাতে তার মরদেহটা অন্তত বন্য জন্তুদের ক্ষুধিত গ্রাস থেকে রক্ষা পায় ।

এই মন-খারাপ-করা অনুষ্ঠানটা শেষ হ'য়ে যাবার পর মাতিয়াস ফান খোইতের আমন্ত্রণে আমরা তাঁর সঙ্গেই ক্রালের উদ্দেশে চললুম ।

আধ ঘন্টার মধ্যেই আমরা ফান খোইতের ক্রাল-এ গিয়ে পৌঁছুলুম । মস্ত একটা চওড়া জায়গা, বেড়া দিয়ে ঘেরা ; ক্রালের দরজাটা বেশ প্রশস্ত, যাতে অনায়াসেই মোষ-টানা-গাড়ি ঢুকতে পারে । ভিতরে লম্বা একটা খোড়ো বাড়ি, গাছের ডাল ও তক্তা জুড়ে-জুড়ে তৈরি । ঘেরা জায়গাটার বাঁ প্রান্তে ছ-টা মস্ত খাঁচা, খাঁচাগুলো আবার কোঠাওলা, উপরন্তু তলায় চাকা রয়েছে, যাতে মোষ-টানা-গাড়ির সঙ্গে জুতে দিলেই খাঁচাগুলো নিয়ে রওনা হ'য়ে পড়া যায় । খাঁচার ভিতর থেকে যে-রকম গর্‌র্‌র্ গর্জন উঠলো, তাতে স্পষ্টই বোঝা গেলো যে সেগুলো আদৌ প্রাণীবিবর্জিত নয় ।

এ-ছাড়া রয়েছে গোটা-বারো মোষ, পাহাড়ের ঘাস খেয়েই তারা বেঁচে আছে । তারাই এই সচল পশুশালা নিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ায় । ছ-টি লোক আছে এই মোষগুলোর তদারকি করা ও গাড়ি চালাবার জন্যে—আর জনাদশেক লোক রয়েছে জন্তুগুলোকে গ্রেপ্তার করার জন্যে । বাস, এই হ'লো ক্রাল-এর লোকজনদের তালিকা ।

গাড়িওলাদের ভাড়া করা হয়েছে কেবল এই অভিযানের জন্যেই ; কাছের রেলওয়ে স্টেশনে জন্তুগুলোকে পৌঁছে দিলেই তাদের ছুটি । সেখান থেকে রেলে ক'রে এলাহাবাদ হ'য়ে এরা যাবে কলকাতা কি বম্বাই—সেখান থেকে ইওরোপ ।

ফান খোইত তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে কয়েক মাস হ'লো এই ক্রাল-এই রয়েছেন । কেবল যে তরাইয়ের বন্য জন্তুদের ভয়ই রয়েছে এখানে, তা নয়—এখানকার ভীষণ কালান্তক জ্বরের ভয়ও রয়েছে প্রতি মুহূর্তে । স্যাঁৎসেঁতে ভেজা রাত্তির, মাটি থেকে ওঠা ভ্যাপশা ঠাণ্ডা গন্ধ, গাছের ডগায় ঝুলে-থাকা ভিজে-ভিজে রোদ্দুর—সবকিছু মিলে হিমালয়ের এখানটা ভীষণ অস্বাস্থ্যকর । একবার ম্যালেরিয়া ধরলে আর রক্ষে নেই । এই ম্যালেরিয়া এমনকী তরাইয়ের বাঘের বাচ্চাদের চেয়েও মারাত্মক । সুতরাং এই ক্রাল-এ এসে আশ্রয় নিয়ে আমাদের কোনোই লাভ নেই—হয়তো দু-এক রাত্তির কাটানো যেতে পারে, তাছাড়া বাকি সময়টা *স্টীম হাউসে* কাটানোই আমাদের পক্ষে শ্রেয় ।

আমরা ক্রাল দেখতে যাওয়াতে মাতিয়াস ফান খোইত খুব খুশি । ঘুরে-ঘুরে জীবজন্তুর সংগ্রহ দেখালেন তিনি আমাদের, অনর্গল কথা বললেন জন্তুজানোয়ার সম্বন্ধে —অনেক বৈজ্ঞানিক নাম ও লাতিন অভিধায় ভূষিত তাঁর বক্তৃতা থেকে বোঝা যাচ্ছিলো নিজের বিষয়টা তিনি ভালোই বোঝেন ।

তবু ক্যাপ্টেন হুডের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হ'লো অতিশয় চিত্তাকর্ষক । সেই পুরোনো তর্কটা বারে-বারে উত্থাপিত হ'লো—শিকার ভালো, না জন্তু-জনোয়ার ধ'রে পোষ মানানো

ভালো । এবং বলাই বাহুল্য তর্কের কোনো স্পষ্ট মীমাংসা হ'লো না । শেষটায় দুজনেই যখন একযোগে নিজের-নিজের নেশা ও খেয়ালের গুণকীর্তন শুরু ক'রে দিলেন, তখন ব্যাঙ্কস মাঝখানে প'ড়ে তাদের বাদ-প্রতিবাদ থামালে ।

অবশেষে তর্কটা দাঁড়ালো এইরকম : বনের রাজা কোন জন্তু ? সিংহ, না হাতি, না বাঘ ? লিবিয়ার জঙ্গল বেশি ভয়ংকর, না সুন্দরবন ? ফান খোইত শেষটায় বাঘকেই বনের রাজা ব'লে ঘোষণা করলেন ;—বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের রাজাবাঘের হালুম নিনাদ—তিনি বললেন—অরণ্যের সবচেয়ে *ভয়ংকরসুন্দর* শব্দ । এ-বিষয়ে অবশ্য ক্যাপ্টেন হুডের সঙ্গে তাঁর বিশেষ মতভেদ দেখা গেলো না । এবং জঙ্গলে সবচেয়ে ভীষণ জন্তু যে বাঘই হয়—বিশেষ ক'রে সে যদি কখনও নরমাংসের স্বাদ পেয়ে থাকে —এ-বিষয়েও তাঁরা অবশেষে একমত হলেন । 'মানুষখেকো বাঘের চেয়ে ভীষণ আর-কিছু নেই, এটা সত্যি,' অবশেষে ফান খোইত সিদ্ধান্ত জানালেন, 'তবে স্বভাবকে না-মেনে তাদের উপায় কী ?' একটু হেসে আরো যোগ করলেন, 'তাদেরও তো খেয়ে বাঁচতে হবে ।'

তাঁর এই মন্তব্যের পরই আমরা ক্রাল থেকে ফেরবার সময় হয়েছে ব'লে সাব্যস্ত করলুম । কেননা আমাদেরও খেয়ে বাঁচা দরকার ছিলো । বলাই বাহুল্য, ক্রাল থেকে বিদায় নেবার সময় ভাবভঙ্গি দেখে এমনিতে মনে হবার জো নেই যে ফান খোইত আর ক্যাপ্টেন হুডের মধ্যে কোনোদিন বন্ধুতা সম্ভব, অথচ হুড আর ফান খোইতের মধ্যে শেষ পর্যন্ত গলাগলি ভাব হ'য়ে গিয়েছিলো, যদিও দুজনের মতামত ছিলো একেবারেই বিপরীত । একজনের স্বপ্ন তরাই থেকে বন্যজন্তু নির্মূল করা, অন্যজনের জীবিকা তাদের ধ'রে দেশ-বিদেশে চালান দেয়া ; তবু জঙ্গল সম্বন্ধে অন্য-অনেক বিষয়ে দুজনের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দেখা গেলো না । বরং ঠিক হ'লো যে ক্রাল আর স্টীম হাউসের মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন করা চলবে না । ফান খোইত যেমন ক্যাপ্টেন হুডের অভিপ্রায় স্মরণে রাখবেন, তেমনি আমরাও কোনো চিত্তাকর্ষক জন্তু পেলে যেন তাঁকে খবর দিই । ফান খোইত তো তাঁর সব শিকারিকেই ক্যাপ্টেন হুডের হাতে ছেড়ে দিলেন, বিশেষ ক'রে কালোগনি, কারণ তারা এ-অঞ্চলের হালচাল ভালো ক'রে জানে ব'লে সহজেই বন্য জন্তুদের হদিশ দিতে পারবে—আর কালোগনি এদেরই মধ্যে অত্যন্ত চালাকচতুর ও ক্ষিপ্র ; ক্রাল-এর কাজে সদ্য নিযুক্ত হ'লেও তার উপরে অনায়াসে এ-সব বিষয়ে নির্ভর করা যায় । এর বদলে—হুড প্রতিশ্রুতি দিলে—সেও যথাসাধ্য চেষ্টা করবে যাতে ফান খোইত বাকি জন্তুগুলো শিগগিরই পাকড়ে ফেলে তাঁর কোটা পূর্ণ করতে পারেন ।

ক্রাল ছেড়ে আসার আগে সার এডওয়ার্ড আবার কালোগনিকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানালেন ; বললেন, যখনই সে স্টীম হাউসে যাবে, তখনই সে সেখানে স্বাগত হবে । শুনে কালোগনি ঠাণ্ডাভাবে তাঁকে একটা সেলাম করলে । লোকটা যেন পাথরে-খোদাই করা ; বাইরেটা দেখে কিছুতেই বোঝবার উপায় নেই ভিতরে-ভিতরে সে কী ভাবছে ।

নিশ্চয়ই সার এডওয়ার্ডের কৃতজ্ঞতায় ভিতরে-ভিতরে সে খুশি হচ্ছিলো, কিন্তু তার মুখ দেখে সেটা বোঝার কোনো জো ছিলো না ।

৩

তরাইয়ের রানী

পর-পর কয়েকদিন ধ'রে এমন একটানা বৃষ্টি পড়লো যে শেষটায় আমাদের বিরক্তি বোধ হ'তে লাগলো । আকাশে সূর্যের দেখা নেই ; ছাইরঙা ভারি নিচু মেঘ ঝুলে আছে সারাদিন, মাঝে-মাঝে বাজ পড়ছে, অনবরত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—হুডের শিকারে যাবার পরিকল্পনাটা ভেস্তে গেলো ব'লে তার সে কী বিষম রাগ ! শেষটায় জুন মাসের শেষদিনে আকাশ একটু পরিষ্কার হবার লক্ষণ দেখালো । হুড, ফক্স, গৌমি আর আমি ঠিক করলুম বৃষ্টি থামলেই ক্রাল-এ গিয়ে হাজির হবো—সেখান থেকে ফান খোইতের সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে অবশেষে বেরুবো বাঘের খোঁজে ।

বৃষ্টি থামতেই সেদিন আমরা তাই বেরিয়ে পড়লুম ।

খানিকক্ষণ যাবার পর সেই বাঘ-ধরা-ফাঁদটার কাছে এসে দেখি খোদ ফান খোইত সশরীরে কালোগনি ও আরো পাঁচ-ছজন অনুচরসহ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন । রাত্তিরে ফাঁদে একটা বাঘ পড়েছিলো, কালোগনিরা সেটাকে মোষ-টানা-খাঁচায় তুলতে শশব্যস্ত ।

বাঘটা সত্যি রাজার মতো । পেশল বলিষ্ঠ শরীর ; দেখেই তো হুডের ঈর্ষা হ'তে লাগলো । 'আরো-একটা কমলো তরাই থেকে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফক্সকে সে জনান্তিকে জানালে ।

ফান খোইত কিন্তু কথাটা শুনে ফেলেছিলেন । তিনি ব'লে বসলেন, 'আরো-একটা বাড়লো আমার সংগ্রহে । এখনও আরো-দুটো বাঘ, একটা সিংহ, দুটো চিতাবাঘ চাই আমার—না-হ'লে সব চাহিদার জোগান দেয়া যাবে না । তা, আপনারা কি আমার সঙ্গে ক্রাল-এ যাবেন নাকি ?'

'ধন্যবাদ,' হুড বললে, 'কিন্তু আজকে আমরা নিজেদের হাতের কাজেই ব্যস্ত থাকবো ।'

'তাহ'লে কালোগনিকে সঙ্গে নিতে পারেন,' বললেন ফান খোইত, 'এখানকার জঙ্গল ওর নখদর্পণে—হয়তো আপনাদের কাজে লাগবে ।'

'পথ দেখাবার জন্যে ওকে আমরা সানন্দেই নেবো ।'

'তাহ'লে আমি বাঘটাকে নিয়ে এখন চলি । আশা করি আপনাদের নিরাশ হ'তে হবে না—তবে জঙ্গল থেকে সবগুলো জানোয়ারই সাবাড় ক'রে দেবেন না যেন ।' এই ব'লে মাতিয়াস ফান খোইত অনেকটা নিচু হ'য়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে আমাদের অভিবাদন ক'রে খাঁচায় গর্জাতে-থাকা বাঘটাকে নিয়ে সদলবলে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন, কেবল কালোগনি র'য়ে গেলো আমাদের জঙ্গলের মধ্যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ।

'তাহ'লে, মোক্লের, চলো এবার আমার বিয়াল্লিশ নম্বরের সন্ধানে !'

'আপনার বিয়াল্লিশ, আর আমার আটত্রিশ,' তক্ষুনি ফক্স পুরো হিশেবটা জানিয়ে দিলে ।

শুনে আমিও বললুম, 'এবং আমার এক নম্বর'—কিন্তু আমার কথা বলার ভঙ্গি দেখে হুড একেবারে হেসে ফেললে ; স্পষ্ট বোঝা গেলো, আমার কণ্ঠস্বরে তার মতো দিব্য আগুনের ছোঁয়াচ ছিলো না ।

কালোগনির দিকে ফিরে হুড জিগেস করলে, 'তাহ'লে এখানকার জঙ্গল তুমি ভালো ক'রে চেনো ?'

'অন্তত কুড়িবার, দিনে-রাতে, এই জঙ্গল দিয়ে যেতে হয়েছে আমাকে,' বললে কালোগনি ।

'সেদিন ফান খোইত বলছিলেন ক্রাল-এর আশপাশে নাকি একটা বাঘকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছে । তুমি সেটাকে দেখেছিলে ?'

'দেখেছি, কিন্তু সেটা বাঘ নয়, বাঘিনী । এখান থেকে মাইল দু-এক দূরে তাকে দেখা গিয়েছিলো । কয়েক দিন ধ'রে সবাই সেটাকে পাকড়াবার চেষ্টা করছে । আপনারা যদি চান তো তার ডেরার—'

'ঠিক তা-ই আমরা চাই,' হুড আর কালোগনিকে তার কথা শেষ করতে দিলে না ।

কালোগনিকে অনুসরণ ক'রে আমরা গভীরতর জঙ্গলে প্রবেশ করলুম । কারণ সাধারণত ক্ষুধায় কাতর না-হ'লে বাঘ কখনও সহজে গভীর জঙ্গল ছেড়ে বেরোয় না । সেইজন্যেই অনেকে হয়তো কোনো বাঘের মুখোমুখি না-প'ড়েও এই অঞ্চলে এসে বেড়িয়ে যেতে পারেন । শিকারের উদ্যোগ করলে সেইজন্যেই প্রথমে খবর নিতে হবে জঙ্গলের কোথায়-কোথায় বাঘের উপদ্রব বেশি । বিশেষ ক'রে খোঁজ নিতে হয় বাঘ কোথায় জল খেতে যায়—সেই ঝরনা বা ছোট্ট জলস্রোতটি বার করতে পারলেই অনেকটা সন্ধান মিলে গেলো—তারপরে কেবল সুযোগের অপেক্ষা । তবে অনেক সময় তা অবিশ্যি আদৌ যথেষ্ট হয় না, টোপ ফেলেই তাকে কব্জিতে আনতে হয় । অনেক সময় গোরুর মাংস গাছতলায় ফেলে রেখে গাছের উপরে শিকারিরা ওৎ পেতে থাকে । অন্তত ঘন জঙ্গলে সাধারণত এই উপায়ই গ্রহণ করা হয় ।

সমতলভূমিতে অবিশ্যি ব্যবস্থা অন্য । সেখানে মানুষের এই সবচেয়ে বিপজ্জনক

খেলায় হাতি সবচেয়ে কাজে লাগে। অবশ্য হাতিদের এই জন্যে ভালো ক'রে শিখিয়ে নিতে হয়। তবু সবচেয়ে শিক্ষিত হাতিরাও অনেক সময় বাঘের মুখোমুখি প'ড়ে গেলে ভয় পেয়ে হুড়মুড় ক'রে এমনভাবে দৌড়ুতে থাকে যে হাওদায় ব'সে-থাকা শিকারির পক্ষে তখন হাতির পিঠে ব'সে-থাকাই দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে। মাঝে-মাঝে আবার বাঘেরাও দুঃসাহসে ভর ক'রে তড়াক ক'রে লাফিয়ে ওঠে হাতির পিঠে—সেই বিশাল জন্তুর পিঠেই তখন বাঘে-মানুষে ভীষণ লড়াই বেধে যায়, আর বেশির ভাগ সময়েই সেই লড়াই শিকারির পক্ষে মারাত্মক হ'য়ে ওঠে।

অন্তত এইভাবেই ভারতের রাজা-বাদশারা শিকারে বেরোন, জমকালো ভঙ্গিতে, জাঁকজমক সহকারে—কিন্তু ক্যাপ্টেন হুডের শিকার করার পদ্ধতি মোটেই এ-রকম নয়। হুড বরং পায়ে হেঁটে বাঘের খোঁজে বনে-বনে ঘুরে বেড়াবে, সে বরং মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঘের সঙ্গে সরাসরি লড়াই করবে, কিন্তু তবু কখনও হাতির পিঠে চ'ড়ে শিকারে বেরুবে না।

আমরা কালোগনিকে অনুসরণ ক'রে এগুচ্ছি বনের মধ্যে। সাধারণত হিন্দুরা একটু চাপা স্বভাবের হয়, কালোগনিও তাদের মতোই—পারতপক্ষে কোনো বাক্যব্যয় করতে চায় না—কোনো প্রশ্ন করলেও অতি সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে দেবার পক্ষপাতী।

ঘণ্টাখানেক হেঁটে আসার পর একটি প্রখর স্রোতস্বিনীর কাছে এসে আমরা থামলুম। জলের ধারে মাটির ওপর নানা ধরনের জন্তুর পায়ের ছাপ—ছাপগুলো বেশ টাটকা। পাশেই একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে মস্ত একখণ্ড গোমাংস টোপ হিশেবে বেঁধে রাখা হয়েছিলো—টোপটা, স্পষ্ট বোঝা গেলো, কোনো জন্তু আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছিলো। বোধহয় কতগুলো শেয়াল মাংসের টুকরোটাকে নিয়ে টানাটানি করেছিলো, যদিও আদৌ তাদের জন্যে এই টোপ ফেলা হয়নি। আমরা কাছে যেতেই গোটা কয়েক শেয়াল হুড়মুড় ক'রে ছুটে পালিয়ে গেলো।

'ক্যাপ্টেন,' কালোগনি বললে, 'এখানেই বাঘিনীটার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন, এখানে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকলে কত সুবিধে হবে।'

কালোগনি ঠিকই বলেছিলো। আমরা বন্দুক উঁচিয়ে ঢ্যাঙা গাছগুলোর আড়ালে লুকিয়ে প'ড়ে সেই মাংসের টুকরোটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রইলুম। গৌমি আর আমি রইলুম একটা গাছের আড়ালে, হুড আর ফক্স দুটো মুখোমুখি দাঁড়ানো মস্ত ওকগাছের ডালে উঠে ব'সে তৈরি হ'য়ে রইলো। কালোগনি লুকোলো একটা মস্ত পাথরের আড়ালে—বিপদ দেখলে সে পাথরের চুড়োয় উঠে পড়বে। এইভাবে ছড়িয়ে-থাকার ফলে সুবিধেটা হ'লো এই যে জন্তুটাকে একেবারে ঘিরে ধরা যাবে—কিছুতেই যাতে সে পালাতে না-পারে, সেইজন্যেই এই ব্যবস্থা।

এখন কেবল অপেক্ষা করা ছাড়া আর-কিছুই করণীয় নেই আমাদের। আশপাশের ঝোপের আড়ালে শেয়ালগুলো তখনও ডাকাডাকি করছিলো—কিন্তু আমাদের ভয়ে

সেগুলো আর মাংসের দিকে এগিয়ে আসতে পারছিলো না ।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ আচম্বিতে শেয়ালের ডাক থেমে গেলো । পরক্ষণেই হুড়মুড় ক'রে গোটা কয়েক শেয়াল ল্যাজ গুটিয়ে সেখান থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালো । কালোগনির শরীরটা তখন টান হ'য়ে উঠেছে ধনুকের ছিলার মতো, ইঙ্গিতে সে আমাদের সাবধান হ'তে ব'লে দিলে । বুঝতে পারলুম, শেয়ালদের ওই পলায়ন আসলে কোনো হিংস্র জন্তুর আবির্ভাবের পূর্বাভাস । সম্ভবত ওই বাঘিনীরই আবির্ভাব হয়েছে বনের মধ্যে ।

আমরা বন্দুক উঁচিয়ে আছি । ঝোপের যেদিক থেকে শেয়ালগুলো ছুটে পালিয়েছিলো, হুড আর ফক্স বন্দুক তুলে সেই দিকটায় তাগ ক'রে আছে । তার পরেই হঠাৎ দেখলুম সেই ঝোপের একটা দিক আচমকা ভীষণভাবে ন'ড়ে উঠলো । শুনতে পেলুম শুকনো ডালপালা গুঁড়িয়ে যাবার শব্দ । আস্তে, অতি মন্থর কিন্তু নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে, কোনো জন্তু গুঁড়ি মেরে এগুচ্ছে নিশ্চয়ই । যদিও জন্তুটা শিকারিদের কোথাও দেখতে পাচ্ছে না, তবু কেমন ক'রে যেন সে টের পেয়ে গেছে যে জায়গাটা তার পক্ষে আদৌ নিরাপদ নয় । জন্তুরা এ-সব বিষয় কেমন ক'রে যেন টের পেয়েই যায় । নিশ্চয়ই ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর না-হ'য়ে পড়লে, এবং সেই মাংসের গন্ধে আকৃষ্ট না-হ'লে, সে আর এক পাও এগুতো না ।

অবশেষে ডালপালার আড়ালে তাকে দেখা গেলো—কেমন যেন সন্দিহান হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই বিশালসুন্দর বাঘিনী । তারপরে আস্তে সাবধানে গুঁড়ি মেরে সে এগুতে থাকলো আবার—শরীরের মধ্যে কোথাও তার বোধহয় কোনো স্প্রিং আছে, কোনো বেগতিক দেখলেই সে ঝটকা মেরে লাফিয়ে পালাবে ।

আমরা তাকে টোপটা পর্যন্ত এগুতে দিলুম । মস্ত একটা শিকারি বেড়াল শিকারের উপর লাফাবার আগে ঘাড় ও পিঠ যেমনভাবে বাঁকিয়ে টান ক'রে নেয়, তার শরীরটাও ঠিক তেমনি হ'য়ে উঠলো ।

হঠাৎ সেই ছমছমে স্তব্ধ বন যুগপৎ দুটি বন্দুকের গুলিতে থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো :

'বিয়াল্লিশ নম্বর', চেঁচিয়ে উঠলো হুড ।

'আটত্রিশ', ততোধিক উঁচু গলার স্বর ফক্সের ।

হুড আর ফক্স একই সঙ্গে গুলি করেছিলো ; আর এমনি তাদের অব্যর্থ লক্ষ্য যে বাঘিনীর হৃৎপিণ্ড তৎক্ষণাৎ ফুটো হ'য়ে গিয়েছে । এখন সে প'ড়ে আছে মাটিতে —নিস্পন্দ ও নিঃসাড় ।

কালোগনি চটপট ছুটে গেলো তার দিকে । আমরা তাড়াতাড়ি যে-যার গাছ থেকে নেমে এলুম । বাঘিনীটা আর একটুও নড়ছে না ।

কিন্তু, সত্যি, কার গুলিতে মরেছে তরাইয়ের এই রানীবাঘ ? ক্যাপ্টেন হুড, না ফক্স—কার গুলি ভেদ করেছে লক্ষ্য । পরীক্ষা ক'রে দেখা হ'লো বাঘটাকে ; দেখা গেলো

তার বুকে স্পষ্ট দুটি গুলির দাগ !

'যাক,' হুডের গলায় কিঞ্চিৎ ক্ষোভ শোনা গেলো, 'আমরা দু জনেই তাহ'লে আধখানা ক'রে বাঘ পেলুম—সাড়ে-একচল্লিশ হ'লো তাহ'লে আমার।'

'অর্থাৎ আমার হিশেব দাঁড়ালো সাড়ে-সাঁইত্রিশ,' ফক্সের গলাতেও সেই একই ক্ষোভ।

কিন্তু তারা দুজনে যতই ক্ষুব্ধ হোক না কেন, বাঘিনীটা যে তক্ষুনি মরেছে, এটা আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। আহত বাঘিনীর মতো ভয়ংকর জন্তু আর-কিছুই হ'তে পারে না—নিজেদের ভাগ নিয়ে তারা দুজনে যতই ক্ষুব্ধ হোক না কেন, একবারেই একটা বাঘ মেরে ফেলা মোটেই কম কৃতিত্বের কাজ নয়।

ফক্স আর গৌমি বাঘিনীর সেই চমৎকার ছালটি ছাড়াবার জন্যে সেখানেই থেকে গেলো, আর আমি হুডের সঙ্গে ফিরে এলুম স্টীম হাউসে। সারা রাস্তা হুড বেশ মন-মরা হ'য়ে রইলো—ভাগে মাত্তর আধখানা বাঘ পড়ায় সে কিন্তু মোটেই খুশি হয়নি।

+

তরাইয়ের জঙ্গলে ক্যাপ্টেন হুডের প্রতিটি অভিযানের বর্ণনা দেবার কোনো প্রয়োজন দেখছি না, কারণ আসলে হয়তো প্রতিটি শিকার-অভিযানের ধরনই একরকম—বৈচিত্র্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত, একইরকমভাবে সবকিছুরই পুনরাবৃত্তি হয়। তেমনি সন্তর্পণে যেতে হয় জঙ্গলের মধ্যে, টোপ ফেলা হয় জন্তুটির জন্যে, তারপর লুকিয়ে থেকে একইরকমভাবে জন্তুটির আবির্ভাবের জন্য ব'সে-থাকা, অপেক্ষা-করা। সেইজন্যেই এখানে কেবল এটুকু বলাই নিশ্চয়ই যথেষ্ট হবে যে তরাই অন্তত হুড আর ফক্সের নালিশ করার মতো কোনো কারণ দেয়নি।

এরই মধ্যে একবার ফান খোইতও আমাদের সঙ্গে শিকারে বেরিয়েছিলেন। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন যে কোনো আধমরা বাঘকে তিনি ক্রাল-এ নিয়ে গিয়ে সারিয়ে তুলবেন, এবং তাঁর তালিকা বিস্ফারিত হ'য়ে উঠবে। সেদিন আমাদের তিনটি বাঘের পাল্লায় পড়তে হয়েছিলো। দুটি বাঘ, ফান খোইতের তীব্র বিরাগ সত্ত্বেও, হুড আর ফক্সের গুলিতে প্রথম বারেই মারা পড়লো—কিন্তু তৃতীয় বাঘটির কাঁধে গুলি লাগার পর সে একটি প্রচণ্ড লাফ দিয়ে আমাদের মাঝখানে এসে পড়েছিলো।

'এই বাঘটাকে মারবেন না,' ফান খোইত চীৎকার ক'রে জানালেন, 'এ-বাঘটাকে জ্যান্ত পাকড়াতে চাই।'

কিন্তু প্রাণীতাত্ত্বিকের মুখের কথা শেষ হবার আগেই আহত বাঘটি প্রায় তাঁরই উপর এসে পড়লো। এক ধাক্কায় ফান খোইত কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়লেন—ঠিক তক্ষুনি ক্যাপ্টেন হুড গুলি না-করলে এই *উড়ো ওলন্দাজটিকে* আর বেঁচে থাকতে হ'তো না।

'ক্যাপ্টেন, আপনার আরেকটু অপেক্ষা করা উচিত ছিলো। শেষ পর্যন্ত না-হয় দেখতেন'—

'কী দেখতাম? বাঘের থাবায় কীভাবে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যান, সেই দৃশ্য?'

'একটু নখের আঁচড় লাগলেই যে মরতুম, তা আপনাকে কে বললে ?'

'বেশ,' হুড শান্ত গলায় বললে, 'এর পরের বারে আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব দেখবো —কোনো বাধা দেবো না ।'

পশুশালায় দাঁড়িয়ে গর্জন করার বরাত ছিলো না বাঘটার, বরং বৈঠকখানার দেয়ালের শোভা বর্ধন করাই ছিলো তার নিয়তি । কিন্তু তার ফলে হুডের সংগ্রহ দাঁড়ালো তেতাল্লিশ, আর ফক্সের আটত্রিশ—আগের দিনের আধখানা বাঘ আমরা আর হিশেবেই ধরলুম না ।

হঠাৎ তেইশে জুলাই কয়েকজন পাহাড়ি এসে হাজির স্টীম হাউসে । আমাদের শিবির থেকে মাইল পাঁচেক দূরে তাদের ছোট্ট গ্রামটি—তরাইয়ের জঙ্গলের উপর দিকটায় । তারা তড়বড় ক'রে আমাদের যা বললে তার সারমর্ম দাঁড়ালো এইরকম : গত কয়েক সপ্তাহ ধ'রে একটি বাঘিনী নাকি পুরো অঞ্চলটায় সন্ত্রাসের সৃষ্টি ক'রে চলেছে । ছাগল-ভেড়া উধাও হচ্ছে প্রতিদিন, মানুষের প্রাণও মোটেই নিরাপদ নয় । বসতি তুলে অন্য-কোথাও চ'লে যাবে কিনা ভাবছে তারা । ফাঁদ পেতে তারা ধরবার চেষ্টা করেছিলো বাঘিনীটিকে, কিন্তু বাঘিনীর গায়ে তাতে আঁচড়টিও পড়েনি । গাঁও-বুড়োরা বলছে এ-বাঘিনী নাকি সর্বনাশের দূত—শিগ্‌গিরই এখান থেকে বসতি না-তুলে দিলে সব ছারখার ক'রে দিয়ে যাবে ।

কাহিনীটি শুনেই ক্যাপ্টেন হুড প্রায় লাফিয়ে উঠলো । তক্ষুনি সে পাহাড়িদের প্রস্তাব ক'রে বসলো যে সে তাদের সঙ্গে তাদের গ্রামে গিয়ে সব সরেজমিন তদন্ত ক'রে দেখতে রাজি আছে । এ-রকম একটি দুর্ধর্ষ বাঘিনীর সঙ্গে বোঝাপড়া করার সাধ নাকি তার অনেক দিনের ।

'তুমিও আসবে না কি, মোক্লের ?' আমাকে হুড জিগেস করলে ।

'নিশ্চয়ই,' আমি ব'লে উঠলুম, 'এ-রকম একটা রোমহর্ষক অভিযান আমি ছাড়তে রাজি নই ।'

ব্যাঙ্কস বললে, 'এবার কিন্তু আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো । আমার অনেক দিনের ইচ্ছে হুড কেমন ক'রে শিকার করে, তা দেখে এই চর্মচক্ষু সার্থক করি ।'

'ক্যাপ্টেন, আপনি আমাকে যেতে বলবেন না ?' জিগেস করলে ফক্স ।

'সে কী হে ? এই তো তোমার বাকি আধখানা বাঘিনী মারার সুযোগ !' হুড হেসে উঠলো, 'এই সুযোগ কি কখনও ছাড়া চলে ?...না, না, তোমাকেও যেতে হবে ।'

আমাদের যেহেতু তিন-চার দিন একটানা স্টীম হাউসের বাইরে থাকতে হবে, সেইজন্যে ব্যাঙ্কস সার এডওয়ার্ডকেও জিগেস ক'রে নিলে তিনি আমাদের সঙ্গে পাহাড়িদের গ্রামে যেতে চান কিনা । সার এডওয়ার্ড অবশ্য তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, এই সুযোগে তিনি সার্জেন্ট ম্যাক-নীল আর গৌমিকে নিয়ে আশপাশের অঞ্চলটা একবার টহল দিয়ে ঘুরে আসবেন । আমরা যেন তাঁর জন্যে খামকা কোনো চিন্তা না-করি ।

ব্যাঙ্কস আর তাঁকে বিশেষ পিড়াপিড়ি করলে না । চটপট তৈরি হ'য়ে নিয়েই আমরা

প্রথমে ক্রাল-এর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম ।

ক্রাল-এ যখন পৌঁছুলুম তখন বেলা দুপুর । ফান খোইতকে আমরা আমাদের অভিপ্রায় জানাতেই তিনি কালোগনি ছাড়াও আরো-তিনজন ভারতীয়কে আমাদের সঙ্গে দিয়ে দিলেন । শুধু-একটা চুক্তি ক'রে নিলেন তার আগে—যদি দৈবাৎ কোনো কারণে বাঘিনীটিকে আহত অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহ'লে তাকে ক্রাল-এ দিয়ে যেতে হবে ; কারণ কোনো চিড়িয়াখানায় যদি এ-রকম একটা প্ল্যাকার্ড লটকে দিয়ে জানানো যায়, '*তরাইয়ের এই সম্রাজ্ঞী একদা একটা পুরো গ্রাম ছারখার ক'রে দিয়েছিলো,*' তাহ'লে সেটা নিশ্চয়ই একটা মস্ত আকর্ষণ হ'য়ে উঠবে ।

ক্রাল থেকে বেরিয়ে আমরা যখন পাহাড়িদের গ্রামে গিয়ে পৌঁছুলুম, তখন বেলা চারটে বাজে । গিয়ে দেখি, গ্রামবাসীদের আতঙ্ক সেখানে অসীমে পৌঁছেছে । ঠিক সেইদিনই সকালবেলায় প্রকাশ্য দিবালোকে বাঘিনীটি নাকি একটি যুবককে ধ'রে নিয়ে গেছে ।

আমরা সেই গ্রামে পৌঁছুতেই আমাদের মহাসমাদর ক'রে গ্রামের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটির কাছে নিয়ে যাওয়া হ'লো । ব্যক্তিটি একজন ইংরেজ, সেখানে পাহাড়িদের সঙ্গে থেকে তিনি চাষবাস করেন । তাঁর পক্ষে এই বাঘিনী আরো সাংঘাতিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে : দু-একদিনের মধ্যে বাঘিনীটিকে বধ করা না-গেলে তল্পিতল্পা গুটিয়ে তাঁকে আবার নতুন ক'রে অন্য জায়গায় গিয়ে চাষবাসের উদ্যোগ করতে হবে । এবং সেটা তাঁর মোটেই অভিপ্রেত নয় । ওই বাঘিনীটিকে কেউ যদি ঘায়েল করতে পারে, তাহ'লে তিনি বরং কয়েক হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন, তবু এখানকার বাস ওঠাবেন না । কারণ —তিনি বললেন—একবার যদি এই আতঙ্ককে বাড়তে দেয়া যায়, তাহ'লে আশপাশের চোদ্দ-পনেরোটা গ্রাম একেবারে ছারখার হ'য়ে যাবে ।

'কয়েক বছর আগে,' তিনি বললেন, 'আরেকটি বাঘিনীর জন্যে তেরোটি গ্রামের লোক গ্রাম ছেড়ে চ'লে যেতে বাধ্য হয়েছিলো—আর তার ফলে প্রায় দেড়শো মাইল উর্বর জমি পতিত প'ড়ে থাকে । এবারও যদি এ-রকম কোনো ব্যাপার ঘটে, তাহ'লে পুরো এলাকাটাই আমাদের ছেড়ে যেতে হবে !'

'বাঘিনীটাকে মারবার চেষ্টা করেছেন আপনারা ?' ব্যাঙ্কস জিগেস করলে ।

'সম্ভব-অসম্ভব সব উপায়ই প্রয়োগ করা হয়েছে । ফাঁদ পাতা হয়েছে, মস্ত গর্ত ক'রে উপরে ডালপালা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে, স্ট্রিকনিন-মাখানো মাংস দিয়ে টোপ ফেলে দেখা হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি !'

'আপনাকে অবশ্য এমন কথা দিতে পারবো না যে আমরা বাঘিনীটিকে ঘায়েল করবো,' বললে হুড, 'তবে এইটুকু বলতে পারি যে আমরা চেষ্টার কোনোই ত্রুটি করবো না ।'

সেই দিনই সব তোড়জোড় ক'রে আমরা বেরিয়ে পড়লুম । আমাদের দলের সঙ্গে, যোগ দিলে আরো কুড়িজন পাহাড়ি । ব্যাঙ্কস যদিও আদৌ শিকারি নয়, তবু সে উচ্ছলভাবে অত্যন্ত আগ্রহসহকারে আমাদের সঙ্গে সফরিতে বেরুলো ।

তিনদিন ধ'রে অহোরাত্র খোঁজা হ'লো সেই বাঘিনীকে—কিন্তু তার কোনো পাত্তাই পাওয়া গেলো না ; গোটা তল্লাট থেকেই সে যেন একেবারে উবে গিয়েছে । মাঝখান থেকে হুডের পাল্লায় পড়লো আরো-দুটি বাঘ, এবং হুড কেবল গুনে শেষ হিশেব জানালে আমাদের : 'পঁয়তাল্লিশ ।'

অবশেষে আমরা যখন সেই নরখাদক বাঘিনীর আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি, তখন হঠাৎ এক নতুন দুষ্কর্ম সাধন ক'রে সে তার আগমনবার্তা জানালে আমাদের । আমরা যে-ইংরেজ ভদ্রলোকের অতিথি হয়েছিলুম, তাঁরই একটি মোষ হঠাৎ একদিন খোঁয়াড় থেকে উধাও হ'য়ে গেলো—এবং তার ভুক্তাবশেষ ও হাড়গোড় পাওয়া গেলো গ্রাম থেকে মাইল দু-এক দূরে । হত্যাকাণ্ডটি—আইনের ভাষায়—বলা যায়, সুপরিকল্পিত । সকলের আগেই মোষটিকে নিয়ে সে উধাও হ'য়ে যায় । নানা চিহ্ন দেখে বোঝা গেলো আততায়ী খুব-একটা দূরে নেই—ওই ভুক্তাবশেষেরই আশপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে ।

আমরা অবিশ্যি তবু উটকো একটা প্রশ্ন করলুম, 'এটা কি সেই বাঘিনীরই কাজ ব'লে মনে হয় ? না কি অন্য-কোনো বাঘের কীর্তি ?'

পাহাড়িদের দেখা গেলো এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই । সবাই একবাক্যে জানালে ওটা তারই কাজ । তাদের দ্বিধাহীন রায় শুনে আমরা আর রাতের অপেক্ষা না-ক'রে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লুম । কারণ রাতের অন্ধকারে এই ধূর্ত, ক্ষিপ্র ও ভীষণ বাঘিনী একেবারে বেমালুম নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাবে । খেয়ে-দেয়ে এখন সে নিশ্চয়ই তার ডেরায় গিয়ে ঘাপটি মেরে ব'সে আছে—দু-তিন দিনের মধ্যে হয়তো আর বেরুবেই না ।

যেখান থেকে মোষটাকে বাঘিনীটি টেনে নিয়ে গিয়েছিলো, সেখানে চাপচাপ রক্ত প'ড়ে আছে । সেই রক্তের দাগ লক্ষ ক'রে এগিয়েই আমরা বাঘিনীর ডেরার উদ্দেশে চলতে লাগলুম । রক্তের দাগ গিয়ে শেষ হ'লো একটা ঘন ঝোপের মধ্যে । এই ঝোপটাকে এর আগে খেদা দিয়ে বহুবার ঘেরাও করা হয়েছে—কিন্তু বাঘের ল্যাজের ডগাটিরও দেখা যায়নি । এবার আমরা চারপাশ দিয়ে গোল ক'রে ঝোপটাকে ঘিরে ধরলুম, যাতে কিছুতেই সেই নরখাদক আর পালাতে না-পারে ।

আস্তে-আস্তে সেই গোল মনুষ্যবেড়া ছোটো হ'য়ে আসতে লাগলো । আমি, কালোগনি আর ক্যাপ্টেন হুড রইলুম একদিকে—অন্যদিকে রইলো ফক্স আর ব্যাঙ্কস । কিন্তু দু-দলের মধ্যে যোগাযোগ আমরা একটুও ছিন্ন করিনি—প্রতি মুহূর্তেই সংবাদ আদান-প্রদান করা হচ্ছিলো ।

বাঘটা যে ঝোপের মধ্যেই আছে, তাতে কোনো সন্দেহ ছিলো না । কারণ রক্তের দাগ গিয়ে শেষ হয়েছে ঝোপের মধ্যে, অথচ অন্য পাশে আর-কোনো রক্তের দাগ নেই । অবশ্য তার মানে এই নয় যে বাঘটার ডেরা এই ঝোপে, কারণ আগে যখন ঝোপটা খোঁজা হয় তখন বাঘটাকে এখানে পাওয়া যায়নি । হয়তো এটা তার সাময়িক বিশ্রামের স্থান ।

বেলা তখন মাত্র আটটা । সাড়ে-আটটার মধ্যেই আমাদের গণ্ডি আরো ছোটো

হ'য়ে এলো । পাশের লোকটিকে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, এত ছোটো হয়েছে গণ্ডি । কিন্তু ভিতরে কোনো সাড়াশব্দ নেই—ঝোপের মধ্যটা অদ্ভুতরকম স্তব্ধ হ'য়ে আছে । শেষটায় আমার মনে হ'তে লাগলো বাঘটা হয়তো ঝোপের মধ্যে আর নেই—আমরা মিছিমিছি এইভাবে সময় নষ্ট করছি ।

আরো-ছোটো হ'য়ে এলো আমাদের গণ্ডি—আর তারপরেই হঠাৎ ঝোপের মধ্য থেকে একটা চাপা রাগি গর্জন উঠলো । শব্দ শুনে বোঝা গেলো কতগুলো পাথর আর গাছের আড়ালে বাঘটা ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে ।

হুড, ব্যাঙ্কস, ফক্স, কালোগনি ও আরো-কয়েকজন পাহাড়ি তখন ঝোপের মুখটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে ।

'ভিতরেই ঢুকে পড়ি এবার,' হুড পরামর্শ দিলে ।

'সেটা অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে—বিশেষ ক'রে প্রথমে যে যাবে, তার পক্ষে,' বললে ব্যাঙ্কস ।

হাতের রাইফেলটা তুলে হুড বললে, 'তবু আমি যাবো—'

'আমি আগে যাবো, ক্যাপ্টেন,' ফক্স ঝোপের দিকে পা বাড়ালো ।

'না, না, ফক্স—এটা সম্পূর্ণ আমার ব্যাপার,' হুড বাধা দিলে ।

'কিন্তু ক্যাপ্টেন, আমি আপনার চেয়ে ছটা বাঘ পিছিয়ে আছি—'

তক্ষুনি ব্যাঙ্কস ফতোয়া জারি করলে, 'উঁহু, তোমাদের দুজনের কাউকেই আমি ঝোপের মধ্যে ঢুকতে দেবো না ।—কিছুতেই না ।'

'ঝোপে ঢোকবার কী দরকার ? আরো তো একটা উপায় আছে,' বললে কালোগনি ।

'কী ?'

'ও-পাশে আগুন দিয়ে দিলেই হয়—ধোঁয়া আর আগুনের জন্যে বাধ্য হ'য়ে তাকে বেরুতেই হবে ! আর একবার গাছের আড়াল থেকে বেরুলে বাঘটাকে মারাও অনেক সহজ হ'য়ে উঠবে ।'

'কালোগনি ঠিকই বলেছে,' ব্যাঙ্কস সায় দিলে, 'এসো, চটপট কিছু শুকনো ডালপালা ও ঘন-পাতা একজায়গায় জড়ো করো—তারপর তাতে আগুন দাও । তাতে হয় তাকে জ্যান্ত ঝলসে মরতে হবে নয়তো বেরুতেই হবে বাইরে ।'

'বেরিয়ে যদি পালিয়ে যায়,' পাহাড়িরা আপত্তি করলে ।

'তাহ'লে তার আগেই তাকে আমরা অভিনন্দন জানাবো,' হুড তার রাইফেল তুলে দেখালে ।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুকনো পাতা, ঘাস, ডালপালা জড়ো ক'রে আগুন ধরিয়ে দেয়া হ'লো—অমনি কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠলো—আর হাওয়ার তোড়ে সেই ধোঁয়া ঢুকতে লাগলো ঝোপের মধ্যে । এবার আরেকটা রাগি, হিংস্র গর্জন উঠলো ঝোপ থেকে বোঝা গেলো, অচিরেই বাঘটা ঝোপ থেকে লাফিয়ে বেরুবে ।

উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত ভাবে আমরা ঝোপের দিকে তাকিয়ে রইলুম, আর হুড পছন্দসই একটা জায়গা বেছে নিয়ে রাইফেল তুলে ধরলো। হঠাৎ ঝোপের মধ্যটা প্রচণ্ডভাবে ন'ড়ে উঠলো। হাঁটু গেড়ে বসলো হুড, রাইফেল তাগ-করা ঝোপের দিকে, সমস্ত শরীর তার ধনুকের ছিলার মতো টান-করা।

হঠাৎ ধোঁয়ার মধ্য থেকে একটা প্রকাণ্ড জন্তু সবেগে বেরিয়ে এলো।

একসঙ্গে গ'র্জে উঠলো দশটি বন্দুক—কিন্তু, আশ্চর্য, বাঘের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত পড়লো না। হুড তখনও হাঁটু গেড়ে ব'সে রাইফেল তাগ ক'রে আছে— বাঘিনীটা যেই আরেকটু এগুলো, অমনি তার কাঁধ লক্ষ্য ক'রে হুডের রাইফেল গ'র্জে উঠলো। কিন্তু সেই মুহূর্তেই বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্র সেই বাঘিনী লাফিয়ে পড়লে হুডের উপর। থাবার একটা আঘাতে এক্ষুনি তার মাথার খুলি ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাবে—

কিন্তু পরমুহূর্তে তীক্ষ্ণ ছুরি হাতে কালোগনি লাফিয়ে পড়লো বাঘের উপর। হঠাৎ এমনভাবে আক্রান্ত হ'য়ে বাঘিনী এবার তার দিকেই ফিরলো।

সেই ফাঁকে হুড ক্ষিপ্রভাবে লাফিয়ে উঠলো। কালোগনির হাত থেকে ছুরিটা প'ড়ে গিয়েছিলো—সেটা তুলে বাঘিনীর বুকে বসিয়ে দিলো আস্ত, একেবারে বাঁটশুদ্ধ বাঘিনীটা গড়িয়ে প'ড়ে গেলো।

পরক্ষণেই পাহাড়িদের সমস্বর উল্লাস শোনা গেলো : 'শের মর গিয়া ! শের মর গিয়া !'

সত্যি, ম'রে গিয়েছে ! দশ ফিট লম্বা, ল্যাজ সমেত—চিক্কণ, নধর, পেশল—সম্রাজ্ঞীর মতোই, সত্যি !

পাহাড়িরা যখন সেই রানীবাঘকে ঘিরেই উল্লাসে নৃত্য করছে, কালোগনি আস্তে হুডের দিকে এগিয়ে গেলো। 'আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, সাহেব।'

'ধন্যবাদ কীসের ! আমিই তো উলটে তোমাকে ধন্যবাদ দেবো—তুমি না-থাকলে এতক্ষণে আমি অক্কা পেতুম !'

'কিন্তু আপনি বাঘটা না-মারলে আমাকেও মরতে হ'তো,' ঠাণ্ডা গলায় বললে কালোগনি, 'আপনার ছেচল্লিশ নম্বর এটা ! আমি আর কীই-বা করেছি !'

হুড আর কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রে কালোগনির হাত ধ'রে কৃতজ্ঞতাভরে ঝাঁকুনি দিলে।

ব্যাঙ্কস বললে, 'কালোগনি, চ'লে এসো আমাদের *স্টীম হাউসে, বেহেমথে*। তোমার কাঁধ থেকে রক্ত ঝরছে—ওষুধ লাগিয়ে দেবো।'

কালোগনি কোনো আপত্তি করলে না। পাহাড়িদের সমস্বর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে আমরা *স্টীম হাউসের* দিকে রওনা হ'য়ে পড়লুম। ফান খোইতের অন্যান্য অনুচরেরা ক্রালের দিকে ফিরে গেলো।

বেহেমথে ফিরে এলুম দুপুর নাগাদ। এসে দেখি, সার্জেন্ট ম্যাক-নীল আর গৌমিকে নিয়ে কর্নেল মানরো বেরিয়ে গেছেন ; ছোট্ট একটা চিরকুটে লিখে গেছেন,

তিনি নানাসাহেবের সন্ধানে চললেন—নানাসাহেব নেপালে আছেন কিনা, এটা তিনি সঠিক জানতে চান।

চিরকুটটা যখন পড়া হচ্ছিলো, তখন হঠাৎ আমি তাকিয়ে দেখলুম কালোগনির মুখের ভাব যেন আচমকা কী-রকম অদ্ভুত হ'য়ে উঠলো ! কেন ? নানাসাহেবের নাম শুনে ? কিছুই ঠিক বুঝতে পারলুম না।

৪

মাতিয়াস ফান খোইতের বিদায়

সার এডওয়ার্ডের অপ্রত্যাশিত প্রস্থান আমাদের সবিশেষ ভাবিয়ে তুললো। এখানে আসার পর থেকেই লক্ষ করছিলুম, তিনি কেমন যেন গম্ভীর হ'য়ে আছেন। যখনই পাহাড়িরা আমাদের শিবিরে আসতো, তখনই তিনি তাদের নানারকম প্রশ্ন করতেন, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিগেস ক'রে নানাসাহেবের হদিশ জানবার চেষ্টা করতেন। স্পষ্ট বোঝা যেতো, অতীতের ঘটনা তিনি মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে পারেননি।

কিন্তু এখন, এ-রকম অবস্থায়, আমরা কী করবো ? অনুসরণ করবো তাঁকে ? কিন্তু তিনি যে কোন দিকে গেছেন, তা-ই তো জানি না। নেপালের সীমান্তের কোন জায়গাটাই বা তিনি খুঁজে দেখতে চান, তাও আমাদের জানা নেই। তাছাড়া আগে থেকে যেহেতু তিনি এ-সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করেননি, তার কারণই হ'লো তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে তিনি অন্যকে বিরক্ত করতে চান না—এ ছাড়া ব্যাঙ্কস আগে থেকে এ-কথা শুনলে হয়তো তাঁকে বাধা দেবারও চেষ্টা করতো, যেটা তাঁর ঠিক মনোমতো হ'তো না। এখন আমরা কেবল তাঁর ফিরে-আসার জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর-কিছুই করতে পারি না। নিশ্চয়ই অগস্ট মাস শেষ হবার আগেই তিনি ফিরে আসবেন, কেননা ঠিক ছিলো *বেহেমথ* অগস্টের শেষাশেষি কি সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে বম্বাই প্রেসিডেন্সির দিকে রওনা হবে।

কালোগনি মাত্র একদিনই ছিলো *স্টীম হাউসে*; ব্যাঙ্কসের চিকিৎসায় যখন তার আশু উন্নতি দেখা দিলো, তখন সে ক্রাল-এ নিজের কাজে যোগ দেবার জন্যে ফিরে গেলো। ক্ষতটা শিগগিরই শুকিয়ে যাবে—তা থেকে ভয়ের কোনোই কারণ নেই।

অগস্ট মাস এলো ভয়ানক ঝড়বৃষ্টির মধ্যে—আবহাওয়া এতটাই খারাপ হ'য়ে গেলো যে ব্যাঙেরও সর্দি হবার আশঙ্কা দেখা দিলে। তবু শুকনো দিনগুলো হয়তো সংখ্যায় জুলাই মাসের চেয়ে বেশি। সেইজন্যেই তরাইয়ের জঙ্গলে মাঝে-মাঝে শিকারে বেরুনো

গেলো। ক্রাল-এর সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হ'লো। মাতিয়াস ফান খোইত আর-কিছুতেই তুষ্ট নন—তাঁকেও সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে চ'লে যেতে হবে, কিন্তু এখনও সেই একটি সিংহ, দুটো বাঘ আর দুটো চিতা তিনি পাকড়াও ক'রে উঠতে পারেননি।

সিংহটা অবশেষে ধরা পড়লো। ৬ই অগস্ট—ফান খোইতের পাতা ফাঁসে। এতদিন ধ'রে সিংহের দেখা না-পেয়ে-পেয়ে তিনি শেষটায় ভাবতে বসেছিলেন যে ভারতের জঙ্গলে বোধ হয় সিংহ পাওয়াই যায় না। যেই তিনি সিংহের আশা ছেড়ে দিলেন, অমনি তাঁরই পাতা দড়ির ফাঁসে সিংহটা ধরা পড়লো। শুধু তা-ই নয়, ফাঁসটা লক্ষ না-করলে ক্যাপ্টেন হুড হয়তো সিংহটাকে গুলিই ক'রে বসতো, কিন্তু ভাগ্যিশ ফান খোইত সঙ্গেই ছিলেন, সেইজন্যে আগে থেকেই হুডকে বারণ করতে পারলেন।

আর সিংহটাই বুঝি তাঁর কপাল খুলে দিলে। ১১ই অগস্ট সেই ফাঁদে—যে-ফাঁদে ফান খোইত নিজেই আটকা পড়েছিলেন একদা—পড়লো দুটো চিতাবাঘ—রোহিলখণ্ডে যে-রকম একটি চিতা উদ্ধতভাবে *বেহেমথকে* আক্রমণ করেছিলো না-বুঝে, চিতা দুটো ছিলো সেই জাতের।

এর পরে কেবল বাকি রইলো দুটো বাঘ—তাহ'লেই ফান খোইতের তালিকা সম্পূর্ণ হয়।

ইতিমধ্যে হুড আর ফক্সের তালিকাও স্থির হ'য়ে বসে নেই—তাও ক্রমশ ফেঁপেই চলেছে ; হুডের সংগ্রহ হয়েছে আটচল্লিশ নম্বর, ফক্স তার উনচল্লিশ নম্বরটিকে ঘায়েল করতে একটুও দ্বিধা করেনি—; কালো নেকড়ে বাঘটিকে হিশেবে ধরলে ফক্সের তহবিল অবশ্য চল্লিশেই পূর্ণ হ'তো।

২০শে অগস্ট ফান খোইত একটি বাঘ পেলেন গর্তের মধ্যে : গভীর গর্ত খুঁড়ে তার উপর ডালপালা বিছিয়ে রাখা পাহাড়িদের বন্য জন্তু শিকারের প্রাচীন পদ্ধতি। সেইজন্যেই হয়তো সব জন্তুই এতদিন সন্তর্পণে ওই সন্দেহজনক গর্তটি এড়িয়ে চলছিলো। যে-বাঘটি গর্তে পড়েছিলো, সে এত উঁচু থেকে অতর্কিতে প'ড়ে যাওয়ার ফলে বেশ আহত হয়েছিলো, কিন্তু আঘাতটা মোটেই সীরিয়াস ছিলো না। কয়েকদিন খাঁচার মধ্যে বিশ্রাম করলেই সেটা সেরে যাবে। ফান খোইত যখন হামবুর্গের হের হাগেনবেককে বাঘটা সমঝে দেবেন, তখন আঘাতের কোনো চিহ্নই থাকবে না।

এখন কেবল আর-একটা মাত্র বাঘ পেলেই ফান খোইতের চাহিদা মেটে। তাহ'লেই তিনি বম্বাই গিয়ে জাহাজ ধরতে পারেন।

সেই শেষ বাঘটিকে সংগ্রহ করতে অবশ্য বেশি দেরি হ'লো না, কিন্তু তার জন্যে যে দাম দিতে হ'লো সেটা নেহাৎ কম নয়। আগে জানলে ফান খোইত হয়তো আর শেষ শার্দুলটির জন্য অপেক্ষা করতেন না।

২৬শে অগস্ট রাত্রে শিকারে বেরুবার পরিকল্পনা ছিলো ক্যাপ্টেন হুডের। নির্মেঘ শান্ত আকাশ, স্তব্ধ ক্ষীণ চাঁদ—সমস্ত-কিছুই শিকারের পক্ষে খুব অনুকূল। একেবারে ঘন কালো অন্ধকার রাতে জন্তুরা অনেক সময়েই ডেরা ছেড়ে বেরোয় না ; তার চেয়ে

অর্ধ-আলোকই তাদের আকর্ষণ করে বেশি। আলোছায়ার মধ্যেই গভীর রাতে এই নিশাচরেরা শিকারের সন্ধানে গুঁড়ি মেরে-মেরে এগোয় বনের মধ্যে। মাঝরাতের পর যখন চাঁদ উঠবে—হুড ঠিক করেছিলো—তখনই সে শিকারে বেরুবে।

হুড, ফক্স, স্টর আর আমি—ঠিক ছিলো *স্টীম হাউস* থেকে এই চারজনে বেরুবো—আর ক্রাল থেকে ফান খোইত স্বয়ং কালোগনি ও আরো-কয়েকজন অনুচরকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেবেন।

সেইজন্যেই সান্ধ্যভোজ শেষ হ'তেই আমরা চারজনে *স্টীম হাউস* থেকে বেরিয়ে পড়লুম ; প্রথমে ক্রাল-এ যাবো ; সেখান থেকে ফান খোইতদের নিয়ে একেবারে বনের মধ্যে ঢুকবো।

ক্রাল-এ যাবার পর ফান খোইত আমাদের সব পরিকল্পনা শুনে বললেন, যেহেতু মাঝরাতের আগে আমরা শিকারে বেরুচ্ছি না, সেইজন্যে তিনি এই সুযোগে দু-এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে চান। জৃম্ভন সহযোগে এই তথ্যটি জানিয়ে তিনি শোবার ঘরে চ'লে গেলেন, ব'লে গেলেন ইচ্ছে করলে আমরাও খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে পারি, আর ঘুম-টুম যদি একান্তই আমাদের না-আসে তাহ'লে গোটা ক্রালটাই রইলো আমাদের তত্ত্বাবধানে—আমরা যা খুশি তা-ই করতে পারি।

কাঁচা ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলাতে-কচলাতে শিকারে যাবার কথাটা আমার মোটেই পছন্দ হ'লো না ; তার চেয়ে একটুও না-ঘুমুনোই ভালো ; সেইজন্যে আমি হুডের সঙ্গে ক্রাল-এর মধ্যেই গল্প ক'রে-ক'রে ঘুরতে লাগলুম। ফান খোইতের বহুমূল্য ও হিংস্র সম্পত্তিগুলোকে টহল দিয়ে দেখে এলুম একবার, বাঘ-সিংহ, নেকড়ের খাঁচায় জন্তুগুলো ব'সে-বসে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝিমুচ্ছে। গল্প করতে-করতে আমরা তাদের একবার দেখে এলুম। ঘণ্টাখানেক সময় এইভাবেই কাটিয়ে দেয়া গেলো। তারপর আর-কিছু করার না-পেয়ে ব'সে-ব'সে ঢুলতে লাগলুম দুজনে। চারপাশ কী-রকম স্তব্ধ হ'য়ে আছে, বেশ অস্বাভাবিক রকম। কোথাও কোনো নিশাচরের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না—সব কেমন অদ্ভুত চুপচাপ। এত চুপ, যে সেই স্তব্ধতা যেন বুকের উপর চেপে ব'সে যায়। জঙ্গলের মধ্যে এ-রকম ছমছমে ভুতুড়ে স্তব্ধতা কেন যেন মানায় না।

স্তব্ধতা কেমন যেন আমাদেরও আক্রান্ত করেছিলো। সেইজন্যেই হুড স্তব্ধতা না-ভেঙেই ফিশফিশ ক'রে আমাকে বললে, 'মোক্লের, এই চুপচাপ ভাবটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না। জঙ্গলের চেয়ে শোরগোলভরা জায়গা খুব কমই আছে। বাঘ-সিংহের গর্জন না-শুনলেও শেয়ালের ডাক তো সারা রাতই শোনা যায়। আর এই ক্রাল-এ এত জীবজন্তু ও মানুষ আছে যে সহজেই তারা এর দ্বারা আকৃষ্ট হ'তো। অথচ দ্যাখো, কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না—শুকনো পাতার শব্দ পর্যন্ত না। ফান খোইত জেগে থাকলে তাঁরও নিশ্চয়ই এটা খুব অদ্ভুত ঠেকতো।'

'ঠিকই বলেছো, হুড,' আমি বললুম, 'নিশাচরদের এই স্তব্ধতার কোনো কারণ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। যা-ই হোক—একটু সাবধানে থেকো, না-হ'লে শেষটায় দেখো, ঘুম পেয়ে যাবে।'

'না, না, ঘুমিয়ো না।' আড়মোড়া ভেঙে হুড বললে, 'আরেকটু পরেই আমাদের রওনা হ'তে হবে।'

মাঝে-মাঝে দু-একটা কথা বলছি, কিন্তু ক্রমশই কথাগুলো জড়িয়ে আসছে। ব'সে-ব'সে ঢুলছি কেবল : চেতনাটা কেমন শিথিল হ'য়ে আসছে। হঠাৎ একটা রুষ্ট চাপা গর্জনে আমার ঝিমুনি ভেঙে গেলো। গর্জনটা যে বুনো জন্তুদের খাঁচা থেকে এলো সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ রইলো না। কারণ পরমুহূর্তে বাঘ-সিংহের চাপা-চাপা রাগি গরগর আওয়াজ ভেসে এলো। খাঁচার মধ্যে উত্তেজিতভাবে তারা পায়চারি করছে —মাঝে-মাঝে খাঁচার শিকের কাছে দাঁড়িয়ে হাওয়ার মধ্য থেকে কীসের গন্ধ শুঁকছে, বোধহয় দূরের কোনো-কিছুর গন্ধ পাচ্ছে তারা।

'কী ব্যাপার, বলো তো হুড,' আমি জিগেস করলুম।

'কিছুই তো বুঝতে পারছি না। ভয় হচ্ছে ওরা বুঝি দূরের কিছুর গন্ধ...'

হুডের কথা শেষ হবার আগেই ক্রাল-এর বেড়ার বাইরে বুনো জন্তুদের ভীষণ গর্জন উঠলো।

'কী সর্বনাশ! বাঘ!' ব'লেই হুড ফান খোইতের ঘরের দিকে হুড়মুড় দৌড় দিলে।

হুডের অবশ্য ছুটে-যাবার কোনোই দরকার ছিলো না। কারণ সেই বিকট গর্জন শুনে ততক্ষণে ক্রাল-এর সবাই ধড়মড় ক'রে জেগে উঠেই বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

'চড়াও হয়েছে না-কি এসে?' চেঁচিয়ে জিগেস করলেন ফান খোইত, ঘর থেকে তিনি ছুটে বেরিয়ে আসছেন।

'তা-ই তো মনে হয়,' হুড জানালে।

'দাঁড়ান, একবার দেখে নিই।' ব'লে একটা মই নিয়ে বেড়ার গায়ে ঠেশ দিয়ে ফান খোইত তরতর ক'রে উপরে উঠে গেলেন। উঠেই চীৎকার ক'রে জানালেন, 'দশটা বাঘ আর ডজন খানেক নেকড়ে!'

'ব্যাপারটা তো ঘোরালো ঠেকছে খুব,' বললে হুড, 'আমরাই তাদের শিকার করছিলুম এতকাল—এবার দেখছি তারাই আমাদের শিকার করতে এসেছে!'

'বন্দুক—আপনাদের বন্দুক নিন!' ফান খোইত চেঁচিয়ে জানালেন।

আদেশ পালন করতে আমরা একটুও দেরি করলুম না : তক্ষুনি যে যার বন্দুক বাগিয়ে তৈরি হ'য়ে দাঁড়ালুম।

দল বেঁধে বন্য হিংস্র জন্তু এসে চড়াও হচ্ছে, দাঁত-নখ বেঁধাচ্ছে, এই ব্যাপারটা ভারতবর্ষে খুব দুর্লভ নয়। বিশেষ ক'রে যে-সব জায়গায় বাঘ ঘুরে বেড়ায়, সে-সব জায়গায় এটা হামেশা হয়; সুন্দরবন অঞ্চলে বাংলাদেশের রাজা-বাঘ কতবার যে এমনি সদলে দিগ্বিজয়ে বেরোয়, তার ইয়ত্তা নেই। ব্যাপারটা যে ভয়ংকর, তা তর্কাতীত—কারণ প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় আক্রমণকারীরা বিজয়গর্বে সবকিছু বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত ক'রে চ'লে গিয়েছে।

ততক্ষণে বাইরের দুরন্ত দমকা গর্জনের সঙ্গে খাঁচার মধ্যেকার জন্তুদের চাপা, রাগি, ক্ষুব্ধ চীৎকার মিশে গিয়েছে । বনের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে ক্রাল—জন্তুদের এই কথোপকথনের মধ্যে আমাদের কথা সব চাপা প'ড়ে যাচ্ছিলো ।

মোষগুলো তখন আতঙ্কে ও বিভীষিকায় একেবারে যেন খেপে গিয়েছে—ছুটে পালাবার চেষ্টা করছে তাদের খোঁয়াড় থেকে—খামকাই ফান খোইতের অনুচরেরা তাদের সামলাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু মোষদের তীব্র সন্ত্রস্ত ভাবগতিকে মনে হচ্ছে না যে তাদের সামলানো যাবে ।

এমন সময় ক্রাল-এর দরজা সশব্দে খুলে গেলো—সম্ভবত দরজাটা তেমন শক্ত ক'রে আটকানো হয়নি সন্ধেবেলায়—এবং হুড়মুড় ক'রে ভিতরে ঢুকে পড়লো একদঙ্গল বুনো জন্তু ।

'সবাই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ুন, ঘরের মধ্যে,' ফান খোইত ছুটতে-ছুটতেই চ্যাঁচালেন । আত্মরক্ষার আশ্রয় বলতে সত্যি ঘরের মধ্যে ঢুকে-পড়া ছাড়া আমাদের তখন আর-কিছু করার ছিলো না । কিন্তু ঘর পর্যন্ত পৌঁছুনো যাবে কিনা, তা-ই সন্দেহ । এর মধ্যেই ফান খোইতের দুটি অনুচরের ছিন্নভিন্ন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে । অন্যরা পাগলের মতো যে-কোনো-একটা আশ্রয়ের জন্যে এলোমেলো উদ্‌ভ্রান্ত ছুটছে ।

ফান খোইত, স্টর আর ছ-জন অনুচর ততক্ষণে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে—দুটো বাঘ লাফাবার উদ্যোগ করেছিলো, কিন্তু তার আগেই তারা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে ।

কালোগনি, ফক্স আর অন্যরা প্রাণপণে আশপাশের গাছগুলোর মগডালে উঠে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। কেবল আমি আর ক্যাপ্টেন হুডই ফান খোইতের সঙ্গে যোগ দেবার একফোঁটাও সুযোগ পাইনি ।

'মোক্লের ! মোক্লের !' হুডের ডান হাতটায় তক্ষুনি একটা চোট লেগেছে, তা সত্ত্বেও সে আমাকে সাবধান ক'রে দেবার চেষ্টা করলে । কিন্তু আমি ততক্ষণে একটা মস্ত বাঘের ল্যাজের ঘায়ে মাটিতে ছিটকে পড়েছি । বাঘটা আমাকে কব্জা করার আগেই লাফিয়ে উঠে আমি হুডের সাহায্যের জন্যে ছুটে গেলুম ।

তখনও আমাদের একটা আশ্রয় ছিলো । জানোয়ারদের খাঁচায় তখনও একটা কামরা ছিলো ফাঁকা—যে-বাঘটা ধরা হয়নি তারই জন্যে ওই কামরাটা নির্দিষ্ট ছিলো । আমরা হুড়মুড় ক'রে সেই খাঁচাটার মধ্যে গিয়ে ঢুকেই খাঁচার দরজা বন্ধ ক'রে দিলুম । আপাতত কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত নিরাপদ । জন্তুগুলো তখন খাঁচার লোহার গরাদের উপর ঝাঁপিয়ে গরগর ক'রে চাপা রাগে ভীষণ গর্জাচ্ছে । আর তাদের ধাক্কায় আস্ত খাঁচাটাই বুঝি উলটে ডিগবাজি খেয়ে যায় । কিন্তু বাঘেরা—তারাই সবচেয়ে সাংঘাতিক—তক্ষুনি অন্য শিকারের খোঁজে সেখান থেকে চ'লে গেলো—লোহার গরাদ ভেঙে আমাদের পাকড়াবার চেষ্টা সম্ভবত স্থগিত রাখলো কিছুক্ষণের জন্য ।

সে কী দৃশ্য ! গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখলুম ব'লেই কোনো খুঁটিনাটিই আমাদের

চোখ এড়ালো না ।

'গোটা পৃথিবীটাই যেন ভিরমি খেয়ে চিৎপাত উলটে পড়ছে,' হুড তখন রাগে প্রায় কাঁপছে । 'ব্যাপারটা একবার ভাবো, মোক্লের ! কী পরিহাস ! জন্তুগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে বাইরে, স্বাধীন ভাবে—আর আমরা কিনা বন্দী হ'য়ে আছি খাঁচায় ?'

'তোমার যে-চোট লেগেছিলো, সেটা কেমন—' আমি জিগেস করলুম ।

'ও-কিছু না—সামান্য ।'

এমন সময় পর-পর পাঁচ ছটা গুলির আওয়াজ শোনা গেলো । ঘরের মধ্যে থেকে ফান খোইতরা গুলি চালাতে শুরু করেছেন—আর ঘরের চারপাশে রক্তের স্বাদে খেপে গিয়ে গর্জাচ্ছে দুটো বাঘ আর তিনটে নেকড়ে ।

স্টরের বুলেটে একটা জন্তু প'ড়ে গেলো নিস্পন্দ । বাকিগুলো তখন পেছিয়ে গিয়ে শেষটায় একযোগে মোষের খোঁয়াড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ।

ফক্স, কালোগনি ও অন্যরা তাড়াহুড়োয় বন্দুক-টন্দুক ফেলেই গাছে উঠে পড়েছিলো—তারা এই অবস্থায় কোনো সাহায্যই করতে পারছে না ।

ক্যাপ্টেন হুডের ডান হাতটা আবার চোট পেয়ে প্রায় অবশ হ'য়ে আছে । তবু, সেই অবস্থাতেই, গরাদের ফাঁক দিয়ে কোনো-রকমে বন্দুক তাগ ক'রে ধ'রে সে তার উনপঞ্চাশ নম্বরটিকে দখল ক'রে নিলে ।

মোষগুলো তখন লাফিয়ে বেরিয়ে পড়েছে খোঁয়াড় থেকে । খ্যাপার মতো দাপাদাপি করছে—আতঙ্কে ডাকতে-ডাকতে ক্রালের এপাশ-ওপাশ ছুটে বেরুচ্ছে—মাঝে-মাঝে চেষ্টা করছে মাথার শিঙ দিয়ে বাঘদের এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে ফেলতে—কিন্তু বাঘগুলো সাবধানে তাদের শিঙের নাগাল থেকে দূরে পাক খেয়ে-খেয়ে তাদের তাড়া লাগাচ্ছে । একটা মোষের কাঁধে লাফিয়ে উঠেছে কালো একটি নেকড়ে—দাঁত-নখ বসিয়েছে তার ঘাড়ে, শেষটা ঐ অবস্থাতেই মোষটা ক্রাল-এর খোলা দরজা দিয়ে হুড়মুড় ক'রে ছুটে চ'লে গেলো বাইরে, জঙ্গলের অন্ধকারে ।

আরো পাঁচ-ছটা মোষ বাঘের তাড়ায় তারই মতো ওই খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো—দু-তিনটি বাঘও তক্ষুনি তাদের পিছু-পিছু ছুটলো । কেবল যে-মোষগুলো বাঘ-নেকড়ের থাবা এড়াতে পারেনি, তাদের রক্তাপ্লুত দেহ গড়াগড়ি যেতে লাগলো মাটিতে ।

ফান খোইতের ঘরের জানলা দিয়ে অবিরাম বন্দুক গর্জাচ্ছে । আমি আর হুড যথাসাধ্য করবার চেষ্টা করছি খাঁচার মধ্য থেকে । আর ইতিমধ্যে একটা নতুন বিপদ দেখা দেবার উপক্রম করছে । খাঁচার মধ্যেকার জন্তুগুলো রক্তের গন্ধে ও এই শোরগোলে ভীষণ দাপাদাপি শুরু ক'রে দিয়েছে—খাঁচা ভেঙে বেরুবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে । থরথর ক'রে কাঁপছে চাকা-লাগানো খাঁচাগুলো, একটা বাঘের খাঁচা উলটে পড়লো, একটা চাকা শূন্যে ঘুরে গেলো একবার । ভয় হ'লো, জন্তুগুলো শেষটায় হয়তো খাঁচা ভেঙে বেরিয়েই পড়ে বুঝি-বা ।

সৌভাগ্যই বলতে হবে যে তেমনতর কিছুই ঘটলো না । হুড তার বন্দুকে টোটা

ভরতে-ভরতে বললে, 'এ-যে দেখছি কিছুতেই ফুরোয় না ! *এতগুলো* এসেছিলো !'

এমন সময় একটা বাঘ ফান খোইতের অনুচরেরা যে-গাছে আশ্রয় নিয়েছিলো তার ডাল লক্ষ্য ক'রে এমন একটা লম্ফ দিলে যে আঁৎকে উঠলুম । বিশ্ব-রেকর্ড ভঙ্গ ক'রে বাঘটা শেষটায় একটি পাহাড়ির পা কামড়ে তাকে সবেগে টেনে নিয়ে এলো মাটিতে । কিন্তু তখন সেই মৃতদেহটির স্বত্ব নিয়ে কোত্থেকে একটি নেকড়ে এসে সেই বাঘটির সঙ্গে লড়াই শুরু ক'রে দিলে । রক্তে মাখামাখি থাবা তাদের—হাড়ের শব্দ হচ্ছে মড়মড়, কষ বেয়ে তাদের রক্ত গড়াচ্ছে ।

আমাদের গোলা-গুলি ততক্ষণে ফুরিয়ে গেছে । অসহায় দর্শক ব'লে সমস্ত দৃশ্যটা বিস্ফারিত চক্ষে অবলোকন করা ছাড়া আমাদের আর-কোনো উপায় নেই ।

কিন্তু সেই বীভৎস দৃশ্য অবশ্য আর আমাদের দেখতে হ'লো না । আমাদের পাশের খাঁচায় একটা বাঘ এত হুটোপাটি করছিলো যে তার ধাক্কায় আমাদের খাঁচাটা উলটে গেলো । ভিতরে আমরা ডিগবাজি খেলুম বার-দুই, কিন্তু খাঁচাটা এমনভাবে উলটেছিলো যে বাইরে কী হচ্ছে না-হচ্ছে আর দেখা গেলো না ।

দেখা গেলো না সত্যি, কিন্তু শোনা গেলো । সে কী কানে-তালা লাগানো গর্জন ও দাপাদাপি ! তাজা রক্তের গন্ধ ভাসছে হাওয়ায় । বাইরে যেন তাণ্ডব চলছে একটা —ভারতীয় ধরনে বলা যায় । খাঁচাগুলো ভেঙে অন্য জন্তুগুলো বেরিয়ে পড়েছে নাকি ? ফান খোইতের ঘরটা কি একযোগে চড়াও হ'য়ে তারা ভেঙে ফেলেছে ? না কি লাফ দিয়ে-দিয়ে গাছগুলো থেকে একজন-একজন ক'রে মানুষ পাকড়াও করছে তারা ?

'কী হচ্ছে কিছুই বুঝছি না—আর আমরা কিনা এই নোংরা সিন্দুকটায় বন্দী হ'য়ে প'ড়ে আছি,' রাগে ক্ষোভে ক্যাপ্টেন হুড আর-কিছু বলতে পারলে না ।

প্রায় পনেরো-বিশ মিনিট কেটে গেলো এইভাবে—কিন্তু এই সময়টুকুকেই মনে হ'লো অনন্তকাল । আর তারপরেই বাইরের সেই বীভৎস গর্জন ক্রমে শান্ত হ'য়ে আসতে লাগলো । বাঘের ডাক আর শোনা যাচ্ছে না, পাশের খাঁচাগুলোতেও জন্তুদের দাপাদাপি বন্ধ হ'য়ে এলো । তাহ'লে কি রক্তারক্তি কাণ্ড শেষ হ'লো অবশেষে ? তক্ষুনি শুনতে পেলুম সশব্দে বন্ধ করা হ'লো ক্রাল-এর দরজা । বাইরে কালোগনি চেঁচিয়ে আমাদের নাম ধ'রে হাঁক পাড়ছে : 'ক্যাপ্টেন ! ক্যাপ্টেন !'

'এই-যে, এদিকে !' হুড চেঁচিয়ে জানালে ।

তার কথা নিশ্চয়ই বাইরে শোনা গেলো, কারণ পরক্ষণেই খাঁচাটাকে ধরাধরি ক'রে ঠিক-মতো বসানো হ'লো চাকার উপর—আমরা জন্তুদের খাঁচা থেকে মুক্তি পেলুম ।

'ফক্স ! স্টর !' বেরিয়ে এসেই হুড প্রথমেই নিজের সঙ্গীদের খোঁজ করলে ।

'এই-যে, আমরা এখানে আছি !' সাড়া পাওয়া গেলো তাদের ।

আশ্চর্য ! তারা একটুও আহত হয়নি । ফান খোইত আর কালোগনির দেহেও কোনো আঁচড় লাগেনি । মাটিতে ম'রে প'ড়ে আছে একটা নেকড়ে ও দুটি প্রকাণ্ড বাঘ । অন্যগুলো ক্রাল ছেড়ে পালিয়েছে—আর-কোনো ভয় নেই আমাদের । খাঁচা ভেঙেও

কোনো জানোয়ার আর পালাতে পারেনি—মাঝখান থেকে ফান খোইত দেখতে পেলেন দুটি খাঁচার মাঝখানে একটা বাঘ আটকে প'ড়ে গিয়েছে—পালাতে পারেনি—ফলে তাঁর শেষ বাঘটাকেও পাওয়া গেলো ।

কিন্তু এই বাঘটার জন্যে তাঁকে যে-দাম দিতে হ'লো, তা অনেক । পাঁচটা মোষ মরেছে তাঁর, আর তিনটি ছিন্নভিন্ন প'ড়ে আছে মাটিতে : রক্তে-রক্তে জায়গাটা মাখামাখি ! সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বাঘটা সত্যি খুব দামি ।

+

বাকি রাতটুকু ক্রালের ভিতরে কি বাইরে আর-কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো না । এবার ক্রালের দরজা বেশ শক্ত ক'রে লাগানো হয়েছিলো । তখন যে কেমন ক'রে হঠাৎ জন্তুগুলোর ধাক্কায় দরজা খুলে গিয়েছিলো, সেটাই অবাক লাগলো—কারণ খিলগুলো বেশ পোক্ত ছিলো ।

হুড যেখানটায় চোট পেয়েছিলো, এখন, সব উত্তেজনা প্রশমিত হ'লে, সেখানটায় বেশ ব্যথা করতে লাগলো, অথচ আঘাতটা তেমন জোরালো হয়নি—আরেকটু হ'লেই তার ডান হাতটা আস্ত কেটে বাদ দিতে হ'তো হয়তো । আমার অবশ্য কোথাও কোনো চোট লাগেনি ।

সকাল হ'লেই, ঠিক ক'রে ফেললুম, *স্টীম হাউসে* ফিরে যাবো—আপাতত আর শিকারে যাবার বাসনা আমার নেই ।

মাতিয়াস ফান খোইত অবশ্য তাঁর অনুচরদের দশা দেখে বেশ মর্মাহত হ'য়ে পড়েছিলেন—ফালতু বাঘটিকে পেয়ে অবশ্য তাঁর শোক কিঞ্চিৎ প্রশমিত হ'লো । সারা রাতটা তাঁর শশব্যস্ত কেটে গেলো । লোক তিনটিকে সমাহিত করা হ'লো ক্রালের মধ্যেই গভীর কবর খুঁড়ে—যাতে বুনো জানোয়ারদের খপ্পরে কিছুতেই না-পড়ে । কিন্তু মড়ার আবার দেহের ভয় !

কিছুক্ষণ পরেই তরাইয়ের ছায়া-ঢাকা কালো পথগুলো আলো হ'য়ে উঠতে লাগলো । ফান খোইতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা *স্টীম হাউসের* উদ্দেশে রওনা হ'য়ে পড়লুম । জঙ্গলের রাস্তায় আমাদের যাতে আবার কোনো বিপদে পড়তে না-হয়, সেইজন্য ফান খোইত আমাদের সঙ্গে কালোগনি ও আরো দুজন অনুচর দিয়ে দিলেন ।

পথে আর-কোনো বিষম ব্যাপার ঘটলো না । বাঘ কি নেকড়ে—কারু ল্যাজটুকুও আর দেখা গেলো না । বোধহয়, আলো ফুটতে দেখে, রাত্তিরের ওই অভিযানের পর তারা ক্লান্ত বোধ ক'রে, যে যার গোপন ডেরায় ফিরে গেছে । এখন হাঁক পেড়ে তাদের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে জাগিয়ে তোলার কোনো মানে হয় না । যে-মোষগুলো ক্রাল থেকে প্রাণভয়ে ছুটে পালিয়েছিলো, সেগুলো হয় বাঘ-নেকড়ের খাদ্যে পর্যবসিত হয়েছে, নয়তো এই তল্লাট ছেড়ে বহু দূরে পালিয়ে গেছে । মোষগুলো ফান খোইতের একেবারে সমূহ লোকশান হ'লো ।

জঙ্গল পেরিয়ে এসে কালোগনি তার সঙ্গীদের নিয়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায়

নিলে । আমরা *স্টীম হাউসে* ফিরে গেলুম ফ্যান আর নাইজারের উল্লসিত ডাকাডাকির মধ্যে ।

ব্যাঙ্কসকে আমরা রাত্তিরের সেই রগরগে ও শিহরন ভরা অভিজ্ঞতার কথা খুলে বললুম । এত সহজে আমরা নিষ্কৃতি পেয়েছি শুনে সে আমাদের অভিনন্দন জানালে আর ভাগ্যকে কৃতজ্ঞতা । প্রায় ক্ষেত্রেই এ-রকমভাবে আক্রান্ত হবার পর বন্ধুদের গল্প শোনাবার জন্যে কেউই নাকি বেঁচে থাকে না ।

হুড অত্যন্ত অপছন্দ করলেও ব্যাঙ্কস কিন্তু হুডের হাতটা পট্টি বেঁধে স্লিং-এ ঝুলিয়ে রাখলে । তবে ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা ক'রে ব্যাঙ্কস এটা বললে যে আঘাত মোটেই গুরুতর নয়—কয়েক দিনের মধ্যেই সেরে যাবে । ভিতরে-ভিতরে হুড একেবারে অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়েছিলো : সে কোনো প্রতিশোধ নিতে পারলে না, মাঝখান থেকে বাঘের থাবার চোট পেয়ে গেলো । অথচ ওই প্রায়-অবশ হাত নিয়েই সে কিনা ৪৯ নম্বরটি ঘায়েল করেছে ।

২৭ তারিখ বিকেলে গোটা *স্টীম হাউস* ফ্যান আর নাইজারের আহ্লাদি ডাকাডাকিতে জেগে উঠলো । বাইরে এসে দেখি সার্জেন্ট ম্যাক-নীল আর গৌমিকে নিয়ে কর্নেল মানরো ফিরে এসেছেন । দেখে আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম । সার এডওয়ার্ডের অভিযান সফল হয়েছে কি না, তা অবশ্য তখনও জানি না—কিন্তু তিনি যে সুস্থ দেহে ফিরে এসেছেন, এটাই যথেষ্ট ।

পরে অবিশ্যি জানা গেলো নেপাল-সীমান্তে তাঁর অন্বেষণের কোনো ফল হয়নি—এটুকু ছাড়া মানরো আর বিশেষ-কিছু বলতে চাইলেন না । ব্যাঙ্কস অবিশ্যি হাল ছেড়ে দিলে না—আড়ালে ডেকে ম্যাক-নীলকে জিগেস ক'রে যা জানা গেলো, তার সারমর্ম হ'লো এই : বম্বাই প্রেসিডেন্সিতে আবির্ভূত হবার আগে নানাসাহেব হিন্দুস্থানের যে-অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন, মানরোর ইচ্ছে ছিলো পুরো জায়গাটা সরেজমিন তদন্ত ক'রে দ্যাখেন ; নানাসাহেব ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের কী হ'লো, তা জানবার জন্যে অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন তিনি, জানতে চাচ্ছিলেন বম্বাইতে গিয়ে কে আশ্রয় নিয়েছে—নানাসাহেব, না বালাজি রাও ।

খোঁজখবর নিয়ে যা জানা গেছে, তাতে আর সন্দেহ নেই যে বিদ্রোহীরা ভারত ছেড়ে চ'লে গিয়েছে । বালাজি রাও-এর কোনো খবরই নেই ; নানাসাহেব তো একেবারে উবে গিয়েছেন হাওয়ায় । সাতপুরা পর্বতের অধিত্যকাতেই নিশ্চয়ই নানাসাহেবের মৃত্যু হয়েছে—আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা নিশ্চয়ই নেতার মৃত্যুতে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে । *বেহেমথের* এখন আর হিমালয়ে থেকে লাভ নেই । বরং বম্বাই অব্দি ঘুরে দেখা ভালো ।

সব শুনে ঠিক হ'লো সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখে আমরা ধবলগিরি ছেড়ে রওনা হবো । হুডের ক্ষতটা শুকিয়ে যেতে এই ক-টা দিন লেগে যাবে । তাছাড়া কর্নেল মানরোও এত জায়গা ঘুরে এসে বেশ ক্লান্ত—তাঁরও বিশ্রাম চাই ।

ব্যাঙ্কস ইতিমধ্যে হিমালয় থেকে বম্বাই যাবার প্রস্তুতিতেই ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। ঠিক হ'লো, উত্তর-পশ্চিম ভারতের যে-সব অংশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিলো, সে-সব অংশ দিয়ে কিছুতেই যাওয়া চলবে না—অর্থাৎ মীরাট, দিল্লি, আগ্রা, গোয়ালিয়র, ঝান্সি—এইসব জায়গা *বেহেমথ* বিষবৎ পরিত্যাগ ক'রে চলবে। মানরোর তিক্ত ও বিষণ্ন স্মৃতিকে খামকা উশকে দিয়ে কোনো লাভ নেই। আমরা যাবো সিন্ধিয়ার মধ্য দিয়ে—এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ওইসব নগরের চেয়ে একদিক থেকে অনেক-বেশি চিত্তাকর্ষক।

ইতিমধ্যে অগস্টের মধ্যে মৌশুমি ঋতুর অবসান হ'য়ে গেলো। সেপ্টেম্বর এলো শুকনো, স্বচ্ছ ও ঝলমলে দিন নিয়ে। তাপমাত্রাও কম, আমাদের যাত্রার দ্বিতীয় পর্যায় অনেক-বেশি ভালো কাটবে, সন্দেহ নেই।

ইতিমধ্যে আমরা দু-তিনবার ক্রাল-এ গিয়েছিলুম। মাতিয়াস ফান খোইতও বম্বাই রওনা হবার উদ্যোগ করছিলেন— যে ক-টা জন্তু তাঁর সংগ্রহ করার ছিলো, সবই করেছেন—কিন্তু এখন আবার গাড়ি-টানা মোষ জোগাড় করতে হবে তাঁকে। সে-রাত্রে যে-মোষগুলো পালিয়ে গিয়েছিলো, তার একটাকেও ফিরে পাওয়া যায়নি। সেই জন্যেই ফান খোইত অনেক ভেবে কালোগনিকে পাঠিয়েছেন আশপাশের গ্রামে—যদি কয়েকটা মোষ জোগাড় করা যায় গাড়ি টানবার জন্য।

হুডের ক্ষতটা ক্রমশ শুকিয়ে আসছিলো। একটু সেরে উঠতেই সে ফের শিকারে বেরুবার জন্যে উশখুশ করতে লাগলো। কিন্তু কড়া ফতোয়া জারি ক'রে দিলে ব্যাঙ্কস: রাস্তায় অনেক শিকার পাওয়া যাবে—এখন দুর্বল হাত নিয়ে শিকারে যাবার কোনো দরকার নেই।

'কিন্তু আমি যে অন্তত পঞ্চাশটা বাঘ মারতে চেয়েছিলুম,' হুড কাতরভাবে বললে, 'মাত্র ঊনপঞ্চাশটা হয়েছে।

'বাস, ওই ঢের। পঞ্চাশ নম্বরটি না-হয় পরে মেরো।'

সেপ্টেম্বরের দুই তারিখ বিকেলবেলায় ফান খোইত আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন যাবার আগে। কেবল বিদায় জানানোই অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো না। গাড়ি-টানা মোষ নাকি তাঁর জোগাড় হয়নি, কালোগনির সব চেষ্টা ও তদন্তই নাকি ব্যর্থ হয়েছে—অজস্র অর্থের বিনিময়েও সে একটিও মোষ কিনতে পারেনি। এখন এই ওলন্দাজ ভদ্রলোক মহা ফাঁপরে পড়েছেন—কেমন ক'রে যে ওই জানোয়ারগুলোকে নিয়ে বন্দর অব্দি যাবেন, এ-কথা ভেবেই কূল পাচ্ছেন না।

'তাহ'লে কী করবেন আপনি এখন?' ব্যাঙ্কস জিগেস করলে।

'কী-যে করবো, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না,' ফান খোইত বিমর্ষভাবে জানালেন, 'অথচ কথা ছিলো সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখে জন্তুগুলো বম্বাইতে গিয়ে ডেলিভারি দিতে হবে—আর মাত্র আঠারো দিন হাতে আছে আমার।'

'আঠারো দিন মাত্র! তাহ'লে তো আপনার আর একমুহূর্তও নষ্ট করলে চলবে

না ! বম্বাই কি এখান থেকে কম দূর ?'

'তা জানি । কিন্তু এখন আর একটাই মাত্র উপায় আছে আমার — তাছাড়া আঠারো দিনে বম্বাই পৌঁছুনো অসম্ভব !'

'কী উপায়, শুনি ?'

'কর্নেল যদি দয়া ক'রে আমার একটা উপকার করেন, তাহ'লে—'

'বলুন, মিস্টার ফান খোইত !' সার এডওয়ার্ড বললেন, 'আমাকে দিয়ে যদি আপনার কোনো উপকার হয়, তো আমি সানন্দে তা-ই করবো !'

মাতিয়াস ফান খোইত ঝুঁকে অভিবাদন ক'রে এমন-একটা ভঙ্গি করলেন যেন কর্নেল মানরোর এই অনুগ্রহে তিনি শুধু আপ্লুত নয়, একেবারে প্লাবিতই হ'য়ে গেছেন। তারপর কিছুক্ষণ ধ'রে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রে তিনি বললেন যে, তিনি শুনেছেন *বেহেমথের* ক্ষমতা নাকি অসীম—যদি *বেহেমথের* সঙ্গে তাঁর চাকাওলা-খাঁচাগুলো জুতে দেয়া যায়, এবং এটোয়া পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়, তাহ'লে সেখান থেকে তিনি ট্রেন ধরতে পারেন। কর্নেল মানরো ব্যাঙ্কসের দিকে তাকালেন । 'মিস্টার ফান খোইত যা চাচ্ছেন, তা কি সম্ভব হবে ?'

'সম্ভব না-হবার তো কোনো কারণ দেখছি না,' ব্যাঙ্কস বললে, 'কত ওজন নিয়ে চলেছে, তা *বেহেমথ* টেরই পাবে না !'

'তাহ'লে তা-ই হবে, মিস্টার ফান খোইত,' বললেন কর্নেল মানরো, 'আপনাকে আমরা এটোয়ায় পৌঁছে দেবো । হিমালয়ে একে-অন্যকে না-দেখলে মানুষ আর কোথায় পরস্পরকে দেখবে বলুন ?'

সেই অনুযায়ীই বন্দোবস্ত হ'লো । ওলন্দাজ প্রাণিতাত্ত্বিকটি ক্রাল-এ ফিরে গেলেন । লোকজনের মাইনে চুকিয়ে দিতে হবে—সঙ্গে মাত্র চারজন পাহাড়িকে নেবেন তিনি, তারা জন্তুদের দেখাশুনো করবে, বাকিদের চাকরি এখানেই শেষ । তাছাড়া যাবার ব্যবস্থাও করতে হবে ।

'তাহ'লে এই কথাই রইলো—কাল আমাদের দেখা হবে,' মানরো বললেন ।

'আমি তৈরিই থাকবো—ক্রাল-এ গিয়ে আপনাদের ওই বাষ্পীয় দানবকে মোটেই সময় নষ্ট করতে হবে না !'

এই ব'লে সানন্দ চিত্তে ফান খোইত ক্রাল-এ ফিরে গেলেন ।

পরের দিন সকাল সাতটার সময় *বেহেমথের* চুল্লিতে আগুন দেয়া হ'লো—আবার কয়েক সপ্তাহ পরে প্রচণ্ড বাষ্পবেগে *বেহেমথ* কেঁপে উঠলো থরথর ক'রে, শুরু হ'লো আমাদের ভারতদর্শনের দ্বিতীয় পর্যায় ।

ঘণ্টা দুই পরে শুঁড় দিয়ে কুণ্ডলী-পাকানো কালো ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে *বেহেমথ* ক্রাল-এ গিয়ে হাজির হ'লো । *বেহেমথকে* দেখেই ফান খোইত ছুটতে-ছুটতে বাইরে বেরিয়ে এলেন, সাধু ভাষায় বিরাট যত বাক্য আউড়ে আবার অবিশ্রাম ধন্যবাদ দিলেন আমাদের, তারপর খাঁচাগুলো *বেহেমথের* পিছনে জুড়ে দেয়া হ'লো—এছাড়াও রইলো

চাকালাগানো একটা অতিরিক্ত কামরা, সেটাতে থাকবেন ফান খোইত, তাঁর অনুচরদের নিয়ে।

ব্যাঙ্কস সংকেত করতেই *বেহেমথের* তীক্ষ্ণ ধাতব বাঁশিটি বেজে উঠলো, তারপর রাজকীয় চালে *বেহেমথ* আস্তে-আস্তে অগ্রসর হ'লো দক্ষিণের পথ ধ'রে। ফান খোইত ও তাঁর বহর জুড়ে দেয়া সত্ত্বেও *বেহেমথের* চালচলনে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হ'লো না।

'কী, ফান খোইত ? কেমন লাগছে আমাদের *বেহেমথকে*,' ক্যাপ্টেন হুড জিগেস করলে তাঁকে।

'আমার কি মনে হয়, জানেন ক্যাপ্টেন,' মাতিয়াস ফান খোইত বললেন, 'হাতিটা যদি রক্তমাংসের হ'তো, তাহ'লে আরো ভালো হ'তো।'

আমরা যে-পথ দিয়ে হিমালয়ে এসেছিলুম, ফেরার সময় আর সেই পথ না-ধ'রে দক্ষিণ-পশ্চিম পথ দিয়ে যেতে লাগলুম। *বেহেমথ* বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই এই পাহাড়ি পথ দিয়ে ঘুরে-ঘুরে নেমে চললো—কোনো বাধা বা অসুবিধে হ'লো না পথে। ওলন্দাজ প্রাণিতাত্ত্বিকটি রোজ সকালবেলায় ছোটোহাজরির সময় আমাদের সঙ্গে এসে বসেন খানা খেতে, এবং মঁসিয় পারাজারের রন্ধনপ্রতিভার প্রতি সুবিচার করেন সবেগে ও সহাস্যে। পারাজারের রকমারি রান্না একবার যে চেখে দেখেছে, সে আর কখনও তা ভুলতে পারবে না।

রাস্তায় যখনই কোনো পাহাড়ি গ্রাম পড়লো দলে-দলে গ্রামবাসীরা এলো আমাদের বহর দেখতে। ফান খোইতের বাঘ-সিংহের খাঁচার দিকে তারা একবারও নজর দিলে না, ঘুরে-ঘুরে কেবল লক্ষ করলে *বেহেমথকে* আর তড়বড় ক'রে নিজেদের ভাষায় সম্ভবত তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করলে। এর ফলে ফান খোইতের মনে যে-শোক দেখা দিতো, তার উপশম করতেন তিনি খাবার-টেবিলে।

অবশেষে দিন দশেক পরে রেলস্টেশন যখন এলো তখন ফান খোইত ট্রেন ধরার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। এবং যে-সব অনুচর এখন আর তাঁর লাগবে না, তাদের তিনি বিদায় দিলেন এখানেই—বাকি দু-তিনজন তাঁর সঙ্গে যাবে বম্বাই অব্দি—সেখানে তাঁকে জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে তবে তাদের ছুটি। যাদের মাইনে তিনি চুকিয়ে দিলেন, তাদের একজন হ'লো দুর্ধর্ষ শিকারি কালোগনি।

কর্নেল মানরো ও ক্যাপ্টেন হুডের প্রাণ বাঁচিয়েছিলো ব'লে কালোগনির উপর আমাদের প্রীতি জ'ম্মে গিয়েছিলো। চাকরি চ'লে-যাওয়ায় তাকে বিমর্ষ হ'য়ে পড়তে দেখে ব্যাঙ্কস তাকে জিগেস করলে যে সে আমাদের সঙ্গে বম্বাই অব্দি যেতে রাজি আছে কিনা। কিছুক্ষণ কী ভেবে কালোগনি প্রস্তাবটা গ্রহণ করলে—আর কালোগনি সঙ্গে যাবে শুনে কর্নেল মানরো খুব খুশি হ'য়ে উঠলেন। সে এদিককার সবকিছু ভালো চেনে —সে *স্টীম হাউসে* কাজ নিলে আমাদেরই সুবিধে হবে সবচেয়ে বেশি।

ফান খোইতের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিলুম অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই—কিন্তু ফান খোইতের ভাবভঙ্গিতে রইলো বিপুল নাটুকেপনা—যেন মঞ্চের ওপর কৌতুকনাট্যের

দৃশ্য একটা ; কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভঙ্গি তাঁর আতিশয্যে ভরপুর। বিশেষ ক'রে যখন *স্টীম হাউস* তাঁকে রেলস্টেশনে নামিয়ে দিয়ে চ'লে গেলো, তখন তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপস্রিয়মাণ *বেহেমথকে* মূকাভিনয় ক'রে দেখাতে লাগলেন যে কস্মিনকালেও—কবরে, কি চিড়িয়াখানায়—কোথাও আমাদের দয়া তাঁর স্মৃতি থেকে মুছে যাবে না। তাঁর সেই হাত-পা নাড়া দেখতে-দেখতে আমরা এটোয়া পেরিয়ে এলুম।

৫

বেতোয়ার পথে

১৮ই সেপ্টেম্বর *বেহেমথ* ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে, তা বোঝাতে গেলে একটা ছোট্ট হিশেব দাখিল করা যেতে পারে।

কলকাতা থেকে দূরত্ব	*৮১২ মাইল*
হিমালয়ের শিবির থেকে দূরত্ব	*২৩৬ মাইল*
বম্বাই থেকে ব্যবধান	*১০০০ মাইল*

কত-কত মাইল ভ্রমণ করেছি, সেই হিশেব করলে অবশ্য আমাদের ভারতদর্শনের অর্ধেকও এখনও হয়নি, কিন্তু হিমালয়ের গায়ে যে-সাত হপ্তা কাটিয়ে এসেছি, সে-কথা মনে থাকলে বলতে হয় যে আমরা অর্ধেকেরও বেশি সময় ইতিমধ্যেই অতিবাহিত ক'রে ফেলেছি। কলকাতা ছেড়েছিলুম ৬ই মার্চ—আর দু-মাসের মধ্যেই আশা করা যায় হিন্দুস্থানের পশ্চিম তীরে পৌঁছুতে পারা যাবে।

১৮৫৭র বিদ্রোহে যে-সব নগর প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলো, স্থির হ'লো তাদের সন্তর্পণে এড়িয়ে আমরা কেবল দক্ষিণমুখো অগ্রসর হবো। মধ্যভারতের পার্বত্য এলাকায় পৌঁছুনো পর্যন্ত কোনো ঝামেলা নেই—সে-পর্যন্ত রাস্তাঘাট খুবই ভালো। তাছাড়া কালোগনি তো সঙ্গে আছেই ; তার মতো একজন অভিজ্ঞ ও ওস্তাদ লোক থাকতে কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়—হিন্দুস্থানের এদিকটা তার যে ভালোই জানা আছে, এটা তার হাবভাব দেখে আমরা বুঝতে পারলুম।

কর্নেল মানরো তখন মধ্যাহ্নভোজের পর দিবানিদ্রায় ঢুলে পড়েছেন, এমন সময় ব্যাঙ্কস একদিন কালোগনিকে ডেকে পাঠালে।

ব্যাঙ্কস প্রথমে তাকে জিগেস করলে এদিকটাকে সে কেন এত ভালো ক'রে চেনে। উত্তরে কালোগনি বললে যে সে আসলে যাযাবর বেদুইনদের লোক—এ-সব জায়গায় বেদেদের সঙ্গে বহুবার তাকে যাতায়াত করতে হয়েছে, সেই জন্যেই এখানকার পথঘাট তার এত চেনা হ'য়ে গেছে।

‘এখনও এ-সব অঞ্চলে বেদেরা ঘুরে বেড়ায় ?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ—বছরের এ-রকম সময়ে তারা উত্তরে ফিরে আসে—হয়তো রাস্তায় ও-রকম কোনো দলের সঙ্গে আমাদের দেখা হ’য়ে যেতে পারে ।’

‘তা, কালোগনি, তোমাকে পেয়ে আমাদের খুব ভালো হ’লো । তুমি আমাদের অনেক কাজে লাগবে । আমরা আসলে বড়ো-বড়ো শহরগুলো এড়িয়ে গিয়ে খোলা জায়গা দিয়ে যেতে চাই—তুমিই তাহ’লে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ।’

‘নিশ্চয়ই, হুজুর,’ ঠাণ্ডা গলায় বললে কালোগনি । তার এই হিম ঠাণ্ডা আবেগহীন গলা শুনলেই আমার কেমন যেন অস্বস্তি হ’তে থাকে । সে আরো বললে, ‘কীভাবে আমরা যেতে পারি তার একটা মোটামুটি খশড়া তৈরি ক’রে দেবো কী ?’

‘তাহ’লে তো খুব ভালো হয় ।’ ব্যাঙ্কস টেবিলের উপর একটা মানচিত্র বিছিয়ে ধরলে—কালোগনির কথার সঙ্গে সে মানচিত্র দেখে মিলিয়ে নিতে চায় ।

‘সে আর এমন বেশি কথা কী ? একটা সোজা পথ গেছে—দিল্লি রেলপথ থেকে বম্বাই রেলপথ অব্দি—দুটো রাস্তা এসে মিলেছে এলাহাবাদে । এটোয়া আর বুন্দেলখণ্ডের সীমান্তের মধ্যে একটাই বড়ো নদী আমাদের পেরুতে হবে—সেটা যমুনা । ওটা আর বিন্ধ্যপর্বতের মাঝখানে বেতোয়া ব’লে আরেকটা নদী আছে । বেশি বৃষ্টি হ’লে মাঝে-মাঝে পথঘাট জলে ডুবে যায়—তবে মনে হয় আপনাদের এই কলের হাতি তাকে অনায়াসেই পেরিয়ে যেতে পারবে ।’

‘সেজন্যে খুব-একটা ভাবনা নেই,’ ব্যাঙ্কস তাকে জানালে । ‘তারপর ? বিন্ধ্যপর্বতে পৌঁছে—’

‘আমরা একটু দক্ষিণ-পুব মুখো যাবো—একটা ভালো গিরিপথ আছে । সেখানেও কোনো অসুবিধে হবে না—গাড়ি-টাড়ি হ’লে এই গিরিপথ দিয়েই যায়—রাস্তাটা চেনা । এটাকে বলে শ্রীগড়ের গিরিপথ ।’

‘তাতে আমাদের কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু এখানে মানচিত্রে দেখছি শ্রীগড়ের গিরিপথের পর জায়গাটা কেমন উঁচুনিচু । তার চেয়ে ভোপাল দিয়ে গেলে ভালো হয় না ?’

‘কিন্তু সেদিকে অনেক বড়ো-বড়ো শহর রয়েছে । তাদের এড়িয়ে-যাওয়া তাহ’লে মোটেই সম্ভব হবে না । স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সেপাইরা সেখানে বড়ো-বড়ো লড়াই করেছিলো ।’

স্বাধীনতা সংগ্রাম কথাটা আমার অদ্ভুত ঠেকলো—ইংরেজরা যাকে বলে *বিদ্রোহ* ভারতীয়রা নিশ্চয়ই এটাকে বিদ্রোহ ব’লে দ্যাখে না । তাদের কাছে গোটা *বিক্ষোভটাই* নিশ্চয়ই *স্বাধীনতার লড়াই* হ’য়ে উঠেছিলো ।

‘বেশ, তাহ’লে ভোপালের আশপাশ দিয়ে না-গিয়ে শ্রীগড় দিয়েই আমরা যাবো,’ বললে ব্যাঙ্কস, ‘কিন্তু তুমি ঠিক জানো তারপর ঐ অসমতল উঁচুনিচু পথ পেরিয়ে আমরা শেষটায় ভালো রাস্তায় গিয়ে পড়বো ?’

'একটু ঘুরে গেলে জব্বলপুরের কাছ দিয়ে আমরা বম্বাই যাবার রেলপথ ধ'রে ফেলতে পারবো ।'

মানচিত্র দেখে ব্যাঙ্কস বললে, 'এবার বুঝলুম । আর তারপর—'

'তারপরে রাস্তাটা আবার দক্ষিণ-পশ্চিমমুখো এগিয়েছে—বম্বাইয়ের রেলপথের একেবারে সমান্তরালভাবে ।'

'হুঁ, ঠিক বলেছো । তাহ'লে এদিকে তো বিশেষ-কোনো অসুবিধে দেখছি না । আমরা তাহ'লে এদিক দিয়েই যাবো ।'

কালোগনি সেলাম ঠুকে চ'লে যাচ্ছিলো, হঠাৎ কী ভেবে ফিরে দাঁড়ালে ।

'কিছু বলবে ?' ব্যাঙ্কস জিগেস করলে ।

'একটা কথা জিগেস করবো ? বুন্দেলখণ্ডের ঐ শহরগুলো আপনারা এড়িয়ে যেতে চান কেন ?'

ব্যাঙ্কস আমার দিকে তাকালে একবার । এই লোকটার কাছ থেকে কিছুই লুকোবার নেই আসলে । অল্প দু-চার কথায় ব্যাঙ্কস তাকে কর্নেল মানরোর মনের অবস্থাটা বুঝিয়ে দিলে ।

সব শুনে সে একটু অবাকভাবেই বললে, 'কিন্তু নানাসাহেবের কাছ থেকে তো কর্নেল মানরোর ভয়ের কোনো কারণ নেই—বিশেষ ক'রে এই অঞ্চলে ।'

'এখানেও না, অন্য-কোথাও নয় । ভয় পাবার কথা মোটেই হচ্ছে না । কিন্তু তুমি বিশেষ ক'রে এখানকার কথা বলছো কেন ?' জিগেস করলে ব্যাঙ্কস ।

'কারণ শুনেছি কয়েক মাস আগে নানাসাহেবকে নাকি বম্বাই প্রেসিডেন্সিতে দেখা গিয়েছে, কিন্তু অনেক খোঁজ-খবর ক'রেও পরে তাঁর আর-কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি । যদি কখনও তিনি ওদিকটায় গিয়েও থাকেন, এতদিনে তিনি যে আবার ফিরে এসে ভারত-চিন সীমান্ত অতিক্রম করেছেন, তাতে বোধহয় কোনো সন্দেহ নেই ।'

তার কথা শুনে বোঝা গেলো যে সাতপুরা পর্বতে মে মাসে কী ঘটেছিলো, সে-খবর তার মোটেই জানা নেই ।

'মনে হচ্ছে হিমালয়ের জঙ্গলে খবর পৌঁছুতে অনেক সময় নেয় !' ব্যাঙ্কস ব'লে উঠলো ।

কালোগনি বিমূঢ়ভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইলো । তার ধাঁধায়-পড়া ভঙ্গি দেখে মনে হ'লো না ব্যাঙ্কসের কথার কোনো মর্মোদ্ধার সে করতে পেরেছে ।

'নানাসাহেব যে মারা গেছেন, তা মনে হচ্ছে তুমি জানো না !'

'*নানাসাহেব মারা গেছেন* !' কালোগনি অস্ফুট স্বরে চীৎকার ক'রে উঠলো ।

'নিশ্চয়ই,' বললে ব্যাঙ্কস, 'সরকার বাহাদুর সমস্ত খুঁটিনাটি সমেত তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশ করেছেন । নানাসাহেব নিহত হয়েছেন—'

'নিহত হয়েছেন ? নানাসাহেব ?' কালোগনি মাথা নাড়লে । 'শুনি, কোথায় নানাসাহেব নিহত হয়েছেন ব'লে খবর বেরিয়েছে ।'

'সাতপুরা পাহাড়ে ।'

'কবে ?'

'মাস ছয়েক আগে । ২৫শে মে ।'

কলোগনির কালো মুখটা মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠলো । কোনো কথা না-ব'লে সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো একটুক্ষণ । কী যেন ভাবছে ।

আমি জিগেস করলুম, 'নানাসাহেবের মৃত্যুর সংবাদ মিথ্যে ব'লে মনে হয় তোমার ? মিথ্যে মনে হবার কোনো বিশেষ কারণ আছে ?'

'না, সাহেব । আপনারা যা বললেন, তাই আমি বিশ্বাস করেছি ।' ব'লে সেলাম ক'রে, কালোগনি সেখান থেকে চ'লে গেলো ।

সে চ'লে যেতেই ব্যাঙ্কস বললে, 'দেখলে, মোক্লের ? এরা কেমন লোক ! সিপাহী বিদ্রোহের নেতাকে এরা মর-মানুষ ব'লেই মনে করে না । যেহেতু এরা তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলতে দ্যাখেনি, সেইজন্য কোনোদিনই এরা বিশ্বেস করবে না যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ।'

'এ-রকম হয়,' আমি বললুম, 'নাপোলিয়ঁর মৃত্যুর কুড়ি বছর পরেও তাঁর সেনাদল মেনে নিতে পারেনি যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ।

৬

হুড বনাম ব্যাঙ্কস

২৯শে সেপ্টেম্বর *বেহেমথ* আস্তে-আস্তে বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলে । শ্রীগড়ের গিরিসংকটে যাবার এটাই রাস্তা ।

এ-পর্যন্ত আমাদের রাস্তায় কোনো অসুবিধেই হয়নি । পেরিয়ে এসেছি ত্রিবেণী ও যমুনা, গোয়ালিয়র ও ঝান্সি, বেতোয়া—অর্থাৎ এটোয়া থেকে ৬২ মাইল দূরে চ'লে এসেছি আমরা ।

গোয়ালিয়র ও ঝান্সি পেরুবার সময় আমরা সাবধান ছিলুম । কিছুতেই শহরের মধ্যে ঢুকিনি । কারণ এখানেই নানাসাহেবের বান্ধবী ঝান্সির রানী লক্ষ্মীবাঈ প্রবল পরাক্রমের সঙ্গে ইংরেজবাহিনীকে প্রতিরোধ করেছিলেন । এখানেই সার্জেন্ট ম্যাক-নীলের সঙ্গে সার এডওয়ার্ডের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় । এখানেই সার হিউ রোজ ছ-দিন ব্যাপী একটানা লড়াইয়ে লক্ষ্মীবাঈয়ের বাহিনীর দ্বারা বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হন । তান্তিয়া টোপি, বালাজি রাও ও রানী লক্ষ্মীবাঈ অবশেষে পিছু হঠতে বাধ্য হ'লেও সমগ্র বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে এখানেই প্রথম বিদ্রোহের আগুন দাউদাউ জ্ব'লে উঠেছিলো । সেইজন্যেই সার এডওয়ার্ডের তিক্ত ও বিষণ্ন স্মৃতিকে একটুও উশকে দিতে চাইলুম না আমরা—বরং

একটু ঘুরে এ-সব শহরের পাশ কাটিয়ে চ'লে এসেছি বিন্ধ্যপর্বতের সানুদেশে। জব্বলপুর এখান থেকে মাত্র ষাট মাইল দূরে—কিন্তু এখানে তাড়াতাড়ি চলবার উপায় নেই— উঁচুনিচু উবড়োখাবড়ো পার্বত্যভূমি, সেইজন্যেই অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগবে জব্বলপুর পৌঁছুতে। খাড়া উৎরাই, খারাপ রাস্তা, পাথুরে জমি, হঠাৎ একেকটা ধারালো মোড় আর সরু গিরিপথ—এই সবকিছু মিলে *বেহেমথের* গতি অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে।

তাছাড়া এখানে সবসময় সাবধানে থাকতে হচ্ছে, ব্যবস্থা রাখতে হচ্ছে কড়া পাহারার। কালোগনিই বিশেষ ক'রে পাহারার ব্যবস্থা করার জন্যে তাড়া দিয়েছে। কারণ এদিকটায় নাকি ভীষণ দস্যুর ভয়। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল ব'লে এখানটায় নাকি বহু দস্যুদল আশ্রয় নিয়েছে—ফলে এখান দিয়ে যাবার সময় অত্যন্ত সাবধান হ'তে হয়। হয়তো কিছুই হবে না, কোনো ডাকাতদলই *বেহেমথকে* আক্রমণ করবে না ; কিন্তু তবু সাবধানের মার নেই।

অবশ্য আমাদের ভয়ের কিছু ছিলো না। প্রথমত আমরা সংখ্যায় নেহাৎ কম নই, অস্ত্রশস্ত্রও রয়েছে যথেষ্ট, তার উপর আস্ত একটা চলন্ত কেল্লায় ক'রে যাচ্ছি। কাজেই বুন্দেলখণ্ডের এদিকটায় যদি খুনে ডাকাত বা ভীষণ ঠগিরা ঘাপটি মেরে লুকিয়েও থাকে তবু আমাদের আক্রমণ করতে সাহস পাবে না।

শ্রীগড়ের গিরিপথ অব্দি অনায়াসেই পৌঁছুনো গেলো—একটু সময় লাগলো বটে, কিন্তু কোনো বিপদ-আপদ বা অসুবিধে হ'লো না আমাদের। তাছাড়া দেখে মনে হ'লো এই সব ঘোরানো ও জটিল পাহাড়ি রাস্তা কালোগনির একেবারে নখদর্পণে। কাজেই তার উপরেই সব ভার ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো ; সে-ই আমাদের এইসব পাইন বন, গভীর খাত ও উঁচু পাকদণ্ডী দিয়ে অনায়াসেই *বেহেমথকে* চালনা ক'রে নিয়ে এলো।

কখনও-কখনও অবশ্য সে *বেহেমথকে* থামিয়ে দিয়ে নিজে গিয়ে চারপাশটা দেখে আসছিলো, তবে তা কিন্তু পথ চেনে না ব'লে নয়,—বর্ষার পর এখানকার রাস্তা অনেক সময় থাকে প্লাবিত ও পিছল, সে-রকম অবস্থায় হয়তো *বেহেমথকে* ও-পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক।

আবহাওয়াও চমৎকার যাচ্ছে। বৃষ্টি-বাদল নেই ; জলন্ত আকাশ হালকা কুয়াশার পর্দায় ঢাকা, সেইজন্যে গরমও কম লাগছে। চাই কি সময়-সময় হুড শিকারের মৎলব এঁটে সফরিতে বেরুচ্ছে। তবে ফক্স আর সে, দুজনেই তরাইয়ের জঙ্গলের জন্য হা-হুতাশ করে প্রায়ই ; সেখানে যেন বন্যজন্তুর মেলা ব'সে গিয়েছিলো—কিন্তু এখানে বাঘ-সিংহের কোনো পাত্তাই নেই।

তবে সেইসব আমিষখোর জন্তুর বদলে আমরা এখানে মাঝে-মাঝে বুনো হাতির দেখা পাচ্ছি. যে-দৃশ্য এমনকী, ভারতবর্ষের অন্য-অনেক অঞ্চলেও দুর্লভ। ৩০শে সেপ্টেম্বর দুপুরবেলায় এমনকী একজোড়া হাতিকে *বেহেমথের* সামনে দেখা গেলো। বাঁশি বাজিয়ে *বেহেমথকে* সবেগে অগ্রসর হ'তে দেখে, তারা রাস্তা থেকে স'রে দাঁড়িয়ে আমাদের যেতে দিলে। বোধহয় *বেহেমথের* মতো প্রকাণ্ড অতিকায় হাতিকে দেখে

তারা কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছিলো ।

এমনকী ক্যাপ্টেন হুড শুদ্ধু—কোনো বুনো জন্তু দেখলেই যার হাত বন্দুকের ঘোড়া টেপবার জন্যে নিশপিশ করতে থাকে—অপ্রয়োজনে এই প্রকাণ্ড সুন্দর জন্তুদের তাগ ক'রে গুলি চালাবার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি । বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা কেবল তাদের চলার ভঙ্গির প্রশংসা করতে লাগলুম ।

'ফান খোইত থাকলে নিশ্চয়ই এই সুযোগে প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে মস্ত একটা বক্তৃতা দিয়ে বসতেন,' ক্যাপ্টেন হুড মন্তব্য করলে ।

এটা নিশ্চয়ই সবাই জানে যে ভারতবর্ষই আসলে মাতঙ্গ রাজ্য — যদিও এটা ঠিক যে আফ্রিকার হাতির চেয়ে ভারতের হাতি আকারে অনেক ছোটো—তবে ভারতের নানা অঞ্চলেই এদের পাওয়া যায়—ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলেও হাতি ঘুরে বেড়ায় । সাধারণত *খেদা*-র সাহায্যেই হাতি ধরা হ'য়ে থাকে ; পোষা হাতিরা ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে আসে তাদের—কখনও বহু শিকারি একত্রে হাতিদের তিনদিক থেকে ঘিরে তাড়া লাগায় । বাংলাদেশে ও নেপালে এখনও ল্যাসো ব্যবহার করা হয় হাতি ধরার সময়ে । শুনে মনে হ'তে পারে হাতি ধরা বুঝি খুব সহজ ব্যাপার, কিন্তু বুনো খ্যাপা হাতির পাল্লায় পড়লে একেক সময় একেকটা তল্লাট তছনছ হ'য়ে যায়—আর বর্ষার পর অনেক সময়েই ভারতের বনজঙ্গলে খ্যাপা হাতির সন্ধান মেলে—এমনকী জনপদ পর্যন্ত নেমে আসে তারা, বাড়িঘর ভেঙেচুরে তাণ্ডব শুরু ক'রে দেয় । কে বেশি মরাত্মক —মানুষখেকো বাঘ, না খ্যাপা হাতি—এ-তর্কের হয়তো কোনো শেষ নেই ।

হাতি দুটো স'রে দাঁড়িয়ে *বেহেমথের* পথ ক'রে দিলে, আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হস্তিপুঙ্গবদের প্রশংসা করতে লাগলুম, স্টর আর কালু নির্বিঘ্নে হাতি দুটোকে পেরিয়ে *বেহেমথকে* চালিয়ে নিয়ে গেলো । হঠাৎ তাকিয়ে দেখি হাতি দুটিও আমাদের পিছন-পিছন আসছে ।

কিছুক্ষণের মধ্যে আরো-কয়েকটি হাতির দেখা পাওয়া গেলো ; একটু দ্রুত হেঁটে তারাও আগেকার দুটো হাতির সঙ্গ নিলে । মিনিট পনেরোর মধ্যেই দেখা গেলো *বেহেমথের* পিছন-পিছন প্রায় ডজন খানেক হস্তিশাবকের শোভাযাত্রা আসছে । স্পষ্ট বোঝা গেলো *বেহেমথকে* দেখে তারা বিস্মিত হয়েছে, প্রায় পঞ্চাশ গজ পিছনে সেই জন্যেই তারা মিছিল ক'রে তাকে দেখতে আসছে । আমাদের পাশ কাটিয়ে চ'লে যাবার কোনো লক্ষণ বা তাড়া তাদের নেই, এবং আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করারও কোনো মৎলব তাদের দেখা গেলো না । ইচ্ছে করলে পবনবেগে ছুটতে পারে হাতিরা ; বিন্ধ্যপর্বতের উবড়োখাবড়ো রাস্তায় দ্রুত চলাই তাদের অভ্যেস । কিন্তু হাবভাব দেখে বোঝা গেলো আরো একপাল হাতিকে ডেকে এনে *বেহেমথকে* দেখানো ছাড়া তাদের আর-কোনো মৎলব নেই, কারণ চলতে-চলতে তারা অনবরত অদ্ভুত আওয়াজ ক'রে-ক'রে ডাকছিলো । সেই ডাক যে আসলে অন্য হাতিদের হাঁক পেড়ে নিয়ে-আসা, তা বুঝতে আমাদের দেরি হ'লো না, কারণ দূর থেকে ঠিক তেমনিভাবে তৎক্ষণাৎ অন্য হাতিদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিলো ।

একটা নাগাদ দেখা গেলো প্রায় তিরিশটা হাতি পায়ে-পায়ে আমাদের অনুসরণ ক'রে আসছে ; সংখ্যাটা যে অচিরেই আরো বৃদ্ধি পাবে, সেই সম্ভাবনাটাও ছিলো তখনও। মাঝে-মাঝে এ-রকম যূথবদ্ধ হাতির পালের মুখোমুখি পড়া ভারতের জঙ্গলে নতুন ব্যাপার নয়—এবং সেই সাক্ষাৎকার পথিকদের পক্ষে সাধারণত বিশেষ উপভোগ্য ঠেকে না।

আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠার সঙ্গেই এই অদ্ভুত মিছিলটি তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলুম।

'সংখ্যা যে ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে,' বললে ব্যাঙ্কস, 'এদিককার সব হাতিকেই দেখছি একজায়গায় জড়ো করতে চায় এরা।'

'কিন্তু,' আমি বললুম, 'তারা নিশ্চয়ই অনেক দূর-দূর থেকে সব হাতিকে ডেকে আনতে পারবে না।'

'ডাকতে পারবে না, এ-কথা ঠিক,' ব্যাঙ্কস সায় দিলে, 'কিন্তু এদের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রখর—কারণ পোষা হাতিরা অনেক সময় তিন-চার মাইল দূরের বুনো হাতির গন্ধ পায়!'

'এরা তো দেখছি মহাপ্রস্থানে বেরিয়েছে!' বললেন কর্নেল মানরো, 'ব্যাঙ্কস, আমাদের বোধহয় *বেহেমথের* গতি বাড়ানো উচিত।'

'*বেহেমথ* তার যথাসাধ্য করছে, সার এডওয়ার্ড। এই উবড়োখাবড়ো উৎরাই বেয়ে চলা খুব-একটা সহজ কাজ নয়।'

'তাড়াহুড়ো করার কী দরকার?' নতুন অ্যাডভেনচারের গন্ধে হুড উল্লসিত হ'য়ে উঠলো, 'আসুক না এরা, যত-খুশি। এরা যদি আমাদের শোভাযাত্রা ক'রে পৌঁছে দিতে চায়, তাহ'লে ক্ষতি কী? জায়গাটা এমনিতেই ঊষর আর পরিত্যক্ত—এদের জন্যেই এখন ক্রমশ চিত্তাকর্ষক হ'য়ে উঠছে। রাজাবাদশারাও কখনও এ-রকম সংবর্ধনা পায় না।'

'এদের উপস্থিতিকে না-মেনে আর উপায় কী?' বললে ব্যাঙ্কস, 'এদের হাত এড়াবার কোনো পথ তো দেখছি না।'

'আরে, এত ভয় পাচ্ছো কেন?' জিগেস করলে ক্যাপ্টেন হুড। 'এটা নিশ্চয়ই জানো একটা খ্যাপা হাতি যত ভীষণ, একটা আস্ত হাতির পাল তত নয়। বেশ-তো শান্তশিষ্ট জীব—শুঁড়ওলা কতগুলো ভেড়া, এই আর-কী।'

'হুডের উৎসাহ দেখছি ক্রমশই উশকে উঠছে,' বললেন কর্নেল মানরো, 'আমি এ-কথা মানতে রাজি আছি যে হাতির পাল যদি এমনিভাবে পিছন-পিছন আসে আমাদের, তাহ'লে আমাদের ভয়ের কিছুই নেই; কিন্তু যদি হঠাৎ এ-কথা তাদের মাথায় ঢোকে যে এই সরু রাস্তায় আমাদের পাশ কাটিয়ে তাদের এগিয়ে যেতে হবে, তাহ'লে ব্যাপারটা খুবই সঙিন হ'য়ে উঠবে।'

'তাছাড়া,' আমি বললুম, '*বেহেমথের* মুখোমুখি পড়লে তাকে যে কী-রকম সংবর্ধনা

জানাবে, তা-ই বা কে জানে !'

'যত বাজে কথা ! ওরা হাঁটু গেড়ে ব'সে শুঁড় তুলে *বেহেমথকে* সেলাম ঠুকবে !' বললে হুড, 'মনে নেই, কুমার গুরু সিং-এর হাতিরা কী-রকম সেলাম জানিয়েছিলো ?'

'কিন্তু তারা ছিলো পোষা হাতি, শেখানো ।'

'ওই বুনো হাতিগুলোও পোষ মানবে । *বেহেমথের* সামনে পড়লে এতই চমকে যাবে যে গভীর শ্রদ্ধা জেগে উঠবে এদের মনে ।'

কৃত্রিম যান্ত্রিক হাতির জন্যে হুডের প্রশংসা ক্রমেই গগনচুম্বী হ'য়ে উঠলো । আরো বললে, 'তাছাড়া হাতিরা বেশ বুদ্ধিমান হয় । তারা যুক্তি দেবে, তুলনা করবে, বিচার ক'রে দেখবে । মানুষের মতো তারাও দুটো ভাবনাকে যোগ ক'রে দেখতে পারে ।'

'আমি এ-কথা মানি না,' বললে ব্যাঙ্কস !

'এ-কথা মানো না ? তুমি ?' হুড বেশ উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো, 'তোমার কথা শুনে মনে হয় তুমি বুঝি কস্মিনকালেও ভারতে বাস করোনি । কেন, পোষা হাতিদের যে সবরকম ঘরোয়া কাজেই লাগানো হয়, তা তুমি জানো না ? এ-কথা কি কখনও শোনোনি, মোক্লের, বড়ো-বড়ো লেখকরা হাতি সম্বন্ধে কী ব'লে গেছেন ? তাঁদের মতে, হাতি অত্যন্ত প্রভুভক্ত—মোট বয়, ফুল তুলে নিয়ে আসে প্রভুদের জন্যে, বাজার করে, নিজের জন্যে আখ, কলা, আম কিনতে পারে, নিজেই দাম চুকিয়ে দেয় জিনিশপত্রের, পাহারা দেয়, গোটা ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে শিক্ষিত ধাত্রীর চেয়েও যত্ন ক'রে ছোটোদের নিয়ে বেড়াতে বেরোয় । দয়া আছে তার, কৃতজ্ঞ জীব, স্মৃতিশক্তি অদ্ভুত, কোনো উপকার কি আঘাত পেলে ভোলে না কখনও । তাছাড়া কী নরম তার মন ! পারলে একটা মশামাছি পর্যন্ত মারে না । আমার এক বন্ধু নিজের মুখে বলেছে এ-কথা : একটা পাখি নাকি বসেছিলো একটা পাথরের উপর, হাতিকে বলা হ'লো পাখিটা পায়ের তলায় চেপ্টে মারতে ! কে কার কথা শোনে ! মাহুতের হুমকি, ধমক কি ডাঙশের ঘা কিছুই হাতিটাকে ওই দুষ্কর্মে লিপ্ত করাতে পারেনি । তখন তাকে বলা হ'লো পাখিটাকে তুলে আনতে, অমনি সে আস্তে সন্তর্পণে আলগোছে শুঁড় দিয়ে পাখিটাকে তুলে আনলে—এবং তাকে উড়ে যেতে দিলে। আমার বন্ধু এ-দৃশ্য নিজের চোখে দেখেছে । বুঝলে, ব্যাঙ্কস, এটা তোমাকে মানতেই হবে যে হাতি এমনিতে খুব ভালো জীব, দয়া আছে, অন্যান্য জীবজন্তুর চেয়ে নানাদিক দিয়ে ভালো—বাঁদর কি কুকুরের চেয়েও বুদ্ধিমান ও প্রভুভক্ত ! শোনোনি ভারতীয়দের মতে হাতিদের নাকি মানুষের মতোই বুদ্ধিশুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান রয়েছে?' ব'লে হুড তার টুপি খুলে হাতিদের দিকে ঝুঁকে অভিবাদন জানালে ।

'ভালো বলেছো, হুড !' কর্নেল মানরো মুচকি হাসলেন । 'হাতিরা তোমার মধ্যে একজন সত্যিকার ভালো উকিল পেয়েছে !'

'আপনার কি মনে হয় না আমি ঠিক বলেছি ?

'হুড হয়তো ঠিক কথাই বলেছে,' বললে ব্যাঙ্কস, 'কিন্তু তবু আমি স্যাণ্ডারসনের

মতেই সায় দেবো—স্যাণ্ডারসন কেবল মস্ত শিকারিই নন, এ-সব বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞও বটে ।'

'বটে ? তা শুনি তোমার স্যাণ্ডারসন মহোদয় কী বলেছেন ?'

'তাঁর মতে হাতিদের তেমন-কিছু অসাধারণ বুদ্ধি নেই । হাতিদের নিয়ে যে-সব গালগল্প প্রচলিত, তা আসলে মাহুতদের আদেশ পালন করারই ফল—তারা খুবই প্রভুভক্ত, খুব কথা শোনে, এই আর-কি !'

'*বটে* !'

'তিনি আরো বলেছেন,' ব্যাঙ্কস বললে, 'হিন্দুরা কেন হাতিকে জ্ঞানের প্রতীক ব'লে মান্য করেনি, সেটাও ভেবে দেখার বিষয় । স্থাপত্যে কি ভাস্কর্যে সর্বত্র বুদ্ধির জন্য শ্রদ্ধা পেয়েছে শেয়াল, ভুশুণ্ডি কাক কি বাঁদর !'

'ভুল ! ভুল ! আমি এ-কথার প্রতিবাদ করি,' তীব্র স্বরে বললে হুড ।

'প্রতিবাদ তুমি যত পারো করো, কিন্তু তার আগে আমার কথা শুনে নাও । স্যাণ্ডারসন বলেছেন যে মগজের মধ্যে আদেশ পালন করার কোষটা হাতিদের অস্বাভাবিক বর্ধিত—হাতির মাথার খুলি ব্যবচ্ছেদ ক'রে কোষগ্রন্থিটা পরীক্ষা করেছেন তিনি । তাছাড়া হাতিরা এত নির্বোধ যে সহজেই ফাঁদে প'ড়ে যায়—তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে খেদায় নিয়ে আসা যায় । । যদি কখনও পালিয়েও যায়, তবু এমনই অনায়াসে তাকে আবার ধ'রে ফেলা হয় যে তাতে তার কাণ্ডজ্ঞানের বিশেষ প্রশংসা করা যায় না । এমনকী অভিজ্ঞতাও তাকে বিশেষ-কিছু শেখাতে পারে না ।'

'হায়-রে হস্তিশাবক ! শোন, ব্যাঙ্কস তোদের কী প্রশংসাপত্র দিচ্ছেন ।'

'আরো বলবো ?' ব্যাঙ্কস বললে, 'স্ত্রী-হাতি কিংবা হস্তীশাবককে পোষ মানানো একটা প্রাণান্তকর ব্যাপার ! এরা কিছুতেই কিছু শিখতে চায় না—'

'তাতে তো আরো-বেশি প্রমাণিত হয় যে হাতিরা আসলে মানুষেরই মতো,' হুড হেসে বললে, 'ছেলেছোকরা কি স্ত্রীলোকের চাইতে বয়স্ক মানুষদের শেখানো বা বোঝানো অনেক সোজা নয় কি ?'

'বন্ধু-হে, আমি আর তুমি যেহেতু বিয়ে করিনি, সেই জন্যে আমাদের কি এ-রকম একটা মন্তব্য ক'রে ফেলা ভালো ?'

'হা-হা-হা, এটা তুমি ঠিক বলেছো ।'

'এককথায়,' ব্যাঙ্কস বললে, 'হাতিদের সুবুদ্ধি কি কাণ্ডজ্ঞানের উপর বেশি নির্ভর করতে আমি আদৌ রাজি নই । যদি কোনোকিছুতে এরা একবার খেপে যায়, তাহ'লে এদের প্রতিরোধ করা অসম্ভব হবে । যারা আমাদের এখন দক্ষিণমুখো পৌঁছে দিতে চাচ্ছে, আমি চাই যে শিগগির তারা যেন অন্য-কোনো কাজে উলটো দিকে ছুট লাগায় !'

'তুমি আর হুড যতক্ষণ এদের নিয়ে তর্ক করলে, ততক্ষণে কিন্তু সংখ্যায় এরা ভীষণ রকম বেড়ে উঠেছে, ব্যাঙ্কস,' আস্তে, ধীর গলায় মন্তব্য করলেন কর্নেল মানরো ।

৭

এক বনাম একশো

সার এডওয়ার্ড আদৌ ভুল বলেননি। প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি হাতি এখন আমাদের পিছন-পিছন ধাবমান। দল বেঁধে এগুচ্ছে তারা একযোগে, ইতিমধ্যেই *স্টীম হাউসের* এত কাছে এসে পড়েছে—*বেহেমথের* সঙ্গে তাদের দূরত্ব মাত্র দশগজ হবে এখন—যে তাদের খুব ভালো ক'রে লক্ষ করা যাচ্ছিলো।

'হুড,' আমি বললুম, 'একবার তাকিয়ে দ্যাখো কতগুলো হাতি! এখনও কি তুমি বলতে চাও যে বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই?'

'ফুঃ,' হুড আমার কথা যেন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলে, 'এরা আমাদের ক্ষতি করতে চাইবে কেন, বলো? এরা তো আর বাঘের মতো নয়, কী বলো, ফক্স?'

'নেকড়েদের মতোও নয়,' প্রভুর কথায় ধুয়ো ধরলে অনুচরটি।

কিন্তু এ-কথায় দেখলুম কালোগনি ঘন-ঘন মাথা নাড়লে। বোঝা গেলো, সে এ-বিষয়ে মোটেই একমত নয়।

'তোমাকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, কালোগনি,' ব্যাঙ্কস বললে।

কালোগনি কেবল বললে, '*বেহেমথের* বেগ কি আর বাড়ানো যায় না?'

'বেশ কঠিন কাজ,' ব্যাঙ্কস বললে, 'তবু একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।'

এই ব'লে ব্যাঙ্কস বারান্দা থেকে গিয়ে হাওদায় উঠলো। স্টর দাঁড়িয়েছিলো হাওদায়। কী কথা হ'লো দুজনে, তারপরেই *বেহেমথের* বেগ আরো বেড়ে গেলো। বেড়ে গেলো, তবে অতি সামান্যই, কারণ রাস্তাটা বন্ধুর। কিন্তু *বেহেমথের* গতি যদি দ্বিগুণ বাড়ানো হ'তো, অবস্থাটা তবু রইতো তথৈবচ—কারণ হাতির পালও সেই তুলনায় গতি বাড়িয়ে দিলে।

ঘণ্টা কয়েক কেটে গেলো এইভাবেই। শেষে নৈশভোজ সেরে আমরা আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। পিছনে সোজা চ'লে গেছে রাস্তাটা—কোনো বাঁক না-নিয়ে মাইল দু-তিন। অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে লক্ষ করলুম ইতিমধ্যে হাতিরা সংখ্যায় আরো বেড়েছে। গুনবার চেষ্টা ক'রে দেখলুম, অন্তত একশো হবে তারা সংখ্যায়। দু-তিনটি সারি ধ'রে এগুচ্ছে তারা, চুপচাপ, একই তালে, একই ছন্দে, শুঁড় শূন্যে তোলা। জোয়ারের জল যেমন ভাবে এগোয়, তেমনি অনিবার্য ভঙ্গি তাদের। এখন সব শান্ত, কিন্তু একবার খেপে উঠলে কী-যে হবে কে জানে।

এদিকে সব ঝাপসা হ'য়ে এসেছে। চাঁদ ওঠেনি। তারাও দেখা যাচ্ছে না আকাশে—পাৎলা একটা কুয়াশার আস্তরণ পড়েছে এর মধ্যেই। ব্যাঙ্কস ঠিকই বলেছিলো: অন্ধকারে এ-রকম বিশ্রী রাস্তায় এগুনো দুঃসাধ্য হবে। সামনে উপত্যকাটা একটু চওড়া

হ'লেই *বেহেমথকে* থামিয়ে দিয়ে রাতের মতো বিশ্রাম নেয়া হবে, এটাই ঠিক হয়েছিলো খাবার টেবিলে ।

অন্ধকার ঘন হ'য়ে আসতেই হাতিদের মধ্যে একটা সাড়া প'ড়ে গেলো, যেটা সারাদিনে একবারও দেখা যায়নি । কেমন যেন একটা চাপা গর্জন করলে তারা, তারপরেই আরো-একটা অদ্ভুত ডাক উঠলো তাদের মধ্যে, অনেকটা দূরে কোথাও বাজ পড়ার শব্দের মতো ।

মানরো জিগেস করলেন, 'হঠাৎ এই ডাকাডাকির অর্থ কী ?'

'এ-রকম শব্দ তারা করে,' কালোগনি জানালে, 'শত্রুর সামনে পড়লে ।'

'তার মানে এরা আমাদের শত্রু ব'লে মনে করছে ?' ব্যাঙ্কস বললে ।

'তা-ই তো আশঙ্কা করছি,' উত্তর দিলে কালোগনি ।

রাত নটা নাগাদ আমরা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত একটি সমতলভূমিতে এসে পৌঁছুলুম —আধমাইল চওড়া গোল একটা চত্বর যেন—এখান থেকেই রাস্তা গেছে পুটুরিয়া হ্রদের দিকে—যেখানে গিয়ে আমরা বম্বাইয়ের রাস্তায় পৌঁছুবো । কিন্তু হ্রদটা এখনও দশ মাইল দূরে—এই অন্ধকার রাতে সেদিকে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না । ব্যাঙ্কস থামবার সংকেত করলে, অমনি *বেহেমথ* থমকে দাঁড়ালো, কিন্তু চুল্লি নিভিয়ে ফেলা হ'লো না । স্টরকে আগেই বলা হয়েছিলো এঞ্জিন চালু রাখতে, যাতে মুহূর্তের মধ্যে আবার রওনা হ'য়ে পড়া যায় ।

মানরো তাঁর ঘরে চ'লে গিয়েছেন, কিন্তু ব্যাঙ্কস আর হুড বারান্দায় ব'সে আছে। আমারও একা শুয়ে পড়ার ইচ্ছে ছিলো না, অন্যরাও তৈরি হ'য়ে আছে । কিন্তু হাতিরা হঠাৎ *স্টীম হাউস* আক্রমণ করলে কী-যে করবো, তা-ই ঠিক করতে পারছিলুম না আমরা ।

প্রায় ঘণ্টাখানেক সেই চাপা সুরে বাজ পড়ার মতো আওয়াজ শোনা গেলো আমাদের চারপাশে । হাতির পালটা সমতলভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছে । তারা কি তবে *বেহেমথের* পাশ কাটিয়ে আরো দক্ষিণে চ'লে যাবে ? তা-ই মনে হ'লো, কারণ রাত সোয়া-এগারোটা নাগাদ আর-কোনো সাড়াশব্দ শোনা গেলো না ; সব হঠাৎ কেমন অস্বাভাবিক রকম চুপচাপ হ'য়ে গেছে । শুধু *বেহেমথের* এঞ্জিনের ফোঁশ-ফোঁশ আওয়াজ ছাড়া আর-কোনো শব্দ নেই কোথাও ।

'কেমন ? ঠিক বলিনি ? হাতিগুলো নিজেদের পথে চ'লে যাবে,' বললে হুড ।

'উঁহু! আমি ততটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না ।' বললে ব্যাঙ্কস, 'তবু দেখা যাক ।' ব'লে সে হাঁক পাড়লে, ,'স্টর ! সন্ধানী আলোটা জ্বালো দেখি ।'

তক্ষুনি দুটো তীব্র বিজলি বাতি জ্ব'লে উঠলো *বেহেমথের* চোখে । ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে চারপাশে দেখা হ'লো আলো ফেলে ।

দেখা গেলো, হাতিরা *স্টীম হাউসকে* ঘিরে স্থিরভাবে চুপচাপ শুয়ে আছে । ওই তীব্র আলো প'ড়ে তাদের কালো পাহাড়প্রমাণ শরীরগুলো কী-রকম ভুতুড়ে দেখালো

—কেমন যেন অতিকায় ও প্রাগৈতিহাসিক। আলো পড়তেই যেন খোঁচা খেয়ে জেগে গেলো তারা। শুঁড় উঠে গেলো শূন্যে, চোখা দাঁতগুলো উদ্যত হ'লো অস্ত্রের মতো, চাপা রাগি গুমগুমে গর্জন উঠলো।

'আলো নিভিয়ে ফ্যালো, এক্ষুনি,' ব্যাঙ্কস নির্দেশ দিলে।

তক্ষুনি আলো নিভে গেলো হঠাৎ, আর অমনি যেন মন্ত্রবলে সব চাঞ্চল্যও থেমে গেলো মুহূর্তে।

'দেখলে তো, *স্টীম হাউসকে* ঘিরে ফেলেছে এরা।' বললে ব্যাঙ্কস।

'হুম।' হুডের বিশ্বাস এতক্ষণে একটা মস্ত ঝাঁকুনি খেলো।

কিন্তু কী করা যায় এখন? কালোগনির কাছে পরামর্শ চাওয়া হ'লো। সে তার উদ্বেগ চাপা দেবার কোনো চেষ্টাই করলে না। রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চ'লে যাওয়া যায় না? উঁহু, *অসম্ভব*! তাছাড়া তাতে কীই-বা লাভ হবে? হাতির পাল যে অন্ধকারেও আমাদের অনুসরণ করবে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। তাছাড়া রাতের বেলায় এই পাহাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে-পড়ার অনেক বিপদ আছে। কাজেই আলো ফোটবার আগে রওনা হবার কোনোরকম চেষ্টা না-করাই ভালো। হাতির পালকে না-চটিয়ে তখন আমরা চ'লে-যাওয়ার একটা আপ্রাণ চেষ্টা করতে পারি।

'কিন্তু তখনও যদি হাতির পাল পাছু না-ছাড়ে?' আমি জিগেস করলুম।

'তখন আমরা এমন-কোথাও যাবার চেষ্টা করবো, যেখানে তারা আর *বেহেমথের* নাগাল পাবে না,' বললে ব্যাঙ্কস।

'বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করবার আগে এমন-কোনো জায়গা কি পাবো আমরা?' নাছোড় হুড জানতে চাইলো।

'একটা জায়গা অবিশ্যি আছে,' বললে কালোগনি।

'কোথায়?'

'লেক পুটুরিয়া।'

'এখান থেকে হ্রদটা কতদূরে?'

'প্রায় ন মাইল।'

'কিন্তু হাতিরা তো সাঁৎরাতে পারে—প্রায় সমস্ত দিনই তারা জলে কাটিয়ে দিতে পারে!' বললে ব্যাঙ্কস। 'ওরা যদি লেক পুটুরিয়া অব্দি আমাদের ধাওয়া ক'রে যায়, তাহ'লে তো অবস্থা আরো সঙিন হ'য়ে পড়বে।'

'কিন্তু তাছাড়া তো এদের হাত এড়াবার আর-কোনো উপায় দেখছি না।'

'তাহ'লে তা-ই করা হোক!' ব্যাঙ্কস রাজি হ'লো।

তাছাড়া অবিশ্যি আর-কিছু করারও ছিলো না। হাতিগুলো হয়তো জলে নেমে পড়ার ঝুঁকি নেবে না; যদি-বা নেয়, তাহ'লে তাদের এড়িয়ে যাবার জন্যে অন্য-কোনো উপায় তখনই না-হয় ভাবা যাবে।

আমরা অধীরভাবে দিনের অপেক্ষা করতে লাগলুম। তখন রাত শেষ হ'তে বেশি

বাকিও ছিলো না। কিন্তু দিন হ'লে দেখা গেলো, একটি হাতিও নড়েনি—*স্টীম হাউসকে* তারা চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে। এবার দিনের বেলায় কয়েকটা হাতি এসে একেবারে *বেহেমথের* গা ঘেঁসে দাঁড়ালো। ব্যাঙ্কস ব'লে দিয়েছিলো কেউ যেন কিছুতেই হাতিদের চটিয়ে না-দিই। হাতিরা নিশ্চয়ই এখন নিশ্চল *বেহেমথকে* ঘিরে বুঝতে চাচ্ছে হাতিরই মতো দেখতে এই অতিকায় দানবটা কোন আজব কিম্ভূত জন্তু। তাদেরই কোনো আত্মীয় কি? তার ক্ষমতা তাদের চেয়ে বেশি, এটা কি তারা বুঝতে পারছে? আগের দিন তারা ভালো ক'রে দেখতে পায়নি তাকে, কারণ সারাক্ষণই একটু দূরে-দূরে ছিলো। কিন্তু এখন তারা কী করবে, যখন ঘোঁৎ ক'রে আওয়াজ ক'রে শুঁড় দিয়ে ভলকে-ভলকে ধোঁয়া ছাড়বে *বেহেমথ*? যখন দেখবে যে মস্ত পা ফেলে-ফেলে *বেহেমথ* দুটো আস্ত বাড়ি টেনে নিয়ে চলেছে, তখন তাদের সকলের প্রতিক্রিয়া কী হবে?

কর্নেল মানরো, ক্যাপ্টেন হুড, কালোগনি আর আমি *স্টীম হাউসের* সামনের দিকে গিয়ে দাঁড়ালুম; সার্জেন্ট ম্যাক-নীল তার সঙ্গীদের নিয়ে দাঁড়ালো পিছনে। কালু চুল্লির সামনে দাঁড়িয়ে কেবলই জ্বালানি দিয়ে স্টীম বাড়িয়ে চললো। ব্যাঙ্কস রইলো স্টরের সঙ্গে হাওদায়, চাকায় হাত দিয়ে প্রস্তুত, যাতে যে-কোনো দিকে *স্টীম হাউসকে* চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

অবশেষে যাবার মুহূর্ত এলো। ব্যাঙ্কসের ইঙ্গিতে স্টর স্প্রিং ধ'রে টান দিলে, তীব্র একটা কানে-তালা-ধরানো বাঁশির আওয়াজ হ'লো। আশপাশের হাতিরা মাথা তুলে একটু স'রে দাঁড়ালো পিছনে, সামনে কয়েক ফুট জায়গা ফাঁকা ক'রে দিলে।

বেহেমথের শুঁড় দিয়ে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে এলো, চাকাগুলো গড়িয়ে গেলো সামনের দিকে, *বেহেমথ* চলতে শুরু ক'রে দিলে।

বেহেমথকে চলতে দেখেই সামনের হাতিদের মধ্যে অদ্ভুত-একটা সাড়া প'ড়ে গেলো। ভীষণ অবাক হ'য়ে গেলো তারা, কী-রকম ভ্যাবাচাকা খেয়ে স'রে গেলো সামনে থেকে, আর রাস্তা ক'রে দেয়ার ফলে *বেহেমথ* সামনের দিকে এগিয়েই চললো।

কিন্তু হাতিরাও সঙ্গ ছাড়লে না কিছুতেই। তারাও পিছনে আসতে লাগলো, আগেরই মতো, উপরন্তু এবার দু-পাশেও হাতির পাল *বেহেমথের* সমান্তরভাবে এগুতে লাগলো। যেমনভাবে ঘোড়সোয়াররা রাজারানীর গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে এগোয়, অনেকটা সেইভাবে। এই চমকপ্রদ পুরো দলটা চললো আশ্চর্য শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে, তাড়াহুড়ো করলো না, কোনো উত্তেজনা প্রকাশ করলো না—কেবল *বেহেমথের* গতির সঙ্গে সমানে তাল রাখতে লাগলো।

'এরা যদি এইভাবেই আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে হ্রদ পর্যন্ত যায়,' বললেন কর্নেল মানরো, 'তাহ'লে আমি কোনো আপত্তি করবো না।'

'কিন্তু রাস্তা যখন সংকীর্ণ হ'য়ে যাবে, তখন কী হবে?' আশঙ্কা প্রকাশ করলে কালোগনি।

ঘণ্টা তিনেক কেটে গেলো, আমরা আট মাইল পথ পেরিয়ে এসেছি— ওর মধ্যে

নতুন-কিছুই ঘটেনি । হাতিদের দেখে-দেখে আমরা কী-রকম যেন অভ্যস্ত হ'য়ে গেছি —প্রথম যে-চমক আর ভয়টা ছিলো, তা ক্রমশই থিতিয়ে গিয়ে ভোঁতা হ'য়ে আসছে । হ্রদটা মাত্র আর মাইল দু-এক দূরে—সেখানে গিয়ে একবার পৌঁছুতে পারলেই আর-কোনো ভয় থাকবে না, আমরা ভাবলুম ।

এই জায়গাটা ঠিক বন্য নয়, কিন্তু মরুভূমির মতো ফাঁকা । কোনো গ্রাম পড়লো না পথে, একটা গোলাবাড়িও নয়, কোনো পথিক পর্যন্ত দেখতে পেলুম না এ-পর্যন্ত । বুন্দেলখণ্ডের এই পার্বত্যপ্রদেশে আসার পর থেকে একটি মানুষও আমাদের চোখে পড়েনি ।

এগারোটা নাগাদ উপত্যকাটা সংকীর্ণ হ'য়ে এলো, রাস্তার দু-পাশে উঁচু হ'য়ে উঠতে লাগলো পাহাড়—এবং আবার আমাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠলো । হাতিরা যদি আমাদের পিছন-পিছন আসতো, কিংবা এগিয়ে যেতো সামনে, তাহ'লে কোনো আশঙ্কাই ছিলো না । দু-পাশে কুচকাওয়াজ ক'রে আসছে অনেকে । হয় *বেহেমথের* ধাক্কায় তারা এখানে চেপ্টে মরবে, নয়তো চিৎপটাং হ'য়ে গড়িয়ে প'ড়ে যাবে খাদে ।

রাস্তাটা সরু হ'য়ে আসছে দেখেই হাতির পাল দু-ভাগ হ'য়ে কেউ চ'লে গেলো সামনে, কেউ-বা পিছনে । আর তারই ফলে *বেহেমথের* পক্ষে এগুনো বা পিছোনো অসম্ভব হ'য়ে উঠলো ।

'ব্যাপারটা ভারি গোলমেলে হ'য়ে উঠলো তো,' মানরো মন্তব্য করলেন ।

'হ্যাঁ,' বললে ব্যাঙ্কস, 'এবার দেখছি সোজা এদের উপর দিয়েই *বেহেমথকে* চালিয়ে নিতে হবে ।'

'তাহ'লে তা-ই করো !' হুড ব'লে উঠলো, '*বেহেমথের* লোহার দাঁত ওদের উজবুক গজদন্তের চেয়ে অনেক জোরালো, সন্দেহ নেই ।' পরিবর্তমান হুডের চোখে বুদ্ধিমান হাতিরা ইতিমধ্যেই গবেট ও উজবুকে পরিণত হ'য়ে গেছে ।

ম্যাক-নীল বললে, 'কিন্তু *বেহেমথ* একা, আর ওরা একশো ।'

'এগোও, যা-হয় হবে ।' ব্যাঙ্কস চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলে, 'না-হ'লে হাতির পাল শেষটায় আমাদের পিষে মারবে !'

বেহেমথের শুঁড় থেকে ভলকে-ভলকে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে এলো, সামনের হাতিটার গায়ে তার চোখা লোহার দাঁত বিঁধে গেলো মুহূর্তে । হাতিটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ ক'রে উঠলো, আর তৎক্ষণাৎ পুরো দলটা থেকে একযোগে একটা চাপা রাগি গর্জন উঠলো । যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ।

আমাদের হাতে বুলেটভরা রাইফেল, এমনকী রিভলবারগুলোয় পর্যন্ত গুলি ভরা । অন্তত কোনো প্রতিরোধ না-ক'রে *বেহেমথ* মাথা নোয়াবে না !

আক্রমণটা প্রথমে এলো একটা মস্ত পুরুষ হাতির কাছ থেকে ; হাতিটা কেবল অতিকায় নয়, দেখতে সাংঘাতিক, ভীষণ ; পিছনের পা মাটিতে রেখে সে *বেহেমথের* মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ালো ।

'একটা *গণেশ* !' কালোগনি চেঁচিয়ে উঠলো ।

'ফুঃ,' হুড তাচ্ছিল্য ক'রে কাঁধ ঝাঁকালে, 'হাতিটার মাত্র একটাই দাঁত !'

'সেইজন্যেই তো সে আরো-ভীষণ,' কালোগনি জানালে ।

গণেশ বলে এক-দেঁতো পুরুষ হাতিকে—বিশেষ ক'রে তার ডান দিকের দাঁতটা না-থাকলে সে আরো ভীষণ হ'য়ে ওঠে । *গণেশরা* অসাধারণ ডাকাবুকো—কোনো-কিছু রেয়াৎ করে না, ভয় করে না । *গণেশের* অকুতোভয় পরাক্রম আমরা তক্ষুনি বুঝতে পারলুম ।

বেপরোয়া একটা গর্জন ক'রে উঠলো *গণেশ*, ক্রুদ্ধ ও স্পর্ধিত ; শুঁড়টা শূন্যে তোলা, সেই একটামাত্র দাঁত উঁচিয়েই সে ছুটে এলো ।

লোহার পাতের গায়ে এমন ভয়ংকরভাবে তার দাঁতটা লাগলো যে সমস্ত *স্টীম হাউস* থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো ; ইস্পাতের চাদরে মোড়া না-থাকলে *বেহেমথ* নিশ্চয় এফোঁড়-ওফোঁড় হ'য়ে যেতো ; কিন্তু *বেহেমথ* নিশ্চিতভাবে এগিয়ে যেতে থাকলো সামনে—আর সেই প্রচণ্ড সংঘাতে *গণেশের* দাঁতটা দু-টুকরো হ'য়ে ভেঙে গেলো । কিন্তু তবু সেই বেপরোয়া *গণেশ* সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে *বেহেমথকে* —আর তার ডাকে সাড়া দিয়ে পুরো হাতির পালটা সামনে স্থির দাঁড়িয়ে রইলো, অনড় মাংসপিণ্ডের স্তূপের মতো—আর পিছন থেকে অন্য হাতিরা এসে ধাক্কা দিলে *বেহেমথকে* । উদ্দেশ্য, দুই দলের মধ্যে প'ড়ে *বেহেমথ* চূর্ণ হ'য়ে যাক ।

থামলে চলবে না, তাহ'লে মুহূর্তে তারা *বেহেমথকে* কাৎ ক'রে ফেলবে ; কোনো-রকম ইতস্তত না-ক'রে আমাদের উলটো আক্রমণ করতে হবে এবার । রাইফেলগুলো উদ্যত হ'লো হাতে । হুড তারস্বরে চেঁচিয়ে ব'লে দিলে, 'একটা গুলিও বাজে খরচ কোরো না । শুঁড়ের গোড়ায় গুলি কোরো—কিংবা চোখ দুটোর মাঝখানে, কপালে । ওগুলোই হ'লো আসল জায়গা ।'

হুডের কথা শেষ হবার আগেই কয়েকটা বন্দুক গ'র্জে উঠলো, সেই সঙ্গে হস্তীকুলের মধ্য থেকে উঠলো কাতর চীৎকার । তিন-চারটে হাতি মারাত্মক জায়গায় গুলি লেগে প'ড়ে গেলো পিছনে ও দু-পাশে—আর সেইজন্যেই বাঁচোয়া, সামনে পড়লে তাদের মৃতদেহগুলোই *বেহেমথের* কাছে মস্ত বাধা হ'য়ে দাঁড়াতো । আর্তনাদ শুনে সামনের হাতিগুলো একপাশে স'রে দাঁড়ালো—*বেহেমথ* এগিয়ে চললো, নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত ।

'গুলি ভ'রে নাও বন্দুকে,' হুড বললে ।

ততক্ষণে হাতিরা আবার সবেগে একযোগে আক্রমণ করেছে *বেহেমথকে* । আমরা হাল ছেড়ে দিলুম । কারণ হাতিরা যখন বেপরোয়া হ'য়ে ওঠে, তখন কার সাধ্য তাদের রোধ করে, ঠেকায় !

'এগোও সামনে,' ব্যাঙ্কস নির্দেশ দিলে স্টরকে ।

'গুলি করো, *আবার* !' হুডের চীৎকার শোনা গেলো ।

হাতির ক্রুদ্ধ গর্জন, *বেহেমথের* তীক্ষ্ণ বাঁশি, আর আমাদের রাইফেলের শব্দ—

সব মিলে যেন একটা তাণ্ডব শুরু হ'য়ে গেছে। গোলমালে লক্ষ্য স্থির ক'রে গুলি করার উপায় নেই। মাংসে গুলি লাগছে, তবে তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না। দু-একটা গুলি কেবল কারু-কারু দুই চোখের মাঝখানে লাগলো, আর সেই হাতিগুলিই শুধু হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেলো। যারা কেবল আহত হ'লো তারা আরো-রাগিভাবে এগিয়ে গেলো *বেহেমথের* দিকে—*স্টীম-হাউসের* দেয়ালশুদ্ধু যেন তাদের চাপে ভেঙে যাবে।

বেহেমথের স্টীমের আওয়াজ হচ্ছে ফোঁস-ফোঁস—সেও যেন অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো গর্জাচ্ছে—যেন আদিম কোনো আবেগে ছুটে যাচ্ছে সামনে; আর তার লোহার শুঁড় সামনে যাকে পাচ্ছে আঘাত করছে প্রচণ্ড, তার ইস্পাতের দাঁত বিঁধে যাচ্ছে কারু-কারু গায়ে—থরথর ক'রে কাঁপতে-কাঁপতে সে এগুচ্ছে—আর ইতিমধ্যে দূরে দেখা যাচ্ছে হ্রদের জল।

হঠাৎ, এমন সময়, সামনের বারান্দায় একটা প্রকাণ্ড শুঁড় ল্যাসোর মতো বিদ্যুৎবেগে নেমে এলো—সেই জীবন্ত ল্যাসো মুহূর্তে কর্নেল মানরোকে তুলে নিতো পেঁচিয়ে, কিন্তু মস্ত একটা কুঠার হাতে লাফিয়ে পড়লো কালোগনি, প্রচণ্ড আঘাতে দু-খানা ক'রে দিলে সেই শুঁড়টা।

তারপর থেকে লড়াইটা আরো-প্রচণ্ড হ'য়ে উঠলো—আমরা অবিশ্রাম গুলি চালিয়ে গেলুম, আর কালোগনি সারাক্ষণ কর্নেল মানরোকে আড়াল ক'রে রাখলে সব বিপদ থেকে, চোখে-চোখে রাখলে সবসময়।

বেহেমথের ক্ষমতার এটাই *অগ্নিপরীক্ষা*। যেন কোনো প্রচণ্ড গজালের মতো সে ভেদ ক'রে যাচ্ছে এই মাংসস্তূপ।

হঠাৎ, এমন সময়, পিছনে *স্টীম হাউসের* দ্বিতীয় বাড়ি থেকে প্রচণ্ড শোরগোল উঠলো। একপাল হাতি দ্বিতীয় বাড়িটাকে পাথরের গায়ে উলটে পিষে ফেলার চেষ্টা করছে।

ব্যাঙ্কস চেঁচিয়ে সবাইকে দ্বিতীয় বাড়িটা থেকে চ'লে আসতে বললো। ফক্স, গৌমি আর ম্যাক-নীল ততক্ষণে চ'লে এসেছে সামনের বারান্দায়।

'পারাজার কোথায়?' হুড জিগেস করলে।

'সে তার রান্নাঘর ছেড়ে কিছুতেই বেরুবে না,' ফক্স বললে।

'আসতেই হবে তাকে—পাঁজাকোলা ক'রে ওকে নিয়ে এসো।'

মঁসিয় পারাজার কিছুতেই তার রসুইখানা ছেড়ে বেরুবে না, কিন্তু তখন তর্কাতর্কি করার সময় নেই, গৌমি তাকে জোর ক'রে কাঁধে তুলে নিয়ে এলো।

'সবাই এসেছো?' ব্যাঙ্কস জিগেস করলে।

'হ্যাঁ, সাহেব,' গৌমি জানান দিলে।

'জোড়া খুলে দাও।'

'তার মানে? *স্টীম হাউসের* আধখানা ফেলে যাবো আমরা?'

'তাছাড়া আর উপায় নেই। বিপদের সময় পণ্ডিতেরা আদ্ধেক ছেড়ে যান!' ব্যাঙ্কস

জানালে ।

সংযোগ-শিকল ছিন্ন ক'রে তক্ষুনি দ্বিতীয় বাড়িটাকে আলাদা ক'রে দেয়া হ'লো । আর পর মুহূর্তেই ক্রুদ্ধ খ্যাপা হাতিদের পায়ের তলায় গোটা বাড়িটা লণ্ডভণ্ড শতখণ্ড হ'য়ে গেলো । দ্বিতীয় বাড়িটার বদলে হাতিরা যদি সামনের বাড়িটা আক্রমণ করতো...আমি আর ভাবতে পারলুম না ।

লেক পুটুরিয়া আর মাত্র কয়েক গজ দূরে তখন ।

স্টর পূর্ণবেগে চালিয়ে দিলে *বেহেমথকে—বেহেমথের* শুঁড় দিয়ে তখন গরম বাষ্প বেরুচ্ছে সামনে, ছ্যাঁকা দিচ্ছে সামনের হাতিদের—যেমন দিয়েছিলো একবার ফল্গুনদীর তীর্থযাত্রীদের ।

একবার হ্রদে পৌঁছুতে পারলেই আমরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হবো । হাতিরাও বোধকরি সেটা বুঝতে পেরেছিলো—ক্যাপ্টেন হুড যে তাদের বুদ্ধির কথা বলছিলো, এটাই তার প্রমাণ । তারা একটা মরীয়া শেষ চেষ্টা করলে *বেহেমথকে* বাধা দিতে ।

বারে-বারে গর্জন ক'রে উঠছে আমাদের বন্দুক । *বেহেমথের* শুঁড় দিয়ে বেরিয়ে আসছে গরম বাষ্প, যেন রাগে ফোঁশ-ফোঁশ করছে *এই* অতিকায় লৌহদানব । এত জোরে ছুটছে যে হঠাৎ যে-কোনো সময় *স্টীম হাউস* উলটে যেতে পারে—সামনে তখনও কয়েকটা হাতি শুঁড় তুলে একটা শেষ চেষ্টা করলে, কিন্তু এক ঝটকায় তাদের সরিয়ে দিয়ে দুর্ধর্ষ *বেহেমথ* জলে নেমে পড়লো—এবং জলে নেমেই শান্ত জলে ভেসে চললো, জাহাজের মতো ।

দু-তিনটে হাতিও জলে নেমে পড়েছিলো, কিন্তু ধাবমান *বেহেমথ* থেকে কয়েকটা গুলি ছুটে আসতেই তারা আবার চটপট উঠে পড়লো ডাঙায় ।

'কী, ক্যাপ্টেন ?' ব্যাঙ্কস জিগেস করলে ঠাণ্ডা গলায়, 'ভারতীয় হস্তিকুলের ভদ্র ও সুমধুর স্নিগ্ধ সম্ভাষণ কেমন লাগলো ।'

'ধেৎ !' হুড ব'লে উঠলো, 'এরা আবার বন্য জন্তু নাকি । এই একশোটা উজবুকের জায়গায় যদি তিরিশটা বাঘ হ'তো, তাহ'লে কী হ'তো একবার ভাবো দেখি—এই অদ্ভুত গল্পটা শোনাবার জন্যে আমাদের একজনও যে আর বেঁচে থাকতো না, এটা আমি বাজি ধ'রে বলতে পারি !'

৮

লেক পুটুরিয়া

বেহেমথ যখন লেক-পুটুরিয়ার মাঝখানে ভাসছে, তখন এক-এক ক'রে আমরা খতিয়ে দেখছি ক্ষতির পরিমাণ । সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছিলো মঁসিয় পারাজারের জন্যে ; রান্নাঘরটা

হারিয়ে বেচারি ভারি মনমরা হ'য়ে গেছে । এদিকে আমাদেরও এতক্ষণে ক্ষুধার উদ্রেক হচ্ছে, সকালবেলায় সেই কখন তাড়াহুড়ো ক'রে ছোটোহাজরি সেরেছিলুম—তারপরে আর-কিছু খাওয়া হয়নি । এখন যতক্ষণ-না জব্বলপুর পৌঁছুনো যাচ্ছে, খাওয়া-দাওয়ার কোনো উপায় নেই । ওদিকে *বেহেমথের* জ্বালানিও শেষ হ'য়ে গিয়েছে, স্টীম ক'মে আসছে, ক'মে এসেছে গতিবেগ ; তার উপর সন্ধে হ'তে-না হ'তেই সব কুয়াশায় ঢাকা প'ড়ে গেলো । সকলেরই মুখ খুব গম্ভীর—এ অবস্থায় কী-যে করণীয়, কিছুই স্থির ক'রে ওঠা যাচ্ছে না । স্রোত আর হাওয়া যতক্ষণ-না আমাদের তীরে পৌঁছে দিচ্ছে, ততক্ষণ এই হ্রদের মাঝখানে হাত-পা গুটিয়ে ব'সে-থাকা ছাড়া আর-কিছু করার নেই ।

'শোনো, কালোগনি, হ্রদটা কত বড়ো, তোমার জানা আছে ?'

'আছে সাহেব, কিন্তু এই কুয়াশায় ঠিক বোঝা কঠিন—'

'আন্দাজ ক'রেও বলতে পারবে না আমরা তীর থেকে কত দূরে আছি ?'

একটু ভেবে কালোগনি বললে, 'দেড় মাইলের বেশি হবে না ।'

'পুব তীর থেকে ?'

'হ্যাঁ ।'

'অর্থাৎ ওই তীরে গিয়ে পৌঁছুলে আমরা জব্বলপুরের রাস্তায় গিয়ে পড়বো ?'

'হ্যাঁ ।'

'তাহ'লে জব্বলপুরেই আমাদের সব রশদপত্তর জোগাড় করতে হবে ।' বললে ব্যাঙ্কস, 'কিন্তু তীরে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে, কে জানে ? জ্বালানি নেই ব'লে হাওয়ার উপর নির্ভর ক'রে ব'সে থাকতে হবে আমাদের । কয়েক ঘণ্টাও লাগতে পারে, আবার পুরো দু-দিনও কেটে যেতে পারে । অথচ খাবারদাবারও কিছু নেই !'

'কিন্তু,' কালোগনি বললে, 'আমাদের মধ্যে কেউ-একজন আজ রাতেই ডাঙায় পৌঁছুবার চেষ্টা করলে হয় না ?'

'কেমন ক'রে পৌঁছুবে—উপায় কই ?'

'কেন ? সাঁৎরে ।'

'এই কুয়াশায় দেড় মাইল সাঁৎরে যাবে ? এ-তো মরতে যাওয়া—'

'বিপদ আছে ব'লেই কোনো চেষ্টা করবো না, তা কী হয় ?' কালোগনি বললে ।

'তুমি যেতে চাও সাঁৎরে ?' কর্নেল মানরো জিগেস করলেন ।

'হ্যাঁ, কর্নেল । আমি এই কুয়াশাতেও তীরে পৌঁছুতে পারবো !'

'একবার তীরে পৌঁছুতে পারলে,' ব্যাঙ্কস বললে, 'অবশ্য কোনো ভয় নেই । জব্বলপুর থেকে তাহ'লে চটপট সাহায্য নিয়ে আসতে পারবে ।'

'আমি এক্ষুনি রওনা হ'য়ে পড়তে রাজি আছি,' কালোগনি বললে ।

ভেবেছিলুম এ-কাজে রাজি হবার জন্যে কালোগনিকে ধন্যবাদ জানাবেন কর্নেল মানরো । কিন্তু তার মুখের দিকে স্থির চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মানরো শেষে হাঁক পাড়লেন, 'গৌমি !...তুমি ভালো সাঁতার কাটতে পারো ?'

'হ্যাঁ, সাহেব।' গৌমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

'এ-রকম কুয়াশার মধ্যে মাইল দেড়েক সাঁৎরে যেতে পারবে তুমি?'

'তা পারবো।'

'বেশ। কালোগনি বলছে সে সাঁৎরে তীরে চ'লে যাবে—তীর থেকে জব্বলপুর বেশি দূরে নয়। এখন বুন্দেলখণ্ডের এদিকটায়—কি জলে, কি ডাঙায়—একজনের চেয়ে দুজন বুদ্ধিমান ও সাহসী লোকের সফল হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি! তুমি কালোগনির সঙ্গে যাবে?'

'নিশ্চয়ই সাহেব!' গৌমি বললে।

'আর-কারু অবিশ্যি দরকার ছিলো না,' বললে কালোগনি, 'তবে কর্নেল মানরো যখন বলছেন, তাহ'লে গৌমিও না-হয় সঙ্গে চলুক।'

'তাহ'লে আর দেরি কোরো না,' ব্যাঙ্কস বললে, 'আর সাবধানে যেয়ো—সাহসের চেয়েও সতর্কতা অনেক সময় বেশি কাজে লাগে।'

কর্নেল মানরো গৌমিকে একপাশে ডেকে নিয়ে সংক্ষেপে দু-এক কথায় কী-সব নির্দেশ দিলেন। পাঁচ মিনিট পরেই গৌমি আর কালোগনি মাথায় দুটি কাপড়ের পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে জলে নেমে পড়লো। একটু পরেই ঘন কুয়াশায় তারা মিলিয়ে গেলো—তাদের আর দেখা গেলো না।

কালোগনিকে একা পাঠাতে কর্নেল মানরো কেন রাজি হচ্ছিলেন না, তা আমার দুর্বোধ্য ঠেকছিলো। আমার ধন্দের কথাটা জিগেস করতেই মানরো বললেন, 'মঁসিয় মোক্লের, কালোগনিকে কখনও অবিশ্বাস করার কোনো কারণ আমি পাইনি—তবু এখন তার কথাবার্তার সুর আমার কেন যেন ভালো ঠেকছিলো না।'

'মানে?' ব্যাঙ্কস জিগেস করলে।

'এভাবে সাঁৎরে যাবার পিছনে ওর নিশ্চয় আরো-কোনো মৎলব আছে। আমার মনে হয় না ও জব্বলপুরে সাহায্য আনতে যেতো।'

'কিন্তু, কর্নেল, কালোগনি আমাদের অনেকবার বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে— বিশেষ ক'রে আপনাকে তো সবচেয়ে বেশি! অথচ আপনিই এখন ওকে অবিশ্বাস করছেন! কেন, বলুন তো? আর তাছাড়া আমাদের হঠাৎ বিপদে ফেলে ওর কী-ই বা লাভ হবে?'

'তা জানি না। হয়তো সব যখন বুঝতে পারবো, তখন আমাদের কিছুই করার থাকবে না। তবে গৌমিকে আমি বিশেষভাবে সাবধান ক'রে দিয়েছি—বলেছি কালোগনিকে যেন সবসময় চোখে-চোখে রাখে।' কর্নেল মানরো এর চেয়ে বেশি আর কিছুই ভেঙে বলতে রাজি হলেন না।

রাতটা কেটে গেলো স্তব্ধ, কুয়াশাঢাকা, প্রলম্বিত। পাঁচটার সময় পর্যন্ত কুয়াশা সরলো না, আলো ফুটলো না একফোঁটা। অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর-কিছু করার নেই। কর্নেল মানরো, ম্যাক-নীল আর আমি ব'সে আছি সামনে, ফক্স আর মঁসিয়

পারাজার পিছনে, ব্যাঙ্কস আর স্টর হাওদায়, আর ক্যাপ্টেন হুড *বেহেমথের* কাঁধে, শুঁড়ের কাছে—যেন মাস্তুলে টঙের উপর ব'সে আছে কোনো নাবিক ।

বেলা দুটো নাগাদ হাওয়া উঠলো । সূর্যের প্রথম রশ্মি ফুটলো কুয়াশা ছিঁড়ে, আস্তে-আস্তে কুয়াশা স'রে গেলো, দিগন্ত পর্দা তুলে দিলে ।

'ডাঙা !' ঠিক নাবিকদের মতোই চেঁচিয়ে বললে ক্যাপ্টেন হুড ।

দক্ষিণ-পুব দিকে ডাঙা প'ড়ে আছে, গাছপালা ঢাকা । আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে মেঘের কোলে পাহাড় ।

হাওয়া আস্তে-আস্তে আমাদের তীরে পৌঁছে দিয়ে গেলো ।

ফাঁকা তীর—শুধু কতগুলো গাছপালা ছাড়া আর-কিছু নেই । *বেহেমথ* তীরে এসে ঠেকলো । কিন্তু স্টীম ছাড়া তাকে ডাঙায় তোলা মুশকিল ।

আমরা সবাই ডাঙায় নেমে পড়লুম । ব্যাঙ্কস তাড়াতাড়ি জ্বালানির জোগাড়ে শশব্যস্ত হ'য়ে উঠলো । যাতে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই জব্বলপুর রওনা হওয়া যায়, সেদিকে নজর রেখেই সে এমন ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে ।

সবাই মিলে হাত লাগিয়ে কাঠকুটো ডালপালা জড়ো করছি, যাতে এক-ফোঁটা সময় নষ্ট না-হয় । কেবল কালু ব'সে ব'সে চুল্লিতে কাঠ গুঁজে দিচ্ছে আর গরম ক'রে নিচ্ছে এঞ্জিন । ঘন্টাখানেকের মধ্যেই স্টীম বেশ চাপ দিতে লাগলো । 'তাহ'লে এবার জব্বলপুর রওনা হওয়া যাক,' বললে ব্যাঙ্কস ।

কিন্তু স্টর রেগুলেটরে হাত দেবার আগেই গাছপালার আড়াল থেকে আচমকা একটা প্রচণ্ড কোলাহল উঠলো । পরক্ষণেই প্রায় দেড়শোজন ভারতীয় বনের মধ্যে থেকে ছুটে এলো *স্টীম হাউসের* দিকে—মুহূর্তের মধ্যে আক্রান্ত হ'লো হাওদা ও গাড়ি—কিছু বুঝে ওঠবার আগেই আমাদের কয়েদ ক'রে তারা *স্টীম হাউস* থেকে নামিয়ে নিলে । মুক্তির চেষ্টা করা বৃথা, কারণ শক্ত ক'রে তারা ধ'রে রেখেছে আমাদের, চোখে মুখে দয়া বা মমতার লেশমাত্র নেই ।

তাদের পুঞ্জীভূত ক্রোধ মুহূর্তের মধ্যে গোটা *স্টীম হাউসটাই* লণ্ডভণ্ড ক'রে দিলে —আশবাবপত্তর কিছুই রইলো না আস্ত, মুহূর্তের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়া হ'লো আমাদের *স্টীম হাউসে* !

বেহেমথকেও তারা ধ্বংস করতে চেষ্টা করলে, কিন্তু আগুন বা কুঠার কিছুই *বেহেমথের* গায়ে আঁচড়টি কাটতে পারলে না । ক্যাপ্টেন হুড রাগে চ্যাঁচাতে লাগলো । কিন্তু কেউ তার দিকে দৃক্‌পাতও করলে না ।

স্টীম হাউস পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলে পর ভিড়ের মধ্য থেকে দৃপ্ত পদক্ষেপে একজন এগিয়ে এলো আমাদের দিকে । নিশ্চয়ই দলের সর্দার । অন্য লোকেরা তৎক্ষণাৎ তার পাশে মাথা নত ক'রে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলো । এমন সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে আরেকটা লোক এগিয়ে গেল সর্দারের দিকে । এবং তক্ষুনি সব রহস্যের অবসান হ'য়ে গেলো । দ্বিতীয় লোকটি আর-কেউ নয়—*কালোগনি* ।

আশপাশে গৌমির কোনো চিহ্ন নেই ।

কালোগনি সোজা এগিয়ে গেলো মানরোর দিকে, আঙুল তুলে দেখালো সে কর্নেলকে, 'এই-যে সেই !' সে বললে ।

তক্ষুনি কোনো কথা না-ব'লে মানরোকে তারা টেনে নিয়ে গেলো—কোনো কথা বলবারও অবসর দেয়নি । হুড, ব্যাঙ্কস ও আমরা বাকি সবাই খামকাই নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টা করতে লাগলুম, কিন্তু তারা আমাদের ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলে ।

মানরোকে নিয়ে দলটা দক্ষিণ দিকে বনের আড়ালে চ'লে গেছে । মিনিট পনেরো পরে রক্ষীরাও আমাদের ফেলে রেখে ছুটে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো ।

অনুসরণ ক'রে কোনো লাভ নেই, জানি । কারণ তাতে সার এডওয়ার্ডকেই অযথা আরো বিপন্ন করা হবে। বুঝতে বাকি ছিলো না যে কালোগনির আক্রমণের লক্ষ্য কেবল সার এডওয়ার্ডই ।

কিন্তু কেন ? নিশ্চয়ই তার নিজের কোনো স্বার্থ তাতে সিদ্ধ হবে না । তবে *কার* আদেশ সে পালন করছে ? নানাসাহেব নামটা যেন কোনো একটা অতিকায় অলুক্ষুণে শক্তির মতো আমার মনের মধ্যে ভিড় ক'রে এলো ।

+

মঁসিয় মোক্লের-এর পাণ্ডুলিপি এখানে এসেই শেষ হয়েছে । ভারত ভ্রমণে আসা এই ফরাশি যুবাপুরুষ এর পরেকার ঘটনাগুলো আর স্বচক্ষে দ্যাখেননি—কীভাবে এই গ্রন্থিল কাহিনীর সবগুলো জট এরপর হুড়মুড় ক'রে খুলে গিয়েছিলো, তিনি অবশ্য তার প্রত্যক্ষ দর্শক ছিলেন না । কিন্তু পরে যখন সব জানা গেলো, তখন তাদের গল্পের মতো ক'রে একজায়গায় ক'রে দেয়া হ'লো, যাতে মঁসিয় মোক্লের-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত একটা মোটামুটি সম্পূর্ণ চেহারা নিতে পারে ।

৯

মুখোমুখি

বন্দীকে নিয়ে চলেছে কালোগনি । সদলবলে । এতকাল সে তাঁকে নিজের জীবন পদে-পদে বিপন্ন ক'রেও বাঁচিয়েছে নানা বিপদ থেকে, সাপ-বাঘ-হাতির পাল সব-কিছুর হাত থেকে নিজের জীবন বারে-বারে বিপন্ন ক'রে কর্নেল মানরোকে সে বাঁচিয়েছিলো কেবল এই মুহূর্তটির জন্যেই ; নানাসাহেবের পরম শত্রুকে বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়ে প্রভুর কাছে তুলে-দেয়া—এতদিন এই ছিলো তার ধ্যান, জ্ঞান আর স্বপ্ন । সেইজন্যেই তরাইয়ের

সেই গভীর জঙ্গলে ওলন্দাজ প্রাণিতাত্ত্বিক মাতিয়াস ফান খোইতের কাছে সে চাকরি নিয়েছিলো ; এইজন্যেই নানাভাবে সে উপার্জন করছিলো আস্ত *স্টীম-হাউসের* বিশ্বাস —সেই-যে মহরমের দিন ভোপালে নানাসাহেব তার কাঁধে দায়িত্ব তুলে দিলেন, তারপর থেকে কায়মনোবাক্যে সে কেবল এই পরিকল্পনাই চরিতার্থ করবার জন্যেই নিজের জীবনটাকে নিয়ে বারে-বারে ছিনিমিনি খেলেছে। কেউ বুঝতে পারেনি তার উদ্দেশ্য কী, স্বপ্ন কী, সাধ কী—নিজের সব অনুভূতিকে সে এতদিন চাপা দিয়ে রেখে এসেছে।

কেবল যখন লেক পুটুরিয়া সাঁৎরে পেরুবার সময় গৌমি তার সঙ্গে এলো, তখন মুহূর্তের জন্যে তার চোখটা ধ্বক ক'রে জ্ব'লে উঠেছিলো। অনেক কষ্টে সে তখন নিজেকে সংবরণ করে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে তীরে পৌঁছে নানাসাহেবের আরেকজন অনুচর নাসিম ও তার দলের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে তার একটুও দেরি হয়নি, কারণ এ-সব জায়গার পথঘাট সব তার নখদর্পণে। কেবল যখন অন্ধকারে নাসিমের সঙ্গে সে কথা বলছিলো তখন গৌমি সব বুঝতে পেরে বিদ্যুৎবেগে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে স'রে পড়েছে—এইটুকুই যা খুঁত থেকে গেলো কাজটায়। কোথায় যে সে কেটে পড়লো, তা আর বোঝাই গেলো না। কিন্তু যাক—সে একা এতজনের হাত থেকে নিশ্চয়ই মানরোকে উদ্ধার ক'রে নিতে পারবে না। তাছাড়া অহেতুক রক্তপাতে কালোগনির বিষম বিরাগ—সেইজন্যেই হুড, ব্যাঙ্কস বা মোক্লেরদেরও সে কিছুক্ষণ আটকে রেখে পরে ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলো। যে জটিল গোপন রাস্তা দিয়ে তারা এখন নানাসাহেবের আস্তানায় চলেছে, সাধ্য কি এরা, এই বিদেশীরা, তা খুঁজে বার করে ?

কেবল একবার সে ধরা প'ড়ে যাচ্ছিলো *স্টীম হাউসে* থাকার সময়—যখন ব্যাঙ্কস তাকে নানাসাহেবের মৃত্যুসংবাদ দিয়েছিলো। আরেকটু হ'লেই গুজবটায় সে বিশ্বাস ক'রে বসতো। কিন্তু কে জানে, আসল ব্যাপারটা কী হয়েছিলো। গোরা সেপাইদের তো ভুল হ'তেই পারে। হামেশাই হ'য়ে এসেছে এতকাল।

আপন মনে এ-সব ভাবতে-ভাবতে একটু মুচকি হাসলে কালোগনি।

রাত হ'য়ে এসেছে। রায়পুরের কেল্লা দেখা যাচ্ছে, দূরে। নাসিম বলেছে নানাসাহেব এখন সেখানে আছেন। পঁচিশ মাইল রাস্তা একটানা হন্তদন্ত এসেছে তারা, ঘিরে রেখেছে মানরোকে, একবারও তার উপর থেকে নজর সরায়নি।

কেল্লার কাছে যেতেই কে-একজন এগিয়ে এলো আস্তে, দর্পিত পদক্ষেপে।

কে ? কালোগনি তার সামনে গিয়ে নুয়ে অভিবাদন করলে, সসম্ভ্রমে চুম্বন করলে তার বাড়িয়ে-দেয়া হাত — লোকটি আস্তে কালোগনির পিঠ চাপড়ে এগিয়ে এলো বন্দীর দিকে। চোখ দুটো তার বাঘের চোখের মতো জ্বলছে, সর্বাঙ্গ কী-একটা চাপা রাগে টান-টান।

লোকটি কাছে আসতেই মানরো চিনতে পারলেন। 'ও ঃ! বালাজি রাও !' মানরোর গলায় প্রচণ্ড ঘৃণা ফুটে উঠলো।

'ভালো ক'রে তাকিয়ে দ্যাখো,' চাপা স্বরে লোকটি আদেশ করলে।

'*নানাসাহেব !*' মানরো চিনতে পেরে এক-পা পেছিয়ে গেলেন।'নানাসাহেব বেঁচে আছে ?'

সন্দেহ কী ! আগুনের শিখার মতো তেজিয়ান মানুষটিকে দেখে চিনতে ভুল হবার কথা নয়। কিন্তু সাতপুরা পর্বতে তাহ'লে কে মরেছিলো ?

মরেছিলেন ধুন্ধুপন্থের ভাই, বালাজি রাও।

দুই ভাইকেই দেখতে এতই-একরকম যে বাইরের লোকের ভুল-হওয়া বিচিত্র ছিলো না। দুজনেরই মুখে ছিলো বসন্তের দাগ, একই হাতের একই আঙুল হারিয়ে ছিলেন দুজনে, একই কঠোর প্রতিজ্ঞায় দুজনেরই চিবুক ছিলো তীক্ষ্ণ ও সুদৃঢ় ; আর তাতেই লক্ষ্ণৌ ও কানপুরের গোরা সেপাই ভুল ক'রে বসেছিলো।

আর এই ভুলেরই সুযোগ নিয়েছিলেন নানাসাহেব। মৃত্যুর সংবাদ সরকারিভাবে সমর্থিত হয়েছিলো ব'লে নিরাপত্তা হয়েছিলো অটুট, কারণ এটা তিনি জানতেন যে সরকার নানাসাহেবের মতো তন্নতন্ন ক'রে তাঁর ভাই বালাজি রাওকে খুঁজবে না—কারণ বালাজি রাও কখনোই বিদ্রোহীদের প্রকাশ্য নেতৃত্বে অবতীর্ণ হননি। সেইজন্যেই নানাসাহেব এই মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তে দিতে কোনো বাধা দেননি—বিদ্রোহের আগুন নতুন ক'রে জ্বালাবার আগে তাঁর নিজের একান্ত-ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করার এটাই সুবর্ণ-সুযোগ ব'লে ভেবেছিলেন তিনি। আর দৈবও ছিলো তাঁর সহায়। কর্নেল মানরোও এই সময় কলকাতা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন বম্বাই আসবেন ব'লে—পথে কোনো-রকমে একবার যদি তাঁকে বুন্দেলখণ্ডে বিন্ধ্যপর্বতের অরণ্যদেশে নিয়ে আসা যায়, তাহ'লে তিনি দেখে নেবেন তাঁর চিরশত্রুকে। বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য কালোগনির হাতে সব ভার তুলে দিয়ে সেইজন্যেই নিশ্চিন্তে কেবল এই মুহূর্তটিরই প্রতীক্ষা করছিলেন নানাসাহেব।

অবশেষে এতদিনে সব প্রতীক্ষার অবসান হ'লো। এখন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কর্নেল মানরো—বন্দী, নিরস্ত্র, নিঃসহায়, একাকী। জ্বলজ্বলে ক্ষুধিত চোখে নানাসাহেব তাকিয়ে রইলেন। মানরোও মুখ ফিরিয়ে নিলেন না। দশ বছর আগে যখন দেশজোড়া আগুন জ্বলেছিলো তখন এঁরা একবার পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। এখন, রাতের অন্ধকারে, রায়পুরের কেল্লার পাশে, বিদ্রোহী ভারতীয়দের মধ্যে, আবার এঁরা দাঁড়িয়েছেন পরস্পরের মুখোমুখি।

অবশেষে নানাসাহেবের গম্ভীর গলা স্তব্ধতা ভেঙে গমগম ক'রে উঠলো।'মানরো, তোমার মনে আছে— তোমারই আদেশে পেশওয়ারে একশো কুড়ি জন বন্দীকে কামানের মুখে উড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো ? তারপর থেকে এতদিনে আরো অন্তত বারোশো সেপাই ওইভাবে মারা গিয়েছে। লাহোরে তোমরা পলাতক মানুষদের নির্বিচারে বধ করেছো, আবালবৃদ্ধবনিতা কাউকে বাদ দাওনি, দিল্লি দখল ক'রে বাদশাভবনের মানুষদের তোমরা একফোঁটা দয়া দেখাওনি ; লক্ষ্ণৌতে মারা গেছে ছশোরও বেশি ভারতীয় ; পঞ্জাবে তিন হাজারেরও বেশি ভারতীয়কে তোমরা কোনো বাছবিচার না-ক'রে নৃশংসভাবে হত্যা

করেছো। কেন ? না, আমার দেশবাসী আজাদি চেয়েছিলো, স্বাধীনতা চেয়েছিলো–আর স্বাধীনতার বদলে তোমরা তাদের রক্ত ঝরিয়েছো অবিশ্রাম...'

'*মৃত্যু ! মৃত্যু চাই,*' নানাসাহেবের অনুচরেরা গর্জন ক'রে উঠলো।

নানাসাহেব হাত নেড়ে তাদের চুপ করতে নির্দেশ দিলেন। মানরো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন নিরুত্তর।

'মানরো, মনে আছে ঝান্সির রানী তোমার হাতেই মরেছিলেন ?'

মানরো তবু চুপ ক'রে রইলেন।

'চার মাস আগে,' চাপা দীপ্ত স্বরে নানাসাহেব বললেন, '*আমি ব'লে ভুল ক'রে* আমার ভাইকে তোমরা মেরেছো–'

'*মৃত্যু চাই ! মৃত্যু !*' ক্রুদ্ধ কোলাহল উঠলো।

'মানরো,' আবার নানাসাহেবের গলা গমগম ক'রে উঠলো অন্ধকারে, 'তোমারই পূর্বপুরুষ জনৈক হেকটর মানরোর শাস্তি দেবার বর্বর পদ্ধতি ১৮৫৭ সালের যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়, এ-কথা জানো ? জ্যান্ত মানুষদের কামানের গোলায় বেঁধে উড়িয়ে দেবার নৃশংস পথটা সে-ই প্রথম দেখায়–'

এই কথায় আবার চাপা রাগে, অন্ধকারে, কালো মানুষগুলো গর্জন ক'রে উঠলো। আবার তাদের শান্ত ক'রে সেই গম্ভীর মরাঠা গলা শোনা গেলো, 'এইসব ভারতীয় যেভাবে মৃত্যুবরণ করেছে, তোমাকেও ঠিক সেইভাবে মরতে হবে মানরো–তোমারই পূর্বপুরুষের দেখানো উপায়ে। দেখেছো এই কামান ?' আঙুল তুলে নানাসাহেব কেল্লার পাশের মস্ত কামানটি দেখালেন। 'গোলা ভরা আছে এই কামানে। এর মুখে তোমায় বেঁধে দেয়া হবে, তারপর কাল যখন সূর্য উঠবে তখন কামানের গর্জন শুনে বিন্ধ্যপর্বতের দিক-দিগন্তে এই বার্তা ছড়িয়ে যাবে যে অবশেষে মানরোর উপর নানাসাহেবের প্রতিশোধ নেয়া হ'লো।'

এই কথা ব'লে গম্ভীর পায়ে নানাসাহেব কেল্লায় গিয়ে ঢুকলেন। মানরোকে টেনে নিয়ে যাওয়া হ'লো কামানের পাশে। সেইখানেই তাঁর দড়িবাঁধা দেহটা ফেলে রেখে অন্যরাও চ'লে গেলো কেল্লায়।

সার এডওয়ার্ড একা প'ড়ে রইলেন তাঁর মৃত্যু ও তাঁর ভগবানের মুখোমুখি। এবং সম্ভবত হেকটর মানরোর বর্বর প্রথারও।

১০

কামানের মুখে

স্তব্ধ কালো রাত ; আর তারই মধ্যে সেই ভীষণ কামানটা একটা প্রকাণ্ড কালো দৈত্যের মতো মানরোর দিকে যেন তর্জনী নির্দেশ ক'রে রয়েছে । মানরো প'ড়ে আছেন কামানের নলটার ঠিক সামনে, আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা । কাছেই একটি ভারতীয় দাঁড়িয়ে আছে বন্দুক হাতে পাহারায় । কেবল মাঝে-মাঝে রাতের স্তব্ধতাকে আরো-প্রকট ক'রে কেল্লার ভিতর থেকে তুমুল হৈ-হল্লার আওয়াজ আসছে—বোধহয় মানরোকে হাতে পেয়ে এই ক্ষুব্ধ মানুষগুলো এখন সোল্লাসে পানভোজনে মত্ত ।

কেল্লার পাশেই একটা গভীর খাত । পাহারাওলাটি একবার খাতের কাছে গিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে অন্ধকারে কী যেন তাকিয়ে দেখলো, তারপর আবার এসে দাঁড়ালে কামানের কাছে । হাই তুললো সে একবার—বোঝা গেলো ঘুমে তার চোখ দুটো জড়িয়ে আসছে । তারপর আস্তে-আস্তে একসময় বন্দুকটা ধ'রে কামানের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সে ঢুলতে লাগলো ।

ছমছমে রাতটা আরো-কালো ও ঘুটঘুট্টে হ'য়ে এলো যেন । ভারি মেঘ ঝুলে আছে নিশ্চল । আবহাওয়ায় কেমন যেন একটা চাপা অস্বস্তির ভাব ।

মানরো প'ড়ে-প'ড়ে সাত-পাঁচ ভাবছেন । কানপুরে যখন আগুন লাগলো, তখন সেই রক্তারক্তির মধ্যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছেন তাঁর স্ত্রী—কেউ আর তাঁর খোঁজ পায়নি —সবাই একরকম ধ'রেই নিয়েছে যে তিনি মারা গেছেন । আজ দশ বছর সারাক্ষণ ১৮৫৭-র সেই জ্বলন্ত দিনগুলি তাঁকে অবিশ্রাম যন্ত্রণা দিয়েছে—কাল ভোরে সবকিছুর অবসান !

একটা শেষ চেষ্টা করলেন মানরো বাঁধন খোলার—কিন্তু চেষ্টার ফলে দড়িগুলো যেন গায়ে আরো কেটে-কেটে ব'সে গেলো । অসহায় ও অক্ষম ক্ষোভে চাপা গর্জন ক'রে উঠলেন মানরো । আর সেই পাহারাওলাটি ধড়মড় ক'রে জেগে উঠলো । একবার কাছে এসে সে দেখে গেলো বন্দীকে, জড়ানো গলায় বললে : 'কাল ভোরবেলায়—বুঝলে—গুড়ুম গুম ! ফর্দাফাঁই চিচিংকার !'

ব'লে আবার সে ফিরে গিয়ে ফের কামানের গায়ে হেলান দিয়ে ঢুলতে লাগলো, আর মানরোর জাগ্রত চোখের উপর ছবির মতো ভেসে গেলো সিপাহী বিদ্রোহের অসংখ্য দৃশ্য । নৃশংসতার, বর্বরতার রক্তাক্ত সব ছবি । নিচু মেঘগুলো তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে কালো আকাশ থেকে । রাত কত হবে কে জানে ।

হঠাৎ চটকা ভেঙে গেলো তাঁর, দূরে তাকিয়ে দেখলেন মশালের ক্ষীণ আলো । কে যেন এগিয়ে আসছে এই দিকে, আস্তে, পা টিপে-টিপে, চুপি-চুপি, সন্তর্পণে ;

সেপাইদের ব্যারাক পেরিয়ে, কেল্লার পাশ দিয়ে এগিয়ে আসছে এই কামানেরই দিকে।

কে আসছে ? গৌমি ? ব্যাঙ্কস, হুড, ও মোক্লের ? না কি অন্য কেউ—নানাসাহেবেরই কোনো অনুচর ? আশা আছে তাঁর উদ্ধারের, না কি অবশেষে এখানেই কামানের মুখে উড়ে যাবে তাঁর ছিন্ন দেহ ? যেমনভাবে *নেটিভদের* উড়িয়ে দিয়ে মজা পেতেন হেকটর মানরো।

ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে মশাল হাতে। কে, বোঝা যাচ্ছে না—শুধু দেখা যাচ্ছে ঢিলে কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা তার—হাতে মশাল, জ্বলন্ত, দাউ-দাউ।

মানরো নড়তে পারছিলেন না ; এমনকী নিশ্বেস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে—যদি ছায়ামূর্তি মিলিয়ে যায় অন্ধকারে—মশাল নিভে যায় দপ ক'রে আলেয়ার মতো ! প'ড়ে রইলেন ভারি কোনো ধাতুর মূর্তির মতো, রুদ্ধশ্বাস ও নিস্পন্দ ! পাহারাওলাটা যদি জেগে যায়, *সাবধান*, চেঁচিয়ে ব'লে দিতে চাইলেন তিনি সেই ছায়ামূর্তিকে, *হুঁশিয়ার* ! আর সেই ছায়ামূর্তি যেন ভেসে আসতে লাগলো হাওয়ায়—আস্তে, চুপি-চুপি, নিঃশব্দে, এই কামানের দিকে।

যদি সে ওই পাহারাওলার গায়ে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে যায় ! মানরোর বুক ধ্বক ক'রে লাফিয়ে উঠলো।...না, তার সম্ভাবনা নেই। কারণ লোকটা কামানের বাঁ-পাশে হেলান দিয়ে ঢুলছে আর সেই অদ্ভুত ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে ডানদিক দিয়ে—মাঝে-মাঝে থেমে পড়ছে, মশালের আলোয় দেখছে চারপাশ, কিন্তু তারপরেই আবার এগিয়ে আসছে, ধীরে-ধীরে।

শেষকালে সে মানরোর এতই কাছে এসে পড়লো যে তিনি তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। দেখলেন এক মাঝারি উচ্চতার মানুষ, আপাদমস্তক একটা ঢোলা কাপড়ে মোড়া। একটাই হাত দেখা যাচ্ছে তার, সেই হাতে একটা জ্বলন্ত মশাল।

'*পাগল ?*' মানরো হঠাৎ যেন প্রচণ্ড এক হতাশায় ভ'রে গেলেন। 'পাগলটা কেল্লার আশপাশে বারে-বারে ঘুরে বেড়ায় ব'লেই তারা আর এর দিকে কোনো নজর দেয়নি। ঈশ, পাগলটার হাতে যদি মশালের বদলে কোনো ছোরা থাকতো তাহ'লে হয়তো আমি কোনোরকমে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এই দড়িগুলো কেটে ফেলার ব্যবস্থা করতে পারতুম।'

ছায়ামূর্তি মোটেই পাগল নয়, তবে মানরো অনেকটা ঠিকই ধরেছেন।

এ হ'লো নর্মদাতীরের সেই উন্মাদিনী, সেই অর্ধচেতন প্রাণী—গত চার মাস ধ'রে বিন্ধ্যপর্বতে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এলোমেলো, আর সে স্বাভাবিক নয় ব'লেই গোণ্ডরা তাকে মাঝে-মাঝে খেতে দিয়েছে, সসম্ভ্রমে তার পথ ছেড়ে দিয়েছে সর্বত্র। নানাসাহেব কিংবা তাঁর অনুচরেরা মোটেই জানেন না কেমন ক'রে বহ্নিশিখা সাতপুরা পাহাড়ে নিজের অজ্ঞাতসারে গোরা সেপাইদের পথ দেখিয়ে এনেছিলো। জানতেন না ব'লেই *বহ্নিশিখার উপস্থিতি* কোনোদিনই তাঁদের মধ্যে কোনো আশঙ্কা বা সন্দেহের উদ্রেক করেনি। কতবার সে আপনমনে ঘুরতে-ঘুরতে রায়পুরের কেল্লায় এসে পড়েছে—কিন্তু কেউ তাকে কস্মিনকালেও তাড়িয়ে দেবার কথা ভাবেনি। সম্ভবত দৈবই আজ তার এই উদ্দেশ্যহীন

গন্তব্যহীন লক্ষ্যহীন নৈশভ্রমণকে এখানে এনে শেষ ক'রে দিলো ।

মানরো এই উন্মাদিনীর কথা কিছুই জানতেন না । *বহ্নিশিখার* নাম তিনি কোনো দিনই শোনেননি । অথচ তবু যেই সে মশাল হাতে এদিকে এগিয়ে এলো তাঁর হৃৎপিণ্ড যেন কেমন অস্বস্তিভরে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠতে লাগলো ।

অতি ধীরে, একটু-একটু ক'রে, সেই উন্মাদিনী এগিয়ে এলো কামানের কাছে । তার মশাল নিভু-নিভু ; ক্ষীণ শিখা থেকে কালো ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে, বন্দীর মুখোমুখি প'ড়েও সে যেন তাকে দেখতে পাচ্ছে না, যেন তার চোখ দুটো তাকিয়ে আছে কোনো অদৃশ্য-কিছুর দিকে, পার্থিব কোনোকিছুই আর তার চোখে পড়বে না যেন কোনোদিনও ।

সার এডওয়ার্ড প'ড়ে রইলেন স্তব্ধ ও অনড় । এই উন্মাদিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোনো চেষ্টাই তিনি করলেন না । অবশেষে সে ফিরে দাঁড়ালে, তাকিয়ে দেখলে সেই প্রকাণ্ড কামনটাকে—কালো লোহার সেই কামানে মশালের কাঁপা-কাঁপা শিখা প'ড়ে কেমন যেন ভুতুড়ে হ'য়ে উঠলো ।

জানে কি এই উন্মাদিনী কামান কেমন ক'রে ছোঁড়ে—যা এখন প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো প'ড়ে আছে এখানে, যার মুখে প'ড়ে আছে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা একজন দুর্ভাগা মানুষ —সকালের আলো ফুটলেই যার কালো নলটা আগুন আর বারুদ উগরে দেবে, সেই কামান কাকে বলে তা কি সে জানে ?

না বোধহয় । *বহ্নিশিখা* দাঁড়িয়ে আছে সেখানে — নেহাৎই যেন দৈবচালিত ; ঠিক এইখানেই না-দাঁড়িয়ে থেকে সে বিন্ধ্যপর্বতের যে-কোনোখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো এখন । হয়তো সে এরপর আবার পাকদণ্ডী বেয়ে ঘুরে-ঘুরে নেমে চ'লে যাবে —যেদিকে তার দু-চোখ যায় । মানরো তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন । দেখলেন সে কামানটার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলো পাহারাওলার দিকে । যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকে, কিন্তু কাছে গিয়েই সে আবার ফিরে দাঁড়ালে—এবার এগিয়ে এলো বন্দীর দিকে—কাছে এসে দাঁড়ালে, নিশ্চল ও নির্বাক । মানরোর বুকের ভিতরটা এমন ভাবে লাফাচ্ছে যে মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি কোনো বিস্ফোরণ ঘ'টে যাবে ।

আরো-কাছে চ'লে এলো বহ্নিশিখা—মশাল নামিয়ে তাকিয়ে দেখলো বন্দীর মুখ । তার নিজের মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা, কেবল চোখ দুটো জ্বলছে তীব্রভাবে, জ্বরাতুর ও ঘোলাটে । মানরো মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইলেন ।

হঠাৎ হাওয়া এলো দমকা । স'রে গেলো *বহ্নিশিখার* মুখের গুণ্ঠন, দপ ক'রে উজ্জ্বলভাবে জ্ব'লে উঠলো মশাল, ক্ষণিকের জন্যে ।

চাপা, অস্ফুট একটা কাতর ডাক বেরিয়ে এলো বন্দীর মুখ দিয়ে : '*লরা !*'

মানরোর মনে হ'লো মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি নিজেই বুঝি পাগল হ'য়ে যাচ্ছেন । মুহূর্তের জন্যে চোখ বুঝলেন তিনি, তারপর আবার চোখ খুলে তাকালেন সেই উন্মাদিনীর দিকে । *লরা ! লেডি মানরো !* তাঁর স্ত্রী—এখানে মশাল হাতে দাঁড়িয়ে !

'লরা !—তুমি ! সত্যি তুমি ?'

লেডি মানরো কোনো কথাই বললেন না । মানরোকে তিনি চিনতেই পারেননি । এমনও মনে হ'লো না যে তাঁর কোনো কথা কানে গেছে ।

'লরা ! তুমি পাগল হ'য়ে গেছো ? *পাগল* ?—কিন্তু বেঁচে তো আছো ।'

চিনতে মোটেই ভুল হয়নি সার এডওয়ার্ডের । সত্যি, লেডি মানরোই । লরাকে চিনতে তাঁর কোনোদিনই ভুল হবে না ।

কানপুরের সেই বীভৎস রক্তারক্তি দেখে লরার সংবেদনশীল স্পর্শাতুর মন এমন-একটা বিষম ধাক্কা খায় যে কেবল স্মৃতিই যে হারিয়ে যায় তা নয়, মাথায় চোট লেগে কেমন-একটা অপার্থিব ঘোরের মধ্যে যেন প'ড়ে যান তিনি । তারপর থেকেই লোকে দেখতে পাচ্ছে এই উন্মাদিনীকে, তারা যার নাম দিয়েছে *বহ্নিশিখা*, যে চুপচাপ উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন গন্তব্যহারা ঘুরে বেড়ায় বিন্ধ্যপর্বতের কোলে, নর্মদার তীরে, লোকালয়ের বাইরে কি ছোট্ট পাহাড়ি গ্রামগুলোয় ।

মানরো আবার তাঁকে নাম ধ'রে ডাকলেন, 'লরা !' আর যখন দেখলেন লেডি মানরোর চোখ তেমনি ভাবভাষাহীন শিখার মতো জ্বলছে অন্ধকারে, কী-রকম একটা প্রচণ্ড কষ্টে ভ'রে গেলেন, দুমড়ে গেলেন । নানাসাহেব কিছুতেই কল্পনাও করতে পারবেন না কোন প্রচণ্ড কষ্টে এখন তাঁর বুক ভেঙে যাচ্ছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে ।

যদি জাগে তো জাগুক এই পাহারাওলা । যদি শোনে তো শুনুক সমস্ত কেল্লা । '*লরা* ! *লরা* !' গলার স্বর আরেক পর্দা চড়িয়ে মানরো ডাকলেন ।

লরা তখন তেমনি জ্বরাতুর অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন মানরোর দিকে । একবার মাথা নাড়লেন তিনি ডাক শুনে—যেন উত্তর দিতে চান না, এমনি ভঙ্গি । আবার গুণ্ঠনে ঢেকে গিয়েছে তাঁর মুখ, মশালও আবার কেঁপে-কেঁপে ক্ষীণ শিখায় জ্বলছে । লরা দু-এক পা পেছিয়েও গেলেন । চ'লে যাচ্ছেন ?

'লরা !' কাতরভাবে ডেকে উঠলেন মানরো, যেন এই কাতর কণ্ঠস্বরে তিনি বিদায়ের সমস্ত বেদনাকে ভ'রে দিতে চাচ্ছেন ।

হঠাৎ কামানটার দিকে চোখ পড়লো লরার । কেমন যেন টান দিলো তাঁকে এই প্রকাণ্ড জিনিশটা । হয়তো মনে প'ড়ে গেলো কানপুরের সেই আগুন-ওগরানো কামানগুলো, হয়তো তাঁর কানে গর্জন ক'রে উঠেছে সেই আগুনজ্বলা অতীত । মশালের আলো পড়লো সেই বিকট ইস্পাতের খোলে । এখন যদি একটুকরো আগুনের ফুলকি পড়ে কামানের গায়ে তাহ'লেই প্রচণ্ড নিনাদের সঙ্গে-সঙ্গে মানরোর ছিন্ন দেহ উড়ে যাবে তিন শূন্যে । তাহ'লে জগতে যিনি মানরোর সবচেয়ে প্রিয়, তাঁরই হাতে তাঁর মৃত্যু লেখা ? এর চেয়ে নানাসাহেব এসে কেন তাঁকে উড়িয়ে দিচ্ছেন না! তিনি কি তাহ'লে চীৎকার ক'রে কেল্লার সেই জল্লাদগুলোকে এই বধ্যভূমিতে আহ্বান করবেন ?

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন মানরোর হাত চেপে ধরলো । না, *স্বপ্ন নয়*, সত্যি । কার যেন বন্ধু-হাত দড়ি কেটে দিচ্ছে । কোন দেবতার দয়ায় কে-একজন এখানে এসে

পড়েছে তাঁকে মুক্তি দিতে !

দড়িগুলো প'ড়ে গেলো। শিরার মধ্যে রক্ত যেন ফেনিয়ে ঘুরে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করলেন মানরো—আরেকটু হ'লেই মুক্তির আনন্দে তিনি চেঁচিয়ে উঠতেন।

পাশে তাকিয়ে দেখলেন গৌমি দাঁড়িয়ে আছে ছুরি হাতে। ছায়ার মতো।

কালোগনি যখন অন্ধকারে তার দলবলের সঙ্গে মিশে যায়, তখনই সে পুরো ব্যাপারটা চট ক'রে বুঝে নিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছিলো। আড়ি পেতে শুনেছিলো যে মানরোকে ধ'রে তারা রায়পুরের কেল্লায় নিয়ে আসবে—যেখানে নানাসাহেব নিজের মুখে উচ্চারণ করবেন তাঁর মৃত্যুদণ্ড, স্বাক্ষর করবেন তাঁর মৃত্যুর পরোয়ানায়। কোনো দ্বিধা না-ক'রে তক্ষুনি গৌমি রায়পুরের কেল্লার কাছে এসে লুকিয়ে থাকে। তারপর নিঝুম রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে বেরিয়ে এসেছে লুকোনো জায়গা ছেড়ে, প্রভুকে মুক্তি দিতে।

ফিশফিশ ক'রে গৌমি বললে, 'সকাল হ'য়ে আসছে, আমাদের এক্ষুনি পালাতে হবে—আর একটুও সময় নেই।'

'আর লেডি মানরো ?' কামানের পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা সেই অদ্ভুত গুণ্ঠনবতী মূর্তিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে জিগেস করলেন মানরো।

'উনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন !' গৌমি কোনো ব্যাখ্যা চাইলো না।

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হ'য়ে গেছে। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন ব'লে, গৌমি আর কর্নেল যেই লরার দিকে এগিয়ে গেলেন লরা পালাতে চাইলেন তাঁদের হাত এড়িয়ে। তাঁর হাত থেকে মশালটা প'ড়ে গেলো কামানে। পরক্ষণেই বিন্ধ্যপর্বতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত থরোথরো কাঁপিয়ে দিয়ে গর্জন ক'রে উঠলো কামান !

১১

বেহেমথ

সেই প্রচণ্ড শব্দে লেডি মানরো মূর্ছিত হ'য়ে তাঁর স্বামীর গায়ে ঢ'লে পড়লেন। মুহূর্তমাত্র দেরি না-ক'রে মানরো স্ত্রীর অচেতন দেহ বহন ক'রে ছুটে গেলেন চত্বর পেরিয়ে। হঠাৎ জেগে-ওঠা পাহারাওলাকে কিছু টের পাবার অবসর না-দিয়েই তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিলে গৌমি, তারপরে প্রভুর পিছন-পিছন ছুটে চ'লে গেলো।

কেল্লার পাশের পাকদণ্ডী দিয়ে তাঁরা সবে নেমে পড়েছেন, এমন সময় কেল্লা থেকে পিল-পিল ক'রে ছুটে এলো হঠাৎ জেগে-ওঠা ভ্যাবাচাকা মানুষগুলি। কী হয়েছে, তারা

কিছুই বুঝতে পারছিলো না—আর এই ফাঁকে মানরোরা আরো-খানিকটা ছুটে গেলেন পাকদণ্ডী বেয়ে ।

নানাসাহেব ক্বচিৎ এই কেল্লায় রাত কাটাতেন । মানরোকে কামানের মুখে বেঁধে তিনি গিয়েছিলেন একটা ছোটো সভায়—যেখানে এদিককার আরো কয়েকজন বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে তাঁর গোপন শলা-পরামর্শ হবে । দিনের বেলায় বেরুবার উপায় নেই ব'লে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেরোন তিনি—ফিরে আসেন শেষ রাতে । এটাই তাঁর ফিরে-আসার সময় ।

কালোগনি, নাসিম ও তাদের অনুচরেরা—শতাধিক মানুষের একটা বাহিনী—নিশ্চয়ই এক্ষুনি পলাতকদের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে । ব্যাপারটা বুঝতে কেবল যে-সময়টুকু লাগবে —তবে পাহারাওলার ছুরিকাবিদ্ধ মৃতদেহ দেখে নিশ্চয়ই পুরো ব্যাপারটা বুঝতে তাদের একটুও দেরি হবে না ।

দেরি হ'লোও না । কালোগনির রোষ মুহূর্তের মধ্যে তীব্র দাঁতচাপা শপথের আকারে বেরিয়ে এলো । নানাসাহেব ফিরে এলে কী জবাবদিহি দেবে সে ? এক্ষুনি তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে বন্দীর খোঁজে ।

কোথায় আর যাবে তারা ? বন্দী আর তার সঙ্গীরা ? এই পাহাড়ি জায়গায় সব তাদের চেনা । লোকালয়ে পৌঁছুবার আগেই তারা ধ'রে ফেলবে পলাতকদের ।

পাকদণ্ডী বেয়ে-বেয়ে মানরোরা তখন ছুটে নেমে যাচ্ছেন । পাহাড়ের কোলে ঊষার আলো ছড়িয়ে পড়ছে তখন । হঠাৎ উপর থেকে মস্ত কোলাহল ভেসে এলো । কালোগনি দেখতে পেয়েছে তাঁদের । 'মানরো ! ওই তো মানরো !' চীৎকার ক'রে সে বলছে সবাইকে ।

পরক্ষণেই এক লাফে কালোগনি নেমে এলো পাকদণ্ডী বেয়ে—পিছনে ছুটে এলো তার অনুচরেরা, প্রচণ্ড কোলাহল ক'রে ।

কোথাও লুকোবার উপায় নেই । কেবল সামনে ছুটে যেতে হবে । মানরো মনে-মনে সব স্থির ক'রে ফেলেছেন । নানাসাহেবকে আর তিনি জ্যান্ত ধরা দেবেন না—বরং গৌমির ছুরিটা আমূল বসিয়ে দেবেন নিজের বুকে, তবু না ।

গৌমি হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'আর-একটু ...পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমরা জব্বলপুরের রাস্তায় এসে পড়বো ।'

কিন্তু গৌমির মুখের কথা শেষ হবার আগেই দেখা গেলো সামনে থেকে দুটি লোক দ্রুতবেগে ছুটে আসছে । ততক্ষণে আলো ফুটেছে, মুখ দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট । আর সেইজন্যেই পরস্পরকে চিনতে কারু একফোঁটা দেরি হ'লো না । দু জনেরই ঘৃণা ও রোষ যেন দুটি নাম হ'য়ে ফেটে পড়লো সেই পাহাড়ি রাস্তায় ।

'মানরো !'

'নানাসাহেব !'

কামানের আওয়াজ শুনে নানাসাহেব খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছিলেন । কেন-যে তাঁর ফিরে-আসার আগেই তাঁর আদেশ অমান্য ক'রে কামান গ'র্জে উঠলো, এটা

তাঁর দুর্বোধ্য ঠেকেছিলো। তাঁর সঙ্গে মাত্র একটিই অনুচর। কিন্তু সেই অনুচরটি কোনো সময় পাবার আগেই আর্তনাদ ক'রে গৌমির পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লো। গৌমির ছুরিটা অকস্মাৎ প্রচণ্ড রক্তপিপাসু হ'য়ে উঠেছে।

নানাসাহেব অন্যদের ডাক দিলেন, 'শিগগির এসো এখানে!'

'হ্যাঁ, এখানে,' বলেই গৌমি লাফিয়ে পড়লো নানাসাহেবের উপর। উদ্দেশ্য নানাসাহেবকে ব্যস্ত রাখা—যাতে মানরো এই ফাঁকে পালিয়ে যেতে পারেন।

নানাসাহেব এক ঝটকায় নিজেকে গৌমির হাত থেকে মুক্ত ক'রে নিলেন। কিন্তু গৌমি পরক্ষণে কঠোর হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরলো, তারপর অবলীলাক্রমে তাঁকে বহন ক'রে এগিয়ে গেলো খাতের দিকে। তাঁকে নিয়েই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে নিচে—তবু কিছুতেই তাঁকে ছেড়ে দেবে না।

কালোগনিরা ততক্ষণে একেবারে কাছে এসে পড়েছে। কাঁধে একটি মূর্ছিত দেহ নিয়ে অবসন্ন রাতজাগা ক্লান্ত বিধ্বস্ত মানরো কোথায় পালাবেন?

হঠাৎ প্রায় কুড়ি গজ দূর থেকে ডাক শোনা গেলো: 'মানরো! মানরো!'

ওই-যে রায়পুরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ব্যাঙ্কস, ক্যাপ্টেন হুড, মোক্লের, সার্জেন্ট ম্যাক-নীল, ফক্স আর পারাজার—মানরো দেখলেন। পিছনেই বড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ওগরাচ্ছে *বেহেমথ*—হাওদায় ব'সে আছে স্টর আর কালু।

স্টীম হাউসের শেষ বগিটা ধ্বংস হ'য়ে যাওয়ায় ব্যাঙ্কসরা হাওদায় চেপেই লেক পুটুরিয়া থেকে জব্বলপুরের দিকে রওনা হ'য়ে পড়েছিলো। হঠাৎ এখান দিয়ে যাবার সময় কামানের বিকট আওয়াজ শুনে তারা থেমে পড়েছে। কী-একটা অলুক্ষুণে ভয়ে পরমুহূর্তে তারা লাফিয়ে নেমেছে এখানে—হুড়মুড় ক'রে এগিয়েছে পাহাড়ি রাস্তায়। তারা যে কী দেখবে ব'লে প্রত্যাশা করেছিলো, তা-ই তারা স্পষ্ট জানে না। অনেক সময় মানুষের ভিতর থেকে কে যেন নির্দেশ দিয়ে মানুষকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেয়— যার কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা হয় না। তারপর মোড় ঘুরেই তারা সামনে দেখতে পেয়েছে মানরোকে।

'লেডি মানরোকে বাঁচাও!'

'লেডি মানরো!'

'আর সত্যিকার নানাসাহেবকেও ছেড়ে দেবে না!' একেবারে শেষ সঞ্চিত শক্তিটুকু দিয়ে গৌমি এই প্রকাণ্ড মানুষটিকে এখানে বহন ক'রে এনেছে।

তক্ষুনি হুড আর ম্যাক-নীল নানাসাহেবকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললে। কোনো কথা বলার তখন অবসর নেই—সবাই চটপট গিয়ে উঠে পড়লো *বেহেমথে*। ব্যাঙ্কস চেঁচিয়ে বললে, 'পুরোদমে চালিয়ে দাও, স্টর! *পুরোদমে!*'

কালোগনিরা ততক্ষণে প্রায় একশো গজ দূরে। তারা এসে পড়ার আগেই যদি জব্বলপুরের সামরিক শিবিরে পৌঁছুনো যায়, আর ভয় নেই। শিবিরটা কাছেই—ঠিক জব্বলপুরে ঢোকার মুখে।

কিন্তু রাস্তা এখানে উবড়োখাবড়ো, পর-পর অনেকগুলো তীক্ষ্ণ বাঁক রয়েছে—

পুরোদমে *বেহেমথকে* চালিয়ে নেবারও কোনো উপায় নেই ।

কালোগনিরা আরো-কাছে এসে পড়ছে ।

'গুলি চালাতেই হবে ।' হুড বন্দুক তুলে ধরলো !

'কিন্তু আর মাত্র যে ডজন খানেক টোটা আছে,' ফক্স বললে, 'এলোমেলো গুলি চালালে চলবে না কিছুতেই !'

ম্যাক-নীল ব'সে আছে বন্দী নানাসাহেবকে চেপে ধ'রে, কালু আর পারাজার কেবল জ্বালানি দিচ্ছে চুল্লিতে, ব্যাঙ্কস, আর স্টর *বেহেমথকে* চালিয়ে নিতে ব্যস্ত, মানরো ব'সে আছেন লরার মূর্ছিত দেহ কোলে ক'রে । হুড আর ফক্স বিদ্রোহীদের দিকে মুখ ক'রে ব'সে টোটাভরা বন্দুক তাগ ক'রে ধরলে ।

ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কস সামনে খোলা রাস্তা পেয়ে *বেহেমথের* গতি যতটা পারে বাড়িয়ে দিয়েছে । মাঝখানে দু-দলের ব্যবধান একেবারে ক'মে গিয়েছিলো—এখন আবার ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে লাগলো । কিন্তু হঠাৎ সামনে একটা সরু বাঁক দেখে ব্যাঙ্কসকে যেই আবার গতি কমাতে হ'লো অমনি ব্যবধান আবার চট ক'রে ক'মে গেলো ।

হুড আর ফক্সের বন্দুক গ'র্জে উঠলো একসঙ্গে—আর্তনাদ ক'রে প'ড়ে গেলো দুটি লোক, হুমড়ি খেয়ে । কিন্তু অন্যেরা তবু এগিয়ে আসছে । বন্দুক এরা ভয় পায় না—আরো-কোনো তীব্র বারুদে এই ভারতীয়দের বুকভরা । দেশের জন্যে প্রাণ দিতে তারা পেছ-পা হয় না কখনও, বিশেষ ক'রে যেখানে নানাসাহেবের প্রাণ সংশয়, সেখানে তারা নিজেদের জীবন তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে ছুটে আসছে । ক-জনকে মারতে পারবে এই শ্বেতাঙ্গ বিদেশীরা ? শেষটায় এরা নাগাল ধ'রে ফেলবেই, আর তখন দেখবে শতাধিক বছর ধ'রে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের নির্বিরোধী মানুষদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার চালাবার ফল কী ! তাছাড়া কালোগনি ভালো ক'রেই জানে যে ক্যাপ্টেন হুডের গোলা-বারুদ ফুরিয়ে এসেছে । কতক্ষণ এরা যুঝবে ?

আরো কয়েক বার হুড আর ফক্সের বন্দুক গ'র্জে উঠলো, উত্তরে তাদেরও বন্দুক গর্জালো *বেহেমথকে* লক্ষ্য ক'রে । আরো কয়েকজন ভারতীয় ছিটকে পড়লো রক্তাপ্লুত দেহে, কিন্তু মরতে-মরতেও তারা রুষ্ট স্বরে ঘৃণাভরে ব'লে গেলো : *'বিদেশীরা নিপাত যাক !'*

আর মাত্র দুটি গুলি রয়েছে হুড আর ফক্সের । একেবারে শেষ মুহূর্তে খরচ করবে তারা ।

ব্যবধান এখন একেবারেই ক'মে এসেছে ।

এতক্ষণ কালোগনি সাবধানে আসছিলো—এবার সে লাফিয়ে এগিয়ে এলো, বন্দুক হাতে, চীৎকার ক'রে ।

'ওঃ ! তুমি ?' হুড ব'লে উঠলো, 'শেষ গুলিটা তাহ'লে তুমিই নাও ।' অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় তাগ ক'রে ঘোড়া টিপলো হুড ।

কালোগনির কপালের ঠিক মাঝখানটায় গুলি লাগলো । আকাশ হাৎড়ালো তার হাতটা একবার, বাতাস আঁকড়ে ধরতে চাইলো যেন, একবার লাফিয়ে এগিয়ে এলো

তিন পা, তারপরেই সে একটা প্রকাণ্ড পাক খেয়ে ঘুরে প'ড়ে গেলো !

কিন্তু *বেহেমথ* ততক্ষণে একটা খাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ! তার মুখ ফেরাবার কোনো উপায় নেই—পিছনে ভারতীয়রা একেবারে কাছে এসে পড়েছে !

'লাফিয়ে নেমে পড়ো সবাই, এক্ষুনি !' বললে ব্যাঙ্কস ।

মানরো স্ত্রীর মূর্ছিত দেহ কাঁধে ক'রে নেমে পড়লেন । অন্যরাও একটুও দেরি করলে না । কাছেই সেনানিবাসের ছাউনি দেখা যাচ্ছে ।

'নানাসাহেবের কী হবে?' মানরো ছুটতে-ছুটতে জিগেস করলেন ।

'তার ভার আমি নিয়েছি ।' ব্যাঙ্কস বললে । হাওদায় নানাসাহেবের দড়ি বাঁধা শরীর প'ড়ে আছে । 'এখানেই প'ড়ে থাক,' ব'লে ব্যাঙ্কসও লাফিয়ে নেমে পড়লো ।'

বেহেমথ থামলো না । এঞ্জিন চলছে তার, শুঁড় দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, পুরোদমে সে ছুটে চললো সামনে—খাদের দিকে ।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ শোনা গেলো ।

ছুটতে-ছুটতে পিছন ফিরে তাকিয়ে মানরো দেখতে পেলেন *বেহেমথের* বয়লারটা ফেটে গেলো—নামবার আগে ব্যাঙ্কস পুরোদমে চালিয়ে এসেছিলো *বেহেমথকে* ।

বয়লার ফেটে যেতেই *বেহেমথ* কী-রকম ঘুরে গেলো একপাক, শুঁড়টা শূন্যে তোলা, ইস্পাতের পাতগুলো ফেটে উড়ে গিয়েছে চারধারে—কেবল হাওদাটা নানাসাহেবকে নিয়ে ছিটকে উড়ে গেলো খাদের দিকে ।

'বেচারি *বেহেমথ* !' হুড ছুটতে-ছুটতে বললে, 'আমাদের বাঁচাতে গিয়ে মরলি তুই !'

সেনানিবাসের মধ্যে ঢুকতে-ঢুকতে ব্যাঙ্কস বললে, 'কে বললে *বেহেমথ* বেচারি ! সে নানাসাহেবকে বধ ক'রে তবে মরেছে!'

১২

ক্যাপ্টেন হুডের পঞ্চাশ নম্বর বাঘ

কর্নেল মানরো ও তাঁর দলের আর-কোনো ভয় নেই কিংবদন্তির সেই আগুনজ্বালা মানুষটির কাছ থেকে । সেই মরাঠা বীরের ছিন্ন দেহ নিয়ে *বেহেমথ* বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়েছে । ফিরে এসে তিনি আর-কোনোদিন বলবেন না, 'জব্বলপুরের রাস্তায় যে প্রাণ দিয়েছে সে আমার ভাই বালাজি রাও । কিন্তু তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবো আমি, মানরো—ভুলে যেয়ো না ।'

বিস্ফোরণের শব্দে গোরা সেপাইরা ছাউনি থেকে হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে এলো ।

আর তাদের দেখেই নেতৃত্বহীন ও বিপন্ন ভারতীয় দলটা পালিয়ে গেলো ।

পরিচয় দিতেই কর্নেল মানরোদের জব্বলপুরে নিয়ে যাওয়া হ'লো । সেখানে খাদ্য, বিশ্রাম ও নিশ্চিন্তি পেলেন তিনি এতদিন পরে ।

লরাকে নিয়ে যাওয়া হ'লো একটা মস্ত হোটেলে । সেখানে মানরোর শুশ্রূষা ও যত্নে সেই পাণ্ডুর চোখে স্বাভাবিক দীপ্তি ফিরে এলো, আস্তে-আস্তে ফিরে এলো স্মৃতি ও স্বাস্থ্য । আর কিঞ্চিৎ সুস্থ হ'তেই সবাই ট্রেনে ক'রে বম্বাই রওনা হ'য়ে পড়লেন ।

কিন্তু ট্রেনে ব'সে বারে-বারে তাঁদের মনে পড়তে লাগলো *বেহেমথকে*—সেই অতিকায় বাষ্পচালিত শকট, যে কিনা তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে নিজে টুকরো-টুকরো হ'য়ে গেলো ।

বেহেমথের ধ্বংসাবশেষ তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও কিন্তু নানাসাহেবের মৃতদেহ পাওয়া যায়নি । হয়তো তাঁর অনুচররা তাঁর মৃতদেহ ব'য়ে নিয়ে গিয়েছে অন্ত্যেষ্টির জন্যে । আর মৃতদেহ পাওয়া গেলো না ব'লেই মধ্যভারতে রচিত হ'লো মৃত্যুহীন এক অত্যুজ্জ্বল কিংবদন্তি—যার সারমর্ম হ'লো নানাসাহেব এখনও মরেননি, এখনও তিনি বেঁচে আছেন, আর তাঁর অশান্ত ও আগুনজ্বালা পৌরুষ এখনও আবার বিদ্রোহের উদ্যোগে লিপ্ত হ'য়ে আছে । নানাসাহেবের যে মৃত্যু হ'তে পারে—এটা মধ্যভারত কিছুতেই বিশ্বাস করলে না ।

নভেম্বর মাসের শেষ দিকে মানরোরা বম্বাই থেকে কলকাতা ফিরে এলেন । লরা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, তবু চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আছেন । মানরোর অনুরোধে ব্যাঙ্কস মানরোর বাংলোতেই ছুটিটা কাটিয়ে যাবেন স্থির করেছেন । ম্যাক-নীল আর গৌমিও এখানেই কাজ করে । মঁসিয় মোক্লেরকে অবিশ্যি ইওরোপ ফিরে যেতে হবে শিগগিরই । আর মোক্লের যেদিন মানরোদের বাংলোয় বিদায় নিতে গেলো, সেদিন হুড আর ফক্স্‌ও সেখানে এসেছিলো—বিদায় নিতেই ; তাদেরও ছুটি ফুরিয়ে এসেছে—তারা মাদ্রাজে ফিরে যাবে ।

অনেক দিন পরে কলকাতার সেই বাংলোয় চায়ের আসর জ'মে উঠলো ।

'তাহ'লে, হুড,' মানরো বললেন, 'আমাদের সঙ্গে উত্তর ভারত বেড়াতে তোমার খারাপ লাগেনি তেমন ? শুনে ভালো লাগলো । তবে একটা দুঃখ থেকে গেলো আমার : তোমার আর পঞ্চাশ নম্বর বাঘটা মারা হ'লো না !'

'কে বললে, মারিনি !' হুড প্রতিবাদ করলে, '*পঞ্চাশ নম্বর বাঘটা* ছিলো সবচেয়ে ভীষণ ও মারাত্মক । কেন ? আপনাদের চোখের সামনেই তো তাকে গুলি করলাম !'

'আমাদের চোখের সামনে ? কই—দেখতে পাইনি তো ? কখন ? কোনখানে ?'

'কেন—জব্বলপুরের রাস্তায় ।' হুড হিশেব দাখিল করলে, 'ঊনপঞ্চাশটা বাঘ, আর ...আর *কালোগনি* ? কী—*পঞ্চাশ* হ'লো না ? কালোগনিকে আপনি ভারতবর্ষের রাজাবাঘ ছাড়া আর কীই-বা বলতে পারেন ?'

দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড

ফাইভ উইক্‌স ইন এ বেলুন

১

আঠারোশো বাষট্টি সালের জানুয়ারি মাসে রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সংসদভবনে একটা মস্ত সভার আয়োজন হয়েছিলো। প্রথম থেকেই শ্রোতারা অত্যন্ত কৌতূহলী ও উৎসুক হ'য়ে ছিলো, সভাপতির উদ্দীপ্ত বক্তৃতা শুনতে-শুনতে তারা ক্রমেই উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। হাততালির প্রবল আওয়াজ আর প্রশংসার একটানা গুঞ্জনে সভাঘর অল্পক্ষণের মধ্যেই মুখরিত হ'য়ে গেলো। বক্তৃতা শেষ ক'রে বসবার আগে সভাপতি বললেন, 'ভৌগোলিক অভিযানে ইংরেজরাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু আসন দখল করেছে। ইংলণ্ডের সেই গৌরব শিগগিরই আরো বাড়িয়ে দেবেন ডক্টর ফার্গুসন। যে-কাজ সফল ক'রে তোলার চেষ্টা তিনি করছেন,' (শ্রোতাদের একজন চটপট ব'লে উঠলো, '*তা যে সফল হবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই*,) 'তা সফল হ'লে আফ্রিকার অসম্পূর্ণ মানচিত্র অচিরেই পূর্ণাঙ্গ হ'য়ে দেখা দেবে। আর যদি তাঁর সকল চেষ্টাই বিনষ্ট হ'য়ে যায়, যদি তাঁর সব উদ্যমই ব্যর্থতার অন্ধকারে তলিয়ে যায়, তাহ'লেও তাঁর পরাজয় এ-কথাই আরেকবার প্রমাণ ক'রে দেবে যে, দুঃসাহসে ভর দিয়ে যে-কোনো কাজেই রত হ'তে পারে ব'লে জীবকুলের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ।'

বক্তৃতা পুরোপুরি শেষ হবার আগেই ডক্টর ফার্গুসনের দীর্ঘ জীবন কামনা ক'রে সকলে মুখর হ'য়ে উঠলো। তক্ষুনি অভিযানের খরচ জোগাবার জন্যে চাঁদা সংগৃহীত হ'তে লাগলো। দেখতে-দেখতে তাঁর অভিযানের জন্যে সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশো তিন পাউণ্ড জোগাড় হ'য়ে গেলো। জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটির একজন সভ্য সভাপতিকে জিগেস করলেন, 'ডক্টর ফার্গুসন কি আমাদের সামনে একবারও বেরুবেন না ?'

'কেন বেরুবেন না! সবাই যদি চান তো এক্ষুনি তিনি এখানে আসতে-পারেন।'

সভাঘরের চারদিকেই তুমুল শোরগোল উঠে গেলো, 'আমরা একবার ডক্টর ফার্গুসনকে চোখে দেখতে চাই!'

একজন ছিলো একটু সেয়ানা গোছের চালিয়াৎ, সে তো ব'লেই দিলে, 'ধুর, ধুর —ফার্গুসন নামে কোনো লোকই নেই—ও-সব ধাপ্পা, নিছক বাজেকথা।'

আরেকজন আবার সেইসঙ্গে ফোঁড়ন কাটলে, 'ঠিকই বলেছো। কেন তোমরা বুঝতে পারছো না যে এ-সবই বুজরুকি।'

তখন সভাপতি বললেন, 'ডক্টর ফার্গুসন, আপনি যদি দয়া ক'রে একবার মঞ্চে এসে দাঁড়ান তো ভালো হয়। এঁরা সবাই আপনাকে একবার দেখতে চাচ্ছেন।'

তক্ষুনি গম্ভীর চেহারার এক ভদ্রলোক স্থির পায়ে মঞ্চের উপর এসে উঠে দাঁড়ালেন। শ্রোতারা সোল্লাসে হাততালি দিয়ে উঠলো। ফার্গুসনের বয়েস চল্লিশের কিছু কম, শক্ত সুঠাম শরীর, তীক্ষ্ণ নাকে বুদ্ধির ছাপ, আর চোয়ালের চৌকো হাড়ের রেখায় একধরনের দৃঢ়তা মিশে আছে। কোমল চোখে ঝলমল করছে বুদ্ধি, বাহুযুগল দীর্ঘ, আর কাঁধের হাড় মস্ত আর চওড়া। তাঁর পা দেখেই দর্শকেরা আন্দাজ ক'রে নিলে যে, হ্যাঁ, পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ পর্যটন করার ক্ষমতা তাঁর আছে বটে। ফার্গুসন সভাপতির পাশে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরের কোলাহল ভীষণ বেড়ে গেলো। হাত নেড়ে সবাইকে শান্ত হ'তে ইঙ্গিত করলেন ফার্গুসন, তারপর ডানহাতের তর্জনী শূন্যে তুলে বললেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'

তাঁর এই একটি কথায় শ্রোতারা যেমনভাবে উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো, ক্যাডেন বা ব্রাইটের হাজার বক্তৃতাতেও তা কখনও হয়নি। এই-যে ফার্গুসন, যিনি পলকের মধ্যে সহস্রের হৃদয় জয় ক'রে নিলেন, তাঁর পরিচয় নানা কারণেই নিশ্চয়ই পাঠকদের অজ্ঞাত নেই।

ফার্গুসনের বাবা ছিলেন ইংরেজ নৌবহরের একজন সাহসী সেনাধ্যক্ষ। ছেলেবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে-সঙ্গে সমুদ্রে দিন কাটিয়েছেন ফার্গুসন। এমনকী তুমুল লড়াই চলবার সময়েও ছেলেকে কাছছাড়া করতেন না তাঁর বাবা। তখন থেকেই ফার্গুসন সব বিপদ-আপদকে তুচ্ছ করতে শিখেছেন। একটু বয়েস্‌ হ'তেই ফার্গুসন দিনরাত অ্যাডভেনচারের বই নিয়ে সময় কাটাতে শুরু ক'রে দেন। সে-সব অ্যাডভেনচারের বইয়ে গাঁজাখুরি ও আজগবি রোমাঞ্চকর উপ্যাখ্যান থাকতো না, থাকতো বিশ্ববিখ্যাত পর্যটকদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। হাজার বিপদ-আপদকে তুচ্ছ ক'রে অজ্ঞাতের সন্ধানে বেরিয়েছেন তাঁরা, পদে-পদে নানারকম বিপত্তি ও দুর্দৈবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে তাঁদের, তবু কেউ এক পাও পিছনে হ'ঠে যেতে রাজি হননি ; একবারে না-পারলে আবার বেরিয়েছেন তাঁরা, শেষকালে হয়তো মৃত্যুকেই বরণ ক'রে নিয়েছেন, কিন্তু সব সত্ত্বেও একটুও পেছিয়ে যাননি। এইসব বই বালক ফার্গুসনের কল্পনাকে চেতিয়ে দিতো, উসকে দিতো তাঁর মন, আর তখন থেকেই ভেতরে-ভেতরে নিজেকে সেইসব নায়কদের সঙ্গে তিনি মিলিয়ে নিতেন। সেইসব বাধা-বিপত্তি বিপদ-আপদ তাঁকে উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কায় ভ'রে দিতো সত্যি, কিন্তু সেইসব বিপদ-আপদের হাত থেকে তাঁরা যে-ভাবে নিজেদের উদ্ধার করতেন, তা তাঁকে বিস্তর আমোদ ও আনন্দ দিতো। তবে মাঝে-মাঝে তাঁর মনে হ'তো এমন অবস্থায় পড়লে তিনি নিজে নিশ্চয়ই আরো সহজে উদ্ধার লাভ করতে পারতেন। ছেলের মনের ধাত বা চেহারা বাবার অজ্ঞাত ছিলো না। নানা ধরনের বিজ্ঞানশিক্ষায় ছেলে যাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করে, সেইজন্যে প্রথম থেকেই তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ফলে, মৌমাছিরা যেমন ক'রে বহুকিছু থেকে মধু সংগ্রহ ক'রে একটু-একটু ক'রে মৌচাক গ'ড়ে তোলে, তেমনিভাবে নানা বিদ্যা থেকে মানসিক খাদ্য নিষ্কাশন ক'রে ফার্গুসনের বিদগ্ধ মানস গ'ড়ে উঠেছিলো।

পিতার মৃত্যুর পর সেনাবাহিনীতে কাজ নিয়ে ফার্গুসন ভারতবর্ষে বাংলাদেশে এলেন, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সেনাবাহিনীর রুটিন-বাঁধা, একঘেয়ে, কাজ তাঁকে বিষম অরুচিতে ও বিতৃষ্ণায় ভ'রে দিলে। তরবারি পরিত্যাগ ক'রে অচিরেই তিনি পর্যটক হ'য়ে উঠলেন, তারপর গোটা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করতে তাঁর আর খুব-বেশি দিন লাগলো না। দেশ ঘোরার ইচ্ছেটা তাঁর এতই প্রবল ছিলো যে একদিন সকালে কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটে সরাসরি সুরাটের দিকে রওনা হলেন। ভারতবর্ষ ভ্রমণ সাঙ্গ ক'রে ক্রমে-ক্রমে রুশদেশ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াও ঘুরে এলেন তিনি। কোনো-কিছুতেই তাঁর কোনো অসুবিধে হ'তো না। অনেকদিন অনাহারে কাটাতে হয়েছে, তবু হাল ছেড়ে দিয়ে পেছ-পা হননি। ঘুম তো ছিলো যেন তাঁর হুকুমের চাকর, তাঁর কথাতেই যেন ওঠ-বোস করতো। সময়ে-অসময়ে সুবিধেয়-অসুবিধেয় সংকীর্ণ স্থানে কি প্রশস্ত জায়গায় যখন যতটুকু দরকার ততটুকু ঘুমুতে পারতেন তিনি—ঠিক নাপোলিয়ঁর মতো।

বিশেষ-কোনো সমিতির সভ্য না-হওয়া সত্ত্বেও *ডেইলি টেলিগ্রাফে* নিয়মিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখতেন ব'লে জনসমাজে ফার্গুসন সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু লোকে তাঁর নাম জানলেও খুব কম লোকের সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিলো। কোনো সভা-সমিতিতে যোগ দিয়ে, কি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে, তিনি একটুও সময় নষ্ট করতেন না। ভাবতেন, যতক্ষণ সভায় ব'সে তর্কাতর্কি ক'রে খামকা সময় নষ্ট করবো, ততক্ষণ কোনো-একটা তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করলে ঢের বেশি কাজ দেবে। পর্যটক ফার্গুসন যা দেখতেন, তার একেবারে অন্তঃস্থল পর্যন্ত না-দেখে ছাড়তেন না। সেই কারণে সাধারণ পর্যটকদের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তর পার্থক্য ছিলো।

একদিন *ডেইলি টেলিগ্রাফ* লিখলে :

> **'এতদিনে নির্জন আফ্রিকার কালো অবগুণ্ঠন খুলে যাবে, এতদিনে নীরবতা ভেঙে কথা ক'য়ে উঠবে উষ্ণ জঙ্গলের মৌন অন্ধকার। ছ-হাজার বছর ধ'রে অবিশ্রান্ত চেষ্টা ক'রেও যার সন্ধান মেলেনি, এবারে, এতদিনে, সত্যিই, তা সব আবরণ উন্মোচিত ক'রে দেখা দেবে। নীলনদের উৎস আবিষ্কার করার চেষ্টা এতকাল শুধু অসম্ভব ও বাতুল কল্পনা ব'লেই পরিচিত ছিলো। বহুকালের চেষ্টায় মাত্র তিনটে প্রবেশপথ মুক্ত হয়েছিলো কালো আফ্রিকার। ডেনহ্যাম ও ক্ল্যাপারটনের আবিষ্কার-করা পথে মাত্র সুদান পর্যন্ত গিয়েছিলেন ডক্টর লিভিংস্টোন; ক্যাপ্টেন গ্র্যান্ট ও ক্যাপ্টেন স্পীক ভিন্ন একটি পথ দিয়ে আফ্রিকার কয়েকটি হ্রদ আবিষ্কার করেছিলেন। যেখানে এসে পথ তিনটে মিলেছে, সেটাই আফ্রিকার মধ্যখান ব'লে সকলের ধারণা। শিগগিরই আফ্রিকার এই ত্রিবাহুসংগমে যাত্রা করছেন ডক্টর ফার্গুসন। তিনি স্থির করেছেন, পূর্ব-আফ্রিকা থেকে পশ্চিম-আফ্রিকা পর্যন্ত গোটা এলাকাটাই তিনি আকাশযানে ক'রে যাবেন। আমরা যতদূর জানতে পেরেছি তার মোদ্দা কথাটা এই যে, ফার্গুসন ঠিক করেছেন তিনি জান্‌জিবার থেকে বেলুনে ক'রে বরাবর**

পশ্চিমমুখো যাবেন। এই যাত্রা যে কোথায় এবং কীভাবে শেষ হবে, তা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন। আমরা সর্বান্তঃকরণে এই বীর পর্যটকের সাফল্য কামনা করছি।'

ডেইলি টেলিগ্রাফে এ-খবরটা বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গেই সারা দেশে দস্তুরমতো হৈ-চৈ প'ড়ে গেলো। অনেকেই বললে, 'এ একেবারে অসম্ভব কথা। অমন ক'রে কি বেলুনে চ'ড়ে একটা আস্ত মহাদেশে যাওয়া যায় নাকি কখনও! আসলে ফার্গুসন ব'লে কেউ নেই, ওটা কারু ছদ্মনাম, *ডেইলি টেলিগ্রাফে* সে প্রবন্ধ লিখতো। এই সুযোগে কাগজের কাটতি বাড়াবার জন্যে *ডেইলি টেলিগ্রাফে* সে এই বুজরুকি তুলে দিয়েছে। সম্পাদক মশাইকে তো চিনি, একবার অমনি একটা হুজুগ তুলে তিনি আমেরিকার মাথা খেয়েছিলেন, এবার দেখছি ইংলণ্ডেরও মাথা খেতে বসেছেন।' অন্যান্য খবরের কাগজও একটা সুযোগ পেয়ে গেলো, তারা *ডেইলি টেলিগ্রাফকে* ঠাট্টা-বিদ্রূপ ক'রে নানা ধরনের প্রবন্ধ ও ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করতে শুরু ক'রে দিলে। ফার্গুসন অবশ্য যথারীতি চুপচাপই থাকলেন, এই ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্যই করলেন না।

কিছুকাল পরে সবাই যখন শুনতে পেলে যে, সত্যিই সুবিখ্যাত লায়ন কম্পানি ফার্গুসনের বেলুন তৈরির ভার নিয়েছে আর ইংরেজ সরকার *রেজোলিউট* নামে আস্ত একটি জাহাজ ফার্গুসনের ব্যবহারের জন্যে নিযোজিত করেছে, তখনই সকল সন্দেহ দূর হ'য়ে চারদিকে তুমুল সাড়া প'ড়ে গেলো। এই খবরটাও প্রথম প্রকাশ করেছিলো *ডেইলি টেলিগ্রাফ*; খবরটার যথার্থতা নিয়ে কেনো প্রশ্নই যখন করা গেলো না, তখন হু-হু ক'রে তার কাটতি বেড়ে গিয়ে কাগজের মালিকরা রীতিমতো ফেঁপে উঠলেন।

সারা ইংলণ্ডে এই নিয়ে বাজি ধরা শুরু হ'য়ে গেলো। সত্যিই ফার্গুসন নামে কেউ আছেন কি না, প্রথমে বাজি ধরা হ'লো তা নিয়ে; দু-নম্বর বাজির বিষয় হ'লো, এমন-একটি অসম্ভব ও দুঃসাহসী অভিযানে সত্যিই কেউ শেষ পর্যন্ত প্রবৃত্ত হবে কি না, এই প্রশ্ন; পর্যটন সফল হবে কি না, ফার্গুসন আর ইংলণ্ডে ফিরতে পারবেন কি না, এইসব নিয়েও বাজি ধরা হ'তে লাগলো।

প্রত্যেকদিন দলে-দলে লোক এসে ফার্গুসনকে প্রশ্নে-প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত ও উত্ত্যক্ত ক'রে তুললে। অনেকে আবার নানা প্রশ্ন ক'রেই ছেড়ে দিলে না, তারা আবার তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যেও আব্দার ধরতে লাগলো। ফার্গুসন যদিও স্থিরভাবে সকল প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিলেন, তবু একটি ব্যাপারে একেবারে অবিচল থেকে গেলেন—কাউকেই তিনি সঙ্গে নিতে রাজি হলেন না।

২

ডক্টর ফার্গুসনের একমাত্র বন্ধু যিনি ছিলেন, তিনি ডিক কেনেডি। ধ্যান-ধারণা, প্রবণতা ও স্বভাব দু-জনের একেবারে অন্যরকম, কোনো দিকেই প্রায় মেলে না ; কিন্তু তবু তাঁদের ভিতর প্রীতির কোনো অভাব ছিলো না। কতগুলো দিকে আবার দুজনের খুব খাপ খেতো : ডিক কেনেডি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সরলচিত্ত, কোনো ঘোরপ্যাঁচ জটিলতা নেই, একবার যা করবেন ব'লে ধরেন কখনও তা শেষ না-ক'রে ছাড়েন না। শিকারি হিশেবে গোটা এডিনবরায় তাঁর কোনো জুড়ি ছিলো না। তিনি থাকতেন এডিনবরার লিথি নামক স্থানে। তাঁর টিপ এমনি অব্যর্থ আর অমোঘ ছিলো যে, দূরে একটা ছুরি রেখে তিনি বন্দুকের এক গুলিতে ছুরিটাকে দুই সমান ভাগে টুকরো ক'রে দিতে পারতেন। সুপুরুষ, শাদাসিধে, সরল এবং দুঃসাহসী ডিক কেনেডি তাঁর ডাকাবুকো বন্ধু ফার্গুসনকে খুবই ভালোবাসতেন।

তিব্বত-ভ্রমণের পর ফার্গুসন দু-বছর চুপচাপ ব'সে ছিলেন, আর-কোথাও ভ্রমণ করতে বেরোননি। তাই দেখে ডিক ভেবেছিলেন, বন্ধুর বেড়াবার নেশা বোধহয় এতদিনে শেষ হ'লো। তাতে তিনি মনে-মনে বেশ খুশিই হয়েছিলেন। দেখা হ'লেই তিনি ফার্গুসনকে কেবলই বলতেন, 'আর ছুটোছুটি ক'রে কাজ নেই, বিজ্ঞানের জন্যে অনেক করেছো, এবারে দু-দিন ঘর-সংসারে মন দাও দেখি।' ফার্গুসন মাঝে-মাঝে এ-কথা শুনে মৃদু হাসতেন, কখনও আবার চুপ ক'রে কী যেন ভাবতেন, বন্ধুর কথার সরাসরি কোনো উত্তর দিতেন না।

ডক্টর স্যামুয়েল ফার্গুসনের সঙ্গে ডিক কেনেডির পরিচয় হয়েছিলো ভারতবর্ষে। সেনাবাহিনীর একই বিভাগে কাজ করতেন দুজনে, কিছুকাল একই শিবিরেও কাটিয়েছিলেন। সবসময়েই শিকার নিয়ে মত্ত থাকতেন ডিক, আর ফার্গুসন কেবলই যতরাজ্যের পোকামাকড় আর নানা জাতের গাছপালার স্বভাব, প্রকৃতি, প্রবণতা এইসবই অনুসন্ধান ক'রে বেড়াতেন। দুজনে দুজনের জন্যে এমন-কোনো কাজই করেননি যা তাঁদের বন্ধুতার মূল কারণ হ'তে পারে, কিন্তু তবু—প্রায় সব বিষয়েই দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও—দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুতা হয়েছিলো। অনেকে ভাবতে পারে যে দুজনে যখন একই বাহিনীতে কাজ করতেন, তখন হয়তো পরস্পরকে তাঁরা কখনও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, বা কোনোরকম পারস্পরিক উপকারের সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন ; কিন্তু তা সত্য নয়। দুজনের মধ্যে দেখাশোনাও হ'তো ক্বচিৎ কখনও, কিন্তু তবু যখনই ফার্গুসন তাঁর মস্ত এক একটি অভিযানের পর ইংলণ্ডে ফিরে আসতেন, তখনই ছুটতেন ডিক কেনেডির বাড়ি। যতদিন-না সেখানে কয়েকদিন কাটানো যায় ততদিন যেন আর তাঁর মনের অস্বস্তি ও অস্থিরতা কাটবে না।

লামাদের দেশ থেকে প্রাণ হাতে ক'রে ফিরে আসার পর বছর-দুয়েক ফার্গুসন টুঁ-শব্দটি না-ক'রে পড়াশুনো নিয়ে কাটাচ্ছিলেন দেখে ডিক মনে-মনে স্বস্তি অনুভব

করছিলেন । এতদিনে তবে সত্যিই ডাকাবুকো বার-মুখো ফার্গুসন ঘরের দিকে মন দিয়েছেন ! কিন্তু হঠাৎ *ডেইলি টেলিগ্রাফের* পাতায় ফার্গুসনের সংকল্পিত অভিযানের কথা প'ড়ে তাঁর সব ধারণা চুরমার হ'য়ে গেলো । প্রথমটা অন্য-অনেকের মতো তিনিও খবরটিকে আজগুবি ব'লে ভেবেছিলেন । কেননা বেলুনে ক'রে আফ্রিকা পাড়ি দেবার মতো ও-রকম একটা ভীষণ সংকল্প কেবল পাগলেই করতে পারে । নেহাৎ যদি মাথায় পোকা না-ঢোকে তো কেউ কোনোদিন বেলুনে ক'রে আভিযানের কথা ভাবতে পারে ? তাছাড়া কয়েকদিন আগেই তো ফার্গুসনের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর, তখন তো কই এ-রকম কোনো সংকল্পের কথা মুখেও আনেননি ফার্গুসন ! খবরটা বিস্তারিতভাবে পড়ার পরে কিন্তু ডিকের ভুল ভেঙে গেলো । তাহ'লে কি এইরকম একটা মারাত্মক মৎলব আঁটছিলেন ব'লেই ফার্গুসন দু-বছর চুপচাপ ব'সে ছিলেন ? এর পরে হয়তো কোনোদিন বন্ধুটি চন্দ্রলোকে যাবার জন্যেও বায়না ধ'রে বসবেন ।

অস্বস্তিতে ভ'রে গেলেন ডিক । না, যেমন ক'রেই হোক, এই সংকল্প থেকে ফার্গুসনকে নিবৃত্ত করতেই হবে। জীবন যে কখন কোন-দিক থেকে অভাবনীয়ের সম্মুখীন ক'রে দেয়, তা কে জানে । হয়তো ফার্গুসন তাঁর সংকল্প থেকে মোটেই টলবেন না, কিন্তু তবু একবার তাঁকে ফেরাবার চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কী ? না, আজই যেতে হয় দেখছি ।

একটু রাগও হ'লো ডিকের । এই-ই যদি তাঁর উদ্দেশ্য হবে, তবে আগে সে-কথা ডিককে বলতে কী দোষ হয়েছিলো ? বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও এই খবরটা ডিককে কিনা খবরের কাগজ প'ড়ে জানতে হ'লো ! এত লোকজানাজানি হবার আগে ডিক যদি এ-কথা একবার জানতে পারতেন, তবে হয়তো অনায়াসেই তাঁকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে নিবৃত্ত করতে পারতেন । কিন্তু এখন, এত হৈ-চৈ শুরু হ'য়ে যাওয়ার পর, তা কি আর সম্ভব হবে ?

ডিক আর-একটুও দেরি না-ক'রে রেলের টিকিট কেটে সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে গাড়িতে চেপে বসলেন । যথাসময়ে পরদিন সকালবেলায় লণ্ডনে এসে পৌঁছুলেন তিনি, তারপর সোজা গাড়ি ক'রে গ্রীক স্ট্রিটে ফার্গুসনের বাড়িতে এসে হাজির হলেন ।

ডিক কেনেডিকে হঠাৎ এসে হাজির হ'তে দেখে ফার্গুসন যৎকিঞ্চিৎ অবাক হ'লেও বাইরে তা প্রকাশ করলেন না । মুখে কেবল বললেন, 'হঠাৎ তুমি যে ? কী ব্যাপার ? শিকার ছেড়ে হঠাৎ লণ্ডনে কী জন্যে ?

ডিক একটু রাগি গলায় উত্তর দিলেন, 'আচ্ছা, তোমার কি কখনও কাণ্ডজ্ঞান হবে না, ফার্গুসন ? বুদ্ধিশুদ্ধি কি সব লোপ পেয়ে গেছে ? কী-সব যা-তা কথা ব'লে বেড়াচ্ছো ? পাগলের মতো তোমার মাথায় পোকা ঢুকেছে ব'লেই হন্তদন্ত হ'য়ে আমাকে এই বিচ্ছিরি আর ঘিঞ্জি লণ্ডন শহরে আসতে হ'লো ।'

'আমার মাথায় পোকা ঢুকেছে ব'লে ?' ফার্গুসন একটু হাসলেন । 'ও, কাগজে বুঝি খবরটা পড়েছো ? তা সে নিয়ে পরে কথা হবে, আগে তো মাথা ঠাণ্ডা ক'রে

গুছিয়ে বোসো ।'

'সে-সব ভদ্রতা পরে দেখা যাবে ।' ডিক বললেন, 'তাহ'লে সত্যিই তুমি আফ্রিকা যাচ্ছো ?'

'তা তো যাচ্ছিই । সব ব্যবস্থাও মোটামুটি হ'য়ে গেছে । ফেব্রুয়ারির ষোলো তারিখে গ্রীনউইচ থেকে *রেজোলিউট* জাহাজ ছাড়বে—ঐ জাহাজে ক'রেই জানজিবার অব্দি যাবো আমি ।'

'সব ঠিকঠাক ক'রে ফেলেছো তাহ'লে, না ?' আর রাগ চাপতে পারলেন না ডিক । 'জানো, তোমার সমস্ত ব্যবস্থা আমি লণ্ডভণ্ড ক'রে দিতে পারি ।'

'অত মাথা-গরম কোরো না, ডিক ।' ফার্গুসন আবার হাসলেন । 'তোমার এত রাগের কারণ আমি জানি ! এই নতুন অভিযানের পরিকল্পনাটি কেন আগে থেকে তোমাকে জানাইনি—তোমার এত রাগের কারণ তো তা-ই !'

'নতুন অভিযান গোল্লায় যাক । আমি বলছি, তোমার যাওয়া হবে না—ব্বাস, সব গোল চুকে গেলো । এর মধ্যে আবার মনস্তত্ত্বের কথা ওঠে কোত্থেকে ?'

'সে-কি ! আমি যে এবারে তোমাকেও সঙ্গে নেবো ঠিক করেছি । জানো তো, যে-সে জায়গা নয়, আফ্রিকা । বুনো জানোয়ারদের হাতে প'ড়ে যে-কোনো মুহূর্তে প্রাণ হারাতে হ'তে পারে । কাজেই সঙ্গে এমন-একজন লোক চাই, যার বন্দুকের টিপ একেবারে মোক্ষম এবং শিকারে যার কোনোকালেই অনীহা দেখা দেবে না, আর যার সাহসের তুলনা হয় না । আর সে-রকম লোক, আমার হিশেবে, সারা ইংলণ্ডে একজনই আছে—সে তুমি । কাজেই তোমাকে সঙ্গে নেবার কথা গোড়া থেকেই আমি মনে-মনে ভাবছিলুম । আজ যদি তুমি না-আসতে তো আমিই তোমাকে এখানে আসার জন্যে তার ক'রে দিতুম । তাছাড়া, এই তো সেদিন তুমি আপশোশ ক'রে বলেছিলে, এমন-এক দেশে আছো যেখানে কোনো শিকার মেলা দুর্লভ, যেখানে শিকার ক'রে আনন্দ নেই ; বিপদ-আপদ মৃত্যুর আশঙ্কা—এ-সবই যদি না-থাকলো তাহ'লে আর শিকার করার মধ্যে উত্তেজনার খোরাক কী আছে । তাই বলছি, চলো আমার সঙ্গে, দেখা যাবে কত শিকার তুমি করতে পারো ।'

'আমি যাবো তোমার সঙ্গে !' ডিকের বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না । প্রথমটায় তো ফার্গুসনের কথা তাঁর বিশ্বাসই হ'তে চাচ্ছিলো না । পরে যখন বুঝলেন বন্ধু তাঁকে ঠাট্টা করছেন না, বরং একটি সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্তের কথাই প্রকাশ করছেন, তখন জোর দিয়ে বললেন, 'অসম্ভব, তা হয় না । আমি তো এখনও তোমার মতো পুরোদস্তুর পাগল হ'য়ে যাইনি, কাজেই ও-সব আজগুবি মৎলব আমার মাথায় খুব-একটা আসে না ।'

ফার্গুসন কিন্তু তাঁর সংকল্প থেকে একতিলও নড়লেন না । প্রথমটায় ডিক যতই আপত্তি করুন না কেন, ফার্গুসন যখন শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন ডিক তখন অন্যদিক দিয়ে আক্রমণ চালালেন । জেদ কারুই কম নয়, দুজনেই সমান একরোখা । ফার্গুসন তাঁর বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যাবেনই আর ডিকেরও পাহাড়ের মতো

অনড় প্রতিজ্ঞা, কিছুতেই তিনি সঙ্গে যাবেন না। পরিকল্পনাটি জনসাধারণের কাছ থেকে যতই হাততালি বা পিঠচাপড়ানি পাক না কেন আসলে এটা কেবল অবাস্তবই নয়, রীতিমতো অসম্ভব। অন্য লোক হ'লে ডিক এই প্রস্তাবের ভয়াবহতা নিয়ে হয়তো আলোচনা করতেন, কিন্তু ফার্গুসনকে ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই : আগে যিনি প্রাণ হাতে ক'রে বিভিন্ন সংকটের মধ্যে একা অকুতোভয়ে চলাফেরা করেছেন, তাঁকে সাধারণ লোকের মতো প্রাণের ভয় দেখানো হাস্যকর। কাজেই ডিক যুক্তি-তর্ক দিয়ে ফার্গুসনের প্রস্তাবের অবাস্তবতা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু যুক্তি জিনিশটার উপর তো ডিকেরই কেবল একতরফা অধিকার নেই। ফার্গুসনের বৈজ্ঞানিক মনও যুক্তিকে কোনো অব্যর্থ তীক্ষ্ণধার ছুরিকার মতো ব্যবহার করতে জানে। ডিকের সমস্ত বিরোধিতাকেই ফার্গুসন যুক্তি দিয়ে খণ্ডন ক'রে দিলেন। অনেকক্ষণ ধ'রে তর্কাতর্কি চলার পর ডিক কেনেডির বিরোধিতায় একটু বিচলিত হলেন। তাছাড়া, সত্যি-বলতে, ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকায় শিকার করতে যাওয়ার প্রস্তাবটা তাঁকে ভেতরে-ভেতরে কিঞ্চিৎ দুর্বল ক'রে দিয়েছিলো। অমন লোভনীয় প্রস্তাব কি একটুও বিবেচনা না-ক'রে অগ্রাহ্য ক'রে দেয়া যায়, না কি তা কখনও দেয়া উচিত ? কিন্তু, তবু বেলুনে ক'রে যাওয়ার কথাটা ডিকের কিছুতেই মনঃপূত হচ্ছিলো না।

'বেশ-তো, যেতেই যদি হয় তাহ'লে হাঁটা-পথে যেতে আপত্তি কীসের ? বেলুনে ক'রে যেতে চাচ্ছো কেন ? হঠাৎ তারপর বেলুন কোনোরকমে ফুটো হ'য়ে যাক, আর মাটিতে আছড়ে প'ড়ে চুরমার হ'য়ে যাই। এর কোনো মানে হয় না। অন্যকোনো দিক দিয়ে মৃত্যু এলে তবু তার সঙ্গে খানিকক্ষণ লড়াই চালানো যায়, না-যুঝে এত সহজে হার স্বীকার করার কোনো কথাই ওঠে না। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তো করার কিছুই নেই। অসহায়ের মতো মৃত্যুর হাতে নিজেকে স'পে দিতে হবে। তার চেয়ে স্থলপথ ঢের ভালো— অন্তত এত সহজে মৃত্যুর হাতে পড়তে হবে না। কেন-যে তুমি মাটির ওপর দিয়ে যেতে চাচ্ছো না, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

'স্থলপথে মাটির ওপর দিয়ে এইজন্যে যেতে চাচ্ছি না যে, এর আগে যতবারই হাঁটাপথে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে, সবই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।' ফার্গুসন বন্ধুকে বোঝাতে ব'সে গেলেন। 'আফ্রিকায় যাবার চেষ্টা তো আর আজকেই প্রথম হচ্ছে না, এর আগে ইয়োরোপের অনেকেই সেই চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই স্থলপথ বেছে নিয়ে মস্ত ভুল করেছিলেন। জন্তুজানোয়ার, অসুখ-বিশুখে, আফ্রিকার দুর্দান্ত আদিবাসীদের হামলায় ও পথশ্রমে প্রত্যেককেই খামকা ক্লান্ত হ'তে হয়েছে। অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন, কেউ-কেউ প্রায়-মৃত অবস্থায় যখন ফিরে এসেছেন, তখন কঙ্কালটা বাদে মনুষ্য-শরীরের আর-কিছুই তাঁদের অবশিষ্ট ছিলো না। তা ছাড়া আমাদের যাবার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আফ্রিকার ঠিক কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছুনো। পথেই যদি আমাদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ হ'য়ে যায়, তাহ'লে গিয়ে আর লাভ কী, হয়তো ফিরে-আসার কোনো ক্ষমতাই তখন আমাদের অবশিষ্ট থাকবে না। কী ক'রে পথের এই বিপজ্জনক ও মারাত্মক শ্রম

বাদ দিয়ে আফ্রিকার কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছুনো যায় সে-কথা ভাবতে গিয়েই আকাশযানের কথা আমার মনে পড়ে । বেলুনে ক'রে যাওয়ার সুবিধে কত, তা কি আর তালিকা ক'রে বোঝানো যায় । আকাশপথে যাবো ব'লেই এইসব বিপদ-আপদ আমাদের কোনো নাগালই পাবে না, তার অনেক উপর দিয়ে তার হাত এড়িয়ে আমরা চ'লে যাবো, তাছাড়া কত তাড়াতাড়ি যাবো, তাও একবার ভেবে দ্যাখো । আগে যে-সব অভিযানকারী যে-পথ অতিক্রম করতে এক মাস লাগিয়েছিলেন, আমরা তা অনায়াসেই বেলুনে ক'রে দু-তিন দিনে চ'লে যাবো, এমনকী নিরাপদেই যাবো । ভ্রমণকারীদের সামনে পথে যে-সব বাধা আসে, তার কিছুই আমরা অনুভব করতে পারবো না । দুর্ভেদ্য জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, নদী প্রান্তর মরুভূমি, অসুখবিশুখ, অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু—কোনোকিছুই আমাদের বাধা দিতে পারবে না, অক্লেশে সবকিছুর উপর দিয়ে সহজেই আমরা পাড়ি দেবো । শূন্যপথে যাবো ব'লে অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়বে, ঝড়বৃষ্টিকেও এড়িয়ে যেতে পারবো । শুনে নিশ্চয় বুঝতে পারছো পায়ে-চলায় এ-সব কোনোকালেই সম্ভব হ'তো না । বেলুনের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা থাকবে আমারই হাতে—কখনও অনেক উঁচু দিয়ে, কখনও-বা মাটির সামান্য কিছু ওপর দিয়ে, যখন যেভাবে সুবিধে হয়, সেভাবেই আমরা যাবো ।'

'বেলুন তোমার মর্জি-মাফিক চলবে নাকি ? তার চলা তো নির্ভর করবে হাওয়ার গতিবেগের ওপর । কাজেই তোমার সুবিধে অনুযায়ী তা চলবে কী ক'রে ?'

এমন কোনো-একটা প্রশ্নই আশা করেছিলেন ফার্গুসন, কাজেই প্রশ্নটা শুনে তাঁকে মোটেই বিচলিত দেখালো না । চট ক'রে বললেন, 'তার ব্যবস্থাও আমি ঠিক করেছি। আমরা তো পুবদিক থেকে পশ্চিমে যাবো, তুমি নিশ্চয়ই জানো বাণিজ্যবায়ুর গতিও সেই দিকেই—ওই বাণিজ্যবায়ুই আমায় গন্তব্য পথে যেতে সাহায্য করবে ।' একটু থেমে আবার যোগ করলেন, 'এতদিন ধ'রে বেলুনকে যখন-তখন ওপরে ওঠাবার ও নিচে নামাবার জন্যে বহু পরীক্ষা ও গবেষণা হয়েছে, কিন্তু কেউই এমন-কোনো পথ বাৎলাতে পারেনি যাকে বিশেষ সুবিধেজনক বলা চলে । কিন্তু আমি অনেক ভেবেচিন্তে এমন-একটি প্রক্রিয়া বের করেছি, যার সাহায্যে অনায়াসেই যে-কোনো বেলুনকে ইচ্ছেমতো চালানো যায় । তুমি তো জানো গ্যাস যত সম্প্রসারিত হয়, ততই তা হালকা হ'য়ে পড়ে । বেলুনের গ্যাস সম্প্রসারিত ক'রে আমি তাকে ওপরে ওঠাবো, আর গ্যাস সংকোচন করিয়ে তাকে নিচে নামাবো । প্রশ্ন করতে পারো, এই সংকোচন সম্প্রসারণ আমি ইচ্ছেমতো করবো কী ক'রে ? উত্তরে বলবো, অতি সহজেই । গ্যাসের উত্তাপের তারতম্যের ওপরই তার সংকাচন ও সম্প্রসারণ নির্ভর করে । তাপ বাড়িয়ে দিলেই গ্যাস ছড়িয়ে গিয়ে হালকা হবে আর তাপ কমিয়ে দিলেই তা একজায়গায় জড়ো হ'য়ে ভারি হ'য়ে যাবে ।'

'সবই না-হয় বুঝলাম,' ডিকের গলা খুব হতাশ শোনালো, 'কিন্তু তবু কিছুতেই আমার মন এতে সায় দিতে চাচ্ছে না, ফার্গুসন ।

'এর মধ্যে আর কোনো কিন্তু নেই, ডিক । তুমি যে সঙ্গে যাবে, তা আমি অনেক

আগেই ঠিক ক'রে ফেলেছি । তুমি আর আমি ছাড়া আর যাবে জো—তুমি তো জানোই, ওকে না-নিয়ে আমি কোথাও যাই না । আর জো যদি বিনা দ্বিরুক্তিতেই যেতে পারে, তাহ'লে তোমার যেতে এত আপত্তি কীসের, তা আমি বুঝতে পারছি না ।'

৩

জো—সে হ'লো ফার্গুসনের চিরসাথী ও বিশ্বস্ত অনুচর । যারাই জোকে জানে, তারাই একবাক্যে সমস্বরে এ-কথা বলে যে, তার মতো ভৃত্য আর হয় না । অনেকদিন থেকেই সে ফার্গুসনের সঙ্গে আছে, আর সে-যে কেবল অদ্ভুত বিশ্বাসী, তা-ই নয়, তার মতো প্রভুভক্তও অতি বিরল । ফার্গুসনকে সে দেবতার চেয়েও বেশি ভালোবাসে । ফার্গুসনের চালচলন, কথাবার্তা — সব তার কাছে মহৎ ব'লে প্রতিভাত হয় । তিনি যা-ই করেন, তা-ই তার ধারণায় একমাত্র ধ্রুব সত্যি । এর আগে ফার্গুসনের সঙ্গে সবকটি অভিযানেই সে অংশ নিয়েছিলো ব'লে অভিযান-সংক্রান্ত নানা ব্যাপারে সে যথেষ্ট ক্ষমতা ও বিচারবুদ্ধি অর্জন করেছে : অনেকের কাছে যে-সব কাজ বিপজ্জনক ও দুঃসাধ্য ব'লে মনে হবে, অতি সহজে অবলীলাক্রমে জো সেগুলি করতে পারে । আর সে পারে না, এ-হেন কাজ কিছু আছে কি না সন্দেহ । কাজেই কোনো দুরূহ অভিযানে তার মতো লোকের সাহায্য ও সাহচর্যের তুলনা হয় না । ফার্গুসন তাকে মুখ ফুটে কখনোই বলেননি যে তাকে তিনি সঙ্গে নেবেন, কিন্তু তবু জো নিশ্চিতভাবেই জানে যে সে সঙ্গে যাবে । কোথায় যাবে, কেন যাওয়া হবে, কতদিনের জন্যে—এ-সব কথা তার কাছে বাহুল্য, অবান্তর ও অনাবশ্যক, এ-সব ব্যাপারে কোনোই কৌতূহল নেই তার ; সে কেবল জানে, ডক্টর ফার্গুসন নতুন অভিযানে বেরুবেন, কাজেই সে যে সঙ্গে যাবে তা তো স্বতঃসিদ্ধ, এ-সম্বন্ধে আর-কোনো আবোলতাবোল কথা উঠতে পারে ব'লে সে মনে করে না ।

জো-র চেহারাও দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো—যেমন লম্বা-চওড়া তেমনি স্বাস্থ্যবান, কিন্তু গোটা শরীরে মেদের বাহুল্য নেই, অতিরিক্ত চর্বি নেই কোথাও, কেবল পেশী আর হাড়—ইস্পাতের মতো পিটিয়ে তৈরি, পাথরের মূর্তির মতো ঋজু ও দৃঢ় । শরীরের কোনো অংশে বাহুল্য নেই ব'লে ক্ষিপ্রতায় সে নেকড়ের মতো । কথা খুব কম বলে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত টু-শব্দও উচ্চারণ করে না কিছুতেই, আর হুঁ-হ্যাঁ ক'রেই পারত-পক্ষে কাজ চালিয়ে দেয় । ফার্গুসনের প্রতি তার শ্রদ্ধা অসীমে পৌঁছেছিলো ব'লেই ফার্গুসনের সঙ্গে পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক কোণে যেতেও তার দ্বিরুক্তি ছিলো না ।

স্বভাবতই সে অতি শান্ত, তার জীবনের মূলসূত্র হ'লো নিয়মনিষ্ঠা ; কাজকর্মের ব্যাপারে সে ক্ষিপ্র, চটপটে । জীবনে যে অভাবনীয়ের কোনো স্থান আছে, তা তার

মুখ দেখে কেউ কল্পনাও করবে না। যত বিস্ময়কর পরিস্থিতিতেই পড়ুক না কেন, কিছুতেই সে স্তম্ভিত হয় না। অতি দ্রুত চলে তার দক্ষ হাত আর যে-কোনো কাজেই সে পারঙ্গম; আর যেটা তার সবচেয়ে বড়ো গুণ তা এই : গায়ে প'ড়ে সে কখনও উটকো পরামর্শ দেয় না, এমনকী, যখন তার পরামর্শ চাওয়া হয়, তখনও সম্ভব হ'লে নির্বাক থাকে।

গত কয়েক বছর ধ'রে সে ফার্গুসনকে ছায়ার মতো পায়ে-পায়ে অনুসরণ করেছে। কিন্তু কোনোদিনও সে ভুলেও এমন-কোনো অভিযোগ করেনি যে পথ বড়ো লম্বা, কি পথশ্রম সহ্যের সীমা ছাড়ালো; পৃথিবীর যে-কোনো কোণের জন্যেই তাকে বাক্স-তোরঙ্গ গোছাতে হোক না কেন—তা সে তিব্বতের দুর্গমতম স্থানই হোক কি আমাজোনের সবচেয়ে মারাত্মক অঞ্চলই হোক—কোনো কথাই সে মুখ ফুটে বলে না, কোনো প্রশ্ন না-ক'রেই প্রভুকে সে সর্বত্র অনুসরণ করে। সমস্ত রোগকেই অবলীলায় প্রতিরোধ করে তার স্বাস্থ্য; প্রত্যেকটি পেশী আঁটো আর কঠিন—কিন্তু স্নায়ু ব'লে তার যেন কিছুই নেই—অন্তত তার মানসের ওপর স্নায়ুর নিয়ন্ত্রণ একেবারেই নেই। সেইজন্যেই তুমুলতম বিপদের মুহূর্তেও তাকে পাথরের মূর্তির মতো নির্বিকার ও অবিচল দেখায়।

ঠিক ছিলো জানজিবার থেকেই যাত্রা শুরু হবে। জানজিবার অবস্থিত আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে—বিষুবরেখা থেকে প্রায় তিনশো ষাট মাইল দক্ষিণে, ভারত মহাসাগরের তীরে। জানজিবার পর্যন্ত যাওয়া হবে জাহাজে। সরকার থেকে এই উদ্দেশ্যে আটশো টনের জাহাজ *রেজোলিউট* নিয়োজিত করা হয়েছিলো—এই জাহাজই ফার্গুসন ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে যাবে সুদূর জানজিবার দ্বীপে; যাঁর হাতে জাহাজ পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছিলো তাঁর নাম ক্যাপ্টেন পিনেট। তাঁর নেতৃত্বে ১৮৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ষোলো তারিখে যাত্রার জন্যে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত হ'য়ে *রেজোলিউট* গ্রীনউইচে নোঙর ফেলে অপেক্ষা করছিলো—এখন সব প্রয়োজনীয় জিনিশপত্র বোঝাই করা হবে জাহাজে, তারপর ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে সেই দুঃসাহসিক অভিযানের সূচনা হবে।

ফার্গুসন তো এ-ক-দিন অভিযানের নানা ঝামেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন। এক মুহূর্তও অবসর নেই—কতরকম ব্যবস্থা করতে হবে, এঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, ওঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে বহু বিষয়ে আলোচনা করছেন— এক ফার্গুসন যেন অনেক হ'য়ে গিয়ে নিজের সব জিনিশের তদারক করতে লাগলেন।

হিশেব-নিকেশ ক'রে আগেই তিনি দেখেছিলেন,—খাদ্য, পানীয়, নানারকম যন্ত্রপাতি কলকব্জা ও আনুষঙ্গিক অন্যসব জিনিশ মিলিয়ে প্রায় চার হাজার পাউণ্ড হবে, কাজেই বেলুনের মাপ ও ক্ষমতা এমন হওয়া চাই যাতে সে এই ওজন বহন করতে পারে। ওজনের হিশেবে যাতে সূক্ষ্মতম গলদও না-থাকে, এইজন্যে ফার্গুসন নিজেদের ওজন পর্যন্ত আগে থেকে নিয়ে রেখেছিলেন। ওজনের হিশেব হ'লো এই রকম : ডক্টর ফার্গুসন স্বয়ং ১৩৫ পাউণ্ড, ডিক কেনেডি ১৫৩ পাউণ্ড আর জো-র ওজন ২২০ পাউণ্ড।

ফার্গুসনের বিচক্ষণ পরিকল্পনা অনুযায়ী আলাদা মাপের দুটি বেলুন তৈরি করা হয়েছিলো, একটি বড়ো ও একটি ছোটো—ছোটোটি থাকবে বড়ো বেলুনটির ভেতর। দুটি বেলুনই তৈরি করা হ'লো শক্ত রেশম দিয়ে, ওপরে থাকলো গাটাপার্চারের আবরণ। মজবুত একটা লোহার নোঙর আর খুব টেকশই রেশম দিয়ে পঞ্চাশ ফুট লম্বা একটি দড়ির মইও সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা করা হ'লো। বড়ো বেলুনটির ওজন হ'লো সাড়ে-ছয়শো পাউণ্ড আর ছোটো বেলুনটির হ'লো পাঁচশো পাউণ্ডের কিছু বেশি। যাতে ব'সে যাবেন, সেই দোলনা বা *'কার'*-এর ওজন হ'লো দুশো আশি পাউণ্ড। যন্ত্রপাতি কলকব্জা, তাঁবু, নোঙর, বন্দুক প্রভৃতি নানারকম আনুষঙ্গিক জিনিশপত্র দুশো পাউণ্ড। শুকনো মাংস, কফি, বিস্কুট প্রভৃতি খাবার-দাবার প্রায় চারশো পাউণ্ড, পানীয় জলও তাই, পোশাক-পরিচ্ছদ সাতশো পাউণ্ড, হাইড্রোজেন গ্যাসের ওজন দুশো আশি পাউণ্ড, আর বস্তায় ক'রে দুশো পাউণ্ড ওজনের পাথরের টুকরো (কখনও বেলুনকে ওপরে তুলতে হ'লে বেলুন থেকে তো ওজন কমাতে হবে, তাই এই পাথর অর্থাৎ *ব্যালাস্ট*) —একুনে চার হাজার পাউণ্ড।

এত-সব জিনিশপত্রের বিলি-ব্যবস্থা করতে গিয়ে ফার্গুসন যখন দম ফেলবার সময়টুকুও পাচ্ছেন না, ডিক কেনেডি কিন্তু তখন অত্যুৎসাহী উপসর্গদের উৎপাতে অস্থির। ঝাঁকে-ঝাঁকে লোকজন এসে প্রশ্নের পর প্রশ্নে কেনেডিকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত ক'রে মারলে। উত্ত্যক্ত হবার একটা সীমা আছে। সেই সীমা ছাড়িয়ে গেলে স্নায়ুগুলি পর্যন্ত বিকল হ'য়ে গিয়ে কোনো-কিছু বোধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফ্যালে। শেষটায় কেনেডিরও তা-ই হ'লো। লোকজনেরা এসে হাজার জ্বালাতন করলেও শেষদিকে তিনি যেন কিছুই করতে পারতেন না। প্রথমটায় তিনি খবরকাগজগুলোর মুণ্ডুপাত করতেন —যত নষ্টের গোড়া এই কাগজগুলো, সম্ভব-অসম্ভব নানা বিবরণী ছাপিয়ে এরাই একের পর এক হুজুগ তুলে লোকজনকে খেপিয়ে তোলে। আর, সবচেয়ে আশ্চর্য হ'লো, সমস্ত পরিকল্পনা সংগোপন রাখার জন্যে যতই সযত্ন চেষ্টা করা হোক না কেন, শেষটায় তারা কী ক'রে যেন সব টের পেয়ে যায়। আফ্রিকার রহস্যময় অরণ্য সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা ও আজগুবি বিবরণেরও শেষ নেই। অসংখ্য সব হাস্যকর মতামত, কয়েক লক্ষ গুজব আর আকাশস্পর্শী সব বুজরুকির খবর ছড়িয়ে গেলো। তারা যেন অদৃশ্য থেকেও সর্বত্র তাদের অসহ্য অস্তিত্বের ঘোষণা করতে লাগলো। শেষটায় প্রায় পাগলই হ'য়ে গেলেন কেনেডি, কবে একুশে ফেব্রুয়ারি আসে, কবে জাহাজ ছাড়ে, দিনরাত কেবল সে-কথাই ভাবতে লাগলেন।

বেলুন দুটি, *'কার,'* নোঙর, দড়ি, জলের পিপে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সব আনুষঙ্গিক জিনিশ সবই অবশেষে একদিন জাহাজে তোলা হ'লো, ফার্গুসন আর কেনেডির জন্যে দুটি ক্যাবিন ভালো ক'রে সাজানো-গোছানো হ'লো, জো-র জন্যেও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হ'লো। আর এরই মধ্যে একদিন রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি তাঁদের বিদায় অভিনন্দন জানাবার জন্যে সোসাইটির মস্ত সভাঘরে ফার্গুসনদের বিরাট

একটি ভোজে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ক'রে শুভেচ্ছা জানালে। সেখানে বিভিন্ন বক্তা তাঁদের যাত্রার সাফল্য কামনা করার পর অভিযাত্রীদের পক্ষ থেকে ফার্গুসন সবিনয়ে তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

একুশে ফেব্রুয়ারি যখন নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ ছাড়লো তখন জাহাজঘাটায় লোকে লোকারণ্য। *রেজোলিউট* নোঙর তুলে ন'ড়ে উঠতেই অসংখ্য লোক সম্মিলিত গলায় অভিযাত্রীদের নামে জয়ধ্বনি দিলে আর সেই প্রবল ধ্বনির মধ্য দিয়ে জাহাজ তার গন্তব্যপথের দিকে স্থির গতিতে এগিয়ে চললো।

৪

রেজোলিউট বেশ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছিলো, তবু পথও তো অনেক লম্বা, কাজেই দিনের পর দিন ফার্গুসন তাঁর সহযাত্রীদের কৌতূহল নিবারণের জন্যে বেলুনের সম্বন্ধে নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে চললেন। একদিন তিনি সকলকে তাঁর যাত্রার মূল উদ্দেশ্য ভালো ক'রে বুঝিয়ে বললেন :

'একদিন এই রহস্যময় মহাদেশ আদি পৃথিবীকে উপহার দিয়েছিলো লোভনীয় এক সভ্যতার গৌরব। প্রাচীন মিশর—ছেলেবেলা থেকে কত গল্পই না শুনেছি তার—কত তার রহস্য, আর কী বিপুল ঐশ্বর্য! সাত হাজার বছর আগেকার মানুষদের সেইসব ঐশ্বর্য একবার নিজের চোখে দেখে আসতে পারবো না, তাও কি হয়। অথচ যে-মহাদেশ এই সভ্যতার আশ্রয়, কত সামান্যই আমরা জানি তার, কত কম ; বলতে গেলে কিছুই না। কিন্তু কোনোদিনও তা জানবো না, তা কী ক'রে হয়? কাজেই আফ্রিকা যাবার পরিকল্পনা আমার মাথায় অ্যাদ্দিন ঘুরপাক খাচ্ছিলো।

'কী শুনেছি আমরা মিশর সম্বন্ধে? না, মিশর হ'লো অতীতের জাদুঘর ; সেই জাদুঘর চোখে দেখলে মাথা ঘুরে যায়। মনে হবে, আজকের পৃথিবী থেকে হঠাৎ যেন ছিটকে সেই পাঁচ-সাত হাজার বছরের পুরোনো পৃথিবীতে ফিরে-যাওয়া গেছে। আর কী তার ঐশ্বর্য—চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে দেয়। সোনা-রুপো হিরে-মুক্তোর যেন ছড়াছড়ি, কত শৌখিনতা, কী অপরূপ শিল্প—আজকের এই উনিশ শতকের তথাকথিত অগ্রসর মানুষও বুঝি তা কল্পনাতেই আনতে পারে না। অথচ এ-সব জিনিশ পাওয়া গেছে কোথায়—না, রাজারাজড়াদের কবরে। অবাক ক'রে দিতে পারে এই প্রশ্ন : কবরের ভেতরেই এত জিনিশ! কিন্তু ঠিক তাই। কেন-না তারা মনে করতো, মরার পরই মানুষের সব শেষ হ'য়ে যায় না, কবরের মধ্যেও মানুষ থেকে যায়। আর কবরের ভেতরে এভাবে থাকার সময় রাজাদের যাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এতটুকুও অভাব না-হয়,

সেইজন্যেই থরে-থরে সাজিয়ে রাখা হ'তো এত-সব রকমারি জিনিশ। আশবাবপত্র, অলংকার, শৌখিন শুর্মার খাপ, বাজনার যন্ত্র, খাবার-দাবার, বাসন-কোশন—এমনকী দাস-দাসী ধোপা নাপিতের দল পর্যন্ত। কবরের ভেতর পাথরের তৈরি সারি-সারি পুতুল পাওয়া গেছে—আসলে তা তো আর পুতুল নয়, কবরের মধ্যে পাওয়া দাসদাসীর দল। তারা ভাবতো, এই প্রস্তরীভূত মূর্তিগুলোই কবরের ভেতর সেবার কাজ চালাতে পারবে। গোটা জিনিশটা ভাবতেও অবাক লাগে—এত-সব জিনিশ কিনা কোনোদিন জীবিতের ভোগে লাগেনি। যে-ধনরত্ন সমস্ত কল্পনাকেও হার মানায় তা কিনা সব মৃত্যুর অপেক্ষায় গুছিয়ে রাখা! মরার আয়োজন নিয়ে এমন মত্ত হ'য়ে উঠেছিলো যে আদি সভ্যতা—তার জন্যে কি তাকে কোনো দাম দিতে হয়নি ?

'হয়েছিলো ; সেই দাম যে কী ভীষণ, তার প্রমাণও আছে—ঐ কবরের ভেতরই। কবরে তাদের ছবি আর মূর্তি পাওয়া গেছে—রাজার জন্যে তারা ব'য়ে নিয়ে চলেছে কী বিপুল বিলাস-সামগ্রী, তার ভারে নুয়ে পড়েছে পিঠ, ধনুকের মতো বেঁকে গেছে শিরদাঁড়া, হাড় আর চামড়া ছাড়া শরীরে সামান্যতম মাংস নেই। পরনে ছিঁড়ে-যাওয়া নেংটি, আর পিঠের কাছে নিষ্ঠুর প্রহরীর উদ্যত চাবুক।

'এই ঐশ্বর্যের সম্ভার যারা গ'ড়ে তুলেছিলো, তারা প্রাণ দিয়ে মৃতের জন্যে সব আয়োজন ক'রে গেলো। যে-পিরামিড আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো-একটি আশ্চর্য, তাও মৃতের জন্যে তৈরি। জীর্ণ পুরোনো পুঁথিতে লেখা আছে, একলাখ লোক বিশ বছর ধ'রে অক্লান্ত ও একটানা পরিশ্রম ক'রে গ'ড়েছিলো এই পিরামিড। তার চৌকো ভিতের একদিকের মাপ হ'লো লম্বায় সাতশো পঞ্চান্ন ফুট, মাটি থেকে তার চুড়োটা প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু। পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে গ'ড়ে তোলা হয়েছে পিরামিড। যেদিন শূন্যে তার চুড়ো অসীম স্পর্ধায় মাথা তুলে দিলে সেদিন হিশেব ক'রে দেখা গেছে এ-পিরামিড গাঁথতে লেগেছে ২,৩০০,০০ পাথরের চাঁই, গড়পড়তায় তার একেকটার ওজন প্রায় সত্তর মণ। সব পাথর তো আর সমান নয়—কোনোটা ছোটো কোনোটা বড়ো, আর বড়ো পাথরের মধ্যে একটি আছে যার ওজন প্রায় দশ হাজার মণ, তার দিকে তাকালেই নাকি মাথা ঘুরে যায়।

'পাথরগুলো আনা হয়েছিলো মরুভূমি পেরিয়ে নীলনদের ওপারের অনেক দূরের একটি পাহাড় থেকে। অতদূর থেকে এমন-সব মস্ত পাথরের টুকরো কী ক'রে নীল নদ পার ক'রে মরুভূমির বুকের ওপর দিয়ে এতদূর নিয়ে আসা হয়েছিলো ভাবতে গেলে কোনো থই পাওয়া যায় না! গোটা ব্যাপারটাই এমনি অতিকায় যে প্রায় অলৌকিক ব'লে মনে হ'তে চায়। আর তাও কি আজকের কথা ?

'এই অতিকায় ব্যাপারটি গ'ড়ে তুলেছে কিনা পাঁচ হাজার বছর আগেকার দুর্ধর্ষ মানুষ! ঐশ্বর্যের সকল সম্ভারের কথা যদি ছেড়েও দেয়া যায়, তাহ'লেও এই একটি জিনিশ যারা নির্মাণ করেছিলো, তাদের ক্ষমতা কী বিপুল ছিলো, সে-কথা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

'অথচ আজকের পৃথিবীতে—এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতের বাসিন্দা হ'য়েও আমরা কতটুকু জানি আফ্রিকার কথা, এই বোধই চিরকাল আমার মগজে জ্বালা ধরিয়েছে। যতবারই আমি ভ্রমণে বেরিয়েছি সবসময়েই এই অসম্পূর্ণতার চিন্তা আমাকে মগ্ন ক'রে রেখেছে। তাই শেষকালে এই প্রচেষ্টার জন্যে আমি তৎপর হয়েছি। যে-উৎস থেকে একদিন স্রোত এসেছিলো নীলনদের, আদি পৃথিবীকে যা দিয়েছিলো সভ্যতার গরীয়ান দীপ্তি, সেই এতকালের অনাবিষ্কৃত উৎসস্থল আবিষ্কারের জন্যেই তাই এই অভিযানে বেরিয়েছি আমি আজ। জানি, আমার পিছনে আছে সারা জগতের শুভেচ্ছা আর ঈশ্বরের দয়া, তাই অভিযান যে সফল হবেই, এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই আর নেই।'

৫

বেশ দ্রুত গতিতেই অগ্রসর হচ্ছিলো *রেজোলিউট*। আবহাওয়া পরিষ্কার, বাতাস অনুকুল, সমুদ্রও শান্ত। উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে মোজাম্বিক উপসাগর নির্বিঘ্নে অতিক্রম ক'রে অবশেষে পনোরোই এপ্রিল জাহাজ এসে পৌঁছুলো জানজিবার বন্দরে।

জানজিবারের ইংরেজ রাজদূত *রেজোলিউটেরই* প্রতীক্ষা করছিলেন, নোঙর ফেলতেই তিনি সদলবলে জাহাজে এসে উঠলেন। অত্যন্ত উৎসাহ দেখালেন তিনি ফার্গুসনের পরিকল্পনায়, সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। জাহাজ থেকে জেটি পর্যন্ত মাঝখানে যে একটুকরো কালো সমুদ্র রয়েছে, সেটুকু পেরিয়ে রাজদূত বা কন্সালের সঙ্গে ফার্গুসন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বন্দরে চ'লে এলেন।

বেলুনদুটিকে যখন তীরে নামানো হবে, এমন সময় গোল বাধলো। অনেক অনুসন্ধানের পর কন্সাল ব্যাপারটি সহজেই বুঝে নিলেন। ফার্গুসন প্রথমটা গণ্ডগোলের কারণ বুঝতে পারেননি, কন্সালই সবিস্তারে তাঁকে সব বুঝিয়ে দিলেন, 'বেলুন তীরে নামাতে গেলে ভীষণ মুশকিলে পড়তে হবে, কেননা এখানকার আদিবাসীরা তাতে ভয়ানকভাবে বাধা দেবে। তাদের ধারণা হ'লো; এই-যে বিধর্মী লোকগুলো বেলুন নিয়ে আকাশে উড়তে এসেছে, এটা হ'লো তাদের ধর্মবিরুদ্ধ কাজ—কাফেরদের এই স্পর্ধা তারা কিছুতেই সহ্য করবে না, হাতিয়ার নিয়ে বাধা দেবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছে। সূর্য আর চাঁদের উপাসক এরা। আর এই দুজন দেবতা থাকেন আকাশে, খ্রিষ্টানরা বেলুন নিয়ে আকাশে উঠে দেবতার আবাস অপবিত্র ক'রে দিতে চাচ্ছে—এমন অলুক্ষুণে কাণ্ড যদি ঘটতে দেখা যায়, তাহ'লে তাদের বিষম অমঙ্গল হবে। এই আশঙ্কাতেই তারা ভীষণভাবে খেপে গিয়েছে।'

'তাহ'লে এখন কী করবো ?' ফার্গুসন একটু হতাশ হ'য়ে পড়লেন। 'দ্বীপের যেখানেই বেলুন নামাতে যাই না কেন, সেখানেও তো ঐ একই বিপদ বল্লম উঁচিয়ে তেড়ে আসবে। কাজেই সে-চেষ্টা ক'রে তো কোনো লাভ নেই। আচ্ছা, ওদের কি কোনোরকমে বোঝাতে পারা যায় না যে আমরা দেবতার আবাসকে অপবিত্র করতে চাচ্ছি না—আমরা অন্য কারণে আকাশে উড়তে চাচ্ছি ?'

'না, তা ওরা বুঝবে না। কোনো যুক্তি যদি থাকতো, তাহ'লে হয়তো বোঝানো যেতো। কিন্তু লোকে যেখানে হাজার বছরের জড় বিশ্বাস আঁকড়ে ব'সে আছে, সেখানে যত জোরালো যুক্তিই দিন না কেন, তা মোটেই কাজে আসবে না, সবই নিষ্ফল হবে। তবে একটা কাজ হয়তো করা যায়।' চিন্তিত স্বরে কন্সাল বললেন, 'অনেকক্ষণ ধ'রে এ-বিষয়ে আমি ভেবেছি। ঐ-যে সমুদ্রের মাঝখানে কালোর মাঝে সবুজ ফুটকির মতো ছোটো-ছোটো দ্বীপ দেখা যাচ্ছে, তারই কোনো-একটায় গিয়ে বেলুন নামান। চারদিকে জাহজের নাবিকেরা কড়া পাহারা দেবে, আমিও কিছু লোক দেবো। সবাই যদি হুঁশিয়ার থাকে, তাহ'লে সম্ভবত আর কোনো ভয় থাকবে না।'

কন্সালকে ধন্যবাদ জানালেন ফার্গুসন। 'তা-ই ভালো। খামকা কোনো ঝামেলায় না-গিয়ে আমরা যাতে নির্বিঘ্নে আমাদের কাজ সারতে পারি, সেটাই আমাদের সর্বাগ্রে দেখা উচিত।'

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই কাজ হ'লো। শামুকের মতো গুটিগুটি ঐরকম একটি দ্বীপের গায়েই *রেজোলিউটকে* ভেড়ানো হ'লো। চারদিকে বহুদিনের পুরোনো সব মস্ত গাছ ছায়া আর আড়াল দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা ফাঁকা জায়গায় বেলুনদুটিকে নামিয়ে দেয়া হ'লো। আশি ফিট উঁচু মস্ত দুটি মাস্তুল—একটা শক্ত লোহার তার জুড়ে দিয়ে তারই ওপর দড়ির সাহায্যে বড়ো বেলুনকে টেনে খাড়া করিয়ে তার তলায় ছোটো বেলুনটিকে ঝুলিয়ে দেয়া হ'লো ; এই দুটো বেলুনের মধ্যে আবার যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে, সংযুক্ত করা হয়েছে শক্ত একটি লোহার নল, যার ভেতর দিয়ে বেলুনের ভেতর হাইড্রোজেন গ্যাস যাবে। এখন গ্যাস তৈরি ক'রে তা দিয়ে বেলুনকে ভর্তি করতে হবে।

গ্যাস তৈরি করার জন্যে ফার্গুসন অনেকরকম যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলি লাগসইভাবে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে গ্যাস বানানোর কল তৈরি করা হ'লো। গ্যাস বানানোর জন্য চাই সালফিউরিক অ্যাসিড, পুরোনো লোহার টুকরো, জল। সমস্ত ঠিকঠাক করতেই সারা দিন চ'লে গেলো। ফার্গুসন ঠিক করলেন, গ্যাস তৈরির কাজ শুরু হবে পরের দিন সকালে।

ঘুম যখন ভেঙে গেলো সূর্য উঠতে তখনও ঢের দেরি। রাতটা জাহাজেই কাটিয়েছিলেন ফার্গুসন। তাঁর বিছানার কোল ঘেঁসেই গোল জানলা, জাহাজের ভাষায় তাকে বলে *পোর্টহোল*। পর্দা সরিয়ে তিনি বাইরে তাকালেন। কালো জলের একটুকরো মাঝখানটায় আর তার পরেই সবুজ দ্বীপ—এদিকে-ওদিকে তখনও অনেক আলোর ছিটে ছড়ানো রয়েছে। দ্বীপের তখনও ঘুম ভাঙেনি, যেন ঝিমুচ্ছে। ঘুম-চোখে শেষরাতের

দ্বীপের দিকে তাকিয়ে আলসেমি করার অবসর সত্যিই ছিলো না। এক্ষুনি তৈরি হ'তে হবে। বিছানার চাদর থেকে নিজেকে বার ক'রে জামা-জুতোর মধ্যে শরীর গলিয়ে দিয়ে জাহাজের এ-গলি ও-গলি ঘুরে খাবার ঘরে এসে হাজির হলেন ফার্গুসন। সেখানে এর মধ্যেই কেনেডি আর জো এসে কফির টেবিলে হাজির, ক্যাপ্টেনও সঙ্গে আছেন; তাঁদেরও চোখ থেকে ঘুমের ছাপ মোছেনি, তবু চোখগুলো যেন চকচক করছে। কড়া কালো কফি নিয়ে বসলেন সবাই। প্রাতরাশ সারতে-না-সারতে অন্যরাও খাবার ঘরে এসে হাজির হ'লো। নিজেদের দায়িত্বের কথা মনে ক'রে সকলেই শেষরাতে উঠে পড়েছে।

কাজ আরম্ভ হ'লো সকাল আটটায়। গ্যাস তৈরি হ'য়ে ধীরে-ধীরে বেলুনের ভেতর প্রবেশ করলো, আর ক্রমশ বেলুনের আকার বদলে যেতে লাগলো। প্রথমটায় তার আকার হ'লো গোল বৃত্তের মতো, তারপর তার তলার দিকটা সরু হ'য়ে পেটমোটা হ'য়ে গেলো—ওপর দিকটাও ঈষৎ চেপে এলো। যাতে ভারসাম্য বজায় থাকে সেইজন্যে প্রথমে কয়েকটা বস্তা নামিয়ে দেয়া হ'লো *কার*-এর মধ্যে, তারপর একে-একে সব জিনিশপত্র তোলা হ'তে লাগলো। নোঙর, দড়ি, যন্ত্রপাতি, খাবার-দাবার, জলের পিপে, তাঁবু—সব তোলা হ'লো একের পর এক।

সব ব্যবস্থা করতে-করতেই বেলা প'ড়ে এলো। রোদের কড়া আঁচ ক'মে এলো, পশ্চিমদিককার গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে গেলো উষ্ণ জঙ্গলের প্রবল সূর্য, কেবল রশ্মিজ্বলা দিগন্ত থেকে শেষ আলোর কয়েকটি রঙিন রেখা বাঁকাভাবে এসে পড়লো বেলুনের গায়ে।

কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো চারদিকে, নৌকোয় ক'রে লোকলস্কর লাগিয়ে নজর রাখা হয়েছিলো উপসাগরের দিকেও। পাছে এ-দেশের আদি বাসিন্দারা দল বেঁধে আক্রমণ ক'রে বসে, তাই এই খবরদারি।

মূল দ্বীপ জানজিবারে অবশ্য তারা নানা ধরনের হাতিয়ার নিয়ে বিচিত্র আওয়াজ ক'রে *দুর্বোধ্য* ভাষায় তর্জন-গর্জন শুরু ক'রে দিয়েছিলো। তাদেরই মধ্যে কয়েকজন নিশ্চয়ই প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলো, সেই অত্যুৎসাহীরা সমুদ্রে লাফিয়ে প'ড়ে ছোটো দ্বীপটায় সাঁৎরে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে নাবিকদের হাতে বাধা পেয়ে শেষটায় হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে গেলো। সারারাত ধ'রে সমুদ্রের তীরে সেইসব কালো মানুষদের রাগি শোরগোল আর হুমকি শোনা গেলো।

সন্ধেবেলায় *রেজোলিউট* জাহাজে অভিযাত্রীদের বিদায় সংবর্ধনা জানাবার জন্যে ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিলো। পরদিন সকালবেলায় বেলুন তার যাত্রাপথে রওনা হবে—সকলেই সেইজন্যে উত্তেজনায় ভেতরে-ভেতরে একধরনের চাপা অস্থিরতা বোধ করছিলেন। কেবল জো ছিলো স্থির ও নির্বিকার।

রাত থাকতেই সবাই ছোটো দ্বীপটায় চ'লে এলো। পূবদিক থেকে হাওয়া আসছে, সগর্বে আকাশে দুলছে বেলুন। ক্যাপ্টেন তাঁর নাবিকদের নিয়ে বিদায় জানাতে

এসেছিলেন, মূল দ্বীপ থেকে কন্সাল এসেছিলেন সদলে । যাত্রার প্রাথমিক কাজ শেষ ক'রে অভিযাত্রীরা সকলের সঙ্গে করমর্দন করলেন ।

কেনেডি আর জো যখন ডক্টর ফার্গুসনের সঙ্গে ঝোলানো *কার*-এ গিয়ে উঠে বসলেন, তখন বেলা ন-টা । যে-নাবিকেরা দড়ি ধ'রে ছিলো তারা আস্তে-আস্তে হাতের মুঠো আলগা ক'রে দড়ি ঢিলে ক'রে দিলে, ধীরে-ধীরে আকাশের দিকে প্রায় কুড়ি ফিট উঁচুতে উড়ে গেলো বেলুনটি । ওপর থেকে ডক্টর ফার্গুসন চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন, 'এই আকাশযানের একটি নাম দেয়া কর্তব্য আমাদের । *ভিক্টরিয়া* নামটাই আমার কাছে সবচেয়ে সংগত ব'লে মনে হচ্ছে ।'

নিচে থেকে সমস্বরে সকলে উল্লসিত কণ্ঠে রানী ভিক্টরিয়ার দীর্ঘ জীবন কামনা ক'রে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো ।

তারপর হঠাৎ প্রবল হাওয়া এলো, থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো বেলুন । ফার্গুসন বললেন, 'আর দেরি নয়, এবার রওনা হওয়া যাক ।' বিদায় জানালেন তিনি সকলকে ।

সঙ্গে-সঙ্গে হাতের দড়ি ছেড়ে দিলে নাবিকেরা, হাওয়ার দমকা বেলুনটির ঝুঁটি ধ'রে একবার চর্কির মতো পাক খাইয়ে দিলে, তারপরেই দ্রুতবেগে বেলুন আকাশে উঠে গেলো । যাত্রীদের চোখে নিচের সবকিছু আচমকা একেবারে ছোটো হ'য়ে গেলো, সব যেন পুতুলের মতো, সব খুদে মাপের, কেবল জাহাজের উঁচু মাস্তুলে ব্রিটিশ পতাকা পৎপৎ ক'রে উড়ছে হাওয়ায় ।

রেজোলিউট জাহাজের মস্ত চারটে কামান বিকটভাবে গর্জন ক'রে উঠলো । তোপ দেগে অভিনন্দন জানানো হ'লো অভিযাত্রীদের ।

পরক্ষণেই *রেজোলিউটের* মাস্তুলের পতাকাটি অভিযাত্রীদের চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেলো । শেষ যখন তাকে দেখা গিয়েছিলো, মনে হয়েছিলো একটি খেলনা-জাহাজ যেন কালো জলের ওপর প'ড়ে আছে । জানজিবার দ্বীপটির এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হয়েছিলো একটি পুতুলের শহরের মতো, কালো মাটির ওপর কতগুলি রেখা আর বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশার মতো মাঠ-ঘাট-পথ, পিঁপড়ের সারির মতো মানুষজন ।

আস্তে-আস্তে তা যখন মিলিয়ে গেলো, নিচে দেখা গেলো কালো সমুদ্রকে—তার অস্থির, চঞ্চল, ফেনিল জল স্থির একটা বিশাল ছবির মতো প'ড়ে থাকলো যেন তলায় ।

৬

নীল আকাশে কেবল তুলোর পাঁজার মতো শাদা মেঘ, তাদের গা থেকে রোদ আর আলো যেন চুঁইয়ে পড়ছে। সূর্য পূর্বদিকে অনেকখানি উঠে এসেছে, আর অনুকূল হাওয়ার গায়ে লেগে আছে তারই উষ্ণ স্পর্শ। *ভিক্টরিয়া* এক দমকে শূন্যে প্রায় দেড় হাজার ফিট উঠে এসে নিমেষের মধ্যে তাঁদের চোখের সামনে *ভীষণ-সুন্দর* আফ্রিকাকে উন্মোচিত ক'রে দিয়েছিলো।

প্রথমে কথা ব'লে উঠেছিলো জো, 'কী চমৎকার দেখাচ্ছে!' এই-প্রথম বোধহয় জীবনে সে নিজের থেকে কথা বললে, আর তার মধ্যে এই-প্রথম তার বিস্ময়ের স্পর্শ পাওয়া গেলো। ফার্গুসন তার কথা শুনে স্মিতভাবে একটু তাকালেন কেবল, তারপর ব্যারোমিটারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নানারকম নোট নিতে লাগলেন। কেনেডি কথাও বললেন না, অন্য-কোনো দিকে তাকালেনও না—মুগ্ধ চোখে অপলকে সব দৃশ্য রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগলেন।

ঘণ্টাদুয়েক বাদে, ঘণ্টায় আট মাইল গতিতে, আফ্রিকার মূল উপকূলে এসে উপস্থিত হ'লো *ভিক্টরিয়া*। বেলুনটিকে খুব নিচে দিয়ে উড়িয়ে নিতে চাচ্ছিলেন ফার্গুসন, কেননা তাতে ভালো ক'রে সব দেখা যাবে। বিশেষভাবে নির্মিত চুল্লির আগুন তাই একটু কমিয়ে দিলেন তিনি। বেলুনের ভেতরকার গ্যাস ক্রমশ সংকুচিত হ'য়ে এলো; আর তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেলুনটি ক্রমে-ক্রমে দেড় হাজার ফিট থেকে নেমে এলো। প্রায় তিনশো ফিট উচ্চতায় এলে পর ফার্গুসন আর তাপ কমালেন না: আপাতত এই উচ্চতা দিয়েই যাক।

আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের উজারামো নামক স্থানের ওপর দিয়ে বেলুন চ'লে গেলো এক মিশকালো গভীর বনের দিকে—সমুদ্রর ফেনিল ঢেউ আছড়ে পড়ছে তীরে, দূরে দিগন্তের কাছে উঁচু পাহাড়ের কালো চূড়োগুলি দেখা যাচ্ছে। ধীরে-ধীরে বন পেছনে ফেলে একটি গ্রামের উপর চ'লে এলো *ভিক্টরিয়া*। মানচিত্র দেখে বোঝা গেলো এই গ্রামের নাম কিজোটু।

গ্রামের লোকেরা বেলুনটাকে দেখতে পেয়েছিলো। বাঁশপাতার ছোটো-ছোটো ঘর থেকে দলে-দলে বেরিয়ে এলো তারা, আকাশের দিকে আবাক চোখ-মুখ তুলে দুর্বোধ্য ভাষায় সমস্বরে এত জোরে চেঁচিয়ে উঠলো যে তার খানিকটা রেশ বেলুনেও এসে পৌঁছুলো। ভয়ে, আতঙ্কে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করলে তারা প্রথমে, তারপরে সন্ত্রাসের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতেই লোকগুলো রেগে উঠলো, তীরধনুক নিয়ে এসে অজস্র তীর ছুঁড়লো বেলুন লক্ষ্য ক'রে, আকাশের দিকে। কিন্তু তাদের সব চেষ্টা নিষ্ফল হ'লো, তাদের বিষের তীর মোটেই বেলুনের কাছে পৌঁছুলোই না, অবলীলাক্রমেই সেই তীক্ষ্ণ তীরগুলির অনেক ওপর দিয়ে বেলুন ভেসে গেলো। তারপর ক্রমে-ক্রমে সেই

গ্রামটিও পেছনে প'ড়ে রইলো, ক্রমে দিগন্তের কালো বন যেন তার রাক্ষুসে বিবরে গ্রামটিকে লুকিয়ে ফেললে ।

এতক্ষণে ডিক কথা বললেন, 'সত্যি কী অদ্ভুত আমাদের এই আকাশযান ! এর কাছে গাড়ি-ঘোড়া, জাহাজ-রেল কিছুই লাগে না, আর-কোনো যানবাহন থেকেই এক নিমেষে চারদিক এমনভাবে দেখে নিতে পারা যায় না । অপূর্ব ! আগাগোড়া ব্যাপারটাই স্বপ্ন ব'লে মনে হচ্ছে আমার কাছে !'

'কেবল তা-ই নয়,' ফার্গুসন যোগ ক'রে দিলেন, 'নিজের চোখেই তো দেখলে, ডাঙার কোনো বিপদ-আপদই শূন্যে এতদূর পর্যন্ত এসে পৌঁছোয় না । এখন নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছো, কেন আমি বেলুনে ক'রে যাবার পরিকল্পনা করেছিলুম । যদি তোমার কথা শুনে স্থলপথে যেতুম তাহ'লে কত সময় যেতো আর কত হাজার রকম ঝামেলা পোহাতে হ'তো, তা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছো ?'

'আমি তখন এতটা বুঝতে পারিনি,' ডিক বললেন, 'তার জন্যে আমার খুব-একটা দোষ নেই । এর আগে কে আর ভাবতে পেরেছিলো যে মানুষ একদিন আকাশ জয় ক'রে নেবে যেমনভাবে জয় করেছে জলকে । জলের জাহাজের মতো তৈরি হবে শূন্যের জাহাজও !'

ফার্গুসন কেবল একটু হাসলেন ।

জো জিগেস করলে, 'এখন কি নাস্তার ব্যবস্থা করবো ? জলযোগের উদ্যোগ?'

'তাই-তো, জো বলাতেই জঠর জানান দিচ্ছে যে বেশ খিদে পেয়েছে ।' কেনেডি ব'লে উঠলেন : 'তাহলে আর দেরি কোরো না, চটপট তোমার ব্যবস্থা ক'রে ফ্যালো, জো ।'

'না-না, দেরি কেন হবে ? বিস্কুট তো আছেই, টিন থেকে একটু শুকনো মাংস বের ক'রে নিলেই হবে । তাছাড়া কফিও সঙ্গে প্রচুর আছে । বানাতেও কোনো অসুবিধে হবে না । ওই চুল্লিটা থেকে যত-খুশি জল গরম ক'রে নিতে পারা যাবে । আলাদা ক'রে আগুন জ্বালাবার কোনো দরকার নেই, তাতে বরং খামকা বিপদ ডেকে আনা হবে ।'

ফার্গুসন এত নির্দেশ না-দিলেও পারতেন জো-কে । সে চক্ষের পলকে সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছে ।

খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার সবাই নিচে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন ঘন সবুজ গাছ আর স্নিগ্ধ শস্যের খেত । এই সবুজের ভেতর প্রাণের আয়োজন কী বিপুল-প্রচুর— যেন উদ্দাম সবুজের বন্যা ! এমন উর্বর জমি আর-কোথায় পাওয়া যাবে ? প্রকৃতি যেন মানুষের হাতে ফসলের রাশি তুলে দেবার জন্যে উশখুশ করছে, এতটুকু চেষ্টাতেই যে-কেউ ওখানে সোনা ফলাতে পারবে । এই শস্যশ্যামল কালো মাটির গায়ে কোথাও তামাক গাছের সারি, কোথাও-বা ভারতীয় শস্য, বার্লি, ধান গাছের প্রাচুর্য, অজস্র কলা, খেজুর ও নারকেল প্রভৃতি নানা গাছ উঁচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে, মাঝে-মাঝে ছোটো-ছোটো

পাহাড়, কোনোখানে আবার এমনসব গাছের সারি, যাদের কাউকেই তাঁরা চেনেন না।

'দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড ওই গাছগুলোর নাম কী ? কী মস্ত ঐ গাছগুলো, দেখেছো ? এর গোটাকয়েকেই তো এমন-এক বিশাল বন তৈরি হ'য়ে যাবে, যেখানে সূর্যের আলো পর্যন্ত ভেতরে পৌঁছুতে পারবে না। কী নাম এগুলোর, জানো ?'

'এ-গাছের নাম *বাওবাব,*' ফার্গুসন উত্তর দিলেন, 'এখানকার ভাষায় এর অন্য-একটা নাম আছে। এ-দেশের আদি বাসিন্দারা একে বলে *বাঁদুরে রুটি* গাছ। ওই দ্যাখো আরেকটা কী মস্ত গাছ—ওটা প্রায় একশো ফিট মোটা হবে।'

আফ্রিকার পুবদিকে ভারত সাগরের মধ্যে মোম্বাসা হচ্ছে একটি ছোটো দ্বীপ, তার বাসিন্দার সংখ্যা প্রায় হাজার চল্লিশ। হাতির দাঁত, চামড়া আর রবারের ব্যাবসার জন্যে এই দ্বীপে অনেক লোক আনাগোনা করে। বহুদিন থেকেই দ্বীপটি ইতিহাসবিখ্যাত হ'য়ে আছে। ১৪৯০ সালে বিখ্যাত নাবিক ভারত-আবিষ্কারক ভাশ্‌কু-ডা-গামা এখানে এসেছিলেন। সেই সময় একজন আরব সর্দার তাঁকে জাহাজশুদ্ধু ডুবিয়ে মারার চক্রান্ত করেছিলো। দৈব সহায় ছিলো ব'লে কোনো গতিকে এই চক্রান্তের কথা আগেই জেনে গিয়েছিলেন ভাশ্‌কু-ডা-গামা, আর জেনেই মহা খাপ্পা হ'য়ে মোম্বাসাকে তিনি তোপের মুখে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু এখানকার সুলতান অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে তাঁকে ঠাণ্ডা করেন। মোম্বাসার প্রধান রাজপথ ভাশ্‌কু-ডা-গামা স্ট্রিট আজও এই *অবিস্মরণীয়* নাবিকের স্মৃতি বহন করছে। মোম্বাসা শহর প্রতিষ্ঠিত হয় প্রায় হাজার বছর আগে, কিন্তু শহরটি যে তার চেয়েও ঢের পুরোনো, তা এখানে-আবিষ্কৃত প্রাচীন চিন, মিশর ও পারস্য দেশের অনেক জিনিশ দেখে বোঝা যায়। ১৫০৫ থেকে ১৭২৯ সাল পর্যন্ত এই দ্বীপটি ছিল পুর্তুগিশদের অধীনে—এই নিয়ে আরবদের সঙ্গে পুর্তুগিশদের অনেকবার লড়াইও হ'য়ে গিয়েছে। ১৬৯৬ সালের মার্চ মাস থেকে সুদীর্ঘ সোয়া তিন বছর ধ'রে পুর্তুগিশরা আরবদের দ্বারা এই দ্বীপে অবরুদ্ধ হ'য়ে থাকে ; পুর্তুগাল থেকে সাহায্য পাবার আশায় অবরুদ্ধ পুর্তুগিশরা প্রাণপণে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আশা সফল হয়নি। দুর্ধর্ষ আরবদের তলোয়ারের মুখে পুর্তুগিশদের আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণ যায় ; কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর ঠাট্টা যে কত নিদারুণ হ'তে পারে তাই প্রমাণ দেবার জন্যে, সেই হত্যাকাণ্ডের ঠিক দু-দিন পরেই পুর্তুগাল থেকে সাহায্য এসে উপস্থিত হয়। কিছুদিন পরে মোম্বাসা আবার পুর্তুগিশদের হাতে গেলেও তাদের সেই প্রাধান্য স্থায়ী হ'তে পারেনি। মোম্বাসা এখন জানজিবারের সুলতানের অধীনে। আফ্রিকার বিপুল অভ্যন্তরে কত-যে গভীর জঙ্গল, দুর্গম গিরিমালা ও বিজন মরুভূমি লুকিয়ে আছে মোম্বাসাকে দেখলে তা কিছুই মনে হয় না।

সম্ভব হ'লে জানজিবার থেকে মোম্বাসা হ'য়েই যেতেন অভিযাত্রীরা। কিন্তু জানজিবার থেকে বেলুন হাওয়ার তাড়নে আফ্রিকার উপকূলে গিয়ে পৌঁছুলো—হাওয়ার গতি ছিলো উত্তর-পশ্চিম দিকে। বোঝা গেলো বেলুন মোম্বাসার ঠিক ওপর দিয়ে যাবে না বটে, তবে তার কিছু দূর দিয়ে তাকে অতিক্রম ক'রেই ভিক্টরিয়া হ্রদের ধার ঘেঁসে

নীলনদের দিকে চ'লে যাবে ।

বিষুবরেখার নিকটবর্তী অঞ্চল ব'লে এখানকার দিন আর রাতের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি । দিনের বেলা বেশ গরম, সকালে-সন্ধেয় থাকে আরামদায়ক উষ্ণতা , আর রাতে ঠাণ্ডা পড়ে । দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের উঁচু এলাকায় উচ্চতার জন্যে উত্তাপ কিছু কম থাকে —কিন্তু যত উত্তরে যাওয়া যায় গরমের প্রবলতা ততই বেশি । এ-দেশের বেশির ভাগ জায়গার জলবায়ুই হচ্ছে চরম প্রকৃতির—অনেকটা মরা ধুলোর মরুভূমির মতো—তেমনি উগ্র আর পরস্পর-বিরোধী আবহাওয়া ।

যে-সব জায়গায় বৃষ্টিপাত তুলনায় বেশি, সেখানেই বনভূমি দুর্গম । সেই বনে আছে রুপোলি ইউক্যালিপটাস, কর্পূর, দেবদারু আর বাঁশের ঝাড় । কোনোখানে আবার সিডার গাছের দীর্ঘ বন । মরুভূমির স্পর্শলাগা অঞ্চলে রয়েছে নানা রঙের গুল্ম আর চারাগাছের ঝোপ । কোনো-কোনো এলাকায় কফি আর চায়ের চাষ হয় ।

সন্ধে সাড়ে ছটায় *ভিক্টরিয়া* ডাথুমি নামক পর্বতের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হ'লো । এই পর্বত অতিক্রম করার জন্যে আরো তিনশো ফিট উঁচুতে তুলতে হবে বেলুনকে, ফার্গুসন সেইজন্যে তাঁর চুল্লির তাপ আঠারো ডিগ্রি বাড়িয়ে দিলেন । দেখতে-দেখতে ওপরে উঠে গেলো বেলুন, অনায়াসেই ডিঙিয়ে গেলো সেই উঁচু পর্বত ।

ওপরে যত তাড়াতাড়ি ওঠা যায়, নিচে নামতে তার চেয়ে ঢের বেশি সময় লাগে। নামতে-নামতে একসময় *কার* থেকে নোঙর নামিয়ে দেয়া হ'লো । একটি বিরাট *বাওবাব* গাছের ডালে সেটি ভালোভাবে জড়িয়ে যেতেই বেলুন থেমে গেলো, সঙ্গে-সঙ্গে দড়ির মই নামিয়ে দিয়ে জো নিজে নেমে এসে নোঙরটাকে ভালো ক'রে ডালের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিলে, তারপর সেই রেশমি মই বেয়ে আবার *কার*-এ উঠে এলো । বেলুন নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলো, পুবদিকে পাহাড়ের আড়াল থাকায় হাওয়ার চাপ লাগলো না তার গায়ে, আর তাই থেমে গেলো তার কাঁপুনিও ।

রাতের মতো বিশ্রাম এখানে ।

হিংস্র বনভূমির কালো রাত, ঠাণ্ডাও বেশ পড়েছে । কত-রকম অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কা থাকতে পারে, তার ঠিক নেই । কাজেই সাবধানে থাকার জন্যে ঠিক করা হ'লো পালা ক'রে তিনজনে সারারাত পাহারা দেবেন । ফর্গুসন দেবেন নটা থেকে বারোটা, কেনেডি বারোটা থেকে তিনটে, আর জো বাকি সময়টুকু—সকাল ছ-টা পর্যন্ত ।

রাতের খাওয়া সাঙ্গ ক'রে খানিকক্ষণ নানা বিষয়ে আলোচনা ক'রে কেনেডি কম্বল-মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন, জো-ও তাই করলে ; কেবল ফার্গুসন অতন্দ্র পাহারায় জেগে ব'সে থাকলেন ।

৭

রাত কেটে গেলো নিরাপদেই, কিন্তু পরদিন—সেদিন শনিবার—কেনেডি উঠলেন বিষম জ্বর নিয়ে। প্রথমটায় ফার্গুসন ভেবেছিলেন, বুঝি-বা উষ্ণ জঙ্গলের জ্বর আক্রমণ করেছে তাঁকে, কিন্তু একটু পরেই যখন বুঝতে পারলেন যে জ্বর ততটা গুরুতর নয়, তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে কেনেডিকে যখন চাঙা ক'রে তোলা হ'লো, তখন কিন্তু অস্বস্তি এলো নতুন দিক দিয়ে।

সূর্য ওঠবার খানিকক্ষণ পরেই আকাশের সকল কোণে কে যেন মিশকালো এক চাদর বিছিয়ে দিলে; প্রথমটায় ছিলো আলকাৎরার মতো কালো একটুকরো মেঘ, দেখতে-না-দেখতে তা সারা আকাশে ছড়িয়ে গেলো আর অন্ধকার ক'রে এলো চারদিক। ঘন-ঘন চমকালো বিদ্যুৎ যেন আলোর এক-একটি আঁকাবাঁকা তীব্র সাপ পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরেছে মেঘকে; বিদ্যুৎ-দিয়ে-চেরা মেঘখানি ক্রমেই এমনভাবে এগিয়ে এলো যে মনে হ'লো বিরাট এক কালো রঙের ড্র্যাগন তার আগুনের দাঁত বার ক'রে সারা আকাশকে কামড়ে, ছিঁড়ে, চিবিয়ে গিলে ফেলতে চাচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত আকাশ মেঘে-মেঘে চাপা প'ড়ে গেলো, বাজ ফাটলো গুরুগুরু আর বাজের সেই গড়ানে আওয়াজ শুনে যেই ঝড়ের ঘুম ভাঙলো, অমনি বনের যত গাছপালা পাগল হ'য়ে তাণ্ডব নাচ শুরু ক'রে দিলে।

দীর্ঘ একটি তীব্র আলোর রেখা তারপর জেগে উঠলো, কোনো মস্ত গাছের মতো ধীরে-ধীরে তা গজিয়ে উঠলো যেন আকাশে, আর আগুনের ডালপালা কেঁপে এঁকেবেঁকে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে শুরু ক'রে দিলে। মনে হ'লো তারা যেন কোনো অশরীরীর অদৃশ্য দেহের আগুনজ্বালা শিরা-উপশিরা। মেঘের রং যে এত কালো হ'তে পারে, আর বিদ্যুতের তীব্র তলোয়ার যে এত ক্ষিপ্র হ'তে পারে, আর এমন ভীষণ-গম্ভীর আওয়াজ ক'রে যে আলো ফেটে পড়তে পারে ফার্গুসনরা কেউই তা আগে জানতেন না। কিন্তু এই *ভয়ানক সুষমা* উপভোগ করার সময় তখন ছিলো না। তক্ষুনি যদি নোঙর খুলে বেলুনকে আকাশে ওড়ানো না-যায়, তাহ'লে যে-কোনো মুহূর্তে বেলুনের ক্ষতি হ'তে পারে!

ফার্গুসনের নির্দেশে সেই বিষম ঝড়ের মধ্যেই নোঙর তুলে যাত্রা শুরু ক'রে দেয়া হ'লো। প্রায় ছ-শো ফিট উঠে আসার পর পাওয়া গেলো প্রয়োজনীয় অনুকূল বাতাস, নিচে তখন রাগি ঝড় প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসছে। উত্তর-পশ্চিমমুখো বাতাস বইছে, বেলুন তার পথ ধ'রে শূন্যে অগ্রসর হ'লো।

'এবারে আমরা যার সম্মুখীন হচ্ছি,' ফার্গুসন জানালেন, 'তার নাম রুবি-হো পর্বত —এ-দেশের লোকেরা তার নাম দিয়েছে *হাওয়ার পথ*। ঐ পাহাড়ের চুড়ো উঠে গেছে শূন্যে, কাজেই সেটা পেরুতে হ'লে আমাদের অনেক উচ্চতায় ওঠবার ব্যবস্থা করতে

হবে। আমার কাছে যে-মানচিত্র রয়েছে, তাতে যদি তথ্যসংক্রান্ত কোনো গলদ না-থাকে, তাহ'লে এখন প্রায় পাঁচ হাজার ফিট উঠতে হবে আমাদের ; কাজেই সেই অনুযায়ী চুল্লির আঁগুনকে আরো গনগনে ক'রে তুলতে হবে।'

চুল্লির লাল ঘুলঘুলির ভেতর গিয়ে দেখা গেলো, ভেতরের স্বচ্ছ অগ্নিশিখা আরো-স্বচ্ছ হ'য়ে এলো ক্রমশ, উত্তাপ বেড়ে চললো প্রবল হারে, আর তার ফলে হালকা হ'য়ে ছড়িয়ে গেলো গ্যাস, বেলুন ফুলে উঠলো আগের চেয়ে অনেক বেশি, আর তরতর ক'রে উঠতে লাগলো ওপর দিকে। হাওয়ার জোরালো টানে অচিরেই সেই তুষার-ঢাকা পাহাড়ের তীক্ষ্ণ শ্বেত চুড়ো পেরিয়ে গেলো *ভিক্টরিয়া*, তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই রুবি-হো-র অন্য দিকে উশাগারা প্রদেশের মাটিতে এসে নামানো হ'লো বেলুন। কাছেই কালো একটি বন দেখা যাচ্ছে। যদি সেখানে কোনো শিকার মেলে, তবে তা-ই দিয়েই রাতের খাবার চালানো যাবে। কেননা অকারণে সঙ্গের খাবার তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ফেলার কোনো মানে হয় না ; তাছাড়া ক্রমাগত বাসি খাবার গলাধঃকরণ করা স্বাস্থ্যের পক্ষেও খারাপ, সেদিক দিয়ে টাটকা মাংসের চেয়ে উপকারী খাবার আর কী আছে।

ফার্গুসন তাঁর পরিকল্পনার কথা কেনেডিকে খুলে বললেন। 'তুমি বরং জো-কে সঙ্গে নিয়ে বন্দুক কাঁধে বেরিয়ে পড়ো—যদি দু-একটা হরিণ শিকার করতে পারো, তাহ'লে তোফা নৈশভোজের ব্যবস্থা করা যায়। তাছাড়া তোমারও বন্দুকের হাত যাতে খারাপ না-হয়, সেজন্যও মাঝে-মাঝে শিকারের ব্যবস্থা ক'রে চর্চার সাহায্যে তাকে শানিয়ে নেয়াও দরকার। আফ্রিকায় এসে যদি শিকারই না-করলে তো তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আসার সার্থকতা কী রইলো ?'

আর দেরি করলেন না কেনেডি, তক্ষুনি জো-কে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু দূরেই সেই কালো গভীর বন : মস্ত *বাওবাব*, রুপোলি ইউক্যালিপটাস আর হলদে *পোডোকার্পাস* ছাড়া *গাম* নামক একজাতীয় গাছ সেখানে আছে, ঝোপঝাড়ও অসংখ্য। খুব সাবধানে হুঁশিয়ারভাবে কেনেডি জো-কে নিয়ে এগুতে লাগলেন। ভীষণ বন ! ভালো ক'রে ভেতরে ঢুকতে-না ঢুকতেই কাঁটাঝোপের তীক্ষ্ণ আক্রমণে কেনেডি আর জো-র পোশাক ছিঁড়ে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেলো। এমন অসময়ে এই দুর্গম বনে মানুষকে ঢুকতে দেখে বানর আর পাখির দল অবাক হ'য়ে আরো জোরে কলরব ক'রে উঠলো।

গাছের ফাঁকে একটু ফাঁকা-মতো জায়গা ; হলদে-কালোয় ডোরাকাটা একদল জিব্রা ছুটোছুটি করছিলো, হঠাৎ বেবুনদের তীব্র শোরগোল শুনে চমকে তারা দৌড় দিয়ে বনের দূর কিনারে উধাও হ'য়ে গেলো। কয়েকটা বেঢপ জিরাফ তাদের অদ্ভুত গলা বাড়িয়ে গাছের আগডাল থেকে পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছিলো, জিব্রাদের তীব্র গতি দেখে তারাও ছুটে পালাতে শুরু ক'রে দিলে। এই জিরাফদের ছুটে পালাবার ভঙ্গি এমন কিম্ভূত আর বেয়াড়া যে কেনেডি তা দেখে না-হেসে থাকতে পারলেন না।

হঠাৎ ঠোঁটের ডগায় আঙুল তুলে ডিক কেনেডি 'শ্-শ্-শ্' ব'লে আওয়াজ ক'রে

উঠে জো-কে কোনো আওয়াজ না-করতে ইশারা করলেন। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা গেলো ছোটো-একটি জলস্রোত কালো মাটির ওপর আঁকাবাঁকা রুপোলি রেখা এঁকে ছলছল ক'রে ব'য়ে চলেছে, আর সেখানে কতগুলি ছোটো-বড়ো হরিণ জল পান করছে।

নিঃশব্দে বন্দুক উঁচিয়ে ডিক গাছের ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য স্থির করলেন। তারপরেই প্রবল আওয়াজ ক'রে আগুন ফেটে পড়লো, তীব্র দ্রুত নীল একটি শিখা ক্ষীণ রেখা এঁকে হরিণদের দিকে ছুটে গেলো। চক্ষের পলকে হরিণেরা সবাই উধাও হ'য়ে গেলো: ত্রাস, চমক, আতঙ্ক—সব তাদের মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় ক'রে তুলেছিলো, কিন্তু বন্দুকের ঘোড়ায় আবার চাপ দেবার আগেই একটি হৃতপ্রাণ হরিণ ছাড়া সেই জলস্রোতের আশপাশে আর-কেউ রইলো না। হরিণটির কাঁধে গুলি বিঁধেছে, মাটিতে প'ড়ে চার-পা শূন্যে তুলে একটু ছটফট ক'রে সে নিঃসাড় হ'য়ে গেলো।

প্রশংসাভরা গলায় জো ব'লে উঠলো, 'চমৎকার গুলি করেছেন; অদ্ভুত টিপ--অব্যর্থ!'

হরিণটির দিকে এগিয়ে গেলেন ডিক। তারপর যখন জো তার চামড়া ছাড়িয়ে কিছু মাংস কাটতে ব্যস্ত, এমন সময় অনেক দূর থেকে একটি বন্দুকের আওয়াজ ভেসে এলো। চটপট কিছু মাংস কেটে নিলে জো, তারপর দু-জনেই তাড়াহুড়ো ক'রে বেলুনের দিকে ফেরবার জন্যে দৌড় শুরু ক'রে দিলেন, আর এমন সময় আবার আরেকটি গুলির শব্দ দু-জনের কানে এসে পৌঁছুলো।

'আরো তাড়াতাড়ি!' ছুটতে-ছুটতে ব'লে উঠলেন ডিক, 'নিশ্চয়ই ফার্গুসনের কোনো বিপদ হয়েছে!'

একটুক্ষণের মধ্যেই কালো বনের জটিলতা ছাড়িয়ে এলেন ডিক, জো এলো তাঁর পেছন-পেছন; আর বন ছাড়িয়ে এসেই দু-জনের চোখে পড়লো বেলুনটি, ডিক দেখলেন ফার্গুসন *'কার'*-এর ওপর দাঁড়িয়ে আছেন।

'সর্বনাশ হয়েছে!' সেদিকে তাকিয়েই আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো জো।

'কী হয়েছে? কী?' রুদ্ধশ্বাসে জিগেস করলেন ডিক।

'মস্ত একদল *কালো* মানুষ—*কাফ্রি* বলে তো ওদের, তা-ই না?—আমাদের বেলুন ঘিরে ফেলেছে!'

বনের সীমান্ত থেকে বেলুনটি প্রায় মাইল-দুয়েক দূরে। দূর থেকে দেখা গেলো খুদে-খুদে একদল *কাফ্রি* চারদিক থেকে বেলুনটিকে ঘিরে ফেলেছে। যে-গাছে *ভিক্টরিয়াকে* নোঙর করা হয়েছিল, সে-গাছেও কয়েকজন লোক উঠে পড়েছে। মগডালেও দেখা যাচ্ছে কালো-কালো ফুটকির মতো কয়েকজনকে।

রুদ্ধশ্বাসে ছুটলেন ডিক। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখার মতো এক মুহূর্তও সময় নেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই মাইল-খানেক পথ ছুটে পেরিয়ে এলো দু-জনে, আর এমন সময় আবার চারদিক কাঁপিয়ে ফার্গুসনের হাতে বন্দুক গর্জন ক'রে উঠলো। গুলির আওয়াজ শুনে ডিক তাকিয়ে দেখলেন গাছের মগডাল থেকে কালো একটি মানুষ ডাল থেকে

ডালে ঘুরে-ঘুরে. নিচের দিকে প'ড়ে যাচ্ছে। মাটি থেকে যখন সে প্রায় কুড়ি ফিট উঁচুতে হঠাৎ ডিগবাজি খেয়ে সার্কাসের ওস্তাদ খেলোয়াড়ের মতো একটা ডাল ধ'রে সে ঝুলে পড়লো, আর তার পা দুটি শূন্যে ঝুলতে লাগলো।

হঠাৎ জো সশব্দে হেসে উঠলো। 'আরে দেখুন, দেখুন, মিস্টার কেনেডি, ওটা ল্যাজ দিয়ে ডালটা জড়িয়ে ধ'রে ঝুলছে! এ-যে দেখছি কালো মতো একটা বাঁদর। আরে, তা-ই তো—ভারি অবাক কাণ্ড তো। সবগুলোই তো বাঁদর! ছি-ছি, আমরা কিনা তাদের *কাফ্রি* ব'লে ভুল করে বসেছিলুম।'

আসলে ওগুলো ছিলো একপাল কুকুরমুখো বাঁদর যাদের বেবুন বলা হয়। ভীষণ হিংস্র স্বভাব—এরা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে কেবল যে ভয়ই দেখায় তাই নয়, বাঁদুরে বুদ্ধির উৎকট ব্যবহারে অনেক সময় মানুষকে একেবারে নাজেহাল ক'রে তোলে। দেখতে এত বিকট যে দস্তুরমতো ভয় করে। শেষকালে অবশ্য আরো-কয়েকটি গুলি খেয়ে ঐ বেবুন-বাহিনী দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বিশ্রী আওয়াজ করতে-করতে পালিয়ে গেলো আর স্মৃতিচিহ্ন হিশেবে পেছনে কয়েকজন মৃত সঙ্গীকে রেখে গেলো তারা।

আর তার পরক্ষণেই জো-র সঙ্গে-সঙ্গে কেনেডিও *ভিক্টরিয়ার* কাছে এসে পৌঁছুলেন।

অল্পক্ষণ পরেই আবার নোঙর তুলে দেয়া হ'লো। আকাশে উঠে এসে অনুকুল বাতাস পেলে *ভিক্টরিয়া,* যথারীতি ভেসে চললো পশ্চিম দিকে। বেলা তখন গড়িয়ে এসেছে, প্রায় চারটে বাজে।

সন্ধে সাতটার সময় *ভিক্টরিয়া* কায়মি নদীর উপত্যকা পেরিয়ে এলো। সেই উপত্যকার পরেই মাইল-দশেক জুড়ে সমতল ভূমি : বেশ কতগুলো গ্রাম বাওবাব আর অন্যান্য গাছের ফাঁকে লুকিয়ে আছে। নোংরা এক-একটি গ্রাম, তাদের কুঁড়েঘরগুলি যেমন নড়বোড়ে তেমনি ভাঙাচোরা, বাসিন্দারাও তেমনি গরিব ও শ্রীহীন। ওরই মধ্যে একটা বাড়ির জৌলুশ আর জাঁকজমক আছে, উগোগোর সুলতান সেটায় থাকেন। অন্য অনেক অঞ্চলের চেয়ে এরা অপেক্ষাকৃত *সুসভ্য,* প্রাণপণে নিজেদের অবস্থা ফেরাবার চেষ্টা করছে।

কানেয়েসি উপত্যকা অতিক্রম করতেই সমতলভূমি শেষ হ'য়ে আবার শুরু হ'লো উঁচু-নিচু পাহাড়ি জায়গা। বেলুন কখনও চলেছে বনের ওপর দিয়ে, কখনও তার তলায় দেখা যাচ্ছে ছোটো-বড়ো পাহাড়ের কালো চূড়ো, কখনও-বা রেশমি শাদা সুতোর মতো আঁকাবাঁকা জলধারা, কখনও-বা কেবল ধূ-ধূ করা দিগন্তজোড়া মাঠ। সেই পাহাড়ি এলাকা শেষ হ'তেই আবার দেখা গেলো মাইল-মাইল জুড়ে প'ড়ে আছে সবুজ মাঠ, শ্যামলতায় ছাওয়া। ধীরে-ধীরে সন্ধে গাঢ় হ'য়ে রাত ক'রে এলো। সে-রাত্রে আর বেলুন থামিয়ে কোথাও রাত্রিবাস করার চেষ্টা করলেন না ফার্গুসন, বেলুন একটানা উড়েই চললো।

৮

প্রবল এক বাতাসের বেগে উত্তর-পুব কোণের এক পাথুরে প্রদেশের উপর দিয়ে যখন *ভিক্টরিয়া* পরদিন সকালে উড়ে চলছিলো, তখন ফার্গুসনের ঘুম ভাঙলো। রাতে যখন তাঁর ঘুম আসে তখন বেলুন যাচ্ছিলো এক বনের ওপর দিয়ে। তারপর ঘুমের ভিতর কখন যে এই নতুন এলাকার ওপর বেলুন চ'লে এসেছে, তা আর তিনি টের পাননি। চারদিকেই উঁচু-নিচু লাল পাথরের বন্ধুর সমারোহ—অনেকটা কবরখানার সমাধিফলকের মতো দেখতে। চোখা, থ্যাবড়া, তিনকোণা, পাঁচকোণা—নানা আকারের পাথর, দিনের বেলার স্বচ্ছ রোদ তাদের ওপর ঝলমলে আলো ফেলেছে।

এখন তাঁরা *কাজে* থেকে একশো মাইল দূরে। *কাজে* আফ্রিকার একটি নামকরা প্রদেশ। সমুদ্রতীর থেকে প্রায় সাড়ে-তিনশো মাইল দূরে তার অবস্থান, কিন্তু তবু তা ব্যাবসা-বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি সংগমস্থলে তার উপস্থিতি ব'লে উটের বহর নিয়ে সদাগরেরা আসে নানা দিক থেকে বিবিধ পণ্যসম্ভার নিয়ে— হাতির দাঁতের জিনিশ, তুলো, পোশাক-আশাক, কাচের মালা, এ-সব তো বটেই, তার ওপরে এখানে আবার ক্রীতদাসও বেচা-কেনা হয়।

বেলা দুটো নাগাদ বেলুন *কাজে* পৌঁছুলো। ফার্গুসন বললেন, 'সেদিন সকাল ন-টায় সময় আমরা জানজিবার ছেড়ে রওনা হয়েছি, আর দু-দিন পরেই আজ কি না পাঁচশো মাইল দূরে *কাজে*-তে এসে উপস্থিত হয়েছি! দেখেছো, বেলুনের আশ্চর্য ক্ষমতা!'

সীমানা-ঘেরা কতগুলি ছাউনির সমষ্টি, মাঝে-মাঝে বাঁশপাতা আর মাটির তৈরি অনেক কুঁড়েঘর। এখানকার আদি বাসিন্দারা আর ক্রীতদাসেরা এ-সব ছাউনি আর কুঁড়েঘরে থাকে; ছাউনির সামনে উঠোনের মতো একেক টুকরো জায়গা, তাতে নানা জাতের ফসল ফ'লে আছে।

একদিকে বাজার—কেনাবেচার বেসাতি, লোকজনের হৈ-চৈ আর শোরগোলে সরগরম। অনেক লোক বাজারে, তারা আবার নানা জাতের; সবাই যেন একসঙ্গে কথা বলছে, তাই এই চ্যাঁচামেচি একেবারে অবোধ্য। ঢাক আর বাঁশির অদ্ভুত আওয়াজ, খচ্চরের ডাক, গাধার বিকট চীৎকার মেয়েগলার রিনরিনে আওয়াজ, শিশুদের কোলাহল—এইসব তো আছেই, কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে উটের বহরের সর্দারের তর্জন-গর্জন, আর এই মিশ্র শব্দের প্রবলতায় জায়গাটা যেন জাহান্নামের কোনো মেলার মতো হ'য়ে উঠেছে।

হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে এই ভীষণ শোরগোল স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। অবাক চোখে সবাই তাকিয়ে রইলো আকাশের দিকে। বিশাল *ভিক্টরিয়া* মন্থর গতিতে তাদের দিকে ভেসে আসছে দেখে বাজারের সেই লোকজনেরা বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেলো। কিন্তু বেলুনটি

যখন তারপর সোজাসুজি মাটির দিকে নেমে আসতে লাগলো, তখন নিমেষের মধ্যে সেখনকার আবালবৃদ্ধবনিতা, মরুভূমির সদাগর, আরব, ও নিগ্রো ক্রীতদাস—সবাই আতঙ্কে ভয়ে মুহ্যমান হ'য়ে আশপাশের কুটিরগুলোর ভিতর গিয়ে লুকিয়ে পড়লো।

কেনেডি ব'লে উঠলেন, 'কিন্তু, ফার্গুসন, ওরা সকলেই যদি এভাবে ভয় পায়, তাহ'লে ওদের কাছ থেকে জিনিশপত্র কেনাকাটা করবো কী ক'রে ?'

'ও কিছু নয়,' ফার্গুসন উত্তর দিলেন, 'ওদের এই ভয় নেহাৎই সাময়িক। সংস্কার খুব প্রবল বটে, কিন্তু কৌতূহলের ক্ষমতা তার চেয়ে ঢের বেশি—ঐ কৌতূহলই ওদের আবার ঘর থেকে বের ক'রে আনবে। তবে আমাদের কিন্তু খুব সাবধান থাকতে হবে, খুব হুঁশিয়ার, একটুও অসতর্ক থাকলে চলবে না। খুব সাবধানে এগুতে হবে ওদের কাছে, কেননা তীরধনুক অথবা বন্দুকের গুলির হাত থেকে বাঁচবার কোনো উপায়ই আমাদের নেই। ঐ দুটি পদার্থের কাছে আমাদের বেলুন কিন্তু বড্ড অসহায়।'

'তুমি কি এদের সঙ্গে আলাপ করতে চাও নাকি ?'

'তোমার কথায় মনে হচ্ছে তুমি যেন বিশ্বাস করতে পারছো না। কিন্তু আলাপ করলেই বা কী দোষ ? দেখাই যাক না।'

ভিক্টরিয়া আস্তে-আস্তে নিচের দিকে নেমে এসে বাজার থেকে বেশ-খানিকটা দূরে একটি গাছের মাথায় নোঙর ফেললো।

আস্তে-আস্তে সেই ভয়-পেয়ে-লুকিয়ে-থাকা জনতার হারানো সাহস বোধহয় ফিরে এলো ; একে-একে তারা বেরিয়ে এলো খোলা জায়গায়। সারা শরীরে বিদঘুটে উল্কি-আঁকা শঙ্খের মালা পরা ওয়াগোগো জাতের কিছু লোক প্রথমে এগিয়ে এলো—এরা সব হ'লো ডাইনি-পুরুৎ। নারী, শিশু ও অন্য-সবাই এলো তাদের পেছনে-পেছনে। প্রবলভাবে বেজে উঠলো ঢাক আর শিঙা, আর তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে বার-বার প্রচণ্ড করতালি দিতে শুরু ক'রে দিলে—মাঝে-মাঝে হাত বাড়িয়ে দিলে শূন্যের দিকে।

ফার্গুসন বললে, 'ওদের ধরন-ধারণ দেখে বোঝা যাচ্ছে, ওরা আসলে অনুগ্রহ প্রার্থনা করছে—এ-সবই ওদের প্রার্থনার ভঙ্গি। আমার আন্দাজ যদি ঠিক হয়, তাহ'লে এবার আমাদের বোধহয় কিছুটা অভিনয় করতে হবে।'

এমন সময় সেই ডাইনি-পুরুতেরা পিছন দিকে হাত তুলে কী যেন ইশারা করলে, অমনি সব চ্যাঁচামেচি যেন জাদুবলে স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। পুরুৎদের মধ্য থেকে দু-জন এগিয়ে এলো বেলুনের আরো-কাছে, তারপর উত্তেজিতভাবে এক অজ্ঞাত দুর্বোধ্য ভাষায় ফার্গুসনদের তড়বড় ক'রে কী যেন ব'লে গেলো। বুঝতে না-পেরে ফার্গুসন আরবি ভাষায় কোনোরকমে কিছু বলতেই তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্য থেকে সেই ভাষায় উত্তর এলো।

আরবি ভাষায় একটানা অনেক-কিছু বললে লোকটি। তার বক্তব্য শুনে মোটামুটি ফার্গুসন বুঝতে পারলেন যে এখানকার লোকেরা *ভিক্টরিয়াকে* চাঁদ ব'লে ভেবেছে

—আর তারা চাঁদেরই উপাসনা করে, ফলে চাঁদ স্বয়ং যেহেতু তাঁর তিন পুত্রকে নিয়ে করুণাবশত তাদের এই উষ্ণ দেশকে দর্শন দিয়ে ধন্য করতে এসেছেন, এই পুণ্য দিবসের কথা তাই পুরুষানুক্রমে তারা সবাইকে গেয়ে শোনাবে। তারপর সে সম্ভ্রমে প্রায় আভূমি নত হ'য়ে সশ্রদ্ধ মিনতি জানালে যে, চাঁদের এই তিন পুত্র যদি অসীম কৃপায় তাদের মাটিতে পদধূলি দেন, তাদের সুলতান নাকি আবার কয়েক বছর ধ'রে এক মরণাপন্ন অসুখে ভুগে-ভুগে প্রায় মুমূর্ষু হ'য়ে আছেন— যদি দর্শন দিয়ে তাঁকে নিরাময় ক'রে যান, তাহ'লে তারা চিরবাধিত হ'য়ে ধন্য বোধ করবে।

লোকটির সব কথার সারমর্ম সঙ্গীদের ইংরেজিতে তর্জমা ক'রে জানালেন ফার্গুসন।

'এই কাফ্রি সুলতানের কাছে সত্যি যাবে নাকি তুমি?' অবাক গলায় শুধোলেন ডিক।

'নিশ্চয়ই!' ফার্গুসন বললেন, 'লোকগুলোকে তো ভালো ব'লেই মনে হচ্ছে। তাছাড়া আবহাওয়াও এখন বেশ শান্ত, কাজেই *ভিক্টরিয়ার* জন্যে আমাদের ভাবনার কোনো কারণ নেই।

'কিন্তু তুমি সেখানে গিয়ে কী করবে?'

'এই ডাইনি-পুরুৎগুলোর হাত থেকে সুলতানকে বাঁচাতে চাচ্ছি আমি। সঙ্গে ওষুধের বাক্স নিয়ে যাচ্ছি। ঠিকমতো চিকিৎসা হয়নি ব'লেই তো সুলতানের অসুখ সারছে না—যদি ঠিক-ঠিক ওষুধ পড়ে, লাগসই দাওয়াই, তাহ'লেই তো সব অসুখ সেরে যাবে।'

৯

ডাইনি-পুরতরাই সম্ভবত আদি পৃথিবীর পরম্পরাগত জীবন্ত নিদর্শন। সারা গায়ে জন্তুজানোয়ার, ফুল, লতাপাতা, গাছপালার উল্কি আঁকা, গলায় শাঁখের মালা, মাথায় পশু-লোমের টুপি, কানে মস্ত হাড়ের মাকড়ি—এই হ'লো ডাইনি-পুরুতের চেহারা। প্রত্যেকটা দলের মধ্যে এদের ক্ষমতাই সবচেয়ে বেশি। রাজারা পর্যন্ত এদের ভয় পায়, এদের হুকুম নিঃশব্দে তামিল করে। পুরুতদের নামকরণের রীতিটা বড়ো অদ্ভুত: বেশির ভাগেরই নাম কোনো-না-কোনো জন্তুর নামে, অবশ্য ফুলের নাম বা গাছের নামও বাদ যায় না। কেনো পুরুতের নাম হরিণ, কারু-বা নাম ভালুক, কেউ আবার নিজের পরিচয় দেয় দাঁড়কাক ব'লে, আবার কারু-বা নাম সূর্যমুখী। ব্যাপরটা বেশ-একটু রহস্যে ভরা। নাম দিতে চাচ্ছে মানুষের দলের পুরুতের, অথচ নামটা নিচ্ছে জন্তু-জানোয়ারদের কাছ

থেকে । এ-আবার কোন ধরনের ব্যাপার ?

ব্যাপারটার রহস্য পরিষ্কার হয়, যদি কয়েকটি মূল সূত্রের দিকে নজর রাখা যায় । লক্ষ করলে দেখা যায়, তাদের গায়ে যে-সব উল্কি থাকে, বা যে-সব নাম তারা নেয়, তার বেশির ভাগই হ'লো খাবার জিনিশ । পশুপাখি, গাছগাছড়াই বেশি—আর এগুলো খেয়ে পেট ভরানো সম্ভব । অবশ্য এমন কিছু-কিছু নাম আছে যা কিনা খাবার জিনিশ নয়, যেমন বৃষ্টি, পাথর ও ঐ জাতীয় কিছু । কিন্তু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় এগুলো আদি ও অকৃত্রিম নয়, অনেক পরের ব্যাপার, আদি যুগের *অখাদ্য* নকল বা অনুকরণ মাত্র । কাজেই এই সূত্র থেকে সন্দেহ হয় যে, আদি মানুষের খাবার জোগানোর সঙ্গে এই নামগুলির কোনো যোগাযোগ ছিলো—নামের ফর্দ দেখে সেই সন্দেহ আরো দৃঢ় হয় । কিন্তু তা ছাড়াও আরেকটি খুব জরুরি সূত্র আছে । প্রতিটি দলের মধ্যে একটা উৎসব আছে, যেটা সবচেয়ে জরুরি ও বড়ো ; সেই উৎসবের সময় পুরো দলটা এক জায়গায় জমায়েৎ হয়—কিন্তু যেখানে-সেখানে নয়, আর যখন-খুশি তখনও নয় । জড়ো হবার জায়গাটা বাঁধা-ধরা, সময়টাও তাই । যেমন, কোনো দলের পুরুতের নাম যদি কাছিম হয়, তাহ'লে উৎসবের জন্য গোটা দল জমায়েৎ হবে কাছিমদের ঘাঁটিতে, আর কাছিমেরা যে-সময়টায় বাচ্চা পাড়ে, সেই সময়টায় । প্রশ্ন ওঠে, কেন ওরা জড়ো হচ্ছে, মৎলবটা কী ওদের । উত্তর হ'লো, ওরা জমা হচ্ছে কাছিম ধরার জন্যে ; কাছিম ধ'রে খাবে, খেয়ে প্রাণ বাঁচাবে । এই ব্যাপারটা শুরু হয়েছে এমন-এক আদিম যুগে যখন আদি মানুষেরা খাবারের সন্ধানে হন্যের মতো সবখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে । তাদের অস্ত্রশস্ত্র তখন এতই বাজে যে তা দিয়ে হরেক রকম খাবার জোগাড় করার কথাই ওঠে না । বন-জঙ্গলের যে-এলাকায় ওরা হন্যে হ'য়ে ঘুরছে, সেই অঞ্চলে কেবলমাত্র যে-খাবার সহজে পাওয়া যায় তা-ই খেয়েই তাদের প্রাণ বাঁচে ; তাই যারা আশপাশে কাছিম জোগাড় করতে পারে কেবল কাছিম খেয়েই তাদের প্রাণ বাঁচাতে হয় । কাছিম ছাড়া তাই ওরা নিজেদের কথা মোটেই ভাবতে পারে না ; কাছিমই এদের দলের সবচেয়ে বড়ো রক্ষক, কাছিমের সঙ্গেই ওদের যত আত্মীয় সম্বন্ধ, কাছিম থেকেই ওদের প্রাণ, ওরা আর কাছিম তাই মোটেই আলাদা নয়। তারপরে কিন্তু সেই আদি মানুষের অস্ত্রশস্ত্র উন্নত হ'লো আর তাই তারা কেবল একরকমেরই খাবার নয়, নানারকম খাবার জোগাড় করতে পারলে । তা ছাড়া দলের মানুষ বেড়েছে, বাড়তে-বাড়তে অনেকগুলি দলে ভাগ হ'য়ে গেছে —কিন্তু তাহ'লেও এক দলের সঙ্গে অন্য দলের একটি গভীর সম্বন্ধ থেকে গেছে—সেটি সহযোগিতার । অর্থাৎ বাঁচার ব্যাপারে এ-দল ও-দলের সাহায্যে আসে, ও-দল এ-দলের । কী-ভাবে ? না, ঠিক হ'লো, এই দল ঐ দলের খাবরে ভাগ বসাবে না, ওই দল তাই যেন এই দলের খাবারে ভাগ না-বসায় । যেমন—আগে যাদের সঙ্গে কাছিমের আত্মীয়তা ছিলো, তারা বললে, আমরা আর কাছিম খাবো না—এ খাবার অন্য দলের খাবার হোক । আবার হরিণ-দলের লোক বললে, আমরা আর হরিণ খাবো না, এ-খাবার অন্য দল নিয়ে নিক । অর্থাৎ যে-সহযোগিতার সূত্র তাদের আটকে রাখলো তার মধ্যে কতগুলো নিয়ম

হ'লো, কাছিম-দলের পক্ষে কাছিম খাওয়া নিষিদ্ধ, হরিণ-দলের পক্ষে হরিণ। এই সূত্র মনে রাখলেই, কেন প্রাচীন মিশরের দেবদেবীর চিত্র বা মূর্তিতে জন্তু-জানোয়ারের অঙ্গ থেকে গেছে, তা অনেকটাই স্পষ্ট হয়।

কিন্তু এখানেই হ'লো সবচেয়ে জরুরি বিষয়, যাকে বলা যায় কুহক, জাদুবিদ্যা বা ইন্দ্রজাল। এই ইন্দ্রজালের প্রয়োগকর্তা হ'লো ডাইনি-পুরুৎ। ডাইনি কেন ? না, তারা জাদু জানে। জাদু আর-কিছু নয়, প্রকৃতিকে জয় করার ব্যাপারে অনেক পেছিয়ে ছিলো আদিম মানুষ, তাই তারা সেই জয়ের অভিনয় ক'রে কল্পনায় প্রকৃতিকে জয় ক'রে নেবার চেষ্টা করলে—এক ধরনের ইচ্ছাপূরণকারী দিবাস্বপ্ন আর-কি ! যেমন—আকাশে জল নেই, মরুভূমি এগিয়ে আসছে তার মরা ধুলোর তুমুল ঝড় তুলে, অসুবিধে হচ্ছে চাষবাসের, তাই আকাশে জল চাই। কেমন ক'রে তা করা যায় ? না, বৃষ্টির নকল করো—সবাই মিলে একসঙ্গে তালে-তালে নাচো। দল বেঁধে একসঙ্গে যে কাজ করবে, প্রকৃতি তা মানতে বাধ্য। যদি দল বেঁধে শিকারিও নাচ নাচে আর তার মূল কথাটা যদি এই হয় যে, মনের মতো শিকার জুটেছে ব'লে ফুর্তির কোনো শেষ নেই, তাহ'লে শিকার জুটবেই জুটবে। অর্থাৎ পৃথিবীকে সত্যকার জয় করার অভাবটা কল্পনায় জয় করা দিয়ে পূরণ ক'রে নেয়া—এটাই হ'লো ইন্দ্রজালের প্রথম এবং আদি সূত্র। মানুষের হাতিয়ার যতদিন নেহাৎই বাজে আর অকেজো ধরনের ততদিন অব্দি পৃথিবীকে সত্যি-সত্যি আর কতটুকুই বা জয় করা যায় ? তাই আসল জয়ের অভাবটা এইভাবে কল্পনা দিয়ে পূরণ ক'রে নিতে না-পারলে তখন যেন প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হ'তো না। আর ইন্দ্রজালে অধিকার ছিলো ব'লেই ডাইনি-পুরুৎদের হাতে চলে এলো সব প্রভাব প্রতিপত্তি। নানারকম জিনিশ তারা জমাতো—তার ভিতর হিরে-জহরৎ, নানা রঙের চকচকে পাথর, সোনা-রুপোও ছিলো। এ-সব জিনিশ তারা জমাতো তাদের অলৌকিক জাদু-ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে। তারা ভাবতো এ-সবের ভেতর ইন্দ্রজালের শক্তি লুকোনো আছে, তাই এ-সব সংগ্রহ ক'রে নিজের কাছে যে রাখতে পারবে তার অলৌকিক শক্তি আশ্চর্যভাবে বেড়ে যাবে। এ-সব তাদের কাছে বিলাসের উপকরণ ছিলো না। তারা ভাবতো, চকচকে দামি পাথরের ভেতর লুকিয়ে আছে জাদুর ক্ষমতা, তাই সে-পাথর যে ধারণ করবে —গলায় ঝোলোবে কি হাতে তাবিজ ক'রে বেঁধে রাখবে— তার মধ্যে ঐ পাথর থেকেই অলৌকিক শক্তি চ'লে আসবে। আর এইসবের সঙ্গে তারা ভারিক্কি চাল আনতো নানা গুরুগম্ভীর গুমগুমে আওয়াজ-তোলা অর্থহীন আবোল-তাবোল মন্তর আউড়ে— এই একটানা সুরময় ধ্বনির মধ্যে তারা যেন হুকুম করছে প্রকৃতিকে। আর যেহেতু লোকের জাদুবিশ্বাস প্রবল ছিলো সেহেতু নানা কাকতালের ফলে তারা ভাবতো প্রকৃতি বুঝি পুরুৎদের হুকুম তামিল করছে —আর তাই শেষকালে তাদের ক্ষমতা প্রচণ্ড বেড়ে গেলো, লোকে জুজুর মতো ভয় করতে লাগলো তাকে, তাকে মানতে লাগলো মাথা নুইয়ে, কারণ সে যেমন ভালো করতে পারে, তেমনি সব জড় পদার্থের ওপর তার মন্তরের জোর খাটাতে পারে ব'লে সে মন্দও করতে পারে লোকের। তাই কেউ

পারতপক্ষে তার বিরাগ-ভাজন হ'তে চাইতো না—এমনকী দলের রাজা পর্যন্ত না। যদি ধুলোপড়া ছিটিয়ে দেয় কি অন্ধকারকে হুকুম দেয়, তাহ'লেই তো রাজার দফারফা, সব খেল খতম, সব ক্ষমতাই উধাও।

এই পুরুতেরা যদি একবার কোনো কারণে ফার্গুসনের উপর চ'টে যায় তো তাঁদের আর প্রাণে বাঁচতে হবে না। তাই ফার্গুসনের সংকল্পের কথা শুনে ডিক ভয়ে-বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হ'য়ে গেলেন। যদি একবার পুরুতেরা বুঝে ফ্যালে যে তাঁরা চাঁদ থেকে আসেননি, তাদেরই মতো পৃথিবীর মানুষ, তাহলে তাদের ঠকাবার জন্যে তারা মহা খাপ্পা হ'য়ে উঠবে। ডিক তাই ফার্গুসনকে বাধা দেবার জন্য কী যেন বলতে চেষ্টা করলেন কিন্তু ডিক কোনো কথা ব'লে ওঠবার আগেই ভাঙা-ভাঙা আরবিতে ফার্গুসন জনতাকে জানালেন: 'তোমাদের কোনো ভয় নেই। চাঁদের দেবতা তোমাদের ওপর তুষ্ট হ'য়ে তোমাদের রাজাকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের পাঠিয়েছেন। তাই কোনো ভয় কোরো না—আমি সুলতানকে দেখতে যাবো।'

এ-কথা শুনেই ডাইনি-পুরুতেরা গুমগুমে গলায় উল্লাস জানালে, আর জনতাও তার সঙ্গে তাদের সম্মিলিত উচ্ছ্বাস যোগ ক'রে দিলে।

১০

ডিকের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন ফার্গুসন। 'শোনো কেনেডি, চুল্লিটার তাপ বড়িয়ে রেখে যে-কোনো সময় উড়ে যাবার জন্যে তৈরি হ'য়ে থেকো—নোঙরটা অবশ্য খুব আঁটো ক'রে জড়ানো আছে, তবু চটপট উড়ে যেতে কোনো অসুবিধে হবে না। জো নিচে মাটিতে বেলুনের তলায় ব'সে অপেক্ষা করবে। কেবল আমি একাই যাবো সুলতানের কাছে।'

'আমি যাবো আপনার সঙ্গে,' জো বিনীত অথচ দৃঢ় গলায় জানালে।

'না, আমি একাই যাবো।' উত্তর দিলেন ফার্গুসন, 'কোনো ভয় নেই। সত্যিই আমাদের চাঁদের ছেলে ব'লে ভেবেছে ওরা, কাজেই ওদের কুসংস্কারই আমার সহায় হবে। তবে, যে-কোনো বিপদের জন্যেই তৈরি হ'য়ে থেকো। গিয়েই চটপট চ'লে আসবো আমি।'

দড়ির সিঁড়ি নামিয়ে দেয়া হ'লো। ওষুধের বাক্স বগলে নিয়ে ফার্গুসন প্রথম নিচে নামলেন, পেছন-পেছন জো নেমে এলো। নিচে মাটিতে এসে বেশ রাজার মতো চাল ক'রে, জমকালো দেমাকি ভঙ্গি ক'রে বসলো জো, কৌতূহলী নরনারী তার চারদিকে সসম্ভ্রমে ভিড় ক'রে দাঁড়ালে। এদিকে কানে-তালা-লাগানো অদ্ভুত বাজনা আর বিচিত্র

চীৎকারের মধ্যে উল্কি-কাটা শাঁখের-মালা-পরা হাড়ের-গয়না-গায়ে ডাইনি-পুরুতেরা ফার্গুসনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো সুলতানের প্রাসাদের দিকে । সেখানে পৌঁছুতে অনেকটা রাস্তা হাঁটতে হ'লো । যখন পৌঁছুলেন, বেলা তখন তিনটে ।

প্রাসাদে ঢুকতেই পাতার-ঘাগরা-পরা সুন্দর চেহারার কয়েকজন মেয়ে ফার্গুসনকে সমাদরে অভ্যর্থনা ক'রে ভেতরে নিয়ে গেলো । বিভিন্ন প্যাঁচালো আকারের মস্ত লম্বা নলচেয় ক'রে তারা তামাক টানছিলো । তাদের মধ্যে ছ-জন ছিলো পাটরানী : সুলতানের মৃত্যু হ'লে তাদেরও জ্যান্ত বরণ ক'রে নিতে হবে মৃত্যুকে, কেননা মৃত্যুর পরপারে গিয়ে সুলতানকে সঙ্গ দিতে হবে তো ! কারণ তাদের বিশ্বাস, রাজা হলেন অমর, তাঁর জরা নেই, ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই । দলের লোকের মনে কোনোরকমে এই বিশ্বাসটি টিকিয়ে রাখার উপরই রাজার ঐশ্বর্য আর অসীম প্রতিপত্তি নির্ভর ক'রে আছে । তাই তাদের রীতি-নীতির ভেতর একেবারে মরীয়ার মতো অমর সাজবার আয়োজন । সুলতান অমর, তাঁর মৃত্যু নেই, তাই ম'রে যাবার পরও তাঁর জন্যে দরকার জীবনধারণের সব উপকরণ । তাই তাঁদের শবাগারগুলো ছোটোখাটো একেকটি প্রাসাদের মতো । বেশ শক্ত ক'রে গাঁথা সেইসব কবর, ভেতরে ঐশ্বর্যের তাক-লাগানো সম্ভার ; আশবাবপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, বাসন-কোশন, গয়নাগাটি আর সাজগোজের আয়োজন—সোনা তামা আর দামি পাথরের যেন ছড়াছড়ি । এই কবরখানার ভেতরে গুদোম-ঘর, আর তার মধ্যেই থরে-থরে তেল, খাদ্য পানীয়, আরো পাঁচ রকমের কত-কী জিনিশ সাজানো । রাজাকে যে-ঘরে কবর দেয়া হয়, তারই আশপাশের ঘরে রাজার চাকরবাকরেদেরও জ্যান্ত কবর দেবার ব্যবস্থা —সেই সঙ্গে জীবন্তই পোতা হ'তো রানীদের কিংবা হয়তো মেরে ফেলে তাদের পরে কবর দেয়া হ'তো । মোটমাট, মরা রাজার যাতে সেবার কোনো ত্রুটি না-হয়, এই জন্যে মরতে হ'তো অন্য মানুষদেরও । এই ব্যবস্থা চ'লে আসছে মিশরে, যুগ থেকে যুগে, শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে । আর মৃত্যুর এই জাঁকজমকের চূড়ান্ত পরিণতি হ'লো তার বিখ্যাত ও চমকপ্রদ বড়ো পিরামিড—মৃত্যুর কালো প্রাসাদ যেন আসলে, ফ্যারাওয়ের মৃত শরীরকে যে ম্যমি ক'রে টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা তা-ই নয়, তার ওই কবরখানার মধ্যে বেঁচে-থাকার সবরকম আয়োজনও থাকে । বহু যুগের ওপার থেকে এই-যে আঁটো, কঠিন, অনড় নিয়ম চ'লে আসছে, রানীরা সবাই তা জানে ; তারা জানে যে অচিরেই অকালে তাদের মৃত্যু বরণ করতে হবে । কিন্তু এই নিশ্চিত মৃত্যু-সংবাদ জানা সত্ত্বেও সেই ছয় রানী বেশ নির্বিকার খোশ-মেজাজের সঙ্গেই তামাক টেনে যাচ্ছিলো ।

খুব গম্ভীর ভাবভঙ্গি দেখালেন ফার্গুসন, আড়ম্বর ক'রে মৃতপ্রায় সুলতানের শয্যার দিকে এগিয়ে গেলেন । সুলতানের বয়স খুব বেশি নয়, অল্পই, বড়ো-জোর হয়তো চল্লিশ হবে, কিন্তু তবু তার সমস্ত শরীরে জীর্ণতার রেখা সুস্পষ্ট : অজ্ঞান অবস্থায় সে প'ড়ে আছে তার শয্যায়, নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না । কিন্তু ভালো ক'রে তাকিয়েই তার চোখের তলার কালিমা দেখে ফার্গুসন অনায়াসেই বুঝতে পারলেন যে বহুদিনের বহু রকমের নেশা ও অত্যাচারে সে তার শরীরের যে-হাল ক'রে এনেছে, তাতে তার আর

বাঁচার আশা নেই। মুখে সে-কথা তিনি প্রকাশ করলেন না। বরং নীরবে, কোনো কথা না-ব'লে, বাক্স থেকে একটি কড়া ওষুধ বার ক'রে কোনোরকমে সুলতানকে খাইয়ে দিলেন। তারই ফলে সুলতান একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠলো। একেবারে আসাড়, অবশ, মৃতপ্রায় হ'য়ে ছিলো সে, হঠাৎ তার মধ্যে প্রাণের চঞ্চল সাড়া দেখে উপস্থিত সকলে উল্লাসে কোলাহল ক'রে উঠলো। ফার্গুসন কিন্তু আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না, তক্ষুনি প্রাসাদ থেকে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এসে সোজা *ভিক্টরিয়ার* দিকে ফিরে চললেন।

১১

জো বেশ জমকালো ভঙ্গিতে ব'সে ছিলো বেলুনের তলায়। ডিক ওপরে চুল্লির আগুন তাতিয়ে গনগনে করবার ব্যবস্থা করেছেন, আর ফার্গুসন গেছেন ডাইনি-পুরুতের সঙ্গে সুলতানের কাছে। কাজেই বাজারে যত লোক ছিলো, তারা জো-কে চাঁদের অন্যতম পুত্র ভেবে গদগদভাবে নানা ভঙ্গিতে তার চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করছিলো। কতগুলি মেয়ে-পুরুষ অদ্ভুত এক আচাভুয়ো বাজনার সঙ্গে তালে-তালে পা ফেলে বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচ দেখাচ্ছিলো তাকে। জোও একটু কৃপার ভঙ্গিতে তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের ধন্য করছিলো, লোকজনেরা জো-র কাছে হরেক রকম জিনিশপত্র এনে উপচার হিশেবে হাজিরও করছিলো।

অবস্থা যখন এইরকম জমকালো, হঠাৎ জো দেখতে পেলো ফার্গুসন খুব দ্রুত পায়ে বেলুনের দিকে এগিয়ে আসছেন, প্রায় দৌড়ুচ্ছেন বলা চলে, আর তাঁর পেছন-পেছন ভীষণ হৈ-চৈ ক'রে একদল কালো মানুষ অনুসরণ ক'রে আসছে, তাদের পুরোভাগে আছে সেই বিকট চেহারার ডাইনি-পুরুতেরা। জো-র মনে হ'লো তারা ভীষণ রাগে ফেটে পড়তে চাচ্ছে, বিশেষ ক'রে পুরুৎগুলো তুলকালাম কাণ্ড শুরু করেছে, তাদের বিষম কোলাহলে কান পাতা দায়, তবে রাগের ভাব স্পষ্ট। ব্যাপার কী? অবাক হ'য়ে ভাবলে জো। আগেকার সেই ভক্তি ও বিনয় হঠাৎ মন্ত্রবলে উবে গিয়ে এই উগ্রচণ্ড রাগি মেজাজ এলো কেন? তাহ'লে কি যাকে তারা চাঁদের সন্তান ভেবে অনুনয় ক'রে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো সেই ফার্গুসনের হাতে সুলতানের আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে? তাহ'লেই তো সর্বনাশ!

প্রায় ছুটেই এলেন ফার্গুসন—উত্তেজনায় তাঁর কপালের শিরা রক্তের তীব্র চাপে ফুলে উঠেছে, সারা মুখে ভয়ে ছাপ স্পষ্ট, চোখদুটো কেমন চকচক্ ক'রে উঠেছে। সোজা তিনি ছুটে এলেন মইয়ের কাছে। হয়তা সংস্কারের প্রবলতা তখনও কায়েমি হ'য়ে ছিলো ব'লেই তাঁকে উপেক্ষা ক'রে, জনতা তখনও তাঁকে কোনোরকম আঘাত

করা থেকে বিরত থেকেছে। চট ক'রে মই বেয়ে *কার*-এ উঠে এলেন, ফার্গুসন, আর তাঁর উত্তেজিত ইশারায় জো-ও আর একমুহূর্ত সময় নষ্ট না-ক'রে ক্ষিপ্র বিদ্যুতের মতো তাঁর অনুসরণ করলে।

'আর একমুহূর্তও দেরি কোরো না।' নিশ্বাস রোধ ক'রে উত্তেজিত গলায় ফার্গুসন নির্দেশ দিলেন, 'নোঙর খোলবার সময় পর্যন্ত নেই, বরং দড়ি কেটে দাও তাড়াতাড়ি! শিগগির উড়ে যেতে হবে আমাদের।'

'কী হয়েছে?'

'ব্যাপার কী; খুলে বলো তো ফার্গুসন।'

'ওই দ্যাখো, ওদিকে তাকিয়ে।' আকাশের এক কোণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন ফার্গুসন।

'চাঁদ!' সমস্বরে ব'লে উঠলেন অন্য দু-জনে।

দিগন্তের বেশ কিছুটা ওপরে মস্ত এক সোনালি চাঁদ ভেসে উঠেছে। সেই চাঁদ আর *ভিক্টরিয়া* উভয়ই আকাশে শোভা পাচ্ছে একসঙ্গে। হয় পৃথিবীতে দুটি চাঁদ আছে, নয়তো শাদা চামড়ার লোকগুলি শঠ প্রবঞ্চক ও প্রতারক, মোটেই দেবতা নয় এরা —এই ভাবটাই এখন সব লোকের মনে জেগে উঠেছে। তাই তারা রাগে, অবিশ্বাসে মারমুখো হ'য়ে উঠেছে।

হো-হো ক'রে না-হেসে থাকতে পারলেন না ডিক।

'*কাজে'র* লোকেরা যখন দেখলো যে ঐ শ্বেতাঙ্গ প্রতারকগুলো নকল চাঁদে ক'রে পালিয়ে যাবার মৎলব আঁটছে, অমনি প্রবল স্বরে চ্যাঁচামেচি ক'রে উঠলো। দুর্বোধ্য ভাষায় গালাগাল করতে-করতে বেলুন তাগ ক'রে তীর ছুঁড়তে উদ্যত হ'লো তারা, কেউ-কেউ আবার কতগুলো চোখা বল্লম উঁচিয়ে ধরলে। কিন্তু একটি ডাইনি-পুরুৎ হাত তুলে তীরধনুক ব্যবহার করতে বারণ করলে জনতাকে। তারপর অসীম ক্ষিপ্রতায় সে গাছে ওপর উঠতে লাগলো : মনে-মনে সে মৎলব এঁটেছে যে নোঙরটা ধ'রে টেনে নিচে নামিয়ে নেবে এই নকল চাঁদ।

কার থেকে কুড়ুল হাতে ঝুঁকে পড়লো জো। জিগেস করলে 'দড়ি কেটে দেবো?'

'একটু রোসো।'

'কিন্তু ওই ডাইনি-পুরুৎটা যে উঠে আসছে!'

'আগে দেখাই যাক কী হয় না-হয়। হয়তো শেষ পর্যন্ত নোঙরটা বাঁচাতে পারবো আমরা,' ফার্গুসন বললেন, 'না-হ'লে, শেষটায় লক্ষণ খারাপ বুঝলে, দড়ি কেটে দেয়া যাবে।'

ডাইনি-পুরুৎটি ততক্ষণে ওপরে উঠে, এসে ডাল ভেঙে নোঙরটাকে মুক্ত ক'রে ফেলেছে। যেই ডালটা ভেঙে গেলো, অমনি বেলুনের টানে আচমকা নোঙরটা উঠে গেলো ওপরে আর লোকটার পা তাতে আটকে গেলো, লোকটাকে নিয়েই বেলুন উঠে

এলো আকাশে, তলায় লোকটা ঝুলতে লাগলো ।

নিচে যে-সব লোক এসে জমায়েৎ হয়েছিলো, তারা হতবাক হ'য়ে বিস্মিত চোখে দেখতে লাগলো, তাদের জাদু-জানা ঐন্দ্রজালিক পুরুৎ আকাশে ভেসে যাচ্ছে ।

'চমৎকার হ'লো !' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো জো ।

'লোকটা বেশ আঁকড়ে ধরেছে দড়িটা, নইলে—'কেনেডি বললেন, 'কখন তলায় প'ড়ে যেতো !'

'লোকটাকে কি শূন্য থেকেই ফেলে দেবো ?' জো জিগেস করলে ।

'ছিঃ !' ফার্গুসন বললেন, 'আমরা খামকা একটা লোকের মৃত্যু ঘটাবো কেন ? বরং ওকে আমরা নিরাপদেই মাটিতে নামিয়ে দেবো, যদিও তার ফলে অবশ্য ওর দলবলের সকলের কাছে ওর প্রতিপত্তি ও মাহাত্ম্য অনেক বেড়ে যাবে ।'

ভিক্টরিয়া এর মধ্যেই প্রায় হাজার ফিট ওপরে উঠে এসে ভেসে যাচ্ছিলো । প্রাণপণে দড়িটা আঁকড়ে ধরেছিলো সেই ডাইনি-পুরুৎটি ; ভয়ে-আতঙ্কে তার চোখদুটো কোটির থেকে যেন ঠেলে বেরুতে চাচ্ছে, মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই । এমনিভাবে বেলুন একটুক্ষণ পরে ধীরে-ধীরে শহরের সীমা ছাড়িয়ে এলো ।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে ফার্গুসন যখন দেখলেন যে তাঁরা অনেকদূর চ'লে এসেছেন, তখন তিনি চুল্লির উত্তাপ এমনভাবে কমিয়ে আনার ব্যবস্থা করলেন যাতে বেলুন সরাসরি মাটির দিকে নেমে আসে। বেলুন যখন প্রায় কুড়ি ফিট উপরে, সেই ডাইনি-পুরুৎটি হঠাৎ বুকের ভেতর সাহস পেলে ; যথেষ্ট পরিমাণ ভরসা সঞ্চয় করে সে চট ক'রে লাফিয়ে নামলে মাটিতে, তারপর কোনো দিকে না-তাকিয়ে '*কাজে'র* দিকে তীরের বেগে ছুটে চ'লে গেলো ।

আর সেই মুহূর্তে হঠাৎ বেলুনটি হালকা হ'য়ে যাওয়ায় আবার তরতর ক'রে ওপর দিকে উঠে যেতে লাগলো ।

ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা নেমে এলো তার ঝাপসা আবছায়া নিয়ে, তারপর সেই আবছায়াকে আরো-পাৎলা ক'রে দিয়ে ধীরে-ধীরে আকাশের এককোণায় শোভা পেতে লাগলো সোনালি, নিটোল, জ্বলজ্বলে চাঁদ ।

'ওই দেখুন, চাঁদ যেন আজ অন্য দিনের চেয়েও অনেক বেশি জ্বলজ্বল করছে ।' জো বললে, 'বেশ দিব্যি জাঁকিয়ে বসেছিলুম চাঁদের পুত্র হিশেবে, কিন্তু ওই চাঁদই কিনা শেষটায় আমাদের এই নতুন পরিচয় ভেস্তে দিয়ে ফাঁস ক'রে দিলে যে আমরা চাঁদের কেউ নই ।'

'এ-দেশের নাম কী, জানো ?' ফার্গুসন বললেন, 'এখানকার লোকেরা একে *চাঁদের দেশ* বলে । এখানকার বাসিন্দারা চিরকাল ধ'রে চাঁদের পুজো ক'রে আসছে । তাছাড়া এ-দেশের মতো উর্বর দেশ আর-কোথাও সহজে মেলে না ।'

'এই *জংলি* দেশেই কেন প্রকৃতি এমন অকৃপণ, সে-কথা ভাবলে অবাক লাগে ।' কেনেডি বললেন ।

'এই দেশই হয়তো একদিন সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সভ্য হ'য়ে উঠবে, সেই সম্ভাবনার কথাটাই বা তুমি ভাবছো না কেন ? এমনও তো হ'তে পারে যে, ইয়োরোপে লোকসংখ্যা এত বেড়ে গেলো যে কিছুতেই আর কুলোয় না ; তখন তো তারা বাধ্য হ'য়েই এ-দেশে বসবাস করতে চ'লে আসবে ।'

কেনেডি জিগেস করলেন, 'তা-ই ভাবছো নাকি তুমি ?'

'হ্যাঁ, আমার তো অন্তত তা-ই ধারণা ।' ফার্গুসন ব'লে চললেন, 'মানুষের ইতিহাস খুঁটিয়ে দেখলে এই ঘটনাই দেখতে পাওয়া যায় । তার প্রাকৃতিক সম্পদ এত বেশি যে, তাই দিয়েই আফ্রিকা একদিন সকলকে টানবে । নানা কলকব্জা যন্ত্রপাতি নিয়ে ইয়োরোপ থেকে লোক আসবে, বাসযোগ্য ক'রে তুলবে এই কালো বন আর পাহাড়ি শ্যামলতা, গ'ড়ে উঠবে স্বাস্থ্যকর লোকালয়, নাব্য হ'য়ে উঠবে এর স্রোতস্বিনী, তারপর ধীরে-ধীরে হয়তো বিশাল এক সুসভ্য সাম্রাজ্য গ'ড়ে উঠবে এখানে । কে জানে হয়তো এ-দেশ থেকেই বাষ্প আর বিদ্যুৎশক্তির আরো চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর অনেক কিছু আবির্ভূত হবে ।' [১]

'আমি সেই শুভদিনের অপেক্ষায় রইলুম ।' কেনেডি বললেন ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পূর্ব-টাঙ্গানাইকা হ্রদ থেকে বেরিয়ে আসা মালালারাজি নদীস্রোতের কাছাকছি এসে পড়লো *ভিক্টরিয়া* । মস্ত-মস্ত লম্বা ঘাসে গোটা এলাকাটা ঢাকা, তারই মধ্য দিয়ে দলে-দলে বিশাল-কুঁজ-ওলা গোরুর দল চ'রে বেড়াচ্ছে । এই ঘাসের বন যেখানে গভীর, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সেখানে মাঝে-মাঝে সিংহ, চিতাবাঘ, হায়েনা ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুরা আত্মগোপন ক'রে থাকে । মাঝে-মাঝে মটমট ক'রে ডাল ভেঙে মস্ত পাহাড়ের মতো হাতির পালকে নেমে আসতে দেখা যায় ।

'কী অপূর্ব শিকারের জায়গা ।' কেনেডি ব'লে উঠলেন ।

হঠাৎ সমস্ত প্রকৃতি যেন কীসের আশঙ্কায় স্তব্ধ থমথমে হ'য়ে গেলো । ঝড়ের পূর্বলক্ষণকে চিনে নিতে মোটেই দেরি হ'লো না ফার্গুসনের । চাঁদ ডুবিয়ে দিলে কালো মেঘ, অন্ধকার ক'রে এলো সারা আকাশ । উসেগুা নামক গ্রামের অগুনতি কুটিরগুলোর ঝাপসা-কালো অস্পষ্টতার অনেক ওপরে *ভিক্টরিয়া* নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো ।'

এমন সময় হঠাৎ তীক্ষ্ণ বাঁকা রেখায় আকাশকে শতখান ক'রে চিরে দিলে বিদ্যুতের তীব্র বিষম বাঁকা রেখা, তারপরেই কানফাটা আওয়াজ ক'রে আলো ফেটে পড়লো, গড়িয়ে গেলো এক গুমগুমে ভয়ানক ধ্বনি, চারদিক থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো ।

'ওঠো, ওঠো—শিগগির উঠে পড়ো ।' ফার্গুসনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন কেনেডি, জো-ও তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠলো—পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁরা । ঘুম তাড়াবার জন্য চোখ কচলাতে লাগলেন সজোরে ।

---

১. জুল ভের্ন তাঁর এই ধারণাকে নিয়ে *'দ্য বারজাক মিশন'* নামে মস্ত একটি রহস্যময় উপন্যাস রচনা করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর সেটি প্রকাশিত হয়েছিলো ।

'আমরা কি নিচে নামবো ?' কেনেডি জিগেস করলেন ।

'না, তাহ'লে বেলুন ধ্বংস হ'য়ে যাবে,' ফার্গুসন বললেন, 'বৃষ্টির আগে, প্রবল বাতাস শুরু হবার আগেই, আমাদের ওপরে উঠে যেতে হবে!' এই ব'লে তিনি চুল্লির আগুন পুরোদমে চড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন ।

উষ্ণ জঙ্গলের এই ঝড় যেমন নিমেষের মধ্যে তার প্রচণ্ডতা নিয়ে হাজির হয়, তেমনি তুলকালাম কাণ্ড বোধহয় আর-কোথাও হয় না । আবার চোখ ধাঁধিয়ে দিলে তীব্র এক বিদ্যুতের বাঁকা রেখা, যেন আকাশকে এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে ছিঁড়ে ফেলতে চাচ্ছে সে, তারপর ছোটো-বড়ো অসংখ্য বিদ্যুৎ থেকে-থেকে চমকে উঠলো, যেন সারা আকাশ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হ'য়ে গেছে । আর তার সঙ্গে তাল রেখে নেমে এলো প্রবল বর্ষণ ।

'বড্ড দেরি হ'য়ে গেলো আমাদের,' ফার্গুসনের গলায় ত্রাস আর চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট, 'এখন এই বৈদ্যুতিক আকাশ ফুঁড়ে এই গ্যাস-ভর্তি বেলুন নিয়ে আমাদের উঠতে হবে। বুঝতে পারছো তো কী সাংঘাতিক অবস্থা— যে-কোনো মুহূর্তে আগুন লেগে সর্বনাশ হ'য়ে যেতে পারে ।'

আরো-গনগনে ক'রে তোলা হ'লো চুল্লির আগুন । বেলুন এমন তীব্রভাবে কেঁপে উঠলো, যেন ঝড় এসে তার ঝুঁটি ধ'রে নাড়াচ্ছে । বেলুনের চারপাশে যে-একটি আবরণ পরানো ছিলো তাতে অনেক বড়ো-বড়ো ফুটো হ'য়ে গেলো, আর হাওয়া এলো ভেতরে, ভীষণ আওয়াজ ক'রে দাপাদাপি শুরু ক'রে দিলে বাতাস, আর তার সঙ্গেই তাল বজায় রেখে বড়ো-বড়ো শিলাবৃষ্টি শুরু হ'য়ে গেলো বেলুনের গায়ে । কেনেডির মুখ শুকিয়ে এলো, ফার্গুসনের কপালেও চিন্তার রেখা দেখা গেলো, কেবল জো-র মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই সে ভয় পেয়েছে কি না । বিদ্যুতের তীব্র-নীল শিখা ভ্রূকুটি ক'রে শাসাতে লাগলো চারদিকে, কিন্তু তবু এতসব সত্ত্বেও, সমস্ত বাধা ঠেলে বেলুন ওপরে উঠতে লাগলো ।

'ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন !' ঝড়ের বাতাসের মধ্যে ফার্গুসনের ভেজা গলা করুণ শোনালো, 'নিচে পড়লে তেমন জোরে পড়বো না, এই ভরসা থাকলেও যে-কোনো বিপদের জন্যে আমাদের প্রস্তুত হ'য়ে থাকতে হবে ।'

মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণপণে যুঝতে-যুঝতে বেলুনটি যখন ঝোড়ো মেঘের ওপর উঠে এলো, তখন মাত্র পনেরো মিনিট কেটেছে । আগেও একবার উষ্ণ জঙ্গলের কালো ঝড়ের পাল্লায় পড়েছিলেন তাঁরা, কিন্তু সেবার বিপদের আশঙ্কা তুলনামূলকভাবে অনেক কম ছিলো । ঝড়ের আওতার বাইরে চ'লে এসে বিদ্যুতের তীব্র বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন তাঁরা ।

সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত ! নিচে ভীষণ মেঘ তার কালিমা দিয়ে সারা পৃথিবীটাকে যেন চিরকালের জন্যে ঢেকে ফেলে দিতে চাচ্ছে, অথচ তার ওপর দিয়ে *ভিক্টরিয়া* ভেসে যাচ্ছে নিরাপদ ও অনুকূল হাওয়ায় । আকাশ, নিচের মেঘ, চাঁদের আলোয় ঝলমল ক'রে উঠেছে । আর কত তারা ফুটে আছে এই ওপরে, ঝিকমিক ! আশ্চর্য ! অদ্ভুত মাথার

ওপর তারা-আঁকা আকাশ, আর নিচে উন্মত্ত কলো মেঘের প্রচণ্ড দাপাদাপি।

'এত সহজেই যে বিপদ থেকে বাঁচতে পেরেছি সেই জন্যে ঈশ্বরকে অনেব ধন্যবাদ!' ফার্গুসন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন। 'এখন প্রায় হাজার বারোশো ফিট ওপরে আছি আমরা, কাজেই আর-কোনো ভয় নেই।'

কেনেডি বললেন, 'তাজ্জব অভিজ্ঞতা হ'লো কিন্তু! যে-পরিস্থিতিতে প'ড়েছিলুম, এখন তার কথা ভাবতেই আশ্চর্য লাগছে।'

জো কেবল একবার চোখ তুলে তাকিয়ে ইঙ্গিতে সে কথায় সায় দিলে।

১২

পরদিন সকালে কিন্তু আকাশ একেবারে পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। শান্ত শাদা মেঘের গা থেকে চুঁইয়ে পড়ছে রোদ, চারদিক আলোয় ভরা, সুন্দর মন্দ-মধুর হাওয়া দিচ্ছে। আবার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠলো নিচের পৃথিবী।

হাওয়া অনুকুল, উত্তর-পূব দিকে ভেসে চললো *ভিক্টরিয়া*। ফার্গুসন হিশেব ক'রে দেখলেন যে বিষুবরেখা থেকে তাঁরা এখন প্রায় পৌনে দুশো মাইল দূর দিয়ে চলেছেন। পাহাড়ি এলাকার উপর দিয়ে যাচ্ছে এবার বেলুন, মস্ত বড়ো পাহাড়, নাম কারাওয়ে। আফ্রিকিদের মধ্যে চলতি একটা কথা আছে, যাতে একে বলা হয়েছে *নীল-নদের দোলনা*। এই পাহাড়ই উকেরিভি নামক বিরাট জলাশয়ের একদিকে দেয়াল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই হ্রদের *নতুন* নাম দেয়া হয়েছে *ভিক্টরিয়া*—আর এরই কাছাকাছি, অল্প দূরের ব্যবধানে, দক্ষিণ-পশ্চিম মালভূমির প্রশস্ত উপত্যকাতে বিভিন্ন ধাপে নাইভাসা, বারিঙ্গো, মাগাদি প্রভৃতি কয়েকটা ছোটো হ্রদ। প্রথমে দূর থেকে একটা গ্রাম চোখে পড়েছিলো, তারপরেই হ্রদগুলো দেখা দিলে। ১৮৫৮ সালের অগস্ট মাসের তিন তারিখে ক্যাপ্টেন স্পেক এখানে পদার্পণ করেছিলেন। ফার্গুসন উল্লসিত হ'য়ে উঠলেন: যে-সব জায়গার ওপর দিয়ে তাঁর যাবার ইচ্ছে ছিলো, বেলুন সত্যি-সত্যি সেইসব আকাঙ্ক্ষিত দেশের ওপর দিয়েই চলেছে। দুরবিন হাতে তিনি অজানা দেশের প্রতিটি জিনিশ ভালো ক'রে দেখতে লাগলেন।

কারাগুইব রাজ্যের রাজধানী চোখে পড়লো তারপর: গোটা পঞ্চাশেক বাঁশপাতার গোল কুটির, তাই দিয়েই আফ্রিকিরা এই রাজধানী গড়েছে।

দুপুরবেলা *ভিক্টরিয়া* হ্রদের ওপর দিয়ে উড়ে চললো বেলুন। এই বিশাল জলরাশিকে ক্যাপ্টেন স্পেকই *ভিক্টরিয়া-নায়েঞ্জা* নাম দিয়েছিলেন। ভিক্টরিয়া ইংরেজদের রানী, আর নায়েঞ্জা কথাটা এ-দেশি, তার মানে হ'লো হ্রদ।

'এবার আমরা আসল পথ ধরেছি। এক্ষুনি হয়তো আমরা নীল নদকে দেখতে পাবো। এই হ্রদই যে নীল নদের উৎস, তাতে আমার কোনো সন্দেহই নেই।'

ফার্গুসনের আন্দাজে যে মোটেই ভুল নেই একটু পরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেলো। একপাশের গিরিমালার মধ্য দিয়ে সত্যিই দেখা গেলো প্রবল এক জলধারা অপর দিক দিয়ে ধেয়ে চলেছে।

'ঐ দ্যাখো! ঐ দ্যাখো!' উল্লসিত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন ফার্গুসন,. 'আরবেরা ঠিকই বলে—এই সেই জলধারা যার প্রতিটি জলকণা গিয়ে ভূমধ্যসাগরে মিশেছে। এরই নাম নীল নদ।'

মিশরের আশ্চর্য সভ্যতা যখন গ'ড়ে উঠেছিলো, নীল নদ তখন অকৃপণ হাতে তার পেছনে তার প্রসাদকণা বিলিয়েছিলো। চারদিকে ধুলো, ধুলো, মরা ধুলোর মরুভূমি—আর তারই ওপর নীল নদের দু-কূল জুড়ে যেন একফালি সবুজের উদ্দাম সম্ভার। নীল নদের কোল ঘেঁসেই ঘনসবুজ ঘাস, স্নিগ্ধ শস্যের খেত, কিন্তু তারপরেই, মিশর থেকে বেরিয়ে এলেই, রুক্ষ ধুলো, মরুভূমির হলদে লোলুপ বাহু। প্রাণীর রাজ্য বলতে শুধু এই সবুজের ফালিটুকুই, কেননা বাঁচবার জন্যে যা-কিছু আয়োজন তার সবটুকুই এইখানটিতেই। আর সে-আয়োজন কী প্রচুর! যেন সবুজের কূল-ছাপা বন্যা। অথচ এই ফসলের ফালিটুকুর বাইরে এক পা বাড়ালেই দেখা যাবে বাঁচবার আয়োজন ছিটেফোঁটাও নেই, কেবল খাঁ-খাঁ করছে শুকনো, রক্তিম, তপ্ত মৃত্যুর দেশ।

জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে এমন স্পষ্ট দাগ কেটে পৃথিবীর আর-কোথাও ভাগ ক'রে দেয়া হয়নি। অনায়সেই মিশর দেশে এমন জায়গা বেছে দাঁড়ানো যায় যেখানে এক পা পড়েছে শস্যশ্যামল মাটির ওপর আর অন্য পা রুক্ষ মরুভূমির তপ্ত রক্তিমতায়—এক পা জীবনের দেশে আর আরেক পা মৃত্যুর দেশে।

অনেক, অনেক কাল আগে, আদি পৃথিবীতে, আশপাশের নানা দেশের যাযাবর মানুষেরা ধীরে-ধীরে নীল নদের খবর পেয়েছিলো। খবর পেয়েছিলো, কাছেই আছে এমন-এক দেশ, যেখানে প্রাণ তার সবুজ নিশান উড়িয়ে দিয়েছে দিগন্তের আকাশ লক্ষ্য ক'রে, না-চাইতে যেখানে পৃথিবীর কাছ থেকে অনেক-কিছু পাওয়া যায়, তাই ওইসব বেদুইন মানুষের নানান দল এসে জমতে লাগলো নীল নদের এই কিনারায়। কেউ এলো আফ্রিকারই অন্য এলাকা থেকে, কোনোদল এলো আরব্য অঞ্চল থেকে, হয়তো-বা সুদূর এশিয়া থেকেই এলো কেউ-কেউ। আর যতই দিন গেলো, ততই এইসব নানা দলের মানুষের মধ্যে মিশোল হ'তে লাগলো, আর তারাই হ'লো আদি মিশরের বাসিন্দা।

শেষকালে নিজেদের জন্যে একটা নামই তারা ঠিক ক'রে ফেললো : সে-নামটা ভারি অদ্ভুত। তাদের ভাষায় তারা যে-নাম দিলে, তার মানে হ'লো, 'মানুষ'—শুধু *মানুষ*। অর্থাৎ মানুষ নিজেকে *মানুষ* ব'লে ডাকতে শিখলো। তারা এইভাবে নিজেদের মানুষ ব'লে ডাকতে শিখে গেলো, তার মানে কিন্তু এই যে, পৃথিবীর তারাই হ'লো *একমাত্র মানুষ*, আর-কোথাও মানুষ নেই, আর-কেউ মানুষ নয়। মানুষ আর মিশরের লোক

—দুইই তাদের কাছে এক কথা। তাহ'লে কি তারা জানতো না যে পৃথিবীতে আরো বহু রকমের মানুষ আছে ? তা তারা ভালো ক'রেই জানতো কেবল অন্যদের ওরা মানুষ ব'লে মানতো না, তাদের কাছে অন্যরা হ'লো '*বিদেশী*', আর বিদেশী মানেই কিছুটা অন্য ধরনের, মানুষের চেয়ে কিছুটা খাটো, কিছুটা নিচু। মানুষ মানে কেবল *মিশরের মানুষ*, আর-কেউ নয়।

এমনতরো যে হ'লো, তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তার কারণটা খুবই স্বাভাবিক। রুক্ষ হলুদ মরুভূমির ভেতর একটুখানি জায়গায় প্রাণ তার সবুজ নিশান উড়িয়েছে, আর এই একরত্তি জায়গাটুকুই তাদের কাছে পুরো জগৎ: তার বাইরে পৃথিবী বলতে যে আর-কিছু আছে বা থাকতে পারে, তা তাদের পক্ষে ভালো ক'রে বুঝতে পারাই কঠিন ছিলো। মিশরই গোটা পৃথিবী, মিশরের অধিবাসীরাই কেবল মানুষ—শুধু যে এইসবই তারা ভাবতো তা-ই নয়, নদীর বেলাতেও এমনি। তাদের দেশের ওই-যে নীল নদ, ও ছাড়া পৃথিবীর আর-কোথাও যে নদী আছে বা থাকতে পারে, এমন কথা তারা যেন ভাবতেই পারতো না, তাই নদীটার ও-রকম নাম দিয়েছিলো তারা : *নীল*—বা *নাইল*; তাদের ভাষায় কথাটার মানেই হ'লো '*নদী*', শুধু *নদী*। তার মানে, *নদী* আর তাদের ওই নীল—একই জিনিশ; কারণ ওই নীল নদ ব'য়ে চলেছে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে, আর সেই কারণে তাদের ভাষায় উত্তর দিকে এগুনো, আর নদীর স্রোত বরাবর এগুনো একই কথা আবার উজানে যাওয়া বা দক্ষিণ দিকে যাওয়া—দুই-ই হ'লো এক। নীল ছাড়া আর-কোনো নদীর নাম তারা জানতো না, তাই তাদের ধারণায় নীল নদের স্রোত যেমন দক্ষিণ থেকে উত্তরে অন্য-সব নদীর স্রোতও তা-ই হ'তে বাধ্য। তাদের ওই ছোট্ট বিশ্বে এই একটি নদী ছাড়া আর-কোনো নদী ছিলো না, কাজেই পৃথিবী বলতে তারা কতটুকু জায়গা বুঝতো, তা সহজেই আন্দাজ করা যায়। আর তাই তারা মনে করতো, কালো রঙটাই ভালো, লাল মোটেই ভালো না। কেননা এই-যে তাদের একরত্তি পৃথিবী তার রঙটা কালো, আর তার পরেই শুরু হয়েছে মরুভূমি যার মাটি রুক্ষ, শুকনো, তপ্ত—লাল রঙের।

'এই-ই *নীলনদ* !' কেনেডি আশ্চর্য গলায় বললেন।

জোও চিৎকার ক'রে উঠলো, 'আশ্চর্য তো ! এই কিনা *নীলনদ* !'

বড়ো-বড়ো পাহাড় আর পাথর প'ড়ে আছে নীল নদের গতিপথে। কোথাও জলপ্রপাত, আর কোথাও-বা ফেনিল জলধারার মত্ত উচ্ছ্বাস তীব্রবেগে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। নদীর দু-পাশ ধ'রে অনেক গ্রাম আর স্নিগ্ধ শ্যামল শস্যের সম্ভার। গ্রামের বাসিন্দারা বেলুনের দিকে তাকিয়ে নিষ্ফল আক্রোশে নানারকম অঙ্গভঙ্গি আর অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শন ক'রে তাদের বিষম ক্রোধ প্রকাশ করতে লাগলো।

কেনেডি বললেন, 'কী সর্বনাশ ! এখানে নামতে গেলে তো মস্ত বিপদ হবে দেখছি !'

'তা সত্ত্বেও আমাদের নামতেই হবে,' ফার্গুসন দৃঢ় গলায় জানালেন। 'নয়তো

আমার অভিযানের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। অন্তত সিকি ঘণ্টার জন্যে হ'লেও নামতে হবে—সবকিছু দেখে-শুনে নেবার জন্যে। উত্তর দিক থেকে যে-সব অভিযানকারী এসেছিলেন, তাঁদের মাইল পাঁচেকের মধ্যে পৌঁছেছি এখন। নামবোই, তবে, খুব সাবধানে।'

ভিক্টরিয়া প্রায় হাজার-দেড়েক ফুট নেমে এলো। হঠাৎ ফার্গুসন চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন: 'আরে! ওই-যে নদীর ঠিক মধ্যিখানে একটা ছোটো দ্বীপের মতো রয়েছে। গোটা-চারেক গাছও তো রয়েছে দেখছি! ওটার নাম কী জানো? বেঙ্গা দ্বীপ। ভালোই হ'লো একদিক থেকে—এখানেই নামবো আমরা।'

'কিন্তু এখানে যে লোকজন থাকে ব'লে মনে হচ্ছে,' জো জানালে।

'তাইতো—ঠিকই তো! ওই-যে প্রায় জন-কুড়ি কালো মানুষ দেখা যাচ্ছে মাঠের ওপর। তাহ'লে তো ভারি মুশকিল হ'লো।'

'ওরা যাতে পালিয়ে যায় এমন কোনো ব্যবস্থা করলে হয় না?'

'হ্যাঁ, তা-ই করবো আমি।'

সূর্য তখন ঠিক মাথার ওপরে রক্ত চক্ষু জ্বেলে জ্বলছে, এমন সময় *ভিক্টরিয়া* মাটির দিকে নেমে আসতে লাগলো। নানাভাবে হাত-পা ছুঁড়ে বিকট গলায় চ্যাচামেচি করতে লাগলো নিচের অধিবাসীরা। একজন তার মাথার পাতার গোল টুপিটা আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলে। অমনি কেনেডি ক্ষিপ্র হাতে বন্দুক তুলে নিলেন। পলকে লক্ষ্য স্থির ক'রে সেই উড়ো টুপিটা তাগ ক'রে গুলি ছুঁড়লেন তিনি, অমনি টুপিটা টুকরো-টুকরো হ'য়ে গেলো। তাতেই কিন্তু কাজ হ'লো। আফ্রিকিরা বিষম ভয় পেয়ে চোঁ-চাঁ দৌড়ে ঝপ-ঝপ নদীতে লাফিয়ে পড়লো, তারপর সাঁৎরে দু-পারে উঠে গেলো। দ্বীপ থেকে চ'লে গেলেও মোটেই তারা শান্ত হ'লো না কিন্তু—দু-পার থেকে অজস্র তীর ছুঁড়তে লাগলো তারা। তাতে অবশ্য গাছের নিরাপদ আড়ালে নোঙর ক'রে-রাখা *ভিক্টরিয়ার* গায়ে আঁচড়টুকুও পড়লো না। বিষের তীরের নাগলের বাইরে *ভিক্টরিয়া* হাওয়ায় কেবল আস্তে-আস্তে দুলতে লাগলো।

দড়ির মই বেয়ে প্রথমে জো নিচে নেমে এলো, তারপর কেনেডি আর ফার্গুসন ধীরে-ধীরে নামতে লাগলেন।

কেনেডি প্রথমটায় নামতে রাজি হননি। 'আমি আবার খামকা নিচে নেমে কী করবো?'

'আমার একজন সাক্ষী থাকা দরকার, না-হ'লে লোকে আমার কথা বিশ্বাস করবে কেন?' স্মিত মুখে জানালেন ফার্গুসন।

'বেশ, চলো তা'হলে।'

'জো, তুমি কিন্তু খুব সাবধানে থেকো—ভালো ক'রে পাহারা দেয়া চাই।'

দ্বীপের একদিকে ছোটো একটি টিলা, দু-জনে চললেন সেদিকে। টিলার গায়ে ঝোপঝাড় গজিয়েছে, ফার্গুসন সোজা সেই ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। তারপর

নিচু হ'য়ে কী যেন খুঁজতে লাগলেন তিনি। কাঁটাগাছের খোঁচা খেয়ে তাঁর হাত-পা ছ'ড়ে গেলো, রক্ত ঝরলো, কিন্তু তবু তিনি ক্ষান্ত হলেন না। ডিক কেনেডি অবাক হ'য়ে বন্ধুর রকম-শকম দেখতে লাগলেন। হঠাৎ ফার্গুসন উৎসাহী গলায় ব'লে উঠলেন, 'এই-যে, এই-যে, পেয়েছি! দ্যাখো, ডিক, দ্যাখো!'

'আরে! এ-যে ইংরেজি হরফ দেখতে পাচ্ছি!'

ফার্গুসন কোনো সাতরাজার ধন বা গুপ্তধন খোঁজেননি, তিনি খুঁজছিলেন টিলার গায়ে বিশেষ একটি পাথরে স্পষ্ট হরফে দুটি ইংরেজি অক্ষরে খোদাই করা : এ. ডি.।

'এ. ডি. হ'লো অ্যানড্রিয়ে ডেবোনা-র নামের আদ্য অক্ষর।' ফার্গুসন বললেন, 'ডোবোনা ছিলেন খার্তুমের একজন ব্যবসায়ী, হাতির দাঁতের খোঁজে ঘুরতে-ঘুরতে ভদ্রলোক নীল নদের উৎসের কাছে এসে পৌঁছেছিলেন।'

'এই অক্ষরদুটি যে তারই নির্ভুল প্রমাণ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'তাহ'লে এবার বিশ্বাস হ'লো তো?'

'নিশ্চয়ই! এটা যে নীল নদ, তা মানতেই হয়। এমন অকাট্য প্রমাণের পরে তা আর কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।' কেনেডি স্বীকার করলেন।

আরেকবার অক্ষরদুটির দিকে কেমন জ্বলজ্বলে চোখে তাকালেন ফার্গুসন। তারপর বললেন, 'চলো এবার, শিগগির চলো বেলুনের দিকে। খুব সাবধান কিন্তু—আবার নদী পেরুবার চেষ্টা করছে আফ্রিকিরা।'

এর প্রায় দশ মিনিট পরেই আবার *ভিক্টরিয়া* শূন্যে উঠলো, এবার তার গায়ে পৎপতিয়ে উড়ছে গ্রেটব্রিটেনের পতাকা, *ইউনিয়ন জ্যাক*।

১৩

আস্তে-আস্তে দূরে মিলিয়ে গেলো নীলনদ আর তার আশপাশের অঞ্চল। তারপরে হাওয়া এলো প্রবল, আর কালো রাত চোখের সামনে সব ঢেকে দিলে। মস্ত একটা গাছের উপর নোঙর করা হ'লো বেলুন। যথারীতি ন-টা থেকে বারোটা পর্যন্ত পাহারা দিলেন ফার্গুসন, নির্দিষ্ট সময়ে কেনেডিকে ঘুম থেকে তুলে সাবধান ক'রে দিলেন, 'খুব হুঁশিয়ার থেকো কিন্তু।'

'কেন বলোতো! সন্দেহের কিছু কারণ ঘটেছে নাকি?'

'না, তবে গাছের ঠিক নিচে কিরকম-একটা শব্দ শুনেছি একবার। কিন্তু শব্দটা যে কীসের তা বুঝতে পারিনি।'

দোলনার রেলিঙ ধ'রে ঝুঁকে প'ড়ে কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন ডিক।

একবার যেন শো-দুই গজ দূরে আলোর এক ফুলকি জ্ব'লে উঠলো, পরক্ষণেই তা মিলিয়ে গেলো আবার। ছোট্ট সেই স্ফুলিঙ্গ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে আর্ত এক চীৎকার স্তব্ধ রাতটাকে চিরে দিলে। কোনো জন্তুর গলার আর্তনাদ? না কোনো রাত-জাগা পাখির? মানুষের গলাও কি হ'তে পারে?

চোখে দুরবিন লাগিয়ে ডিক অন্ধকারের মধ্যে দেখবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুই তাঁর চোখে পড়লো না। হঠাৎ মনে হ'লো কতগুলো কালো-কালো ছায়া যেন তাঁদের গাছের দিকে সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে। এমন সময় মেঘ একটু পাৎলা হ'য়ে গেলো, আর ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে একটু জ্যোৎস্না এসে ছড়িয়ে পড়লো। ডিক স্পষ্ট দেখতে পেলেন কতগুলো লোক এসে তাঁদের গাছের নিচে জড়ো হয়েছে। তক্ষুনি তিনি ফার্গুসনকে জাগিয়ে তুললেন।

'চুপ!' ডিক সাবধান ক'রে দিলেন ফার্গুসনকে, 'আস্তে কথা বলো। জো আর আমি মই বেয়ে বেলুন থেকে গাছটায় নেমে যাই।'

'তা-ই ভালো।' ফার্গুসন তাঁর প্রস্তাবে সায় দিলেন, 'আমি বেলুনে থেকে চট ক'রে যাতে আকাশে উড়ে যেতে পারি, তার ব্যবস্থা ক'রে রাখবো। কিন্তু সাবধান, নেহাৎ বেগতিক না-দেখলে বন্দুক চালিয়ো না। খামকা এদের কাছে আমাদের উপস্থিতি জানিয়ে কোনো লাভ নেই।'

প্রথমে কেনেডি নামলেন চুপিসাড়ে, তাঁর পেছন-পেছন নামলে জো, তেমনি নিঃশব্দে। গাছের মগডালেই একটা সুবিধাজনক জায়গা ঠিক ক'রে ভালোভাবে জো-কে নিয়ে বসলেন কেনেডি। কান পেতে যা শুনলেন, তাতে বুঝতে পারলেন যে কতগুলো লোক গাছে উঠে আসছে। বুনো পোকামাকড়ের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে গায়ে তেল মেখে এসেছে তারা, তার বোঁটকা দুর্গন্ধে নাক জ্ব'লে গেলো তাঁর।

হঠাৎ একটু পরে কেনেডির হাত টিপলো জো। সাপের মতো আস্তে, নির্ভুলভাবে, লোকগুলো চারপাশ দিয়ে ডালে-ডালে এগিয়ে আসছে। যখন দুটি মাথা কাছে এসে পড়লো, ডিক নির্দেশ দিলেন, 'গুলি চালাও!'

মাথা দুটি লক্ষ্য ক'রে গ'র্জে উঠলো দু-জনের বন্দুক। সঙ্গে-সঙ্গে বিকট একটা আর্তনাদ উঠলো, চটপট অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো লোকগুলো, আর সেই ধাবমান পদশব্দের মধ্যে আবার মর্মঘাতী আর্তনাদ উঠলো, কে যেন ফরাশিতে বলছে,—'বাঁচাও! বাঁচাও!'

ফার্গুসন বেলুন থেকে উত্তেজিত গলায় বললেন, 'ডিক, শুনছো, কোনো-এক ফরাশি বিপদে পড়েছে। নির্ঘাৎ ওই জংলিগুলোর হাতে পড়েছে! তাঁকে উদ্ধার না-ক'রে আমরা কিছুতেই নড়বো না!'

'কিন্তু ওই ভীষণ জংলিদের তাড়াবো কী ক'রে?'

'এখন যেমনভাবে তাড়ালে। ওরা যে আগ্নেয়াস্ত্রে অভ্যস্ত নয়, তা তো স্পষ্টই বুঝতে পারছো। ওদের সেই ভয়-পাওয়ার সুযোগই নিতে হবে আমাদের। সকাল অব্দি অপেক্ষা

করতে হবে অবশ্য, কেননা এই অন্ধকারে ঝুঁকি নেয়ার কোনো মানে হয় না। এরই মধ্যে আমাদের একটা ফন্দি বার করতে হবে, কী ক'রে এই ফরাশিকে মুক্ত করা যায়।'

'এদিকে যদি আজ রাতেই জংলিরা ওঁকে মেরে ফ্যালে ?'

'তা তারা করবে না। এ-সব জয়গায় জংলিরা সাধারণত দিনের বেলাতেই তাদের বন্দীদের হত্যা ক'রে থাকে।'

'আজ রাতেই তো সুবিধে বেশি। জংলিরা এখন নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে দূরে স'রে গেছে—এক্ষুনি কি আর সে-ভয় কাটিয়ে তারা ফিরবে ? এদিকে সেই ফরাশি লোকটা হয়তো মিথ্যেই ঘাবড়ে থাকবে।'

'তার আর কী আছে ? এক্ষুনি তাঁকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি।' এই ব'লে ফার্গুসন সেই সাহায্যপ্রার্থীকে উদ্দেশ ক'রে ফরাশিতে চেঁচিয়ে বললেন, 'আপনি যে-ই হোন, নির্ভয়ে থাকুন। এখানে আপনার তিন বন্ধু আপনার সাহায্যের জন্যে তৈরি হ'য়ে আছে।'

বন্দীর কাছ থেকে কোনো উত্তর এলো না, বরং হঠাৎ মিলিত কণ্ঠে জংলিরা উৎকট চেঁচিয়ে উঠলো।

'সর্বনাশ !' ডিক বললেন, 'জংলিরা নির্ঘাৎ একে এক্ষুনি সাবাড় ক'রে দেবে।'

'কিন্তু কীই-বা করবে তুমি এই অন্ধকারে ? কিছুই তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।'

এবার জো বললে, 'এই অন্ধকারকে আলো ক'রে দেবার কোনো উপায় নেই কি ?'

ফার্গুসন সরাসরি এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর না-দিয়ে চুপচাপ কী যেন ভাবলেন একটু। পরে বললেন, 'ঠিক আছে, তবে তা-ই হোক। বন্দুক হাতে তৈরি থেকো তোমরা —হয়তো গুলি চালাতে হবে আমাদের। জো, তুমি পাথরভরা থ'লে ধ'রে থাকবে, ইশারা করলেই তা ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। আর ডিক—তোমার হাতে বন্দীকে তুলে নিয়ে আসার ভার। কিন্তু মনে রেখো, আমার নির্দেশ ছাড়া কেউ কিছু করতে পারবে না। জো, তুমি নিচে গিয়ে চট ক'রে নোঙরটা খুলে দিয়ে দোলনায় ফিরে এসো।'

নিমেষে তার কর্তব্য পালন করলে জো। চুল্লির বৈদ্যুতিক ব্যাটারিতে দুটি তামার তার ব্যবহার করা হচ্ছিলো, ফার্গুসন সে-দুটিকে হাতে নিয়ে দুটো কয়লার টুকরো চেঁছে-চেঁছে তাদের মুখ ছুঁচলো ক'রে দিলেন, তারপর দুটিকেই তারের মুখে বাঁধলেন। ব্যবস্থা শেষ হ'লে, দোলনায় দাঁড়িয়ে দু-হাতে অঙ্গারদুটি ধ'রে একসঙ্গে ছুঁইয়ে দিলেন। অমনি চোখ-ধাঁধানো এক শাদা আলো জ্ব'লে উঠে আশপাশের কালো অন্ধকারকে দূর ক'রে দিলে।

সেই আলোয় দেখা গেলো, একটি খোলা মাঠের মাঝখানে মস্ত এক বাওবাব গাছের ডগায় তাঁদের বেলুন বাঁধা। দূরে, মাঠের এক প্রান্তে, কতগুলি নড়বোড়ে নিচু খোড়ো

বাড়ি, তার চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে অনেক লোক ; আর, বেলুনের ঠিক নিচেই দেখা গেলো মাটিতে প'ড়ে আছে বছর তিরিশ বয়সের এক শ্বেতাঙ্গ, শতছিন্ন তাঁর জামাকাপড়, সারা শরীরে বহু ক্ষতের চিহ্ন, তা থেকে দরদর ক'রে রক্ত ঝরছে ।

তাঁর পোশাক দেখেই জো চীৎকার ক'রে উঠলো, 'একজন মিশনারি দেখছি !'

'এঁকে আমাদের রক্ষা করতেই হবে ।' দৃঢ় গলায় ফার্গুসন ব'লে উঠলেন ।

লোকগুলো সম্ভবত বেলুনকে ভেবেছিলো মস্ত এক ল্যাজ-ঝোলা জ্বলন্ত ধুমকেতু ব'লে । ফার্গুসন তাঁর হাতের আলোকে কুটিরগুলোর দিকে ফেরাতেই তারা ভয় পেয়ে হুড়মুড় ক'রে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো ।

বেলুনের দোলনা মাটিতে ঠেকতেই ডিক নিচু হ'য়ে ঝুঁকে প'ড়ে দু-হাতে ফরাশি ভদ্রলোককে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিলেন, আর তক্ষুনি জো নুড়ি-ভরা বস্তাটা ছুঁড়ে ফেলে দিতেই বেলুন সবশুদ্ধু ভীষণ দুলে উঠলো, এক ঝাঁকুনিতে প্রায় হাজার ফিট ওপরে উঠে এলো । ফার্গুসন তামার তার দুটিকে আলাদা ক'রে দিলেন । চারদিক আবার কালো অন্ধকারে ডুবে যাবার আগে পলকে তিনি কব্জিঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিয়েছিলেন : রাত তখন একটা ।

দোলনায় উঠেই ফরাশি ভদ্রলোকটি হতচেতন হ'য়ে প'ড়ে গিয়েছিলেন । জ্ঞান ফিরতেই ফার্গুসন তাঁর দিকে ঝুঁকে প'ড়ে জানালেন, 'আর-কোনো ভয় নেই আপনার ।'

হ্যাঁ, খুব বেঁচে গেছি,' ভাঙা ইংরেজিতে অবসন্ন গলায় সেই ফরাশি ভদ্রলোক বললেন, 'ভীষণ মৃত্যুর হাত থেকে দৈব আমাকে বাঁচিয়েছে । আপনারা ঈশ্বরের দূত হ'য়ে এসেছেন—আপনাদের অনেক ধন্যবাদ । কিন্তু তাহ'লেও আর আমি বাঁচবো না, আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে । একটু পরেই যে আমার মৃত্যু হবে, তা আমি ঠিক জানি ।' এ-কথা ব'লেই তিনি ফের জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন ।

সেই রক্তাপ্লুত শীর্ণ দেহকে একটি কম্বলের উপর শুইয়ে দেয়া হ'লো ; ফার্গুসন দ্রুত হাতে তাঁর ক্ষতস্থলে পট্টি বেঁধে দিয়ে ওষুধ খাইয়ে দিলেন ।

এরপরে যখন তাঁর জ্ঞান হ'লো, ফরাশি ভাষাতেই তিনি তাঁর কাহিনী ব'লে গেলেন । তিনি জন্মেছিলেন গরিবের ঘরে । ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ইচ্ছে ছিলো ধর্মযাজক হবেন, সেইজন্যে তিনি রোমান ক্যাথলিক চার্চে যোগদান করেন ; আফ্রিকায় যখন তিনি এলেন, তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি । বহু বিপদ ও উৎপাত সহ্য ক'রে শেষকালে নীলনদের উৎসস্থলের কাছাকাছি এসে হাজির হন । স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে, তাঁর ধর্মকে আর তাঁর সহৃদয়তাকে মোটেই ভালো চোখে দ্যাখেনি, ফলে এই নিষ্ঠুরদের হাতে দু-বছর তাঁকে বন্দীভাবে কাটাতে হয়, তাঁর ওপর চলতে থাকে অবর্ণনীয় অত্যাচার । তবু তাদের জন্যে তিনি দিনরাত প্রার্থনা করেন, অনবরত সদুপদেশ দেন, শোনান সুসমাচারের গভীর বাণী । শেষে একদিন গৃহযুদ্ধের শেষে তারা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেলো ; তারপর তারা সেখান থেকে নতুন আস্তানার খোঁজে বেরুলো—যাবার সময় তাঁকে মৃত ভেবে পরিত্যাগ ক'রে গেলো ।

একটু সুস্থ হ'য়ে আবার তিনি আত্মনিয়োগ করলেন ধর্মপ্রচার ও মানবসেবার কাজে। তাঁর মতে সভ্যতার যা সবেচেয়ে বড়ো উপঢৌকন, তিনি যে-ভেট নিয়ে এসেছেন এই অজ্ঞাত মহাদেশে, সেই প্রীতির বাণীই তিনি নানা স্থানে ঘুরে-ঘুরে প্রচার করতে লাগলেন। আফ্রিকার সবচেয়ে হিংস্র আদিবাসী যারা, সেই নিয়াম-নিয়ামদের সঙ্গে পর্যন্ত তিনি বছরখানেক বসবাস করেন। এমন সময় হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় তাদের সর্দারের মৃত্যু হয়, সেই মৃত্যুর জন্যে তারা তাঁকেই দায়ী করে, এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। গত চল্লিশ ঘণ্টা ধ'রে অবিরাম নানাপ্রকার অত্যাচার চলে তাঁর ওপর। যদি অভিযাত্রীরা তাঁকে না-বাঁচাতেন, তাহ'লে আজ রাত দুপুরেই তাঁর হত্যাকাণ্ড সমাধা হ'তো।

'কোনো খেদ নেই আমার,' ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'মরতে বসেছি ব'লে কোনো পরিতাপ নেই। কখনও আমি বিলাপ করিনি আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে, মনস্তাপে বা সন্তাপে কখনও বিচলিত হ'য়ে পড়িনি। মৃত্যুর আগে এই-যে আমার শ্বেতকায় দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে দেখা হ'লো আর জীবনের শেষ মুহূর্তে এই-যে মাতৃভাষায় দুটো কথা কইতে পারলাম, এর মধ্যে কি ঈশ্বরের অসীম করুণা প্রচ্ছন্ন নেই? আমার অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে শেষবার আমি প্রার্থনা করবো আপনাদের যাত্রা যাতে নিরাপদ ও সার্থক হয়। দয়া ক'রে আমাকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিন।'

তাঁর অন্তিম প্রার্থনা পুরোপুরি শেষ করতে পারলেন না তিনি, কেনেডির কোলে তাঁর নিষ্প্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়লো। নীরবে দাঁড়িয়ে শোকার্ত অভিযাত্রীগণ এই করুণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন।

'এই দেশের জন্যেই বহু রক্তক্ষরণ হয়েছে এঁর। এখানেই এঁকে আমরা সমাহিত করবো।' ফার্গুসন ফিশফিশ ক'রে বললেন।

পরদিন কঙ্গোর উত্তর-সীমান্তের কিছু দূরে নেমে এই ফরাশি ধর্মযাজকের অন্ত্যেষ্টি সমাপন করা হ'লো। কবরের উপরে কাঠের ক্রুশ বসিয়ে দিয়ে ফার্গুসন খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন।

'কী ভাবছো?'

'ভাবছি? কিছু না।' অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন ফার্গুসন। 'ভাবছি প্রকৃতির কী নিমর্ম পরিহাস! আজীবন অসীম দারিদ্র্য আর দুঃখের মধ্যে কাটিয়ে তিনি কিনা অন্তিম শয়নে শুলেন সোনার ওপর!'

'সোনা। বলো কী!'

'হ্যাঁ, সোনার খনি! এই যে-সব পাথরের টুকরো তোমরা পা দিয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছো, এগুলোর ভিতর রেণুর মতো ছড়িয়ে আছে সোনা। তার পরিমাণ কত হবে জানো? —এখানে যত সোনা ছড়িয়ে আছে, তাতে শুধু গোটা অস্ট্রেলিয়া আর ক্যালিফর্নিয়াকেই ধনী করা যায় না, অনেক মরুভূমিকেও ভরিয়ে তোলা যায়।'

১৪

যেদিকে তাকানো যায়, কেবল মরা ধূলোর মরুভূমি । হলুদ, তপ্ত ধূ-ধু বালি ছড়িয়ে আছে দিগন্তের শেষ পর্যন্ত—জলহীন, জনহীন, প্রাণহীন : যে-কালো শ্যামলতা তাঁরা ছাড়িয়ে এলেন, তার সঙ্গে এর কোনোই মিল নেই—কিছুতেই ভাবা যায় না, সবুজের ঐ উদ্দাম বন্যার পর এই রুক্ষ লাল দিগন্ত-জোড়া পিপাসা থাকে কী ক'রে ।

ভয়ানক এক দুশ্চিন্তা আঁকড়ে ধরেছে ফার্গুসনকে । বেলুনে যে জল আছে, তাতে আর বেশি সময় চলবে না । অথচ কাছাকাছি কোথাও পানীয় জল পাবার সম্ভাবনা নেই । ফার্গুসন দস্তুরমতো ভয় পেলেন, চুল্লিকে সবসময় জ্বালিয়ে রাখার জন্যে পানীয় জল আরো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে ।

আকাশের অনেক ওপরে নিয়ে যাওয়া হ'লো বেলুনকে, যাতে চারদিকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় । সন্ধে নাগাদ প্রায় নব্বুই মাইল পাড়ি দেয়া হ'লো : জানজিবার থেকে এখন তাঁরা মোট প্রায় আড়াই হাজার মাইল দূরে এসে পৌঁছেছেন ।

দুরবিন চোখে দিয়ে বৃথাই জলের খোঁজে চারদিক নিরীক্ষণ করলেন ফার্গুসন, কিন্তু মরুভূমির মরা ধুলোর রুক্ষ তাপ ছাড়া আর-কিছুই দেখা গেলো না কোনোদিকে । বিষম এক অবসাদ আর হতাশা এসে আচ্ছন্ন করলো তাঁকে, কিন্তু মুখে তিনি কিছুই প্রকাশ করলেন না । কী ভীষণ দায়িত্ব তাঁর উপর ! প্রায় জোর ক'রেই তিনি এই দুটি প্রাণীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, এখন যদি জলাভাব হয়, আর তার ফলে যদি...ফার্গুসন আর-কিছু ভাবার চেষ্টা করলেন না । যে-দিকে চোখ যায় শুধু বালি আর কাঁটাঝোপ ; হলুদ লোলুপ, লেলিহান মরুভূমির দেশে প্রবেশ করেছে এবার বেলুন—শুধু নির্জলা প্রান্তর প'ড়ে আছে । হাওয়া নেই বললেই চলে ।

ভীষণ এক স্তব্ধতার ভিতর রাত কাটলো, একবারও দুচোখের পাতা এক করতে পারলেন না ফার্গুসন । যদি হাওয়া থাকতো প্রবল, তাহ'লে ভরসা পাওয়া যেতো—চট ক'রে হয়তো মরুভূমির এলাকা পেরিয়ে যেতে পারতো বেলুন । সকাল এলো, কিন্তু তবুও আকাশ নির্মেঘ, আর অসহ্য গুমোট, সব বাতাস যেন ম'রে গিয়েছে । ফার্গুসন হতাশায় ভ'রে গেলেন । 'গত দশদিনে আমরা মাত্র অর্ধেক পথ এসেছি, কিন্তু এখন যে-ভাবে বেলুন যাচ্ছে, তাতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে কত সময় যে লাগবে তা কেবল ঈশ্বরই জানেন । তার ওপর জল আবার ফুরিয়ে আসছে ।'

'নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও জল পাবো,' কেনেডি বন্ধুকে ভরসা দেবার চেষ্টা করলেন, 'কোনো-না-কোনো নদী কিংবা জলাশয় নিশ্চয়ই পথে পড়বে ।'

'আমিও তো সেই আশাতেই বুক বেঁধে আছি । ঈশ্বর করুন, তা-ই যেন হয় !'

মিলিয়ে গেছে সমস্ত বাড়ি-ঘর-গ্রাম, জনপদের শেষ চিহ্নটুকু । সর্বনেশে মরুভূমির ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে বেলুন, দিগন্তের অন্তরাল নেই, কেবল হলুদ বালিকে ঘিরে

আকাশের বিরাট বন্ধনী প'ড়ে আছে । অল্পই জল রয়েছে বেলুনে, পিপাসা মেটাবার জন্যে মোটেই যথেষ্ট নয় । প্রত্যেকের মুখে-চোখে আতঙ্কের কালো ছায়া ফুটে উঠলো ।

যতক্ষণ ফেরার উপায় ছিলো কিছুই বোঝা যায়নি যে এমন হবে । এখন আর পেছনে ফেরার উপায় নেই—শুধু মৃদু বাতাস সামনের দিকে ধীরে-ধীরে ঠেলে নিয়ে চলেছে । এক হয় যদি ঝড় আসে দৈবাৎ, আর উলটো দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় বেলুনকে । কিন্তু সেই দুরাশাটুকু করার মতো মনোবলও ছিলো না কারু । আগুন ঝরছে আকাশ থেকে, আগুন আর শুস্কতা—মেঘের চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই । সারাদিন মাত্র ত্রিশ মাইল পথ গেছে *ভিক্টরিয়া* । যদি জলের জন্য ভাবনা না-থাকতো, যদি এই উদ্বেগ কি উৎকণ্ঠা তাঁদের তাড়া না-করতো, তাহ'লে এইটুকু অগ্রগতিতে মোটেই তাঁরা বিচলিত হতেন না । কিন্তু তীক্ষ্ণ একটি যতিচিহ্নের মতো এই নির্মম সত্য সারাক্ষণ তাঁদের চেপে থাকলো : আর মাত্র তিন গ্যালন জল আছে ।

এক গ্যালন রাখা হ'লো ৯১ ডিগ্রি গরমের সহ্যাতীত পিপাসা মেটাবার জন্যে, বাকি দুই গ্যালন যাবে চুল্লির গ্যাস বাড়াবার জন্যে ; অথচ এই দুই গ্যালনে মাত্র ৪৮০ ঘন-ফুট গ্যাস তৈরি হবে, আর্থাৎ মাত্র চুয়ান্ন ঘণ্টা পথ চলা যাবে এর সাহায্যে ।

'পুরো চুয়ান্ন ঘণ্টাও চলা যাবে না,' ফার্গুসন বললেন, 'কেননা রাতে যাওয়া চলবে না—পাছে অন্ধকারে কোনো নদীনালা বা জলাশয় পেরিয়ে চ'লে যাই । কাজেই বাদবাকি যে-সামান্য সময়টুক আমাদের হাতে আছে, তার মধ্যে যে ভাবেই হোক না কেন জল আমাদের জোগাড় ক'রে নিতেই হবে । এখন থেকে সাবধানে জল খরচ করতে হবে —র‍্যাশন ক'রে দেয়াই ভালো ।'

'তা-ই ভালো ।' কেনেডি সায় দিলেন । 'এই জলেই ফোঁটা-ফোঁটা ক'রে আমাদের তিন দিন চালাতে হবে । তাতে যত কষ্টই হোক, তা ছাড়া আর-কোনো উপায় নেই । এর মধ্যে নিশ্চয়ই জল পেয়ে যাবো ।'

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর সামান্য জল পান করা হ'লো—অল্প জল, তৃষ্ণার পক্ষে যথেষ্ট নয় । রাত্রির মতো বেলুন নামলো বিরাট বালুকাময় ভূমিতে । নিটোল, ঝকঝকে, মিটমিট-জ্বলা তারারা ফুটে আছে আকাশে, আলোর ফুলের মতো, কিন্তু সেই সঙ্গে হাওয়া কেবল ছড়িয়ে দিচ্ছে শুষ্কতা । দিনের বেলায় খর রৌদ্রের সহ্যাতীত আঁচ—যেন সব পুড়িয়ে দিয়ে যাবে ।

সকালে পাঁচটায় ফের যাত্রা শুরু হ'লো, কিন্তু *ভিক্টরিয়া* কিছুতেই আর চলতে চায় না—স্থির দাঁড়িয়ে রইলো একই জায়গায় : গোটা জগৎ থেকেই যেন বাতাস উবে গিয়েছে, চরাচর পর্যন্ত যেন তৃষ্ণার্ত ।

'এই-ই হ'লো আফ্রিকার আসল চেহারা : তৃষ্ণা, তাপ আর হতাশা দিয়ে তিলে-তিলে শুকিয়ে মারে ।' ফার্গুসন আপন মনে ব'লে উঠলেন ।

সন্ধেবেলায় হিশেব ক'রে দেখা গেলো, সারা দিনে মাত্র কুড়ি মাইল পথ অতিক্রম করেছে বেলুন । দিনের বেলায় ঘন নিশ্বাসের মতো একটু উষ্ণ বাতাস তবু থাকে, কিন্তু

রাতে তাও ম'রে যায়। সারা শরীর জ্ব'লে যেতে চায় শুকনো তাপে, যেন ফোস্‌কা প'ড়ে যাবে।

পরদিন বিকেলে চারটের সময় দিগন্তে কতগুলো পাম গাছ দেখে সবাই চিৎকার ক'রে উঠলো, 'ঐ তো গাছ দেখা যাচ্ছে—নিশ্চয় মরূদ্যান আছে, এবার তাহ'লে জল পাবো !'

'বড্ড গরম !' জো শুকনো মুখে বললে, 'মরূদ্যান যখন পাওয়া গেলো, তখন এবার নিশ্চয়ই একটু জল পাওয়া যেতে পারে !'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই !'

প্রত্যেকে এক পাত্র ক'রে জল পান করলেন। আর মাত্র সাড়ে-তিন পাত্র জল রইলো। এদিকে গরম ক্রমশ অসহনীয় হ'য়ে উঠছে। আকাশে যদি মেঘও থাকতো একটু, তাহ'লে হয়তো রোদের খরতা একটু কমতো, কিন্তু মেঘের কোনো চিহ্নই নেই কোথাও।

ছ-টা নাগাদ পামগাছগুলোর কাছে এলো বেলুন। মরা কতগুলি গাছ নীরক্ত ও শ্বেত কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে, সব পাতা ঝ'রে গেছে। গাছগুলির তলায় একটু গহ্বর-মতো দেখা গেলো, হয়তো কোনোকালে কোনো কুয়ো ছিলো এখানে। ইতস্তত চারপাশে ছড়িয়ে আছে কতগুলি পাথর, কিন্তু একফোঁটাও জল নেই কোথাও ; পশ্চিম দিকে, অনেক দূর পর্যন্ত, নানা ধরনের কঙ্কাল প'ড়ে আছে ; মড়ার মাথার শাদা খুলি, রাশি-রাশি হাড় আর হাড়। যে-সব হতভাগ্যরা জলের আশায় এখানে এসে প্রাণ হারিয়েছে, সেইসব মানুষ আর প্রাণীর কঙ্কাল মৃত্যুর ঠাণ্ডা শাদা দাঁত-বার-করা টিটকিরির মতো প'ড়ে আছে। এই মরা গাছগুলি পথ দেখিয়ে এনেছে পিপাসার্তদের, তারপর তারা এখানে এসে অসহ্য তৃষ্ণায় এই হলুদ বালির ওপর প'ড়ে ধুঁকতে-ধুঁকতে আলিঙ্গন করেছে মৃত্যুকে।

বেলুন নামতেই সকলে কুয়োর দিকে গেলেন, তারপর তার গা বেয়ে ধাপে-ধাপে নিচে নেমে গেলেন কেনেডি, পেছনে গেলো জো। কিন্তু সব শুকনো, শুধু বালি আর বালি, হলুদ ধূ-ধূ, তপ্ত। আঙুলগুলি পাগলের মতো খুঁড়ে তুলতে চাইলো জল, কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো। অনেক অনেক বছর ধ'রেই শুকিয়ে মৃত প'ড়ে আছে এই কুয়ো। সর্বাঙ্গে বালি মেখে সঙ্গী দু-জন মূর্তিমান হতাশার মতো কুয়ো থেকে বেরিয়ে এলো, ফার্গুসন এক অবর্ণনীয় হতাশায় ভ'রে গেলেন।

রাতে খাওয়া-দাওয়া করা হ'লো নির্জলা। কারু মুখেই কোনো কথা নেই। সেই মৃত, রিক্ত, শ্বেতশুভ্র হাড়গুলি স্পষ্ট গলায় তাঁদের ভবিষ্যৎ জানিয়ে দিয়েছে।

১৫

পরের দিন—সে-দিন শনিবার—যখন বেলুনকে আকাশে তোলা হ'লো তখন আর মাত্র দু-ঘন্টা চলাবার মতো শক্তি আছে *ভিক্টরিয়ার*। এর ভেতরে যদি কোনো জলাশয় না-পাওয়া যায়, তাহ'লে মরুভূমির মরা ধূলোয় ম'রে প'ড়ে থাকা ছাড়া আর-কোনো উপায় নেই। তার সর্বগ্রাসী রিক্ততা নিয়ে প'ড়ে আছে হলুদ মরুভূমি, এমনকী একটু হাওয়াও সে রাখেনি অভিযাত্রীদের ভরসা দেবার জন্যে। রোদ এত প্রখর যে, সেই সকাল বেলাতেই পারা চড়চড় ক'রে উঠে গেলো একশো তেরো ডিগ্রি পর্যন্ত। ফার্গুসন তাকিয়ে দেখলেন, সঙ্গী দু-জন আচ্ছন্নের মতো চোখ বুঝে প'ড়ে আছেন। একাই তাঁকে শেষ চেষ্টা করতে হবে বাঁচবার। উদভ্রান্তের মতো তিনি চুল্লির আঁচ বাড়িয়ে চললেন, বেলুন উঠে এলো পাঁচ হাজার ফিট। কিন্তু নিচে যেমন ওপরেও তেমনি, একটুও হাওয়া নেই। সোজা ওপরে চ'লে এলো বেলুন মস্ত এক লম্বের মতো, একচুলও এদিক-ওদিক নড়লো না, তারপর একসময়ে সব গ্যাস সংকুচিত হ'য়ে ফের সেই খাঁ-খাঁ বালিতেই নেমে এলো, যেখান থেকে উঠেছিলো ঠিক সেখানেই।

বেলা তখন দুপুর। এখান থেকে পাঁচশো মাইল দূরে চাড হ্রদ, আর পশ্চিম উপকূলও প্রায় চারশো মাইল দূরে অবস্থিত।

ধীরে-ধীরে বেলা গড়িয়ে গিয়ে রাত এলো : আজ আর কেউ রাতের বেলায় পাহারা দেবার কথা ভাবলেন না, অথচ কারু চোখেই কিন্তু ঘুম নেই।

পরদিন প্রায় আধপাত্র আন্দাজ জল বাকি থাকলো। ঐ শেষ জলবিন্দুটুকু স্পর্শ করা হবে না ব'লে ঠিক হলো। আকাশ ঝকঝক করছে, তেমনি নির্মেঘ আর অগ্নিক্ষরা।

সন্ধের দিকে জো-র ভিতর পাগলামির লক্ষণ দেখা দিলো। মুঠো-মুঠো বালি তুলে সে বলতে লাগলো, 'আঃ কী *ঠাণ্ডা* জল!' তারপর মুখে পুরেই থুঃ থুঃ ক'রে ফেলে দিতে লাগলো, 'নাঃ, বড্ড বেশি নোনা জল—কিছুতেই পান করা যায় না।' চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হ'য়ে গেছে তার—চারদিকের বিস্তীর্ণ বালুকাকে সে বার-বার ভুল করতে লাগলো নীল সমুদ্র ব'লে।

ফার্গুসন আর কেনেডি প'ড়ে আছেন অসাড়। হামাগুড়ি দিয়ে জো দোলনার দিকে এগিয়ে গেলো। বোতলের জলের শেষ তলানিটুকু সে পান করবেই, না-হ'লে যেন এক্ষুনি পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে তার হৃৎপিণ্ড। তীব্র ইচ্ছাশক্তির বলে সে অবশ হাত নিয়েই বোতলটাকে কাছে টেনে নিলে, তারপর ঠোঁটের কাছে তুলে ধরতেই কানে শুনলো, 'আমায় একটু দাও, আমায় একটু!'

তাকিয়ে দ্যাখে, কেনেডিও হামাগুড়ি দিয়ে পাশে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কোনো কথা না-ব'লে সে তাঁর হাতে তুলে দিলে বোতলটি। মুহূর্তে সবটুকু জল নিঃশেষে গলায় ঢেলে দিলেন কেনেডি। ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে জ্বালাধরা চোখে সেদিকে তাকিয়ে

রইলো জো । তারপর দু-জনেই জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে গেলেন বালির মধ্যে ।

কীভাবে যে সেই ভীষণ রাত কাটলো, কেউ তা জানে না । সকালে মনে হ'লো সারা শরীর যেন দুমড়ে যাচ্ছে, কে যেন শুষে নিচ্ছে শরীরের সমস্ত রক্ত, সব রক্ত নিংড়ে নিয়ে কেবল খোশার মতো শরীরটা ফেলে দিয়ে যাবে সে । ভীষণ এক প্রেত সে, তীব্র তার চাহিদা, নাম তার পিপাসা—সে-ই সবাইকে ছিবড়ের মতো ফেলে রেখে যাবে, সব রক্ত নিঃশেষে পান ক'রে । জ্ঞান হ'তেই ওঠবার চেষ্টা করলে জো, কিন্তু কিছুতেই পারলে না । ফার্গুসন গুটিশুটি মেরে অসাড়ে প'ড়ে আছেন, কপালে উঠে আসতে চাচ্ছে তাঁর চোখের তারা । কেনেডির অবস্থা আরো ভীষণ : অনবরত মাথা ঝাঁকিয়ে চলেছেন তিনি, চোখের শাদা অংশটা রক্তের চাপে টকটকে লাল হ'য়ে গেছে । হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো দোলনার গায়ে রাখা রাইফেলটার দিকে । অমনি এক অদ্ভুত দীপ্তিতে মুহূর্তের জন্যে সারা মুখ ভ'রে গেলো তাঁর, চকচক ক'রে উঠলো চোখের তারা । অমানুষিক প্রচেষ্টায় তিনি এগিয়ে গিয়ে রাইফেলটাকে তুলে নিয়ে মুখের মধ্যে নলটা ঢুকিয়ে দিলেন । এবার ঘোড়ায় চাপ দিয়ে তিনি তাঁর জীবনের শেষ শিকার সমাধা করবেন । ট্রিগারের উপর তাঁর শিথিল আঙুল এসে পড়লো ।

'ও কী করছেন, থামুন ! থামুন ! থামুন !' ব'লে কেনেডির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো জো । রাইফেলটা নিয়ে প্রবল ঝুটোপাটি শুরু হ'য়ে গেলো দু-জনের ।

কেনেডি ভীষণ গলায় রুক্ষভাবে শাসিয়ে উঠলেন, 'সাবধান, জো, যদি ভালো চাও তো শিগগির ছেড়ে দাও, নয়তো তোমাকেই আমি গুলি ক'রে মারবো ।'

১৬

জো কোনো কথা বলেনি । প্রবল হাতে সে ভীষণ ঝাঁকুনি দিলে কেনেডিকে । এক হাতে বন্দুকের ট্রিগার চেপে অন্য হাতে জো-কে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেন কেনেডি । আর এই প্রচণ্ড টানা-হেঁচড়ার মধ্যে গুলিটা সশব্দে শূন্যের দিকে বেরিয়ে গেলো । শূন্যে মরুভূমির বুকে কোনো প্রতিধ্বনি না-তুলেই বাজ ফাটার আওয়াজ ক'রে শব্দটা মুহূর্তে মিলিয়ে গেলো, কিন্তু সেই আওয়াজেই ফার্গুসনের সংবিৎ ফিরে এলো হঠাৎ । দাঁড়িয়ে উঠে তিনি দু-হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন : 'ঐ-যে ! ঐ-যে ! ঐ দ্যাখো !'

আচমকা এই চীৎকার শুনে জো আর কেনেডি ধস্তাধস্তি থামিয়ে দিয়ে দিগন্তের দিকে ফিরে তাকালেন । আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন ক'রে প্রবল এক ঝড় এগিয়ে আসছে ভীষণবেগে—পাহাড়-উঁচু হ'য়ে এগিয়ে আসছে মস্ত এক বালির স্তম্ভ, যেন হঠাৎ নিস্তরঙ্গ কোনো সমুদ্রের সব জলরাশি ফুলে-ফেঁপে ফুঁশে উঠে এগিয়ে আসছে পাহাড়ের দিকে ।

ফার্গুসন সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সাইমুম !'

'*সাইমুম !*' অর্থ না-বুঝেই বিড়বিড় ক'রে কথাটার পুনরাবৃত্তি করলে জো ।

'ভালোই হ'লো !' অসহায় ক্ষোভে ভ'রে গেলেন কেনেডি, 'মৃত্যুর হাত থেকে আর ত্রাণ নেই ! ভালোই তো—আত্মহত্যার চেষ্টা করতে হবে না আর !'

সাইমুম এক-ধরনের লু—আরব মরুভূমির যে উত্তপ্ত শুষ্ক ধূলিময় ঝোড়ো বাতাস শ্বাস রোধ ক'রে উদ্দাম ব'য়ে যায়, তাকেই এই নামে ডাকা হয় । তার ভীষণতা স্বচক্ষে না-দেখলে বোঝা যায় না । কাজেই কেনেডির ক্ষোভ অসংগত নয় । কিন্তু ফার্গুসন অন্য কথা বললেন, 'না, ডিক, আর আমাদের ভয় নেই, এবারকার মতো আমরা বোধহয় বেঁচে গিয়েছি ।' এই ব'লে তিনি দ্রুত হাতে দোলনা থেকে বালি সরিয়ে দিতে লাগলেন । দেখাদেখি কেনেডি আর জো-ও তা-ই করলে, তারপর তিনজনে দোলনায় উঠে বসলেন । ঝড় তখন কাছে এগিয়ে এসেছে । উঠে বসতে-না বসতেই ঝোড়ো হাওয়ায় তৎক্ষণাৎ আকাশের দিকে উঠে গেলো বেলুন, আর প্রচণ্ড সেই সাইমুম তার প্রবল ধাক্কায় তীরবেগে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চললো ।

ঝড় থামলো বেলা তিনটেয় । যেমন আচমকা সে এসেছিলো, তেমনি অকস্মাৎ সে চ'লে গেলো, যাবার আগে স্মৃতিচিহ্ন হিশেবে নিচে রেখে গেলো মস্ত এক বালির পাহাড় । আকাশ আবার পরিষ্কার হ'য়ে গেছে, আবার নিশ্চল হ'য়ে আকাশে থরথর ক'রে কাঁপছে *ভিক্টরিয়া* । আর, সেই মুহূর্তে, অদূরে দেখা গেলো মস্ত একঝাড় খেজুর গাছ, মনোরম এক মরূদ্যান রচনা ক'রে তারা দাঁড়িয়ে আছে ।

'জল ! জল ! এ-যে নিচে জল !' চেঁচিয়ে বলে উঠলেন ফার্গুসন । বেলুনের ভাল্ভ খুলে দিতে হু-হু ক'রে সব গ্যাস বেরিয়ে গেলো, দ্রুত নিচে নেমে এলো *ভিক্টরিয়া* । এই চার ঘণ্টায় ঝড় তাঁদের আড়াইশো মাইল তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে ।

'সাবধান কিন্তু ! সঙ্গে বন্দুক নিয়ে যেয়ো ।' ফার্গুসন হুঁশিয়ারি শোনালেন ।

কেনেডি আর জো চট ক'রে লাফিয়ে নিচে নামলেন, ছুটে গেলেন কুয়োর কাছে । ধাপ বেয়ে-বেয়ে নিচে নেমে আকণ্ঠ জল পান করতে লাগলেন । আঃ, কী আরাম ! স্নিগ্ধ একটি সুষমায় দু-জনের সারা শরীর ভ'রে গেলো । ঈশ্বর করুণাময়, শেষ পর্যন্ত তিনিই তাঁদের পিপাসাকাতর নিষ্ঠুর মৃত্যু থেকে বাঁচালেন ।

আঁজলার পর আঁজলা জল পান করতে লাগলেন কেনেডি, পাগলের মতো ।

জো বারণ করলে : 'একসঙ্গে অত জল খাবেন না, খারাপ হবে । তাছাড়া তাড়াতাড়ি করুন—মিস্টার ফার্গুসনের জন্যেও তো জল নিয়ে যেতে হবে ।'

বন্ধুর নাম শুনে কেনেডির সংবিৎ ফিরে এলো । বোতল ভর্তি ক'রে জল নিয়ে ফিরতে যাবেন, এমন সময় কুয়োর মুখটায় হঠাৎ সূর্যালোক আড়াল ক'রে দিলো যেন কে ।

'এ-কী ! আমরা যে আটকা প'ড়ে গেলাম !'

'কী সর্বনাশ ! সিংহ দেখছি !' চীৎকার ক'রে উঠলো জো ।

'সিংহ নয়, সিংহী,' কেনেডি বললেন, 'দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি ।' মুহূর্তে লক্ষ্য স্থির ক'রে তিনি বন্দুকের ট্রিগারে চাপ দিলেন । ভীষণ আওয়াজে কুয়োর ভেতরটা ভ'রে গিয়ে তাঁদের বধির ক'রে দিলে, আর তারপরেই, কানে তালা লাগিয়ে বিকট আর্তনাদ ক'রে সিংহীটা গড়িয়ে কুয়োয় প'ড়ে গেলো । আর তারই প্রচণ্ড হ্যাঁচকা আঘাতে টাল সামলাতে না-পেরে হুড়মুড় ক'রে প'ড়ে গেলো জো । ঠিক এমন সময় অতর্কিত আবার একটি গুলির শব্দ শোনা গেলো । দেখা গেলো, ফার্গুসন এসে দাঁড়িয়েছেন ওপরে, তখনও তাঁর বন্দুক থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে ।

কেনেডি তাড়াতাড়ি উঠে এসে ফার্গুসনকে জলের বোতল দিলেন । কোনো কথা না-ব'লে তৎক্ষণাৎ ফার্গুসন সব জল ঢকঢক ক'রে গলায় ঢেলে দিলেন ।

১৭

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর তিনজনে গাছতলায় শুয়ে ঘুম দিলেন । তার আগে অবশ্য ভালো ক'রে চারদিক দেখে নেয়া হ'লো ধারে-কাছে অন্য-কোনো জীবজন্তু আছে কি না । যখন আর-কোনো জন্তু-জানোয়ার দেখা গেলো না, তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সবাই ভীষণ অবসাদের পর গভীর সুপ্তির হাতে নিজেদের সমর্পণ ক'রে দিলেন । ঘুম খুব ভালো হয়েছিলো, কেননা সকালে বেশ ঝরঝরে লাগলো শরীর, বেশ চাঙা লাগলো ।

বিশ্রামেই কাটিয়ে দেয়া হ'লো সারা দিন । ফার্গুসন স্থির করেছিলেন, অনুকূল বাতাস না-পাওয়া পর্যন্ত এখানেই বিশ্রাম করবেন । কিন্তু তাতেও আবার ভয় আছে । যদি এভাবে বেশি-দিন অপেক্ষা করতে হয়, তাহ'লে তো সব খাবার ফুরিয়ে যাবে, এবং অনাহারে মৃত্যু বরণ করতে হবে। এক মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে কিনা আরেক মৃত্যুর হাতে গিয়ে পড়তে হবে !

পিপেভর্তি জল নেয়া হ'লো । এখন মোটেই বাতাস নেই বটে, কিন্তু যখনই বাতাস আসে তখনই যাতে রওনা হওয়া যায় তার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে থাকা ভালো ।

ক্রমে সন্ধে হ'লো, তারপরে ধীরে-ধীরে রাত । জো পাহারা দিচ্ছিলো, হঠাৎ সে দেখলো অন্ধকার আরো গাঢ় হ'য়ে আসছে। তৎক্ষণাৎ সে চীৎকার করে উঠলো, 'শিগগির উঠুন শিগগির ! বাতাস আসছে—ঐ দেখুন, *বাতাস* !'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন ফার্গুসন আর কেনেডি । মিথ্যে বলেনি জো, সত্যিই ভীষণ ঝড় আসছে । চটপট তিনজনে বেলুনে উঠে বসলেন । একটুও অপেক্ষা করতে হ'লো না, উঠতে-না-উঠতেই কে যেন বেলুনের ঝুঁটি ধ'রে ওপরে টেনে নিলে, তারপর—দু-

শো ফিট ওপর দিয়ে—ঝড়ের তোড়ে উল্কার মতো ছুটে চললো *ভিক্টরিয়া* । হাওয়ার গতি এত ভীষণ যে, তিনজনে দোলনার রেলিঙ সজোরে আঁকড়ে ধ'রে রইলেন, না-হ'লে এই পুবমুখো ঝড় হয়তো উলটে ফেলে দেবে । জ্যা-মুক্ত ধনুঃশরের মতো ছুটে যাচ্ছে বেলুন, মনে হচ্ছে সে যেন যত তাড়াতাড়ি পারে এই মরুভূমি থেকে পালাতে চাচ্ছে ।

সকালবেলার দিকে সামান্য ঘাস দেখা গেলো নিচে, নানারকম গুল্ম, লতা-পাতা, তার পরে আরো-কিছু উদ্ভিদ । ধীরে-ধীরে মরুভূমির একঘেয়ে বালুকাময় বিস্তার অদৃশ্য হ'য়ে যেতে লাগলো, খানিক বাদেই দেখা গেলো কিছু ছোটোখাটো গাছপালা ।

কেনেডি ব'লে উঠলেন, 'যাক, শেষটায় প্রাণের রাজ্যে এসে পৌঁছুনো গেলো তাহ'লে !'

'কই, এখানে তো কোনো জনমানব দেখতে পাচ্ছি না !' জো বললে ।

ফার্গুসন বললেন, 'শিগগিরই দেখতে পাবে, কেননা আমরা খুব দ্রুতগতিতে এগুচ্ছি এখন । মাঝখানে যে-কদিন অনড় গেছে, হাওয়ারা এখন তা সুদে-আসলে পুষিয়ে দিতে চাচ্ছে যেন ।'

'হ্যাঁ । তবে শিগগিরই আমরা আরব-বেদুইনদের দেশে প্রবেশ করবো ।'

বাতাস অনুকূল ছিলো ব'লে বেশ ভালো ভাবেই ভেসে যাচ্ছিলো *ভিক্টরিয়া* । কম্পাস অনুযায়ী বোঝা গেলো বরাবর উত্তর-মুখো যাচ্ছে বেলুন ।

'অদৃষ্ট তো এখন সুপ্রসন্ন দেখছি,' ফার্গুসন বললেন, 'এভাবে চললে আজকেই আমরা চাড হ্রদের কাছে পৌঁছুতে পারবো ।'

চাড হ্রদ হ'লো মস্ত এক জলাশয় । বর্ষার সময় এর দৈর্ঘ্য হয় একশো কুড়ি মাইল ; তবে গ্রীষ্মের খর তাপে কোনো-কোনো জায়গা শুকিয়ে গিয়ে আয়তনে যৎকিঞ্চিৎ ছোটো হ'য়ে যায় ।

'শা-কুরু' নদীর গতিপথ ধ'রে চলতে লাগলো বেলুন । কালো বনে ঢাকা দুই তীর, মাঝে-মাঝে দেখা যায় অসংখ্য কুমির নদীর চড়ায় গা এলিয়ে দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে, কোথাও-বা আবার নদীর জলে পিঠ ভাসিয়ে দিয়ে ভেসে চলেছে ।

অবশেষে চাড হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে এসে পৌঁছুলো বেলুন । ইয়োরোপে যেমন কাস্পিয়ান সাগর, আফ্রিকায় তেমনি চাড হ্রদ । এতকাল ধ'রে লোকে তাকে ভাবতো কোনো অলীক কল্পনা ব'লে, কেননা অতি দুর্গম এলাকায় তার অবস্থান—জনবসতির বাইরে । প্রতিদিনই এর তীরভূমির পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, কখনও বাড়ছে কখনও কমছে, আর এর তীরভূমি এমন দুর্ভেদ্য জঙ্গল ও জলাভূমির দ্বারা আবৃত যে এর মানচিত্র নিখুঁত ক'রে আঁকা প্রায় অসম্ভব ছিলো ।

হ্রদের ভিতর ছোটা-বড়ো দ্বীপ অনেক আছে । এইসব দ্বীপে দুর্ধর্ষ হিংস্র বোম্বেটেরা বাস করে । তারা যখন *ভিক্টরিয়াকে* দেখলো, তখন ক্রোধে ও কৌতূহলে ফেটে প'ড়ে ওপর দিকে বিষের তীর ছুঁড়তে শুরু ক'রে দিলে । বেলুন অবশ্য তাদের তীরের অনেক

ওপর দিয়েই নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে উড়ে চ'লে গেলো ।

হঠাৎ জো চেঁচিয়ে বললে, 'ঐ দেখুন, মস্ত সব পাখিরা উড়ে আসছে এদিকে —সংখ্যায়ও নেহাৎ কম নয় তারা, দল বেঁধে আসছে সবাই ।'

'পাখি ? কোথায় ?' ফার্গুসন চোখ ফিরিয়ে দেখলেন 'কী সর্বনাশ ! এই সেরেছে ।'

'কেন ? পাখিদের কাছে আবার কোনো ভয়ের কারণ আছে নাকি ?'

'নিশ্চয়ই ! ওগুলো ঈগল—কী মস্ত একেকটা, দেখছো ! ওরা যদি বেলুন আক্রমণ করে, তাহ'লে আর রক্ষে নেই আমাদের !'

'তাতে আর ভয়ের কী ! আমাদেরও হাতে বন্দুক রয়েছে ।'

মিনিট-কয়েকের মধ্যেই ঈগলগুলি বেলুনের কাছে এসে পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরতে লাগলো । অতিকায় সব ঈগল, রোদ পড়ে সোনার মতো ঝকঝক করছে তাদের গা, বাঁকা চোখা নিষ্ঠুর চঞ্চু তার তীক্ষ্ণ ঠোকরে যে-কোনো পোক্ত জিনিশকেও ফুটো ক'রে দিতে পারে । ভয় ব'লে কিছুই যেন তারা জানে না—রকম-শকম দেখে মনে হ'লো তারা যেন সব ভীষণ রেগে আছে । ভীষণ ডানা মেলে প্রায় ছোঁ মারার ভঙ্গি ক'রে মুখ বেঁকিয়ে বারে-বারে ঘুরে-ফিরে বেলুনের আরোহীদের দেখে যাচ্ছে । ভাবখানা, এরা আবার কে এলো আকাশের স্বত্বে ভাগ বসাতে । দু-একটা তো বন্দুকের পাল্লার ভেতরেই এসে গেলো । কেনেডি তো বন্দুক তাগ ক'রে গুলি করবার জন্যে উশখুশ করতে লাগলেন, কিন্তু ফার্গুসন নিষেধ করলেন, 'খামকা ওদের চটিয়ো না, বরং তৈরি হ'য়ে থাকো । দেখাই যাক না, শেষ অব্দি কী হয় । আমি বললে তবে গুলি ছুঁড়বে । ওরা আহত হ'লে কিন্তু মারাত্মক হ'য়ে ওঠে ।'

কর্কশ কান-ফাটা চীৎকার ক'রে ঈগলগুলি বেলুনকে প্রদক্ষিণ ক'রে চাকার মতো ঘুরতে লাগলো । কয়েকটা পাখি প্রায় তিন ফিট লম্বা । হঠাৎ একটা ঈগল তার বিরাট বাঁকা ঠোঁট আর তীক্ষ্ণ নখর নিয়ে বেলুনটার দিকে ছোঁ মারার ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো । অমনি ফার্গুসনের ইঙ্গিতে কেনেডির বন্দুক অগ্নিবর্ষণ ক'রে গর্জে উঠলো । সৌভাগ্যবশত পাখিটার এমন জায়গায় গুলি লেগেছিলো যে সে প্রাণ হারিয়ে কাটা ঘুড়ির মতো পাক খেতে-খেতে মাটির দিকে প'ড়ে গেলো ।

ঈগলেরা একটু ভয় পেয়ে তখনকার মতো দূরে স'রে গেলো বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার দ্বিগুণ বিক্রমে বেলুনকে আক্রমণ করলে, অনেকে মিলে একসঙ্গে, এবং জো আর কেনেডির বন্দুক গর্জন ক'রে উঠলো : অব্যর্থ একেকজনের টিপ, দুটো পাখি ম'রে গেলো, ঘুরতে-ঘুরতে মাটিতে প'ড়ে গেলো তারা ।

এবারে ঈগলেরা আক্রমণের কৌশল পালটে নিলে । সোজা উঠে গেলো তারা বেলুনের ওপর, তারপরে তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে ভীষণ ছোঁ মারলে বেলুনের গায়ে । পরক্ষণেই দেখা গেলো বেলুন নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে ।

'সর্বনাশ ! ঈগলগুলো বেলুন ছ্যাদা ক'রে ফেলেছে ! জো, শিগগির বালির বস্তা-

কটা ছুঁড়ে ফেলে দাও—ভার না-কমালে বেলুন এক্ষুনি নিচে প'ড়ে যাবে ।'

নির্দেশ মতো কাজ করতে একটুও দেরি হ'লো না । কিন্তু তবুও বেলুন কেবল নেমেই চললো ।

'তাড়াতাড়ি আরো হালকা করো বেলুন ! জলের পিপে ফেলে দাও । কী সর্বনাশ —আমরা যে সোজা হ্রদের দিকে নেমে যাচ্ছি ।'

জলের পিপে ফেলে দেয়া হ'লো, কিন্তু বেলুন তবু নামছে । ফার্গুসন সভয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ক্রমশ যেন বিশাল জলরাশি বেলুনের দিকে উঠে আসছে । আরো হ্রাস পেলো তার দূরত্ব, আরো, আরো—প্রায় দুশো ফিটের মধ্যে নেমে পড়েছে বেলুন । এবারে সব খাবার-দাবার ফেলে দেয়া হ'লো । বেলুনের নিচের দিকে ধেয়ে আসা খানিকটা কমলো বটে, কিন্তু তবু নিচের দিকেই নেমে চলেছে ।—আর তবে রক্ষা নেই ! শোঁ-শোঁ শব্দ ক'রে সব গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে ছ্যাঁদা দিয়ে । যখনই তাঁরা পর-পর কতগুলি বিপদের হাত থেকে দৈবের অসীম দয়ায় নিষ্কৃতি পেয়ে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন, তখনই কিনা ঈগলগুলি এলো নাছোড় এক অভিসম্পাতের মতো !

'আরো-কিছু ফ্যালো ! আর কিছু কি নেই ফেলে দেবার মতো ?'

'আর তো কিছুই ফেলে দেবার নেই ।'

'কে বলে নেই ? এখনও আছে,' ব'লে জো কাউকে কোনো কথা বলার অবসর না-দিয়ে চট ক'রে দোলনা থেকে শূন্যে লাফিয়ে পড়লো ।

'এ কী করলে, জো ! এ কী !'

কিন্তু জো তখন সেই মস্ত হ্রদের দিকে, কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতো, প্রচণ্ড বেগে নেমে যাচ্ছে । আর তাকে দেখা গেলো না ।

এবারে কিন্তু *ভিক্টরিয়া* অনেক হালকা হ'য়ে যাওয়ায় ফের আকাশ উঠতে শুরু ক'রে দিয়েছে । প্রায় হাজার ফিট ওপরে উঠে গেলো বেলুন, আর হাওয়া তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো হ্রদের উত্তর তীরের দিকে ।

প্রথমটায় কিছুক্ষণ কোনো কথা জোগালো না দুই বন্ধুর মুখে । দু-জনেরই চোখ জলে ভ'রে ঝাপসা হ'য়ে গেলো । প্রবল এক খেদের ভাব ছেয়ে রইলো দু-জনকে —শোকে তাঁরা স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন । তাঁদেরই বাঁচাবার জন্যে জো কিনা এইভাবে অবধারিত মৃত্যুর দিকে লাফিয়ে পড়লো ! ঝাপসা চোখে নিচের দিকে তাকালেন, কিন্তু কিছুই দেখা গেলো না, বেলুন ততক্ষণে অনেক দূরে স'রে এসেছে ।

শেষে একসময়ে কেনেডি জিগেস করলেন, 'এখন তাহ'লে আমরা কী করবো ?'

'যত তাড়াতাড়ি পারি নেমে প'ড়ে তার জন্যে খোঁজ করবো ।'

প্রায় ষাট মাইল যাবার পর *ভিক্টরিয়া* চাড হ্রদের উত্তর তীরে এক জায়গায় এসে মাটি স্পর্শ করলে । নিচু একটি গাছে নোঙার ফেললেন ফার্গুসন ।

বেলা গড়িয়ে গেলো—দিগন্তের শেষ রশ্মিটুকু মিলিয়ে যাবার পরে কালো একটি

রাত্রি নেমে এলো উষ্ণ জঙ্গলের হ্রদের উপর ।

সেই রাতে ফার্গুসন বা ডিক—কেউই একবারও চোখের পাতা এক করতে পারেননি ।

১৮

হয়তো বেঁচে আছে জো । কেননা তার মতো চটপটে,, চতুর আর পাকা সাঁতারু নিশ্চয়ই ঐ হ্রদে ডুবে মরবে না । খানিকক্ষণ আলোচনা ক'রে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছুলেন দু-জনে । অন্তত এইভাবেই নিজেদের আশ্বাস দিতে চাচ্ছিলেন তাঁরা । মুখে কিন্তু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলে কী হবে, মোটেই কোনোরকম ভরসা ছিলো না কারু । বাঁচলে তাঁরা সুখী হন, এইজন্যেই এটা তাঁরা মনে-মনে ভেবে নিলেন । অনেকটা ইচ্ছাপূরণকারী দিবাস্বপ্নের মতো । যা হ'লে ভালো হবে, যা হ'লে বিবেক একটু সান্ত্বনা পায়, তা-ই তাঁরা ভাবলেন । সত্য নিষ্ঠুর ব'লে অনেক সময়েই মানুষ তার দিকে চোখ বুঝে এক অলীক স্বর্গ বানিয়ে নেয় । কিন্তু সে বেঁচে আছে এই ভেবে তো আর নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকা যায় না, তন্নতন্ন ক'রে চারদিকে অনুসন্ধান করতে হবে। দৈব দয়া করলে হয়তো ফিরেও পাবেন জো-কে । কিন্তু তাকে খুঁজতে বেরুবার আগে আরেকটি জরুরি কাজ সাঙ্গ করতে হবে তাঁদের । দুটি বেলুনের মধ্যে যেটি বাইরে ছিলো, ঈগলদের দুর্বিনীত হিংস্রতার চিহ্ন স্বরূপ সেটির নানা স্থানে কতগুলি ছিদ্র হ'য়ে গেছে । ওটাকে খুলে ফেলতে হবে প্রথমে, তাহ'লে অন্তত সাড়ে ছ-শো পাউণ্ড হালকা হবে বেলুন ।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই হ্রদের তীরে একটু ঘুরে দেখে-শুনে এলেন দু-জনে, তারপর কাজে লেগে গেলেন । প্রায় আড়াই ঘণ্টার গলদঘর্ম পরিশ্রমের পর বেলুনের বাইরের ঢাকাটা খোলা গেলো । বাইরের খোলটা না-থাকায় অবশ্য বেলুনটির ভেসে-থাকার ক্ষমতা পাঁচভাগের এক ভাগ ক'মে গেলো, কিন্তু তা নিয়ে এখন আর আপশোশ ক'রে কোনো লাভ নেই, কেননা ঐ অকেজো সাড়ে ছ-শো পাউণ্ড বেলুনে রেখে তাকে অক্ষম ক'রে রাখার চাইতে এটা তবু কিছুটা মন্দের ভালো হ'লো । কেনেডি একবার প্রশ্ন করেছিলেন, 'এর ফলে সবাইকে নিয়ে বেলুনটা উড়তে পারবে তো ?' ফার্গুসন তার জবাবে আশ্বাস দিয়েছিলেন তাঁকে, 'সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো । জিনিশপত্র সব আমি এমনভাবে উলটেপালটে সাজিয়ে নেবো যে জো ফিরে এলেও আমরা সবাই একসঙ্গে উড়তে পারবো ।'

বেলুনের বাইরের খোলটা খুলে ফেলার পর ফার্গুসনের পরামর্শ-মতো কেনেডি বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়লেন । অভিপ্রায় : যদি কোনো শিকার মেলে । যাবার আগে

ফার্গুসন তাঁক বারে-বারে বারণ ক'রে দিলেন 'বেশি দূরে যেয়ো না কিন্তু । এ-জায়গা সম্বন্ধে আমার কোনোই আন্দাজ নেই । কখন কী হয়, তার কিছুই ঠিক নেই ।'

কেনেডি শিকারে বেরিয়ে যাবার পর ফার্গুসন একাই বেলুনের সব জিনিশপত্র নতুন ক'রে সাজালেন । জো-র ওজন অনুযায়ী দোলনায় কিছু নুড়ি-পাথরও তোলা হ'লো, যাতে বেলুনের ভারসাম্য বজায় থাকে । এইসব করতে-করতেই বেলা গেলো । একসময় কেনেডি ফিরে এলেন । কতগুলি বুনো হাঁস আর নানা ধরনের পাখি মেরে এনেছেন ছররা-গুলি দিয়ে । আগুন জ্বালিয়ে সেগুলিকে রোস্ট ক'রে ভবিষ্যতের খাদ্য হিশেবে তুলে রাখা হ'লো ।

এইসব করতে-করতে সেই দিনটা কেটে গিয়ে রাত ক'রে এলো । খাওয়া-দাওয়ার পর পালা ক'রে দু-জনে ঘুমিয়ে নিলেন । শরীর যদি চাঙা ও সক্ষম না-থাকে, তাহ'লে কোনো কাজই হবে না ।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দু-জনে পরামর্শ করতে বসলেন, কী ক'রে জো-র তল্লাশ করা যায় । অন্তত জো-কে এটুকু তো জানানো উচিত, তাঁরা কোথায় আছেন । কিন্তু জো যে কোথায় আছে, তা না-জানলে সে-খবর তার কাছে পৌঁছে দেয়া যায় কী ক'রে ? শেষটায় ফার্গুসন বললেন, 'বড্ড অসহায় আমরা, ডিক । দৈবের হাতে সব সমর্পণ ক'রে দেয়া ছাড়া প্রায় কিছুই আমাদের করার নেই । তবে—এখন তো বাতাস ফের উলটো দিকে বইছে । আমরা ইচ্ছে করলে ফের হ্রদের দিকে যেতে পারি । তাই করি বরং, কী বলো ? তাতে অনুসন্ধানেরও সুবিধে হবে—তাছাড়া এমনও তো হ'তে পারে যে জো কোথায় আছে তা পথেই আমাদের নজরে প'ড়ে গেলো !'

এটা ফার্গুসন নিশ্চিত ক'রে জানতেন যে, কোনো বিপদে না-প'ড়ে থাকলে জো এসে তাঁদের দেখা দেবেই । কিন্তু এমনও তো হ'তে পারে যে *জংলিরা* তাকে বন্দী ক'রে রেখেছে । এমন অবস্থায় আকাশে বেলুন দেখে সে হয়তো একটু আশ্বস্ত হবে । একটি তথ্য ফার্গুসন জানতেন, সেটাই এখন তাঁর সৌভাগ্য ব'লে মনে হ'লো : এই অঞ্চলের *জংলিরা* বন্দীকে নাকি উন্মুক্ত স্থানে বেঁধে রাখে । তাঁর সব ধারণা তিনি বন্ধুর কাছে খুলে বললেন । দু-জনেই তক্ষুনি রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন ।

নোঙর খুলে আকাশে তোলা হ'লো *ভিক্টোরিয়াকে*, অমনি বিপরীত হাওয়ায় প্রায় কুড়ি মাইল বেগে হ্রদের ভেতর দিকে চলতে লাগলো বেলুন । ফার্গুসন তাপ নিয়ন্ত্রণ ক'রে বেলুনকে দুশো থেকে পাঁচশো ফিট উচ্চতায় রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন । কেনেডি মাঝে-মাঝে ফাঁকা আওয়াজ করতে লাগলেন বন্দুক দিয়ে ; যদি কোনোরকমে সে-আওয়াজ জো-র কানে গিয়ে পৌঁছোয়, তাহ'লে সে হয়তো সাড়া দিতে পারবে—অন্তত সাড়া দিক বা না-দিক, তাঁদের অবস্থান বুঝতে পারবে ।

জো যেখানে লাফিয়ে পড়েছিলো সে-জায়গা অতিক্রম ক'রে গেলেন তাঁরা, কিন্তু জো-র কোনো চিহ্নই দেখা গেলো না । কেনেডি একেবারে নিরাশ হ'য়ে পড়লেন । ফার্গুসনও যে হতাশ হননি তা নয়, কিন্তু মুখে সে-ভাব প্রকাশ না-ক'রে বন্ধুকে তিনি

আশা দিলেন, 'অত তাড়াতাড়ি মুষড়ে পড়ো কেন ? অমন হুতুশে স্বভাব ভালো না। একটু ধৈর্য ধ'রে থাকো—এত সহজে হতাশ হ'লে চলে না।'

বেলা যখন প্রায় এগারোটা বাজে, তখন ফার্গুসন হিশেব ক'রে দেখলেন যে এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা প্রায় নব্বুই মাইল অতিক্রম করেছেন। এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই অতর্কিতে আবার আরেক বিপদ। আচমকা প্রায় সমকোণের মতো ক'রে হাওয়ার গতি ঘুরে গেলো। ফার্গুসন বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। এভাবে গেলে আবার তাহ'লে সেই ভীষণ মরুভূমির খপ্পরে গিয়ে পড়তে হবে। উঁহু, সেদিকে আর-কিছুতেই যাওয়া চলবে না। যে-ক'রেই হোক হ্রদের আশপাশেই থাকতে হবে তাঁদের। অনুকূল বাতাসের আশায় বেলুনকে অনেক ওপরে তুলে নেবার ব্যবস্থা করলেন তিনি—অবশেষে অনেকটা ওপরে ওঠবার পর উত্তর-পশ্চিম এক হাওয়ার স্তর পাওয়া গেলো; সেই হাওয়া তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে গেলো গত রাতে তাঁরা যেখানে ছিলেন সেইদিকে। শেষে একসময়ে যথারীতি তীরভূমি দেখা দিলে, বেলুন নিচে নামিয়ে সেখানেই রাত কাটানোর ব্যবস্থা করা হ'লো।

সকালবেলায় আচমকা হাওয়া এমন প্রবল হ'য়ে উঠলো যে নোঙরের বাধা না-মেনে বেলুন প্রচণ্ডভাবে দুলতে লাগলো। বেশ বোঝা গেলো যে এখানে থাকা আর মোটেই নিরাপদ নয়। শিগগির দু-জনে বেলুনে উঠে পড়লেন।

কেনেডি অবশ্য একটু আপত্তি তুলেছিলেন, 'এভাবে আমরা চলে গেলে জো-র কী হবে ?'

'ওকে আমরা নিশ্চয়ই ছেড়ে যাবো না, ডিক। কিন্তু এখানে থাকলে কারুই কোনো উপকার হবে না, মাঝখান থেকে নিজেদের বিপদ ডেকে আনা হবে। বেলুনটা নষ্ট হ'য়ে যেতে-পারে। আর তাহ'লে জো-কে উদ্ধার করবার আশা চিরতরে বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে। সেটা নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

কিন্তু যাওয়ার আগে এক মুশকিলে পড়তে হ'লো। নোঙরটা মাটির ভিতর এতটা সেঁধিয়ে গিয়েছিলো যে অনেক চেষ্টা ক'রেও কিছুতেই তাকে টেনে তোলা গেলো না। শেষকালে কোনো উপায় না-দেখে ফার্গুসন নোঙরের দড়ি কেটে দিতে বাধ্য হলেন। যেই দড়ি কেটে দেয়া হ'লো, অমনি তড়াক ক'রে প্রায় তিনশো ফিট ওপরে উঠে গেলো বেলুন, সোজা চললো উত্তরমুখো, তীরের মতো। এই প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার হাতে নিজেদের সমর্পণ ক'রে দেয়া ছাড়া আর-কোনো উপায় নেই। স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন ফার্গুসন, বিষণ্ণ। ক্রমেই বেলুন একটু-একটু ক'রে তার সব ক্ষমতা হারাচ্ছে। ফেলে দেয়া হয়েছে জলের পিপে ও অন্য অনেক সরঞ্জাম, তার বাইরের খোলটাও চ'লে গেছে, এখন গেলো তার নোঙর। আর, শুধু তা-ই নয়, সর্বোপরি, তাঁর এতকালের এত অভিযানের সঙ্গী প্রিয় ভৃত্য জো-ও কিনা সঙ্গে নেই—হয়েতো তাকেও চিরকালের মতো হারাতে হ'লো। এ-কথা ভাবতে ফার্গুসনের বুক মোচড় দিয়ে উঠলো। অসীম নীলিমার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তিনি উদগত অশ্রুকে গোপন করলেন।

কাঁটাঝোপ আর বন্য গুল্ম-ভরা সুদান সীমান্তের টিবাউস মরুভূমি অঞ্চল পেরিয়ে এলো *ভিক্টরিয়া*। শোঁ-শোঁ ক'রে বেলুন তিন ঘণ্টায় প্রায় ষাট মাইল পথ পেরিয়ে এলো। নোঙর নেই ব'লে এখন বেলুনের ওপর কোনো কর্তৃত্বও নেই আরোহীদের। ফার্গুসন দেখলেন তাঁর নিজের হাতে-গড়া জিনিশ এখন আর তাঁর ইচ্ছেকে সম্মান করে না। এমন বিপদ, যে নামাও যাচ্ছে না, থামাতেও পারছেন না। এমনকী কোনো গাছ বা টিলাও নজরে পড়ছে না যে কোনোরকমে তার গায়ে গিয়ে বেলুন ঠেকবে। এমনিভাবে যদি খানিকক্ষণ চলে তো সাহারা মরুভূমিতে গিয়ে পৌঁছোতে হবে তাঁদের। সাহারার কথা ভাবতেই ফার্গুসনের শরীর শিউরে উঠলো। ঈশ্বর করুন কিছুতেই যাতে সাহারায় গিয়ে না-পৌঁছুতে হয়—একবার সাহারার পাল্লায় পড়লেই সব আশা শেষ হ'য়ে যাবে।

এদিকে ঝড়ের গতিও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। প্রবল ঘূর্ণি হাওয়ার প্রচণ্ড দাপটে ভয়ানকভাবে দুলতে লাগলো বেলুনের দোলনা—আতঙ্কে মুহ্যমান হ'য়ে অসহায় আরোহী দু-জন রেলিঙ আঁকড়ে নিরুপায়ভাবে ব'সে রইলেন। আর, এমনভাবে কতক্ষণ চলবার পর, আবার এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। হঠাৎ থমকে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লো বেলুন, সব হাওয়া মুহূর্তে স্তব্ধ হ'য়ে গেছে, কিন্তু পরক্ষণেই এলো আরেক ঝোড়ো হাওয়া, এবারে উলটো দিক থেকে। যেমন প্রচণ্ড গতিতে এতক্ষণ তাঁদের তাড়িয়ে এনেছিলো, তেমনি প্রচণ্ডভাবে আবার বেলুনকে আগের জায়গায় টেনে নিয়ে চললো। বাতাস যেন নতুন খেলনা পেয়েছে তার হাতে, তাই তাকে নিয়ে বাচ্চাদের মতো লোফালুফি খেলছে এখন।

'এ আবার কোথায় চলেছি?'

'ঈশ্বরের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখো, ডিক। আবার দক্ষিণ দিকেই চলেছি আমরা। এতক্ষণ আমি সেদিকেই যেতে চাচ্ছিলুম। হয়তো শেষ অব্দি আমরা বরনু এলাকার কুকা শহরে গিয়ে পৌঁছুবো।'

'মনে হচ্ছে ঝড় শিগগিরই ক'মে যাবে। আকাশ তো বেশ পরিষ্কার হ'য়ে এলো।'

'ভালোই তো। দুরবিন নিয়ে ভালো ক'রে তাকিয়ে দ্যাখো চারদিকে—কোনোকিছুই যেন আমাদের নজর এড়িয়ে চ'লে যেতে না-পারে।'

১৯

দুরবিনের ফুটোয় চোখ রেখে হঠাৎ একসময়ে কেনেডি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে! ঐ-যে, দূরে, কতগুলো ঘোড়সোয়ার ছুটে চলেছে ব'লে মনে হচ্ছে! অবশ্য ভীষণ ধূলো উড়ছে, তাই ভালো ক'রে সঠিক কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ফার্গুসন সেদিকে দুরবিন ঘুরিয়ে নিলেন : 'ঘোড়সোয়ার ব'লেই তো মনে হচ্ছে। তবে অনেক দূরে রয়েছে ব'লে ঠিকঠাক চেনা যাচ্ছে না, কেবল কালো কতগুলো চলন্ত ফুটকিই চোখে পড়ছে।'

'আমি নজর রাখছি। খুব অবাক লাগছে আমার। হয়তো কোনো অশ্বারোহী সেনাবাহিনী চলেছে।'

'তোমার আন্দাজই সম্ভবত ঠিক। ওরা নির্ঘাৎ কোনো আরব ঘোড়সোয়ার বাহিনী। আমরা যেদিকে যাচ্ছি, ওরাও সেই দিকেই যাচ্ছে। অবশ্য ওদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি যাচ্ছে আমাদের বেলুন, কাজেই কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছুবো। তখন না-হয় ভেবে দেখা যাবে, আমাদের কী করা উচিত।'

'ঠিকই ধরেছো তুমি।' কেনেডি কিছুক্ষণ ভালো ভাবে দেখে নিয়ে বললেন, 'আরব সওয়ারদের বাহিনী ব'লেই মনে হচ্ছে। কী জোরে ছুটছে, দেখেছো ? ঠিক তীরের মতো। জনা-পঞ্চাশেক হবে সংখ্যায়। সার বেঁধে চলেছে সবাই মিলে। দলের সর্দারটি প্রায় শো-খানেক গজ আগে-আগে যাচ্ছে।

'ওদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। দরকার বুঝলে এখানেই বেলুন নামাবার ব্যবস্থা করবো। তুমি কী বলো ?'

'ভারি আশ্চর্য তো ?' কেনেডি দুরবিনের ফুটোয় চোখ রেখেই বিস্মিত স্বরে ব'লে উঠলেন, 'বড়ো অদ্ভুত লাগছে আমার—ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। ওদের গতিবেগ, চলার ভঙ্গি আর বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে তো নেহাৎ সাধারণ কোনো রুটিন কুচকাওয়াজ ব'লে মনে হচ্ছে না। এ যেন কাউকে তাড়া ক'রে নিয়ে চলেছে ওরা। ফার্গুসন, আমার কিন্তু কী রকম লাগছে ! আরো স্পষ্ট না-দেখে বেলুন নামানো বোধহয় উচিত হবে না।'

'তুমি ঠিক দেখেছো তো ?'

'নিশ্চয়ই ! উঁহু, ফার্গুসন, আমার আন্দাজ মোটেই ভুল হয়নি। সত্যিই কাউকে ভীষণভাবে তাড়া ক'রে যাচ্ছে ওরা। সামনের ঐ লোকটা সর্দার নয়—ওকেই ধরবার জন্যে ছুটেছে। ক্রমেই তার সঙ্গে ওদর দূরত্ব ক'মে আসছে। একজন লোককে ধরবার জন্যে আস্ত একটা বাহিনী ! কী ব্যাপার বুঝতে পারছি না তো ! সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে আমার কাছে ! খুব রহস্যময় ব'লে মনে হচ্ছে !'

বেলুন আরো কাছে এগিয়ে এলো। প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে ঘোড়সোয়ারেরা।

হঠাৎ কেনেডি বিস্ময়ের স্বরে চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'ফার্গুসন ! এ কী দেখছি !'

বন্ধুর গলার স্বর শুনে ফার্গুসন আঁৎকে উঠলেন। 'কী ? কী হ'লো ?'

'এ কি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম ?'

'কী ব্যাপার ?'

'এ-যে জো !' দুরবিনে স্থির দৃষ্টি রেখে কেনেডি ব'লে উঠলেন, 'জো-কেই এই আরবরা তাড়া ক'রে নিয়ে যাচ্ছে ! ক্রমেই ব্যবধান ক'মে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে !'

১

পাহাড়ে কী হয়েছিলো

এই গল্পে আমার নিজের সম্বন্ধে যদি আমি কয়েক কাহন ফাঁদি, তবে তা শুধু এই জন্যেই যে এই গল্পের চমকপ্রদ সব ঘটনার সঙ্গে আমি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলুম, গোটা বিংশ শতাব্দীও এমন বিস্ময়কর ঘটনাবলির মুখোমুখি কখনও পড়বে কি না সন্দেহ। মাঝে-মাঝে আমি নিজেকেই জিগেস ক'রে বসি : এ-সব ঘটনা সত্যি-সত্যি একদিন ঘটেছিলো তো ? এ-সব কি আমার স্মৃতির মধ্যে যথার্থই খোদাই-করা আছে, যেমন ঘটেছিলো হুবহু তেমন—নাকি স্মৃতির পটে এই-যে-সব ছবি খোদাই-করা আছে সে-সব নিছকই আমার তেতে-ওঠা কল্পনার সৃষ্টি ? ওয়াশিংটনে ফেডারেল পুলিশ বিভাগের চীফ-ইন্‌স্‌পেক্টর হিশেবে—শুধু-যে পুলিশে কাজ করি আমি, তা-ই নয়, আমার ইচ্ছেও করে, সব দুর্বোধ্য প্রহেলিকার জট খুলে দেখতে, যা-কিছু রহস্যময় ও কুহেলিঘেরা তাকেই খুঁটিয়ে তন্নতন্ন ক'রে দেখে বোঝবার চেষ্টা করাটা আমার ধাতের মধ্যেই আছে—কিন্তু চীফ-ইন্‌স্‌পেক্টর হিশেবেই আমি এই তাজ্জব আর অসাধারণ ঘটনাগুলোয় বিশেষভাবেই কৌতূহলী হ'য়ে পড়েছিলুম। আর যেহেতু সরকার আগেই আমাকে—যখন আমি নেহাৎই কিশোর, তখনই—বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর রহস্যময় গোপন তদন্তে নিয়োগ করেছিলো, সেইজন্যেই খুব সহজেই, স্বাভাবিকভাবেই, আমার বিভাগের বড়োকর্তা আমারই ওপর এই তাকলাগানো তদন্তটার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, আর কাজটা হাতে নিয়েই আমার মনে হচ্ছিলো আমি যেন কত-কত দুর্ভেদ্য রহস্যের সঙ্গে সরাসরি এক মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হ'য়ে পড়েছি।

আজ যে-কাহিনীটা বলতে বসেছি, তা শুরু করার আগেই এটা ব'লে নেয়া ভালো যে আমি এখন যা বলবো তা আপনাদের বিশ্বাস করতে হবে। এটা খুবই জরুরি। কারণ কতগুলো তথ্য এখানে এমন থাকবে, যেগুলোর সম্বন্ধে একমাত্র যা সাক্ষ্যপ্রমাণ মিলবে, তা শুধু আমারই কথা, আমারই এজাহার—এদের প্রমাণ করবার জন্য অন্য-কারু নজিরই আমি হাজির করতে পারবো না। আপনারা যদি আমাকে বিশ্বাস করতে না-চান তো সে আপনাদেরই অভিরুচি—এবং আপনাদের সে-সব কথা বিশ্বাস করতেও আমি বলছি না। আমি নিজেই তো এর বেশির ভাগ ঘটনাই এখনও বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছি না।

এই অদ্ভুত ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করেছিলো আমাদের এই বিশাল মার্কিন

'দেখি ! দেখি !' ব'লে ফার্গুসন দুরবিন তুলে নিলেন ।

'আরে ! সত্যিই তো !'

'ও আমাদের দেখতে পায়নি ।'

'এক্ষুনি আমি সব ব্যবস্থা করছি !' এই ব'লে ফার্গুসন চুল্লির আগুন কমিয়ে দিলেন ।'কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা ওর ঠিক মাথার ওপর গিয়ে পৌঁছে যাবো ।'

বেলুন ক্রমে নিচে নেমে আসছে । আরব-বেদুইনদের বেলেল্লা চীৎকার শোনা যাচ্ছে বেলুন থেকে । বিকট গলায় চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে জো-র পশ্চাদ্ধাবন করছে তারা, তাদের পিছনে যে বেলুন এসে গেছে তা তাদের নজরে পড়েনি । প্রায় পাঁচশো গজের মধ্যে এসে পড়েছে *ভিক্টরিয়া* ।

'আমি বন্দুক তুলে ফাঁকা আওয়াজ করছি,' কেনেডি বললেন, 'তাহ'লেই ও ফিরে তাকিয়ে আমাদের দেখতে পাবে ।'

আরবদের সঙ্গে জো-র দূরত্ব আরো অনেক ক'মে গিয়েছে । ছুটতে-ছুটতে একজন আরব তাকে লক্ষ্য ক'রে বল্লম উঁচোলো । কেনেডি আর দেরি করলেন না, তক্ষুনি তাঁর অব্যর্থ নিশানায় গুলি ছুঁড়লেন ; পলকের মধ্যে আরবটি ঘোড়া থেকে ছিটকে ডিগবাজি খেয়ে প'ড়ে গেলো । জো কিন্তু বন্দুকের আওয়াজ শুনেও ফিরে তাকালো না, কোনো দৃক্‌পাত না-ক'রেই সামনের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে লাগলো ।

কেনেডির বন্দুক অবশ্য আরেকবার অগ্নিবর্ষণ করলো । আরেকজন আরব ঘোড়া থেকে প'ড়ে গেলো, আর কয়েকজন আবার হঠাৎ থেমে গিয়ে চটপট মাটিতে নেমে পড়লো—বোধকরি সঙ্গীদের অবস্থা দেখার জন্যে : বাকিরা কোনো দিকে দৃক্‌পাত না-ক'রে সোজা জো-র পেছন পেছন ছুটে গেলো ।'ব্যাপার কী বলো তো ? জো থামছে না কেন ?'

'না-থেমে ভালোই করেছে । ঠিক বেলুনের গতিপথ ধ'রেই এগিয়ে যাচ্ছে ও, নিশ্চয়ই আমাদের ভরসাতেই আছে । শাবাশ জো ! দ্যাখো না, আমি গিয়ে ওকে একেবারে আরবদের নাকের ডগা থেকে তুলে নিয়ে আসবো । আমরা আর অল্পই পেছনে আছি । একটু সবুর ।'

'কিন্তু এই সময়টুকু আমরা কী করবো ?'

'তুমি বরং বন্দুকটা রেখে দিয়ে এক কাজ করো । পাউণ্ড-পঞ্চাশেক ওজনের একটা কোনো বস্তা তুলে ধরতে পারবে তুমি ?'

'নিশ্চয়ই । তার চেয়ে ঢের বেশি ওজন তুলতে পারি আমি ।'

'ঠিক আছে ।' ফার্গুসন একটা পাথর-ভরা বস্তা তুলে দিলেন কেনেডির হাতে । 'এটা নিয়ে তুমি তৈরি হ'য়ে থাকো । যেই আমি ইঙ্গিত করবো, অমনি ওটাকে ফেলে দিতে হবে । কিন্তু খুব সাবধান, আমার নির্দেশ না-পাওয়া অব্দি কিছুতেই ফেলো না যেন তাহ'লে মুশকিল হবে ।'

'ঠিক আছে। তুমি যেমন বলবে, তা-ই হবে।' *ভিক্টরিয়া* ততক্ষণে আরব ঘোড়সোয়ারদের মাথার ওপর এসে পড়েছে। ফার্গুসন দোলনার সামনের দিকে এসে দাঁড়ালেন, হাতে তাঁর দড়ির মই, সময়-মতো ওটাকে ছুঁড়ে দেবেন জো-র কাছে। জো তখন আরবদের কাছ থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফিট দূরে, পুরো কদমে তার ঘোড়া ছুটছে ধুলো উড়িয়ে, তুমুল টগবগ আওয়াজ ক'রে। *ভিক্টরিয়া* আরব বেদুইনদের ছাড়িয়ে চ'লে এলো।

ফার্গুসন তাঁর বন্ধুকে জিগেস করলেন, 'তৈরি তো ?'

'হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত হ'য়ে আছি।'

'জো ! জো ! ওপরে তাকিয়ে দ্যাখো,' এই ব'লে গলার জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন ফার্গুসন, সেইসঙ্গে দড়ির মইটা তিনি ফেলে দিলেন নিচে, মাটি পর্যন্ত নেমে গেলো সেটা।

ফার্গুসনের গলা শুনে ঘোড়ার গতি না-থামিয়েই পেছন দিকে ফিরে তাকিয়েছিলো জো। দড়ির মইটা কাছে আসতেই চক্ষের পলকে সেটা ধ'রে সে ঝুলে পড়লো, আর মনি ফার্গুসনের নির্দেশ অনুযায়ী পাথরভরা বস্তাটা কেনেডি ফেলে দিলেন। ভার ক'মে ওয়ায় তৎক্ষণাৎ এক ঝটকায় প্রায় দেড়শো ফিট ওপরে উঠে গেলো *ভিক্টরিয়া*।

কঠিন, আঁটো হাতে দড়ির মই ধ'রে ঝুলে রইলো জো। ঝাঁকুনিতে তখন সেটা ভীষণভাবে দুলছিলো, একটু যদি ফসকে যায় বা কোনোরকমে মুঠো আলগা হ'য়ে যায়, তাহ'লে আর রক্ষে নেই। শ্বাস রোধ ক'রে জো-র কাণ্ড দেখতে লাগলেন তাঁরা। জো-র কপালের শিরাগুলি তখন রক্তচাপে প্রবলভাবে ফুলে উঠেছে, অস্বাভাবিক এক দীপ্তিতে তার চোখ জ্ব'লে উঠেছে, ক্রমশ যেন ইন্দ্রিয়গুলির ওপর থেকে সে অধিকার হারিয়ে ফেলছে। আর তারই সঙ্গে মানিয়েই যেন নিচের আরবদের চ্যাচামেচিতে সে কিছুই শুনতে পাচ্ছিলো না, এমনকী হাওয়ার শব্দও তার কানে পৌঁছুচ্ছিলো না। সার্কাসের ওস্তাদ খেলোয়াড়ের মতো অদ্ভুত কৌশলে তর-তর ক'রে সে অল্পক্ষণের মধ্যেই দোলনায় উঠে এলো।

দোলনায় পা দিতেই দুই বন্ধু তাকে জড়িয়ে ধরলেন। নিচে বেদুইনদের ক্রুদ্ধ শোরগোল তখন চরমে পৌঁছেছে, কিন্তু বেলুন যত দূরে স'রে যেতে লাগলো—সেই আওয়াজও একটু-একটু ক'রে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

'*প্রভু* ! মিস্টার কেনেডি !' কেবল এই দুটি কথা ব'লেই জো অজ্ঞান হ'য়ে পড়লো। তার শরীরে আর একটুও ক্ষমতা ছিলো না। আফ্রিকার উষ্ণ শুকনো হাওয়া সব যেন শুষে নিয়েছে। উত্তেজনা আর অবসাদ যেন পাকে-পাকে পেঁচিয়ে ধরছে তাকে। শরীরের নানা জায়গায় ছোটো-বড়ো কত যে ক্ষত। সে-সব থেকে রক্ত পড়ছে চুঁইয়ে। ফার্গুসন তাড়াতাড়ি তাতে নানারকম ওষুধ লাগিয়ে পট্টি বেঁধে দিলেন। একটু পরেই জ্ঞান ফিরে এলো জো-র, মিনমিনে গলায় সে জল খেতে চাইলো। ঢক-ঢক ক'রে বোতল-ভর্তি জল নিঃশেষ খেয়ে সে অবসাদ আর ক্লান্তির ফলে ঘুমিয়ে পড়লো। বেলুন তখন

যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনার পশ্চিমভাগে। সেখানে, নীলগিরি পর্বতমালার একেবারে দুর্ভেদ্যগভীরে উঠেছে এক মস্ত চূড়া—যার নাম *গ্রেট আইরি*—ঈগলপাখির মস্ত বাসা। তার বিশাল বর্তুল আকৃতিটা কাটাওয়াবা নদীর তীরে ছোট্ট-যে শহর আছে, মরগ্যানটন নাম, সেখান থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ে। আরো স্পষ্ট চোখে পড়ে যখন কেউ প্লেজেন্ট গার্ডেন গ্রামটার মধ্য দিয়ে গিয়ে পাহাড়টার দিকে এগিয়ে চ'লে যায়।

আশপাশের অঞ্চলের লোকে কেন-যে এই পাহাড়চূড়ার নাম দিয়েছিলো *গ্রেট আইরি* —ঈগলপাখির মস্ত বাসা—তা আমি এখনও জানি না। পাহাড়টা উঠে গেছে পাথুরে, রুক্ষগম্ভীর, অগম্য, আর বিশেষ-বিশেষ আবহাওয়ায় তার গায়ে জড়িয়ে থাকে এক গভীর-নীল ও অদ্ভুত-সুদূর ভঙ্গি। তবে নামটা শুনে প্রথমেই যে-ভাবনাটা লোকের মাথায় খেলে যাবে, তা হ'লো নিশ্চয়ই এখানটায় শিকারি পাখিরা এসে বাসা বাঁধে, আস্তানা গাড়ে, তা-ই এই নাম : ঈগল, কণ্ডর, গৃধিনী ; অগুনতি পালকখচিত পাখনাওলা জীবের বসতি, মানুষের নাগালের বাইরে এই দূর-চূড়ার উপর ডুকরে ডেকে-উঠে পাক খেয়ে যাচ্ছে তারা। অথচ, এদিকে কিন্তু, এই *গ্রেট আইরি* পাখিদের যে খুব-একটা আকৃষ্ট করে তা অবশ্য মনে হয় না ; বরং তার উলটোটাই সাত্যি ; আশপাশের এলাকার লোকজন মাঝে-মাঝে উলটে বরং এই মন্তব্যই করে যে পাখিরা চুড়োটার দিকে যখন উড়ে যায়, তখন আচমকা দ্রুতগতিতে উঠে যায় আরো-উপরে, চক্কর দেয় শিখরটার ওপর, পাক খায়, তারপর ক্ষিপ্রবেগে দূরে উড়ে যায়, আকাশ-বাতাস ছিঁড়ে দেয় তাদের কর্কশ চীৎকারে।

তাহ'লে কেন শিখরটার নাম *গ্রেট আইরি*? তার চেয়ে বরং শিখরটার নাম জ্বালামুখ দিলেই মানাতো বেশি, কারণ এই খাড়া সটান-ওঠা বর্তুল দেয়ালগুলোর মধ্যে হয়তো গভীর-কোনো নয়ানজুলিই আছে। হয়তো ঐ দেয়ালগুলো আড়াল ক'রে রেখেছে কোনো মস্ত পাহাড়ি ঝিল, যেমনটা প্রায়ই দেখা যায় আপালাচিয়ার পর্বতব্যবস্থার অন্যান্য অংশে, এমন-এক লেগুন যাকে অনবরত জল খাইয়ে যায় বৃষ্টিবাদল আর শীতের তুষার।

এককথায়, এটা কি তবে কোনো প্রাচীন আগ্নেয়গিরিরই আবাস ছিলো না—যে-আগুনের পাহাড় অনেক বছর ধ'রে ঘুমিয়ে আছে সত্যি,তবে যার আভ্যন্তর স্তিমিত আগুন আবার যে ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে না, তা-ই বা কে জানে? *গ্রেট আইরি* কি একদিন আশপাশে সেই বিষম দুর্বিপাকই সৃষ্টি করবে না, যে-দুর্যোগ সৃষ্টি করেছে মাউন্ট ক্রাকাতোয়া কিংবা মাউন্ট পেলে? সত্যি যদি তার মাঝখানে গভীর-কোনো হ্রদ থেকে থাকে, তবে সেই জলের মধ্যে কি সর্বনাশই ওতপ্রোত মিশে নেই, যা একদিন হয়তো পাথুরে স্তরগুলোর ফাটল দিয়ে চুঁইয়ে গিয়ে পড়বে গভীর-নিচে, আর আগ্নেয়গিরির আগুনের কুণ্ডে প'ড়ে বাষ্প হ'য়ে পাক খাবে, আর পাথর ফাটিয়ে বার ক'রে নেবে তাদের বাইরে বেরুবার পথ, ভয়ংকর বিস্ফোরণে ফেটে পড়বে চারপাশ, গলন্ত লাভার প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ক্যারোলাইনার সুন্দর উপত্যকাদেশ, যেমনটা ঘটেছে এই সেদিন, ১৯০২ তে, মার্তিনিক-এ?

সত্যি-বলতে, এই শেষ সম্ভাবনাটা যে মোটেই কোনো অলীক বা অমূলক আশঙ্কা

পশ্চিমমুখো উড়ে চ'লেছে। পথে যখন এক স্থানে রাত্রিবাসের জন্যে বেলুন থামানো হ'লো, জো তখনও মড়ার মতো নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টা পরে বেলুন তখন সুদানের দক্ষিণ সীমান্তে জিণ্ডা শহরের—জিণ্ডার এখনকার নাম নাইজেরিয়া—কাছে এসে পৌছুলো, জো জেগে উঠলো।

ঘুম থেকে উঠে প্রথমটায় সে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, যেন তার উপলব্ধির সব ক্ষমতা লুপ্ত হয়েছে, কিছুই যেন তার মাথায় ঢুকছে না আর। আস্তে-আস্তে অবশ্য তার চোখের দীপ্তি সহজ হ'য়ে এলো। ফার্গুসন তার হাত চেপে ধ'রে কৃতজ্ঞতা জানালেন: 'নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে তুমি আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছো, তোমাকে যে কী ব'লে ধন্যবাদ দেবো, আমি তার কোনো ভাষাই খুঁজে পাচ্ছি না।'

জো এ-কথা শুনে একটু যেন লজ্জিত হ'লো। আত্মপ্রশংসায় কান না-দিয়ে বললে, 'অমন কথা বলবেন না! ওভাবে তখন যদি ঝাঁপিয়ে না-পড়তুম, তাহ'লে সবাই মিলে মরতুম। কাজেই সেদিক দিয়ে আমি কেবল আপনাদেরই বাঁচাইনি, নিজেকেও বাঁচিয়েছি। আত্মরক্ষার জন্যেই আমি ও-কাজ করেছিলুম।'

তারপর সে ধীরে-ধীরে তার কাহিনী খুলে বললে। চাড হ্রদে প'ড়ে কিছুদূর সাঁৎরে যাবার পর এক বিস্তৃত জলাভূমির মধ্যে এসে পড়ে সে; সেখানে হঠাৎ একটা দড়ি দেখে সে অবাক হয়, দড়ি ধ'রে তক্ষনি সে তীরে চ'লে আসে। তীরে এসে দ্যাখে দড়ির শেষ প্রান্ত মাটিতে তাদেরই বেলুনের নোঙর পোঁতা আছে। তা-ই দেখেই সে মোটামুটি একটা আঁচ করে নেয় বেলুন কোন দিকে গেছে। হ্রদের তীর থেকে ডাঙার একটু ভেতরে এসে প্রবেশ করে সে। সেখানে এসে দ্যাখে, একটা ঘেরাও-করা জায়গায় কতগুলো আরবি ঘোড়া নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খাচ্ছে। সে ভেবে, দেখলে যে, পায়ে হেঁটে এই অজানা দেশে যাওয়ার চাইতে ঘোড়াটার পিঠ ক'রে সওয়ার হ'য়ে যাওয়া তার পক্ষে অনেক বেশি নিরাপদ হবে; তৎক্ষণাৎ সে একটি ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে চ'ড়ে ব'সে দ্রুত তাকে ছুটিয়ে দেয়। লোকালয় ছাড়িয়ে সে তখন মরুভূমির দিকে এগোয়: এটাই তার পক্ষে সুবিধাজনক ব'লে মনে হয়। প্রতিমুহূর্তেই সে আশা করেছিলো এই বুঝি বেলুনটাকে দেখা গেলো, কিন্তু প্রতিবারই তাকে হতাশ হ'য়ে পড়তে হয়। আর তাতেই কি পার পাওয়া গেছে? দুর্ভাগ্য যখন আসে, তখন পেছনে-পেছনে একপাল শাগরেদ নিয়ে আসে। হঠৎ এক বেদুইনদের ঘোড়সোয়ার বাহিনীর সামনে প'ড়ে যায় সে—দস্যুতাই তাদের প্রধান বৃত্তি, পথে লোকজন দেখলে তাকে মেরে ফেলে তার সব জিনিশপত্র লুঠপাট ক'রে নেয়াই তাদের পেশা। তারা যখন তুমুল চ্যাঁচামেচি ক'রে তার পেছনে নিলে, প্রাণের ভয়ে কোনোদিকে দৃকপাত না-ক'রে সোজা সামনের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় সে। এই হ'লো তার কাহিনীর সারমর্ম। 'পরের ঘটনা তো আপনারাই ভালো জানেন,' ব'লে সে থামলে।

জো যে অকুতোভয় এবং দুঃসাহসী, বহু অভিযানে তাকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন ব'লে ফার্গুসন তা ভালো ক'রেই জানতেন। কিন্তু এখন জো তাঁদের জন্যে যা করেছে,

ফার্গুসন তার কোনো তুলনা খুঁজে পেলেন না।

বেলুন তখন বিস্তীর্ণ এক মাঠের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে। নিচে দেখা যাচ্ছে আফ্রিকার নানারকম জীব-জন্তু—জিরাফ, জিব্রা, উটপাখি, হরিণ এবং আরো কত-কী। ধীরে-ধীরে রক্তিম মরুপ্রান্তর পেরিয়ে শস্যশ্যামল স্নিগ্ধ বনভূমি উন্মোচিত হ'য়ে পড়লো তাঁদের চোখের সামনে।

রাত দশটার সময় আড়াইশো মাইল অতিক্রম করার পর *ভিক্টরিয়া* যেখানে এসে থামলো, এককালে সেখানে প্রসিদ্ধ এক শহর ছিলো। চাঁদের আলোয় তার ঝাপসা মসজিদ, গোল মিনার আর ঝোলানো অলিন্দের ধ্বংসাবশেষ অতীতের সমৃদ্ধির স্মৃতি নিয়ে বিষণ্নভাবে প'ড়ে আছে। শহরের বাড়ি মিনার মসজিদ সবই এখন ভাঙাচোরা ও পরিত্যক্ত; অথচ এককালে এখানে প্রাচীন এক সভ্যতার সোনার যুগ কেটেছে লোকজনের উচ্চকিত ভিড়ে, হামামের গন্ধভরা পরিমলে, আর মিনারের বুরুজের সোনালি আলোর ঝলমলানিতে।

অস্পষ্ট উষাকালেই আবার *ভিক্টরিয়ার* যাত্রা শুরু হ'লো। কাজ রয়েছে তার—কাজ, দায়িত্ব, বাধ্যতা; কাজেই প্রচীন সেই শহরে ঘুরে বেড়িয়ে নষ্ট করার মতো সময় আছে নাকি তাঁদের?

২০

'সমুদ্রতীরে পৌঁছুতে আর কতদিন লাগবে আমাদের?'

'কোন্ সমুদ্রতীরে? এখন অবশ্য কিছুই বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে টিম্‌বাক্‌টু এখনও প্রায় চারশো মাইল পশ্চিমে।'

হাওয়া অনুকূলে ছিলো, আর তার গতিও ছিলো প্রবল; তার ফলে রাতের প্রথম ভাগের মধ্যেই পশ্চিম দিকে আরো দুশো মাইল এগিয়ে গেলো *ভিক্টরিয়া*। পাৎলা মেঘের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে রুপোলি; অদূরে হমবির পর্বতের গগনচুম্বী শিখর-দেশ: তার ওপর রুপোর পাতের মতো গ'লে-গ'লে পড়ছে জ্যোৎস্না।

সেদিন বিশ তারিখ। অজস্র নদীনালা ঝরনা খালবিল পেরিয়ে গেলো বেলুন—আফ্রিকিদের ছোটো-বড়ো বস্তিও দেখা গেলো অনেকগুলো—তাদের সবকটিকে একেকটি ছোটো-ছোটো জ্যামিতিক নকশার মতো দেখাচ্ছে, কখনও বাঁকা আর সোজা রেখায় আঁকা, কখনও-বা বহু কালো-কালো ফুটকিতে ঘিরে রয়েছে জনপদের চৌকো সীমানা, কোনোটা আবার গোল বৃত্তের মতো। জায়গাটার নাম কা-বা-বা, টিম্‌বাক্‌টুর রাজধানী, নাইজার নদী থেকে পাঁচমাইল দূরে অবস্থিত। কিছুক্ষণের মধ্যেই এলো

টিম্‌বাক্‌টু ; এ-দেশী ভাষায় লোকে তাকে বলে *মরুভূমির রানী* । পাখির মতো শূন্য থেকে মরুভূমি এই রাজ্ঞীকে তাঁদের চোখে পড়লো : বড়ো অবহেলিত মনে হ'লো নগরটি । বেলুন থেকে সব খুদে মাপে দেখা যায় বটে, কিন্তু মোটামুটি একটা আন্দাজও পাওয়া যায় । রাস্তাঘাট সব সরু-সরু । দুপাশে রোদে শুকনো ইট, লতা ও পাতা খড়ের ছাউনি দিয়ে বানানো একতলা বাড়ির সারিটুকুও ভারি দুঃস্থ ও গরিব দেখালো তাঁদের চোখে ।

এতদূর এসে পড়ায় ফার্গুসন খুব খুশি হলেন । 'ঈশ্বর এখন আমাদের যেদিকেই নিয়ে যান না কেন, আমাদের আর-কোনো অভিযোগ নেই !'

' "*যেদিকে খুশি*"—এ-কথাটা কি ঠিক হ'লো ? বরং বলো—সোজা পশ্চিম দিকে যেতে চাই !'

'কিন্তু ইচ্ছের আর দাম কী ? আমাদের নিজেদের শক্তি আর কতটুকু ?'

'কেন বলো তো ?'

'গ্যাস ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে । হিশেব ক'রে দেখলুম, *ভিক্টরিয়ার* ভেসে-থাকার ক্ষমতা আস্তে-আস্তে কেবল ক'মেই যাচ্ছে । যদি পশ্চিম উপকূলে পৌছুতে চাই, তাহ'লে খুব সাবধানে চলতে হবে আমাদের, হয়তো বেলুন হালকা করার জন্যে সবগুলি পাথরের বস্তা ফেলে দিতে হবে, চেষ্টা করতে হবে যাতে গ্যাস একটুও বাজে-খরচ না-হয় !'

সেই রাতেই ফার্গুসন সব পাথর-ভরা বস্তা ফেলে দিলেন । পুরো দমে গনগনে ক'রে আগুন দিলেন চুল্লিতে যার গোল ঘুলঘুলি দিয়ে রগরগে এক লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ল দোলনার ভেতর । টিম্‌বাক্‌টুর দক্ষিণে প্রায় ষাট মাইল এগিয়ে গেছে বেলুন । হয়তো আগামী কালই নাইজার নদী যেখানে মস্ত চওড়া বাঁক ফিরেছে সেখানে গিয়ে ডেবো নামক হ্রদে পৌঁছুতে পারবেন তাঁরা ।

কিন্তু তাঁদের সব আশাকে ব্যর্থ করার জন্যেই যেন হঠাৎ একখণ্ড প্রচণ্ড বাধা এসে হাজির । কোনো পূর্বাভাস না-দিয়েই হঠাৎ এক পাগলা হাওয়া তা-হো-মের অঞ্চলের দিকে তাড়া ক'রে নিয়ে গেলো *ভিক্টরিয়াকে* । মারাত্মক হিংস্র ধরনের লোক বাস করে এখানে ; নৃমুণ্ডশিকারী হিশেবেই তারা পরিচিত । সাধারণ কোনো উৎসবের দিনেই ডাইনি-পুরুৎ আর রাজার নির্দেশে হিংস্র উল্লাসে এখানে হাজার-হাজার মানুষ কোতল করা হয় । সেখানে গিয়ে পৌঁছুনো মানেই নির্বিচারে মৃত্যুর হাতে নিজেকে সমর্পণ ক'রে দেয়া ।

অত্যন্ত ধীরে-ধীরে কোনোক্রমে প্রায় সোয়া-শো মাইল এগিয়ে গেলো বেলুন । এবারে অন্য-একটি বিপদের সম্ভাবনা ক্রমশ স্পষ্ট হ'য়ে আসছে, ক্রমশই চুপসে লম্বা হ'য়ে গিয়ে তার গোল চেহারা হারিয়ে ফেলছে বেলুন, আর হাওয়ার ধাক্কায় সেই চুপসোতে-থাকা বেলুনের গায়ে নানা স্থানে গর্তের মতো নেমে এসেছে রেশমের আবরণ ।

আর থাকতে না-পেরে ভীত গলায় কেনেডি তাঁর আশঙ্কা প্রকাশ ক'রে ফেললেন, 'বেলুন কি ফুটো হ'য়ে গেলো নাকি ?'

'না,' ফার্গুসন ভালো ক'রে লক্ষ ক'রে জানালেন, 'যে গাটাপার্চার খোল ছিলো বেলুনের গায়ে, তা গরম হ'য়ে নানা জায়গায় গ'লে গেছে—ফলে সে-সব জায়গা দিয়ে একটু-একটু ক'রে গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে ।'

'এই ফুটোগুলোকে তবে বন্ধ করা যায় কী ক'রে ?'

'উঁহু ! এখন আর তার কোনো সুযোগ নেই । তবে একমাত্র যা আমরা এখন করতে পারি, তা হ'লো , ক্রমশ বেলুনক নির্ভার ক'রে ফেলা ; যা-কিছু বাড়তি ওজন আছে বেলুনে, সব ফেলে দিয়ে তাকে যদি হালকা করতে পারি, তাহ'লেই হয়তো একটু উপকার হ'তে পারে ।'

'আমার কী মনে হয়, জানো, ফার্গুসন ? এর চেয়ে বোধহয় নিচে নেমে গিয়ে এটাকে কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে মেরামত ক'রে নিলেই ভালো হবে ।'

'এখন আর একে মেরামত করা আমার সাধ্যের অতীত । আমার সাধ আর সাধ্যের মধ্যে এখন ক্রমেই মস্ত ব্যবধান গ'ড়ে উঠছে । তাছাড়া নামা মানেই যে মৃত্যু, তা কি তুমি বুঝতে পারছো না ? ঐসব গাছে ঐ যে লতাপাতা দিয়ে বাসা বানানো হয়েছে, দেখছো সেগুলো ?'

'কীসের বাসা ও-সব ? পাখির ?'

'পাখির বাসা হ'লে তো ভালোই হ'তো—এমনকী ঐ ঈগলদের আস্তানা হ'লেও তবু একটা কথা ছিলো । আফ্রিকার সবচেয়ে হিংস্র জংলিরা ঐসব গাছে বাসা বেঁধে বাস করে । একবার তাদের পাল্লায় গিয়ে পড়লে স্বয়ং ঈশ্বরও আর রেহাই পাবেন কি না সন্দেহ । নদী থেকে আমরা আর বেশি দূরে নেই, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সেটুকু পথও বোধহয় আর আমরা যেতে পারবো না । সেই ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত বেলুনের নেই এখন ।'

'যেমন ক'রেই হোক নদীর তীরে গিয়ে আমাদের পৌঁছুতেই হবে ।' ফার্গুসন তাঁর মানসিক উত্তেজনা বহু কষ্টে দমন ক'রে রাখলেন । 'কিন্তু আমাকে সবচেয়ে ভাবিয়ে তুলছে আরেকটি বিপদের আশঙ্কা ।

'পর-পর বেশ কতগুলি পাহাড় পেরুতে হবে আমাদের । কিন্তু সে-পরিমাণ গ্যাস আমাদের নেই, তা ছাড়া উপযুক্ত তাপ সৃষ্টি করতে না-পারলে বেলুনও বেশি ওপরে উঠতে পারবে না, অথচ সেইটুকু তাপ তৈরি করারও ক্ষমতা নেই ।'

'পাহাড়গুলোকে তো দেখতেই পাচ্ছি । আচ্ছা, কোনোরকমে এড়িয়ে যাওয়া যায় না এদের ?' কেনেডি ভালো ক'রেই জানেন যে তা সম্ভব নয়, তবু কিছু-একটা বলা দরকার মনে ক'রেই কথাটা বললেন । এই কালো গিরিমালা যেভাবে দিগন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে তাতে তাদের এড়িয়ে যাবার কোনো প্রশ্নই উঠে না । কেনেডির মনে হ'লো , যেন শুধু তাঁদের পথে বাধা সৃষ্টি করবার জন্যেই এই পাহাড়গুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ।

'তার কোনো উপায় নেই ।' ফার্গুসন সোজাসুজি ব'লে দিলেন কথাটা । 'জো,

একদিনের উপযোগী জল রেখে পিপেশুদ্ধু সব জল ফেলে দাও। তাতে হয়তো কিছুটা ওপরে উঠবে বেলুন।'

নিমেষের মধ্যে প্রভুর আদেশ পালন করলে জো। কিন্তু তাতে বিশেষ-কোনো সুবিধে হ'লো না, মাত্র পঞ্চাশ ফিট ওপরে উঠলো বেলুন। ক্রমশই *ভিক্টরিয়া* পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আরো কয়েক শো ফিট ওপরে উঠতে না-পারলে মারাত্মক একটি সংঘর্ষ একেবারে অনিবার্য।

'খালি বাক্সগুলি ফেলে দিলেই হয়।' কেনেডি মৃদু গলায় বললেন, পাউণ্ড পঞ্চাশেক হালকা হ'লো বেলুন, আরো-কিছু ওপরে উঠলো *ভিক্টরিয়া*। কিন্তু এখনও পাহাড়ের চুড়ো অতিক্রম করার মতো উচ্চতা লাভ করেনি সে। গোটা পরিস্থিতির ভয়াবহতার কথা ভাবতেই সবাই শিউরে উঠলো। একের পর এক অতবার মরণের হাত থেকে শেষ মুহূর্তে রক্ষা পেয়েছেন তাঁরা। নিয়তি কি এবারও শেষ মুহূর্তে দয়া করবে না তাঁদের? পাহাড়ের কঠিন বন্ধুর গায়ে ধাক্কা লাগলে যে-পরিণাম হবে, তার কথা কেউ আর ভাবতেই চাইলেন না। আগে যতবারই মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছেন কোনোবারই এমন অক্ষম হতাশায় ভ'রে যাননি কেউ। বেলুন পাহাড় থেকে আর বেশি দূরে নেই। ক্রমেই সেই মস্ত কালো পাহাড় এগিয়ে আসছে তাঁদের দিকে—এমনভাবে মৃত্যুকে এগিয়ে আসতে দেখে শিরদাঁড়া বেয়ে কেবল একটা ঠাণ্ডা স্রোত কিলবিলিয়ে ওঠা-নামা করতে লাগলো। যদি পার না-হ'তে পারেন তাহ'লে আর দশ মিনিটের মধ্যে ফার্গুসনের এত হৈ-চৈ তোলা ভৌগোলিক অভিযান মর্মান্তিকভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে!

'সব জিনিশ ফেলে দাও, সব জিনিশ ফেলে দাও!' ফার্গুসন আর্তস্বরে প্রবল ভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন।

চরম মুহূর্তটির দিকে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে *ভিক্টোরিয়া*। ফার্গুসন নির্দেশ দিলেন, 'তোমার বন্দুকগুলো ফেলে দাও, ডিক!'

অসীম মমতায় তাঁর বন্দুকগুলিকে সজোরে আঁকড়ে ধরলেন কেনেডি। তাঁর এতদিনের সঙ্গী এরা! 'বন্দুক ফেলবো? বলছো কী তুমি?'

'বাঁচতে গেলে এখন ফেলে দিতেই হবে।'

জো চেঁচিয়ে উঠল। 'সর্বনাশ হ'লো। আর-তো বেশি দূরে নেই!'

স্পষ্ট দেখা গেলো, শ্যাওলা-জমা কালো চোখা থ্যাবড়া পাথরগুলো ক্রমশ প্রবল বেগে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। বেলুন থেকে পাহাড়ের চুড়ো এখন প্রায় ষাট ফিট উঁচু। কম্বল, পোশাক-আশাক, গোলা-বারুদও জো দ্রুত হাতে ফেলে দিলে। একঝটকায় বেলুন পাহাড়ের চুড়োর ওপরে চ'লে এলো—এখন দোলনাটা ঠিক চুড়ো-বরাবর চলেছে। দোলনাটার সঙ্গে এই বুঝি পাহাড়ের ধাক্কা লাগলে। আরোহী তিনজন মুহূর্তের জন্য কুঁকড়ে গেলেন। তার পরেই উন্মত্তের মতো চীৎকার ক'রে উঠলেন ফার্গুসন 'ডিক! ডিক! শিগগির তোমার বন্দুকগুলো ফেলে দাও! নয়-তো আমরা সবাই মরবো!'

কেনেডির চোখ জলে ভ'রে গেলো। কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রে তিনি বন্দুকগুলো তুলে ছুঁড়ে ফেলার জন্য হাত তুললেন, কিন্তু হঠাৎ চীৎকার ক'রে জো তাঁকে বাধা দিলে —'থামুন মিস্টার কেনেডি ! এক মিনিট !' এই ব'লেই দোলনার দড়ি ধ'রে, ডিগবাজি খেয়ে, লাফিয়ে, নিচে নেমে গেলো ।

'জো ! জো ! এ কী করলে তুমি !'

'কী সর্বনাশ !'

বেলুন আরেকটু ওপরে উঠে এলো। চূড়োর দিকটা প্রায় কুড়ি ফিট চওড়া, অন্য দিকটা কম ঢালু, সেইজন্যে একেবারে চোখা ছুঁচোলো নয়। নিরাপদেই শুধু হালকাভাবে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে সেই ভীষণ পাহাড়ের চুড়ো পেরিয়ে গেলো বেলুন ।

'পেরিয়ে গেছি ! পেরিয়ে গেছি !'

কেনেডি আর ফার্গুসন চোখ বুজে ফেলেছিলেন, নিচে থেকে জো-র গলা কানে আসতেই *হতবাক আনন্দে* লাফিয়ে উঠলেন। তাকিয়ে দেখলেন, পাহাড়ের চূড়োয় হেঁটে-হেঁটে চলেছে জো, দু-হাতে গায়ের জোরে দোলনাকে ঠেলে-ঠেলে সে এগুচ্ছে । যেই দোলনা চুড়ো পেরিয়ে এলো, অমনি শরীরের সব শক্তি সংহত ক'রে প্রবলভাবে এক ধাক্কা দিয়ে ফের দড়ি বেয়ে ওস্তাদ খেলোয়াড়ের মতো সে দোলনায় উঠে এলো !

খানিকক্ষণ নির্বাকভাবে তাকে লক্ষ ক'রে ফার্গুসন বললেন, 'তোমার ঋণ কিছুতেই শোধ করার নয়, জো ! বারে-বারে তুমি আমাদের নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রেও বাঁচিয়ে দিচ্ছো !' তারপর তিনি আর-কিছু বলতে পারলেন না, গলা ধ'রে এলো ।

২১

বেলুন এবারে কিন্তু পাহাড় পেরিয়েই নামতে শুরু ক'রে দিলে. নিচে পড়লো বিরাট এক বনভূমির কালো বিস্তার। 'কোনো-একটা গাছে বেলুনটি বেঁধে রেখে রাত কাটাতে হবে আমাদের,' ফার্গুসন সঙ্গীদের তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন, 'মাটিতে নামা অত্যন্ত বিপজ্জনক ।'

সন্ধে হ'তেই হাওয়া প'ড়ে গেলো। আকাশের তারা দেখে ফার্গুসন হিশেব ক'রে দেখলেন, সেনেগল নদী থেকে এখনও সাতশো মাইল দূরে আছেন তাঁরা। সেনেগল নদীর ওপর কোনো সেতু নেই, যদি থেকেও থাকে তবে তার খোঁজই বা পাবেন কোথায়, অথচ নদী তাঁদের পেরুতেই হবে এবং পেরুতে হবে এই বেলুনে ক'রেই । ফার্গুসন খুব চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন । ক্রমশ যেভাবে বেলুন তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে, তাতে এই অবস্থায় ঐ মস্ত নদী পেরুবার কথা ভাবা নিছকই এক অমূল কল্পনা । শেষটায়

অনেক ভেবে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, 'শোনো, আমাদের যে ক'রেই হোক এই বেলুনে ক'রেই নদী পেরুতে হবে, কিন্তু এই অবস্থায় বেলুনে ক'রে নদী পেরুবার কথা ভাবাও বাতুলতা। বেলুনকে যাতে আরো হালকা করা যায়, তারই চেষ্টা করতে হবে আমাদের। গ্যাস বাড়াবার যে-সব যন্ত্রপাতি আছে ওগুলোকে এবার খুলে ফেলা যাক, তাতে তো আর কিছু না-হোক অন্তত ন-শো পাউণ্ড ভার ক'মে যাবে। এ ছাড়া আর-কোনো উপায়ই তো আমার চোখে পড়ছে না।

'কিন্তু তাহ'লে আমরা গ্যাস বাড়াবো কী ক'রে ? আর গ্যাস ছাড়া তোমার এই আকাশযান উড়তে পারবে নাকি ? গ্যাসই তো তার অদৃশ্য ডানা।'

'অন্যভাবে ওড়াবার ব্যবস্থা করতে হব।' ফর্গুসন বললেন, 'বেলুনের ভেসে থাকার ও বহন করার ক্ষমতা আমি ভালোভাবে হিশেব ক'রে দেখেছি। অল্প-কিছু জিনিশপত্র আর আমাদের তিনজনকে নিয়ে বেলুন এখনও কিছুদূর অব্দি যেতে পারবে। আমাদের তিনজনেরই ওজন এ-ক-দিনের ধকলে অনেক ক'মে গেছে—কিছুতেই সবশুদ্ধু পাঁচশো পাউণ্ডের বেশি হবো না আমরা।'

ছোটো-ছোটো অংশে ভাগ ক'রে সব যন্ত্রপাতি খুলে ফেলতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেলো। বড়ো-বড়ো কাজের চাইতে সাধারণত ছোটোখাটো খুচরো কাজেই সময় বেশি লাগে! কিন্তু কোনো উপায় নেই—এই সময়টুকু দিতেই হ'লো তাঁদের, অনিচ্ছাসত্ত্বেও। এইভাবে শেষকালে অনেকখানি হালকা হ'য়ে গিয়ে বেলুন আবার আকাশে ওড়বার ক্ষমতা ফিরে পেলে।

রাতে সামান্য-কিছু খেয়ে নেবার পর যথারীতি জো আর কেনেডির পাহারা দেবার পালা এলো। স্তব্ধ জ্যোৎস্নাঢাকা রাত। মাঝে-মাঝে ঝাপসা মেঘ এসে পাৎলা এক আবরণ বিছিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তাঁদের গায়ে, তারপরেই আবার রুপোর পাতের মতো গ'লে-গ'লে নেমে আসছে নরম আলোর ধারা। তন্দ্রাহীন চোখে সেই নিশুতি রাতের আবছায়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন ফার্গুসন। ধীরে-ধীরে তাঁর শোরগোল-তোলা ঐতিহাসিক অভিযান শেষ হ'য়ে আসছে। যতই তিনি এ-কথা ভাবলেন ততই তাঁর মনের ভেতর উত্তেজনার আভাস লাগলো। কী-রকম যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করলেন তিনি। রাতের স্তব্ধতায় কী-রকম একটা উশখুশ ভাব ছড়িয়ে আছে যেন। হঠাৎ খুব নিঃসঙ্গ মনে হ'লো নিজেকে—এই কালো বনের ভেতরে হঠাৎ এই-প্রথম তিনি ক্লান্তি আর অবসাদ অনুভব করলেন—শারীরিক শ্রান্তি নয়, সমস্তটাই মানসিক। ডিক হয়তো ঠিকই বলতো তাঁকে, এখন কিছুদিন ঘরে ব'সে শান্তভাবে দিন কাটালে হয়। নিজেই তিনি অবাক হ'য়ে গেলেন নিজের এই ভাবনায়। এতটা অবসাদ কোনো অভিযানের পরেই তিনি কখনও অনুভব করেননি। এটা ঠিক যে অন্যান্য বারেও অভিযানের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে তিনি এক ধরনের ক্লান্তি অনুভব করতেন, একটু বিশ্রাম করার জন্যে সমস্ত দেহ মন উন্মুখ হ'য়ে উঠতো ; কিন্তু এমনভাবে তা কখনও তাঁকে আচ্ছন্ন করেনি। হয়তো এই কালো বন, তার ঝাপসা রাত্রি আর ছমছমে স্তব্ধতা—সব এখন তাঁর বুকে একসঙ্গে

চেপে বসেছে ব'লেই এমন-সব কথা মনে পড়ছে তাঁর ।

হঠাৎ একটা খশ-খশ শব্দ কানে এলো । দূরে তাকিয়ে অন্ধকারে একটু রক্তিম আলোকরেখা দেখতে পেলেন ফার্গুসন । দুরবিন তুলে নিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে সাবধানে চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন—কিন্তু সন্দেহজনক আর-কিছুই তাঁর চোখে পড়লো না । দুরবিন নামিয়ে রেখে আবার তিনি তাঁর নিঃসঙ্গ স্মৃতির ভিতর তলিয়ে গেলেন । কেন-যে এতকাল তিনি বারে-বারে ঘরের আরাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন, এখন যেন তা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন । এই স্তব্ধ রাতের ঝাপসা রশ্মিজ্বলা মেঘগুলি যেন তাঁকে এখন এই বুনো রাতটায় ব'লে দিলে তাঁর রক্তের এই চঞ্চলতার কারণ । কে যেন এক টানে পর্দা তুলে দিয়ে সব উন্মোচিত ক'রে দিয়েছে তাঁর চোখের সামনে । ছেলেবেলা থেকেই তিনি নিঃসঙ্গ, একা—একেবারে একা, আর সেইজন্যেই তিনি সর্বত্র উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ খুঁজে বেড়িয়েছেন, যাতে কোনোরকমে এই একলা মুহূর্তগুলিকে ভুলে থাকা যায় । এখন তাঁর মনে হ'লো সব চেষ্টাই ব্যর্থ হ'লো, দিগন্ত থেকে দিগন্তে তাঁকে তাড়া ক'রে নিয়ে এলো তাঁর নিঃসঙ্গতা ; খ্যাতি পেয়েছেন, বিত্ত, যশ, সম্মান—সব তাঁকে অকৃপণভাবে দিয়েছে ভাগ্য, কিন্তু সেই স্নেহসূচক পদার্থটি থেকে তাঁকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে, যার অভাবে সবই নিষ্ফল হয়, যাকে বলে মায়ামমতা ভালোবাসা, অন্যকারু সঙ্গে অন্তরঙ্গ কোনো সম্পর্ক । শূন্য চোখে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি । যথাসময়ে কেনেডিকে ঘুম থেকে তুলে পাহারায় বসিয়ে দিয়ে জো-র পাশে শুয়ে পড়লেন । খানিকক্ষণ পরে সুপ্তি এসে তাঁকে তাঁর সব অভাববোধ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলো এমন-এক মায়ালোকে যেখানে কোনো সোনার কাঠির ছোঁয়ায় সব হতাশা যেন মুক্তোর মতো ঝলমল ক'রে উঠে অসীমের দিকে বিচ্ছুরণ পাঠিয়ে দেয় ।

পাহারা দিতে ব'সে কেনেডিরও কেন যেন কালো বনের এই ভারি স্তব্ধতাকে বড্ড অস্বস্তিকর ব'লে বোধ হ'লো । মোলায়েম মৃদু হাওয়ায় একটু-একটু ক'রে দুলে উঠছিলো বেলুনের দোলনা । এই দোল কেনেডির চোখে ঘুম মাখিয়ে দিয়ে গেলো যেন—অনেক বার দুই হাতে চোখ কচলে তিনি জেগে থাকার চেষ্টা করলেন, কিন্তু নিদ্রার আকর্ষণ তার চেয়েও বেশি, সে তার মন্ত্র-পড়া অন্ধকারে তাঁকেও একসময়ে আচ্ছন্ন ক'রে দিলে ।

কতক্ষণ যে এভাবে ঘুমিয়েছিলেন, জানেন না । হঠাৎ দোলনার নিচে প্রবল একটি শব্দ হ'তেই কেনেডির ঘুম ভেঙে গেলো । লাফিয়ে উঠে বসলেন, তিনি, আর সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ে ত্রাসে আতঙ্কে তাঁর সারা মুখ যেন কাগজের মতো শাদা হ'য়ে গেলো । কে যেন একচুমুকে তাঁর শরীরের সব রক্ত শুষে নিয়েছে । আগুন ধ'রে গেছে সারা বনে !

'আগুন ! আগুন !' আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন কেনেডি ।

তাঁর সেই আর্তনাদ যেন অনেক, অনেক দূর থেকে এসে পৌঁছুলো ফার্গুসনের কাছে । প্রথমটায় কিছুই বুঝতে পারেননি, আর্তনাদটা ছিলো যেন স্বপ্নেরই মধ্যে, তারপরে যেই তন্দ্রা ও চটকা ভেঙে গেলো, সচমকে ত্রস্ত উঠে তিনি জিগেস করলেন : 'কী ! কী হয়েছে ?'

'আগুন কে লাগালে ?' ফার্গুসন ফিশ-ফিশ ক'রে জিগেস করলেন ।

আর ঠিক এমন সময়ে এক বিলম্বিত কান-ফাটা চীৎকারে মস্ত বনের পরিপূর্ণ স্তব্ধতাটা যেন ছিঁড়ে, চিরে, ফেঁড়ে গেলো । জংলিদের চীৎকারই তাঁদের স্পষ্টভাবে বলে দিলে এই ভীষণ আগুনের পেছনে কারা রয়েছে । এটা বুঝতে বাকি রইলো না যে, জংলিরা তাঁদের জ্যান্ত ঝলসে পুড়িয়ে মারবার জন্যেই অতর্কিতে সারা বনে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে ।

বেলুনের চারদিকে আগুন সাপের মতো তার লকলকে লেলিহান জিভ বাড়িয়ে দিয়েছে । মটমট ক'রে পুড়ে ভেঙে যাচ্ছে ডালগুলো, অদ্ভুতভাবে শব্দ হচ্ছে সবুজ ডালগুলি পুড়তে, পাতাগুলি পুড়ে গিয়ে ফুলকি আর ছাই উড়ছে চারপাশে : বীভৎস আর ভয়ানক একটা দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে চারদিকে । ঢেউয়ের মতো হাওয়ায় কেঁপে-কেঁপে উঠছে লাল শিখা, আর রশ্মিগুলো তাদের লাল আভা ছড়িয়ে দিয়েছে তিনজন আরোহী সমেত *ভিক্টরিয়ার* গায়ে । হঠাৎ এক দমকা হাওয়া সব তাপ আর শিখাকে যেন বেদম তাড়া দিয়ে বেলুনের দিকে নিয়ে এলো ।

'শিগগির উড়ে পালাই, চলো !' কেনেডি তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'নয়তো এসো নিচে নেমে পড়ি ! তা ছাড়া আমাদের বাঁচবার আর-কোনো রাস্তা নেই ।'

ফার্গুসন তক্ষুনি দৃঢ় মুঠোয় কেনেডির হাত চেপে ধরলেন, আর ইঙ্গিত অনুযায়ী জো দড়ি কেটে দিয়ে বেলুনকে মুক্ত ক'রে দিলে ।

শিখারা সব লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে ওপরে, এই বুঝি ছুঁয়ে দিলে বেলুনকে । প্রচণ্ড তাপ আসছে হাওয়ার ঢেউয়ে ঝাপটায়, হিল্লোলে । দড়ি কাটার পর মুহূর্তেই বেলুন এক ঝাপটায় হাজার ফিট ওপরে উঠে এলো । নিচে থেকে ভীষণ শোরগোল উঠলো, এমন ভীষণ, যে এত ওপরেও তার সামান্য রেশ এসে পৌঁছুলো । বেলুন তখন নিরাপদে অনেক উঁচু দিয়ে পশ্চিম দিকে ভেসে চলেছে ।

২২

'যদি, কাল আমরা জিনিশপত্র সব ফেলে দিয়ে বেলুনকে হালকা না-করতুম, তাহ'লে এতক্ষণে আমাদের যে কী পরিণতি হ'তো, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ?'

'এখনও অত ভয় পাচ্ছো কেন তুমি ? আমরা তো সব পেরিয়ে এলুম । তোমার অনুমতি ছাড়া এখন আর বেলুন নিচে নামবে না ।'

'তা জানি । কিন্তু নিচে তাকিয়ে দ্যাখো একবার ।' ফার্গুসন বললেন ।

বনের সীমান্ত যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে চল্লিশজন ঘোড়সোয়ার রে-রে

ক'রে ছুটে আসছে। তাদের কারু হাতে বল্লম, কারু হাতে বন্দুক। *ভিক্টরিয়ার* সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে তারা তলা দিয়ে। মাঝে-মাঝে ওপর দিকে তাকিয়ে বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠে নানারকম উৎকট অঙ্গভঙ্গি করছে। তাদের রাগি চ্যাচামেচি শুনে মনে হ'লো একবার ধরতে পারলে তারা যেন সর্ব্বাইকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেঁড়ে ফেলবে। অসমতল উঁচু-নিচু পথ দিয়ে অসীম ক্ষিপ্রতায় অনায়াসে ঘোড়া ছুটিয়ে চ'লে আসছে তারা পুরোদমে জোরকদমে।

ফার্গুসন জানালেন, 'এরা হ'লো নিষ্ঠুর ট্যালিবাস-জাতীয় জংলি, আফ্রিকার অন্যতম ভীষণ জাতি। কোনোকিছুতেই বাগ মানে না, পোষ মানে না, নরম হয় না। কালোদেরও এরা রেহাই দেয় না। আমি বরং বুনো জানোয়ারদের সামনেও পড়তে রাজি, কিন্তু এদের সামনে নয়। পশুর চেয়েও হিংস্র এরা, কোনোরকম মানবিক মূল্যবোধই নেই এদের।'

'ওদের চেহারাছিরি চালচলন দেখে তোমার কথাই ঠিক ব'লে মনে হয়। কী ভীষণ দেখতে একেক জন! আর চাউনিতে যেন আগুন জ্বলছে! ভাগ্যিশ ওরা উড়তে পারে না—নইলে আর দেখতে হ'তো না!'

'ঐ পোড়া গ্রামগুলো দেখতে পাচ্ছো—ধ'সে চুরমার হ'য়ে পড়ে আছে? সব এদের কীর্তি। যে-সব জমিতে এককালে সোনালি ফসল দুলে উঠতো হাওয়ায়, আগুন লাগিয়ে সব ছারখার ক'রে দিয়ে কেবল কালো ছাই আর পোড়া মাটি রেখে দিয়ে গেছে এরা।'

'আমাদের ওরা ধরবে কী ক'রে? একবার নদীর ওপারে পৌঁছুতে পারলেই তো নিরাপদ।'

'ঠিকই বলেছো। এখন ঈশ্বর যদি দয়া করেন, তাহ'লেই হয়। বেলুনের ক্ষমতায় এখন আর-কোনো আস্থা নেই আমার। যে-কোনো মুহূর্তে সব গ্যাস শেষ হ'য়ে বেলুন নিচে নেমে পড়তে পারে। আর, একবার নামলেই আর-কোনো কথা নেই, চক্ষের পলকে এই দস্যুরা আমাদের ছিন্নভিন্ন ক'রে দেবে।'

সারা সকালটা ফেউয়ের মতো দস্যুরা তাঁদের সঙ্গে-সঙ্গে তাড়া ক'রে এলো। বেলা এগারোটার সময় হিশেব ক'রে দেখলেন, এতক্ষণে মাত্র পনেরো মাইল পথ অতিক্রম করেছেন।

এমন সময় বিপদের গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে দেবার জন্যেই যেন দিগন্ত থেকে, হাতির মতো কালো শুঁড় বাড়িয়ে, এগিয়ে এলো মেঘ। ঝড়ের আশঙ্কায় ফার্গুসন রীতিমত বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। ঝড় যদি আবার তাঁদের নাইজারের দিকে উড়িয়ে নিয়ে যায় তাহ'লে আর রেহাই নেই। আর অবস্থা যখন এইরকম, তখন বেলুনও যেন চক্রান্ত করলে তাঁদের বিরুদ্ধে। স্পষ্ট দেখা গেল ক্রমশ সে নিচের দিকে নেমে আসছে। যাত্রা শুরু করার পর থেকে এতক্ষণের মধ্যে প্রায় তিনশো ঘন ফিট গ্যাস নষ্ট হ'য়ে গেছে। এখনও কম ক'রেও বারো মাইল দূরে রয়েছে সেনেগল নদী। বেলুন যে-হারে অতি

ধীরে-ধীরে এগুচ্ছে, তাতে অন্তত আরো ঘণ্টাতিনেক সময় লাগবে ।

এদিকে নিচে অনুসরণকারী দস্যুদের বিকট চীৎকারে ক্রমশ উল্লাসের ভাব জেগে উঠলো । তার কারণ আর-কিছুই নয়, বেলুন এখন ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে । মিনিট পনেরো মধ্যেই দোলনা মাটি থেকে প্রায় দেড়শো ফিট ওপর দিয়ে চলতে লাগলো ; তবে হাওয়ার দাপট একটু বেশি ব'লে, এখন তার গতি আগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেড়েছে । দস্যুরা এখন থেকেই বেলুন তাগ ক'রে মুহুর্মুহু গুলি চালাতে শুরু ক'রে দিয়েছে । ভার বা ব্যালাস্ট আর না-কমালে রেহাই নেই । ফার্গুসনের নির্দেশে শেষ-খাদ্যটুকুও ফেলে দেয়া হ'লো । সঙ্গে-সঙ্গে বেলুন ওপরে উঠে গেলো বটে, কিন্তু আধঘণ্টা যেতে-না যেতেই আবার নিচের দিকে নামতে শুরু ক'রে দিলে । বেলুনের রেশমি খোলটা দু-এক জায়গায় ফেঁশে গিয়েছে, তাই দিয়ে হু-হু ক'রে গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে, আর তার ফলেই বেলুনের নিচের দিকে টানটা আগের চেয়ে আরো দ্রুত হ'য়ে উঠেছে ।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দোলনা মাটি স্পর্শ করলো ; সঙ্গে-সঙ্গে হৈ-হৈ ক'রে দস্যুরা ছুটে এলো সেদিকে । কিন্তু এ-রকম সময়ে সাধারণত যা হ'য়ে থাকে তা-ই ঘটলো —মাটিতে ধাক্কা খেয়ে বেলুন বলের মতো তক্ষুনি আবার বিপরীত আঘাতে আকাশে লাফিয়ে উঠে প্রায় মাইলখানেক ভেসে গেলো ।

'নাঃ, দস্যুদের হাত থেকে দেখছি কিছুতেই নিস্তার নেই !' অসহায় রাগে কেনেডি নিশপিশ ক'রে উঠলেন ।

'সব ফেলে দাও—এমনকী শেষ নোঙরটাও ফেলে দাও ।' ফার্গুসন হেঁকে বললেন ।

সব যন্ত্রপাতি ফেলে দেয়া হ'লো বিশেষ কিছুই ফল হ'লো না, বেলুন শুধু একটুক্ষণের জন্যে আকাশে উঠে ফের মাটিতে নেমে আসছে । হিংস্র জানোয়ারের মতো প্রবল বেগে ঘোড়ায় চেপে আসছে ট্যালিবাস দস্যুরা । তারা যখন প্রায় দুশো গজের মধ্যে এসে পড়লো ফার্গুসন চেঁচিয়ে বললেন, 'আর তোমার বন্দুকের মায়া কোরো না, ডিক । চট ক'রে সব বন্দুক ফেলে দাও ।'

'আগে কয়েকটাকে গুলি না-ক'রে ফেলছি না !' কেনেডি দস্যুদের লক্ষ্য ক'রে পর-পর কতগুলি গুলি ছুঁড়লেন । অব্যর্থ টিপ তাঁর, কিন্তু এটা কে জানতো যে তাঁর এই অমোঘ উদ্‌গিরণ শেষটায় মানুষ শিকারে লাগবে ? উৎকট আর্তনাদ ক'রে কয়েকটি দস্যু ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়লো ।

রবারের বলের মতো আবার বেলুন একলাফে আকাশে উঠলো বটে, কিন্তু এ-অবস্থায় বেশিক্ষণ চললো না । হঠাৎ এক দমকে অনেকটা গ্যাস বেরিয়ে গিয়ে বেলুন চুপসে গেলো ।

'সব শেষ হ'য়ে গেলো তাহ'লে ! আর এখন রক্ষে নেই !' কেনেডির গলা হতাশায় ভাঙা-ভাঙা শোনালো ।

'না,' ফার্গুসন হঠাৎ দৃঢ় স্বরে ব'লে উঠলেন । অস্বাভাবিক একটি দীপ্তিতে হঠাৎ

তাঁর চোখদুটি চকচক ক'রে উঠলো। 'না, এত সহজে হাল ছাড়বো না! আরো-একটি জিনিশের মায়া আমাদের ছাড়তে হবে, তাহ'লে প্রায় শো-তিনেক পাউণ্ড হালকা হবে *ভিক্টরিয়া*।'

'শো-তিনেক পাউণ্ড হালকা হবে?' বিমূঢ় হ'য়ে গেলেন কেনেডি। 'সেটা আবার কী?'

'আমাদের দোলনা। শিগগির বেলুনের খোলের দড়ি-দড়া ধ'রে ঝুলে পড়ো। এমনিভাবে ঝুলেই আমরা নদী পেরুতে পারবো। শিগগির করো, হাতে একটুও সময় নেই!'

মৃত্যুকে প্রতিরোধ করার জন্যে এক অমানুষিক শক্তিতে ভ'রে গেলেন অভিযাত্রীরা। বেলুনের দড়ি ধ'রে ঝুলে পড়লেন তাঁরা, আর জো এক হাতে দোলনার দড়ি কেটে দিলে। নিমেষের মধ্যে নিচে আছড়ে পড়লো দোলনাটা, আর বেলুন সোঁ ক'রে একসঙ্গে শো-কয়েক ফিট ওপরে উঠে এলো।

শিকার পালিয়ে যায় দেখে দস্যুরাও তখন মরীয়া হ'য়ে উঠেছে, পাগলের মতো অনবরত চাবুক মারতে লাগলো তারা ঘোড়ার পিঠে, আর মুখের ফেনা তুলে পুরোকদমে ছুটতে লাগলো আরবদের বিখ্যাত ঘোড়াগুলি। খুরে-খুরে নীল ফুলকি ছিটিয়ে দিচ্ছে তারা, ফেনার সঙ্গে নিশ্বাসে হলকা ছাড়ছে। কিন্তু *ভিক্টরিয়া* ততক্ষণে প্রবল হাওয়ার তোড়ে আরো জোরে ভেসে চলেছে, একটু পরেই একটা ছোটো পাহাড় পেরিয়ে এলো সে অনায়াসে। পাহাড়ের গায়ে ঘোড়ার চলার পথ নেই ব'লে দস্যুরা শেষটায় হাল ছেড়ে দিয়ে সেখানেই থেমে যেতে বাধ্য হ'লো।

পাহাড় পেরিয়েই ফার্গুসন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ঐ-যে, ঐ-যে নদী! ঐ দ্যাখো, সেনেগল নদী!'

দূরে দেখা গেলো নদীর রুপোলি জলস্রোত ঘুরে-ঘুরে এঁকেবেঁকে ব'য়ে যাচ্ছে, যেন একটা রুপোর তৈরি সজীব তরল সাপ। যেন ধীরে-ধীরে সুন্দর একটি চকচকে সাপ কুণ্ডলী ছাড়িয়ে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে বুকে হেঁটে দূরের দিকে চ'লে যাচ্ছে। তখনও তা প্রায় মাইল-দুয়েক দূরে; নদীটা পুরোপুরি পেরিয়ে যেতে পারলে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ভাগ্য যদি আর তাঁদের জীবন নিয়ে আর কোনো ছিনিমিনি না-খেলে তাহ'লে আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই তাঁরা আপাতত নিরাপদ হ'য়ে যাবেন, আর-কোনো আশঙ্কাই থাকবে না প্রাণের।

কিন্তু তা বুঝি আর হয় না।

২৩

কেননা বেলুনের সব গ্যাসই ফুরিয়ে গেলো একটু পরে। হু-হু ক'রে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে নেমে পড়লো *ভিক্টোরিয়া*। ছোটো বলের মতো বারে-বারে ধাক্কা খেয়ে কয়েকবার ওঠা-নামা করতে-করতে কিছুদূর এগিয়ে গেলো। মস্ত একটি বাওবাব গাছ দাঁড়িয়ে ছিলো একদিকে, শেষটায় তার মগডালে ঠেকে গেলো বেলুন, তার জাল আটকে গেলো তার ডালে, আর তক্ষুনি একেবারে গতিহীন হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'তবে আর কোনো আশাই নেই!' নিশ্বাস ছেড়ে বললেন কেনেডি। 'সব শেষ হ'য়ে গেলো।'

'আর ঠাট্টাটা দ্যাখো একবার! তা কিনা হ'লো নদীর একশো গজের মধ্যে এসে!'

হতভাগ্য অভিযাত্রীরা বেলুনের জাল থেকে নিচে নেমে এলেন। চটপট নদীর দিকে যেতে হবে এবার। মস্ত এক জলপ্রপাতের একটানা আছড়ে পড়ার শব্দে জায়গাটা মুখর হ'য়ে আছে।

আশপাশে কোনো নৌকো বা জনমানবের চিহ্ন মাত্রও নেই। নদী এখানে প্রায় দু-হাজার ফিট চওড়া, প্রায় দেড়শো ফিট উঁচু থেকে হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে প্রপাতের মতো নেমে এসেছে। জল শুধু তুলকালাম ফেনা ছিটোচ্ছে আর তার ভীষণ গজরানিতে গোটা এলাকাটা ভ'রে আছে, মাঝে-মাঝে মস্ত সব পাথরের টুকরো চোখা থ্যাবড়া নানারকম কিম্ভূতকিমাকার অদ্ভুত আকার নিয়ে জলস্রোতের ভিতর মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে সাঁৎরে নদী পেরুবার চেষ্টা করার অন্য নামই হ'লো সাধ ক'রে মৃত্যুর কাছে নিজেকে সঁপে দেয়া। দেখেই কেনেডি একেবারে হতাশ হ'য়ে পড়লেন। তাঁর আর কোনো উদ্যমই রইলো না, যেন গোটা দৃশ্যটা তাঁর মনের ভিতর এক বিচ্ছিরি হুতুশে ভাব ছড়িয়ে দিয়ে তাঁব সব উৎসাহকে বিকল ক'রে দিয়ে গেছে। ফার্গুসনেরও যে খুব-একটা আশা হচ্ছিলো, তা নয়; তবু মুখে অন্তত তিনি বন্ধুকে ভরসা দিলেন। একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিলো তাঁর; যতই বিপদের মুখে পড়তেন, ততই যেন তাঁর মাথা ঠাণ্ডা হ'য়ে উদ্ধারের ফন্দিগুলো আঁটতে শুরু ক'রে দিতো। বিপদ যেন তাঁর বুদ্ধিকে শানিয়ে-শানিয়ে তীক্ষ্ণ ও ধারালো ক'রে তুলতো। কতগুলো শুকনো ঘাসের দিকে চোখ পড়তেই তাঁর মুখ আশায় ঝলমল ক'রে উঠলো। হঠাৎ কে যেন একটানে তাঁর মনের ভেতরে পর্দা তুলে দিলো, আর সবগুলো জট নিখুঁতভাবে খুলে গিয়ে একটি ভীষণ ধাঁধার সমাধান হ'য়ে গেলো যেন মনের ভেতর: নিটোল একটি পরিকল্পনা জেগে উঠলো তাঁর মনে। সবাইকে নিয়ে ফের বেলুনের কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। বললেন, 'আমরা বোধহয় ঐ দস্যুদের চেয়ে ঘণ্টাখানেকের পথ এগিয়ে আছি, কাজেই আর-একটুও সময় নষ্ট না-ক'রে এক্ষুনি কাজে লেগে যেতে হবে। যত পারো শুকনো ঘাস এনে জড়ো করো। নিদেন একশো পাউণ্ড শুকনো ঘাস আমার দরকার।'

'কেন ? তা দিয়ে হঠাৎ আবার কী হবে ?'

'আমাদের বেলুনে তো আর গ্যাস নেই ! কাজেই হালকা গরম হাওয়ার সাহায্যে বেলুন ফুলিয়ে আমরা নদী পেরুবো !'

পরিকল্পনাটি শুনেই কেনেডির মুখে খুশির আভা ফুটে উঠলো । আবারও একবার বন্ধুর বুদ্ধি এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে রীতিমতো চমৎকৃত হ'য়ে গেলেন তিনি ; শতমুখে প্রশংসা করতে ইচ্ছে হচ্ছিলো তাঁর ।

প্রচুর পরিমাণে শুকনো ঘাস এনে বাওবার গাছের তলায় স্তূপ ক'রে রাখা হ'লো । বেলুনের মুখটা যথাসম্ভব বড়ো ক'রে ফাঁক ক'রে ধরা হ'লো—যাতে বাকি গ্যাসটুকু বেরিয়ে যায়, তারপর সেই মুখের তলায় ঘাসের স্তূপ রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হ'লো । কিছুক্ষণের মধ্যেই একশো আশি ডিগ্রি আঁচে হাওয়া গরম হ'য়ে গিয়ে বেলুনের ভিতর প্রবেশ ক'রে ভেতরকার আটকে-পড়া বাতাসকে হালকা ক'রে তুললো, ক্রমে-ক্রমে তার গোল চেহারা ফিরে পেলে *ভিক্টরিয়া* । ঘাস আর আগুনের অপ্রতুলতা ছিলো না, কাজেই বেলুন এবার দুলে-দুলে ওপর দিকে ওঠবার জন্যে তৈরি হ'লো ।

বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, প্রখর কিরণ ছড়িয়ে দিচ্ছে মধ্যদিনের রাগি সূর্য, ঘামে তাপে পরিশ্রমে অভিযাত্রীরা তখন শ্রান্ত, এমন সময়ে উত্তর দিকে, বেশ দূরে, সেই দস্যুদলকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখা গেলো । তাদের ঘোড়ার খুরের একটানা খটখট আওয়াজ আর বিকট গলার ভীষণ শোরগোল ক্রমশই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠলো । তখনও আগুন জ্বলছে ঘাসের স্তূপে, কেঁপে-কেঁপে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে স্বচ্ছ শিখা, এত স্বচ্ছ যে চোখে তাদের দেখা যায় না, কেবল দেখা যায় তাপের একটা স্রোত ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ফুলে উঠছে—শুধু ঢেউ আর শুধু চঞ্চলতা । এদিকে আর-বেশি সময় নেই, মিনিট কুড়ির মধ্যেই দস্যুরা এখানে পৌঁছে যাবে ।

ফার্গুসন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরো ঘাস দাও, জো ! শিগগির ! দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের আকাশে উঠে যাওয়া চাই !'

ভিক্টরিয়ার তিন ভাগের দুই ভাগ সেই গরম হাওয়ায় ভ'রে গেছে ; একটু-একটু ক'রে ডিমের মতো আকার নিলে তা, তারপর তার পেট মোটা হ'য়ে গেলো আর অপেক্ষাকৃত রোগা হ'য়ে গেলো তলার দিকটা ।

ফার্গুসন নির্দেশ দিলেন, 'আগের মতো এবারেও আমাদের দড়ি ধ'রে ঝুলে-ঝুলে যেতে হবে । শক্ত ক'রে ধোরো কিন্তু !'

দশ মিনিট পরেই আকাশে ওঠবার উপক্রম করতে লাগলো বেলুন, স্বচ্ছ নীল হাওয়ায় কেঁপে উঠছে তার শরীর, আর আকাশের প্রখর নীল থেকে চুঁইয়ে পড়ছে আরো-স্বচ্ছ তাপ । ট্যালিবাস দুস্যরা কেবলই শপাং-শপাং ক'রে চাবুক চালাচ্ছে ঘোড়ার পিঠে, চোখ-কান বুজে ছুটে আসছে পুরোকদমে, এখন প্রায় পাঁচশো গজের মধ্যে এসে গেছে তারা ।

'শক্ত ক'রে ধরো,' দৃঢ় স্বরে ফার্গুসন নির্দেশ দিলেন ।

পা দিয়ে তিনি শেষ ঘাসের আঁটিটা ঠেলে দিলেন আগুনের মধ্যে, আর তারপরেই গরম হাওয়ায় ভ'রে-ওঠা বেলুনটি এক ধাক্কায় আকাশের দিকে উঠে গেলো। আগুনের শিখারা একবার কেবল লাফিয়ে উঠলো তার নাগাল ধরার জন্যে, কিন্তু বেলুন তখন ভেসে চ'লে যাচ্ছে শূন্যপথে।

ট্যালিবাস দস্যুরা প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলো। রাগি চ্যাঁচামেচির সঙ্গে এবার তাদের বন্দুকগুলিও শেষ চেষ্টায় প্রচণ্ডভাবে গ'র্জে উঠলো—একটা গুলি তো প্রায় জো-র কাঁধ ঘেঁসেই চ'লে গেলো, কেবল একটুর জন্যে বেঁচে গেলো সে। বেলুন ক্রমশ আটশো ফিট ওপরে উঠে গেলো দেখে দস্যুদের সে কী নিষ্ফল আক্রোশ। কোনো লাভ নেই জেনেও তারা খানিকক্ষণ বেলুন লক্ষ্য ক'রে এলোপাথাড়ি গুলি চালালে।

জোরালো হাওয়া ভাসিয়ে নিয়ে চললো বেলুনকে, দুলতে-দুলতে জলপ্রপাতের ঠিক ওপর দিয়ে নদী পেরুতে লাগলো *ভিক্টরিয়া*। প্রাণপণে দড়ি ধ'রে ঝুলে আছেন অভিযাত্রীরা, সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো: হাতের শিরাগুলি ফুলে উঠেছে, আর প্রবল চাপে রক্তিম হ'য়ে গেছে হাত; দরদর ক'রে ঘামছেন, উত্তেজনায় চোখগুলি চকচকে, আর ফার্গুসনের কাপালের শিরাটা ভীষণ রক্তচাপে স্পন্দিত হ'য়ে উঠেছে। কেউ কোনো কথা বলছেন না, কেবল প্রবল ইচ্ছার জোরে আঁটো ক'রে দড়ি ধ'রে আছেন। ধীরে-ধীরে বেলুন সেনেগল নদীর অপর তীরে গিয়ে নামতে লাগলো।

ফার্গুসন একবার ঈশ্বরের কৃপার কথা স্মরণ ক'রে চোখ মুদলেন।

অবশিষ্ট

ফরাশি উর্দি-পরা একদল সৈন্য নদীর তীরে এসেছিলো কুচকাওয়াজ করতে। নদীর ওপরে একটা বেলুনের দড়ি ধ'রে তিনজন শ্বেতাঙ্গকে ভাসতে দেখে তারা দস্তুরমতো হতবাক হ'য়ে সব লক্ষ করছিলো। এই দুর্গম প্রদেশে একটা বেলুনে চেপে কিনা নদীর ওপার থেকে তিনজন ইয়োরোপীয় লোক উড়ে এলো! এই তাজ্জব ঘটনা দেখে তাদের আর বিস্ময়ের কোনো সীমা ছিলো না। কিন্তু সেই সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ইয়োরোপীয় খবর-কাগজে অনেকদিন আগেই ডক্টর স্যমুয়েল ফার্গুসনের দুঃসাহসিক অভিযানের সংবাদ পড়েছিলেন। কাজেই দুই আর দুয়ে যোগ ক'রে এটা চট ক'রে বুঝে নিলেন যে, এঁরা আর কেউ নন, খোদ সেই সুবিখ্যাত অভিযাত্রী এবং তাঁর দুই সঙ্গী।

ধীরে-ধীরে বেলুন চুপসে নেমে আসছে মাটিতে—এই দৃশ্য দেখে সৈন্যরা ভয় পেয়ে গেলো। শেষকালে যদি নিরাপদ স্থানে পৌঁছুবার আগের মুহূর্তেই তাঁদের মৃত্যু ঘটে!

বুঝি-বা সেই দোদুল্যমান অভিযাত্রীরা শেষ পর্যন্ত জীবিত অবস্থায় মাটিতে পৌঁছোন না ! বেলুনটা সামান্য বেঁকে প্রবল স্রোতস্বিনীর জলে নেমে আসছে । তাই দেখে আর তারা চুপচাপ নির্বিকার দর্শক হ'য়ে থাকতে পারলে না । চট ক'রে কয়েকজন ফরাশি সৈন্য দ্রুত জলে নেমে গিয়ে হাত বাড়িয়ে অভিযাত্রীদের ধ'রে ফেললে, আর চুপসে-যাওয়া *ভিক্টরিয়া* সেই ভীষণ জলস্রোতে প'ড়ে দ্রুত ভাসতে-ভাসতে চোখের আড়াল হ'য়ে গেলো ।

দ্রুত পায়ে সেনাপতি এগিয়ে এলেন । 'ডক্টর ফার্গুসন !'

'হ্যাঁ, আমারই নাম স্যামুয়েল ফার্গুসন । এঁরা দুজন আমার সঙ্গী, অভিযানের সমস্তটা সময় আমার সঙ্গে-সঙ্গে ছিলেন ।' শ্রান্ত গলায় ফার্গুসন জানালেন । এই শেষ মুহূর্তে, নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে, যেই সব উত্তেজনার সমাপন হ'লো অমনি এক সারা শরীর-ভাঙা অবসাদ এসে তাঁর ওপর চেপে বসেছে ।

সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে তাঁদের তীরে নিয়ে এলো । কিন্তু তীরে এসেও ফার্গুসন সেই উচ্ছসিত, ফেনিল, পাক-খাওয়া জলধারার দিকে চেয়ে রইলেন ; যা তাঁর এতদিনের আশ্রয়, সেই *ভিক্টরিয়াকে* স্রোতের ওপর ঝুঁটি ধ'রে অবলীলায় ঘোরাতে-ঘোরাতে দিগন্তের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো জল । ধীরে-ধীরে ঝাপসা হ'য়ে এলো তাঁর চোখ, ছলোছলো ক'রে উঠলো, যেন এখুনি চোখ ফেটে অশ্রু বেরিয়ে আসবে ।

যে-বেলুন তাঁর এই দুঃসাধ্য অভিযানকে অনায়াসে সার্থক ক'রে দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে এই পাঁচ সপ্তাহ, বাঁচিয়েছে তাঁদের জংলিদের বল্লম, মরুভূমির তৃষ্ণা, বুনো জানোয়ারের দাঁত, কালো বনের আগুন, বেদুইনদের আক্রমণ আর ট্যালিবাস দস্যুদের নিষ্ঠুর বন্দুক থেকে—তার এই চিহ্নবিহীন পরিণতি এক অপরিসীম বিষাদে তাঁকে ভ'রে দিলে । এমনকী স্মৃতিচিহ্নটুকু পর্যন্ত রইলো না ! বড়ো ক্লান্ত লাগলো নিজেকে । মনে-মনে তিনি ফিশ-ফিশ ক'রে বারে-বারে আউড়ে নিলেন, 'তুমি থাকলে না বটে, কোনো স্মারক পর্যন্ত দিয়ে গেলে না, কিন্তু আমি থেকে গেলুম, তোমার কৃতিত্বের জীবিত নিদর্শন ! তোমাকে আমি কোনোদিনও ভুলবো না !' তারপর জোর ক'রে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন—দিগন্তের কাছে যেখানে নদী বাঁক ঘুরে তার ছলোছলো জল নিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে, সেদিকে আর তাকাতে পারলেন না, তীব্র এক অভাব-বোধে ও বিচ্ছেদ-বেদনায় তাঁর বুকটা টন-টন ক'রে উঠেছে ।

সেনেগল প্রদেশ ফরাশিদের একটি উপনিবেশ—সুদানের কাছেই । এই ফরাশি সেনাদল উপনিবেশের রাজ্যপালের আদেশ অনুসারে ঐ এলাকায় একটা জায়গা বেছে নিতে বেরিয়েছিলো, যেখানে সৈন্যদের জন্যে একটি ঘাঁটি স্থাপন করা যাবে । কেননা এ-সব অঞ্চলে দস্যুদের উপদ্রব খুব বেশি—কাজেই সৈন্যদের যত ব্যারাক আর ছাউনি থাকবে, ততই শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে সুব্যবস্থা করা সম্ভব হবে । সেদিন তারা অমনি এক কুচকাওয়াজে বেরিয়ে নদীর ধারে এসেছিলো, তারপর এই সাক্ষাৎ ।

খানিকক্ষণ পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ফার্গুসন সেনাপতিকে উদ্দেশ ক'রে

বললেন, 'আমরা যে এখানে বেলুনে ক'রে চব্বিশে মে তারিখে পৌঁছেছি, এই মর্মে একটি সরকারি বিবৃতিতে আপনার স্বাক্ষর প্রয়োজন। আশা করি এইরকম একটা বিবৃতিতে দস্তখৎ করতে আপনার কোন আপত্তি নেই।'

'নিশ্চয়ই না। আমি এখুনি স্বাক্ষর করছি—আপনার এই অভিযানের সঙ্গে আমার নাম যোগ হ'লে তো আমারই গৌরব! কিন্তু তার আগে চলুন বিশ্রাম করবেন। আপনাদের দেখে অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত ব'লে মনে হচ্ছে—কাজেই সব-আগে আপনাদের বিশ্রামেরই প্রয়োজন এখন।'

ফরাশি সেনাবাহিনীর সঙ্গে জো আর ডিক কেনেডিকে নিয়ে ক্লান্ত ও অবসন্ন ফার্গুসন বাহিনীর ঘাঁটির দিকে রওনা হ'য়ে পড়লেন। যেতে-যেতে ভাবলেন, 'লণ্ডনে পৌঁছুতে আরো কত দিন বাকি! এবারে ফিরে গিয়ে, সত্যি, অন্তত কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম নিতে হবে। না-জেনে সেনাপতি-মশাই একটা মস্ত কথা বলেছেন—বিশ্রামেরই প্রয়োজন এখন আমার সর্বাগ্রে। বড্ড ক্লান্ত লাগছে নিজেকে, বড়ো বেশি অবসন্ন।'

———

নয়, তার প্রমাণ হিশেবে সম্প্রতি এখানে বিচিত্র-সব চিহ্নলক্ষণ দেখা গেছে যা হয়তো ঘুমন্ত কোনো আগ্নেয়গিরি পুনর্জাগরণেরই ইঙ্গিত—বা পূর্বাভাস। পাহাড়ের ওপর ভেসে থেকেছে ধোঁয়ার কুণ্ডলি, পাঁজা-পাঁজা, আর একবার পথচারী পাহাড়িরা কানে শুনেছে ভূগর্ভের কোলাহল, দুর্বোধ্য গুমগুমে আওয়াজ, ব্যাখ্যাতীত সব রুষ্ট গর্জন। শিখরের কাছে আকাশ জ্বলজ্বল ক'রে উঠেছে কী-এক অচেনা আভায়, রাতের অন্ধকারে।

হাওয়া যখন ঝেঁটিয়ে নিয়ে এসেছে সেই ধোঁয়ার মেঘ, পূবদিকে, প্লেজেণ্ট গার্ডেনে, কয়েকটি পোড়া-পোড়া টুকরো আর ছাইভস্ম ঝ'রে পড়েছে সেই মেঘ থেকে। আর, শেষটায়, এক ঝড়ের রাতে বিবর্ণ-সব দাউদাউ শিখা, শিখরের ওপরকার মেঘে প্রতিফলিত হ'য়ে, নিচের বসতিতে আছড়ে ফেলেছে এক ভয়াল হুঁশিয়ার-করা আলো।

এইসব আশ্চর্য সব উৎপাত দেখে, আশপাশের এলাকার লোকজন যে বেশ শঙ্কিত আর অস্থির হ'য়ে পড়বে, তাতে অবাক হবার কিছু ছিলো না। আর এই অস্থিরতার সঙ্গে এসে মিশেছিলো পাহাড়ের সত্যিকার হালচাল জেনে-নেবার জন্যে উদগ্র এক আকাঙ্ক্ষা। ক্যারোলাইনার খবরকাগজগুলোয় জ্বলজ্বল করেছিলো শিরোনাম : '*গ্রেট আইরির গভীর রহস্য!*' এটাও তারা আতঙ্কিত বাক্যবন্ধে জিগেস করেছিলো এ-রকম কোনো অঞ্চলে বসবাস করা কি বিষম বিপজ্জনক নয়। প্রবন্ধগুলো চেতিয়ে তুলেছিলো আতঙ্ক আর কৌতূহল—আতঙ্ক তাদের মধ্যে যারা, সত্যি যদি বিস্ফোরণ ঘটে, তবে সর্বনাশের মুখোমুখি পড়বে; কৌতূহল তাদের মধ্যে, যাদের নিজেদের কোনো আশু বিপদের সম্ভাবনা নেই, যারা জানতে চাচ্ছিলো প্রকৃতির এই উৎপাতের আড়ালে সত্যি-সত্যি সে-কোন প্রক্রিয়া কাজ ক'রে যাচ্ছে। যাদের ঘাড়ের ওপর বিপদ প্রায় লাফিয়ে পড়তে চলেছে, তারা হ'লো মরগ্যানটনের বাসিন্দা, আর তাদের চাইতেও বেশি ভয় ছিলো প্লেজেণ্ট গার্ডেন আর তার আশপাশের ছোটো-ছোটো গ্রামগঞ্জের লোকদের।

এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে কোনো পর্বতারোহীই আগে *গ্রেট আইরির* শিখরে চড়বার চেষ্টা করেনি। শিখরটাকে ঘিরে যে-শৈলশ্রেণী গেছে কেউই আগে তাতে ওঠবার কথা ভাবেনি। সেখানে হয়তো সত্যি এমন-কোনো পথও নেই, যা বেয়ে উঠে সবচেয়ে দুঃসাহসী পর্বতারোহীও ভেতরে গিয়ে পৌঁছুবার কোনো সুযোগ পেতো। অথচ, যদি-কোনো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ক্যারোলাইনার সমগ্র পশ্চিমভাগকেই বিপদের মুখোমুখি ক'রে থাকে, তবে এই গিরিমালার সমগ্র অঞ্চলের একটা সরেজমিন তদন্ত ক'রে দেখা অত্যন্ত জরুরি হ'য়ে উঠেছে।

জ্বালামুখের মধ্যে দিয়ে সত্যি-সত্যি সশরীরে নামবার আগে—নামবার তো কত-যে অসুবিধে আছে তার তো হিশেব নেই—একটা উপায় অবশ্য আছে, যার সাহায্যে ভেতরটায় কী আছে তা দেখে-আসা যায়, তার জন্যে পাহাড় বেয়ে শিখরে ওঠবার কোনো দরকার নেই। সেই স্মরণীয় বছরটার সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে, উইলকার নামে এক নামজাদা বেলুনবাজ তার বেলুনটা নিয়ে মরগ্যানটনে এসে হাজির হয়েছিলো। পূব-থেকে-আসা হাওয়ার অপেক্ষায় থেকে, সে সহজেই তার বেলুনে ক'রে আকাশে

উঠে গিয়ে *গ্রেট আইরি-র* দিকে ভেসে যেতে পারতো। সেখানে, নিরাপদ উচ্চতা থেকে, জোরালো দূরবিন চোখে এঁটে নিচের গভীরে তাকিয়ে সে সব খুঁজে দেখতে পারবে। সে তাহ'লে সহজেই জেনে নিতে পারবে আগ্নেয়গিরিটার কোনো নতুন জ্যান্ত মুখ সেই বিশাল পাথরগুলোর মধ্যে কোথাও বেরিয়েছে কি না। অন্তত সেটাই ছিলো তখন প্রধান প্রশ্ন। এটা যদি একবার নিশ্চিতভাবে জেনে নেয়া যায়, তাহ'লে আশপাশের অঞ্চলের লোকজন জেনে যাবে অচিরেই আসন্ন কোনো অগ্ন্যুদগারের ভয় আছে কি না।

যে-কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছিলো, সেই অনুযায়ীই শুরু হয়েছিলো বেলুনের উত্থান। হাওয়া ছিলো বেশ জোরালোই, কোনো তীব্র ঝাঁকুনি বা দিকবদল ছিলো না; প্রখর সূর্যকিরণে সকালবেলার মেঘগুলো ক্রমেই উধাও হ'য়ে যাচ্ছিলো; *গ্রেট আইরির* অভ্যন্তর যদি ধোঁয়ায় ভরা না-থাকে, বেলুনবাজ উইলকার তবে চোখে দূরবিন এঁটে গোটা তল্লাটটাই ঢুঁড়ে নিতে পারবে। আর যদি সে দ্যাখে কুণ্ডলি পাকিয়ে বাষ্প উঠে আসছে, তবে তার উৎসটাও সে তখন অনায়াসেই জেনে নিতে পারবে।

যাত্রা শুরু করবার সঙ্গে-সঙ্গেই বেলুনটা তরতর ক'রে তক্ষুনি পনেরোশো ফিট উঁচুতে উঠে গিয়েছিলো, তারপর এক জায়গাতেই অনড়ভাবে দাঁড়িয়েছিলো প্রায় পনেরো মিনিট। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো নিচে যে-পুরবইয়া হাওয়াকে জোরালো ব'লে মনে হচ্ছিলো, অতটা ওপরে তার তেমন বেগ ছিলো না। তারপর, পোড়াকপাল আর কাকে বলে, বেলুনকে তাড়া লাগিয়েছিলো উলটোমুখি এক হাওয়া, আর সে পুবদিকে ভেসে চ'লে যেতে থাকে। শৈলশ্রেণী থেকে তার দূরত্ব, তার ব্যবধান, ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিলো। বেলুনবাজের যাবতীয় চেষ্টা সত্ত্বেও, মরগ্যানটনের বাসিন্দারা দেখতে পেলে, বেলুনটা ভুল দিগন্তের দিকে উধাও হ'য়ে যাচ্ছে। তারা জানতে পেরেছিলো, বেলুনটা গিয়ে নেমেছিলো র‍্যালের আশপাশে, যে-র‍্যালে ছিলো নর্থ ক্যারোলাইনার রাজধানী।

এই চেষ্টাটা এইভাবে দূর-মাঠে মারা যাওয়াতে, ঠিক হ'লো যে, আবহাওয়া যখন আরো-ভালো থাকবে, তখন আরো-একবার চেষ্টা ক'রে দেখা হবে। এদিকে নতুন ক'রে শুরু হ'য়ে গেলো পাহাড়ের ভেতরকার গুমগুম গর্জন, সঙ্গে এলো ভারি-ভারি ঝোলা মেঘ আর রাতের বেলায় সন্ত্রস্ত ও কম্পিত আলোকশিখা। লোকে এবার প্রায় নিঃসন্দেহই হ'য়ে গেলো যে *গ্রেট আইরির* হাবভাব মোটেই সুবিধের ঠেকছে না, বিপদটা যে ভয়াল ও করাল হবে শুধু তা-ই নয়, বিপদটা আসন্ন এবং অবশ্যম্ভাবী। হ্যাঁ, সন্দেহ নেই যে, গোটা তল্লাটটাই হয় কোনো ভয়ানক ভূমিকম্প আর নয়তো কোনো আসন্ন অগ্ন্যুদগারের কবলে প'ড়ে গিয়েছে।

সে-বছরের এপ্রিলমাসের গোড়ার দিকে, এই আশঙ্কাগুলো সত্যিই আতঙ্কে পরিণত হয়েছিলো। জনসাধারণের ভয়ের বহুগুণ প্রতিধ্বনি শোনা গেলো খবরকাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে। পাহাড় থেকে মরগ্যানটন অব্দি গোটা অঞ্চলটাই এখন জেনে গিয়েছে যে একটি অগ্ন্যুদগার অবশ্যম্ভাবী।

চৌঠা এপ্রিলের রাত্তিরবেলায়, প্লেজেন্ট গার্ডেনের বাসিন্দারা এক ভয়ানক কোলাহল

শুনেছিলো জেগে উঠলো। প্রথমে তারা ভেবেছিলো গোটা পাহাড়টাই বুঝি তাদের মাথার ওপর ভেঙে পড়েছে। তারা ছুটে বেরিয়ে এসেছিলো তাদের ঘরবাড়ি থেকে, তক্ষুনি গ্রাম ছেড়ে চ'লে যাবার জন্যে তৈরি, এতই শঙ্কাতুর যে ভাবছিলো মাটি বুঝি চারপাশে হা ক'রে আছে, মাইল-মাইল জোড়া খেতখামার গ্রামগঞ্জ গিলে খাবার জন্যে তৈরি।

রাতটা ছিলো ঘুটঘুট্টে অন্ধকার। উপত্যকার ওপর ঝুলে ছিলো ভারি নিচু মেঘ। রাত না-হ'য়ে যদি দিনও হ'তো, তাহ'লেও ঐ মেঘের জন্যে পাহাড়ের চুড়োটা কারু চোখে পড়তো না।

এই দুর্ভেদ্য ও দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারের মধ্যে, চারপাশ থেকে যত আর্তনাদ উঠেছিলো, তার কোনো সাড়া মিলছিলো না। ভীতসন্ত্রস্ত আবালবৃদ্ধবনিতা খ্যাপা এক বিশৃঙ্খলার মধ্যে অন্ধকারে হাৎড়ে-হাৎড়ে ছুটছিলো—কোথায় যাচ্ছিলো কেউ জানতো না। চারপাশ থেকে শোনা যাচ্ছিলো চীৎকার : 'ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!' 'অগ্ন্যুদগার! বিস্ফোরণ!' 'কোথায়? কোথায় অগ্ন্যুৎপাত?' 'কেন! *গ্রেট আইরিতে*!'

মরগ্যানটনে হু-হু ক'রে খবর চ'লে গেলো পাথর, লাভা, ছাইভস্মের এক প্রবল বর্ষণ শুরু হ'য়ে গেছে।

শহরের নাগরিকদের মধ্যে যাদের মাথা তখনও ঠাণ্ডা ছিলো তারা বললে যে সত্যিই যদি কোনো অগ্ন্যুদগার হ'তো তাহ'লে গর্জনটা শুধু-যে এখনও শোনা যেতো তা নয়, তার প্রচণ্ডতাও বেড়ে যেতো, আর শিখরটার ওপর দেখা দিতো আগুনের শিখা;—আর শিখা না-দেখা গেলেও শিখার লেলিহান তাণ্ডব নাচ মেঘ ফুঁড়ে চারপাশে প্রতিফলিত হ'তো। এখন তো এমনকী কোনো শিখারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। আর ভূমিকম্প যদি হ'তো—আতঙ্কিত মানুষজন দেখতে পেলে যে সেই ভূমিকম্পে আর যা-ই হোক, তাদের বাড়িঘরগুলো এখনও চুরমার হ'য়ে ভেঙে পড়েনি। খুবই সম্ভব যে বিকট আওয়াজটা কোনো আভালাঁশের গড়িয়ে-পড়া থেকে উঠেছে, হয়তো শিখর থেকে হঠাৎ কোনো বিশাল পাথর গড়িয়ে পড়েছে।

এক ঘন্টার মধ্যে আর-কোনো নতুন ঘটনাই ঘটলো না। পশ্চিম-থেকে-আসা হাওয়া ঝেঁটিয়ে যাচ্ছে নীলগিরির বিস্তীর্ণ শৈলশ্রেণী, পাহাড়ের ওপর ঢালগুলোয় পাইনবনে হেমলকের ঝাড়ে বিলাপ উঠেছে হাওয়ার। দেখে মনে হচ্ছে আতঙ্কের আর নতুন-কোনো কারণ নেই কোথাও; লোকজন তারপর যে-যার বাড়িতে ফিরে আসতে শুরু ক'রে দিয়েছে ততক্ষণে। তবু সবাই অধীরভাবে অপেক্ষা ক'রে আছে কখন ভোর হয়, কখন দিন ফোটে।

তারপর, আচমকা, শেষরাতে, তিনটে নাগাদ, আকেবার বিপদের সংকেত। *গ্রেট আইরি*-র পাথরের দেয়ালের ওপর লাফিয়ে-লাফিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে আগুনের শিখা! মেঘের গা থেকে প্রতিফলিত হ'য়ে, তারা অনেক দূর অব্দি আকাশ আর মেঘ আলো ক'রে দিয়েছে। শোনা গেলো চড়চড় শব্দ, যেন একসঙ্গে পুড়ে যাচ্ছে অনেক গাছ, যেন কোথাও দাবানল লেগেছে।

আপনা থেকেই বনে আগুন লেগে গিয়েছে? হঠাৎ এভাবে আগুন-লেগে-যাবার কারণ কী হ'তে পারে? বিদ্যুৎ নিশ্চয়ই এই দাবানল শুরু করেনি, কারণ একবারও কোথাও বাজের শব্দ শোনা যায়নি। সত্যি-যে, আগুন ধ'রে যাবার উপকরণ আছে অনেক; ঐ ওপরে নীলগিরির শৈলশ্রেণী নিবিড় বনে ছাওয়া। কিন্তু এই শিখাগুলো যেন বড্ড-আচমকা একসঙ্গে শুরু হ'য়ে গেছে—কোনো নৈসর্গিক কারণ যে আছে তা তো মনে হয় না।

'অগ্ন্যুদগার ! বিস্ফোরণ! অগ্ন্যুৎপাত! আগ্নেয়গিরির ঘুম ভেঙেছে!'

চারপাশ থেকে ঝাপট মারলো আর্ত চীৎকার! আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত! সত্যি, তাহ'লে, পাহাড়ের আঁতের মধ্যে লুকিয়েছিলো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ! আর এত বছর পরে, বলতে-কি যুগ-যুগ পরে, অবশেষে আবার তার ঘুম ভেঙেছে! শিখার সঙ্গে যোগ হ'য়ে এখন কি তবে মুষলধারে বর্ষাবে জ্বলন্ত পাথর, গলানো লাভা আর অবিরাম ছাই? তবে কি লাভা ঢেউ তুলে নেমে আসবে তরল আগুন নিয়ে? আর পথে যা পড়বে সব ধ্বংস ক'রে দেবে—গ্রামনগর, খেতখামার, প্রকৃতির এই সুন্দর লীলাভূমি? এসে ধ্বংস ক'রে দেবে প্লেজেন্ট গার্ডেন আর মরগ্যানটন?

এবার আতঙ্ক আর বিশৃঙ্খলা হ'লো চরম। কোনো আশ্বাস, কোনো প্রবোধ তাকে থামাতে পারতো না। মেয়েরা কোলে শিশু নিয়ে, আতঙ্কে উম্মাদিনী, ছুটেছে পুবদিকে; পুরুষরা, ঘরবাড়ি ছাড়তে-ছাড়তে, ক্ষিপ্রহাতে পুঁটুলিতে বেঁধে নিচ্ছে যা-কিছু ছিলো মূল্যবান, দুর্লভ; তারপর খুলে দিচ্ছে কোরাল আস্তাবল গোয়ালের দরজা, যাতে গোরুভেড়া, শুওর-মোষ যে যেদিকে পারে খোলা মাঠে ছুটে যেতে পারে। সেই তমসাচ্ছন্ন রাত্রে মানুষ আর জানোয়ারের সে-কী হন্যে উম্মাদনা, সে-কী বিশৃঙ্খল ছোটাছুটি, বনে-জঙ্গলে, খোলা মাঠে, গ্রাম-শহরের রাস্তায়, জলাভূমির পাশে, অন্ধকারে! জলাশয়গুলোয় ফুলে ফেঁপে অস্থির হ'য়ে উঠছে জল, পলাতকদের পায়ের তলা থেকে তারা যেন হ্যাঁচকা স্রোতের টানে সরিয়ে নিয়ে যাবে মাটি! কিন্তু যদি উম্মাদ কোনো প্রস্রবণের মতো নেমে আসে তরল আগুন, পাহাড়ের গা বেয়ে, আর যদি সেই জ্বলন্ত লাভার তলায় হারিয়ে যায় পথ?

অবশ্য, সবচেয়ে বড়ো খেতখামার যাদের, যাদের প্রবীণ মগজ তুলনায় বিচক্ষণও, তারা কিন্তু এই উম্মাদ পলায়মান নরনারীর ঠেলাঠেলিতে ভেসে যায়নি, তারা বরং আবারও চেষ্টা করেছে অন্যরা যাতে একটু সংযত হয়। পাহাড়ের মাইল খানেকের মধ্যে এসে, তারা দেখতে পেলে শিখার প্রোজ্জ্বল দাপট অনেকটাই স্তিমিত হ'য়ে বসেছে। সত্যি-বলতে, তাদের মনে হ'লো এই অঞ্চলে যে আশু-কোনো, কিংবা অন্য-কোনো, বিপদের সম্ভাবনা আছে, এমনটা বোধ হচ্ছে না। কোনো পাথরই আছড়ে পড়েনি মহাশূন্যে; ঢালের ওপর কোনো লাভার স্রোত গড়িয়ে যাচ্ছে না; মাটির তলা থেকে ভেসে আসছে না কোনো রহস্যময় গুমগুম আওয়াজ। চারপাশে এমন-কোনো লক্ষণ নেই যা দেখে মনে হ'তে পারে ভূমির কম্পনজনিত কোনো দুর্ঘটনা রাজ্যটাকে সর্বনাশে দিতে পারে।

শেষটায়, পলাতকদের উন্মাদ উড়াল এসে থামলো এমন জায়গায় যেখান থেকে, তারা ভাবলে, পাহাড়ের বিপদ অতর্কিতে এসে ছোঁ মেরে তাদের ওপর আর পড়বে না। তখন কয়েকজন ভয়ে-ভয়ে, সন্তর্পণে, একটু-একটু ক'রে আবার ফিরে এলো পাহাড়ের দিকে। পুরোপুরি দিন ফোটবার আগেই কতগুলো খামারবাড়িতে আবার ফিরে এলো লোকজন।

সকালবেলায় *গ্রেট আইরির* শিখরের ওপর আগের রাতের ধোঁয়ার মেঘের আর কোনো চিহ্নই ছিলো না। আগুন যা জ্বলেছিলো তা নিশ্চয়ই নিজে থেকেই নিভে গিয়েছে ; আর কেন-যে অমন দুর্বিপাক আচমকা শুরু হয়েছিলো তার কারণ যদি-বা কেউই বুঝতে পারেনি, সকলেই অন্তত এই আশাটুকু করেছে যে আবার যাতে অচিরেই তার কোনো পুনরাবৃত্তি না-হয়।

এমনও কারু-কারু মনে হ'লো যে *গ্রেট আইরি* আসলে হয়তো কোনো আগ্নেয় তোলপাড়ের নাট্যশালাই ছিলো না। পুরো এলাকাটা যে ভূমিকম্প কিংবা অগ্ন্যুৎপাতের দয়ার ওপর নির্ভর ক'রে আছে এমন-কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণও কোথাও নেই।

অথচ তবু পাঁচটা নাগাদ, আবার শৈলশিরার ঠিক নিচেটায়, যেখানকার বনভূমিতে রাত্রি তখনও যাই-যাই ক'রেও পুরোপুরি চ'লে যায়নি, অদ্ভুত এক আওয়াজ উঠলো আর হাওয়ায় উড়াল দিয়ে দূরে চ'লে গেলো, আর তার সঙ্গে ছিলো যেন বিশাল-কোনো ডানার ঝাপট। আর দিনটা যদি অন্যদিনের মতো স্বচ্ছ ফটফটে পরিষ্কার হ'তো, চাষীরা হয়তো দেখতে পেতো অতিকায় কোনো শিকারি পাখির তুমুল উড়াল—হয়তো আকাশের কোনো অপদেবতাই *গ্রেট আইরির* নয়ানজুলি ডেকে ডানা ছড়িয়ে উঠে পড়েছে আকাশে, আর দ্রুত গতিতে উড়ে চ'লে যাচ্ছে পুবদিগন্তের পানে।

২

আমি মরগ্যানটনে এসে পৌঁছোলুম

আগের দিন রাত্তিরে ওয়াশিংটন থেকে রওনা হ'য়ে ২৭ শে এপ্রিল আমি এসে পৌঁছোলুম নর্থ ক্যারোলাইনার রাজধানী র‍্যালেয়।

দু-দিন আগে, ফেডারেল পুলিশের বড়োকর্তা আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। খানিকটা অধীর হ'য়েই আমার আপেক্ষা করছিলেন তিনি। 'জন স্ট্রক,' তিনি ব'লে উঠেছিলেন, 'তুমি কি এখনও সেই করিৎকর্মা মানুষটি আছো, যে এর আগে অনেকবার শুধু আমার প্রতি তার আনুগত্যই দেখায়নি, তার কাজের প্রতিভাও

দেখিয়েছে ?'

'মিস্টার ওয়ার্ড,' আমিও উত্তরে নুয়ে প'ড়ে সেলাম ঠুকে বলেছিলুম, 'আমি কোনো সাফল্য বা কর্মদক্ষতার প্রতিশ্রুতি দিতে অপারগ—তবে যদি আনুগত্যের কথা বলেন, আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি, আমার আনুগত্য শতকরা একশোভাগই আপনার অধীন।'

'সে নিয়ে আমি কোনো সন্দেহ করিনি, স্ট্রক,' বড়োকর্তাও সমান সুরে বলেছিলেন, 'আমি বরং তোমাকে আরো-যথাযথ প্রশ্নটা করি : তুমি কি আগের মতোই প্রহেলিকা নিয়ে মাথা ঘামাও ? ধাঁধা বা হেঁয়ালির সমাধান করতে উৎসুক ? আগে যেমন ক'রে কোনো রহস্যভেদ করবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে, এখনও কি তুমি তেমনতর কোনো উদ্‌গ্রীব আগ্রহ বোধ করো ?'

'করি, মিস্টার ওয়ার্ড।'

'সাধু, সাধু,' শাবাশি দিয়েছেন বড়োকর্তা, 'তাহ'লে এখন মন দিয়ে শোনো।'

মিস্টার ওয়ার্ড, বয়েস তাঁর সম্ভবত পঞ্চাশ বৎসর, এত বড়ো পদে উন্নীত হয়েছিলেন শুধু তাঁর ক্ষমতা আর বুদ্ধিবলে; এই পদটার সঙ্গে জড়ানো যাবতীয় গুরুদায়িত্বই তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে পালন ক'রে আসছিলেন । আগে অনেকবারই তিনি আমার ওপর নানাবিধ কঠিন কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, আর আমিও সাফল্যের সঙ্গে সে-সব কাজ সম্পন্ন ক'রে-ক'রে ক্রমেই তাঁর গভীর আস্থাভাজন হ'য়ে উঠেছিলুম। গত কয়েক মাসে অবশ্য আমাকে তিনি কোনো কাজ দেননি, কেননা সে-রকম কোনো দুর্বোধ্য কূট প্রহেলিকার জট ছাড়াবার কাজ আমাদের বিভাগে আসেনি । সেজন্যে তিনি এখন কী বলতে চান সেটা জানবার জন্যেই আমি অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলুম। তাঁর এই প্রশ্ন আর ভনিতা যে আমার কাঁধে আবার কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব চাপিয়ে দেবারই অছিলা মাত্র, এটা বুঝতে আমার একটুও দেরি হয়নি।

'সন্দেহ নেই যে তুমি জানো,' বড়োকর্তা বলেছেন তখন, 'মরগ্যানটনের কাছে ব্লুরিজ মাউন্টেনসে কী-সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে তা নিশ্চয়ই তুমি জানো।'

'শুনেছি বটে । ও-খান থেকে অনবরত যে-সব আশ্চর্য ঘটনার খবর আসছে, তা যে-কারুর কৌতূহল উশকে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।'

'ঘটনাগুলো কেবল-যে আশ্চর্য তা-ই নয়—এমন-কোনো আশ্চর্য ব্যাপার কেউ কখনও জন্মেও শোনেনি। সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ রেখো না, স্ট্রক। কিন্তু তাছাড়াও আরো-কতগুলো জরুরি প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে : *গ্রেট আইরিতে* যা হচ্ছে, সেখানকার লোকদের পক্ষে তা যদি বিপজ্জনক হয়, তবে কতটা বিপজ্জনক ?' সে কি অবিলম্বে-ঘটতে চলেছে এমন-কোনো ভয়াবহ সর্বনাশেরই ইঙ্গিত ? এমন-এক সর্বনাশ, যা অত্যন্ত রহস্যময়ও, যার সম্বন্ধে কিছুই আমরা জানি না।'

'দেখে-শুনে ভয়ই হয়, মিস্টার ওয়ার্ড।'

'কাজেই, স্ট্রক, চট ক'রে আমাদের জেনে নিতে হবে, ঐ পাহাড়ের মাঝখানটায়

কী আছে। যদি প্রকৃতির কোনো বিশাল শক্তির কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতেই হয় আমাদের, তবে লোকজনকে আগে থেকেই এই ভয়াল বিপদটা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দেয়া উচিত।'

'স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটা ভালো ক'রে তদন্ত ক'রে বুঝে নিতে হবে স্তি্য-সত্যি ওখানে কী হচ্ছে।'

'তুমি ঠিক বলছো, স্ট্রক । কিন্তু তাতে আবার বিস্তর ঝামেলা আছে। সকলেই জানিয়েছে যে *গ্রেট আইরির* চুড়োয় ওঠা একেবারেই অসাধ্য ব্যাপার, সেখানে উঠে তারপর ভেতরের নয়ানজুলিটায় নামাটা তো একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু কেউ কি আগে কখনও যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম নিয়ে সবরকমে তৈরি হ'য়ে ভালো আবহাওয়ায় ওখানে যাবার চেষ্টা ক'রে দেখেছিলো ? আমার অবশ্য এতে একটু সন্দেহ আছে ; আমার বিশ্বাস, কোনো সুপরিকল্পিত অভিযান হয়তো সাফল্য এনে দেবে ।'

'কিছুই অসম্ভব নয়, মিস্টার ওয়ার্ড। এখানে, আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো সমস্যাটা হ'লো ব্যয়নির্বাহের প্রশ্ন—কাজটা সুষ্ঠুভাবে করতে গেলে বিস্তর অর্থব্যয় হবে।'

'যখন আমরা আস্ত-একটা জনপদের মানুষজনকে আশ্বস্ত করতে চাচ্ছি, হয়তো-বা সর্বনাশের হাত থেকে তাদের বাঁচাতেও চাচ্ছি, তখন খরচের প্রশ্নটা কোনো প্রশ্নই নয়। তোমার কাছে অবশ্য আমার আরেকটা প্রস্তাবও আছে । হয়তো এই *গ্রেট আইরি* লোকে যতটা ভাবে ততটা অগম্য নয় । হয়তো একদল পাজি দুষ্কৃতকারী গিয়ে সেখানে তাদের গোপন ডেরা বানিয়েছে, হয়তো শুধু তারাই জানে কেমন ক'রে ঐ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতে হয়।'

'অর্থাৎ ? আপনি কি ভাবছেন যে একদল দস্যু—'

'হয়তো আমার অনুমানটা পুরোপুরি ভুল, স্ট্রক। হয়তো এইসব অদ্ভুত আওয়াজ আর চাক্ষুষ দৃশ্যগুলোর পেছনে স্বাভাবিক কোনো নৈসর্গিক কারণই আছে। কিন্তু দস্যুদল না নিসর্গ—কে যে এ-সবের জন্যে দায়ী সেটা আমাদের সুনিশ্চিতভাবে জেনে নিতে হবে—এবং জেনে নিতে হবে যত শিগগির সম্ভব।'

'আমার শুধু একটাই প্রশ্ন আছে।'

'ব'লে ফ্যালো, স্ট্রক, ব'লে ফ্যালো । কোনো খটকাই চেপে রেখো না।'

'ধরুন, আমরা *গ্রেট আইরিতে* গিয়ে পৌঁছেছি, এ-সব আশ্চর্যের উৎস আর উৎপত্তিস্থলও বার ক'রে ফেলেছি, জেনে গিয়েছি যে সেখানে আগ্নেয়গিরির এক জাগ্রত জ্বালামুখ আছে আর এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ অচিরেই আসন্ন—তখন কি তাকে আমরা ঠেকাতে পারবো ?'

'না, স্ট্রক, না। তবে বিপদের পরিমাণ কতটা হ'তে পারে, সেটা আমরা আন্দাজ করতে পারবো। *যদি* মার্তিনিকে যেমন ভয়ংকর অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে, মাউন্ট পেলের উদ্‌গিরণ থেকে *যদি* আস্ত-আস্ত জনপদ যেমনভাবে চাপা প'ড়ে গিয়েছে, *যদি* সেইরকমই

কোনো অগ্ন্যুৎপাত নর্থ ক্যারোলাইনাকে সমূহ বিপদের মুখোমুখি এনে ফেলে থাকে, তবে আমরা লোকজনকে হুঁশিয়ার ক'রে দিতে পারবো, তাদের জানিয়ে দিতে হবে যে এখানকার পাট উঠিয়ে তাদের এবার অন্য-কোথাও গিয়ে আস্তানা পাততে হবে—'

'আশা করি তেমন-কোনো ভয়াবহ বিপদের সম্ভাবনা নেই।'

'আমারও তা-ই মনে হয়, স্ট্রক। ব্লুরিজ শৈলশ্রেণীতে কোনো জাগ্রত আগ্নেয়গিরি আড়মোড়া ভাঙছে, এটা আমার কাছে বড্ড অবিশ্বাস্য ঠেকছে। আমাদের আপালাচীয় পার্বত্যব্যবস্থা কক্‌খনো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু পাহাড়ে যা ঘটছে, তার তো কোনো-একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া চাই আমাদের—সে-সব নিশ্চয়ই অকারণেই ঘটছে না। সংক্ষেপেই তোমাকে বলি, স্ট্রক। আমরা ঠিক করেছি, *গ্রেট আইরিতে* যা হচ্ছে তার একটা সরেজমিন তদন্ত ক'রে দেখা উচিত, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব দেখা দরকার, সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ একজায়গায় জড়ো করা জরুরি—শহরের গ্রামের সবাইকে প্রশ্ন ক'রে-ক'রে জেনে নিতে হবে তারা কী দেখেছে, কী শুনেছে, কী ভেবেছে। আর এইসব কাজ করবার জন্যে আমরা এমন-একজনের কথা ভেবেছি, যার ওপর আমাদের সকলেরই পূর্ণ আস্থা আছে ; এবং সেই লোক হচ্ছো তুমি, *স্ট্রক*।'

'বেশ। আমি তৈরি আছি, মিস্টার ওয়ার্ড,' আমি একটু উত্তেজিত গলাতেই ব'লে উঠেছি তখন, 'নিশ্চিন্ত থাকবেন—পুরো খবরটা জোগাড় করতে যা-যা করতে হবে, সব আমি করবো—কোথাও কোনো কাজে অবহেলা করবো না।'

'তুমি যে কাজে ফাঁকি দেবে না বা অবহেলা করবে না, তা আমি জানি, স্ট্রক। তবে এটাও তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই যে আমাদের মনে হয়েছে তুমিই এই কাজের উপযুক্ত লোক। এবার তুমি তোমার ঐ ছটফটে উগ্র কৌতূহলটাকে চরিতার্থ করবার চমৎকার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে।'

'আপনি তো জানেনই, মিস্টার ওয়ার্ড, যে-কোনো প্রহেলিকাকে নিছক প্রহেলিকা ব'লে মেনে নিতে আমার বোধবুদ্ধিতে আটকায়।'

'পরিস্থিতি অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থাই তুমি নিজে করবে, স্বাধীনভাবে—কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। আর খরচের প্রশ্ন, যদি মনে হয় যে পর্বতাভিযানের জন্যে আঁটঘাট বেঁধে ওস্তাদ পর্বতারোহীদের নিয়ে বেরুতে হবে, তাতে অবশ্য বিস্তর খরচ হবে—তবে সেক্ষেত্রে তোমার *কার্তব্লাঁশ* রইলো, ইচ্ছেমতো অর্থব্যয় করতে পারবে তুমি।'

'যা করলে ভালো হবে ব'লে মনে হবে, আমি তা-ই করবো, মিস্টার ওয়ার্ড।'

'একটা বিষয়ে তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, স্ট্রক। খুব হুঁশিয়ার হ'য়ে, সন্তর্পণে, তোমায় এগুতে হবে। ওখানকার লোকজন এর মধ্যেই উত্তেজনায় টগবগ ক'রে ফুটছে। তোমার পক্ষে বরং গোপনেই অনুসন্ধান চালানো উচিত হবে। আমি যে-সন্দেহের কথাটা তুলেছি, ঘুণাক্ষরেও কক্‌খনো কারু কাছে তার কথা পেড়ো না। আর সবচেয়ে বড়ো কথা—অকারণে নতুন-কোনো আতঙ্ক যাতে না-ছড়ায় সে-বিষয়ে তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টাই সতর্ক থাকতে হবে।'

'মনে থাকবে, মিস্টার ওয়ার্ড।'

'মরগ্যানটনের মেয়রের কাছে তোমার পরিচয়পত্র পেশ করতে হবে—তিনিই সবদিক থেকে তোমায় সাহায্য করবেন। আবারও ব'লে দিচ্ছি, স্ট্রক, সাবধান থেকো, বিচক্ষণ, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি ওখানে যাচ্ছো, ঘুণাক্ষরেও কারু কাছে সে-কথা প্রকাশ কোরো না—যদি একেবারে জরুরি হ'য়ে পড়ে, না-বললেই চলে না, তাহ'লে অবশ্য আলাদা কথা। তুমি-এর আগে বহুবার তোমার কূটকৌশল ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছো। আমি ঠিক জানি তুমি তোমার কাজে সফল হবেই।'

আমি তাঁকে শুধু একটাই কথা জিগেস করেছি, 'কবে আমাকে রওনা হ'তে হবে ?'

'কাল।'

'কাল, আমি ওয়াশিংটন থেকে বেরুবো, আর পরশুদিনই মরগ্যানটনে পৌঁছে যাবো।'

ভবিষ্যৎ যে আমার জন্যে কী-সব মৎলব এঁটে রেখেছিলো, তা যদি তখন আমি স্বপ্নেও টের পেতুম!

তক্ষুনি আমি বাড়ি ফিরে এসে যাবার জন্যে তোড়জোড় শুরু ক'রে দিয়েছিলুম। আর পরদিন সন্ধেবেলায় আমি নিজেকে আবিষ্কার করেছিলুম র‍্যলেতে। সেখানে সে-রাতটা কাটিয়ে পরের দিন বিকেলবেলায় আমি মরগ্যানটনের রেলস্টেশনে গিয়ে পৌঁছোলুম।

মরগ্যানটন শহরটা ছোটো, জুরাসিক যুগের ভূস্তরের উপর গ'ড়ে উঠেছে শহরটা—অজস্র কয়লা আছে এখানে। এর যত সমৃদ্ধির পেছনে আছে এর যত কয়লাখাদান। এখানে অবশ্য অনেকরকম ধাতুতে ভরা জলও আছে বিপুল পরিমাণে, তাই গ্রীষ্মকালে সেখানে বাইরে থেকে অজস্র লোক আসে স্বাস্থ্যোদ্ধারে। মরগ্যানটনকে ঘিরে আছে সুজলাসুফলা সব খেতখামার—প্রচুর ভুট্টা আর মকাই গজায় এখানে। জায়গাটা জলাভূমির মাঝখানে, শ্যাওলা আর খাগড়াবনও আছে অনেক। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে গেছে চিরহরিৎ গাছের অরণ্য। জায়গাটায় যা নেই তা হ'লো প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎস, যে-গ্যাস শক্তি জোগায়, আলো আর উত্তাপ দেয়, যার অফুরান উৎস আছে আলেঘেনি উপত্যকায়। একেবারে পাহাড়ের গায়ের বনজঙ্গলের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে কত-যে গ্রাম আর কত-যে খামার। কাজেই *গ্রেট আইরি* যদি সত্যি-সত্যি কোনো আধো-ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি হয়, যদি তার উপদ্রব পৌঁছে যায় প্লেজেন্ট গার্ডেন আর মরগ্যানটনে, তাহ'লে কত লোক যে বিপন্ন হবে, ধনে-প্রাণে মারা যাবে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

মরগ্যানটনের মেয়র, জনৈক মিস্টার এলিয়াস স্মিথ, মানুষটা দশাসই, কেবল যে লম্বাচওড়া তা-ই নয়, স্বাস্থ্যে আর প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, বয়েস হবে চল্লিশ বৎসর কি তার একটু বেশি, দেখে মনে হয় দুই আমেরিকার সমস্ত চিকিৎসকরাই তাঁদের ব্যাবসা মাঠে মারা যাবে ব'লে পাততাড়ি গুটিয়ে পালাবেন। মানুষটা আবার ওস্তাদ শিকারিও,

অনেক ভালুক আর প্যান্থার মেরেছেন, আলেঘেনি উপত্যকার গভীর বনে বা বন্য খাতে এখনও যে-সব জন্তুর মস্ত প্রাদুর্ভাব।

মিস্টার স্মিথ নিজেই একজন ধনাঢ্য জমিমালিক, আশপাশে তাঁর অনেকগুলো খেতখামার ছড়িয়ে আছে। এমনকী অনেক দূরে-দূরেও যে-সব রায়ৎ আছে, তাদেরও কাজ-কারবার তিনি বার-বার ঘুরে-ফিরে পর্যবেক্ষণ ক'রে দ্যাখেন। সত্যি-বলতে, সরকারি কাজে যখন তাঁর মরগ্যানটনের তথাকথিত প্রাসাদোপম অট্টালিকায় থাকতে হয় না, তখনই তিনি আশপাশের জমিজিরেতে ঘুরে বেড়ান, আর শিকারের উত্তেজনা তাঁকে টেনে-টেনে নিয়ে যায় বনেজঙ্গলে, নিবিড় অরণ্যদেশে।

মরগ্যানটন পৌঁছেই আমি সরাসরি মিস্টার স্মিথের বাড়ি চ'লে গেলুম। তিনি জানতেন যে আমি আসবো, টেলিগ্রাম ক'রে আগেই তাঁকে খবর পাঠানো হয়েছিলো, তাই তখন তিনি আমারই অপেক্ষায় ব'সে ছিলেন। দরাজভঙ্গিতেই আমায় আপ্যায়ন করলেন এলিয়াস স্মিথ, কোনো ভদ্রতার ভড়ং ছাড়াই, মুখে পাইপ, টেবিলের ওপর ব্র্যান্ডি ভরা গেলাশ। তক্ষুনি একটি ভৃত্য দ্বিতীয় আরেকটি গেলাশ নিয়ে এসে হাজির, আর আমাকে পরস্পরের স্বাস্থ্য কামনা ক'রে তক্ষুনি দু-ঢোক ব্র্যান্ডি খেতে হ'লো, তবেই আমি কথাবার্তা শুরু করতে পারলুম।

'মিস্টার ওয়ার্ড আপনাকে পাঠিয়েছেন,' সাদর আপ্যায়ন ক'রে আমাকে তিনি বললেন, 'আসুন, মিস্টার ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য পান করা যাক।'

তাঁর গেলাশের সঙ্গে আমার গেলাশ ঠোকাঠুকি ক'রে আমি পুলিশের বড়োকর্তার স্বাস্থ্য পান করলুম।

'তারপর?' এলিয়াস স্মিথ জানতে চাইলেন, 'এবার বলুন, তাঁর উদ্বেগের কারণ কী?'

আমি তখন মরগ্যানটনের মেয়রের কাছে খুলে বললুম কেন আমি হঠাৎ নর্থ ক্যারোলাইনায় এসে হাজির হয়েছি। আমি তাঁকে আশ্বস্ত ক'রে এও বললুম যে আমার বড়োকর্তা আমার হাতে পূর্ণ দায়িত্বই শুধু দেননি, *গ্রেট আইরির* নিদ্রাভঙ্গের দরুন এই অঞ্চলে যে-রহস্য আর উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে, তার সমাধান করবার জন্যে যা-যা লাগে সবরকম সাহায্য করতেও প্রস্তুত—আর্থিক বা অন্য-যে-কোনোরকম সাহায্যই তাঁর কাছ থেকে সবসময় পাওয়া যাবে।

টুঁ শব্দটি না-ক'রে এলিয়াস স্মিথ প্রথমে আমার সব কথা শুনলেন বটে, তবে মধ্যে-মধ্যে আমার আর তাঁর শূন্য গেলাশগুলি পূর্ণ ক'রে দিতে ভোলেননি। সারাক্ষণ এরই মধ্যে তাঁর পাইপ টেনে চলছিলেন তিনি; তাতে যদি মনে হয় তিনি আমার কথায় মনোযোগ দিচ্ছিলেন না তাহ'লে কিন্তু ভুল করা হবে—তাঁর বাইরের ভোলটা প্রতারক, আসলে তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গেই আমার প্রতিটি শব্দ শুনছিলেন। মাঝে-মাঝেই তাঁর গণ্ডদেশ আরক্ত হ'য়ে উঠছিলো, আর তাঁর ঝোপের মতো ভুরুর তলায় চোখ দুটি কেবলই ঝকঝক ক'রে উঠছিলো। স্পষ্টই বোঝা গেলো, মরগ্যানটনের চীফ ম্যাজিস্ট্রেটও

*গ্রেট আইরি*কে নিয়ে বিষম অস্বস্তিতে আছেন, কেন-যে পাহাড়ে এতসব অদ্ভুত ও রহস্যময় ঘটনা ঘটছে, তার মূল কারণটা খুঁজে বার করবার জন্যে তিনিও আমার মতোই আগ্রহী, শুধু আগ্রহী নয়, উৎসুকও।

আমার কাহন শেষ হ'য়ে যাবার পর এলিয়াস স্মিথ চুপ ক'রে ব'সে আমাকে খানিকক্ষণ শুধু নিরীক্ষণ করলেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'তাহ'লে ওয়াশিংটনে কর্তারা জানতে চাচ্ছেন *গ্রেট আইরি* তার পেটের মধ্যে কী জিনিশ লুকিয়ে রেখেছে?'

'ঠিক তাই, মিস্টার স্মিথ।'

'আর আপনিও ঠিক তা-ই জানতে চাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তা জানতে চাই, মিস্টার স্ট্রক।'

কৌতূহলে তিনি আর আমি দুজনেই সমান।

'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে,' পাইপ ঠুকে ছাই ঝাড়তে-ঝাড়তে তিনি বললেন, 'জমির মালিক হিশেবে *গ্রেট আইরির* ও-সব তাজ্জব ঘটনায় আমি কতটা উৎকণ্ঠিত হ'য়ে আছি। আর মেয়র হিশেবে আমার এলাকার লোকজনকে রক্ষা করার একটা দায়িত্বও আমার আছে।'

'পাহাড়ে যে কী অদ্ভুত রহস্য এসে ঘনিয়েছে, তার কারণ জানবার জন্যে আপনার ডবোল উৎকণ্ঠা থাকাই স্বাভাবিক।' আমি তাঁকে জানালুম, 'আপনার কাছে পুরো ব্যাপারটাই নিশ্চয়ই দুর্বোধ্য প্রহেলিকা ব'লে ঠেকেছে—তবে প্রহেলিকাটি নিশ্চয়ই নিরীহ কিছু নয়—আপনার এই এলাকার লোকজনের নিরাপত্তা তার সঙ্গে জড়ানো ব'লে এর মধ্যে ভয়াবহ বিপত্তিরও সম্ভাবনা আছে।'

'দুর্বোধ্য যে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, মিস্টার স্ট্রক। তবে আমার কথা যদি বলেন, আমি নিজে কিছুতেই বিশ্বাস করবো না যে *গ্রেট আইরি* কোনো আগ্নেয়গিরি। আলেঘেনিরা কোথাওই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্টি হয়নি। আমি নিজে আশপাশে কোথাও লাভা, গন্ধক বা বিস্ফোরক-চুরমার পাথর দেখতে পাইনি। সেইজন্যেই আমার মনে হয় না যে এ থেকে আচমকা মরগ্যানটনের কোনো বিপদ হ'তে পারে।'

'এ থেকে যে বিপদ হ'তে পারে, তা কি আপনার সত্যি কোনোদিন মনে হয়নি, মিস্টার স্মিথ?'

'কোনোদিনও না।'

'কিন্তু এই-যে লোকে বলছে চারপাশে মাটি কেঁপে উঠেছিলো?'

'হুঁ, মাটি কেঁপে উঠেছিলো! ভূমিকম্প!' এলিয়াস স্মিথ মাথা নেড়ে কথাগুলো আওড়ালেন একবার। 'কিন্তু এটা কি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে সত্যি-সত্যিই মাটি কেঁপে উঠেছিলো? শিখাগুলো তখন লকলক ক'রে আকাশ চাটছিলো, আমি তখন উইলডনে আমার খামারবাড়িতে ছিলুম—*গ্রেট আইরি* থেকে তার দূরত্ব এক মাইলেরও

কম। সত্যি-যে বাতাসে একটা তুমুল আলোড়ন, একটা তুমুল ঝাপটা উঠেছিলো, কিন্তু মাটি কেঁপে উঠছে ব'লে আমি একবারও টের পাইনি।'

'কিন্তু মিস্টার ওয়ার্ডের কাছে যে-সব প্রতিবেদন গেছে—'

'ও-সব প্রতিবেদন লোকে পাঠিয়েছে আতঙ্কের মুহূর্তে,' মরগ্যানটনের মেয়র আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'আমার প্রতিবেদনে তো আমি কোনো ভূকম্পনের কথা উল্লেখ করিনি।'

'আর, শিখরের ওপরে ঐ-যে দাউদাউ-জ্বলা শিখাগুলো?'

'হ্যাঁ, শিখাগুলো। সেগুলোর কথা আলাদা, মিস্টার স্ট্রক। আমি তাদের দেখেছি; আমি তাদের স্বচক্ষে দেখেছি, তাছাড়া মেঘের গায়ে প্রতিফলিত হ'য়ে তা অনেক মাইল দূর থেকেও দেখা যাচ্ছিলো। তাছাড়া *গ্রেট আইরি*-র পেট থেকেও গুমগুম আওয়াজ বেরুচ্ছিলো, না, গুমগুম নয়, হিস-হিস শব্দ, যেন একটা মস্ত বয়লার থেকে বাষ্প বেরিয়ে আসছে।'

'বিশ্বাসযোগ্য—নির্ভরযোগ্য কোনো সাক্ষী আছে এর?'

'হ্যাঁ, আমার নিজের কানে শোনা—'

'আর এই হিস-হিস আওয়াজের মধ্যে, মিস্টার স্মিথ, আপনার কি মনে হয় আপনি সবচেয়ে তাজ্জব জিনিশটা শুনেছিলেন—মস্ত সব পাখার ঝাপট?'

'আমার তা-ই মনে হয়েছিলো, মিস্টার স্ট্রক। কিন্তু সে-কোন অতিকায় পাখি সেটা —শিখাগুলো নিভে যাবার পর যে ওখান থেকে উড়ে গিয়েছিলো? সে-কোন পাখি সে, যার ডানার ঝাপট থেকে অমন প্রচণ্ড আওয়াজ বেরুতে পারে? সেইজন্যেই আমি নিজেকেও সন্দেহ করেছি—সে কি ছিলো আমারই কল্পনার কোনো বেঘোরবিভ্রম? *গ্রেট আইরি* আকাশের অজানা অপদেবতার আস্তানা! এ-যে নিছকই মতিভ্রম ছাড়া আর-কিছু নয়। যদি কোনো অতিকায় পাখি ঐ পাথরের মাঝখানে বাসা বেঁধে থাকে, তবে সে কি অনেক আগেই ওখান থেকে উড়ে যেতো না? সে কি ইতিহাসের অগোচর কোনো পাখি নয়? এটাই সবচেয়ে দুর্বোধ্য প্রহেলিকা, মিস্টার স্ট্রক। এর কোনো সদুত্তর আমার জানা নেই।'

'কিন্তু আমরা এই রহস্যের জট ছাড়াবো, মিস্টার স্মিথ, অবশ্য যদি আপনি আমাকে সাহায্য করেন।'

'নিশ্চয়ই, মিস্টার স্ট্রক। কাল থেকেই আমরা আমাদের অভিযান শুরু করবো।'

'তাহ'লে, কাল।' আর এই কথার পরেই মেয়রের কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়েছিলুম। সেখান থেকে সোজা আমি চ'লে গিয়েছি একটা হোটেলে, ঘর ভাড়া করার সময় বলেছি আমাকে যে কতদিন এখানে থাকতে হবে, তা আমি নিজেই জানি না। তারপর লাঞ্চের শেষে মিস্টার ওয়ার্ডকে সব লিখে জানালুম। বিকেলবেলায় আরো-একবার মিস্টার স্মিথের সঙ্গে দেখা করেছিলুম আমি। ঠিক হ'লো, দিন ফোটবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি তাঁকে নিয়ে মরগ্যানটন ছেড়ে বেরিয়ে পড়বো।

আমাদের প্রথম কাজ, পাহাড়ে ওঠবার ব্যবস্থা করা—ঠিক হ'লো সঙ্গে দুজন অভিজ্ঞ গাইড নেয়া হবে, যারা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। এই পর্বতারোহীরা মাউন্ট মিচেল ও ব্লুরিজ শৈলশ্রেণীর অন্যান্য শিখরে চড়েছে আগে, তবে কখনোই *গ্রেট আইরির* শিখরে ওঠবার চেষ্টা করেনি, কেননা কিংবদন্তি এই রকমই যে *গ্রেট আইরির* চারপাশেই আছে সটান-খাড়া অগম্য সব পাথুরে দেয়াল। তাছাড়া সাম্প্রতিক চমকপ্রদ ব্যাপারস্যাপারের আগে *গ্রেট আইরি* কখনোই পর্যটকদের তেমন-একটা আকৃষ্ট করেনি। মিস্টার স্মিথ ব্যক্তিগতভাবে গাইড দুজনকে চিনতেন, তারা দুঃসাহসী, দক্ষ আর নির্ভরযোগ্য। কোনো বাধাবিপত্তির কাছেই তারা মাথা নোয়াবে না—আর আমরা ঠিক করেছিলুম আমরা সবসময়েই সবকিছুতেই পদে-পদে তাদের অনুসরণ ক'রে চলবো।

তাছাড়া মিস্টার স্মিথ শেষটায় এ-কথা বলেছিলেন হয়তো *গ্রেট আইরি* এখন আর আগের মতো তেমন দুরারোহও নয়।

শুনে, আমি জিগেস করেছিলুম : 'কেন ?'

'কারণ সম্প্রতি মস্ত-এক পাথর শিখর থেকে ভেঙে নিচে খ'সে পড়েছে—আর তাইতে হয়তো ভেতরে যাবার মতো সুগম একটা পথ তৈরি হ'য়ে গেছে।'

'সে-হ'লে তো বলতেই হয় আমাদের কপাল ভালো।'

'কপাল ভালো কি মন্দ, তা আমরা কালকেই জানতে পারবো, মিস্টার স্ট্রক।'

'তাহ'লে, কাল।'

৩

গ্রেট আইরি : কোন্ ঈগলের বাসা

পরদিন ভোরবেলায়, এলিয়াস স্মিথ আর আমি মরগ্যানটন ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। রাস্তাটা গেছে কাতাওয়াবা নদীর বাম তীর ধ'রে এঁকেবেঁকে ঘুরে-ঘুরে, সোজা গিয়ে পৌঁছেছে প্লেজেন্ট গার্ডেনে। যে-দুজন গাইড আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো, তাদের একজন হ্যারি হর্ন, তিরিশ বছর বয়েস, অন্যজন জেমস ব্রাক, পঁচিশ বছর। তারা দুজনেই স্থানীয় লোক, আর যত পর্যটক এখানে আসে এবং ব্লু রিজ আর কাম্বারল্যাণ্ড পাহাড়ের ওপর উঠতে চায় তাদের কাছে এই দুজনের চাহিদা অসীম।

দুই-ঘোড়ায়-টানা একটা হালকা ওয়াগন জোগাড় করা হয়েছিলো, ব্লু রিজ শৈলশ্রেণীর একেবারে পাদদেশ অব্দি আমাদের নিয়ে যাবে ওয়াগনটা। তাতে তোলা হয়েছিলো দু-তিনদিনের উপযোগী রসদ—আশা ছিলো তার চেয়ে বেশি সময় আমাদের

পাহাড়ে-পাহাড়ে কাটাতে হবে না। মিস্টার স্মিথ তো প্রচুর পরিমাণে মদ্য-মাংস সরবরাহ করতে পেরে ভারি খুশি। জলের জন্যে তো কোনো ভাবনা নেই, পাহাড়ি ঝরনা থেকে যত চাই তত টলটলে টাটকা জল পাওয়া যাবে, এখানে বসন্তে এত বর্ষাবাদল হ'তে থাকে যে ঝরনার জল বছরের এই সময়টায় যেন উপচে পড়ে।

যদিও গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে বেরিয়েছেন, মরগ্যানটনের মেয়র কিন্তু কাজের সঙ্গে তাঁর খেয়ালখুশি জড়িয়ে ফেলতে ভোলেননি : শিকারি হিশেবে সঙ্গে এনেছেন তাঁর বন্দুক, আর শিকারি কুকুর নিস্কো, সে পরমোৎসাহে আমাদের ওয়াগনের পেছন-পেছন ছুটে আসছে—বাইরে বেরুতে পেরে তার খুশি আর ধরে না। নিস্কোকে অবশ্যি উইলডনের খামারবাড়িতে রেখে যাবার কথা—কারণ সেখান থেকেই আমরা পাহাড়ে চড়তে শুরু করবো। সে নিশ্চয়ই *গ্রেট আইরির* শিখর অব্দি আমাদের পেছন-পেছন যেতে পারবে না—একে তো ঢালটা খাড়া উঠে গেছে, তার ওপর মাঝে-মাঝে পড়বে মস্ত সব ফাটল।

দিনটা চমৎকার ফুটেছিলো, টাটকা হাওয়ায় তখন এপ্রিলের সকালের হালকা ঠাণ্ডা আমেজ। মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে হালকা শাদা মেঘের পাঁজা, দূর অ্যাটলান্টিক থেকে মস্ত উপত্যকা পেরিয়ে যে-হাওয়া আসছে তারাই এই হালকা শাদা মেঘকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সূর্য মাঝে-মাঝেই উঁকি মারছে মেঘের আড়াল থেকে, আলো ক'রে যাচ্ছে গ্রামগঞ্জের নতুন শ্যামলিমা।

যে-বনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি, তাতে যেন অফুরান জীবজন্তুর মেলা ব'সে গেছে। আমাদের ওয়াগনের চাকার শব্দ শুনে হুড়মুড় ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে কাঠবেড়ালি, মেঠোইঁদুর, ঝলমলে সব পালকে সাজানো প্যারাকীট—তাদের অবিশ্রাম ডাকাডাকিতে কানে যেন তালা ধ'রে যায়, লাফিয়ে-লাফিয়ে আমাদের পেরিয়ে গেলো ওপোসুমরা, থলের মধ্যে বাচ্চাগুলোকে সাবধানে আগলে রেখে। পিপুল, তাল, রডোডেনড্রনের গুচ্ছ—আর তাদের ঘন পাতার ফাঁকে-ফাঁকে কত ধরনের যে পাখি, তার আর ইয়ত্তা নেই, সবগুলো আমি আবার চিনিও না।

আমরা প্লেজেন্ট গার্ডেনে এসে পৌঁছুলুম সন্ধেবেলায়। সেখানে আমরা বেশ আরামে-গরমেই আশ্রয় পেলুম প্লেজেন্ট গার্ডেনের মেয়রের বাড়িতে, তিনি আবার মিস্টার স্মিথের বিশেষ বন্ধু। প্লেজেন্ট গার্ডেন নেহাৎ অজ পাড়াগাঁ, কিন্তু তার মেয়র তবু উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন আমাদের, বিশেষভাবে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন আমাদের। কতগুলো বিশাল বীচগাছের ছায়ায় তাঁর চমৎকার বাড়িটা—সেখানে বেশ পরিতোষভরেই রাজসিক আহারবিহার করা গেলো।

স্বভাবতই আলোচনাটা ফিরে-ফিরে এলো আমাদের এই অভিযানের উদ্দেশ্যটায় —আমরা যে *গ্রেট আইরির* ভেতরটায় গিয়ে তার পেটের কথা টেনে বার করতে চাচ্ছি, সব কথাবার্তা সেখানটাতেই আসতে লাগলো ঘুরে-ফিরে। 'আপনারা ঠিকই করেছেন,' বললেন আমাদের গৃহকর্তা, 'যতক্ষণ-না আমরা জানতে পারছি *গ্রেট আইরির*

পেটের মধ্যে কী আছে, ততক্ষণ এখানকার বাসিন্দারা ভয়ে-শঙ্কায় অস্থির হ'য়ে দিন কাটাবে।'

'*গ্রেট আইরির* ওপর সেই-যে দাউ-দাউ শিখা দেখা দিয়েছিলো,' আমি জিগেস করলুম, 'তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত নতুন-কিছু ঘটেনি কি?'

'কিছুই না, মিস্টার স্ট্রক। প্লেজেন্ট গার্ডেন থেকে আমরা পাহাড়ের পুরো শিখরটাই দেখতে পাই। কোনো সন্দেহজনক আওয়াজ ভেসে আসেনি সেখান থেকে। কোনো ফুলকি ওঠেনি আগুনের। যদি-বা একপাল শয়তান এসে ওখানে আস্তানা গেড়ে থাকে, তবে এতক্ষণে তারা নিশ্চয়ই তাদের নারকীয় রান্নাবান্না শেষ ক'রে ফেলেছে—তারপর ভুরিভোজ সেরে হয়তো অন্য-কোনো আস্তানায় চ'লে গিয়েছে।'

'শয়তান!' মিস্টার স্মিথ প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন। 'আশা করি তাদের কাজকর্মের কোনো নিশানা ফেলে না-রেখে তারা তাদের শিবির তোলেনি—দু-একটা পায়ের খুর, মাথার শিং কিংবা ল্যাজের ডগা নিশ্চয়ই ফেলে গেছে তারা। আমরা সে-সব খুঁজে বার করবো।'

পরদিন, উনত্রিশে এপ্রিল, আবার আমরা ভোরবেলাতেই রওনা হ'য়ে পড়লুম। দ্বিতীয় দিনের শেষে—আমরা আশা করেছিলুম—পাহাড়ের পায়ের কাছে উইলডনের খামারবাড়িটায় পৌঁছে যাবো। যে-তরাইটার মধ্য দিয়ে চলেছি, সেটা হুবহু গতকালকার মতোই, তবে ছোট্ট একটা তফাৎও আছে—পথ ক্রমশ ঘুরে-ঘুরে ওপরে উঠে গেছে। একান্তরভাবে পথে পড়ছে বনজঙ্গল অথবা জলাভূমি, যদিও জলাশয়গুলোর সংখ্যা ক্রমেই ক'মে আসছে; যত ওপরে উঠছি মনে হচ্ছে রোদ্দুর তাদের গণ্ডূষে-গণ্ডূষে শুষে ফেলেছে। এখানটায় লোকজনের বসতিও তেমন নেই। ছোট্ট-ছোট্ট কয়েকটা হ্যামলেট, বীচগাছের তলায় তারা যেন প্রায় হারিয়েই গেছে, মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে নিঃসঙ্গ একেকটা খামারবাড়ি, কত-যে ছোটো-ছোটো সোঁতা নেমে এসেছে জল নিয়ে, নিচে গিয়ে আছড়ে পড়ছে কাতাওয়াবা নদীর খাতে।

খুদে-খুদে সব পাখি আর ছোটো-ছোটো জানোয়ারের সংখ্যা অবশ্য আরো-অনেক বেড়ে গিয়েছে। 'বড্ড লোভ হচ্ছে, বন্দুকটা বার ক'রে নিয়ে নিস্কোর সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে যাই,' দু-একবার কথাটা পেড়েছেন মিস্টার স্মিথ, 'আমার জীবনে এইই প্রথম বার আমি এখানটা দিয়ে যাচ্ছি, অথচ কোনো তিতির বা খরগোশ মারছি না। বেচারা জীবজন্তুগুলো পরে হয়তো আমায় চিনতেই পারবে না। তবে আমাদের কাছে যে যথেষ্ট খাবারদাবার আছে তা-ই নয়, পরে আজ আমাদের বড়োকোনোকিছুকে তাড়া ক'রে যেতে হবে। তাড়া করতে হবে রহস্যকে।'

'আর, আশা করা যাক,' আমি ফোড়ন কেটেছি, 'আমাদের নিরাশ শিকারি হ'য়ে ফিরে আসতে হবে না।'

বিকেলবেলায় ব্লু-রিজ-এর পুরো মালাটাই, মাইল ছয়েক দূরে, আমাদের চোখের সামনে দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছড়িয়ে গেলো। স্বচ্ছনীল আকাশের পটে শিখরগুলো যেন

আরো-গাঢ় নীল রঙে স্পষ্ট ক'রে আঁকা, নিচের দিকে নিবিড় বনানী, যত ওপরে উঠেছে ততই রুক্ষ ফাঁকা পাথুরে ঢাল, শিখর অব্দি তারপর উঠে গেছে কেবল স্থগিতবৃদ্ধি বেঁটে-বেঁটে চিরহরিতের ঝোপ। শুটকো সিড়িঙে সব গাছ, কিম্ভূতভাবে তেড়েবেঁকে-যাওয়া, সেই পাথুরে শিখরকে কি-রকম যেন উদ্ভট আর বিমর্ষ বানিয়ে তুলেছে। এখানে-সেখানে শৈলশিরা উঠে গিয়েছে তীক্ষ্ণ চূড়ায়, আমাদের ডানদিকে আছে *কালো গম্বুজ*, ব্ল্যাক ডোম, প্রায় সাতহাজার ফিট ওপরে সে তার অতিকায় মাথা তুলেছে, মাঝে-মাঝে তার চূড়া মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে ঝকমক ক'রে উঠছে।

'আপনি কখনও ঐ গম্বুজটার ওপরে উঠেছেন, মিস্টার স্মিথ ?' আমি জিগেস করেছি।

'না,' উত্তর দিয়েছেন এলিয়াস স্মিথ, 'তবে শুনেছি যে ঐ চূড়ায় ওঠা নাকি দারুণ কঠিন ব্যাপার। কয়েকজন পর্বতারোহী অবশ্য চূড়াটায় উঠেছিলো, তারা জানিয়েছে সেখান থেকে *গ্রেট আইরির* পেটের মধ্যে নাকি কিছুতেই দেখা যায় না।'

'ঠিক বলেছে তারা,' বলেছে আমাদের গাইড হ্যারি হর্ন, 'আমি নিজেও দু-একবার চেষ্টা ক'রে দেখেছি।'

'হয়তো,' আমি সান্ত্বনা দিয়েছি, 'আবহাওয়া মেঘলা ছিলো।'

'মোটেই না, মিস্টার স্ট্রক, বরং আমি যেদিন উঠেছিলুম, সেদিন আবহাওয়া ছিলো চমৎকার—এত স্বচ্ছ সাধারণত থাকে না। কিন্তু *গ্রেট আইরির* দেয়াল এত খাড়াভাবে আকাশে উঠে গিয়েছে যে ভেতরটা সম্পূর্ণ লুকিয়ে রেখেছে।'

'সামনে, সামনে,' মিস্টার স্মিথ চেঁচিয়ে উঠেছেন, 'ফরওয়ার্ড। যেখানে কেউ আগে কখনও পা ফ্যালেনি, কিংবা চাক্ষুষ দ্যাখেনি যে-জায়গা, এমনকী দেবদূতেরাও না, সেখানে গিয়ে প্রথম পা ফেলতে আমার কোনো দুঃখই হবে না।'

সত্যিই, এমন-এক চমৎকার দিন ছিলো সেটা যে *গ্রেট আইরিকে* তখন দেখিয়েছে ধীরগম্ভীর, প্রশান্ত, তার দিকে তাকিয়ে আমরা কোনো শিখা বা কোনো ধোঁয়ার রেশও দেখতে পাইনি।

বেলা পাঁচটা নাগাদ আমাদের অভিযান এসে থেমেছে উইলডন খামারে, যেখানে *ভাড়াটেরা* সবাই বেরিয়ে এসে একযোগে অভ্যর্থনা জানিয়েছে তাদের ভূস্বামীকে। তারা আমাদের আশ্বাস দিয়ে চলেছে গত কয়েকদিনে *গ্রেট আইরিতে* কোনো অস্বাভাবিক ঘটনাই ঘটেনি। আমরা সবাই মিলে তারপর একটা মস্ত টেবিলে ভোজে বসেছি, খামারের সবাইও আমাদের সঙ্গে সেখানে খেতে বসেছে, আর সে-রাতে আমাদের ঘুম হয়েছে গভীর, নিরুপদ্রব, ভবিষ্যতের কোনো অলুক্ষুণে আশঙ্কাই ঘুমের মধ্যেটায় হানা দেয়নি।

পরেরদিন, আলো ফোটবার আগেই, আমরা পাহাড়ে ওঠবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছি। *গ্রেট আইরির* উচ্চতা পাঁচ হাজার ফিটও হবে কি না সন্দেহ। নেহাৎ নাতি-উচ্চ শিখর, আলেঘেনির এই অংশে এর চাইতে উঁচু শিখর আছে কতগুলো। আমরা যেহেতু তখন সমুদ্রতল থেকে তিনহাজার ফিট উঁচুতে ছিলুম, পাহাড়ে ওঠবার ক্লান্তি

তাই খুব একটা বেশি হবার কথা নয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিশ্চয়ই আমরা শিখরের ওপর জ্বালামুখের কাছে গিয়ে পৌঁছুতে পারবো। বাধাবিঘ্ন হয়তো থাকবে কিছু-কিছু, বেয়ে উঠতে হবে খাড়া ঢাল, শৈলশিরা, আর শৈলশ্রেণীর মধ্যেকার ফাটলগুলো হয়তো আমাদের বাধ্য করবে ক্লান্তিকর ও বিপজ্জনক ঘুরপথ দিয়ে যেতে। এই পাকদণ্ডী সম্পূর্ণ অজানা মানুষের, আমাদের প্রচেষ্টার পেছনে তাই একটা অদ্ভুত তাড়াও ছিলো— অজানাকে জয় ক'রে নেবার তাড়া। এখান থেকে যে-উৎরাই শুরু, সেখানটা আমাদের গাইডদেরও অচেনা। আমাকে যেটা উৎকণ্ঠিত করে তুলেছিলো, তা এই তথ্য : এর আগে সবাই বলেছে যে *গ্রেট আইরি* শুধু দুর্গম নয়, সম্পূর্ণ অগম্য। কিন্তু তা তো আর তর্কাতীতভাবে প্রমাণ হয়নি। তারপর আরেকটা নতুন উৎপাতের কথাও ভুললে চলবে না : কোনো নতুন ধস নেমে হয়তো পাথুরে ঢালটায় মস্ত-একটা ফাঁকা গহ্বর তৈরি ক'রে দিয়ে গেছে।

'অবশেষে,' দিনে গোটা-কুড়িবার পাইপে তামাক ভ'রে পাইপ টানেন মিস্টার স্মিথ, এবার তার প্রথমটা ফুঁকতে-ফুঁকতে তিনি আমায় বলেছেন, 'অবশেষে সত্যি অভিযান শুরু হ'লো আমাদের। উঠতে কত সময় লাগবে, অল্প, না বেশি—'

আমি বাধা দিয়ে বলেছি, 'অল্পই লাগুক, আর বেশিই লাগুক, আপনি আর আমি তো প্রতিজ্ঞাই করেছি যে এর শেষ না-দেখে ফিরবো না।'

'হ্যাঁ, সেটাই তো প্রতিজ্ঞা।'

'আমার বড়োকর্তা আমার কাঁধে দায় চাপিয়ে দিয়েছেন—যে-ক'রেই হোক, *গ্রেট আইরির* দানবের সমস্ত রহস্য আমায় ভেদ করতে হবে।'

'দানবের কাছ থেকে গুপ্ত রহস্য আমরা ছিনিয়ে নিয়ে আসবো, তা সে তা পছন্দ করুক, চাই না-করুক।' অন্তরীক্ষকে সাক্ষী রেখে শপথ করেছেন মিস্টার স্মিথ, 'তাতে যদি পাহাড়ের আঁতের মধ্যে গিয়েও খোঁজাখুঁজি করতে হয়, তাও সই।'

'তার একটা সম্ভাবনা এই হ'তে পারে যে,' আমি বলেছি, 'আমাদের অভিযান হয়তো আজকের দিনটাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। সেইজন্যে লটবহর ও রসদের দিকে একবার নজর বুলিয়ে নেয়া ভালো।'

'আশ্বস্ত হোন, মিস্টার স্ট্রক। আমাদের গাইডদের ন্যাপস্যাকে দু-দিনের উপযোগী খাবারদাবার আছে। তাছাড়া আমরাও তো কিছু খাদ্য বহন ক'রে চলেছি। যদিও আমার বেপরোয়া নিস্কোকে আমি খামারে রেখে এসেছি, তবু সঙ্গে বন্দুকটা আনতে আমি ভুলিনি। বনের মধ্যে কিংবা নয়ানজুলিগুলোয় বিস্তর শিকার মিলবে—আর শিখরে উঠে আমরা হয়তো একটা অগ্নিকুণ্ড দেখতে পাবো, যেখানে দিব্বি ঝলসানো যাবে মাংস, রসুই পাকাতে আমাদের কোনোই ঝামেলা হবে না।'

'অগ্নিকুণ্ড দেখতে পাবেন, মিস্টার স্মিথ?'

'কেন নয়, মিস্টার স্ট্রক? ঐ শিখাগুলো! ঐ চমৎকার লকলকে লেলিহান শিখাগুলো! যা দেখে গাঁ-গঞ্জের লোক ভয়েই আধমরা হ'য়ে গেছে! সেই আগুন কি

বরফহিম নাকি ? তাদের ছাইয়ের তলায় কোনোই ফুলকি পাওয়া যাবে না বুঝি ? আর, তারপর ধরুন, এটা যদি সত্যি কোনো জ্বালামুখ হয়, আগ্নেয়গিরি কি তবে একেবারেই নিভে গেছে যে জ্বলন্ত একটা অঙ্গারও পাওয়া যাবে না? বাহ্, তাহ'লে এ আবার কেমনতর আগ্নেয়গিরি—যে একটা ডিম ভাজা যাবে না বা আলু ঝলসে নেয়া যাবে না ? চলুন, চলুন, দেখাই যাক কী আছে ঐ পেটে—ঐ পাথরের জঠরে !'

তদন্তের এখানটায় এসেও, প্রথমেই কবুল ক'রে নেয়া ভালো, আমি কোনো তত্ত্বই খাড়া করিনি। আমার ওপর হুকুম হয়েছে *গ্রেট আইরিকে* সরেজমিন খুঁটিয়ে দেখে আসতে হবে । যদি মনে হয় যে সে একেবারেই নিরীহ, নিরুপদ্রব, কোনো উৎপাতেরই আশঙ্কা নেই, তবে তা ঘোষণা ক'রে দেয়াই হবে আমার কাজ, কেননা তাহ'লে এখানকার লোকজন আশ্বস্ত হ'তে পারবে, নিশ্চিন্ত হ'তে পারবে। তবে, এও কবুল করা ভালো, আমার মধ্যে বিষম কৌতূহল হানা দিয়েছিলো। আমার বরং ভালোই লাগবে, নিজের জন্যেও বটে, আমার অভিযানের জন্যেও বটে, যদি *গ্রেট আইরির* এই চমকপ্রদ কাণ্ডকীর্তির আসল কারণটা আমি বার করতে পারি।

আমাদের পর্বতারোহণ শুরু হ'লো এইভাবে : গাইড দুজন যাবে আগে-আগে, খুঁজে দেখবে কোন পথ ধ'রে এগুলে, বা উঠলে, সুবিধে হবে। এলিয়াস স্মিথ আর আমি এগুবো অপেক্ষাকৃত গদাইলস্করি চালে। একটা সংকীর্ণ গিরিসংকট বেয়ে পাথর আর গাছপালার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছি গোড়ায়, খুদে একটা স্রোতস্বিনী সুতোর মতো ঝ'রে পড়েছে আমার পায়ের তলায়। বর্ষাকালে, কিংবা কখনও কোনো মুষলধারে বর্ষণের পরে, এর জল নিশ্চয়ই পাথর থেকে পাথরে ঝমঝম ক'রে আছড়ে প'ড়ে নামে। তবে এর খাতকে নিশ্চয়ই বৃষ্টিই জল খাওয়ায়, কারণ এখন তার ধারাটা সুতোর মতো ব'য়ে চলেছে। *গ্রেট আইরির* ভেতরকার কোনো মস্ত হ্রদের জল বেরুবার রাস্তা নিশ্চয়ই এটা নয়।

এক ঘণ্টা ধ'রে ওঠবার পর, পাহাড়ের ঢাল এতটাই খাড়া হ'য়ে পড়েছিলো যে আমাদের বেঁকে-বেঁকে যেতে হয়েছে, কখনও ডানদিকে, কখনও বামদিকে, আর আমাদের গতিও খুব মন্থর হ'য়ে এসেছে । একটু পরেই এই সংকীর্ণ গিরিসংকটটি পুরোপুরি অসাধ্য হ'য়ে উঠলো; এর পাহাড়ি খাড়া ঢালে পা রাখবার মতো কোনো খাঁজ নেই। আমাদের হয় গাছের ডাল থেকে ঝুলে, নয়তো বুকে হেঁটে হামাগুড়ি গিয়ে এগুতে হয়েছে। এই গতিতে এগুলে সূর্যাস্তের আগে কিছুতেই শিখরে পৌঁছুনো যাবে না।

'আস্থা, আস্থায় বুক বাঁধুন !' হাঁফ ছাড়বার জন্যে একঝলক থেমে মিস্টার স্মিথ বলেছেন। 'এতক্ষণে বুঝতে পারছি কেন দু-একজন ছাড়া কেউই *গ্রেট আইরির* ওপরে উঠতে চায়নি—আর তাই আমার অন্তত জ্ঞানত মনে পড়ে না কেউ কখনও এর ওপর উঠেছে কি না।'

'আসলে,' আমি সায় দিয়ে বলেছি, 'এত পরিশ্রম ক'রে লাভটাই বা কী হ'তো, বলুন। আমাদের যদি ওপরে ওঠবার জন্যে বিশেষ-কোনো তাগিদ না-থাকতো—'

'এর চেয়ে সত্যকথা জীবনে আপনি আর-কিছু বলেননি,' হ্যারি হর্ন ঘোষণা করেছে, আমাকে থামিয়ে দিয়ে, 'আমি আমার বন্ধুদের নিয়ে কতবারই তো *ব্ল্যাক ডোমের* ওপরে উঠেছি, কিন্তু পথে কোনোবারই এত বাধাবিপত্তির মুখে পড়তে হয়নি।'

'বাধাবিঘ্নই শুধু নয়, এদের অতিক্রম করাও দুঃসাধ্য,' জুড়ে দিয়েছে জেমস ব্রাক।

এখন যে-প্রশ্নটা কুট ক'রে আমাদের মগজে কামড়াচ্ছে তা এই : কোন নতুন পথ ধ'রে এগুবো আমরা, বুঝবো কী ক'রে সেই পথেই ওপরে ওঠা যাবে। বাঁয়ে যাবো, না কি ডানদিকে যাবো ? দু-দিকেই উঠেছে গাছপালা ঝোপঝাড়ের দুর্ভেদ্য ঘন বুনোট। সত্যি-বলতে, এর চেয়ে সরাসরি শিখরে উঠে-যাওয়াও সহজ হ'তো। একবার যদি এই নিবিড় বনানী ভেদ ক'রে ওপাশে চ'লে যেতে পারি তবে হয়তো নিশ্চিততর পদক্ষেপে আমরা অগ্রসর হ'ত পারবো। এখন তো আমরা কেবল এগুতে পারি অন্ধের মতো, হাৎড়ে-হাৎড়ে ; অন্ধের মতোই আমাদের এই দুজন গাইডের স্বজ্ঞা ও সহজাত বোধের ওপর নির্ভর করতে হবে এখন। জেমস ব্রাকের বোধবুদ্ধিই বেশি কাজে এসেছে তখন, আমার বিশ্বাস, এই দুঃসাহসী তরুণটি হালকা চলাফেরায় বাঁদরদেরও হার মানাতো, আর ক্ষিপ্রতায় ছাগলছানারাও তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতো না। দুর্ভাগ্যবশত, না এলিয়াস স্মিথ, না আমি শ্রীযুক্ত স্ট্রক, তার সঙ্গে তাল রেখে উঠতে পারি, সে যেখানে উঠতে পারে আমাদের পক্ষে সেখানে পা দেয়া প্রায় অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে।

তবে যখন সত্যিই কোনোকিছু করা একান্ত জরুরি হ'য়ে পড়ে, আমি অবশ্য সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নই—কারু থেকেই পেছিয়ে থাকতে আমার ইচ্ছে করে না ; ধাতের মধ্যেই একগুঁয়েমি আর জেদ আছে আমার, আর আমার জীবিকাটাই এমন যে শরীরটাকে সবসময় সামলেসুমলে সক্ষম রাখতে হয়, জেমস ব্রাক যেখানে যেতে পারে, আমিও সেখানে যেতে পারবো—এতে যদি কয়েকবার বিষম আছাড় খেয়ে পড়তে হয়, তাতেও কুছ পরোয়া নেই। তবে মরগ্যানটনের চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে ব্যাপারটা তেমন সহজ ছিলো না; একে তো তিনি আর মোটেই তরুণ নন, তেমন চটপটে বা ক্ষিপ্রও নন আর, দশাসই শরীর, ভারি, আর একটু ধকলেই কাবু হ'য়ে পড়েন। যথাসাধ্য করেছেন এলিয়াস স্মিথ, যাতে আমাদের অগ্রগতিতে কোনো বাধা না-পড়ে, কিন্তু সারাক্ষণ ডাঙার ওপর সীল মাছের মতো খাবি খেয়েছেন তিনি—শেষে, একটু পরেই, আমাকে জোর দিয়ে বলতে হয়েছে বিশ্রাম নেবার জন্যে আমাদের একটু থামা উচিত।

অর্থাৎ, বোঝাই যাচ্ছিলো যে আমরা যতটা আন্দাজ করেছিলুম, তার চেয়েও অনেক বেশি সময় লেগে যাবে *গ্রেট আইরির* ঈগলের বাসায় উঠতে হ'লে। আমরা ভেবে রেখেছিলুম এগারোটার মধ্যেই আমরা পাথুরে দেয়ালটার পায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছে যাবো, কিন্তু এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি মধ্যদিনের সূর্যও আমাদের তার থেকে কয়েকশো ফিট নিচে দেখতে পাবে।

দশটা নাগাদ, যখন বার-বার অপেক্ষাকৃত সহজ কোনো রাস্তা খোঁজবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে আমরা হন্যে হ'য়ে উঠেছি, কতবার মোড় ঘুরেছি, কতবার পাকদণ্ডী আমাদের

ফিরিয়ে এনেছে একই জায়গায়, তখন গাইডদের একজন সংকেত ক'রে আমাদের থামতে বললে। অবশেষে আমরা নিজেদের আবিষ্কার করলুম ঐ নিবিড় বনের ওপরকার স্তরে। গাছগুলো এবার আর তেমন গায়ে-পড়া নয়, গায়ে-গায়ে জড়িয়ে নেই ঘননিবিড়, ফলে তাদের ফাঁক দিয়ে আমরা দেখতে পেলুম সেই পাথুরে দেয়ালের তলদেশ যেখান থেকে ওপরে উঠে গিয়েছে সত্যিকার *গ্রেট আইরি*।

'উঃফ্ !' একটা মস্ত পাইনগাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মিস্টার স্মিথ হাঁফ ছাড়লেন। 'একটু জিরিয়ে নেয়া যাক। সেই সঙ্গে একটু নাশ্‌তা হ'লে দারুন জ'মে যাবে।'

আমি বললাম, 'এখানে আমরা এক ঘণ্টা জিরিয়ে নেবো।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ ; ফুশফুশ আর পাগুলোকে এতক্ষণ ধ'রে খাটিয়ে নেবার পর আমাদের জঠরগুলোকেও এবার একটু খাটানো যাক।'

এই একটা ব্যাপারে কারুরই কোনো আপত্তি আছে ব'লে মনে হ'লো না। একটু বিশ্রাম সবাইকেই আবার চাঙা ক'রে তুলবে। আমাদের অস্বস্তির শুধু একটাই কারণ: পাহাড়ের ঢালটা দেখে মোটেই মনোরম ব'লে মনে হচ্ছেন না। যে-জায়গাগুলোয় কোনো গাছপালা গজায় না স্থানীয় লোকেরা তাকে বলে *সরসরি*—মসৃণপিছল ঢাল। মাটিও সেখানে একটু আলগা, মাঝে-মাঝে চোখা-চোখা পাথর বেরিয়ে আছে, আর হঠাৎ-তেড়েফুঁড়ে-বেরুনো পাথরের মধ্যে কোনো রাস্তাই নেই।

হ্যারি হর্ন তার সহকর্মীকে বললে, 'কাজটা খুব সহজ হবে না।'

'অসম্ভবই হবে, হয়তো,' ব্রাক সায় দিয়ে বললে।

তাদের এই মন্তব্য আমার গোপন অস্বস্তিটাকে আরো চাগিয়ে দিলে। পাহাড়ের চূড়ায় না-উঠেই যদি আমাকে ফিরে যেতে হয়, আমার অভিযান তাহ'লে সমূহ ব্যর্থ হবে—আর কৌতূহল চরিতার্থ করতে না-পারার দরুন কী-যে কষ্ট পাবো, তা শুধু ঈশ্বরই জানেন। আর তারপর যখন মিস্টার ওয়ার্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো, পরাস্ত ও লজ্জিত, আমাকে দেখে তখন রাস্তার অচেনা লোকেরও সহানুভূতি উথলে উঠবে।

ন্যাপস্যাকগুলো খুলে আমরা রুটি আর ঠাণ্ডা মাংস দিয়েই মোটামুটিভাবে ভোজ সারলুম। খাওয়া শেষ হ'তেই, আধঘণ্টার মধ্যেই, মিস্টার স্মিথ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, সতেজ ও উৎসুক, আবারও এগিয়ে-যাওয়া যাক। জেমস ব্রাক চললো সকলের আগে-আগে; আমরা শুধু যতটা ভালোভাবে পারি তাকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করলুম।

আমাদের চলা হ'লো ধীরমন্থর। আমাদের গাইডরা তাদের দ্বিধা ও সন্দেহ চাপবার কোনো চেষ্টাই করছে না। একটু পরেই হ্যারি হর্ন আমাদের ছেড়ে একাই এগিয়ে গেলো—কোন রাস্তায় গেলে সবচেয়ে সুবিধে হবে, সেটাই আন্দাজ ক'রে নিতে।

কুড়ি মিনিট পরেই সে ফিরে এলো, আমাদের নিয়ে চললো উত্তরপশ্চিমে। এই দিকটাতেই তিন-চার মাইল দূরে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে *ব্ল্যাক ডোম*। আমাদের পথ এখনও কঠিন, কষ্টকর, আলগা পাথরের ওপর দিয়ে গেছে পথ, কখনও পাথরগুলো

আটকে আছে নেহাৎই বরাৎজোরে, কোনো ঝোপের গায়ে। অবশেষে, বিস্তর ধকলের পর, একেবারে নাজেহাল, আমরা আরো দুশো ফিট ওপরে উঠতে পারলুম, তারপরেই দেখলুম কাটা ঘায়ের মতো মস্ত হা ক'রে আছে একটা গহ্বর, সেখান থেকে কবে যেন মাটি ধ'সে পড়েছে নিচে। এখানে-সেখানে দেখা গেলো সদ্য-উৎপাটিত গাছের শেকড়, ভাঙা-ভাঙা ডালপালা, গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে-যাওয়া মস্ত-সব পাথরের চাঁই, যেন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সদ্য-সদ্য একটা ধস নেমে গিয়েছে, *আভালাঁশ*।

'এটাই নিশ্চয়ই *গ্রেট আইরির* ওপর থেকে মস্ত পাথরটা ধ'সে পড়বার চিহ্ন,' মন্তব্য করলে জেমস ব্রাক।

'নিশ্চয়ই তাই,' মিস্টার স্মিথ সব দেখেশুনে সায় দিলেন, 'আমার মনে হয় আমরা বরং আমাদের জন্যে তৈরি-করা এই পথটা দিয়ে এগুলেই ভালো করবো।'

এই পাহাড়চেরা গহ্বরের পাশটাকেই হ্যারি হর্ন পাহাড়ে চড়ার জন্যে বেছে নিয়েছে। রাক্ষুসে পাথরটা গড়িয়ে পড়বার সময় দেয়ালের যে-অংশটা ভেঙে না-প'ড়ে ঠেকিয়েছিলো, সেখানকার শক্ত জমির ওপরই আমাদের পা নির্ভর করতে পারলে। আমাদের পথচলা তাই অপেক্ষাকৃত সহজ হ'য়ে উঠলো এখানে, এখন আমরা প্রায় একটা সরল রেখার মতোই সোজা ওপরে উঠছি, আর তার ফলেই, সাড়ে-এগারোটা নাগাদ আমরা ঐ সরসরি-র ওপরকার সীমারেখায় গিয়ে পৌঁছুলুম।

আমাদের সামনে, একশো ফিটও দূরে হবে কি না সন্দেহ, কিন্তু মিনারের মতো সোজা খাড়া হ'য়ে ওপরে, শূন্যে উঠে গেছে একশো ফিট, দাঁড়িয়ে আছে সেই শিলাময় দেয়াল, যেটা এর আসল শিখর, *গ্রেট আইরির* শেষ প্রতিরোধব্যবস্থা।

এদিক থেকে চূড়ার দেয়ালকে দেখাচ্ছিলো উদ্ভট-খামখয়ালিতে-ভরা বন্ধুর পাথরের মতো, কখনও উগ্র রুক্ষ গম্বুজের মতো উঠেছে ওপরে, কখনও-বা উবড়োখাবড়ো দেখালো ঠিক যেন এক অতিকায় ঈগল আকাশের পটে ছায়ার মতো আঁকা, উড়াল দেবার জন্যে দু-দিক ছড়ানো তার দুই ডানা। এদিক থেকে, অন্তত, সেই চূড়ায় ওঠা অসম্ভব।

'এক মিনিট সবুর করুন,' বললেন, মিস্টার স্মিথ, 'আমাদের এবার খতিয়ে দেখতে হবে এই পাথরটার বুনিয়াদটার পাশ দিয়ে ওদিকে গিয়ে ওঠা যায় কি না।'

'এটা মনে হয়,' হ্যারি হর্ন জানালে, '*ঐ* মস্ত ধসটা নিশ্চয়ই চূড়ার এদিকটা থেকেই গড়িয়ে নেমে এসেছিলো—অথচ ভেতরে ঢোকবার মতো কোনো রাস্তা সে রেখে যায়নি।'

তাঁদের দুজনের পর্যবেক্ষণই নির্ভুল। অন্য-কোথাও গিয়ে আমাদের ওঠবার পথ খুঁজে বার ক'রে নিতে হবে। দশ মিনিট জিরিয়ে নেবার পর, আমরা কোনোরকমে পায়ে-পায়ে দেয়ালটার ঠিক পাদদেশে গিয়ে দাঁড়ালুম, তারপর তাকে ঘিরে চক্কর দেবার মতো ঘুরতে লাগলুম—যদি কোনো পথ পাওয়া যায়।

বলতে-কি, *গ্রেট আইরি* ততক্ষণে আমার চোখে রীতিমতো আশ্চর্য ব'লে ঠেকছে

—আশ্চর্য আর অবিশ্বাস্য। তার শিখরে যেন আছে যত ড্রাগন, রাক্ষুসে জীব, অতিকায় দানব। যেন কোনো অনল-ওগরানো দানব, পুরাণ থেকে উঠে এসেছে, মাথাটা সিংহের, ল্যাজটা মহানাগের, আর শরীরটা ছাগলের; যেন কোনো গ্রিফিন, যার মাথাটা ঈগলের, পাখাগুলো ঈগলের, কিন্তু শরীরটা সিংহের; পুরাণের যত অলৌকিক জীব এসে যদি তাকে পাহারা দিতো, তাহ'লেও হয়তো আমি অবাক হতুম না।

অত্যন্ত সাবধানে, বিপদ মাথায় ক'রে, আমরা পাথরটার বেড় ঘিরে ঘুরতে লাগলুম। মনে হচ্ছে প্রকৃতি যেন মানুষেরই মতো মিস্ত্রির কাজ ক'রে গেছে এখানে, যেন খুব সচেতন সুঠাম *নীলনকশামাফিক* কাজ করেছে প্রকৃতি। এই দুর্গের দেয়ালের মতো পাথরে কোথাও একটা খাঁজ নেই; পাথরের আস্তরে একটা আঁচড় পর্যন্ত পড়েনি, যেখানে পা রেখে কেউ বেয়ে উঠতে পারে ওপরে। সবখানেই শুধু এই পাথুরে দেয়াল, এই ঢাল, সবখানেই সে একশো ফিট উঁচু!

দেড়ঘণ্টা-জোড়া এই কঠিন পরিশ্রম ও চংক্রমণের পর, আমরা আবার ফিরে এলুম সেখানেই, যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলুম। আমি আর আমার হতাশা চেপে রাখতে পারিনি, আর মিস্টার স্মিথও আমার চেয়ে কম বিচলিত হ'য়ে পড়েননি।

'হাজার শয়তানের বাসা!' খেঁকিয়ে উঠলেন মিস্টার স্মিথ, 'এই হতচ্ছাড়া *গ্রেট আইরিটার* ভেতরে যে কী আছে, তা-ই আমরা এখনও বুঝে উঠতে পারলাম না—যে-তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই র'য়ে গেলাম। এটা কোনো আগ্নেগিরির জ্বালামুখ কি না, তা শুদ্ধু জানি না।'

'আগুনের পাহাড় হোক বা না-হোক,' আমি বললুম, 'এখন কিন্তু কোনো সন্দেহজনক শব্দ শোনা যাচ্ছে না; ধোঁয়া কিংবা শিখাও নেই চূড়ার ওপর; এমনকিছু চোখে পড়েনি যা দেখে মনে হয় অগ্ন্যুদগারের কোনো সম্ভাবনা আছে।'

মিথ্যে বলিনি কথাটা। গভীর-এক স্তব্ধতা বিরাজ করছে আমাদের ঘিরে; মাথার ওপর ঝলসাচ্ছে নিখুঁত-স্বচ্ছ নীল আকাশ। সমুদ্রতল থেকে অনেক উপরে উঠে এলে যে গভীর-গম্ভীর প্রশান্তি অনুভব করা যায়, আমরা এখন তাকেই চাখছিলুম।

এখানে ব'লে রাখা ভালো ঐ বিশাল পাথরটার বেড় ছিলো বারোশো থেকে পনেরোশো ফিট। ভেতরে যে-জায়গাটা সে সুরক্ষিত রেখেছে, সে-যে কী হ'তে পারে, দেয়ালের প্রস্থ না-জেনে, দেয়ালটা কতটা পুরু না-জেনে, সে-সম্বন্ধে কিছুই আন্দাজ করা যাচ্ছিলো না। পুরো জায়গাটাই যেন ফাঁকা, পরিত্যক্ত, প্রাণহীন। হয়তো কোনোদিনই কোনো জ্যান্তপ্রাণী এত উঁচুতে ওঠেনি—বড়ো-বড়ো শিকারি পাখিরা চূড়ার ওপরেই আকাশে উড়াল দিয়েছে যেন চিরকাল।

আমাদের ঘড়িতে তখন ঘণ্টার কাঁটা তিনটের ঘরে। মিস্টার স্মিথ প্রায় বিরক্ত হ'য়েই ব'লে উঠলেন, 'সারাদিন ধ'রে এখানে ব'সে থেকে আর কী লাভ? আর কিছুই আমরা এখানে ব'সে থেকে জানতে পারবো না। যদি আজ রাত্তিরেই প্লেজেন্ট গার্ডেনে ফিরে যেতে হয়, মিস্টার স্ট্রক, আমাদের তবে এক্ষুনি রওনা হ'য়ে পড়তে হবে।'

আমি এ-কথার কোনো উত্তর দিইনি। যেখানে ব'সে ছিলুম, সেখান থেকেও নড়িনি। কাজেই মিস্টার স্মিথ ফের একটু অধীরভাবেই বললেন, 'আরে, আসুন, মিস্টার স্ট্রক, কিছু-একটা তো বলবেন!'

সত্যি-বলতে, বিফল হ'য়ে, মাঝপথেই অভিযানটায় ইস্তফা দিতে আমার নিদারুণ গাত্মজ্বালা করছিলো: আরব্ধ কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই আবার ঐ হতচ্ছাড়া পথ ধ'রে নিচে নেমে যাবো! ভেতরে-ভেতরে নাছোড় একটা তাগিদ অনুভব করছিলুম—কিছুতেই হঠবো না, লেগেই থাকবো; আমার কৌতূহল এখন দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু কীই বা এখন আর করতে পারি? এই নিঃসাড় নির্বোধ দেয়ালটাকে দু-হাত দিয়ে টেনে ফেঁড়ে দেবো? লাফিয়ে উঠবো অতিকায় শিখরটায়? *গ্রেট আইরির* দিকে শেষবারের মতো রুষ্টভাবে তাকিয়ে আমি আমার সাথীদের অনুসরণ করলাম।

ফেরার পথে কিন্তু বিশেষ-কোনো বেগ পেতে হয়নি। এবার শুধু সরসর ক'রে নেমে আসা, আগে যেখানে এত কষ্ট ক'রে বেয়ে-বেয়ে উঠেছিলুম। পাঁচটার আগেই আমরা পাহাড়ের শেষ ঢাল বেয়ে নেমে আসতে পেরেছি। আর উইলডন খামারের গোমস্তা আমাদের অভ্যর্থনা করেছে সাগ্রহ ভূরিভোজে।

জিগেস করেছে: 'তাহ'লে আপনারা ভেতরে যাননি?'

'না,' উত্তরে জানিয়েছেন মিস্টার স্মিথ, 'তবে আমার মনে হয় ঐ ভেতরটা আছে কেবল এখানকার গাঁয়ের লোকের কুসংস্কারেভরা কল্পনায়।'

সাড়ে-আটটার সময় আমাদের ঘোড়ায়-টানা গাড়ি এসে থেমেছে প্লেজেন্ট গার্ডেনের মেয়রের বাড়ির সামনে—সেখানেই আমরা রাতটা কাটিয়েছি তারপর। ঘুমিয়ে পড়বার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করতে-করতে আমি বারে-বারে নিজেকে জিগেস করেছি আমার পক্ষে কী করা উচিত হবে—থেকে যাবো এই গ্রামে, আবার নতুন দলবল নিয়ে পাহাড়ে ওঠবার আরেকটা চেষ্টা ক'রে দেখবো? কিন্তু প্রথম বারের বদলে এই দ্বিতীয় চেষ্টাটাই যে সফল হবে, তার কি কোনো পার্থিব কারণ আছে? নিশ্চয়ই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে সরাসরি ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে মিস্টার ওয়ার্ডের মুখোমুখি ব'সে পুরো ব্যাপারটাকে কাঁটা-চেরা ক'রে বিশ্লেষণ ক'রে দেখা।

কাজেই, পরদিন, আমাদের গাইড দুজনকে বখশিশ দিয়ে, আমি মরগ্যানটনের মিস্টার স্মিথের কাছে থেকে বিদায় নিয়েছি, আর সেইদিনই সন্ধেবেলার ট্রেনে ক'রে রওনা হ'য়ে পড়েছি ওয়াশিংটনের উদ্দেশে।

৪

স্বতশ্চল সংঘের অধিবেশন

তবে কি *গ্রেট আইরির* এই রহস্যের সমাধান হবে একদিন, দৈবাৎ, এমনই আচমকা যে আমরা যা কল্পনাও করতে পারছি না? কিন্তু তা তো ভবিষ্যৎই জানে। তবে এটাও জরুরি প্রশ্ন : সমাধানটা কি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ? তাতে অবশ্যি কোনো সন্দেহ নেই, যেহেতু তার সঙ্গে এত লোকের জীবনমরণের প্রশ্ন জড়ানো আছে—পশ্চিম ক্যারোলাইনার মানুষজনের নিরাপত্তার প্রশ্নটা তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত।

অথচ তবু ওয়াশিংটনে ফিরে-আসবার পনেরোদিন পরেই লোকের কৌতূহল এই সমস্যাটাকে ঠেলে সরিয়ে রেখে অন্য-একটা, একেবারেই অন্যরকম একটা, সমস্যায় চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হ'য়ে গেলো—আর এই নতুন রহস্যটাও কম চমকপ্রদ নয়।

মে মাসের মাঝামাঝি পেনসিলভ্যানিয়ার খবরকাগজগুলো জানালে যে পেনসিল-ভ্যানিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে নাকি এমন-সব ঘটনা ঘ'টে চলেছে, বুদ্ধিতে যার কোনো ব্যাখ্যা চলে না। রাজধানী ফিলাডেলফিয়া থেকে যে-সব রাস্তা অন্যান্য অঞ্চলের দিকে গেছে, সে-সব রাস্তায় না কি আশ্চর্য একটা শকট দেখা যাচ্ছে, কেউই স্পষ্ট ক'রে যার চেহারাটার বর্ণনা দিতে পারছে না—তার আকৃতি, প্রকৃতি, এমনকী শকটের মাপটা পর্যন্ত কারু জানা নেই, এতই দ্রুতবেগে সেটা পাশ দিয়ে ঝড়ের মতো চ'লে যায়। এটা যে একটা স্বতশ্চল শকট, *অটোমোবাইল*,—এ-বিষয়ে সকলেই একমত । কিন্তু সে-যে *কোন* মোটর তাকে চালিয়ে নিয়ে যায়, তা কেবল কল্পনাই জানে; আর যখন জনতার কল্পনা তেতে ওঠে, উসকে ওঠে, তখন জল্পনার কি আর-কোনো সীমা থাকে?

সবচেয়ে উন্নত স্বতশ্চল শকটগুলোও তখন—যাতেই তারা চলুক না কেন, বাষ্পে, গ্যাসোলিনে, বিদ্যুতে—ঘণ্টায় ষাট মাইলের বেশি বেগে যেতে পারতো না—এই গতিও ইওরোপ-আমেরিকার সেরা-সব রেলপথে, সবচেয়ে দ্রুতগামী এক্সপ্রেসও, তখনও অব্দি পেরিয়ে যেতে পারেনি। এখন, এই অভিনব স্বতশ্চল শকট কি না এর প্রায় দ্বিগুণ বেগে ছুটে চ'লে যায়—তাজ্জব ক'রে যায় সবাইকে, এমনকী কল্পনাকেও যেন ভির্মি খাইয়ে দেয়।

এটা নিশ্চয়ই বলতে হবে না যে এমন দুর্বার গতি রাজপথগুলোও প্রচণ্ড দুর্বিপাকের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলছে—অন্য গাড়িগুলোর বিপদ যতটা, পথচারীদের বিপদও ততটাই, কিংবা তারও বেশি । এই দ্রুত-ধাবমান বস্তুটি—বজ্রের মতো এগিয়ে আসে সে—আসবার আগে শোনা যায় দুর্ধর্ষ এক গুমগুম গর্জন, চারপাশে সৃষ্টি ক'রে দেয় ঘূর্ণিবায়ু, তা এমনকী আশপাশের গাছপালা থেকেও ডালপালা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ফ্যালে, আশপাশের মাঠে যে-সব গোরুভেড়া চ'রে বেড়ায় আঁৎকে দেয় তাদের, পাখিরা যারা ভয় পেয়ে উড়ে যায় তারা

তো উদ্ধার পেলো কিন্তু অন্যরা মারা পড়ে তার তলায়, তার চলার পথে যে তীব্র শোষক হাওয়া ছড়ায় কিছুতেই তার টান এড়াতে পারে না, দুমদাম ক'রে এসে আছড়ে পড়ে তার গায়ে, প্রচণ্ড গতিতে।

আর একটা কিম্ভূত অনুপুঙ্খ, খবরকাগজগুলো যার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো তা এই : এই স্বতশ্চল শকটের চাকা নাকি আদৌ ছোঁয় না রাস্তাকে, পথের ওপর তার চাকার নাকি কোনো আঁচড়ই পড়ে না, ভারি-ভারি সব গাড়ি পেছনে যে-সব আবর্জনা ফেলে যায় তাও নাকি সে পেছনে ফেলে রেখে যায় না। খুব-বেশি হ'লে হালকা একটু পরশ, শুধু ধুলোর ওপর যেন বুলিয়ে যায় বুরুশ। তার এই প্রচণ্ড দুর্বার গতিই তার চলার পথে পেছনে ফেলে রেখে যায় ধূলির অমন ঘূর্ণিহাওয়া।

'সম্ভব যে,' *নিউ-ইয়র্ক হেরাল্ড* মন্তব্য করেছিলো, 'এই দুর্বার গতিই তার ভারকে উধাও ক'রে দেয়।'

স্বভাবতই চারপাশ থেকে তুলকালাম প্রতিবাদ উঠেছিলো। এ-রকম উন্মাদ গতিকে এতটা বেপরোয়াভাবে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেয়া যায় না : পথের পাশে যা-ই পড়বে, জিনিশপত্র, গোরুভেড়া, মানুষজন—তাকেই সে-যে ধ্বংস ক'রে যাবে, এ কেমন কথা ? কিন্তু একে *ঠেকানোই* বা যায় কীভাবে ? এই দুর্দান্ত শকটটার মালিক কে, কারুরই তা জানা নেই; এও জানা নেই সে কোত্থেকে আচমকা এসে উদয় হয়, আর কোথায়ই বা মিলিয়ে যায়। এটা ঠিক যে এক চর্মচক্ষে দেখা গেছে, কিন্তু ঝলকের জন্যে, যেন কোনো বন্দুকের গুলি দুম ক'রে ছুটে গিয়েছে পলকপাতের আগেই। কার সাধ্য হাওয়ার মধ্যে গিয়ে লোফে কামানের গোলা, যখন সে তুলকালাম বেরিয়ে আসে আগুনওগরানো নল থেকে ?

আবারও জানিয়ে রাখি : এই দুর্বারগতি শকটের আকৃতিপ্রকৃতি যে কী, সে-সম্বন্ধে কারু কাছেই কোনো তথ্য নেই। পেছনে সে ফেলে রেখে যায় না ধোঁয়ার কুণ্ডলি, বাষ্পের শাদা ভাপ, পেট্রলের কোনো পোড়া গন্ধ—কিংবা অন্য-কোনো তেলেরও গন্ধ পাওয়া যায় না সে চ'লে যাবার পর। তাতে মনে হয় এই স্বতশ্চল শকট সম্ভবত বিদ্যুতের শক্তিতে চলে না। তার শক্তির উৎস যে-সব কোষে জমানো থাকে, তা নিশ্চয়ই অজ্ঞাত কোনো কোষভাণ্ডার, সম্ভবত ব্যবহার করে কোনো অজ্ঞাত তরল পদার্থ।

লোকের কল্পনা, *উত্তেজিত*, প্রায় হুলুস্থুল বাধিয়ে বসেছে : এই রহস্যময় স্বতশ্চল শকট সম্বন্ধে যে-কোনো গুজবই লোকে চোষক কাগজে কালির মতো শুষে নিচ্ছে। কেউ বলে, এ হ'লো ভুতুড়ে গাড়ি, অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক। তাকে নাকি চালিয়ে নিয়ে যায় কোনো প্রেত, নরকের কোনো-এক শোফেয়ার—গাড়িচালক, অন্য পৃথিবীর কোনো নষ্ট জীব—কোনো অপদেবতা, পুরাণের কোনো পশুশালা থেকেই হয়তো বেরিয়ে এসেছে কোনো দানব, হয়তো-বা স্বয়ং শয়তানই, পিছে 666 খোদাই-করা, যে সমস্ত মানুষী বাধাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে, যেহেতু তার দখলে আছে অদৃশ্য ও সীমাহীন শয়তানি ক্ষমতা।

কিন্তু বিশেষ কোনো পারমিট, কোনো অনুমতিপত্র ছাড়া, স্বয়ং শয়তানেরও কোনো হক নেই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পথে-ঘাটে এমন দুর্বার গতিতে তার গাড়ি চালায়। তার গাড়ির কোনো লাইসেন্স প্লেট নেই, কোনো নম্বর নেই, এমনকী কোথাও এই গাড়িটার কথা নথিভুক্ত করা নেই। আর এও ঠিক যে কোনো পুরসভাই তাকে ঘণ্টায় দুশো মাইল বেগে হুলুস্থূল কাণ্ড ক'রে চলবার কোনো অনুমতি দেয়নি। জননিরাপত্তার স্বার্থেই এক্ষুনি এমন-কোনো উপায় বার করা চাই, যার সাহায্যে এই ভয়াল শোফেয়ারের সব গুপ্তরহস্য এক্ষুনি প্রকাশ করা যায়।

তাছাড়া, এই অদ্ভুত দুর্বার গতিনাট্যের নাট্যমঞ্চ তো শুধু পেনসিলভ্যানিয়াই নয় আর। পুলিশ জানালে যে অন্যান্য রাজ্যেও তাকে তুলকালাম কাণ্ড ঘটাতে দেখা গেছে —তাকে দেখা গেছে, বিদ্যুৎঝলকের মতো, কেনটাকি রাজ্যে, ফ্রাংকফোর্টের কাছে; তাকে দেখা গেছে ওহায়োতে, কলম্বাসের রাস্তায়; তাকে দেখা গেছে টেনোসিতে, ন্যাশভিলে; মিসুরিতে, জেফারসনে; আর সবশেষে দেখা গেছে ইলিনয় রাজ্যে, শিকাগোর আশপাশে।

বিপদসংকেত বেজে উঠলো ঢং ঢং ঢং। কর্তৃপক্ষের এখন প্রথম ও প্রধান কাজ এই বিপজ্জনক শকটের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া। এহেন দুর্বার গতিতে যে ছায়াশকট (না কি *মায়াশকট?*) ছুটে বেড়ায়, তাকে থামিয়ে, চালকটিকে গ্রেফতার করার কোনো কথাই ওঠে না। সবচেয়ে ভালো হয় বড়ো-বড়ো রাস্তার মাঝখানে, যদি বিশাল সব গেটওয়ে তৈরি করা যায়, যা বন্ধ থাকবে, সবসময়, আর কখনও-না-কখনও সেই দুর্বার গতি শকট এসে তার গায়ে আছড়ে প'ড়ে হাজার টুকরো হ'য়ে চারপাশে ভেঙে প'ড়ে থাকবে।

'যত আজগুবি!' ঘোষণা করলে, যারা অবিশ্বাসী। 'এই উন্মাদ নিশ্চয়ই ঠিক জেনে ফেলবে কী ক'রে এইসব বাধা এড়িয়ে যেতে হয়—হয়তো ঘুরপথেই যাবে!'

'আর যদি দরকার হয়,' জুড়ে দিলে অন্যরা, 'ঐ ভুতুড়ে গাড়ি নিশ্চয়ই লাফিয়ে উঠে ও-সব বাধা টপকে চ'লে যাবে!'

'আর সে যদি সত্যি খোদ শয়তানই হয়, তবে, প্রাক্তন দেবদূত হিশেবে, সে নিশ্চয়ই তার পাখাজোড়ার দেখভাল করে—দরকার হ'লে সে উড়াল দিয়েই চ'লে যাবে!'

তবে এই শেষ মন্তব্যটা এসেছিলো বোকাহাবা বুড়োহাবড়াদের কাছে, যারা সব একেকজন কুসংস্কারের একেকটা ডিপো, তারা এ-ব্যাপার নিয়ে আদপেই কখনও মাথা ঘামায়নি। কারণ হেডেসের রাজার যদি সত্যি-সত্যি একজোড়া পাখা থেকেই থাকে, সে কেন তবে খামকা ও-রকম একগুঁয়ের মতো পৃথিবীর পথে-ঘাটে তার আদরের প্রজাদের পিষে মেরে দুর্বার গতিতে ছুটে যাবে, যখন সে অনায়াসেই মহাশূন্য থেকে উড়াল দিয়েই যেতে পারতো তার কাজে-অকাজে, মেটাতে পারতো তার যত কিম্ভূত খামখেয়াল। স্বাধীন-কোনো অতিকায় পাখির মতো। তার কি তবে ডানাজোড়া কাটা গেছে?

এই ছিলো যখন হালচাল, তখন মে মাসের শেষ হপ্তায়, এমন-একটা নতুন ঘটনা

ঘটলো, যা থেকে বোঝা গেলো যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন অসহায়ভাবে কোনো অজানা দানবের হাতে খাবি খাচ্ছে। আর নতুন জগতের সমূহ বারোটা বাজিয়ে দিয়ে, সে কি তারপর পুরোনো জগতের দিকে তার নজর দেবে না? এই স্বতশ্চল শকটের বেপরোয়া উম্মাদ কি তারপর ইওরোপকে ছেড়ে কথা কইবে?

নিম্মোক্ত ঘটনাটির কথা মার্কিন দেশের সবগুলো কাগজেই একযোগে বেরুলো, আর তার সঙ্গে কী-যে তুলকালাম মন্তব্য আর হুলুস্থুল হৈ-চৈ শুরু হ'য়ে গেলো, তা আর বিশদ ক'রে খুঁটিয়ে বলবার দরকার পড়ে না।

উইসকনসিনের স্বতশ্চল সংঘ একটা মোটররেসের আয়োজন করেছিলো—এমন-সব রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটবে যা একসময়ে এসে পৌছুবে ঐ রাজ্যের রাজধানী ম্যাডিসন-এ। যে-রুটটা ঠিক করা হয়েছিলো মোটররেসের পক্ষে তা ছিলো চমৎকার রাস্তা—দুশো মাইল মতো লম্বা, পশ্চিম সীমান্তের প্রেয়ারি দু শিয়েন-এ তার শুরু, ম্যাডিসনের পাশ কাটিয়ে, যা এসে শেষ হবে মিশিগান হ্রদের কাছে মিলাউকির একটু ওপরে। শুধু যে-অংশটা জাপানি রাস্তা, নিক্কো থেকে নামোদে অব্দি, যে-রাস্তার দু-পাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অতিকায় সব সাইপ্রেস, সেই অংশটা বাদ দিলে উইসকনসিনের এই রেসকোর্সের মতো চমৎকার রেসকোর্স পৃথিবীতে আর নেই। সোজা নাক-বরাবর গেছে রাস্তা, তীরের গতিপথের মতো সমান, কোথাও-কোথাও একটানা পঞ্চাশ মাইল অব্দি। এই প্রতিযোগিতার জন্যে বিস্তর শকট নাম লিখিয়েছিলো—তাদের মধ্যে কত-যে বিখ্যাত যন্ত্র ছিলো তার কোনো ইয়ত্তা নেই। সব ধরনের মোটর গাড়িকেই রেসে নাম লেখাবার অনুমতি দেয়া হয়েছিলো, এমনকী মোটর সাইকেলদেরও, অটোমোবাইলগুলো তো আছেই। নানা দেশে তৈরি সে-সব যন্ত্র, নানান তাদের গড়ন। বিভিন্ন পুরস্কারের অঙ্ক যোগ করলে দাঁড়ায় পঞ্চাশ হাজার ডলার, নেহাৎ ফ্যালনা টাকা নয়, তাই প্রতিযোগিতা খুবই জ'মে যাবে, কেননা সবাই তাতে মরীয়ার মতো যুঝে যাবে। নতুন-সব রেকর্ড যে তৈরি হবে, তাতে কারুরই কোনো সন্দেহ ছিলো না।

এ-পর্যন্ত বিভিন্ন রেসে সবচেয়ে বেশি গতি যা উঠেছিলো, সম্ভবত ঘণ্টায় আশি মাইল, সেটা মাথায় রেখে এটা আন্দাজ করা হয়েছিলো এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অন্তত তিন ঘণ্টা সময় লাগবে। আর, সমস্ত বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে, উইসকনসিনের কর্তৃপক্ষ প্রেয়ারি দু শিয়েন থেকে মিলাউকি তিরিশের মে-র সকালবেলায় সেদিন তিনঘণ্টার জন্যে সমস্ত যানবাহনের চলা নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এর পরেও যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তবে তারাই চোটজখম পাবে যারা নিজেরাই সাধ ক'রে এই প্রতিযোগিতায় এসে নাম লিখিয়েছে, আর কারু ঘাড়েই তারা কোনো দোষ চাপাতে পারবে না।

জমায়েৎ হয়েছিলো কাতারে-কাতারে লোক, বিশাল ভিড়। শুধু-যে আস্ত উইসকনসিন ঝেঁটিয়েই লোক এসেছে তা নয়, লোক এসেছে আশপাশের রাজ্য থেকেও—এসেছে ইলিনয়, মিশিগান, আইওয়া, এমনকী নিউ-ইয়র্ক থেকেও। যে-সব চালাক

নাম লিখিয়েছিলো, তাদের মধ্যে ছিলো বিস্তর বিদেশী—ইংরেজ, ফরাশি, আলেমান, অস্ট্রিয়ান—প্রত্যেক দেশের লোকই যে-যার দেশের শোফেয়ারদের সমর্থন করছে। তার ওপর, এটা যেহেতু খোদ মার্কিন মুলুক, পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত (মতান্তরে কুখ্যাত) জুয়াড়িদের দেশ, কত ধরনের যে বাজি ধরা হ'লো তার ঠিক নেই—টাকার অঙ্কও কখনও-কখনও এমন যে শুনেই চোখ ছানাবড়া হ'য়ে যায়।

রেসের সূচনা হবে ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় আটটায়, সকালবেলায় ; আর ভিড়ভাট্টা ও দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে ঠিক হয়েছিলো একেকটা গাড়ি বোঁ ক'রে বেরুবে ঠিক দু-মিনিট অন্তর—রাস্তার দু-পাশে থাকবে কাতারে-কাতারে দর্শক।

প্রথম তিনজন প্রতিযোগী, লটারি ক'রে একেকজনকে একেকটা নম্বর দেয়া হয়েছিলো, বেরিয়ে পড়লো আটটা থেকে আটটা বিশ মিনিটের ভেতর। রাস্তায় যদি কোনো গাড়ি ডিগবাজি না-খায়, অথবা একটা আরেকটাকে ধাক্কা না-মারে, তবে এগারোটার মধ্যে এদের কোনো-কোনো গাড়ি লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। অন্যরা এই একই শৃঙ্খলা ও সূচি ধ'রে রচনা হবে।

দেড় ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। প্রেয়ারি দু শিয়েনের রাস্তায় তখন একজন প্রতিযোগীই ঝড়ের বেগে ছুটেছে, টেলিফোন মারফৎ প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর সর্বত্র খবর পৌঁছে যাচ্ছে কোন গাড়ি আগে, কোন গাড়িগুলো তার পেছনে, পর-পর। ম্যাডিসন আর মিলাউকির মাঝখানে সকলের আগে-আগে রয়েছে রেনোভাইদের চার সিলিণ্ডারের কুড়ি অশ্বশক্তির গাড়িটা, টায়ারগুলো মিশেলিনের। তার গায়ে প্রায় নাকটা ঠেকিয়ে আসছে হার্ভার্ড ওয়াটসন গাড়ি, আর দিওন-বুতোঁ। এরই মধ্যে কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, অন্য গাড়িগুলো হু-ই কো-থা-য় পেছনে প'ড়ে আছে। জনা-বারো প্রতিযোগীই শেষ পর্যন্ত প্রথম স্থানের জন্যে ল'ড়ে যাবে। কয়েকজন চালক এর মধ্যেই জখম হয়েছে, তবে কারু চোট-আঘাতই তেমন সাংঘাতিক নয়। তাদের কেউ-কেউ যদি দুর্ঘটনায় ম'রেও যেতো, মানুষের মৃত্যু তখন হ'তো কতগুলো অনুপুঙ্খ মাত্র, পরিসংখ্যানের হিমশীতল অঙ্ক : তাজ্জব মুলুক আমেরিকায় মানুষের মৃত্যুকে কেউই খুব-একটা গুরুত্ব দেয় না।

স্বভাবতই উত্তেজনা আর হৈ-হৈ একেবারে চরমে এসে পৌঁছেছে, যেখানটায় মিলাউকির কাছে এই দৌড়বাজির শেষ। সেখানে এসে জড়ো হয়েছে সবচেয়ে যারা কৌতূহলী আর সবচেয়ে যারা আগ্রহী, সেখানে মুহূর্তের রাগ-অনুরাগ দপদপ ক'রে জ্বলছে—কে কাকে শান্ত করবে। দশটা নাগাদ এটা বোঝা গিয়েছে যে প্রথম পুরস্কার, কুড়ি হাজার ডলার, সাকুল্যে পাঁচটা গাড়ির আয়ত্তের মধ্যে—এ ওর মধ্যে ব্যবধান এই কমছে, এই বাড়ছে, আর এই পাঁচজনের মধ্যে আছে দুজন মার্কিন, দুজন ফরাশি আর একজন ইংরেজ। কাজেই কল্পনা ক'রে নেয়া যায় জাতীয় গৌরবের অছিলায় কেমন খ্যাপার মতো একেকজনে বাজি ধরছে। বুকিরা, যাদের মারফৎ বাজি ধরা হয়, তারা আর এই উত্তেজনার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না—এত লোকে এসে বাজি ধরতে চাচ্ছে। মুখ থেকে মুখেই ছড়িয়ে পড়ছে টাকার অঙ্ক, যেন জ্বরের ঘোরে সবাই হন্যে হ'য়ে

গিয়েছে। 'হার্ভার্ড-ওয়াটসনের ওপর দর এখন একে-তিন!' 'দিওন-বুতোঁর ওপর দর একে-দুই!' 'রেনোর ওপর সমান-সমান!' টেলিফোনে একবার ক'রে খবর আসে, আর দর্শকদের কাছে ঢেউয়ের মতো এই নতুন দর ছড়িয়ে যায়।

হঠাৎ, প্রেয়ারি দু শিয়েন-এর পুরসভার ঘড়িতে যখন সাড়ে-নটা বেজেছে, শহর থেকে দু-মাইল দূরে শোনা গেলো প্রচণ্ড এক দ্রুতধাবমান আওয়াজ আর কোনো-কিছুর গড়িয়ে-আসার শব্দ—যে-আওয়াজ বেরিয়ে আসছিলো ধুলোয়-ধুলোয় ধুল পরিমাণ মেঘের মধ্য থেকে, আর সঙ্গে-সঙ্গে শোনা গেলো তীক্ষ্ণ সিঁটির শব্দ, যেমন ভোঁ শোনা যায় ধাবমান জাহাজ থেকে, কুয়াশার মধ্যে।

আঁৎকে উঠে, ভিড় একদিকে স'রে যাবার আগেই, মেঘ প্রায় হ্যরিকেন তুফানের মতো সে-জায়গাটা ঝেঁটিয়ে গেলো : আতঙ্কিত হ'য়ে হ'ঠে না-গেলে তখন যে তাণ্ডব হ'তো তার বলি হ'তো অন্তত কয়েকশো দর্শক। এমন জোরে চোখের সামনে দিয়ে কী-যে ছুটে গিয়েছে, লোকে তা চোখেই দেখতে পারেনি, কিছু বুঝবে যে, সে-তো দূরের কথা। কিছু-একটা যে এখান দিয়ে গেছে, এইমাত্র, বলতে-না-বলতে, শুধু সেটাই সবাই টের পেয়েছে। কোনো অত্যুক্তিই হ'তো না যদি কেউ তখন ঠাণ্ডা মাথায় হিশেব ক'ষে বলতো যে তার গতি ছিলো ঘণ্টায় দেড়শো মাইল।

ছায়াশকট এসেছে, আর গেছে, দূরে মিলিয়ে গেছে পলকের মধ্যে, পেছনে ফেলে রেখে গেছে শাদা ধুলোর দীর্ঘ রেশ, যেমন কোনো এক্সপ্রেস ট্রেন পেছনে ফেলে রেখে যায় অপস্রিয়মাণ ধোঁয়ার পুচ্ছ। এটা যে কোনো স্বতশ্চল শকট তাতে কোনো সন্দেহ নেই, আর তার মোটরটাও দুর্দান্ত, অসাধারণ, *বাড়িতে লিখে জানাবার মতো*। এটা যদি তার এই তীরের বেগে ধাওয়া বজায় রাখে, এ তবে প্রতিযোগীদের একেবারে সামনে গিয়ে পৌঁছুবে—শুধু-যে পৌঁছুবে তা-ই নয়, তাদের পেরিয়েও যাবে—তাদের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত গাড়ির যা বেগ, এর গতি তার দুনো তো বটেই—অর্থাৎ এই ছায়াশকট সবার আগে গিয়ে পৌঁছুবে লক্ষ্যে, রেসের শেষ সীমায়।

আর তারপর, হকচকিয়ে-যাওয়া ভাবটা কেটে যেতেই, সবখান থেকে উঠলো প্রচণ্ড হট্টগোল—বিশেষ ক'রে দর্শকরা যখন টের পেলে যে বিপদটা আপাতত কেটে গিয়েছে।

'এ সেই জাহান্নামের গাড়িটা!'

'হ্যাঁ, এ সেই গাড়ি পুলিশ যার ল্যাজের ডগাটাও ছুঁতে পারে না!'

'কিন্তু গত পনেরো দিনে এর কথা কোথাও শোনা যায়নি!'

'কে-যে বলেছিলো এটা নাকি উলটে প'ড়ে চুরমার হ'য়ে গিয়েছে—চিরকালের মতো খতম!'

'এ হ'লো গিয়ে খোদ শয়তানের গাড়ি, নরকের আগুনে চলে, আর শয়তান স্বয়ং এটাকে চালায়!'

সত্যি-বলতে, এর শোফেয়ার যদি খোদ শয়তান না-হয়, তাহ'লে কোন মহাজন? এই অবিশ্বাস্য গতিতে ধেয়ে এলো, তার এই রহস্যময় গাড়িতে—এই মাস্তানটি তবে

কে-হে ? অন্তত এটায় কোনোই সন্দেহ নেই যে এই গাড়িটা সেই রহস্যময় গাড়িই যাকে ঘিরে এই ক-দিন ধ'রে এত চেল্লাচিল্লি হয়েছে—মুখে, ও লেখায়; পুলিশ যদি ভেবে থাকে যে তারা তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে, চিরকালের মতো একে মুলুক ছাড়া ক'রে দিয়েছে, পগাড় পার, তবে পুলিশ বিষম ভুল করেছে—আর অন্যদেশেও যেমন, মার্কিন মুলুকেও তেমনি, পুলিশ আখছার ভুলের পর ভুল ক'রেই চলেছে।

বিস্ময়ের প্রথম স্তম্ভিত দশাটা কেটে যেতেই অনেকেই ছুটে গেলো টেলিফোনের কিওস্কগুলোয়—পরে যারা আছে আগে থেকেই তাদের সাবধান ক'রে দেবে ব'লে। এই উন্মাদ শকট শুধু পথের পাশের দর্শকদেরই মারাত্মক বিপদ নয়, পথের ওপর কত-যে গাড়ি যে উলটে দেবে, চুরমার ক'রে দেবে, তার ঠিক কী। এই ভয়াল উন্মাদ যখন পাহাড়ের ধস নামার মতো এসে আর্বিভূত হবে, অন্য গাড়িগুলো তো চিঁড়ে চ্যাপটা হ'য়ে যাবে, গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে ছড়িয়ে পড়বে, সর্বনাশ হ'য়ে যাবে তাদের!

আর অন্য গাড়ির সঙ্গে পর-পর ঠোকাঠুকি লাগলে, সংঘর্ষ হ'লে, এই শোফেয়ারই কি নিজে তার গাড়ি থেকে নিরাপদে বহাল তবিয়তে বেরুতে পারবে ? হয়তো সে পাকা শোফেয়ার, ওস্তাদের ওস্তাদ, শোফেয়ারদের রাজা, কিন্তু তার যন্ত্রটি তাকে এমন নিখুঁতভাবে চালনা করতে হবে, হাতে-আর-চোখে এমন অটুট সম্বন্ধ থাকতে হবে তার, যে, সে হয়তো ভেবে ব'সে আছে, সে নিজে সবরকম পরিস্থিতিতেই নিজেকে বাঁচাতে পারবে। একটাই বাঁচোয়া, যে, উইসকনসিনের কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই স্থির ক'রে নিয়েছিলেন, রাস্তায় শুধু প্রতিযোগী গাড়িগুলো ছাড়া আর-কিছুই থাকবে না। কিন্তু তাদের মধ্যে তাকে এমন হৈ-হৈ কাণ্ড ফেলে দেবার অনুমতি কে দিয়েছে ? এখানে থাকবার কোন হক আছে তার ?

আর প্রতিযোগীরাও বা নিজেরা কী বলছে, টেলিফোনে এই-যে আগেভাগে তাদের সাবধান ক'রে দেয়া হয়েছে, ওহে, স'রে থাকো, *গ্র্যাণ্ড প্রাইজের* লোভে পিতৃদত্ত প্রাণটা খুইয়ো না, তাদেরই বা এ-বিষয়ে কী বক্তব্য ? তাদের হিশেব অনুযায়ী এই আশ্চর্য শকটটা নাকি ঘণ্টায় একশো তিরিশ মাইল বেগে যাচ্ছিলো। তাদের নিজেদের গাড়িরও গতি সাধারণ গাড়ির চাইতে অনেক বেশি, তবু তাদের দিকে এই গাড়ি এমন প্রচণ্ড গতিতে ধেয়ে এসেছিলো এবং হয়তো প্রচণ্ডতর গতিতে বন্দুকের গুলির মতো পাশ দিয়ে চ'লে গিয়েছিলো যে তারা স্পষ্ট ক'রে শকটটাকে খেয়াল পর্যন্ত করতে পারেনি, যেন একটা টেনে-লম্বা-করা টাকু, তবু হয়তো তিরিশ ফিটের চাইতে বেশি লম্বা নয়, তার চাকাগুলো এমন বিদ্যুৎক্ষিপ্র গতিতে ঘুরছিলো যে প্রায় চোখেই পড়ছিলো না। আর যখন পাশ কাটিয়ে চ'লে গেলো এই তাজ্জব লম্বা গাড়ি পেছনে না-রেখে গেলো কোনো ধোঁয়া না-বা কোনো গন্ধ।

আর তার চালক ? সে ছিলো তার যন্ত্রের ভেতটায়, দৃষ্টির অগোচর। দেশের নানা রাস্তায় প্রথম যখন হৈ-চৈ তুলে হাজির হয়েছিলো, তখন-যেমন, এখনও-তেমনি অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছে সে।

মিলাউকিকে তো তক্ষুনি জানিয়ে দেয়া হয়েছে এই উড়ে-এসে-রেসে-নাম-লেখানো অদ্ভুত প্রতিযোগীর কথা। খবরটা যে কেমন হুলুস্থুলু বাধিয়ে বসেছিলো তা নিশ্চয়ই খানিকটা আন্দাজ করা যায়। তক্ষুনি প্রস্তাব নেয়া হ'লো যে এই চলন্ত তুবড়িটাকে যে-ক'রেই হোক থামাতে হবে—রাস্তার মাঝখানে এমন-একটা বাধা তৈরি করতে হবে যার গায়ে আছাড় খেয়ে সে যাতে হাজার টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সে-রকম কোনো প্রতিরোধের প্রাচীর গড়বার সময় কই? যে-কোনো মুহূর্তেই তো উল্কার বেগে সেই শকট এসে হাজির হবে! তবে প্রতিরোধ গড়বার গরজটাই বা কী? রাস্তা কি সটান, সরাসরি, লেক মিশিগানের পাড়ে এসে শেষ হয়নি? হয় গাড়িটা নিজের গরজেই সেখানে দুম ক'রে থেমে যাবে, আর নয়তো তার অতিপ্রাকৃত চালকটি হয়তো ডাঙায় যেমন তেমনি জলেও তার যানটাকে উল্কার গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে।

এখানেও, দৌড়বাজির সারা রাস্তাটা ধ'রে যেমন হয়েছে, যত রাজ্যের আজগুবি প্রস্তাব উঠলো। এমনকী যারা এটা মানবে না যে এই রহস্যময় চালক খোদ শয়তান যদি নাও হয় তারই কোনো-এক দোসর, তারা পর্যন্ত তা-না-না-না ক'রে বললে এ হয়তো প্রলয়কালেরই কোনো অপার্থিব জীব, সংবর্তের বর্ণনা থেকে সরাসরি উঠে এসেছে, জ্যান্ত ও কিম্ভূত। আর তার ওপর এখন আর এক মুহূর্তও সময় নেই ভেবে-ভেবে নষ্ট করার। যে-কোনো মুহূর্তেই এখন এসে উদয় হবে সেই ছায়াশকট মায়াশকট।

তখনও এগারোটা বাজেনি, হঠাৎ রাস্তার দূর প্রান্ত থেকে একটা গুমগুমগুম শব্দ উঠলো, আর ঘূর্ণি তুলে খ্যাপার মতো ব'য়ে গেলো ধুলোর ঝড়। রূঢ় কর্কশতীক্ষ্ণ শিসের শব্দ ভেসে এলো হাওয়ায়, প্রবল এক হুঁশিয়ারি, পথ ছাড়ো, পথ ছাড়ো, রাস্তা খোলা রাখো।

শেষ মুহূর্তেও, সমাপ্তিরেখায় এসেও, সে তার গতি শ্লথ করেনি। সমাপ্তিরেখা থেকে মিশিগান আধমাইলও দূরে হবে কি না সন্দেহ। শকটটা নিশ্চয়ই মিশিগান হ্রদের জলে গিয়ে আছড়ে পড়বে! তাহ'লে কি যন্ত্রটা আর তার চালকের নিয়ন্ত্রণে নেই?

নেই ব'লেই তো ম'নে হয়। কক্ষচ্যুত উল্কার মতো, যানটা মিলাউকি দিয়ে ঝলক তুলে চ'লে গেলো। যখন শহরটা পেরিয়ে যাবে, তখন কি নিজের বিনাশ ডেকে আনবে, আছড়ে পড়বে লেক মিশিগানের জলে—যেটা হবে তার সলিল সমাধি?

যা হবে, সে-তো পরে হবে। কিন্তু যখন যানটা একটা মোড় ঘুরে উধাও হ'য়ে গেলো, এই মাটিতে-চলা-ধূমকেতুটার চলার পথে তার চ'লে-যাওয়ার কোনো চিহ্নই কিন্তু প'ড়ে রইলো না।

৫

নিউ-ইংল্যাণ্ডের তীর ঘেঁসে

খবরকাগজগুলোয় যখন এই অদ্ভুত রেসের খবর ছাড়া আর-কোনো খবর নেই, আমি তখন আবারও ওয়াশিংটনে এসে হাজির হয়েছি। ফিরে এসেই আমি আমার বড়োকর্তার সঙ্গে দেখা করতে তাঁর দফতরে গিয়েছি, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি তখন। পারিবারিক ঝামেলায় হঠাৎ তাঁকে চ'লে যেতে হয়েছে ওয়াশিংটন ছেড়ে, কয়েক সপ্তাহ অনুপস্থিত থাকবেন। মিস্টার ওয়ার্ড অবশ্য জানেন যে আমার অভিযান বিফল হয়েছে। খবরকাগজরা, বিশেষ ক'রে নর্থক্যারোলাইনার খবরকাগজেরা, *গ্রেট আইরিতে* ওঠবার চেষ্টা ক'রে আমরা যে সফল হ'তে পারেনি, তার বিশদ বিবরণ দিয়েছে।

স্বভাবতই, অপ্রত্যাশিত এই বাধার দরুন, আমার অস্থির কৌতূহল আরো-অস্থির হ'য়ে উঠেছিলো। এর পরে যে কী করবো, তার কোনো পরিকল্পনাই আমি মিস্টার ওয়ার্ডের সঙ্গে পরামর্শ না-ক'রে করতে পারছিলুম না। তাহ'লে কি *গ্রেট আইরির* রহস্যটা ভেদ করার সমস্ত আশাতেই জলাঞ্জলি দিতে হবে? না, বারে-বারে বিফল হই তাও সই, তবু আমি বারে-বারে ঐ পাহাড়ে ফিরে যাবো, নতুন উদ্যমে চেষ্টা করবো পাহাড়ে চড়তে।

তবে, এটা ঠিক যে, ঐ দেয়াল বেয়ে চূড়ায় গিয়ে পৌঁছুনো মানুষের সাধ্যাতীত। পাহাড়ের চূড়া অব্দি একটা ভারা বানানো যায় যদি? কিংবা যদি তার দেয়াল ফুঁড়ে খোঁড়া যায় একটা সুড়ঙ্গ? আমাদের এনজিনিয়াররা তো প্রতিদিনই এর চেয়েও কঠিন সমস্ত সমস্যার সমাধান ক'রে ফ্যালে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্য খরচের কথাটাও ভেবে দেখা উচিত—*গ্রেট আইরির* ভেতরে গিয়ে হয়তো দেখা যাবে কোথাও কিছু নেই, সব ভোঁ ভাঁ, তখন এত হাজার ডলার নিছকই বাজে খরচ হবে। সুড়ঙ্গটা অনেক হাজার ডলার খরচ ক'রে বানানো যায়—কিন্তু তাতে আমার এই বেদম কৌতূহল চরিতার্থ করা ছাড়া আর-কোন উপকার হবে লোকের?

আমার নিজের হাতে যা-টাকা আছে তা দিয়ে এই কাজে হাত দেয়া যায় না। সরকারি টাকার দায়িত্ব মিস্টার ওয়ার্ডের ওপর—তিনি তো আপাতত এখানে নেই। একবার ভেবেছিলুম এতসব লক্ষপতি ধনকুবেরদের কোনো-একজনকে বাজিয়ে দেখলে হয় না? হায়-রে, যদি আমি তাঁদের কাউকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারতুম যে ঐ পাহাড়ে সোনারুপোর খনি আছে! কিন্তু এমন কথা শুনে পাগলেও হাসবে। প্রশান্ত সাগরের কূলে যে-সব পাহাড় আছে, ট্রান্সভালে বা অস্ট্রেলিয়ায়, সেখানে হয়তো জমি খুঁড়লে সোনা পাওয়া গেলে যেতেও পারে, কিন্তু আপালাচিয়ার শৈলশ্রেণী তো সোনার খনি পেটে পুরে রাখে না।

পনেরোই জুনের আগে মিস্টার ওয়ার্ড তাঁর কাজে ফেরেননি। আমার ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমাকে কিন্তু তিনি বেশ সমাদরই করেছেন। 'এই-যে, স্ট্রক! বেচারা!' হেসে আমায় স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। 'বেচারা স্ট্রক, যে কি না একটা তুচ্ছ পাহাড়ের কাছে হেরে এসেছে!'

'আপনি যদি আমায় চাঁদের পিঠে কী আছে দেখে আসতে বলতেন তাহ'লে যতটাই হার মেনে আসতুম, তার চাইতে বেশি হার স্বীকার করতে হয়নি কিন্তু,' আমিও হেসেই উত্তর দিয়েছি। 'আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলো নৈসর্গিক বাধা, তখন আমাদের হাতে যা-ক্ষমতা ছিলো তাতে ঐ বাধা অতিক্রম করা অসাধ্য ছিলো।'

'তাতে আমার সন্দেহ নেই, স্ট্রক, তাতে আমার একফোঁটাও সন্দেহ নেই। তবু, তথ্যটা কিন্তু থেকেই যায়। যে, *গ্রেট আইরির* ভেতরে কী তোলপাড় হচ্ছে, কী ওলোটপালোটকাণ্ড ঘ'টে যাচ্ছে, তার কিছুই তুমি আবিষ্কার করতে পারোনি।'

'কিছুই পারিনি, মিস্টার ওয়ার্ড।'

'আগুনের কোনো চিহ্ন বা লক্ষণ দ্যাখোনি?'

'কিছুমাত্র না।'

'আর সন্দেহজনক কোনো গুমগুম আওয়াজও শোনোনি?'

'না।'

'তাহ'লে এখনও আমরা ঠিকঠাক জানি না ওখানে কোনো আগ্নেয়গিরি আছে কি না?'

'এখনও জানি না, মিস্টার ওয়ার্ড। তবে যদি থেকে থাকেও, সে-যে এখন গভীর ঘুমে ঢ'লে পড়েছে তাতে আমাদের সন্দেহ নেই।'

'তবু,' মিস্টার ওয়ার্ড বলেছেন, 'এটাও তো জানা নেই সে শিগগিরই কোনোদিন কাঁচা ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে কি না। স্ট্রক, কোনো আগ্নেয়গিরি যে ঘুমিয়ে আছে, এটা কোনো বড়ো কথা নয়—আমাদের চেষ্টা করতে হবে তাকে সম্পূর্ণ নিভিয়ে ফেলতে। যদি-না, অবশ্য, অত-সব গুজবের জন্ম হ'য়ে থাকে ক্যারোলাইনার লোকদের তেতে-ওঠা কল্পনায়।'

'সে কিন্তু সম্ভব নয়, সার,' আমি বলেছি, 'মরগ্যানটনের মেয়র মিস্টার স্মিথ, এবং তাঁর বন্ধু, প্লেজেন্ট গার্ডেনের মেয়র—দুজনেই বিস্তর কাণ্ডজ্ঞান ধরেন, চোখকান খোলা রাখেন। দুজনেই তাঁরা নির্ভরযোগ্য মানুষ। আর তাঁরা এ-বিষয়ে তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে সব খুলে বলেছেন। *গ্রেট আইরির* ওপরে যে শিখা দেখা গিয়েছিলো, সে-তথ্য মিথ্যে নয়। অদ্ভুত সব আওয়াজও উঠেছিলো ওখানে। অন্তত এই দুই বিষয়ে সন্দেহ করবার মতো কোনো কারণ নেই।'

'মানলাম,' ঘোষণা করেছেন মিস্টার ওয়ার্ড, 'মানলাম যে এই দুটি বিষয় কারু বিকৃত মস্তিষ্কের অলীক বিভ্রম নয়। তাহ'লে তা থেকে একটাই সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো যায়: *গ্রেট আইরি* এখনও তার ভেতরকার রহস্য কিছুই ফাঁস ক'রে দেয়নি।'

'আমরা যদি তা একান্তই জানতে চাই, মিস্টার ওয়ার্ড, তবে সমাধানটা আসতে পারে কেবল অকাতরে অর্থ ব্যয় করলেই। খন্তা, কোদাল আর ডায়নামাইট অনায়াসেই ঐ নিরেট দেয়ালগুলো উড়িয়ে দিতে পারবে।'

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' বড়োকর্তা উত্তরে জানিয়েছেন, 'কিন্তু পাহাড় এখন যখন ঘুমিয়ে আছে, নিরীহ ও নিরুপদ্রব, তখন এত-বড়ো একটা কাজে হাত দেবার কোনো মানে হয় না। আমরা বরং কিছুদিন চুপচাপ ব'সে-ব'সে দেখি, যদি পাহাড় নিজেই কোনো-একদিন তাঁর রহস্য ফাঁস ক'রে দেয়।'

'মিস্টার ওয়ার্ড, বিশ্বাস করুন, আমি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি, তবু আপনি আমার কাঁধে যে-দায়িত্ব দিয়ছিলেন, তা পালন করতে পারিনি ব'লে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।'

'বাজে কথা বোলো না, স্ট্রক ! মিথ্যে নিজেকে এ নিয়ে অস্থির কোরো না। তোমার এই হারটাকে তুমি বরং দার্শনিকদের ভঙ্গিতেই নাও। আমরা তো আর সবসময় কৃতকার্য হ'তে পারি না, পুলিশের চাকরি করলেও না। কত পাজি লোকই তো আমাদের হাত এড়িয়ে চ'লে যায়! সত্যি-বলতে, অপরাধীরা যদি একটু চালাক আর হুঁশিয়ার হ'তো, তবে হয়তো তাদের কাউকেই আমরা পাকড়াতে পারতাম না। সবসময়েই তারা নিজেরাই হাঁদার মতো এমন-কিছু করেছে যে আমরা তাদের পাকড়াতে পেরেছি। কোনো দুষ্কর্ম —চুরি বা খুন—হিশেব ক'রে প্ল্যানমাফিক করার মধ্যে বাহাদুরি কিছু নেই, কেননা সে-সব কাজ করা ভারি সহজ ; কঠিন শুধু কারু সন্দেহ না-জাগিয়ে সেগুলো হাসিল করা, আরো-কঠিন পেছনে কোনো সূত্র ফেলে না-রাখা—যে-সব সূত্র ধ'রে যে-কেউ পুরো ব্যাপারটা ধ'রে ফেলতে পারে। বুঝেছো, স্ট্রক, আমি মাস্টারি ক'রে অপরাধীদের সবকিছু শিখিয়ে দিতে চাই না—আমি বরং চাই তারা যেমন হাঁদা আছে, তেমনি আকাট বোকা থাকুক। তবু, এ-কথাও ঠিক, এমন অনেক অপরাধী আছে পুলিশ কখনও যাদের চুলের ডগাটিও ছুঁতে পারবে না—পারেওনি।'

এই বিষয়ে অবশ্য আমার বড়োকর্তার সঙ্গে আমিও সম্পূর্ণ একমত। পাজির পাঝাড়া বদমায়েশগুলোর মধ্যেই সবচেয়ে বেশি হাবা লোক দেখা যায়। শুধু এই কারণেই আমি ভারি তাজ্জব হ'য়ে গেছি প্রকাশ্য দিবালোকে *ঐ রাক্ষুসে যানটা* সকলের নাকের ডগা দিয়ে চ'লে গেলো, অথচ কর্তৃপক্ষ এখনও তাতে কোনো আলোকসম্পাত করতে পারলো না ! এবং যখন মিস্টার ওয়ার্ড এই প্রসঙ্গটা তুলেছেন, তখন আমি কিছুতেই আমার বিস্ময় প্রকাশ না-ক'রে পারিনি।

মিস্টার ওয়ার্ড বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছেন যে *ঐ রাক্ষুসে যানটার* পেছন নেয়া একেবারেই সম্ভব ছিলো না; আগে যতবারই সে দেখা দিয়েছে, টেলিফোনে কাউকে কোনো খবর দেবার আগেই সে উধাও হ'য়ে গেছে। সারা দেশে কত-যে পুলিশকে শুধু এরই ওপর নজর রাখবার জন্যে নিয়োগ করা হয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই—অথচ তবু কেউ এই দুর্বৃত্তের মুখোমুখি পড়েনি। সে তার এই তাজ্জব-করা ক্ষিপ্র গতি সত্ত্বেও

অবিশ্রাম এক জায়গায় থেকে আরেক জায়গায় যায় না—বরং কোথাও সে এক পলকের জন্যে দেখা দেয়, তারপরেই যেন হাওয়ায় উবে যায়। সত্যি-যে, অবশেষে তাকে প্রেয়ারি দু শিয়েন থেকে মিলাউকি অব্দি মোটররেসের পুরো রাস্তাটাতেই দেখা গেছে, আর এতটা রাস্তা সে গেছে দেড় ঘণ্টারও কম সময়ে, আর রেসট্র্যাকটা তো কম ক'রেও দুশো মাইল হবে।

কিন্তু তারপর থেকেই ঐ অদ্ভুত স্বতশ্চল শকটের আর-কোনো পাত্তাই নেই। সে রেসট্র্যাকের একেবারে শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে, নিজেরই চলার তাড়ায় তারপরও ছুটেছে, কিছুতেই থামতে পারেনি; তবে কি সত্যি সে আছড়ে পড়েছে লেক মিশিগানের জলে, আর একেবারে তলিয়ে গেছে? আমাদের কি তবে ধ'রে নিতে হবে যে এই যান আর তার চালক দুজনেই ধ্বংস হ'য়ে গেছে? তবে কি আর এদের কারু কাছ থেকে আর-কোনো বিপদআপদের আশঙ্কাই নেই আমাদের? জনসাধারণের একটা বড়ো অংশই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে অস্বীকার করছে। তাদের মতে, আবারও হঠাৎ কোনোখান থেকে ঐ অলৌকিক গাড়ি এসে হুলুস্থুল বাধাবে।

মিস্টার ওয়ার্ড তো খোলাখুলি স্বীকারই ক'রে বসলেন যে পুরো ব্যাপারটাই তার কাছে অসাধারণ ও চমকপ্রদ ব'লে ঠেকছে; আর তাঁর এই মতের সঙ্গে আমারও কোনো বিরোধ ছিলো না। যদি এই নারকীয় শোফেয়ার আবার এসে উদয় না-হয়, তার ছায়ামূর্তি (*কেননা কেউই তাকে চোখে দ্যাখেনি একবারও*) নিশ্চয়ই তবে *বুদ্ধিতে-যার-ব্যাখ্যা-চলে-না* এমনি-কোনো অতিমানুষিক রহস্যের অংশ ব'লে ধ'রে নিতে হবে।

বড়োকর্তা আর আমি অনেকক্ষণ ধ'রে, সবদিক তলিয়ে দেখে, ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছিলুম। তারপর যখন ভাবছি আমাদের কথাবার্তা শেষ হ'য়ে গেছে, তখন হঠাৎ, মিস্টার ওয়ার্ড ঘরটার মধ্যে বার-কয়েক পায়চারি ক'রে আচমকা ব'লে উঠেছেন: 'হ্যাঁ, সত্যি, মিলাউকিতে সেদিন যা ঘ'টে গেলো, তা ভারি আশ্চর্য। কিন্তু আমার হাতে আরো-একটা রহস্য আছে, আর তাকেও মোটেই কম আশ্চর্য বলা যাবে না।'

এই কথা ব'লে আমার হাতে বস্টন-থেকে-পাওয়া একটা প্রতিবেদন তুলে দিয়েছেন—এমন-একটা বিষয় সম্বন্ধে সেই প্রতিবেদন যা নিয়ে সান্ধ্য কাগজগুলি সদ্য তাদের পাঠকদের অবহিত করতে শুরু করেছে। আমি যখন প্রতিবেদনটা পড়ছি, তখন হঠাৎ ব্যস্তসমস্তভাবে মিস্টার ওয়ার্ডকে অন্য-কোথাও ডেকে-নিয়ে-যাওয়া হ'লো। আমি জানলার পাশে জমিয়ে ব'সে প্রতিবেদনটায় মনোনিবেশ করলুম।

গত কিছুদিন ধ'রে মাইন, কানেটিকাট আর ম্যাসাচুসেট্‌সের উপকূল ধ'রে সাগরজলে এমন-একটা কিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে কেউই যাকে সঠিক বর্ণনা করতে পারেনি। চলন্ত একটা-কিছু এসে হঠাৎ দেখা দেবে জলের ওপর, তীর থেকে দু-তিন মাইল দূরে, জলের ওপর, আর তার ভীষণ চাকা চালিয়ে জলে হুলুস্থুল তুলবে, ঢেউয়ের মধ্যে সেটা ঝিলিক দেবে ক-বার, এদিক-ওদিক, তারপর ফের তীর বেগে দৃষ্টির বাইরে চ'লে যাবে।

জিনিশটা এতই বিদ্যুৎবেগে চলাফেরা করে যে সবচেয়ে সেরা জাতের টেলিস্কোপ

দিয়েও তার ওপর নজর রাখা যায় না। দৈর্ঘ্যে সে তিরিশ ফিটের বেশি হবে না, অনেকটা একটা লম্বা চুরুটের মতো দেখতে, রংটা সবুজেমতো, আর সেইজন্যেই সমুদ্রের জল থেকে তাকে সহজে আলাদা ক'রে চেনবার উপায় থাকে না। তাকে সবচেয়ে বেশিবার দেখা গেছে কেপ কড থেকে নোভাস্কোশিয়ার জলে। প্রভাইডেন্স, বস্টন, পোর্টসমাউথ, আর পোর্টল্যাণ্ড থেকে মোটরবোট আর স্টীমলঞ্চেরা তাকে দেখে বারে-বারে এই চলন্ত বস্তুটির কাছে যাবার চেষ্টা করেছে—এমনকী তার পেছনে ধাওয়া ক'রে যাবারও চেষ্টা করেছে। কিন্তু হাজার চেষ্টা ক'রেও তারা তার ধারে-কাছে ঘেঁসতে পারেনি। শুধু-যে অসাধ্যই মনে হয়েছে, তা নয়, পশ্চাদ্ধাবন মনে হয়েছে অর্থহীন। প্রত্যেকবারই সে ধনুক-থেকে-ছোঁড়া তীরের মতো দৃষ্টির বাইরে চ'লে গিয়েছে।

স্বভাবতই, বস্তুটি যে কী, কী তার প্রকৃতি, সে-সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত; আর তা ব্যাপারটাকে আরো জট পাকিয়ে তুলেছে। কিন্তু সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়-করানো কোনো অনুমানই এ-পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি। এমনকী ওস্তাদ খালাশিরা পর্যন্ত এটাকে নিয়ে কেবলই মাথা চুলকোচ্ছে, কিন্তু কিছুই বলতে পারছে না। গোড়ায় নাবিকরা ভেবেছিলো এ বুঝি কোনো বৃহদাকার মৎস্য, হয়তো তিমি বা তিমিঙ্গিল। কিন্তু এটাও তো ভালো ক'রেই জানা যে এ-সব জীব জলের ওপর ভেসে ওঠে একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর, নিশ্বাস নিতে, আর ফোয়ারার মতো ছিটিয়ে দেয়—আকাশে—জলের আর হাওয়ার ধারা। অথচ এই আশ্চর্য জীবটি—যদি সে কোনো জলচর প্রাণীই হয়—ককখনো *ফোয়ারা ছেটায়নি*; যেমন বলে নাবিকেরা। ককখনো সে শ্বাসপ্রশ্বাস নেবার ফোঁস-ফোঁস আওয়াজও করেনি। অথচ এ যদি কোনো অতিকায় সামুদ্রিক জীব না-হয়, এই অজ্ঞাত জলরাক্ষসকে তবে কোন শ্রেণীতে ফেলা হবে? সে কি তবে পুরাণ-কিংবদন্তির জলচর জীব, গভীর জলে যারা ঘুরে বেড়ায়, ক্রাকেন, অক্টোপাস, লেভিয়াথান, কিংবা সেই বহুশ্রুত মহানাগ?

সে যা-ই হোক, এই জলদানব, সত্যিকারই হোক বা পুরাণের জীবই হোক, বারে-বারে দেখা দিয়েছে নিউ-ইংল্যাণ্ডের তীর ঘেঁসে, আর ছোট্ট মোটরবোট, জেলেডিঙি বা প্রমোদতরীগুলো ওখানকার জলে আর ঘুরে বেড়াবার সাহসই পায় না। যখনই সে দেখা দিয়েছে, নৌকোগুলো আতঙ্কিত হ'য়ে চম্পট দিয়ে ফিরে এসেছে সবচেয়ে কাছে যে-বন্দর থাকে, সেখানে সাবধানের অন্তত মার নেই। জন্তুটি *যদি* হিংস্র হ'য়ে থাকে, তবে কারু প্রাণেই তার মুখোমুখি গিয়ে পড়ার দুঃসাহস বা গূঢ় বাসনা নেই।

আর বড়ো-বড়ো জাহাজ এবং উপকূলের মস্ত স্টীমারগুলো? তাদের তো কোনো জলদানবের কাছ থেকে ভয় পাবার কিছু নেই—তা সে তিমিই হোক, বা তিমিঙ্গিলই হোক। কয়েক মাইল দূর থেকে এ-রকম কয়েকটি জলপোত তাকে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু যখন তারা তার কাছে যাবার চেষ্টা করেছে, সে দ্রুতবেগে অন্যদিকে চ'লে গিয়েছে। একদিন, এমনকী, মার্কিনরাষ্ট্রের এক দ্রুতগামী গোলন্দাজ রণতরী বস্টন থেকে বেরিয়েছিলো, জলদানবের পেছন নেবার উদ্দেশ্য যদি নাও তার থেকে থাকতো, ইচ্ছে

ছিলো তাকে লক্ষ্য ক'রে অন্তত কয়েকবার কামান ছোঁড়ে। কিন্তু দূর থেকে তাকে দেখবামাত্র চক্ষের পলকে এই জলের জীব উধাও হ'য়ে যায়, পুরো পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যায়, তবে এটা ঠিক এ-যাবৎ এই জলদানব নৌকো বা মানুষ কাউকেই আক্রমণ করার কোনো উৎসাহ দেখায়নি।

এ-পর্যন্ত পড়তে-না-পড়তেই মিস্টার ওয়ার্ড আবার তাঁর খাশকামরায় ফিরে এলেন, আর আমি প্রতিবেদনটার ওপর থেকে চোখ তুলে পড়া থামিয়ে জিগেস করেছি, 'এখনও অব্দি তো এই সিন্ধুনাগকে নিয়ে অভিযোগ তোলার মতো কোনো কারণ ঘটেনি। বড়ো জাহাজ দেখতে পেলেই সে পালিয়ে যায়। ছোটো জাহাজগুলোকে সে কখনোই তাড়া করে না। আবেগ-অনুভূতি বা বুদ্ধিশুদ্ধির বড়াই করতে পারে এমন মাছ আর ক-টাই বা আছে?'

'ভুল বললে, স্ট্রক। মাছেরও আবেগ-অনুভূতি আছে, আর যদি কখনও খেপে যায়—'

'কিন্তু, মিস্টার ওয়ার্ড, এখনও তো এই জীবটিকে খুব-একটা বিপজ্জনক ব'লে বোধ হচ্ছে না। দুটোর একটা জিনিশ নিশ্চয়ই শিগগিরই ঘটবে। হয় সে এখানকার উপকূল ছেড়ে পাততাড়ি গোটাবে, আর নয়তো কেউ-না-কেউ একদিন তাকে পাকড়াবে—কোনো ধীবরের জালে ধরা পড়বার পর তাকে বেশ র'য়ে-স'য়ে *স্টাডি* ক'রে দেখা যাবে—ওয়াশিংটনের এই মিউজিয়ামে আরো-একটা আশ্চর্য জীবের আমদানি হবে।'

'আর এটা যদি সত্যি-কোনো সামুদ্রিক জীব না-হয়?' মিস্টার ওয়ার্ড তখন জিগেস করেছেন।

আমি অবাক হ'য়ে প্রতিবাদ তুলেছি, 'তাছাড়া আর কী-ই বা হ'তে পারে?'

'আগে প'ড়েই নাও পুরোটা,' মিস্টার ওয়ার্ড আমাকে তাতিয়ে দিয়েছেন।

এবং তারপর আমি গভীর মনোযোগ দিয়েই বাকি অংশটা পড়েছি। এবং লক্ষ করেছি যে প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অংশটায় আমার বড়োকর্তা কতগুলো অনুচ্ছেদের তলায় লাল পেনসিল দিয়ে দাগিয়ে রেখেছেন।

বেশ-কিছুকাল ধ'রেই, এ-যে কোনো সমুদ্রের জীব, এ নিয়ে লোকের মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না। আর এও সবাই ধ'রে নিয়েছিলো যে, যদি দল বেঁধে প্রাণপণে এটাকে তাড়া করা যায়, তবে আর-কিছু না-হোক, একে আমাদের এই উপকূলভাগ থেকে ভাগিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু তারপরেই লোকে মত বদল করেছে। লোকে জিগেস করতে শুরু করেছে, মাছ না-হ'য়ে, এ যদি হয় কোনো অভিনব ও দারুণ শক্তিশালী কোনো নৌকো?

সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তার দুর্দান্ত এনজিনটার ক্ষমতা অপরিসীম। হয়তো উদ্ভাবনকর্তা তাঁর এই উদ্ভাবনের মূল সূত্রগুলো বিক্রি ক'রে দেবার আগে, এভাবেই যন্ত্রটা সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল চাগিয়ে তুলতে চাচ্ছে, চাচ্ছে যে লোকে যাতে এই স্টীমবোট সম্বন্ধে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে—আর গোটা নৌজগৎকে তাক লাগিয়ে দেয়াই বোধকরি

তার উদ্দেশ্য : বাহ্‌বা পেতে কার না ইচ্ছে থাকে ? তার এই স্টীমবোটের চলায় এমন-একটা নিশ্চিন্ত দৃঢ়তা, তার প্রত্যেকটি নড়াচড়ায় এমন-একটা সুন্দর ছন্দ, এমন সহজ অনায়াসভঙ্গিতে সে তীরের বেগে পেছন-নেয়া নৌকোর হাত এড়িয়ে যায়—নিশ্চয়ই এত-সব আশ্চর্য গুণের জন্যে তার এই স্টীমবোট জগৎ-জোড়া এক প্রচণ্ড আগ্রহ ও কৌতূহল জাগিয়ে তুলবে।

গত কয়েক বছরে জাহাজের এনজিন বানাবার বিদ্যা দারুণ উন্নতি করেছে। অতিকায় সব অ্যাটলান্টিক পাড়ি দেয়া স্টীমার পাঁচদিনের মধ্যে এ-মহাদেশ থেকে ও-মহাদেশে যাওয়া সম্ভব ক'রে তুলেছে। আর এনজিনিয়াররা এখনও তাঁদের শেষ কথা বলেননি। জগতের নৌশক্তিগুলোও খুব-একটা পেছিয়ে প'ড়ে নেই। ক্রুজার, টর্পেডোবোট, টর্পেডো-বিধ্বংসী জাহাজ—খুব সহজেই অ্যাটলান্টিক বা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্রুততম জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, ভারত মহাসাগরে যারা বাণিজ্যের ছলে ঘুরে বেড়ায় তাদেরও এরা আদপেই রেয়াৎ করে না।

এ যদি, সত্যি, কোনো নতুন নকশা অনুযায়ী তৈরি-করা স্টীমবোট হয়, এ পর্যন্ত তার চেহারাটা, আদলটা, খুঁটিয়ে দেখবার কোনো সুযোগ পাওয়া যায়নি । আর কোন এনজিন : যে তাকে এমন দ্রুতবেগে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় তার শক্তির উৎস নিশ্চয়ই এখনও কারু জানা নেই । কোন শক্তি মারফৎ তার কলকব্জা চলে, সেটাই হয়তো প্রধান প্রশ্ন। যেহেতু এই নৌকোটার কোন পাল নেই, এ নিশ্চয়ই হাওয়ার তোড়ে ছোটে না ; আর যেহেতু তার কোনো নল দিয়ে ধোঁয়া ওঠে না কুণ্ডলি পাকিয়ে, এ নিশ্চয়ই বাষ্পের জোরেও চলে না।

প্রতিবেদনটার এখানটায় পৌঁছে, আমি আবার পড়া থামিয়ে আমরা প্রশ্নটা উত্থাপন করবো কি না ভাবছি, এমন সময় আমার দ্বিধা লক্ষ ক'রে মিস্টার ওয়ার্ড জানতে চেয়েছেন : 'কোথায় তোমার ধাঁধা লাগছে, স্ট্রক ?'

'এখানটায়, মিস্টার ওয়ার্ড। এই তথাকথিত জলযানটির চালকশক্তি যে কী, তা কারু জানা নেই, শুধু এটা জানা যে এর গতি প্রচণ্ড, আশ্চর্য দ্রুতবেগে সে চলতে পারে। এর সঙ্গে আমাদের ঐ তাজ্জব মোটর গাড়িটার কী আশ্চর্য মিল—'

'তাহ'লে এতক্ষণে তুমি এই সিদ্ধান্তেই এসে পৌঁছেছো ?'

'হ্যাঁ, মিস্টার ওয়ার্ড।'

সত্যি, একটাই শুধু সিদ্ধান্তে, পৌঁছুনো যায়। যদি সেই রহস্যময় শোফেয়ার উধাও হ'য়ে গিয়ে থাকে, যদি সে তার শকট নিয়ে লেক মিশিগানে সলিল সমাধি লাভ ক'রে থাকে, তবে এখন তেমনি জরুরি হ'য়ে উঠেছে এই রহস্যময় নৌচালকের গুপ্ত রহস্যটি জানা। আর, সে সমুদ্রের তলায় চিরকালের মতো হারিয়ে যাবার আগেই, সেটা জেনে নেয়া জরুরি। কিন্তু এ কেমনধারা বৈজ্ঞানিক ? কোথায় এমন অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক আছে যে তার উদ্ভাবনের কথা কাউকেই জানাতে চায় না ? মার্কিন সরকার—আর বলতে-কি অন্য যে-কোনো সরকারই—সে যা দাম চায় তা-ই দিতে নিশ্চয়ই রাজি হবে—তার যন্ত্রটা এমনই আশ্চর্য।

অথচ, অবাক কাণ্ড !, দুর্ভাগ্যবশতই বলা যায়, ডাঙার ওপরকার যানটির আবিষ্কর্তা তার গোপন রহস্য বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে জলে ডুবে মরেছে ! এই জলে-ভাসা যানটির আবিষ্কর্তাও কি তেমনিভাবে নিজের আবিষ্কারের রহস্য নিয়ে হারিয়ে যাবে ? প্রথম যানটি যদি—ধ'রে নেয়া যাক, *যদি*—এখনও টিঁকে থাকে কোথাও, এর কথা আজকাল আর কোথাও শোনা যাচ্ছে না; দ্বিতীয়টাও কি, সেই একইভাবে, নিজের বাহাদুরি দেখিয়ে সকলের শাবাশি পেয়ে, শেষটায়, কোনো চিহ্ন না-রেখেই, বেমালুম হারিয়ে যাবে ?

এই সম্ভাবনাটাকে যে আদৌ উড়িয়ে দেয়া যায় না, তার পক্ষে যে যুক্তি আছে, সেটা এই : চব্বিশ ঘণ্টা আগে ওয়াশিংটনে এই প্রতিবেদন এসে পৌঁছুবার পর এই আশ্চর্য জলযানটির কোনো হদিশই কোনোখান থেকে পাওয়া যায়নি—কেউ আর তাকে কোথাও চোখে দ্যাখেনি। আদৌ তাকে আর-কখনও দেখা যাবে কি না, দেখা গেলেও —কবে এবং কোথায়, এই কূট প্রশ্নের উত্তর কেউ-বা জানে ?

আমার চোখে অবশ্য আরো-একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ধরা পড়েছে। ঠিক যখন আমি কথাটা পাড়বো কি না ভাবছি, ঠিক তখনই মিস্টার ওয়ার্ড প্রসঙ্গটা তুলেছেন। এ এক অদ্ভুত কাকতাল। তথ্যটা এই : ঐ আশ্চর্য স্থলযানটি বেমালুম উধাও হ'য়ে যাবার পরেই এই আশ্চর্য নৌযানটি সকলের চোখে পড়েছে। দুটোরই এনজিনে আছে অজ্ঞাত শক্তি —যার ক্ষমতা প্রচণ্ড। যদি জলে-ডাঙায় একযোগে এই দুই যান তীব্রবেগে ছুটে চলে, তবে মানবজাতির সমূহ বিপদ—জলে-ডাঙায়, নৌকোয়-গাড়িতে, পদব্রজে—কিছুতেই এর খপ্পর থেকে পালানো যাবে না। সেইজন্যে, জলসাধারণের চলাফেরার নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্যে এক্ষুনি পুলিশকে কোনোভাবে আসরে নেমে পড়তে হবে।

মিস্টার ওয়ার্ড কথাটা বিশদ ক'রে বলবামাত্র আমাদের কাজ কী হবে, তা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু কী ক'রে আমরা পাকড়াবো এই আবিষ্কর্তাকে ? কিছুক্ষণ আলোচনা ক'রে আমি যাবার জন্যে যেই উঠে দাঁড়িয়েছি, মিস্টার ওয়ার্ড তাঁর ভাবনাটা ভেঙে বলেছেন : 'এই নৌকো আর ঐ গাড়ি—এই দুয়ের চমকপ্রদ মিলটা খেয়াল করেছো কি, স্ট্রক ?'

'আমিও তা-ই ভাবছিলুম।'

'আচ্ছা, এমন কি হ'তে পারে যে দুটোই আসলে এক—এটা একটা উভচর যান!'

৬

প্রথম চিঠি

মিস্টার ওয়ার্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি লং স্ট্রিটে আমার নিজের আস্তানাটায় ফিরে এসেছিলুম। সেখানে বৌ-বাচ্চার হৈ-হুল্লোড় নেই ব'লেই এই আশ্চর্য মামলাটা

নিয়ে ঠাণ্ডাভাবে ব'সে-ব'সে মাথা ঘামাবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। আমার বাড়িতে থাকার মধ্যে আছে এক বুড়ি, আমার মায়ের আমল থেকে সে আমার দেখাশুনো ক'রে আসছে—তারপর মা মারা যাবার পর আমার এখানেই সে কাটিয়ে দিয়েছে পনেরো বছর।

দু-মাস আগে আমি চাকরি থেকে ছুটি নিয়েছিলুম। ছুটি ফুরোতে এখনও দু-হপ্তা বাকি, যদি-না অপ্রত্যাশিত কোনোকিছু এসে গোল পাকায়—কখনও-কখনও এমন-সব মামলা এসে পড়ে যা নিয়ে একফোঁটাও সবুর করা চলে না, তখন এইসব ছুটি-টুটি মাথায় উঠে যায়, ফের হন্তদন্ত হ'য়ে কাজে লেগে পড়তে হয়। এই ছুটির অনেকটাই যে মাঠে না-হোক, পাহাড়ে মারা গেছে, তার বিবরণ তো আগেই দিয়েছি, যখন *গ্রেট আইরির* গুপ্ত রহস্য ভেদ করবার জন্যে পাহাড়ে ছুটতে হয়েছিলো।

আর এখন? এখনও কি আমার পক্ষে উচিত হবে না ছুটির কথা ধামাচাপা দিয়ে জলে-ডাঙায় এই-যে অদ্ভুত ব্যাপার ঘ'টে চলেছে তার ওপর আলো ফেলবার জন্যে আদানুন খেয়ে আবারও কাজে লেগে-পড়া? এই যুগল রহস্য ভেদ করবার সুযোগ পেলে আমি অনেককিছুই দিয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু কেমন ক'রে, কোন সূত্র ধ'রে, এই স্বতশ্চল শকট অথবা বিদ্যুৎক্ষিপ্র তরণীর পেছনে ছুটবো আমি?

ছোটোহাজরি সেরে, পাইপটা জ্বালিয়ে, আরামকেদারায় হেলান দিয়ে ব'সে আমি অলস ভঙ্গিতে সকালবেলার খবরকাগজটা খুলেছি, ভাবছি কোন পাতায় চোখ বোলাবো। রাজনীতি আমাকে থোড়াই টানে, রিপাবলিকান আর ডেমোক্রাটদের মধ্যে এই চিরন্তন কচকচি আর ঝগড়াঝাঁটি আমাকে বড্ড বিরক্ত আর অসহিষ্ণু ক'রে তোলে। সমাজের হাই সোসাইটির কীর্তিকলাপও আমায় টানে না, খেলার পাতাতেও আমার মোটেই কৌতূহল নেই। কাজেই, শুনে নিশ্চয়ই কেউ আশ্চর্য হবে না যে, প্রথমে ঠিক করেছিলুম দেখি *গ্রেট আইরি* সম্বন্ধে নর্থ ক্যারোলাইনার কোনো খবর আছে কি না। খবরকাগজের পাতায় নতুন-কিছু থাকার আশা অবশ্য কমই, কারণ মিস্টার স্মিথ আমায় কথা দিয়েছিলেন যে নতুন-কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলেই টেলিগ্রাম ক'রে তক্ষুনি আমায় জানিয়ে দেবেন। এ নিয়ে আমার মধ্যে কোনোই সংশয় ছিলো না যে মরগ্যানটনের মেয়র তাঁর চোখকান খোলা রাখবেন—আমি নিজে যতটা সজাগ থাকতুম, ততটাই। খবরকাগজ আমায় নতুন-কিছুই বললে না। একটু পরেই সেটা আমার হাত থেকে খ'সে প'ড়ে গেলো, আমি গভীর ভাবনায় তলিয়ে গেলুম।

বারে-বারে ঘুরে-ফিরে গানের ধুয়োর মতো একটা কথাই আমার মনের মধ্যে হানা দিচ্ছিলো: মিস্টার ওয়ার্ড যে-কথাটি বলেছেন, সেই কথাটিই: ডাঙার গাড়ি আর জলের জাহাজ—দুটোই আসলে একই জিনিশ নয় তো? আর-কিছু না-ই হোক, দুটো যন্ত্রই যে একই হাতের তৈরি, তাতে হয়তো সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে দুটো এনজিনই একই রকম, একই শক্তির উৎস তাতে এমন প্রচণ্ড গতি সৃষ্টি করে, জলে বা ডাঙায় এর আগে কখনোই যার কোনো তুলনা দেখা যায়নি।

'একই আবিষ্কর্তা!' নিজেকেই আবারও আমি বোঝাবার চেষ্টা করলুম।

এ-রকম কোনো সিদ্ধান্ত করার পক্ষে যুক্তি ছিলো যথেষ্টই। দুটো যন্ত্র যে কখনোই একসঙ্গে একযোগে আবির্ভূত হয়নি, এই তথ্যটাই সিদ্ধান্তটাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিলো। আপন মনেই আমি নিজেকে শোনালুম : '*গ্রেট আইরির ঐ* রহস্যের পরই পর-পর এসে হাজির মিলাউকি আর বস্টন। এই নতুন সমস্যাটার জট খোলাও কি আগেরটার মতো এত কঠিন হবে?'

অলসভাবে ব'সে-ব'সে আমি ভাবছিলুম যে এই নতুন সমস্যাটার সঙ্গে আগেরটার কিন্তু ভারি অদ্ভুত একটা মিল রয়েছে—যেহেতু দুটোই সাধারণের জীবনহানির ক্ষমতা রাখে। সত্যি-বলতে, *গ্রেট আইরির* অগ্ন্যুৎপাতে বা ভূমিকম্পে শুধু ব্লু-রিজ অঞ্চলের অধিবাসীদেরই বিপদের সম্ভাবনা ছিলো। এদিকে এখন, মার্কিন মুলুকের প্রতিটি রাস্তা, কিংবা তার উপকূল বা বন্দর ধ'রে প্রতিটি মাইলেই দেশের মানুষ এই গাড়ি কিংবা নৌকোর আতঙ্কে ভুগছে—যে-কোনোখানে যে-কোনো সময় ফেটে পড়তে পারে বিপদ, যখন এই গাড়ি বা নৌকো তার খ্যাপা গতিকে নিয়ে বোঁ ক'রে ছুটে বেরুবে।

এটাও দেখলুম—এবং তা প্রত্যাশিতই ছিলো—যে খবরকাগজগুলো নিছক ইঙ্গিতই করেনি, বরং এই বিপদের সম্ভাবনাটাকে ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে বড়ো ক'রে দেখিয়েছে। নিরীহ নির্বিরোধী লোকেরা চিরকালই এ-সব ক্ষেত্রে ভয়ে আধমরা হ'য়ে যায়। যে-বুড়ি আমার দেখাশুনো করে, সে একে কুসংস্কারে ভোগে, তায় সহজেই সবকিছু বিশ্বাস ক'রে বসে —সে-তো এ-সব দেখেশুনে ভীষণ ঘাবড়েই গিয়েছে। সেইদিনই, খাবার সময়, টেবিল পরিষ্কার করতে-করতে সে হঠাৎ আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালে, এক হাতে জলের বোতল, অন্য হাতে একটা ট্রে, সে একটু উদ্বিগ্ন স্বরেই জিগেস করলে : 'কোনো খবর নেই, সার?'

সে কী জানতে চাচ্ছে, বুঝতে পেরেই আমি বললুম, 'না। কোনো খবর নেই।'

'ঐ ভুতুড়ে গাড়িটা আর ফিরে আসেনি?'

'না।'

'আর ঐ অলৌকিক জলযান?'

'সেই জলযানেরও কোনো পাত্তা নেই। যাদের খবর সংগ্রহের ব্যবস্থা সবচেয়ে ভালো, তাদেরও কাগজে এ-সম্বন্ধে কিছুই লেখেনি।'

'তবে- আপনাদের পুলিশের দফতরে কোনো গোপন খবর আসেনি ?'

'আমরাও একই রকম অন্ধকারে আছি।'

'তাহ'লে, সার,—কিছু মনে করবেন না—পুলিশ পুষে আর লাভ কী ?'

এমনতর প্রশ্ন আমাকে প্রায়ই শুনতে হয়, আর কখনোই আমি তার কোনো সদুত্তর দিতে পারি না।

'এবার দেখবেন কী হবে,' বুড়ির গলায় নালিশের সুর, 'একদিন ভোরবেলায় সে এসে উদয় হবে, কোনো হুঁশিয়ারি না-দিয়েই এসে হাজির হবে এই ভয়ংকর শোফেয়ার,

আমাদের রাস্তায় প্রচণ্ড বেগে চালাবে তার গাড়ি, আর আমাদের সব্বাইকে মেরে ফেলবে !'

'ভালোই তো ! তা যখন হবে তখন তাকে পাকড়াবার একটা সুযোগ পাবো আমরা !'

'তাকে, সার, আপনারা ককখনো পাকড়াতে পারবেন না।'

'কেন ?'

'কারণ, সার, সে হ'লো শয়তান স্বয়ং, খোদ *বীলজেবাব,* আর শয়তানকে আপনারা গ্রেফতার করবেন কীভাবে ?'

আমি মনে-মনে ভাবলুম, শয়তানও বিস্তর কাজে লাগে; শয়তান যদি কোথাও নাও থাকতো, আমরা তবু তাকে উদ্ভাবন ক'রে নিতুম, ব্যাখ্যাতীতকে ব্যাখ্যা করবার একটা অস্ত্র তুলে দিতুম লোকের হাতে। সে-ই ঐ লেলিহান শিখা জ্বালিয়েছিলো *গ্রেট আইরির* চূড়ায়। সে-ই উইসকনসিনে মোটররেসে পুরোনো সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিলো। সে-ই ছটফট ক'রে ঘুরে বেড়িয়েছে কানেটিকাট আর ম্যাসাচুসেট্‌সের জলে। না-হয় যারা অশিক্ষিত তাদের জন্যে একপাশে দাঁড় করিয়ে রাখা গেলো এই শয়তানকে, কিন্তু তবু মানতেই হয় আমরা সত্যিই এখন এক দুর্বোধ প্রহেলিকার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। দুটো যন্ত্রই কি তবে চিরতরে অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছে ? উল্কার বেগে ছুটে বেরিয়েছে তারা, যেন মহাশূন্যে কোনো তারা খ'সে পড়েছে; আর আগামী একশো বছরে এই রগরগে কাহিনীটা কিংবদন্তি হ'য়ে উঠবে, পরের শতাব্দীর মানুষজনের কাছে গিয়ে পৌঁছুবে দিব্বি মুখরোচক এক কেচ্ছা হিশেবে।

কয়েকদিন ধ'রেই আমেরিকা আর ইওরোপের খবরকাগজগুলো এই ব্যাপার নিয়ে বেদম মাতামাতি করলে। সম্পাদকীয় মন্তব্যের পর লেখা হ'লো আরো সম্পাদকীয়; একটা গুজবের গায়ে গিয়ে জেল্লা চড়ালো নতুন আরো-একটা গুজব। গল্প বানাতে পেরেই যাদের প্রাণের আরাম, তারা একের পর এক গল্প ফাঁদলে। দুই মহাদেশেরই জনসাধারণ বেজায় উসকে উঠেছে। ইওরোপের কতগুলো দেশে আবার হিংসে হচ্ছিলো : কেন আমেরিকাই এমন-সব চমকপ্রদ ঘটনার কেন্দ্রভূমি হ'য়ে উঠেছে। যদি এই আশ্চর্য আবিষ্কারগুলো কোনো মার্কিনের হয়, তবে মার্কিন মুলুকের সমরবাহিনী অন্য-সব দেশের তুলনায় সমরসজ্জায় অনেকটাই এগিয়ে থাকবে। মার্কিন দেশের প্রতাপ আর দেমাক তাতে যে আরো বেড়ে যাবে !

দশই জুনের তারিখ দিয়ে, নিউ-ইয়র্কের এক খবরকাগজ এই বিষয় নিয়ে অতীব সুচিন্তিত একটি প্রবন্ধ ছাপলে। সবচেয়ে দ্রুতবেগে যেতে পারে ব'লে জানা আছে এমন জলযানের সঙ্গে তুলনা করলে এই অলৌকিক জলযানের গতির—সবচেয়ে-কম কী ছিলো তার গতি; তারপর সেই সন্দর্ভ চুলচেরা যুক্তি সাজিয়ে প্রমাণ ক'রে দিলে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে যদি এই উদ্ভাবনের গোপন সূত্র থেকে থাকে, তবে ইওরোপ তার কাছ থেকে মাত্র তিন দিন দূরে থাকবে—যে-কালে মার্কিন দেশ থাকবে ইওরোপ থেকে পাঁচদিন দূরে।

যদি আমাদের নিজেদের পুলিশবাহিনী নাছোড়ভাবে *গ্রেট আইরির* রহস্যভেদ করবার চেষ্টা ক'রে থাকে, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেরই গুপ্ত বাহিনীগুলো নাছোড়ভাবে এই সমস্যার পেছনেই লেগে আছে।

যতবারই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, ততবারই মিস্টার ওয়ার্ড এই প্রসঙ্গটা পেড়েছেন। আমাদের কথাবার্তা শুরু হবে নর্থ ক্যারোলাইনায় আমার ব্যর্থতা নিয়ে টীকা-টিপ্পনী দিয়ে, আর আমি তাঁকে মনে করিয়ে দেবো যে সাফল্যটা নির্ভর করতো কত ডলার খরচ করতে পারতুম, তারই ওপর।

'ভেবো না, স্ট্রক, মিথ্যে মনখারাপ কোরো না,' বারে-বারেই সান্ত্বনা দিয়েছেন মিস্টার ওয়ার্ড, 'আমাদের ইন্‌স্‌পেক্টরের কাছে আবারও শিরোপা পাবার কত সুযোগ আসবে, বরং ঐ স্বতশ্চল শকট আর অলৌকিক জলযানের কথাই ভেবে দ্যাখো। জগতের সব ধুরন্ধর গোয়েন্দার আগেই যদি তুমি এদের রহস্য ভেদ ক'রে দিতে পারো, তাহ'লে ভেবে দ্যাখো এই দফতরের পক্ষে তা কেমন গৌরবের ব্যাপার হবে ! আর তোমারই বা গৌরব কতটা হবে !'

'সন্দেহ নেই, বিভাগের মহিমা বেড়ে যাবে,' আমিও প্রত্যুত্তর দিয়েছি, 'শুধু যদি আপনি এই সমস্যাটার জট খোলবার ভার আমার ওপর দিতেন—'

'ভবিষ্যতের গর্ভে কী-যে আছে, তা কে বলতে পারে স্ট্রক ! বরং একটু সবুর ক'রেই দেখা যাক ! একটু অপেক্ষাই করা যাক না-হয়।'

অবস্থা যখন এমনি ন-যজৌ ন-তথৌ দাঁড়িয়ে আছে, তখন পনেরোই জুনের ভোরবেলায় আমার বুড়ি দাসী হরকরার কাছ থেকে একটা চিঠি এনে দিলে আমায়, রেজিস্টারি চিঠি, আমাকে সেটা সই ক'রে রাখতে হবে। আমি প্রেরকের ঠিকানাটার দিকে তাকালুম। হাতের লেখাটা আমার একেবারেই অচেনা। ডাকটিকিটের ওপর মরগ্যানটনের ছাপ, দু-দিন আগেকার একটা তারিখ।

মরগ্যানটন ! অবশেষে তাহ'লে মিস্টার এলিয়াস স্মিথের কাছ থেকে এত্তেলা এলো !

'হ্যাঁ,' আমি আমার বুড়ি দাসীকে শুনিয়ে-শুনিয়েই বললুম, 'নিশ্চয়ই অবশেষে মিস্টার স্মিথের কাছ থেকে কোনো খবর এলো। মরগ্যানটনে তো আর-কাউকেই আমি চিনি না। আর হঠাৎ যদি তিনি আমায় চিঠি লিখে থাকেন, তবে সেটাই হবে খবর, *সংবাদ*, বাঁকা হরফে !'

'মরগ্যানটন ?' বুড়ি একটু অবাক সুরেই বললে, 'আচ্ছা, ঐখানেই তো শয়তানের সাঙ্গোপাঙ্গরা তাদের পাহাড়ে আগুন জ্বেলেছিলো, তাই না ?'

'ঠিক তাই !'

'ওহ্, সার ! আশা করি আবার আপনাকে ওখানে *ফিরে যেতে* হবে না !'

'কেন ? গেলে কী হবে ?'

'তাহ'লে যে আপনি *গ্রেট আইরির* ঐ উনুনটায় পুড়ে মরবেন ! আমি কিন্তু আপনার

অমনতর অপঘাত-মরণ চাই না।'

'আরে, অত মনখারাপ করার কী আছে ? দেখাই যাক না, হয়তো ভালো খবরই পাওয়া যাবে এই চিঠিতে।'

লেফাফাটার ওপর গালা দিয়ে মোহর-করা, আর পাশে তিনটে তারা খোদাই-করা। কাগজটা শুধু যে খুব পুরু তা-ই নয়, বেশ শক্তপোক্ত। আমি খামটা খুলে ভেতর থেকে চিঠিটা বার ক'রে নিয়ে এলুম। একটাই কাগজ, দামি, চার ভাঁজ করা, তার শুধু একদিকেই লেখা। আমি প্রথমে পত্রলেখকের স্বাক্ষরটা খুঁজলুম।

কোথাও কারু কোনো স্বাক্ষর নেই! শেষ পঙক্তির পরে শুধু কারু পুরো নামের তিনটে আদ্যক্ষর।

'চিঠিটা দেখছি মরগ্যানটনের মেয়রের কাছ থেকে আসেনি।'

'তাহ'লে কার কাছ থেকে এলো চিঠি?' বুড়ি কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে জিগেস করলে। তার কৌতূহল আর বাগ মানছে না।

তিনটে হরফের দিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে আমি বললুম, 'এই হরফগুলো দিয়ে নাম হ'তে পারে, এমন-কাউকেই আমি চিনি না। মরগ্যানটনেও নয়, অন্য-কোথাও নয়!'

হাতের লেখা স্পষ্ট, দানাদার। সবশুদ্ধু কুড়ি লাইনও হবে কি না সন্দেহ। এই রইলো চিঠিটা, ভাগ্যিশ কী ভেবে তখন আমি তার একটা নকল রেখেছিলুম। আমাকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে চিঠিটার নাম/তারিখ আমাকে জানালে যে সে এসেছে ঐ রহস্যময় *গ্রে টু আইরি* থেকে :

গ্রেট আইরি, ব্লু-রিজ মাউন্টেন্‌স
নর্থ ক্যারোলাইনা; জুন ১৩

মিস্টার স্ট্রক বরাবরেষু
চীফ ইন্‌স্‌পেক্টর অভ পুলিশ
৩৪ লং স্ট্রিট, ওয়াশিংটন, ডি. সি.

সবিনয় নিবেদন :

আপনার উপর *গ্রেট আইরির* রহস্য ভেদ করিবার দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল।

আপনি ২৮শে এপ্রিল পাহাড়ে আসিয়াছিলেন, সঙ্গে ছিলেন মরগ্যানটনের মেয়র এবং দুইজন পথপ্রদর্শক।

আপনি দেয়ালটির পাদদেশ অব্দি আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার ব্যাস ঘিরিয়া একবার পাকও খাইয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন যে ইহা অত্যন্ত উঁচু এবং এতই খাড়াই যে ইহার চূড়ায় চড়া একেবারেই অসম্ভব।

আপনারা তন্নতন্ন করিয়া হাৎড়াইয়া দেখিয়াছিলেন কোথাও কোনো

খাঁজ বা ফাটল আছে কি না—থাকিলে হয়তো উপরে উঠা যাইবে। কিন্তু আপনারা ঐ-রূপ কোনোকিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

জানিয়া রাখুন : গ্রেট আইরিতে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই; যদি কেহ তবুও দৈবাৎ, তাহার ভিতর ঢোকে, তবে সে আর-কখনও ফিরিয়া আসে না।

কখনও আর এইরূপ চেষ্টা করিবেন না, কেননা দ্বিতীয় বারের বেলায় প্রথম বারের মতো ফল হইবে না—বরং আপনার পক্ষে ফলাফল রীতিমতো মারাত্মক হইবে।

এই সতর্কবার্তা অগ্রাহ্য করিবেন না, নতুবা আপনার কপালে বিশেষ দুর্ভোগ আছে।

আবারও : *সাবধান* !

মা. অ. ও.

৭

তিন নম্বর যন্ত্র

কবুল করতেই হয় যে চিঠিটা প'ড়ে গোড়ায় আমি একেবারেই বোমকে গিয়েছিলুম। আপনা থেকেই আমার মুখ ফুটে বেরিয়ে আসছিলো *উঃ* আর *আঃ*। বুড়ি দাসী আমার হাবভাব দেখে ফ্যালফ্যাল ক'রে আমার দিকে তাকিয়েছিলো, কী-যে ভাববে কিছুই বুঝতে পারছিলো না।

'অ্যাঁ, সার? কোনো খারাপ খবর নাকি?'

আমি উত্তরে—কারণ সেই ছেলেবেলা থেকেই আমি তার কাছে কোনোকিছু গোপন করিনি—চিঠিটা তাকে আদ্যোপান্ত, *আগাপাশতলা*, প'ড়ে শোনালাম। শুনতে-শুনতে উৎকণ্ঠায় তার প্রায় ভির্মি খাবার জোগাড়।

'ঠাট্টা করেছে নিশ্চয়ই কেউ,' আমি একটু অস্বস্তির সঙ্গে শুধু আমার কাঁধ ঝাঁকালুম।

'তা,' আমার কুসংস্কারে-ভরা পরিচারিকা বললে, 'এ যদি খোদ শয়তানের কাছ থেকে নাও এসে থাকে, শয়তানের মুলুক থেকে তো এসেছে!'

বুড়ি হাতের কাজ সামলাতে চ'লে যেতেই, আমি আবারও এই অপ্রত্যাশিত চিঠিটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প'ড়ে নিলুম। ভেবে-টেবে মনে হ'লো কেউ নিশ্চয়ই আমার

সঙ্গে ইয়ার্কি ক'রে আমাকে ভড়কে দিতে চেয়েছে। আমি যে *গ্রেট আইরি* গিয়েছিলুম, অভিযানে, সে-কথা তো সব্বাই জানে। খবরকাগজগুলোয় তার বিশদ বিবরণ বেরিয়েছে। কোনো রসিক ব্যক্তি—এমনকী মার্কিন মুলুকেও এমনতর রসিক আছে কয়েকজন—নিশ্চয়ই আমাকে বিদ্রূপ ক'রে এই হুমকিভরা চিঠিটা পাঠিয়েছে।

আইরি যে সত্যি-সত্যি একদল দুর্বৃত্তের গোপন আস্তানা হ'য়ে পড়েছে, তা কেমন যেন অবিশ্বাস্য ব'লে মনে হয়, পুলিশ তাদের গোপন ডেরাটা খুঁজে বার ক'রে ফেলবে, এইই যদি তাদের আশঙ্কা হ'য়ে থাকে, তবে তারা নিশ্চয়ই যেচে সাধ ক'রে নিজেদের দিকে এভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইবে না। তাদের নিরাপত্তা ততদিনই অটুট থাকবে, যতদিন তাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে কেউ কিছু জানবে না। তারা নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পারবে যে এভাবে হুমকি দিয়ে নিজেদের জানান দিয়ে—নিজেদের জাহির ক'রে—তারা গোটা পুলিশবাহিনীকেই তাতিয়ে দেবে—আবার তাদের *আইরিতে* ডেকে আনবে। ডায়নামাইট বা মেলিনাইট অনায়াসেই তাদের দুর্গে ঢোকবার রাস্তা তৈরি ক'রে দেবে। তাছাড়া, তারা নিজেরাই বা কেমন ক'রে *আইরির* ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে—যদি-না *আইরিতে* যাবার এমন-কোনো গোপন রাস্তা থেকে থাকে যেটা আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে ? নিশ্চয়ই এটা কোনো ভাঁড় না-হয় পাগলের কীর্তি : এই শাসানিতে আমার মাথা ঘামাবার কিছু নেই—এটা নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাববারই কিছু নেই—না-হ'লে এই ভাঁড়কে বড্ড-বেশি আশকারা দেয়া হবে।

কাজেই, যদিও একবার আমি ভেবেছিলুম মিস্টার ওয়ার্ডকে গিয়ে চিঠিটা দেখিয়ে আসি, আমি ঠিক করলুম, না, এ নিয়ে আর-কোনো উচ্চবাচ্যই নয়। তিনি নিশ্চয়ই এই হুমকিটাকে কোনো পাত্তাই দেবেন না। তবে আমি অবশ্য চিঠিটা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিইনি, বরং সযত্নে আমার ডেস্কে চাবি বন্ধ ক'রে রেখে দিয়েছি। যদি এই একই *মা. অ. ও.* আদ্যক্ষর সমেত আরো এই ধরনের হুমকি আসে, তখন না-হয় এ-চিঠি নিয়ে আবার ভাবা যাবে।

বেশ শান্তভাবেই কেটে গেছে কয়েকদিন। শিগগির যে আমায় ওয়াশিংটন ছেড়ে বুনো হাঁসের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হবে, এমন-কোনো সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছিলুম না। তবে আমি যে-ধরনের কাজ করি তাতে পরের দিন যে কী হবে, তা কেউই আগে থেকে বলতে পারে না। যে-কোনো মুহূর্তে আমাকে তলব ক'রে বলা হ'তে পারে, ওহে স্ট্রক, অরেগন থেকে ফ্লরিডা ছোটাছুটি ক'রে মরো, ধেয়ে যাও মাইন থেকে টেক্সাস। আর এই অস্বস্তিটা খচখচ ক'রে বেঁধে সারাক্ষণ : আমার হাতে যে-নতুন কাজের দায়িত্ব দেয়া হবে, তা যদি *গ্রেট আইরির* অভিযানটার মতোই ব্যর্থ হয়, তাহ'লে আমার বোধহয় দফতরে ফিরে গিয়ে মাথা নিচু ক'রে ইস্তফাই দিয়ে আসতে হবে। রহস্যময় শোফেয়ার সম্বন্ধে আর-কোনো খবরই নেই। জানতুম যে আমাদের সরকার—অন্যান্য বিদেশী দেশের সরকারও—আমেরিকার জলে-ডাঙায় সারাক্ষণ কড়া নজর রেখে চলেছে। অবশ্য এটা ঠিক আমাদের এই মার্কিন মুলুক এতই বিশাল-একটা দেশ যে তার সর্বত্র সবসময় সজাগ

পাহারা রাখা সম্ভব নয়; কিন্তু এই যুগল আবিষ্কর্তা এর আগে তো তাদের বাহাদুরি দেখাবার জন্যে কোনো জনমানবশূন্য ফাঁকা এলাকা বেছে নেয়নি, বরং বাহ্‌বা পাবার জন্যে এমন-সব জায়গায় আবির্ভূত হয়েছে যেগুলো খুবই জনবহুল। শুধু তা-ই নয়, একটা বহুবিজ্ঞাপিত রেসের দিনে সে এসে হাজির উইসকনসিনের রাস্তায়, সবসময় যেখানে হাজার জলযান চলে সেখানে, বস্টনে, আবির্ভাব হয়েছে তার জলযান নিয়ে! একে মোটেই আত্মগোপন ক'রে থাকবার ব্যাকুল চেষ্টা ব'লে বর্ণনা করা যায় না। ঐ দুঃসাহসী বেপরোয়া চালকটির যদি সলিল সমাধি না-হ'য়ে থাকে—তার ডুবে-মরার সম্ভাবনাটা আদৌ অস্বীকার করা যায় না—তাহ'লে সে হয়তো মার্কিন মুলুক ছেড়েই চ'লে গিয়েছে। হয়তো অলৌকিক জলযানটি এখন ইওরোপের জলে তোলপাড় তুলে ছুটে বেড়াচ্ছে, আর নয় তো গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে কোনো গোপন আস্তানায় । আর, সেক্ষেত্রে—

'আহ্‌!' বারে-বারে এই একটা কথাই আমি শোনালুম নিজেকে। 'এ-রকম কোনো আশ্রয়, যদি এই বাহাদুর উদ্ভাবক চায়, যেটা যুগপৎ গোপন এবং অগম্য, তাহ'লে *গ্রেট আইরির* চেয়ে ভালো আর-কোন জায়গা সে পাবে!' কিন্তু কোনো জলযান সেখানে যাবে কী ক'রে, আর কোনো মোটরগাড়িই বা কী ক'রে বেয়ে উঠবে পাহাড়ের ঢাল! শুধু সেইসব শিকারি পাখি, যারা মহাশূন্যে পাক খায়, ঈগল কিংবা কণ্ডর, তারাই সেখানে আশ্রয় পেতে পারে।

উনিশে জুন আমি আমার দফতরে যাবো ব'লে বেরিয়েছি, রাস্তায় দেখি দুটি অচেনা লোক কি-রকম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। লোকগুলোকে আদপেই চিনি না ব'লে গোড়ায় আমি ব্যাপারটা খেয়াল করিনি। সত্যি-বলতে, আমি তাদের কোনো পাত্তাই দিতুম না, যদি-না বাড়ি ফিরে-আসার পর আমার বুড়ি দাসী এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতো।

কয়েকদিন ধ'রেই নাকি—সে খেয়াল করেছে—এই দুটো লোক রাস্তায় আমার ওপর কড়া নজর রেখে চলেছে। সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছে—আমার বাড়ি থেকে একশো পা দূরে হবে কি না সন্দেহ, এমন জায়গায়, প্রকাশ্যে; আর তার অনুমান : আমি যেখানেই যাই তারা বোধহয় ছায়ার মতো আমার পেছনে এঁটে থাকে, আমাকে সর্বত্র অনুসরণ করে।

'এটা তুমি ঠিক জানো?' আমি জানতে চেয়েছি।

'হ্যাঁ, সার; এই-তো কালকেই, আপনি যখন বাড়ি ফিরে এলেন, লোকগুলো পায়ে-পায়ে ঠিক আপনার পেছন-পেছন এলো, একেবারে দরজা অব্দি, তারপর ভেতরে ঢুকে আপনি যেই দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন, অমনি তারা চটপট কেটে পড়লো।'

'নিশ্চয়ই তোমার বোঝবার কোনো ভুল হয়েছে?'

'মোটেই না।'

'লোক দুটোকে আবার দেখতে পেলে তুমি চিনতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'বেশ,' আমি হেসে ফেলেছি, 'দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যেও গোয়েন্দা হবার

মতো মালমশলা আছে। আমাদের দফতরেই তোমাকে একটা কাজ দেবার সুপারিশ করবো।'

'বেশ, যত-ইচ্ছে ঠাট্টা করুন। তবে আমার চোখ-দুটোয় এখনও ছানি প'ড়ে যায়নি—লোককে দেখে চেনবার জন্যে এখনও আমার কোনো চশমা লাগে না। কেউ-একজন যে আপনার ওপর সারাক্ষণ নজর রেখে চলেছে, এ-বিষয়ে আমার কোনোই সন্দেহ নেই। আপনার বরং উচিত হবে এরা কে তা জানবার জন্যে এদের পেছনে পুলিশের লোক লেলিয়ে দেয়া।'

'ঠিক আছে, তা-ই করবো না-হয়,' তাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে আমি বলেছি। 'আর আমাদের লোক যখন ছিনে জোঁকের মতো তাদের এঁটে বসবে, তখনই আমরা বুঝতে পারবো এই রহস্যময় লোকেরা আমার কাছে কী চায়।'

সত্যি-বলতে, আমি তার আশঙ্কা বা উত্তেজনাটাকে খুব-একটা পাত্তা দিইনি। তবু, তার মন রাখার জন্যে, বলেছি, 'এবার বাইরে গেলে আমার আশপাশে কারা আছে, সেটা ভালো ক'রে লক্ষ ক'রে দেখবো।'

'তা-ই সবচেয়ে ভালো হবে, সার।'

আমার এই বুড়ি দাসী অকারণেই নিজেকে সবসময় ভয় পাইয়ে দেয়; সে বলেছে, 'আবার যদি তাদের আমি দেখতে পাই, আপনি বাড়ির বাইরে বেরুবার আগে আপনাকে আমি তাদের কথা জানিয়ে দেবো।'

'ঠিক আছে! রাজি।' এই ব'লে এই আলোচনাটায় আমি ইতি টেনে দিয়েছি। কারণ, জানাই ছিলো, তাকে যদি এ নিয়ে আরো-কিছু বলতে দিই তো সে শেষটায় খোদ *বীলজেবাবকে* না-হোক তার দক্ষিণ হস্তটিকে আমার পেছনে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে।

পরের দু-দিন অন্তত কেউই আমার ওপর নজর রাখেনি—বেরুবার সময়েও না, ফেরবার সময়ও না। কাজেই আমি ধ'রে নিয়েছি যে আমার বুড়ি দাসী আবারও কিছুই-না থেকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে একটা *গন্ধগোকুলের ঢিবি* তৈরি ক'রে বসেছে। কিন্তু বাইশে জুনের সকালবেলায় হুড়মুড় ক'রে হাঁফাতে-হাঁফাতে সে ছুটে এসেছে ওপরতলায়, আমার ঘরে দুম ক'রে ঢুকে প'ড়ে উত্তেজনায় খাবি খেতে-খেতে বলেছে: 'সার! সার!'

'কী?'

'আবার তারা এসে হাজির হয়েছে!'

'কারা?'

'ঐ দুই খোচর—নাছোড়বান্দার মতো!'

'দুই খোচর!' অ্যাদ্দিন ধ'রে সে যে-কাহনটা ফাঁদছিলো আমি সেটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলুম।

'ঐ তারাই! রাস্তায়! ঠিক আমাদের জানলার সামনে! বাড়িটার ওপর নজর রাখছে, খেয়াল রাখছে কখন আপনি বাড়ি থেকে বেরোন।'

আমি জানলার কাছে গিয়ে খড়খড়িটা একটু ফাঁক ক'রে—বেশি তুলিনি, কারণ সত্যি

কেউ যদি নজর রেখে থাকে তবে তার মনে উটকো সন্দেহ ঢুকে যেতে পারে—আমি দেখতে পেলুম, সাইডওয়াকে, ফুটপাথে, দুটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। বেশ ভালো দেখতে তাদের, স্বাস্থ্যবান, চওড়া-কাঁধ, প্রাণের প্রাচুর্যে যেন টগবগই করছে, বয়েস দুজনেরই চল্লিশের নিচে, পরনে হালফ্যাশানের পোশাক, চোখ অব্দি টেনে নামানো টুপি, ভারি পশমের কোট-পাৎলুন, মজবুত বুটজুতো, হাতে ছড়ি। না, কোনো সন্দেহই আর নেই, এরা সারাক্ষণ আমার বাড়ির ওপরই নজর রেখে চলেছে—আমার বাড়িতে যেহেতু কোনো দারোয়ান নেই তাতে তাদের সুবিধেই হয়েছে। তারপর, নিজেদের মধ্যে কী-সব বলাবলি ক'রে, তারা পায়চারি করতে-করতে একটু দূরে চ'লে গেলো—এবং ফিরে এলো আবার, ঠিক জানলার নিচে।

'তুমি ঠিক চিনতে পেরেছো এদের? এরাই সেই লোক, যারা আগেও নজর রেখেছিলো?'

'হ্যাঁ, সার।'

না, বেঘোর-বিভ্রম ব'লে আর ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেয়া চলে না। ঠিক করলুম, একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলবো। আমি নিজেই যে তাদের অনুসরণ করবো, তা হয় না, কারণ আমি নিশ্চয়ই তাদের কাছে অতি-পরিচিত। সরাসরি গিয়ে তাদের সঙ্গে কিছু ব'লেও ঠিক কোনো ফায়দা হবে না। কিন্তু আজই, সম্ভব হ'লে এক্ষুনি, আমাদের দফতরের একজন সেরা গোয়েন্দাকে আমার বাড়িটাকে পাহারা দিতে বলতে হবে। যদি তারা কালকেও আবার এসে হাজির হয়, তবে তাদের পেছন নিয়ে গিয়ে তাদের আস্তানাটা দেখে আসতে হবে—যতক্ষণ-না জানা যাচ্ছে এরা কে, বা কারা, ততক্ষণ এদের ওপর থেকে নজর সরানো চলবে না।

এখন কি তারা অপেক্ষা ক'রে আছে জানতে, কখন আমি দফতরে যাই? কারণ, যেমন রোজই যাই, আজও তো সেখানেই যাবো আমি। যদি তারা আমার সঙ্গ নেয় তবে তাদের আমার আতিথ্য গ্রহণ করতে আমন্ত্রণও জানাতে পারি, যদিও সেজন্যে তারা আমায় কোনো ধন্যবাদ দেবে না।

আমার টুপিটা তুলে নিলুম আমি; বুড়ি দাসী সমানে জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে; আমি নিচে নেমে, দরজা খুলে, রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম।

লোক দুটো সেখানে আর নেই।

সারাক্ষণ সজাগ থেকেও সেদিন আমি রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার সময় তাদের টুপির ডগাটিও আর দেখতে পাইনি। সেইদিন থেকে আমার বুড়ি দাসী, অথবা আমি, কেউই তাদের আর বাড়ির সামনে দেখতে পাইনি, অন্য-কোনোখানেও তাদের সঙ্গে আমার আর-কোনো মোলাকাৎ হয়নি। তাদের চেহারাছিরি অবিশ্যি আমার স্মৃতিতে গাঁথা হ'য়ে গিয়েছিলো। এদের আমি কোনোদিনই ভুলবো না।

তাদের নজরদারির লক্ষ্য আমিই ছিলুম, এটা ধ'রে নিয়েও হয়তো বলা যায় যে এরা ঠিক আমার পরিচয় জেনে নিতে পারেনি—অর্থাৎ আমায় শনাক্ত করতে পারেনি।

একবার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে তারা এখন আর আমার পেছনে ছায়ার মতো লেগে নেই। কাজেই শেষটায় আমার মনে হ'লো *মা. অ. ও.*-র চিঠিটা যেমন, এও বোধকরি তেমনি-কোনো ব্যাপার : গুরুত্বহীন, এলেবেলে।

তারপর, চব্বিশে জুন, এমন-একটা নতুন ঘটনা ঘটলো যে তাতে আগেকার অলৌকিক জলযান বা স্বতশ্চল শকটের মতোই এই নতুন ঘটনায় জনসাধারণের এবং আমার কৌতূহল বেজায় উসকে উঠলো। *ওয়াশিংটন ইভনিংস্টার* নিচের বিবরণটি দিয়ে হুলুস্থুলু বাধিয়ে দিলে সবখানে, আর পরদিন ভোরে সবগুলো কাগজেই সেই বিবরণ বিশদভাবে বেরুলো।

> টোপেকা থেকে চল্লিশ মাইল পশ্চিমে, ক্যানসাস-এ কিরডাল নামে একটা হ্রদ আছে, যার কথা খুব বেশি লোকের জানা নেই। অথচ এই হ্রদটার কথা সকলেরই জানা উচিত ছিলো, এবং আশা করা যায় সবাই এখন থেকে লেক কিরডাল সম্বন্ধে আগ্রহী হবে—কেননা একটি ভারি অদ্ভুত ঘটনার ফলে এর দিকে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে।
>
> চারপাশে দুর্গম পাহাড়, মাঝখানে এই হ্রদ, সেখান থেকে জল বেরুবার কোনো রাস্তাই বোধহয় নেই। মেঘ হ'য়ে, বাষ্প হ'য়ে যা উবে যায়, তাকেই পূরণ ক'রে দেয় আশপাশের ছোটো-ছোটো পাহাড়ি সোঁতা আর বর্ষার মুষলধারে বৃষ্টি।
>
> লেক কিরডাল প্রায় পঁচাত্তর বর্গমাইল আয়তনে, আর যে-পাহাড়গুলো তাকে ঘিরে আছে তার চাইতে তার উপরিতল অল্প-একটু নিচে। পাহাড়ের মধ্যে বন্দী, সেখানে পৌঁছুতে গেলে পেরুতে হয় সংকীর্ণ ও উপলবন্ধুর কতগুলো নয়ানজুলি। তার তীরগুলোয় অবশ্য কতগুলো ছোটো-ছোটো পাড়াগাঁ গজিয়ে উঠেছে। হ্রদে অজস্র মাছ আছে, জেলেডিঙিগুলো সারাক্ষণই ঘুরে বেড়ায় হ্রদের জলে।
>
> কোনো-কোনো জায়গায় লেক কিরডাল পঞ্চাশ ফিট গভীর, তাও তীরের আশপাশেই। এই বিশাল অববাহিকার ধারে-ধারে উঠে গিয়েছে তীক্ষ্ণ, ধারালো পাথর। জোরে যখন হাওয়া দেয়, ঢেউগুলো খ্যাপার মতো তীরে আছড়ায়, কাছাকাছি যে-সব বাড়ি থাকে, তাতে পিচকিরির মতো জল ঝ'রে পড়ে, কখনও প্রায় হারিকেনের মতোই তীব্র। লেকটা তীরের কাছেই জায়গায়-জায়গায় বেশ গভীর, মাঝখানটা আরো-গভীর, সেখানে কোথাও-কোথাও মেপে দেখা গেছে যে সেখানে তিনশো ফিটেরও বেশি জল আছে।
>
> এখানকার মাছের ব্যাবসা বেশ কয়েক হাজার লোকেরই জীবিকা-নির্বাহের উপায়, শুধু-যে কয়েকশো জেলেডিঙিই আছে সেখানে তা

নয়, গোটা বারো ছোটো-ছোটো স্টীমারও রয়েছে ধীবরদের সাহায্যের জন্যে। পাহাড়ের গণ্ডিটা পেরিয়ে গেলে পৌঁছুনো যায় রেলের রাস্তায়, যেখান থেকে মাছ চালান হয় গোটা ক্যানসাস রাজ্যে, ও আশপাশের রাজ্যেও।

আমরা যে-চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ দিতে বসেছি, সেটা বোঝবার জন্যে লেক কিরডালের এই পরিচয় মনে-ক'রে-রাখা খুবই জরুরি।

কিছুকাল ধ'রে, জেলেরা লক্ষ করছে লেকের জলে মাঝে-মাঝেই তুমুল আলোড়ন উঠছে। কখনও জল এতটাই ফেনিয়ে ফুলে ওঠে যে মনে হয় কিছু-একটা যেন ভেতর থেকে গা ঝাড়া দিয়ে সবেগে উঠে আসতে চাচ্ছে। এমনকী আবহাওয়া যখন অতীব প্রশান্ত, যখন কোথাও কোনো হাওয়ার রেশমাত্র নেই, তখনও মাঝে-মাঝে ফেনিয়ে চর্কি দিয়ে জল স্তম্ভের মতো উঠে আসে।

প্রচণ্ড ঢেউ আর ব্যাখ্যাতীত সব চোরাস্রোতের পাল্লায় প'ড়ে, কোনো-কোনো জেলেডিঙি পাগলের মতো আছড়ায় জলে, আয়ত্তের বাইরে চ'লে যায়। কখনও একটার গায়ে আরেকটা এসে প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ে, ধাক্কা খায়, তার ফলে অনেক নৌকোরই সমূহ ক্ষতি হয়েছে, এই ক-দিনে।

জলের এই দুর্দম আলোড়নের স্পষ্টতই কোনো উৎস আছে এই লেকের গভীরে ; ব্যাপারটা বোঝাবার জন্যে অনেকরকম ব্যাখ্যা দেবারই চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমে, এ-রকম একটা মত শোনা গিয়েছিলো যে, এই উৎপাতের মূল কারণ হয় জলের তলায় কোনো ভূকম্পন অথবা কোনো আগ্নেয়গিরির আড়মোড়া ভাঙা। কিন্তু এই অনুমানটিকে এই জন্যেই বাতিল করতে হয়েছে যে জলের এই আলোড়ন কোনো-একটা বিশেষ জায়গাতেই সীমাবদ্ধ নয়, যখন-তখন যে-কোনোখানে, সারা হ্রদেই, এই জলস্তম্ভ ফিনকি দিয়ে উঠে যেতে পারে। এই তীরে, ঐ তীরে, মাঝখানে কিংবা পাড় ঘেঁসে, প্রায় একটা সরলরেখায় এই জলস্তম্ভ ছুটে চলে—আর তাইতে ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির কথাটা পুরোপুরি বাতিল ক'রে দিতে হয়েছে।

আরো-একটা অনুমান একসময় বেশ চলেছিলো, লোকে ভেবেছিলো বুঝি কোনো অতিকায় জলরাক্ষস এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছে, সে-ই জলের মধ্যে এমন অস্থির আলোড়ন তোলে। কিন্তু জন্তুটি যদি এই হ্রদে জ'ন্মে না-থাকে, এবং এই হ্রদেই যদি সে এমন অতিকায় আকার না-নিয়ে থাকে, যেটা বোধকরি আদৌ বিশ্বাস্য নয়—তাহ'লে সে নিশ্চয়ই বাইরে থেকে একদিন এখানে এসে হাজির হয়েছে। লেক

কিরডালের সঙ্গে, আবারও মনে করিয়ে দিই, অন্য-কোনো জলাশয়ের কোনো যোগাযোগই নেই। লেকটা যদি কোনো সমুদ্রের ধারে অবস্থিত হ'তো, হয়তো জলের তলায় গভীর-গোপন খাল থাকতে পারতো; কিন্তু মার্কিন মুলুকের একেবারে মাঝখানে, সমুদ্রতল থেকে কয়েক হাজার ফিট ওপরে, এ-রকম কিছুই হ'তে পারে না। অর্থাৎ, এটা এমনই-একটি ধাঁধা যার উত্তরটা কারুই জানা নেই; এই হিংটিংছট হেঁয়ালিটির কী-কী যে সুষ্ঠু সমাধান নয়, তা বলা যতখানি সহজ, এর সত্যিকার মীমাংসাটা যে কীসে, সেটা বলা তার চেয়ে শতগুণে কঠিন।

এমন কি সম্ভব যে লেকের জলের তলায় কেউ কোনো ডুবোজাহাজ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে? ডুবোজাহাজ তো আজ আর কল্পনার সামগ্রী নয়, অসম্ভবও নয়। কাপ্তেন নেমোর *নটিলাস*-এর কথা বাদ দিলেও, এটা নিশ্চয়ই অনেকে জানেন যে কয়েক বছর আগে কানেটিকাটের ব্রিজপোর্টে *দ্য প্রোটেক্টর* নামে একটা জাহাজ ভাসানো হয়েছিলো, সেটা জলের ওপর দিয়ে যেমন যেতে পারতো, জলের তলাতেও তেমনি সে অবাধে আনাগোনা করতে পারতো, এমনকী সেটা ছিলো উভচর—ডাঙার ওপর দিয়েও চলাফেরা করার ক্ষমতা তার ছিলো। লেক নামক এক বৈজ্ঞানিক এই *প্রোটেক্টর*-এর উদ্ভাবন করেছিলেন, তার ছিলো দুটি মোটর, যেটা বিদ্যুতে চলতো সেটা ছিলো পঁচাত্তর অশ্বশক্তির, আর যেটা গ্যাসোলিনে অর্থাৎ পেট্রলে চলতো সেটা ছিলো আড়াইশো অশ্বশক্তির, তার আবার একগজ বেড়ের চাকাও ছিলো একাধিক, যার সাহায্যে সে ডাঙার ওপর দিয়ে গড়গড় ক'রে চ'লে যেতে পারতো—সমুদ্রেও সাঁৎরে যেতে পারতো।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও, যদি ধ'রেই নেয়া যায় যে লেক কিরডালে জলস্তম্ভ ওঠায় কোনো শক্তিশালী ডুবোজাহাজ, আগেরগুলোর চাইতে যেটা আরো-নিখুঁত, তবু এই ধাঁধাটা থেকেই যায় : এই ডুবোজাহাজ লেক কিরডালে এসে পৌঁছুলো কী ক'রে। পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই হ্রদ কোনো জলরাক্ষসের কাছে যেমন, কোনো ডুবোজাহাজের কাছেও তেমনি অগম্য।

যেভাবেই এই হেঁয়ালিটির সমাধান হোক না কেন, এই অত্যদ্ভুত ব্যাপারটির সত্যতা সম্বন্ধে বিশে জুনের পর থেকে আর-কোনো সন্দেহ নেই। সেদিন, অপরাহ্নে, স্কুনার *মার্কেল* সব পাল খাটিয়ে তরতর ক'রে ভেসে যাচ্ছিলো, হঠাৎ সে জলের তলায় কিসের সঙ্গে যেন প্রচণ্ড ধাক্কা খায়, সেখানে কাছাকাছি কোনো ডুবোপাহাড়, বা পাথর, ছিলো না—কেননা হ্রদটা সেখানে ছিলো অন্তত নব্বুই ফিট গভীর। স্কুনারটির গলুই

এবং পাশ ভয়ংকর চোট খেয়ে জখম হ'য়ে যায়, প্রায় ডুবেই যাচ্ছিলো। তার ডেকগুলো সম্পূর্ণ ডুবে যাবার আগে সে কোনোমতে ধুঁকতে-ধুঁকতে তীরে এসে পৌঁছুতে পেরেছিলো।

যখন পাম্প ক'রে জল সরিয়ে *মার্কেলকে* ডাঙায় তোলা হয়, পরীক্ষা ক'রে দেখা যায় যে কোনো চোখা ধারালো কিছুর সঙ্গে ঘা খেয়ে তার গলুইটা একেবারেই ভেঙে গিয়েছে।

এ থেকে বোঝা যায় যে লেক কিরডালের জলের তলায় সত্যিই কোনো পরম শক্তিশালী ডুবোজাহাজ অত্যন্ত দ্রুতবেগে ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়।

এটা অবশ্য সত্যিই ব্যাখ্যার অগম্য। শুধু-যে এই ধাঁধাটার কোনো উত্তর নেই—ডুবোজাহাজটা সেখানে গেলো কী ক'রে, তা-ই নয়, এটাও একটা বড়ো প্রশ্ন : ঐ ডুবোজাহাজ লেক কিরডালের জলের তলায় কী করছে? কেন সে কখনও জলের ওপর ভেসে ওঠে না? কেন তার উদ্ভাবক বা মালিক এ-রকমভাবে আত্মগোপন ক'রে আছে? তার এই উদ্দাম ছোটাছুটির জন্যে আরো-কত বিপর্যয় বা সর্বনাশ আমরা প্রত্যাশা করবো?

সেদিন ছিলো একটা রহস্যময় স্বতশ্চল শকট, তারপর এলো রহস্যময় জলযান। এখন এসে হাজির এক রহস্যময় ডুবোজাহাজ—যেন *নটিলাসেরই* দোসর।

আমরা কি তবে এই সিদ্ধান্ত করবো যে তিনটি এনজিনই একই উদ্ভাবকের দুর্দান্ত প্রতিভার পরিচায়ক? এও কি হ'তে পারে এই তিনই আসলে একটিই যান—একে-তিন-তিনে-এক সর্বত্রগামী অসীম শক্তিশালী কোনো শকট?

৮

যেমন ক'রেই হোক

ইভনিং স্টার-এর ইঙ্গিতটা প্রায় যেন কোনো উদ্ভাস, যেন কোনো দিব্যদৃষ্টির ফল। সকলেরই সেটা মনে ধ'রে গেলো। এই তিনটি যন্ত্র যে একই উদ্ভাবকের প্রতিভার ফসল তা-ই নয়, তিনটি যন্ত্রই আসলে এক—ভিন্ন-ভিন্ন কোনো যান নয়। ডাঙায় যেটা চলে,

সেটা জলের ওপরেও ভাসে, আবার জলের তলা দিয়েও চ'লে যায়—একে-তিন-তিনে-এক—কিন্তু কেমন ক'রে যে একটি যান থেকে তার অন্য যানে রূপান্তর হয়, সেটা অবশ্য সহজে বোঝা যায় না। কেমন ক'রে একটা মোটরগাড়ি জাহাজ হ'য়ে যায় ? তারপর সেটা, আবার, ডুবোজাহাজ ? এই চমকপ্রদ যান যেন একটা জিনিশই করতে পারে না—এখনও জানে না কী ক'রে আকাশপথে উড়ে যেতে হয়! তবে এই তিনটি যান সম্বন্ধে এখন অনেক তথ্যই জানা : কী তাদের আকৃতি, কেমন গড়ন, তাদের চলার পথে না-থাকে গন্ধ না-থাকে বাষ্পজনিত কোনো ধোঁয়া, আর তাদের ঐ সব-হার-মানানো চমকপ্রদ দুর্ধর্ষ গতি—এই সমস্তকিছু জুড়ে দিয়েই এখন তাদের শনাক্ত করা গেছে একই যান ব'লে। জনসাধারণ পর-পর এত-সমস্ত আশ্চর্যের বাহার দেখে কেমন যেন থম মেরে গিয়েছিলো, এবার এই অভিনব আশ্চর্যটি আবার তাদের কৌতূহল উসকে দিলে।

খবরকাগজগুলো *এখন* কেবলই এই আশ্চর্য উদ্ভাবনের গুরুত্ব সাতখানা ক'রে ব্যাখ্যানা করছে। এই নতুন এনজিন, তা সে একটা যানের মধ্যেই পোরা থাক অথবা তিনটে ভিন্ন-ভিন্ন যানে, অনায়াসেই বুঝিয়ে দিতে পেরেছে তার কেরামতি। তাক লাগিয়ে দেবার মতোই ক্ষমতা ধরে এই এনজিন। যে-কোনো দামে, যে-ক'রেই-হোক, *যেন-তেন-প্রকারেণ*, কিনে নিতে হবে একে, দখল ক'রে নিতে হবে! সারা জাতির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের উচিত এক্ষুনি এই এনজিনটা কিনে নেয়া। সন্দেহ নেই, ইওরোপের হাম্বড়া শক্তিগুলোও যে-কোনো-প্রকারে এই যন্ত্রটাকে হাতিয়ে নিতে চাইবে—সামরিক শক্তির কথা বিবেচনা করলে এই যন্ত্রের দারুণ সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করবে কে ? জলে-ডাঙায় কী প্রচণ্ড শক্তি পাবে, যদি কোনো রাষ্ট্র এই এনজিনটা কিনে নিতে পারে। এর গুণপনাই বা কী, সীমাবদ্ধতাই বা কী—এ-সব জানা না-গেলে এর বিধ্বংসী ক্ষমতা অবশ্য পুরোপুরি আঁচ করা যাবে না। এর গুপ্তরহস্যটা যদি জানা যায়, তবে কুবেরের ভাণ্ডারও উজাড় ক'রে দেয়া যায় : আমেরিকা তার কোটি-কোটি ডলার এর চেয়ে ভালো আর-কীসের জন্যে খরচ করতে পারতো ?

কিন্তু যন্ত্রটা কিনে নিতে হ'লে যে তার উদ্ভাবকের সন্ধান পাওয়া চাই! আর সেটাই তো দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ। খামকাই লেক কিরডালের জল তোলপাড় ক'রে এই কিনার থেকে সেই কিনার অব্দি খোঁজা হ'লো। এমনকী সবখানে জলের গভীরতাও তন্নতন্ন ক'রে মেপে দেখা হ'লো। উঁহু, উদ্ভাবকের কোনো খোঁজ নেই—সে তার যন্ত্রটা নিয়ে বেমালুম যেন হাওয়ায় উবে গিয়েছে। তবে কি ধ'রে নিতে হবে ডুবোজাহাজটা আর ঐ জলে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে নেই? কিন্তু তা যদি হয়, তবে এই ডুবোজাহাজ এখান থেকে চ'লে গেলো কী ক'রে? আর সেই কথা যদি ওঠে, তবে এই ধাঁধাটারই বা উত্তর কী—যন্ত্রটা এখানে আগে এসেছিলোই বা কেমন ক'রে? দুর্বোধ রহস্য, দুর্ভেদ্য!

ডুবোজাহাজের কথা আর-কোথাও শোনা যায়নি, না লেক কিরডালে, না-বা অন্য-কোথাও। ডাঙার রাস্তা থেকে যেমন একদিন উধাও হ'য়ে গিয়েছিলো স্বতশ্চল শকট, আমেরিকার জল থেকে যেমন একদিন উধাও হ'য়ে গিয়েছিলো ঐ অলৌকিক জলযান, ঠিক তেমনিভাবেই এই দুর্ধর্ষ ডুবোজাহাজ এখন লেক কিরডালের জল থেকে উধাও

হ'য়ে গিয়েছে। মিস্টার ওয়ার্ডের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করবার সময়ে আমরা বারে-বারে এই প্রসঙ্গটায় ফিরে গেছি। আমাদের চরেরা হাজার চোখকান দিয়ে সবখানে কড়া নজর রেখেছে—অন্য দেশেরও চর নিশ্চয়ই আছে এমন—কিন্তু তার চিহ্নমাত্রও যেন কোত্থাও নেই।

সাতাশে জুনের সকালবেলায় মিস্টার ওয়ার্ডের ঘরে আমার তলব হ'লো।

'শোনা, স্ট্রক,' কোনো ভনিতা না-ক'রেই ঘরে পা দেরামাত্র মিস্টার ওয়ার্ড আমায় বলেছেন, 'এতদিনে তোমার কাছে শোধ নেবার একটা চমৎকার সুযোগ এসেছে।'

'*গ্রেট আইরির* ব্যর্থতার শোধ ?'

'নিশ্চয়ই।'

'কী সুযোগ?' উনি কি ঠাট্টা করছেন, না সীরিয়াসভাবে বলছেন? 'কোন সুযোগ ?'

'বাঃ রে, এই-তো,' মিস্টার ওয়ার্ড বলেছেন, 'সুবর্ণসুযোগ ! এই একে-তিন-তিনে-এক যানটার বাহাদুর বৈজ্ঞানিকটিকে তুমি খুঁজে বার করতে চাও না?'

'চাই, মিস্টার ওয়ার্ড। আমাকে শুধু একবার ব্যাপারটার দায়িত্ব দিয়ে দেখুন, আমি একেবারে অসাধ্যসাধন ক'রে ফেলবো—সফল হ'তে গেলে যা-যা করতে হবে তা-ই করবো। আমি জানি, কাজটা খুব-একটা সহজ হবে না।'

'কঠিন কাজ, স্ট্রক, কঠিন কাজ। হয়তো *গ্রেট আইরির* পাষাণ ভেদ ক'রে ভেতরে যাবার চেষ্টা করার চাইতেও কঠিন।'

স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম, আমার ব্যর্থতার কথা তুলে মিস্টার ওয়ার্ড আমায় তাতিয়ে দিতে চাচ্ছেন। এটা আমি জানতুম যে আমার প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা না-থাকলে *গ্রেট আইরির* কথা তিনি এখন তুলতেন না। নিশ্চয়ই আমার মধ্যে জেদ জাগিয়ে দেবার জন্যেই কথাটা তিনি তুলেছেন। আমাকে তিনি ভালোই জানেন; এটাও জানেন যে আগের বারের হার মানার শোধ তোলবার জন্যে আমি মরীয়া হ'য়ে উঠবো। আমি শুধু চুপচাপ ব'সে তাঁর নির্দেশেরই অপেক্ষা করেছি।

মিস্টার ওয়ার্ড ঠাট্টা ছেড়ে দিয়ে এবার সীরিয়াসভাবেই বলেছেন : 'আমি জানি, স্ট্রক, যে তুমি মানুষের সাধ্যে যতটুকু কুলোয় তার সবটাই করেছিলে; কোনো গাফিলতির দোষ অন্তত তোমার ঘাড়ে চাপানো যায় না। কিন্তু এখন আমরা যে-রহস্যটার মাথামুণ্ড বুঝতে গিয়ে নাজেহাল হচ্ছি, *গ্রেট আইরির* রহস্যের চাইতে তা একেবারেই অন্যরকম। যেদিন সরকার চাইবেন যে *গ্রেট আইরির* পাথর উড়িয়ে দিয়ে ভেতরে কী আছে দেখবেন সেইদিনই সরকার সেটা করতে পারবেন। আমাদের শুধু কয়েক হাজার ডলার ওড়াতে হবে—আর অমনি—*চিচিং ফাঁক*—রাস্তাটা খুলে যাবে।'

'আমি অন্তত সেটাই করতে বলবো।'

'কিন্তু এখন,' মিস্টার ওয়ার্ড মাথা নেড়ে বলেছেন, 'আমাদের কাছে আরো-জরুরি হ'লো এই অদ্ভুতকর্মা বৈজ্ঞানিকটিকে হাতে পাওয়া—সে যেন ঈল মাছের মতো বারে-বারে আমাদের হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। এ-কাজটা একজন গোয়েন্দার

—সত্যি-বলতে, একজন ধুরন্ধর গোয়েন্দার কাজ!'

'তার আর-কোনো নতুন খবর পাওয়া যায়নি?'

'না। আর যদিও এ-কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে যে সে ছিলো এবং এখনও আছে—হ্যাঁ, লেক কিরডালেরই জলের তলায়—অথচ তবু কোথাও তার কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। মাঝে-মাঝে মনে হয় লোকটার বুঝি জাদুগরদের মতো নিজেকে অদৃশ্য ক'রে ফেলবার ক্ষমতা আছে—এই যন্ত্রবিদ্‌দের প্রোটেউস বোধহয় মায়াবী কেউ!'

'আমার তো মনে হয়,' আমি তখন বলেছি, 'সে স্বেচ্ছায় দেখা না-দিলে কেউ তাকে কোনোদিন চোখেও দেখতে পাবে না।'

'তুমি ঠিক কথাই বলেছো, স্ট্রক। আর আমার মনে হয় তার সঙ্গে বুদ্ধির প্যাঁচ কষার চাইতে বরং অন্য-একটাই রাস্তা আছে আমাদের : তার আবিষ্কারের জন্যে এমন বিপুল অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করা যে সে তখনই আর তার উদ্ভাবন নিয়ে এসে হাজির হবে।'

মিস্টার ওয়ার্ড ভুল বলেননি। সরকার সত্যি এরই মধ্যে এই *যুগন্ধর* বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছেন, তাকে *যুগন্ধর* ব'লে অন্যায়ও কিছু করেননি সরকার, কারণ, সত্যি-তো, আর কাকেই বা এই খেতাব মানাতো? খবরকাগজগুলো ফলাও ক'রে এই খবর ছাপিয়েছে এবং এই অসাধারণ মানুষটি নিশ্চয়ই এতটা হাঁদা নন যে তিনি জানেন না সরকার তার কাছ থেকে কী চান—এবং তাও আবার তিনি যে-শর্ত আরোপ করতে চান, সেই শর্তেই।

'সত্যি-বলতে,' মিস্টার ওয়ার্ড বলেছেন, 'এই আবিষ্কার তার নিজের আর-কোন ব্যক্তিগত কাজে লাগবে যে তাকে সবকিছু আমাদের কাছ থেকে চেপে রাখতে হবে? কেন-যে তাকে আবিষ্কারটা বিক্রি করতে হবে, তার পেছনে হাজারটা কারণ আছে। প্রশ্ন হচ্ছে : এই অজ্ঞাতকুলশীল মহাশয়টি কি এর মধ্যেই দুর্বৃত্তগিরিতে এতটাই হাত পাকিয়েছেন যে তাঁর অদ্ভুতকর্মা যন্ত্রের সাহায্যে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে চিরকাল আড়ালে-আড়ালেই থাকতে চান? তিনি কি ভেবেছেন যে সকলের হাত এড়িয়ে তিনি পার পাবেন?'

মিস্টার ওয়ার্ড তারপর বিশদ ক'রে বলেছেন এই *আবিষ্কর্তাকে আবিষ্কার* করার জন্যে কী-কী সব অন্য উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। এমনও হ'তে পারে যে বেপরোয়াভাবে কোনো দুঃসাহসিক ও বিপজ্জনক কাজে যন্ত্রটা চালাতে গিয়ে সে তার যন্ত্রেরই সঙ্গে-সঙ্গে ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছে। তা যদি হ'য়ে থাকে, তবে ঐ ভেঙে-পড়া যন্ত্রটাও যন্ত্রজগতে অন্যদের কাছে মহামূল্যবান ও শিক্ষণীয় ব'লে গণ্য হবে। কিন্তু স্কুনার *মার্কেল*-এর সঙ্গে লেক কিরডালে আচমকা ধাক্কা লাগার পর থেকে, তার সম্বন্ধে কোনো খবরই এ-যাবৎ পুলিশের কাছে এসে পৌঁছোয়নি।

এই কথা বলবার সময় মিস্টার ওয়ার্ড কিছুতেই তাঁর হতাশা ও উদ্বেগ চেপে রাখতে পারেননি। হ্যাঁ, উদ্বেগও, কারণ জনসাধারণকে বিপদ-আপদের হাত থেকে রক্ষা করার

দায়িত্বটা ক্রমেই তাঁর কাছে খুব কঠিন হ'য়ে পড়ছে। কেমন ক'রে আমরা দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার করবো, যদি তারা এমন বিদ্যুদ্বেগে জলে বা ডাঙায় পালিয়ে যেতে পারে? কেমন ক'রেই বা সমুদ্রের তলায় গিয়ে আমরা তার পেছন নেবো? আর যখন বেলুনবিদ্যাও চূড়ান্ত উন্নতি ক'রে বসবে, তখন আমাদের কিনা আকাশেও দুর্বৃত্তদের পেছনে ধাওয়া করতে হবে! আমি ভাবছিলুম কালক্রমে আমি এবং আমার সহকর্মীরা একান্তই অসহায় হ'য়ে পড়বো কি না! যদি পুলিশবিভাগ সমাজের কোনো কাজেই না-লাগবে, সমাজ তবে এত টাকা খরচ ক'রে খামকা তাকে পুষবে কেন?

এটা ভাবতেই আমার হঠাৎ সেই-পাওয়া হুমকিটার কথা মনে প'ড়ে গেলো—টিটকিরির সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে আমাকে আবার বেশ ক'রে শাসানো হয়েছে। এও মনে প'ড়ে গেলো, তখন তারা সর্বক্ষণ আমরা ওপর নজর রাখছিলো। মিস্টার ওয়ার্ডকে কি সব কথা এখন খুলে বলবো? কিন্তু এখন হাতে যে-সমস্যাটা এসে পড়েছে, যা নিয়ে আমরা সবাই চোখে সর্ষেফুল দেখছি, তার সঙ্গে তো এদের কোনো সম্পর্ক আছে ব'লেই মনে হয় না। *গ্রেট আইরির* রহস্যটা সরকার তো আপাতত শিকেয় তুলে রেখেছে—যেহেতু এখন আর কোনো অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কা আগের মতো ভয় দেখাচ্ছে না। এখন বরং সরকার আমাকে নতুন একটা তদন্তে লাগাতে চাচ্ছে। তাহ'লে পরেই না-হয় একদিন মিস্টার ওয়ার্ডকে এই চিঠির কথা খুলে বলবো—তখন হয়তো এই বিদঘুটে ঠাট্টাটাকে আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো লাগবে না।

মিস্টার ওয়ার্ড তখনও ব'লে চলেছেন: 'আমরা ঠিক করেছি যে-ক'রেই হোক এই আবিষ্কর্তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবো। সত্যি-যে সে এখন উধাও হ'য়ে গিয়েছে; কিন্তু সে যে-কোনো মুহূর্তে এই মস্ত দেশটার যে-কোনো অংশে ফের এসে উদয় হ'তে পারে। আমি ঠিক করেছি সে আবার আবির্ভূত হবামাত্র তুমি তার পেছন নেবে। যে-কোনো মুহূর্তে ওয়াশিংটন ছেড়ে বেরিয়ে পড়বার জন্যে তোমাকে তৈরি থাকতে হবে। ককখনো তোমার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ো না।—শুধু দিনে একবার ক'রে এই দফতরে এসে হাজিরা দিয়ে যাবে। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় টেলিফোন ক'রে আমায় জানাবে, আর এখানে এসেই সটান আমার সঙ্গে এসে দেখা করবে।'

'আপনি যা বলবেন, তা-ই হবে।' আমি উত্তর দিয়েছি। 'কিন্তু একটা প্রশ্ন করতে পারি কি? আমাকে কি একাই কাজ করতে হবে, না সঙ্গে আর-কেউ—'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে বড়োকর্তা বলেছেন: 'আমি চাই যে তুমি নিজেই এখান থেকে দুজন লোক বেছে নাও—যাদের তোমার মনে ধরে তাদের—'

'ঠিক আছে। তা-ই হবে। তবে, ধরুন, কখনও যদি এই আবিষ্কর্তার মুখোমুখি পড়ি, তখন আমি তাকে নিয়ে কী করবো?

'আর যা-ই করো, ককখনো তাকে চোখের আড়াল কোরো না। আর-কোনো উপায় যদি না-থাকে, তবে তাকে গ্রেফতার কোরো। তোমার সঙ্গে সবসময় একটা গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকবে।'

'সে না-হয় হ'লো। কিন্তু সে যদি তার যানে লাফিয়ে ওঠে, আর অমন তীরের

মতো তার যান ছোটায়, তাহ'লে তাকে আমি থামাবো কী ক'রে? ঘণ্টায় দুশো মাইল বেগে যে তার যান চালাতে পারে, তার সঙ্গে তর্ক করার সময় কোথায় পাবো?'

'সে যাতে দুশো মাইল বেগে তার যান ছোটাতে না-পারে, তোমাকে তারই চেষ্টা করতে হবে, স্ট্রক। আর তাকে গ্রেফতার ক'রেই আমাকে টেলিগ্রাম কোরো। তারপর থেকে পুরো ব্যাপারটার দায়িত্ব আমার কাঁধে থাকবে।'

'যতই দুঃসাধ্য হোক, আপনি আমার ভরসা করতে পারেন, মিস্টার ওয়ার্ড। দিনে-রাতে, যে-কোনো সময় রওনা হবার জন্যে আমি আমার সহকর্মীদের নিয়ে তৈরি থাকবো। মামলাটার ভার আমাকে দেবার জন্যে আবারও আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি যদি এর কোনো সুরাহা করতে পারি, তবে সে-যে কী গৌরবের—'

'এবং লাভের ব্যাপার হবে, তা বুঝিয়ে বলা যাবে না, এই তো?' এই ব'লে আমার বড়োকর্তা সেদিনকার মতো আলোচনার ইতি টেনেছেন।

বাড়ি ফিরে এসে আমি যাত্রার তোড়জোড় শুরু ক'রে দিলুম। কবে, কোথায়, কখন, কতদিনের জন্যে বেরুবো, কিছুই জানা নেই। আমার তোড়জোড় দেখে আমার বুড়ি দাসী ভাবছিলো আমি বুঝি ফের *গ্রেট আইরিতে* যাবার উদ্‌যোগ করছি—সে-জায়গাটা তো তার কাছে জাহান্নামের খাশমহাল বৈ আর কিছু নয়। মুখে কিছু বললো না বটে, কিন্তু এমনভাবে নিজের কাজ করতে লাগলো যে আমি যেন এর মধ্যেই খোদ *বীলজেবাবের* কবলে গিয়ে পড়েছি। জানি যে সে কখনোই গুপ্তকথা ফাঁস করবে না, তবু আমি তাকে আসল কথা কিছুই বলিনি। এই দুরূহ কাজে কাউকেই কিছু খুলে বলা যাবে না।

দফতরের কোন-দুজনে আমার সঙ্গে যাবে, সেটা বেছে নিতে আমার একটু দেরি হয়নি। দুজনেই আমার সঙ্গে আমার বিভাগে কাজ করে, অনেকবার তারা আমার সঙ্গে কাজও করেছে—চটপটে, চৌকশ, কর্মঠ, সবসময়েই টগবগ ক'রে ফুটছে, আবার বুদ্ধিও ধরে। এদের একজন ইলিনয়-এর জন হার্ট, বয়েস তিরিশ; অন্য জন, বয়েস বত্রিশ, ম্যাসাচুসেট্‌সের ন্যাব ওয়াকার। এদের চাইতে ভালো সহকর্মীর কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না।

কয়েকদিন কেটে গেলো, কিন্তু কিছুরই কোনো খবর নেই, না সেই গাড়ির, না সেই জাহাজের, না-বা সেই ডুবোজাহাজের। গুজব কিন্তু ছড়াচ্ছিলো হাজার মুখে, কিন্তু পুলিশ জানতো সবই মিথ্যে। আর যে-রকম উদ্দাম বলগাছাড়া কল্পনার পরিচয় দিয়ে খবরকাগজগুলো খবর ছাপতে লাগলো, তাদের কোনোটারই কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিলো না। সত্য নয় জেনেও এই হুজুগে আজগুবি কোনো খবর ছাপবার প্রলোভন অন্তত কোনো কাগজই ছাড়তে রাজি ছিলো না—এই মওকায় যদি কাগজের কাটতি বাড়িয়ে নেয়া যায়, ক্ষতি কী।

তারপর, পর-পর দু-বার, প্রতিবেদন এলো, আমাদের *এই-প্রহরের মহামানবটি* নাকি আবার দেখা দিয়েছেন। প্রথমটায় জানা গেলো, তাকে নাকি দেখা গেছে আরকানসাসের রাস্তায়, লিটল রকে। দ্বিতীয়টায় জানা গেলো, তাকে নাকি দেখা গেছে

লেক সুপিরিয়রের অথই জলে।

পুলিশের কাছে পাকা খবর এলেও কী হবে—এই দুটি তথ্যকে একেবারেই মেলানো যাচ্ছিলো না। কেননা প্রথমটা তার আবির্ভাবের সময় দিয়েছে ছাব্বিশে জুনের অপরাহ্ণ, আর দ্বিতীয়টার সময় সেই দিনই সন্ধেবেলা। এখন, মার্কিন মুলুকের এই দুটো জায়গার মধ্যে দূরত্ব কম ক'রেও তো না-হোক কোন-না আটশো মাইল হবে। যদি ধ'রেও নেয়া যায়, যে এ-যাবৎ যত স্বতশ্চল শকট দেখা গেছে তার তুলনায় এই অভূতপূর্ব যন্ত্রের গতি প্রায় অচিন্ত্যনীয়ই, কিন্তু মধ্যবর্তী অঞ্চলটা সে কারু চোখে না-প'ড়ে পেরুবে কী ক'রে? কেমন ক'রে সে পর-পর পেরিয়ে আসবে আরকানসাস, মিসুরি, আইওয়া, উইসকনসিন, এ-কিনার থেকে ও-কিনার, অথচ আমাদের চরেরা তার কোনো আঁচই পেলে না, কেউই ছুটে গেলো না সবচেয়ে কাছের টেলিফোনে?

এই দুই আশ্চর্য আবির্ভাবের পর, যদি অবশ্য তাদের আবির্ভাব বলা যায়, যন্ত্রটি আবার যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। খবর যখন এসে পৌঁছেছিলো, তখন আর ও-দুই জায়গার কোনোটাতেই যাবার কোনো মানে হ'তো না—মিস্টার ওয়ার্ড অন্তত আমাদের কাউকেই ও-সব জায়গায় পাঠাতে চাননি। অথচ এই অদ্ভুতকর্মা যন্ত্রটি যেহেতু এখনও ধ্বংস হ'য়ে যায়নি, কিছু-একটা তো করা উচিত। মার্কিন মুলুকের সব খবরকাগজেই তেসরা জুলাই নিচের এই সরকারি বিজ্ঞপ্তিটি বেরুলো, তার বয়ানটা রীতিমতো গুরুগম্ভীর।

> বর্তমান বৎসরের বিগত এপ্রিল মাসে একটি স্বতশ্চল শকট পেনসিলভ্যানিয়া, কেনটাকি, ওহায়ো, টেনেসি, মিসুরি এবং ইলিনয় প্রদেশের বিভিন্ন রাস্তায় চলাফেরা করিয়াছিল; এবং, সাতাশে মে তারিখে, আমেরিকান অটোমোবাইল ক্লাব যে মোটররেসের আয়োজন করিয়াছিল, তাহাতে সে উইসকনসিনের পুরা রাস্তাটাই অতিক্রম করিয়াছিল। অতঃপর সে অদৃশ্য হইয়া যায়।
>
> জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে, একটি জলযান অত্যন্ত দ্রুতবেগে নিউ-ইংল্যাণ্ডের উপকূলে, কেপ কড হইতে কেপ সেব্‌ল-এর মধ্যে, বিশেষত বস্টনের নিকট, সমুদ্রের জল তোলপাড় করিয়া ছুটিয়া যায়। তাহার পর অকস্মাৎ এই জলযানটিও বেমালুম হাওয়ায় উবিয়া যায়।
>
> সেই একই মাসের দ্বিতীয় ভাগে, একটি ডুবোজাহাজ ক্যানসাস রাজ্যের লেক কিরডালের জলের তলায় চলাফেরা করিয়াছিল। পরে সেও অন্তর্হিত হইয়া যায়।
>
> সমস্তকিছু লক্ষ করিয়া ইহাই বিশ্বাস হয় যে একই আবিষ্কর্তা নিশ্চয়ই এই তিনটি যন্ত্রের নির্মাতা; অথবা তিনটি নহে, উহারা সকলে মিলিয়া সম্ভবত একটিই যন্ত্র, জলেস্থলে সর্বত্রই যাহার অবাধ গতিবিধি।

> ঐ যন্ত্রটি অধিকার করিবার জন্য উক্ত আবিষ্কর্তার নিকট—তা তিনি যে-ই হোন না কেন—তাই একটি প্রস্তাব করা হইতেছে।
>
> তাঁহাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তিনি যেন সর্বসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন, এবং বিজ্ঞাপিত করেন যে কী-কী শর্তে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের সহিত কাজকারবার করিবেন। তাঁহাকে এই অনুরোধও করা হইতেছে যে তিনি যেন যথাসত্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি. সি.-স্থিত আন্তঃরাজ্য পুলিশ দফতরের সহিত অনুগ্রহ করিয়া যোগাযোগ করেন।

বড়ো-বড়ো হরফে, মার্কিন মুলুকের সব খবরকাগজেরই প্রথম পাতায় এই বিজ্ঞপ্তিটি বেরিয়েছিলো। যার প্রতি এটা উদ্দিষ্ট, সে যে-ই হোক না কেন, তার চোখে এটা না-প'ড়েই পারবে না। সে নিশ্চয়ই এটা পড়বে। সেই একইভাবে কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়েও সে তার উত্তরটা জানাতে পারে। আর এ-রকম একটা প্রস্তাব সে উপেক্ষাই বা করবে কেন—ডলারের অঙ্ক যেখানে যা-খুশি তা-ই হ'তে পারে! আমাদের শুধু তার কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

এটা নিশ্চয়ই ব'লে দিতে হবে না যে জনসাধারণের মধ্যে এই বিজ্ঞপ্তিটি কীরকম কৌতূহল ও আগ্রহের সৃষ্টি করেছিলো। পুলিশের দফতরের সামনে, সকাল থেকে গভীর রাত অব্দি, এক উৎসুক ও মুখর জনতা ঠেলাঠেলি করছিলো—অপেক্ষা করছিলো কখন এই আবিষ্কর্তার কাছ থেকে কোনো চিঠি বা টেলিগ্রাম আসে—সে হয়তো সরাসরি ফেডারেল পুলিশেরই সঙ্গে যোগাযোগ করবে। সেরা প্রতিবেদকরা নির্ঘুম, ক্লান্তিহীন, দাঁড়িয়েছিলো সেখানে। যে-এই তুলকালাম খবরটা প্রথম ছাপাতে পারবে, সেই সংবাদদাতা কিংবা সেই খবরকাগজ যে রাতারাতি বিখ্যাত হ'য়ে যাবে তা-ই নয়, বিস্তর মুনাফাও লুঠে নিতে পারবে! যে-অজ্ঞাতকে অ্যাদ্দিনের চেষ্টাতেও কোথাও অবিষ্কার করা যায়নি, তার নাম ও হালহকীকৎ বাৎলানো যাবে তবে শেষকালে! আর এও জানা যাবে সরকারের সঙ্গে সে কোনো দরকষাকষিতে রাজি হবে কি না! এটা বোধহয় না-বললেও চলে আমেরিকা সবকিছুই দারুণ কেতায় ক'রে থাকে। কোটি-কোটি ডলার পেতে পারে এই উদ্ভাবক। যদি দরকার হয়, দেশের সব ক্রোড়পতিই তাদের কোষাগার উন্মুক্ত ক'রে দেবে!

একটা দিন কেটে গেলো! উত্তেজিত ও অধীর জনতার কাছে নিশ্চয়ই মনে হচ্ছিলো যে দিনটার মধ্যে যেন চব্বিশ ঘণ্টার চাইতেও বেশি সময় আছে! আর একেকটা ঘণ্টায় যেন আছে ষাট মিনিটের চাইতেও অনেক-বেশি মিনিট! কিন্তু কোথাও কোনো সাড়া নেই—না কোনো চিঠি, না-বা কোনো টেলিগ্রাম! রাতটাও কেটে গেলো। তবু কোনো খবর নেই। আর এইভাবেই নিরুত্তর কেটে গেলো পরের দিন—এবং তারও পরের দিন।

অন্য-একটা ফল হ'লো বটে এই বিজ্ঞপ্তির—এবং সেটা আগেভাগেই অনুমান করা গিয়েছিলো। কেব্‌লের পর কেব্‌ল গেলো ইওরেপে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবিষ্কর্তার কাছে কী প্রস্তাব করেছে সেটা মুহূর্তে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। এই আশ্চর্য উদ্ভাবনটিকে হাতে পাবার আশা ইওরোপেরও বড়ো-বড়ো দেশগুলো করেছিলো। এমন প্রচণ্ড একটা ক্ষমতা হাতে পাবার জন্যে তারাই বা কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না কেন? তারাই বা কেন তাদের কোষাগার উন্মুক্ত ক'রে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়বে না?

সমস্ত বড়ো-বড়ো দেশই ধুমধাম ক'রে ঢাকঢোল পিটিয়ে আসরে নেমে পড়লো —ফ্রান্‌স, ইংলণ্ড, রুশদেশ, ইতালি, অস্ট্রিয়া, আলেমানদেশ। শুধু অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলোই এই চমকপ্রদ নিলেমের আসরে নামেনি—তাদের অত টাকা কোথায় যে খামকা চেষ্টা করবে? ইওরোপের খবরকাগজগুলোও মার্কিন সরকারের বিজ্ঞপ্তিটির অনুসরণ ক'রে বিজ্ঞপ্তি ছাপালে। এই *রহস্যময় শোফেয়ারকে* শুধু একটা মুখের কথা খসাতে হবে-অমনি সে হ'য়ে উঠবে ফান্‌ডেরবিল্‌ট, অ্যাস্টর, গুল্ড, মরগ্যান বা রথ্‌সচাইল্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী ধনকুবের।

কিন্তু তাতেও যখন এই রহস্যময় আবিষ্কর্তার কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না, তখন অবাক হ'য়ে সবাই ভাবতে বসলো সে-কোন চমকপ্রদ প্রস্তাব করলে সমস্ত গোপনীয়তা ঝেড়ে ফেলে সে আত্মপ্রকাশ করবে? সারা জগৎটাই যেন এক মস্ত নিলেমের আসর হ'য়ে উঠেছে—এমন-এক নিলেম যেখানে চোখ-কপালে-তোলা সমস্ত দাম হাঁকা হচ্ছে। দিনে দু-বার ক'রে খবরকাগজগুলো কোটি-কোটি টাকা যোগ ক'রে চলেছে—আর যেন প্রতিবারই তা লাফিয়ে-লাফিয়ে প্রায় আকাশে উঠে যেতে চাচ্ছে। এই দর-হাঁকাহাঁকির শেষ এলো, যখন মার্কিন কংগ্রেস বিস্তর তর্কাতর্কির পর, ভোটে ঠিক করলে যে দুশো কোটি ডলার দেয়া হবে এই আবিষ্কর্তাকে। আর এই আশ্চর্য যানটির ওপর এতটাই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিলো যে দেশের কোনো নাগরিকই এই প্রস্তাবে কোনো আপত্তিই তোলেনি। আমি? আমি আমার বুড়ি দাসীকে বলেছিলুম: 'যন্ত্রটা কিন্তু এর চেয়েও অনেক দামি!'

জগতের অন্যান্য দেশ কিন্তু আমার মতো ভাবেনি, তাদের প্রস্তাব দুশো কোটি ডলারের ধারে-কাছেও ছিলো না। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে এই রেষারেষি কতটাই যে অর্থহীন ছিলো! এই আবিষ্কর্তা যেন জন্মায়ইনি কোনোদিন! সবটাই যেন মার্কিন খবরকাগজগুলোর মস্ত এক ধাপ্পা! সেটাই, অন্তত শেষকালে, দাঁড়ালো ইওরোপের সব খবরকাগজের বিঘোষিত অভিমত।

এদিকে দিনের পর দিন কিন্তু কেটেই চলেছে। এই আবিষ্কর্তার আর-কোনো খবরই নেই কোনোখানে, তার কাছ থেকে টু শব্দটি অব্দি নেই! আর-কোথাও তার এই আশ্চর্য শকট সকলকে বোমকে দিয়ে দেখা দেয়নি। আমি তো কী-যে ভাববো কিছুই বুঝতে পারছিলুম না—এই আশ্চর্য রহস্যের কোনোদিন যে কোনো মীমাংসা হবে, সেই আশাই আমি ছেড়ে দিয়েছিলুম।

তারপরে, হঠাৎ, পনেরোই জুলাই, ফেডারেল পুলিশভবনের ডাকবাক্সে কোনো পোস্টমার্ক ছাড়াই একটা চিঠি পাওয়া গেলো। কর্তৃপক্ষ গভীর মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা খুঁটিয়ে দেখে, ওয়াশিংটনের খবরকাগজগুলোর কাছে চিঠিটা তুলে দিলেন—আর অমনি, বিশেষ সংখ্যা বেরিয়ে গেলো কাগজগুলোর—চিঠির বয়ান একছত্রও এদিক-ওদিক না-ক'রে বেরিয়ে গেলো *জোর খবর! জোর খবর!* হিশেবে :

৯

চিঠি নম্বর দুই

দুর্বারগতি *বিভীষিকা* থেকে
জুলাই ১৫

পুরোনো ও নতুন জগৎ—দুজনকেই :

ইওরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার যে-সব প্রস্তাব করেছে, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার অবশেষে যে-দর হেঁকেছে, তাতে এই কথা কটি ছাড়া আর-কিছু জানাবার নেই :

আমার আবিষ্কারের জন্যে যে-খোলামকুচি দর হাঁকা হয়েছে, তাকে আমি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি।

আমার যান ফরাশিও হবে না, আলেমানও হবে না, অস্ট্রিয়া তাকে হাতাতে পারবে না, রুশদেশের জারও নন—এই যান না-হবে ব্রিটিশ, না-বা মার্কিন।

এই আবিষ্কার শুধু আমার নিজেরই থাকবে, এবং আমি তাকে আমার যেমন-খুশি তেমনিভাবেই ব্যবহার করবো।

এটা দিয়ে, আমি সারা জগতের ওপর প্রভুত্ব করবো—গোটা মানবজাতির এক্তিয়ারে এমন-কোনো উপায় বা ক্ষমতা নেই যা দিয়ে আমাকে *ঠেকাতে* পারবে, বা প্রতিরোধ করতে পারবে। কোনো অবস্থাতেই কারু পক্ষেই আমাকে *ঠেকানো* সম্ভব হবে না।

এটা স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিচ্ছি : কেউ যেন কখনও আমাকে পাকড়াবার বা থামাবার চেষ্টা না-করে। সেটা হবে অসম্ভব চেষ্টা—সম্পূর্ণ অর্থহীন। কেউ যদি আমাকে কোনো আঘাত হানতে চায়, তবে সে-আঘাত আমি প্রত্যাঘাত হেনে একশোগুণ ফিরিয়ে দেবো।

আমাকে যে-নগণ্য টাকা দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে, তা আমি ঘৃণা করি! আমার সে-টাকায় কোনো দরকার নেই। তাছাড়া, যেদিন আমার কোটি-কোটি ডলার কামাবার ইচ্ছে হবে, সেদিন আমি শুধু আমার হাত বাড়িয়ে তা টুপ ক'রে তুলে নেবো।

পুরোনো এবং নতুন জগৎ, দুইই জেনে রাখুক : তারা আমার বিরুদ্ধে কিছুই করবে পারবে না, কিন্তু আমি—আমার যা-ইচ্ছে হবে তা-ই ইওরোপ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে করতে পারবো।

সেইজন্যেই আমি এই চিঠিতে এই ব'লে স্বাক্ষর করছি

দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড

নিখিলের প্রভু জগতের প্রভু

১০

আইনকানুনের পরপারে

মার্কিন সরকারের উদ্দেশে লেখা এইরকম একটা চিঠি! কে-যে খোদ পুলিশের দফতরে এসে এই চিঠিটা ডাকবাক্সে রেখে গিয়েছে, কেউ তাকে দ্যাখেনি।

আমাদের দফতরের বাইরেকার সাইডওয়াক সম্ভবত সারা রাত্তিরে একবারও ফাঁকা থাকেনি। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, সবসময়েই সেখানে লোকজন ছিলো, শশব্যস্ত, উদ্বিগ্ন অথবা নিছকই কৌতূহলী। সত্যি-যে, তখনও পত্রবাহক হয়তো অনায়াসেই সকলের চোখে ধুলো দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তে পারতো, ডাকবাক্সে সরাসরি এসে ফেলে দিতে পারতো এই চিঠি। রাত্তিরটা অবশ্য ছিলো ঘুটঘুটে অন্ধকার, রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে হয়তো কিছুতেই নজর পৌঁছুতো না।

এই চিঠিটার হুবহু প্রতিলিপিই বেরিয়েছিলো সব কাগজে—সরকার সরাসরি সে-সব কাগজে এর বয়ানটা পাঠিয়ে দিয়েছিলো। চিঠিটা প'ড়ে জনসাধারণের প্রথম প্রতিক্রিয়া স্বভাবত এটাই হ'তো যে 'এ নিশ্চয়ই কোনো ভাঁড়ের কীর্তি—বিদূষকের বদ-রসিকতা।' পাঁচ হপ্তা আগে *গ্রেট আইরি* থেকে আমার কাছে যে-চিঠিটা এসেছিলো, তাকে আমি এইভাবেই গ্রহণ করেছিলুম।

কিন্তু এই চিঠিটা সম্বন্ধে সাধারণের প্রতিক্রিয়া কিন্তু সে-রকম হয়নি, ওয়াশিংটনে তো নয়ই, দেশের অন্যত্রও নয়। যদি জনাকয়েক মাতব্বর মুচকি হেসে বলবার চেষ্টা করতো যে এ-চিঠিটাকে পাত্তা দেবার কোনো মানেই হয় না, বেশির ভাগ লোকই কিন্তু

তার উত্তরে বলতো, 'এ-চিঠিটার বয়ান বা ভঙ্গি কোনোটাই কোনো ফাজিল ফিচেল ফুর্তিবাজ লোকের নয়। শুধু-একজনই এ-চিঠি লিখতে পারতো, এবং সে-হ'লো ঐ আশ্চর্য যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা।'

লোকের কাছে কেন-যে এ-কথা তর্কাতীত ব'লে মনে হ'তো, কী-রকম মানসিক অবস্থায় পড়লে লোকে এ-সব মেনে নিতো, তা কিন্তু সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। এতদিন ধ'রে যত-সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, যার চাবিটা অ্যাদ্দিন পাওয়া যায়নি, এই চিঠিটা অবশেষে সে-সব ধাঁধারই সমাধান ক'রে দিয়েছে। লোকে যা ভাবছিলো তা এই : আবিষ্কর্তা এতদিন যে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলো, তা শুধু একদিন অভিনব উপায়ে নিজেকে জাহির ক'রে সকলকে বোম্‌কে দেবার জন্যেই। কোনো দুর্ঘটনায় অপঘাতে মৃত্যু হওয়ার বদলে এতদিন সে এমন-একটি গোপন আড্ডায় নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলো, পুলিশ যার নামগন্ধও জানতে পারেনি। তারপর জগতের সব সরকার সম্বন্ধেই তার মনোভাব কী, সেটা জোরগলায় জানাবার জন্যেই অবশেষে সে এই চিঠি লিখেছে। কিন্তু কোনো বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ-কোনো ডাকঘরে গিয়ে চিঠিটা ডাকে দেবার বদলে—কেননা তাহ'লে হয়তো সেই সূত্র ধ'রে কখনও তার নাগাল পাওয়া যেতো —সে সরাসরি ওয়াশিংটনে এসে সকলের নাকের ডগা দিয়ে পুলিশের সদর দফতরে এসে চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে গিয়েছে।

যদি এই আশ্চর্য মানুষটি ভেবে থাকে যে তার অস্তিত্ব জানান দেবার এই নতুন পদ্ধতি সারা জগতে হুলুস্থুল ফেলে দেবে, তবে সে মোটেই ভুল ভাবেনি। সেদিন, সারা জগতে অগুনতি লোক চোখ রগড়ে বারে-বারে চিঠিটা প'ড়ে মুখস্থ ক'রে ফেলেও যেন নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেনি।

আমি নিজে বারে-বারে খুঁটিয়ে পড়েছি এই দম্ভ, এই স্পর্ধার ঘোষণা, তার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি প্রকাশভঙ্গি। হাতের লেখা বড়ো-বড়ো, মিশমিশে কালো কালিতে কলমের বড়ো-বড়ো টান দিয়ে লেখা শব্দগুলো। কোনো হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ হয়তো এই বড়ো-বড়ো রেখার টান দেখেই চিনে নিতে পারতো তার মেজাজি ও দেমাকি হাবভাব—জেনে নিতে পারতো এর মধ্যে কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার দম্ভ আর অসামাজিক মনোভাব। যেহেতু চিঠিটার *ফ্যাকসিমিলি* বেরিয়েছিলো কাগজে তাই আমার অন্তত এই চিহ্নগুলো খুঁজে পেতে খুব দেরি হয়নি। হঠাৎ আমার অজ্ঞাতসারেই আমার মুখ ফুটে একটা বিস্ময়ের ধ্বনি বেরিয়ে এলো—ভাগ্যিশ আমার বুড়ি দাসী আমার সে-চীৎকার শুনতে পায়নি। কেন আমি এতক্ষণ মরগ্যানটন থেকে ডাকে-ফেলা আমার ঐ আগের চিঠিটার সঙ্গে এই চিঠির আশ্চর্য মিলটাকে লক্ষ করিনি? তাছাড়া, আরো-একটা জিনিশও তো খেয়াল করার ছিলো। আমার চিঠিটায় কারু নাম ছিলো না—শুধু লেখা ছিলো *মা. অ. ও.*, যার সঙ্গে *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড*-এর আদ্যক্ষরগুলো খাপে-খাপে মিলে যায়। এ নিশ্চয়ই নেহাৎই কাকতাল নয়!

আর এই দ্বিতীয় চিঠিটা কোত্থেকে এসেছে? 'দুর্বারগতি *বিভীষিকা* থেকে।' নিশ্চয়ই

এই *একে-তিন-তিনে-এক* যানটারই নাম *বিভীষিকা*। *বিভীষিকার* রহস্যময় কাপ্তেনের স্বনির্বাচিত খেতাবই তাহ'লে *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড*, নিখিলের প্রভু জগতের প্রভু! আমার চিঠিতে যে-আদ্যক্ষরগুলো ছিলো তা তাহ'লে তারই নামের মোহর—আর খোদ এই *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ডই* আমাকে শাসিয়েছে যে ফের যদি আমি *গ্রেট আইরিতে* অভিযান চালাই তবে সে আমাকে দেখে নেবে!

আমি উঠে গিয়ে আমার ডেস্কের দেরাজ থেকে তেরোই জুনের চিঠিটা বার ক'রে নিয়ে এলুম। তার সঙ্গে পাশাপাশি রেখে আমি মিলিয়ে দেখলুম খবরকাগজের এই *ফ্যাকসিমিলি*। না, কোনো সন্দেহই আর নেই। দুটো চিঠিই একই হাতে লেখা।

আমার মনের মধ্যে তখন তুলকালাম আলোড়ন চলেছে। এই চমকপ্রদ তথ্যটা থেকে অবরোহী প্রক্রিয়ায় আমি সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছুতে চেষ্টা করছি : আগের চিঠিটার কথা শুধু আমিই জানি। যে-লোকটা আমার অমন হুমকি দিয়েছে সে-ই দুর্বারগতি *বিভীষিকার* কাপ্তেন—আর যানের নামটাই বা কী, *বিভীষিকা*, যথার্থ নামই বটে! এবার তো আর আমরা আবছায়ার মধ্যে নেই, এবার তো আর আমরা বুনো হাঁসের পেছনে ছুটছি না! এবার আমরা আবার তন্নতন্ন ক'রে অনুসন্ধান চালাতে পারি! *বিভীষিকার* সঙ্গে *গ্রেট আইরির* সম্বন্ধ কী—সেটা বার করতে পারলেই আমরা এই রহস্যটা ভেদ করতে পারবো। *ব্লু রিজ শৈলশ্রেণীর* সেই অদ্ভুত শিখা ও ধ্বনির সঙ্গে কোন অকাট্য সম্বন্ধে জড়ানো এই আশ্চর্য যান—*বিভীষিকা*?

আমার প্রথম পদক্ষেপ কী হবে, ততক্ষণে তা আমি জেনে গিয়েছি! আমার আগের চিঠিটা পকেটে নিয়ে আমি তক্ষুনি পুলিশের সদর দফতরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম। মিস্টার ওয়ার্ড ভেতরে আছেন কি না জেনে নিয়ে আমি তক্ষুনি তাঁর খাশ কামরার সামনে গিয়ে বেশ জোরেই বোধহয় টোকা দিয়েছিলুম, তারপর তিনি ঢুকতে বলবামাত্র আমি হন্তদন্তভাবেই বুঝি ভেতরে ঢুকে পড়েছি।

'তুমি এমনভাবে আসছো যে মনে হয় তুমি কোনো জরুরি খবর নিয়ে এসেছো, স্ট্রক?'

'সেটা আপনি নিজেই বিচার ক'রে দেখুন,' এই ব'লে আমি পকেট থেকে চিঠিটা বার ক'রে তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়েছি।

মিস্টার ওয়ার্ড হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়েছেন, তারপর একবার সেটায় চোখ বুলিয়ে, না-প'ড়েই জিগেস করেছেন : 'এ আবার কী, স্ট্রক?'

'শুধু নামের আদ্যক্ষর মোহর ক'রে লেখা একটা চিঠি—দেখতেই তো পাচ্ছেন।'

'আর কোথায় কোন ডাকঘরে এটা পোস্ট করা হয়েছিলো?'

'মরগ্যানটনে, নর্থ-ক্যারোলাইনায়।'

'চিঠিটা তুমি কবে পেয়েছো, স্ট্রক?'

'এক মাস আগে, জুন মাসের তেরো তারিখে।'

'তখন চিঠিটা প'ড়ে তুমি কী ভেবেছিলে?'

'যে এটা কারু নিদারুণ ঠাট্টা।'

'আর—*এখন*—স্ট্রক?'

'আমি যা ভাবছি, আপনিও তা-ই ভাববেন, মিস্টার ওয়ার্ড, যদি চিঠিটা একটু খুঁটিয়ে দ্যাখেন।'

মিস্টার ওয়ার্ড তারপরেই আবার চিঠিটার ওপর সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়েছেন। 'এখানে নামের বদলে তিনটি হরফ দেখছি।'

'হ্যাঁ, মিস্টার ওয়ার্ড, আর সেই তিনটে হরফ এই *ফ্যাকসিমিলির দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ডই* বোঝায়।'

টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে মিস্টার ওয়ার্ড বলেছেন: '*ফ্যাকসিমিলি* নয়, এই সেই আসল চিঠি।'

আমি তাঁকে উসকে দেবার জন্যেই বলেছি: 'বোঝা যাচ্ছে দুটো চিঠি একই হাতের লেখা।'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে।'

'দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই, *গ্রেট আইরির* গুপ্ত কথা যাতে ফাঁস হ'য়ে না-যায় সেইজন্যে কেমনভাবে আমাকে শাসানো হয়েছে?

'হ্যাঁ, তোমাকে খুন করার হুমকি দিয়েছে। কিন্তু স্ট্রক, এ-চিঠি তুমি পেয়েছো একমাস আগে। এতদিন তুমি চিঠিটা কেন আমাকে দেখাওনি?'

'কারণ আগে আমি চিঠিটাকে কোনো গুরুত্বই দিইনি। এখন, দুর্বারগতি *বিভীষিকা* থেকে চিঠিটা আসার পর একে আর কোনোভাবেই তাচ্ছিল্য করা যায় না।'

'এ-বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার দ্বিমত নেই। আমার কাছে চিঠিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব'লেই মনে হচ্ছে। এরই সাহায্যে আমি হয়তো এই অদ্ভুত মানুষটার নাগাল পেয়ে যাবো।'

'আমিও ঠিক সেই আশাই করি, মিস্টার ওয়ার্ড।'

'শুধু একটাই প্রশ্ন—এই *বিভীষিকার সঙ্গে গ্রেট আইরির* সম্পর্ক কী থাকতে পারে?'

'তা আমি জানিনে। আমি তো কল্পনাও করতে পারছি না—'

'এর কেবল একটাই ব্যাখ্যা হ'তে পারে,' আমার কথায় কান না-দিয়েই বুঝি মিস্টার ওয়ার্ড বলেছেন, 'যদিও সেটা বিশ্বাস করতে আদপেই মন চায় না—মনে হয় অসম্ভব।'

'আর, সেটা?'

'যে *গ্রেট আইরি* ছিলো ঐ আবিষ্কর্তার গোপন কারখানা—সেখানে সে তার সব জিনিশপত্র এনে জড়ো করেছিলো।'

'সে-যে অসম্ভব!' আমি বুঝি চেঁচিয়েই উঠেছি, 'কী ক'রে সে তার জিনিশপত্র

সেখানে নিয়ে যাবে ? আর তার ঐ যানটাকেই বা সে ওখান থেকে বার করবে কী ক'রে ? আমি ওখানে গিয়ে সরেজমিন যা নিজের চোখে দেখে এসেছি, তাতে আপনার এই অনুমানটাকে আমার অবিশ্বাস্যই শুধু নয়—অসম্ভব ব'লেই মনে হচ্ছে।'

'যদি-না—'

'যদি-না, কী ?' আমি ব্যগ্রস্বরে জানতে চেয়েছি।

'যদি-না এই *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড*-এর যানটার পাখাও থাকে। শুধু পাখা থাকলেই সে *গ্রেট আইরিতে* গিয়ে ডেরা বাঁধতে পারে।'

যানের নাম *বিভীষিকা*, সে সমুদ্রের গভীরে ঘুরে বেড়িয়েছে, সে কি সেই সঙ্গে ঈগল আর কণ্ডরের সঙ্গেও পাল্লা দিয়ে আকাশে ঘুরে বেড়াবে ? আমি বোধহয় অবিশ্বাসভরে আমার কাঁধ না-ঝাঁকিয়ে পারিনি। অবশ্য মিস্টার ওয়ার্ডও এরপর আর তাঁর অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব অনুমানটি নিয়ে আর-কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। বরং তিনি আবার চিঠি দুটো পাশাপাশি রেখে তাদের তুলনা করেছেন—সবকিছু মিলিয়ে দেখেছেন। শুধু মিলিয়েই দ্যাখেননি, অনুবীক্ষণের তলায় রেখে দুটি চিঠিকেই তিনি তন্নতন্ন ক'রে খুঁটিয়ে দেখেছেন—বিশেষত যেভাবে নাম লিখেছে লেখক, আর শনাক্ত করেছেন যে দুটি চিঠিই একই হাতের কাজ, হুবহু। শুধু-যে এক হাতেরই কাজ তা নয়—যে-কলম দিয়ে চিঠি দুটো লেখা হয়েছে, সেটাও একই কলম। তারপর গভীরভাবে কী যেন ভেবে তিনি বলেছেন : 'তোমার চিঠিটা আমি এখানে রেখে দেবো, স্ট্রক। মনে হয় এই আশ্চর্য নাটকটায় তোমার একটা বড়ো ভূমিকা রয়েছে—হয়তো একটা নয়, দু-দুটো নাটক—কোন সূত্র দিয়ে যে নাটকদুটি গাঁথা তা আমার জানা নেই—কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, সূত্র একটা আছেই। প্রথম নাটকটার সঙ্গে তুমি আগেই জড়িয়ে পড়েছিলে—আর দ্বিতীয়টাতেও তুমি যদি মস্ত একটা ভূমিকা নাও, তাহ'লে আমি মোটেই অবাক হবো না।'

'আপনি তো জানেনই, মিস্টার ওয়ার্ড, আমার কৌতূহল কেমন—কিছুতেই বাগ মানে না।'

'জানি, স্ট্রক, জানি। সে-কথা তোমায় আবার মনে করিয়ে দিতে হবে না। এখন, আমি কেবল আমার প্রথম নির্দেশটারই পুনরাবৃত্তি করতে পারি : তৈরি হ'য়ে থেকো, মুহূর্তের নোটিসে তোমায় ওয়াশিংটন ছেড়ে চ'লে যেতে হ'তে পারে।'

সেদিন সারাদিন ধ'রে, এই স্পর্ধিত চিঠি নিয়ে লোকের উত্তেজনা কেবলই তুঙ্গে উঠেছে। হোয়াইট হাউস এবং ক্যাপিটল হিল—দু-জায়গাতেই লোকেরা উত্তেজিতভাবে গিয়ে দরবার করেছে : *কিছু-একটা করা হোক, এক্ষুনি*। কিন্তু কিছু করা কি কোনো সহজ কাজ ? কোথায় কেউ দেখা পাবে এই *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড*-এর ? আর তার গোপন আড্ডাটা যদি খুঁজেও বার করা যায়, কেমন ক'রে কেউ তাকে গিয়ে পাকড়াবে ? তার ক্ষমতা যে কতটা, তার পরিচয় সে আগেই দিয়েছে—কিন্তু সেটা হয়তো তার সত্যিকার ক্ষমতার তুলনায় কিছুই-না, তার ক্ষমতার সে হয়তো নিছকই আংশিক

প্রকাশ। পাথরের ওপর দিয়ে কেমন ক'রে সে নিয়ে গিয়েছিলো তার ডুবোজাহাজ, ঐ লেক কির্‌ডালে ? আর কীভাবেই বা পরে সে সেখানে থেকে চম্পট দিয়েছে ? আর যদি সে সত্যিই লেক সুপিরিয়রে দেখা দিয়ে থাকে, তবে কীভাবে সে সকলের অগোচরে মাঝখানের জমি পেরিয়ে এসেছিলো ?

কী-যে মাথা-খারাপ-করা, সব-ঘুলিয়ে-দেয়া, কাণ্ড ! আর সেইজন্যেই চট ক'রে এই রহস্যের একটা মীমাংসা হওয়া উচিত। দুশো কোটি ডলারে যখন তার মন ওঠেনি, তখন এবার তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ ক'রে দেখা উচিত। আবিষ্কর্তা বা তার আবিষ্কার —কিছুই নাকি কেনা যাবে না ! আর কী দম্ভ, কী স্পর্ধার সঙ্গেই সে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে ! তাহ'লে তা-ই হোক ! এই উপেক্ষার ফলে তাকে গণশত্রু ব'লে গণ্য করা হোক, ঘোষণা করা হোক যে সে সমস্ত সমাজেরই শত্রু—আর এমন দুশমনের বিরুদ্ধে সমস্ত-কিছুই প্রয়োগ করা যায়, সেখানে ন্যায়-অন্যায় ব'লে কিছুই আর থাকে না, অন্যদের কোনো সমূহ ক্ষতি করবার আগেই তার সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে ! মাঝখানে যে লোকে ভেবেছিলো সে তার যান-টান নিয়ে দুর্ঘটনায় মারা গেছে, এখন সেই সিদ্ধান্ত সবাই আবর্জনার স্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সে বেঁচে আছে, বহাল তবিয়তেই বিরাজমান; আর তার এই বেঁচে-থাকাই জনসাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক ! সে সাংঘাতিক লোক, মারাত্মক ! কিছুতেই তাকে আর বাড়তে দেয়া চলে না।

এমন ভাবনা থেকেই সরকার থেকে নিচের বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করা হ'লো :

> 'দুর্বারগতি *বিভীষিকার* অধিনায়ক যেহেতু তাহার আবিষ্কারকে সর্বসাধারণের গোচরে আনিতে অস্বীকার করিয়াছে, যেহেতু এই যান সে এরূপভাবে চালায় যে তাহার যন্ত্র জনসাধারণের পক্ষে প্রচণ্ড বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে, যাহার হাত হইতে কিছুতেই রক্ষা করিবার যেহেতু কোনো উপায়ই নাই, অতএব এতদ্দ্বারা *বিভীষিকার* কাপ্তেনকে আইন-কানুনের পরপারে বহিষ্কৃত করা হইল। তাহাকে অথবা তাহার যন্ত্রকে দখল বা ধ্বংস করিবার জন্য যে-কোনো উপায়ই বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং যে-কেহ তাহাকে বন্দী বা হত্যা করিতে পারিবে, তাহাকে যথোপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করা হইবে।'

এ-তো একেবারে যুদ্ধ ঘোষণা, *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড*-এর বিরুদ্ধে এক মরণপণ যুদ্ধের আহ্বান—যে-লোকটা কি না ভেবেছে একটা গোটা জাতিকে হেনস্থা ক'রে বা ভয় দেখিয়ে পার পেয়ে যাবে, আর সে-জাতি কি না মার্কিন জাতি !

দিন ফুরোবার আগেই, মোটা-মোটা অঙ্কের সব পুরস্কার ঘোষণা করা হ'লো : যে-কেউ এই সাংঘাতিক আবিষ্কারকের গোপন আড্ডা বার ক'রে দিতে পারবে, যে-কেউ তাকে সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারবে, যে-কেউ তাকে হত্যা ক'রে আমেরিকাকে মুক্ত করবে পারবে—সকলকেই বিরাট-বিরাট পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হ'লো।

জুলাইয়ের শেষের দিকে এইরকমই ছিলো পরিস্থিতি। সবই প্রায় যেন ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো। যে-মুহূর্তে এই সমাজবিরোধী আবার দেখা দেবে, অমনি সংকেতে সে-খবর সবখানে ফাঁস ক'রে দেয়া হবে, আর সুযোগ পাবামাত্র তাকে গ্রেফতার করা হবে। সেটা অবশ্য সম্ভব হবে না যদি সে থাকে তার সেই আশ্চর্য স্বতশ্চল শকটে অথবা *অলৌকিক* জলযানে। না, তাকে যদি পাকড়াও করতে হয় তো তাকে পাকড়াতে হবে আচমকা, অপ্রস্তুত অবস্থায়, যাতে সে তার ঐ অভূতপূর্বগতির যানে ক'রে পালিয়ে যেতে না-পারে।

আমি সেইজন্যেই সজাগ ও উন্মুখ হ'য়ে ছিলুম, অপেক্ষা করছিলুম কখন মিস্টার ওয়ার্ডের কাছ থেকে রণক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ আসে। আমার সহকর্মীরাও সারাক্ষণ প্রস্তুত ছিলো। কিন্তু কোনো নির্দেশই এলো না মিস্টার ওয়ার্ডের কাছে থেকে, কেননা যার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান তার হাল-হকীকৎ তখনও কারু জানা নেই। জুলাই মাস শেষ হ'য়ে এলো। খবরকাগজগুলো উত্তেজনায় তেমনি টগবগ ক'রে ফুটছে। তারা এমনকী একের পর এক গুজব ছেপে চলেছে। প্রতি মুহূর্তে নতুন-নতুন সূত্রের কথা বেরুচ্ছিলো, কিন্তু সবই ছিলো অলীক কল্পনাবিলাস। আমেরিকার প্রতি কোণ থেকে অনবরত টেলিগ্রাম আসছে ফেডারেল পুলিশের সদর দফতরে, একেকটা টেলিগ্রাম মুহূর্তের মধ্যে নাকচ ক'রে দিচ্ছে অন্য টেলিগ্রামগুলোর বয়ান। এত-যে বিশাল-বিশাল অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিলো, তার একটা ফল তো হবেই : এর ওর নামে নালিশ, লোকের পরিচয় নিয়ে ভ্রান্তিবিলাস, পর্বতপ্রমাণ ভুলবিভ্রম, সবই ছিলো, কোনো-কোনোটা অবশ্য ইচ্ছাকৃত বিভ্রম নয়, কখনও কোনো ধুলোর ঝড় দেখে লোকে ভেবেছে তার আড়ালে বুঝি কোনো স্বতশ্চল শকট লুকিয়ে আছে। আমেরিকার অজস্র হ্রদে কোনো ঢেউ উঠলেই লোকে ভেবেছে বুঝি-বা জলের তলায় লুকিয়ে আছে কোনো ডুবোজাহাজ। সত্যি-বলতে, লোকের উত্তেজিত মগজ অনবরতই রজ্জুতে সর্পভ্রম ক'রে চলেছে।

শেষটায়, উনতিরিশে জুলাই, টেলিফোন এসে হাজির : এক্ষুনি মিস্টার ওয়ার্ডের কাছে এসে দেখা করতে হবে।

'তোমাকে এক ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে, স্ট্রক,' তিনি বলেছেন।

'কোথায় ?'

'টলেডো যেতে হবে।'

'তাকে তবে দেখা গেছে ?'

'হ্যাঁ। টলেডোয় পৌঁছে তুমি পরবর্তী নির্দেশ পাবে।'

'একঘণ্টার মধ্যেই আমার সহকারীদের নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়বো।'

'চমৎকার! আর, ও, হ্যাঁ, স্ট্রক, আমি তোমাকে এখন সরকারিভাবে একটা নির্দেশ দিচ্ছি।'

'কী ?'

'যাতে তুমি সফল হও—এবার যাতে কৃতকার্য হও!'

১১

অভিযান

তাহ'লে, অবশেষে, যাকে চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, সেই আবিষ্কারক আবার এসে মার্কিন মুলুকের ভূখণ্ডে আবির্ভূত হয়েছে! ইওরোপে সে কখনও আত্মপ্রকাশ করেনি, জলেও না, ডাঙাতেও না। সে তাহ'লে অ্যাটলান্টিক পেরোয়নি, যা সে হয়তো তিনদিনেই অতিক্রম ক'রে যেতে পারতো। তাহ'লে কি সে মনে-মনে ঠিক ক'রে নিয়েছে যে আমেরিকাকেই সে তার রগরগে রোমাঞ্চকর অভিযানের রঙ্গভূমি হিশেবে ব্যবহার করবে? তা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা কি ঠিক হবে যে সে আসলে একজন মার্কিন নাগরিক?

আরো-একবার এ-ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে দেখা যাক। এটা তো স্পষ্ট যে তার ডুবোজাহাজের সাহায্যে সে অনায়াসেই এই বিশাল মহাসমুদ্র পেরিয়ে ইওরোপে পৌঁছে যেতে পারতো। তার ডুবোজাহাজের দুরন্ত গতি যে দ্রুততম বাষ্পচালিত জাহাজের চেয়েও তার সমুদ্রযাত্রাকে অনায়াস ও ক্ষণস্থায়ী ক'রে তুলতে পারতো তা-ই নয়, পথে সমুদ্রে যত ঝড়তুফান ওঠে তার হাত থেকেও অনায়াসেই সে তার ডুবোজাহাজে ক'রে রেহাই পেতে পারতো। সমুদ্রঝড় ব'লে কিছুই তার অভিধানে থাকতো না। ঝড় উঠলেই সে চ'লে যেতে পারতো জলের তলায়, আর সমুদ্রের গভীরে সে পেতো শান্ত নিস্তরঙ্গ জল। কিন্তু তবু এই আবিষ্কারক অ্যাটলান্টিক পেরিয়ে ওপারে চ'লে যায়নি, আর এখন যদি সে ধরা প'ড়ে যায় তবে সে সম্ভবত ধরা পড়বে ওহায়ো রাজ্যে, কারণ টলেডো তো ওহায়োরই একটা শহর।

এবারে অবশ্য এই আশ্চর্য যানটাকে দেখা গিয়েছে, সে-তথ্যটা সযত্নে চেপে রাখা হয়েছে। যে-গোয়েন্দাটি খবরটি পুলিশদফতরে জানিয়েছিলো, সে ছাড়া দফতরের আর কয়েকজন লোক মাত্রই খবরটা জানে। এখন আমি শশব্যস্তভাবে সেই নজরদারের সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছি। কোনো খবরকাগজই—আর তাদের মধ্যে অনেকেই খবরটা ছাপবার জন্যে বিস্তর টাকা খরচ করতো—এ-খবরটা ছাপতে পারবে না। আমরা আলোচনা ক'রে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি ব্যাপারটার একটা সুষ্ঠু উপসংহার না-হওয়া অব্দি একটি কথাও বাইরে প্রকাশ করা হবে না। আমি কিংবা আমার সহকারীরা—সেই-যে মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছি, সেই কুলুপ আর সহজে খুলছি না।

মিস্টার ওয়ার্ডের নির্দেশমতো যার কাছে আমি দেখা করতে চলেছি, তার নাম আর্থার ওয়েল্‌স। সে আমাদের জন্যে টলেডোতেই অপেক্ষা ক'রে আছে। লেক ইরির পশ্চিম প্রান্তে এই টলেডো নগরী। আমাদের ট্রেন পূর্ণবেগে সারা রাত ধরে ছুটে চলেছে পশ্চিম ভার্জিনিয়া আর ওহায়োর মধ্য দিয়ে। রাস্তায় কোনোকারণেই দেরি হয়নি; পরদিন

বেলা দুপুর হবার আগেই টলেডোর স্টেশনে এসে আমাদের ট্রেন থেমেছে ।

জন হার্ট, ন্যাব ওয়াকার আর আমি তৎক্ষণাৎ আমাদের স্যুটকেস নিয়ে নেমে পড়েছি, সকলেরই পকেটে রিভলবার। তাকে আক্রমণ করতে হ'লে অস্ত্র লাগবে, যদি আত্মরক্ষা করার দরকার হয় তখনও হাতে অস্ত্র থাকলে ভালো। ট্রেন থেকে নামতে না-নামতেই আমি আর্থার ওয়েল্সের দেখা পেয়ে গেছি—সে আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। অধীরভাবে সে যাত্রীদের ওপর চোখ বোলাচ্ছিলো, বোঝাই যাচ্ছিলো যে সে আমার মতোই অধীর হ'য়ে আছে—কোনো-এক বিষম তাড়ায়।

আমি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে জিগেস করেছি, 'মিস্টার ওয়েল্স?'

'মিস্টার স্ট্রক?' সেও উলটে আমায় জিগেস করেছে ।

'হ্যাঁ।'

'আমি আপনার নির্দেশের অপেক্ষা করছি,' ওয়েল্স বলেছে ।

'আমাদের কি কখনও টলেডোতে থেমে অপেক্ষা করতে হবে?' আমি তার কাছে জানতে চেয়েছি।

'না, আপনার অনুমতি নিয়েই বলছি, মিস্টার স্ট্রক। দুটি টগবগে ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি স্টেশনের বাইরে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। যত-শিগগির-সম্ভব যাতে গন্তব্যে পৌঁছুতে পারি সেইজন্যে আমাদের এক্ষুনি রওনা হ'য়ে পড়তে হবে।'

'আমরা এখনিই যাবো,' এই ব'লে আমি দুই সহকারীর দিকে ফিরে ইশারা করেছি। 'কতদূর যেতে হবে? অনেকটা পথ?'

'সব শুদ্ধু কুড়ি মাইল।'

'আর, যেখানে যাচ্ছি, সে-জায়গাটার নাম?'

'*ব্ল্যাক রক ক্রীক*।'

একটা হোটেলে আমাদের মালপত্র জিম্মা ক'রে রেখে তক্ষুনি আমরা ঘোড়ার গাড়িটায় ক'রে বেরিয়ে পড়েছি । একটু বুঝি বিস্মিতভাবেই লক্ষ করেছি, গাড়িতে, আমাদের সীটের তলায়, বেশ কয়েকদিনের উপযোগী রসদ। মিস্টার ওয়েল্স আমাকে এর মধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে *ব্ল্যাক রক ক্রীক*-এর আশপাশের অঞ্চলটা সারা রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বন্য, পরিত্যক্ত । চাষী কিংবা জেলে—কাউকেই আকৃষ্ট করার মতো কিছুই সেখানে নেই। খাবার-দাবার মিলবে না সেখানে, কেননা সেখানে কোনো সরাই নেই, এমনকী রাতের বেলা আশ্রয় নেবার মতো কোনো কুঠিও মিলবে না ।

ভাগ্যিশ এখন জুলাই মাস, বেশ গরম পড়েছে, তাই আকাশের তারার তলায় দু-একটি রাত কাটাতে হ'লে তেমন-একটা কষ্ট হবে না।

আর যেটা সবচাইতে সম্ভব, আমরা যদি আদৌ কৃতকার্য হই, তবে ব্যাপারটা সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে কয়েক ঘন্টার বেশি লাগবে না। হয় *বিভীষিকার* সর্বাধিনায়ককে পালাবার কোনো সুযোগ না-দিয়েই আচম্বিতে আমরা আক্রমণ করবো, আর নয়তো দেখতে পাবো যে সে তার যান চালিয়ে দিয়েছে—এবং তখন তাকে গ্রেফতার করার

সব আশাই বিসর্জন দিতে হবে।

আর্থার ওয়েল্‌সের বয়েস সম্ভবত চল্লিশ, তাগড়া হট্টাকট্টা মানুষ, গায়ে অসীম শক্তি ধরে। আমি আগেই তার নাম শুনেছিলুম, এখানকার স্থানীয় পুলিশবাহিনীতে দক্ষতার জন্যে তার ভারি সুনাম। বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে, সহজে বিচলিত হয় না, সবসময় একটা-না-একটা ফন্দি বা রণকৌশল বার করছে—নিজের জীবন বিপন্ন ক'রেও এর আগে বেশ কয়েকবার সে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। সম্পূর্ণ আলাদা একটা কাজ হাতে নিয়ে সে টলেডো এসেছিলো—কিন্তু দৈব তাকে *বিভীষিকার* পেছনে এনে হাজির ক'রে দিয়েছে।

আমাদের ঘোড়ার গাড়ি দ্রুতবেগে লেক ইরির তীর ধ'রে ছুটে চলেছে, দক্ষিণ-পশ্চিমে। এই মস্ত হ্রদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর সীমায় প্রায় সমুদ্রের মতোই যেন বিশাল—তার একদিকে ক্যানাডা, অন্যদিকে ওহায়ো, পেনসিলভ্যানিয়া আর নিউ-ইয়র্ক রাজ্য। আমি যদি এখানে একটু থেমে প'ড়ে এই লেক ইরির ভৌগোলিক অবস্থান, তার গভীরতা, তার বিশাল প্রসার এবং তার আশপাশে আর কী-কী জলধারা আছে, সে-কথা একটু-একটু ফেনিয়ে বলি, তবে তা এই জন্যেই যে একটু পরেই যে-ঘটনাগুলো ঘটবে, তা বোঝাবার জন্যে এ-সব তথ্য জানা জরুরি।

লেক ইরি প্রায় দশহাজার বর্গমাইল ধ'রে ছড়িয়ে আছে। সমুদ্রতল থেকে তার অবস্থান প্রায় ছশো ফিট ওপরে। উত্তরপশ্চিমে, ডেট্রয়েট নদী মারফৎ, সে পশ্চিমের বিশালতর হ্রদগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত—তাদের কাছ থেকে অনবরত সে জল পায়। তার নিজেরও কতগুলো নদী আছে, তবে সেগুলো বেশ ছোটোই আর তাদের তেমন গুরুত্বও নেই—যেমন, রকি, কুইয়াহোগা, আর ব্ল্যাক রিভার। উত্তরপুবদিকে এই হ্রদ তার সব জল নায়াগ্রা নদী আর তার বিখ্যাত জলপ্রপাত মারফৎ সরাসরি ঢেলে দেয় লেক অন্টারিওতে।

এ-পর্যন্ত যতটুকু জানা গেছে, লেক ইরি কোথাও-কোথাও একশো তিরিশ ফিট গভীর। তা থেকে নিশ্চয়ই এটাও বোঝা যাবে এখানে কী-পরিমাণ জল থই-থই করছে। এই অঞ্চলটাই বিশাল সব হ্রদে ভর্তি। জমি যদিও উত্তর মুখে অবস্থিত নয়, তবু সে সুমেরুবৃত্তের ঠাণ্ডার কবলে প'ড়ে হি-হি ক'রে কাঁপে। উত্তরদিকে যে-অঞ্চল, সেটা ঢালু হ'য়ে নিচে গড়িয়ে গেছে, আর শীতের হাওয়া দুরন্ত বেগে তার ওপর দিয়ে ঝেঁটিয়ে ব'য়ে যায়, সেইজন্যে মাঝে-মাঝে লেক ইরি এ-তীর থেকে ও-তীর জমাট বেঁধে যায়।

এই বিশাল হ্রদটার ধারে-ধারে যে-সব প্রধান শহর গজিয়ে উঠেছে তার একটা হ'লো, পুবদিকে, বাফেলো—সেটা নিউ-ইয়র্ক রাজ্যের অন্তর্ভূত; টলেডো, ওহায়োর শহর—পশ্চিমে; তাছাড়া আছে ক্লীভল্যাণ্ড ও সানডাস্কি—এ-দুটোও ওহায়োরই শহর, তবে দক্ষিণে; আর তীর ধ'রে কত-যে ছোটো-ছোটো গ্রামশহর গ'ড়ে উঠেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। যানবাহন স্বভাবতই অবিশ্রাম আনাগোনা করছে এখানে, বার্ষিক প্রায় কুড়ি কোটি ডলার আয় হয়—শুধু এই বাবদেই।

আমাদের ঘোড়ার গাড়ি চলেছে, লেকের তীর ধ'রে, রুক্ষ উবড়োখাবড়ো একটা রাস্তা দিয়ে—এ-রাস্তায় যানবাহন কমই চলে। যেতে-যেতেই আর্থার ওয়েল্‌স আমায় খুলে বলেছে সে এখানে এসে কী জেনেছে।

দু-দিনও কাটেনি তারপর, সাতাশে জুলাই অপরাহ্ণে, ওয়েল্‌স ঘোড়ায় চ'ড়ে হার্লি শহরের দিকে যাচ্ছিলো। শহরটা থেকে মাইল পাঁচেক দূরে, সে একটা ছোট্ট বনের মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় দেখতে পেয়েছে, লেকের অনেকটা ভেতরে, মাঝখানেই প্রায়, একটা ডুবোজাহাজ জল থেকে হঠাৎ উঠে আসছে। দেখেই সে ঘোড়া থেকে নেমে প'ড়ে ঘোড়াটাকে একটা গাছের গায়ে বেঁধে রেখে সন্তর্পণে পায়ে-পায়ে লেকটার দিকে এগিয়ে যায়। সেখানে একটা মস্ত গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে সে দেখতে পায়—*নিজের চোখে দেখতে পায়*—এই ডুবোজাহাজ তার দিকেই এগিয়ে আসছে, আর শেষে *ব্ল্যাক রক ক্রীকের* মুখে এসে নোঙর ফেলছে। এই কি তবে সেই অভূতপূর্ব যন্ত্রযান—সারা জগৎ যাকে টুঁড়ে বেড়াচ্ছে—আর এখন কি না সেটা এসে থেমেছে প্রায় যেন তারই পদপ্রান্তে?

'আমি তো একলা ছিলাম,' ওয়েল্‌স আমাদের বলেছে, 'ক্রীকের কিনার ঘেঁসে, একেবারে একা। যদি আপনি এবং আপনার দুজন সহকারী তখন আমার সঙ্গে থাকতেন, তাহ'লে ওদের দুজনের বিরুদ্ধে আমরা চারজন, আমরা অনায়াসেই ওদের ওপর চড়াও হ'য়ে ওরা ওদের ডুবোজাহাজে উঠে পালাবার আগেই ওদের ধ'রে ফেলতে পারতাম।'

কেননা সে তার *ঐ* গাছের আড়াল থেকে দেখেছিলো, ডুবোজাহাজটা যখন তীরের পাথরগুলোর কাছে এসে হাজির হয়েছে, দুজন লোক জাহাজের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে ডেকের ওপর, তারপর ডাঙায় এসে নেমেছে। এদের একজনই কি সেই 'কুখ্যাত' *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড*, সেই-যে বেশকিছুদিন আগে লেক সুপিরিয়রে যাকে দেখা গিয়েছিলো, এবং তারপর থেকে যার আর-কোনো হদিশ নেই? এ-ই কি তবে সেই রহস্যময় *বিভীষিকা*, যেটা এইমাত্র লেক ইরির গভীর থেকে উঠে এলো জলের ওপর?

'হ্যাঁ, আমরা থাকলে হয়তো ওদের ওপর চড়াও হ'তে পারতুম,' ওয়েল্‌সের কথার জের টেনে আমি বলেছি, 'কিন্তু জাহাজে কি ওদের আর-কোনো সঙ্গীসাথী ছিলো না? তবু, যদি এই দুজনকেও পাকড়ানো যেতো, তবে অন্তত ঘোড়ার মুখ থেকেই জানা যেতো ওরা আসলে কারা।'

'আর ভেবে দেখুন,' ওয়েল্‌স জুড়ে দিয়েছে, 'যদি দুজনের একজন সত্যি-সত্যি *বিভীষিকার* কাপ্তেন হ'তো!'

'আমার শুধু একটাই ভয়, ওয়েল্‌স। এই ডুবোজাহাজ—আমরা তো এখনও জানি না আমরা একেই হন্যে হ'য়ে টুঁড়ে বেড়াচ্ছি কি না—তুমি ক্রীক ছেড়ে চ'লে আসার পর এখানে থেকে কেটে পড়েনি তো?'

'আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা সেটা হাতে-নাতে জেনে ফেলবো। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন—ওরা যেন ওখানেই থাকে! তারপর যখন রাতের আঁধার নেমে আসবে—'

'আচ্ছা,' আমি তাকে জিগেস করেছি, 'তুমি কি রাত হওয়া অব্দি গাছের আড়াল থেকে ওদের ওপর নজর রেখেছিলে?'

'না। আমি ঘণ্টাখানেক ওদের হালচাল লক্ষ ক'রেই, সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে টলেডোর টেলিগ্রাফ আপিশে চ'লে আসি। সেখানে আমি গভীর রাতে পৌঁছেছিলাম—তক্ষুনি আমি ওয়াশিংটনে জরুরি বার্তাটা পাঠিয়ে দিই।'

'সে হ'লো পরশু রাতে। তারপর কি কাল তুমি আবার *ব্ল্যাক রক ক্রীকে* ফিরে এসেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'ডুবোজাহাজটা তখনও সেখানে ছিলো?'

'ঠিক একই জায়গায়।'

'আর লোক দুটো?'

'সেই একই লোক—দুজনকেই আমি পরশু ভালো ক'রে দেখে এসেছি। দেখে-শুনে মনে হচ্ছিলো ডুবোজাহাজটা বোধহয় কোনো দুর্ঘটনার পাল্লায় পড়েছিলো, তাই বেছে-বেছে এই নিরিবিলি জায়গায় এসে তারা মেরামত করছে তাকে।'

'হয়তো তা-ই হবে,' আমি বলেছি, 'হয়তো এমন-কোনো ভাঙচুর হয়েছে জাহাজটার যেজন্যে তারা তাদের আসল আড্ডায় ফিরে যেতে পারেনি। ঈশ! এখনও যদি তারা ওখানে থেকে থাকে—'

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস এখনও ওরা ওখানেই আছে—কারণ জাহাজের মধ্য থেকে অনেক মালপত্র বার ক'রে এনে ওরা তীরে স্তূপ ক'রে রেখেছিলো। দূর থেকে দেখে যতটা বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয়েছে ওরা জাহাজের ভেতরটা ফাঁকা ক'রে নিয়ে ভেতরে কাজ করছে।'

'মাত্র দুজন লোক?'

'শুধু দুজন লোক।'

'কিন্তু,' আমি আপত্তি তুলেছি, 'মাত্র দুজন লোকের পক্ষে কি এমন-একটা দুরন্তগতির ডুবোজাহাজ মেরামত করা সম্ভব—আর তার ওপর যন্ত্রটা জটিলও বটে, কেননা সে *একে-তিন-তিনে-এক*, একই সঙ্গে মোটর গাড়ি, স্টীমবোট এবং ডুবোজাহাজ!'

'তা হয়তো সম্ভব নয়, মিস্টার স্ট্রক, কিন্তু আমি শুধু সেই দুজন লোককেই বারে-বারে দেখতে পেয়েছি। আমি যে-বনটার মধ্যে লুকিয়েছিলাম, কয়েকবার তারা তার কাছেও এসেছিলো—কাঠকুটো জড়ো করতে, তাই দিয়ে তীরে আগুনও জ্বেলেছিলো। এ-জায়গাটা একেবারেই জনমানবহীন, তাছাড়া ক্রীকটাও এমনভাবে চারপাশের বনজঙ্গল দিয়ে ঢাকা যে কেউ-যে তাদের আচমকা দেখে ফেলবে এমন সম্ভাবনা আদপেই ছিলো

না। মনে হচ্ছিলো, তারাও বুঝি এ-সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।'

'আবার দেখতে পেলে এই দুজনকে তুমি ঠিক-ঠিক চিনতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই। একজন ছিলো মাঝারি চেহারার, ক্ষিপ্র, চটপটে, মুখে ঝোপের মতো ঘন দাড়ি। অন্যজন তুলনায় একটু বেঁটেখাটো। কিন্তু বহরে বড়ো, আর হট্টাকট্টা। আগের দিনের মতোই, কালও আমি পাঁচটা নাগাদ বন থেকে বেরিয়ে বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে টলেডোয় ফিরে আসি। গিয়ে দেখি মিস্টার ওয়ার্ডের কাছ থেকে একটা তার এসেছে —তাতে জানিয়েছেন যে আপনারা আসছেন। তারপর আমি স্টেশনে গিয়ে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করি।'

সারসংক্ষেপ করলে ব্যাপারটা, তাহ'লে, এইরকম দাঁড়ায় : গত চল্লিশ ঘণ্টা ধ'রে, একটি ডুবোজাহাজ—সম্ভবত সেটাকেই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি—*ব্ল্যাক রক ক্রীকে* সংগোপনে মেরামতির কাজে ব্যস্ত আছে। হয়তো এতই জরুরি ছিলো যে এক্ষুনি মেরামত ক'রে না-নিলে চলতো না—আর তা যদি হয়, যদি গুরুতর জখমই হ'য়ে থাকে এই ডুবোজাহাজ, তাহ'লে এখন গিয়েও আমরা তাকে ওখানেই দেখতে পাবো। *বিভীষিকা* কী ক'রে শেষটায় লেক ইরিতে এসে আস্তানা গেড়েছে, আর্থার ওয়েল্‌সের সঙ্গে আমি সে নিয়েও আলোচনা করেছি, শেষটায় একমত হয়েছি যে এটাই তার সম্ভাব্য আস্তানা হ'য়ে থাকতে পারে। শেষবার তাকে দেখা গিয়েছিলো লেক সুপিরিয়রে। সেখান থেকে লেক ইরি আসতে গিয়ে এই আশ্চর্য যানটি হয়তো মিশিগানের রাস্তা দিয়েই এসেছিলো, কিন্তু পুলিশ বা সাধারণ লোক—কারু চোখেই সে যখন পড়েনি, তাতে মনে হয় *বিভীষিকা* হয়তো জলপথেই এসেছে। *গ্রেট লেকগুলো* শেকলের মতো একটা আরেকটার সঙ্গে জড়ানো, নিশ্চয়ই সেই জলপথেই সে এসেছে—আর যেহেতু সে কাপ্তেন নেমোর *নটিলাস*-এর মতো জলের তলা দিয়েও আসতে পারে, তাই কেউই তাকে দেখতে পায়নি। এবং এখন, *বিভীষিকা* যদি এর মধ্যেই ক্রীক ছেড়ে চ'লে গিয়ে থাকে, কিংবা আমরা যখন সেটা দখল ক'রে নেবার চেষ্টা করবো, তখন সে যদি পালিয়ে যায়—তাহ'লে সে কোনদিকে ফিরবে? তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা তো অর্থহীন হবে। বাফেলোর বন্দরে দুটো টরপেডো-ডেস্ট্রয়ার আছে, লেক ইরির একেবারে অন্য প্রান্তে। ওয়াশিংটন ছেড়ে আসবার আগেই মিস্টার ওয়ার্ড আমাকে তাদের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন; যদি দরকার হয়, তাদের কম্যাণ্ডারের কাছে টেলিগ্রাম পাঠালে, তারা *বিভীষিকা*-র পেছনে ধাওয়া করতে পারে। কিন্তু যত উন্নত জাতের দ্রুতগামী জাহাজই তারা হোক না কেন, *বিভীষিকা*-র সঙ্গে তারা এঁটে উঠতে পারবে কেন? আর সে যদি একবার জলের তলায় ডুবে যায়, তবে তো এরা একেবারে অক্ষম ও অসহায় হ'য়ে পড়বে। তাছাড়া, আর্থার ওয়েল্‌স তার দৃঢ় বিশ্বাস খুলে বলেছে, জলযুদ্ধের সময় যতই কামানবন্দুক থাকুক, আর যতই নৌবাহিনীর লোক থাকুক, ডেস্ট্রয়ারগুলো কিন্তু কোনো সুবিধেই পাবে না। কাজেই, আজ রাতে যদি আমরা সফল হ'তে না-পারি, গোটা অভিযানটারই তবে ভরাডুবি হবে।

ব্ল্যাক রক ক্রীক জায়গাটা আর্থার ওয়েল্‌সের ভালোভাবে চেনা, কয়েকবার সে এখানে এসে শিকার করেছে। বেশির ভাগ জায়গাতেই উবড়োখাবড়ো মস্ত সব পাথর দাঁড়িয়ে আছে, যার গায়ে এসে প্রচণ্ডভাবে আছড়ে পড়ে হ্রদের জল। প্রণালীটা তিরিশ ফিটেরও বেশি গভীর, *বিভীষিকা* তাই জলের ওপরে যেমন, জলের তলাতেও তেমনি আশ্রয় নিতে পারে। দু-তিন জায়গায় খাড়াই পাড়গুলো শেষ হয়েছে বালি ভরা বেলাভূমিতে, তার মধ্য দিয়ে গেছে নয়ানজুলি, খাড়া, দু-তিনশো ফিট ওপরে বনে গিয়ে তা শেষ হয়েছে।

আমাদের ঘোড়ার গাড়ি যখন এই বনে এসে পৌঁছুলো, তখন সন্ধে সাতটা বাজে। তখনও বেশ দিনের আলো ছিলো, তাতে এমনকী গাছের ছায়াতেও সবকিছু সহজেই দেখা যাচ্ছিলো। খোলাখুলি বেলাভূমি দিয়ে ক্রীকের দিকে এগুলে, *বিভীষিকার* মাল্লারা আমাদের দেখে ফেলবে আর অমনি পাততাড়ি গুটিয়ে পালাবে।

'এখানেই আপাতত থেমে গেলে ভালো হয় না কি?' বনের কাছে ঘোড়ার গাড়ি পৌঁছুতেই আমি ওয়েল্‌সকে জিগেস করেছি।

'না, মিস্টার স্ট্রক,' ওয়েল্‌স বলেছে, 'আমরা বরং গাড়িটা বনের ভেতরে গভীরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখি, তাহ'লে সহজে কারু চোখে প'ড়ে যাবার আশঙ্কা থাকবে না।'

'গাছের তলা দিয়ে কি এই ঘোড়ার গাড়ি যেতে পারবে?'

'পারবে,' আমাদর আশ্বস্ত করেছে ওয়েল্‌স। 'এই বনটা আমি আগেই ভালোভাবে দেখে গেছি। এখান থেকে পাঁচ-ছশো ফিট দূরে, ছোট্ট-একটা ফাঁকা জায়গা আছে, যেখানে আমরা গাছপালার সারির আড়ালে সম্পূর্ণ ঢাকা প'ড়ে যাবো, আর ঘোড়াগুলোও ইচ্ছেমতো চ'রে বেড়াতে পারবে। তারপর যেই অন্ধকার হবে, আমরা সন্তর্পণে বেলাভূমিতে চ'লে যাবো, ক্রীকের ঠিক মুখটার কাছে যেখানে উঁচু পাথরগুলো উঠেছে, সেখানে। তাহ'লে *বিভীষিকা* যদি এখনও সেখানে থেকে থাকে, আমরা তার আর তার পালাবার পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে লড়তে পারবো।'

যদিও একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলবার জন্যে আমরা অধীর হ'য়ে উঠেছিলুম, তবু মনে হ'লো ওয়েল্‌স যা বলছে সেইমতো কাজ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে—রাত্রির জন্যে অপেক্ষা করাই ভালো। মাঝখানের সময়টা না-হয় সে যেভাবে বলছে, সেভাবেই কাটিয়ে দেয়া যাবে। ঘোড়াগুলোর লাগাম ধ'রে হেঁটেই এগিয়েছি আমরা, তারা শুধু ফাঁকা গাড়িটাকে টেনে এসেছে, আমরা ক্রমেই নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি। ঢ্যাঙা-সব পাইনগাছ, বিশালবপু ওক বৃক্ষ, বিষাদবিধুর সাইপ্রেস ছড়িয়ে আছে এখানে-সেখানে, মাথার পর সন্ধ্যাটাকে যেন আরো ছায়াচ্ছন্ন ক'রে তুলেছে। আমাদের পায়ের নিচে ছড়িয়ে আছে কত-কত উদ্ভিদ ও লতা, পাইনঝুরি আর মরা পাতা। ওপরের পাতা এমন ঘন নিবিড় যে অস্ত সূর্যের শেষ রশ্মিগুলো ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা ক'রে বিফল হ'য়ে যাচ্ছে। আমাদের যেন হাৎড়ে-হাৎড়ে এগুতে হচ্ছে। আর গাছপালার গায়ে

কয়েকবার ধাক্কা খাবার পর অবশেষে আমাদের গাড়ি, প্রায় দশ মিনিট পরে, সেই ফাঁকা জায়গাটায় এসে পৌঁছোছে।

মাঝখানে একটা ফাঁকা মতো জায়গা, চারপাশে সব মহাবৃক্ষ, পুরু ঘাসের জাজিম বেছানো যেন ছোটো একটা খেলার মাঠ; এখানে এখনও দিনের আলো আছে—অন্তত আর একঘণ্টার মধ্যে অন্ধকার হবার সম্ভাবনা নেই। তাই এখানে একটা শিবির ফেলে একটু বিশ্রাম ক'রে নেবার সুযোগ পাওয়া গেলো—খানিক বাদেই তো রুক্ষ পাথুরে পথ ধ'রে আমাদের এগুতে হবে।

আমরা—বলাই বাহুল্য—ক্রীকটার মুখে যাবার জন্যে যেন মুখিয়ে ছিলুম, *বিভীষিকা* এখনও সেখানে নোঙর ফেলে রয়েছে কি না দেখবার জন্যে আর যেন তর সইছে না। একটু ধৈর্য চাই এখন, তাহ'লেই রাতের আঁধারে সকলের অগোচরেই আমরা রণক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছে যাবো। ওয়েল্‌স বারে-বারে এই কথাই আমাদের মাথায় ঢোকাতে চেয়েছে : আর সব অধীরতা সত্ত্বেও আমি তার কথার সারবত্তা বুঝতে পেরেছি।

ঘোড়াগুলোর জিনলাগাম খুলে দেয়া হয়েছে, যে-কোচোয়ান গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছে তারই তত্ত্বাবধানে তারা চ'রে বেড়াচ্ছে। রসদ সব নামানো হয়েছে—চমৎকার একটা সাইপ্রেস গাছের তলায় জন হার্ট আর ন্যাব ওয়াকার খাবারদাবার সাজিয়ে রেখেছে, বনের গন্ধে আমার কেন যেন বারে-বারে মরগ্যানটন আর প্লেজেণ্ট গার্ডেনের কথা মনে প'ড়ে যাচ্ছে। খিদের সঙ্গে তৃষ্ণাও ছিলো আমাদের : আর খাদ্য বা পানীয়, কোনোটারই কোনো অভাব নেই। তারপর পাইপ জ্বেলে দু-একটা টান দিয়ে নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আমরা আমাদের উত্তেজিত স্নায়ুগুলোকে শান্ত করার চেষ্টা করেছি।

বনের মধ্যে বিরাজ করছে গভীর স্তব্ধতা। পাখিদের শেষ গানগুলো থেমে গিয়েছে এখন, রাত যত কাছে আসছে, হাওয়ার গতিও ততই ঝিমিয়ে আসছে—এমনকী উঁচু-উঁচু গাছগুলোর মগডালেও কোনো পাতা নড়ছে না। সূর্য ডুবে যেতেই আকাশ চট ক'রে অন্ধকার হ'য়ে এলো, প্রদোষ নিয়ে এলো আবছায়া, অস্পষ্টতা। আমি আমার ঘড়িটায় তাকিয়ে দেখলুম, সাড়ে-আটটা বাজে। 'সময় হ'লো, ওয়েল্‌স।'

'আপনি যখনই বলবেন—'

'তাহ'লে, এসো, রওনা দিই।'

কোচোয়ানকে ডেকে হুঁশিয়ার ক'রে দিলুম : ঘোড়াগুলো যেন কিছুতেই এই ফাঁকা জায়গাটার বাইরে না-যায়, তারপর আমরা রওনা হলুম। ওয়েল্‌স গেলো সকলের আগে-আগে, তার পেছনে আমি, জন হার্ট আর ন্যাব ওয়াকার সকলের পেছনে। এই ঘন অন্ধকারে ওয়েল্‌স না-থাকলে আমাদের বিষম মুশকিল হ'তো। শিগগিরই আমরা গিয়ে পৌঁছোলুম বনের অন্যধারে—আমাদের সামনে এখন ছড়িয়ে আছে *ব্ল্যাক ক্রীক রকের* তীরভূমি।

কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই, সব চুপচাপ। সব, মনে হয়, পরিত্যক্তও। কোনো অহেতুক ঝুঁকি না-নিয়েই আমরা এগুতে পারবো। *বিভীষিকা* যদি সেখানে থেকে থাকে,

তবে সে নিশ্চয়ই ঐ বড়ো পাথরগুলোর পেছনেই নোঙর ফেলেছে। কিন্তু সে কি আছে সেখানে? এখনও? সেইটেই লাখো ডলার দামের প্রশ্ন! আমরা যতই এই অদ্ভুত রহস্যের সমাধানের দিকে এগুচ্ছি, ততই মনে হচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন আমরা গলায় এসে আটকে গিয়েছে।

ওয়েল্‌স ইঙ্গিতে আমাদের এগিয়ে যেতে বললে। আমাদের পায়ের তলায় তীরের বালি ডেবে যাচ্ছে। ক্রীকের মুখ থেকে আমরা এখন দুশো ফিট দূরে, পা টিপে-টিপে জায়গাটা পেরিয়ে আমরা সোজা লেকের পাশে পাথরের কাছে এসে দাঁড়ালুম।

কিছুই নেই লেকের জলে! *কিছুই নেই*!

যে-জায়গাটায় ওয়েল্‌স চব্বিশ ঘণ্টা আগেও *বিভীষিকাকে* রেখে গিয়েছিলো সেই জায়গাটায় ফাঁকা প'ড়ে আছে—আমাদের দেখে যেন হা-হা ক'রে হাসছে সে, *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড* এখন আর এই *ব্ল্যাক রক ক্রীকে* নেই। আবারও সে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে পড়েছে!

১২

ব্ল্যাক রক ক্রীক

মানুষের স্বভাবটাই এমন যে সে প্রায়ই বিভ্রমের ঘোরে প'ড়ে যায়। এ-সম্ভাবনা তো সবসময়েই ছিলো যে *বিভীষিকা* এই তল্লাট ছেড়ে কেটে পড়েছে—এমনকী ওয়েল্‌স তাকে গতকাল স্বচক্ষে দেখে থাকলেও এ-সম্ভাবনাটা তো কিছুতেই উড়িয়ে দেয়া যেতো না। যদি তার তিনফেরতা মোটরটায় সত্যি কোনো চোটজখম হ'য়ে থাকে, যেজন্যে সে ডাঙায় বা জলে কিছুতেই তার গোপন আড্ডায় গিয়ে আশ্রয় নিতে পারেনি এবং সেইজন্যেই যদি *ব্ল্যাক রক ক্রীকে* এসে তাকে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিতে হ'য়ে থাকে, তাহ'লে, এখন তাকে এখানে না-দেখতে পেয়ে কোন সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছুবো আমরা? স্পষ্টই ধ'রে নেবো যে তার মেরামতি শেষ হ'য়ে যেতেই সে তার নিজের পথে ফের রওনা হ'য়ে পড়েছে, এরই মধ্যে নিশ্চয়ই পেরিয়ে গিয়েছে লেক ইরির জল।

এই সমাপ্তিটা তো সবসময়েই সম্ভাব্য ছিলো, অথচ যতই আমরা অভিযানে বেরিয়ে এই *ব্ল্যাক রক ক্রীকের* কাছে এসে পড়েছি, ততই আমরা মন থেকে এই সম্ভাবনাটাকে হঠিয়ে দিয়েছি। আমরা প্রায় ধ'রেই নিয়েছি যে রাতের আঁধারে এখানে এসে হাজির হ'লেই *বিভীষিকার* সঙ্গে আমাদের দেখা হ'য়ে যাবে, যে আমরা দেখতে পাবো সে এখানকার জলে নোঙর ফেলে রাত্তিরের মোলায়েম হাওয়ায় দিব্বি দোল খাচ্ছে, যে

ওয়েল্‌স তাকে যেখানে দেখে গিয়েছে সেখানেই সে শেকড় পুঁতে দাঁড়িয়ে আছে।

আর তাই, এখন কী-যে হতাশা! আমার মনে হচ্ছিলো, এই যেন শেষ হ'য়ে গেলো, আর-কখনও তাকে হাতে পাবার কোনো আশা নেই! আমাদের সব চেষ্টাই নিষ্ফল হয়েছে! এমনকী *বিভীষিকা* যদি কখনও এই লেকের জলে থেকে থাকে, তবে তাকে খুঁজে পেয়ে, তার কাছে গিয়ে, তাকে দখল ক'রে বসা অন্তত আমাদের সাধ্যে কুলোবে না—আর এও না-হয় কবুল করাই ভালো—হয়তো তা সব মানুষেরই সাধ্যের বাইরে।

আমরা সেখানেই থম মেরে দাঁড়িয়েছিলুম, আমি আর ওয়েল্‌স যেন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, সম্পূর্ণ হতোদ্যম। জন হার্ট আর ন্যাব ওয়াকারও কম নিরাশ হয়নি, কিন্তু তবু তারা তীর ধ'রে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো—যদি *বিভীষিকা* কোনো চিহ্ন বা সূত্র ফেলে গিয়ে থাকে! ক্রীকের ঠিক মুখটায় হতভম্ব দাঁড়িয়ে, ওয়েল্‌স আর আমি যেন মুখ ফুটে একটা কথাও আর বলতে পারছিলুম না। দুজনের যা মনের দশা এখন, তাতে কোনো কথা বলারই বা দরকার কী। আগ্রহ উত্তেজনার পর এখন এমন দপ ক'রে নিভে-যাওয়া—এতেই যেন আমরা একেবারে অবসাদে ভ'রে গিয়েছিলুম। আমাদের এত সাধ্যের অভিযানের এমন শোচনীয় ভরাডুবি সত্ত্বেও আমরা একদিক থেকে যেমন হাল ছেড়ে দিতে রাজি ছিলুম না, তেমনি অন্যদিক থেকে কোনোভাবে অভিযানটা চালিয়ে-যাওয়াও সম্ভব ছিলো না।

প্রায় একটা ঘণ্টাই কেটে গেছে, অথচ তবু আমরা কিছুতেই যেন জায়গাটা ছেড়ে চ'লে যেতে পারছি না। আমাদের চোখগুলো যেন রাতের আঁধার ফুঁড়ে দূরে-দূরান্তরে দেখতে চাচ্ছিলো। মাঝে-মাঝে লেকের জলে তারার আলো ঝিকিমিকি ক'রে ওঠে, তারপরেই ঢেউ ওঠে, কাঁপা-কাঁপা ক্ষীণ ঝিকিমিকির রেশ মুহূর্তে মিলিয়ে যায়, আর তার সঙ্গে ধুক ক'রে বুকের মধ্যে হঠাৎ-জাগা ক্ষীণ আশাও নিভে যায়। মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে আমরা যেন ছায়ার মতো কোনো জাহাজকে আসতে দেখছি, ছায়ার মতো আকাশের পটে যেন আঁকা আছে সেটা। ক্রীকের জল পাক খেয়ে আমাদের পায়ের কাছে এসে আছড়ে পড়ে, আর সেই ঘূর্ণিজলের আওয়াজে আমাদের বিভ্রমও কেটে যায়। আমাদের জখম মগজই আলেয়ার মতো এত-সব বিভ্রম তৈরি ক'রে যাচ্ছে একের পর এক।

অবশেষে জন হার্ট আর ন্যাব ওয়াকার তাদের খোঁজাখুঁজি শেষ ক'রে ফিরে এলো —আর তাদের দেখেই আমার প্রথম প্রশ্ন হ'লো, 'নতুন-কিছু খবর আছে?'

'উঁহু, কিছু না,' জন হার্টের উত্তর।

'তোমরা এই খালটার দুই তীরই ভালো ক'রে দেখে এসেছো?'

'হ্যাঁ,' ন্যাব ওয়াকার উত্তর দিলে, 'ঐ ওপরে যেখানে অল্প ঘোলাজল পাক খাচ্ছে, সেই অব্দি গিয়েছিলাম। মিস্টার ওয়েল্‌স যে বলেছিলেন জাহাজ মেরামতির জন্যে বিস্তর মালপত্র ডাঙায় নামানো হয়েছিলো, তার কোনো চিহ্নমাত্রও আমরা দেখতে পাইনি।'

বনে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিলো না আমার। 'আরেকটু না-হয় অপেক্ষা ক'রেই

দেখা যাক, এখানে।'

ঠিক তক্ষুনি জলের মধ্যে আচমকা এমন আলোড়ন সৃষ্টি হ'লো, স্তম্ভের আকারে এমনভাবে জল ফুলে-ফেঁপে তীরে এসে আছড়ে পড়লো যে আমাদের সকলেরই মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হ'লো।

ওয়েল্‌স বললে, 'মনে হচ্ছে কোনো জাহাজের চাকার ঘায়ে জলে ঢেউ উঠেছে!'

'হ্যাঁ,' নিজের অজান্তেই বুঝি আমি আমার স্বর নামিয়ে ফেলেছিলুম, 'হঠাৎ এমন ঢেউয়ের কারণ কী? বাতাস তো প্রায় ম'রেই গিয়েছে। জলের ওপরে কিছু ভাসছে কি?'

'না কি কোনোকিছু জলের তলা দিয়ে বেগে ছুটেছে?' ওয়েল্‌স সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে বোঝবার চেষ্টা করলে, হঠাৎ কেন জলের মধ্যে এমন তোলপাড় হচ্ছে।

ঢেউয়ের আছড়ানি দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে কোনো জাহাজের চাকারই কাজ—তবে সেটা জলের তলা দিয়ে চলেছে, না ভেসেই এসে এই খালে ঢুকছে তা বোঝবার কোনো জো নেই।

চুপচাপ, নিশ্চল, আমরা চোখকান টান ক'রে এই গভীর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলুম। খালের ওপাশে যে তীরে এসে ঢেউ আছড়ে পড়ছে, তার শব্দ স্পষ্ট কানে আসছে। জন হার্ট আর ন্যাব ওয়াকার উঁচু একটা পাথরের ওপর উঠে দাঁড়ালে, যাতে ভালো ক'রে দেখতে পারে। আমি ঝুঁকে প'ড়ে জলের সেই আলোড়ন লক্ষ করছি। না, এখনও সমানে তেমনি আলোড়ন চলেছে; না, তাও নয়, বরং এখন আরো বেড়ে উঠেছে জলের শব্দ। আর সেই সঙ্গে আমি যেন শুনতে পেলুম কী যেন একটা দপদপ ক'রে আওয়াজ করছে—যেন কোনো চাকার শব্দ।

'আর-কোনো সন্দেহই নেই,' আমার দিকে হেলে প'ড়ে নিচু গলায় ওয়েল্‌স বললে, 'আমাদের দিকে একটা জাহাজ এগিয়ে আসছে—কোনো স্টীমবোট।'

'তা-ই হবে হয়তো,' আমি তাকে ফিশফিশ ক'রেই বলেছি, 'যদি-না লেক ইরির জলে বড়ো-বড়ো হাঙর বা তিমি থাকে।'

'না-না, এটা নির্ঘাৎ কোনো স্টীমবোট,' ওয়েল্‌স আবারও বলেছে, 'প্রশ্ন হচ্ছে —সে কি খালটার মুখের দিকে যাচ্ছে, না সেদিক থেকে এদিকটায় আসছে।'

'আগে তুমি দু-দু-বার এখানেই জাহাজটাকে দেখেছিলে, তা-ই না?'

'হ্যাঁ, এখানেই।'

'তাহ'লে এটা সেই একই জাহাজ—সেটা ছাড়া আর-কোনো স্টীমবোটই হ'তে পারে না—সম্ভবত সেই একই জায়গায় এসে সে থামবে।'

'ঐ-যে!' ফিশফিশ ক'রে বলেছে ওয়েল্‌স, ক্রীকের মুখটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে।

হার্ট আর ওয়াকারও ততক্ষণে ফিরে এসেছে, আর আমরা চারজনে বেলাভূমির ওপর গুঁড়ি মেরে ব'সে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করছি *ব্ল্যাক রক ক্রীকের* মুখটাকে।

আবছায়ার মধ্যে দেখতে পেলুম, একটা বিশাল-কালো কিছু অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে। খুবই আস্তে এগুচ্ছে সেটা, এখনও খালের মধ্যে এসে ঢোকেনি, এখনও লেকের জলেই ভেসে আছে, উত্তরপুবে, সামান্য-একটু দূরে। তার এনজিনের ক্ষীণ দপদপ শব্দ আর কানে আসছে না, সম্ভবত এনজিনটা থামিয়ে দেয়া হয়েছে, জাহাজটা শুধু আগেকার গতির তাড়নাতেই ভেসে আসছে।

তখনই মনে হ'লো, এটা নিশ্চয়ই সেই ডুবোজাহাজ, ওয়েল্স যাক আগে দু-বার দেখেছে; সে নিশ্চয়ই আবারও এখানে রাত কাটাতে ফিরে আসছে, খালের মধ্যেই বোধহয় সে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত একটা আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে।

তা-ই যদি হবে, যদি ফিরেই আসে, তবে হঠাৎ নোঙর তুলে সে চ'লে গিয়েছিলো কেন? আবারও কি তার কলকব্জা নতুন ক'রে বিগড়ে গেছে—ঠিকমতো সে-সব সারানো হয়নি? না কি কোনো কারণে মেরামতির কাজ অসমাপ্ত রেখেই তাকে আচমকা চ'লে যেতে হয়েছিলো? হঠাৎ তাকে বাধ্য হ'য়ে আবার এখানে ফিরে আসতে হ'লো কেন? এমন কি কিছু হয়েছে যার ফলে সে এখন আর স্বতশ্চল শকটের মতো ডাঙার ওপর দিয়ে যেতে পারছে না—তার ফলে ওহায়োর রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটে যেতে পারছে না আর তীরবেগে?

পর-পর এত-যে প্রশ্ন আমার মনে ভিড় ক'রে এলো, তার কোনো উত্তরই আমার জানা ছিলো না। তাছাড়া ওয়েল্স আর আমি দুজনেই ধ'রে নিয়েছি যে এটাই হ'লো *বিভীষিকা, দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড* যার অধিনায়ক, যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে অসীম স্পর্ধাভরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছে। অথচ এটা তো এখনও নিছকই অনুমান-যতই এর সত্য হবার সম্ভাবনা থাকুক না কেন, এটা এখনও তো অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়নি।

যে-জাহাজই এটা হোক না কেন, সেটা রাতের আঁধারে প্রায় চুপিসাড়েই এখন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই তার কাপ্তেন এখানকার জল আর ডাঙার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, *ব্ল্যাক রক ক্রীক* নিশ্চয়ই নিজের হাতের চেটোর মতোই তার চেনা, না-হ'লে সে এমন ঘুটঘুটে অন্ধকারে এভাবে আসবার সাহস পেতো না। ক্যাবিনগুলো থেকে এককোঁটাও আলো পড়ছে না বাইরে—যেমন রাত্রি ঘুটঘুটে আঁধার, তার চেয়েও গভীর-কালো এই জাহাজটা।

মুহূর্ত পরেই আমরা কী-সব যন্ত্রপাতির ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেলুম। ঢেউয়ের তোড় বেড়েছে আরো; আর কয়েক মুহূর্ত পরেই জাহাজটা তার "ঘাটায়" এসে ঠেকলো।

ঘাটা কথাটা দিয়েই হয়তো, যেখানটায় জাহাজটা ভিড়েছে, তাকে চেনানো যায়। আমাদের পায়ের নিচে পাথরগুলো একটা স্তর তৈরি করেছে, জল থেকে পাঁচ-ছ ফিট ওপরে, আর এমনভাবে ঢালু হ'য়ে জলে গিয়ে গড়িয়ে পড়েছে যে সেখানে অনায়াসেই কোনো নৌকো বাঁধা যায়।

আমার হাত ধ'রে টেনে ওয়েল্স ফিশফিশ ক'রে বললে, 'আর আমাদের এখানে

থাকা ঠিক হবে না।'

'না,' আমিও তার কথায় সায় দিয়েছি, 'ওরা আমাদের দেখে ফেলতে পারে। আমাদের হয় গুঁড়ি মেরে থাকতে হবে, নয়তো কোনো পাথরের ফাটলে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে।'

'আমরা আপনার পেছনেই থাকবো।'

একটা মুহূর্তও নষ্ট করার নেই। সেই ঘনকালো প্রাচীর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে আমার ওপর, আর তার ডেকের ওপর, জলের একটু ওপরে ডেকটা, আমরা দেখতে পাচ্ছি দুজনের ছায়ামূর্তি।

তাহ'লে কি মাত্র দুজন লোকই আছে এই জাহাজে?

আমরা চুপিসাড়ে তারপর চ'লে গেছি নয়ানজুলিটার দিকে, যার একদিকের ঢাল উঠে গেছে ওপরের বনটায়, পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে ছোটো-ছোটো কতগুলো কুলুঙ্গির মতন। ওয়েল্‌স আর আমি একটায় গুঁড়ি মেরে বসলুম, পাশেই কুঁজো হ'য়ে জবুথবু ব'সে রইলো আমরা দুই সহকারী। *বিভীষিকা* থেকে লোক দুটি যদি তীরে এসে নামে, তাহ'লে আমাদের সহজে দেখতে পাবে না—অথচ আমরা তাদের ওপর নজর রাখতে পারবো, আর সুযোগসুবিধেমতো কোনো ব্যবস্থা করতে পারবো।

জাহাজটা থেকে ক্ষীণভাবে ভেসে আসছে নানারকম আওয়াজ, ইংরেজিতেই কারা যেন কী-সব বলাবলি করছে। বোঝা যাচ্ছে যে জাহাজটা এখানেই নোঙর ফেলবার প্রস্তুতি করছে। তারপর একটা দড়ি ছুঁড়ে ফেলা হ'লো জাহাজ থেকে, ঠিক সেই *ঘাটায়*, একটু আগেই যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলুম।

সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে ওয়েল্‌স দেখতে পেলে জাহাজিদের একজন দড়িটা লুফে নিয়েছে—সে আগেই লাফিয়ে তীরে নেমে পড়েছিলো। তারপর আমরা শুনতে পেলুম মাটির ওপর লোহা ঘষটে নেবার শব্দ।

কয়েক মুহূর্ত পরেই, বালির ওপর পায়ের আওয়াজ শোনা গেলো। দুজন লোক হাঁটতে-হাঁটতে সোজা নয়ানজুলিটার কাছেই এসে পড়েছে, কিন্তু না-থেমে সরাসরি বনটার দিকেই এগিয়ে গেলো, একজনের হাতে জাহাজি লণ্ঠন, তার আলোয় পথ দেখে চলেছে তারা।

কোথায় তাদের গন্তব্য? তবে কি *ব্ল্যাক রক ক্রীক* এই *বিভীষিকার* একটা নিয়মিত আশ্রয়স্থল, তাদের অন্যতম গোপন আড্ডা? তার কাপ্তেন কি এখানে রসদপত্তরের একটা ভাঁড়ার কিংবা গুদোম বানিয়ে রেখেছে? তাহ'লে কি তারা এখানে এসেছে জাহাজটায় আবার সব রসদ মজুদ ক'রে নেবার জন্যে—যখন কোনো খামখেয়ালির টানে এদিকে তারা এসেই পড়েছে, তখন নতুন ক'রে জাহাজে মালপত্তর তুলে নেবে ব'লেই কি তারা ঠিক করেছে? তারা কি জনমনুষ্যবর্জিত এই পরিত্যক্ত-জায়গাটাকে এতই ভালোভাবে জানে যে ধরা প'ড়ে যাবার কোনো ভয়ই তাদের নেই?

'কী করবো এখন?' ফিশফিশ ক'রে জিগেস করলে ওয়েল্‌স।

'তাদের ফিরে-আসা অব্দি সবুর করা যাক—তারপর—' বিস্ময়ে আমার আর-কোনো বাক্‌স্ফূর্তি হয়নি। লোক দুটি আমাদের কাছ থেকে তখন বোধহয় তিরিশ ফিটও দূরে ছিলো না, যখন তাদের একজন হঠাৎ কেন যেন পেছন ফিরতেই তাদের লণ্ঠনের আলোটা তার মুখের ওপর এসে পড়লো।

লং স্ট্রিটে আমার বাড়ির ওপর যে-দুজন লোক কড়া নজর রেখেছিলো, এ তাদেরই একজন। উঁহু, মোটেই কোনো ভুল হয়নি আমার। আমার বুড়ি দাসী যেমন ভালো ক'রে তাদের চিনে রেখেছিলো, আমিও তাদের তেমনি ভালো ক'রে খেয়াল করেছিলুম। সে-ই বটে; সে-ই ঐ দুজন চরের একজন, পরে আমি আর যাদের কোনো হদিশ পাইনি! আর-কোনো সন্দেহই নেই : আমাকে হুমকি দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়েছিলো এরাই। চিঠি তবেই সত্যি-সত্যি এই *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড*-এর কাছ থেকেই এসেছিলো—এই *বিভীষিকাতে* ব'সেই ঐ চিঠির মুসাবিদা করা হয়েছিলো! আবারও আমি নিজেকে খুঁচিয়ে জিগেস করলুম : *গ্রেট আইরির* সঙ্গে এই *বিভীষিকার* কী সম্বন্ধে রয়েছে!

ফিশফিশ ক'রে ওয়েল্‌সকে আমি আবার আবিষ্কারটার কথা খুলে বললুম। সব শুনে সে শুধু বললে : 'এ-যে এক বিষম প্রহেলিকা!'

এদিকে লোক দুটি ততক্ষণে বনের দিকে আরো এগিয়ে গেছে, গাছতলায় গিয়ে কাঠকুটো জড়ো করছে। 'ওরা যদি শেষটায় আমার শিবিরটাকে দেখে ফ্যালে?' ওয়েল্‌স একটু উৎকণ্ঠায় ভ'রে গিয়েই জিগেস করলে।

'তারা যদি কাছের গাছপালাগুলো পেরিয়ে বনের ভেতরে ঢুকে না-পড়ে তাহ'লে অবশ্যি কোনো ভয় নেই।'

'কিন্তু যদি সেটা তাদের চোখে প'ড়ে যায়?'

'তাহ'লে তারা নিশ্চয়ই হুড়মুড় ক'রে গিয়ে তাদের জাহাজে উঠে পড়তে চাইবে—আর তখন আমরা তাদের পালাবার পথ আটকে দাঁড়াবো।'

ক্রীকের মুখটায়, যেখানে তাদের জলপোত নোঙর ফেলেছে—সেখান থেকে আর-কোনো আওয়াজ আসছে না। আমি আমার লুকোবার জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এলুম; নয়ানজুলির ঢাল বেয়ে আমি নেমে এলুম *ঐ ঘাটার* দিকে; ঠিক যে-জায়গাটায় আঁকশির মতো লোহার বেড়ি পাথরগুলোয় আটকানো, ঠিক সেখানটাতেই আমি দাঁড়িয়ে রইলুম।

ঐ-তো, ঐ-যে, *বিভীষিকা,* জলের ওপর ভাসছে। কোথাও কোনো আলো নেই। কাউকে দেখা যাচ্ছে না—না ডেকের ওপর, না এই বালিয়াড়িতে। এই কি তবে আমার চমৎকার সুযোগ নয়? আমি কি লাফিয়ে উঠবো *বিভীষিকায়,* তারপর ঘাপটি মেরে ব'সে থাকবো কখন ঐ লোক দুটি জাহাজে ফিরে আসে?

'মিস্টার স্ট্রক!' কাছে থেকেই নিচু গলায় ডাক দিয়েছে ওয়েল্‌স।

আমি হুড়মুড় ক'রে পেছিয়ে এসে তার পাশে গুঁড়ি মেরে ব'সে পড়লুম। জাহাজটার দখল নেবার পক্ষে কি বড্ড-বেশি দেরি হ'য়ে গেছে? না কি চেষ্টাটা এমনিতেই ভণ্ডুল হ'য়ে যেতো, জাহাজ থেকে যারা তীরের দিকে নজর রেখেছে তাদের হুঁশিয়ারিতে?

লণ্ঠন হাতে লোক দুটি এদিকে তখন নয়ানজুলিটা দিয়ে ফিরে আসছে। বোঝাই যাচ্ছে তারা ঘুণাক্ষরেও কোনোকিছু সন্দেহ করেনি। দুজনেই হাতে এক-এক বাণ্ডিল কাঠ নিয়েছে, এগিয়ে এসে তারা *ঘাটায়* এসে থামলে।

তারপর তাদের একজন গলা চড়িয়ে—যদিও খুব জোরে নয়—হাঁক দিলে : 'হ্যাল্লো ! কাপ্তেন !'

'সব ঠিক আছে।' জাহাজটা থেকে একটা গলার স্বর ভেসে এলো।

ওয়েল্‌স আমার কানে-কানে গুনগুন করলে : 'সবশুদ্ধু তাহ'লে তিনজন !'

'হয়তো চারজন আছে,' আমি গুনগুন ক'রেই বললুম, 'কিংবা পাঁচ-ছজনও থাকতে পারে।'

পরিস্থিতিটা ক্রমশই ঘোরালো হ'য়ে উঠছে। অতজন জাহাজির বিরুদ্ধে, আমরা এই ক-জনা কী করবো এখন ? বেশি বেপরোয়া হ'তে গেলে হয়তো সমস্তই বিশ্রীভাবে ভণ্ডুল হ'য়ে যাবে। এই দুজনা যখন এখন ফিরে এসেছে, তারা কি তাদের কাঠকুটো নিয়ে এখন জাহাজে গিয়ে উঠে পড়বে ? তারপরই কি ছেড়ে দেবে তাদের জাহাজ, না কি দিন ফোটা পর্যন্ত এখানেই নোঙর ফেলে থেকে যাবে ? যদি এই ঘাঁটি ছেড়ে এখন সে রওনা হয়, তাহ'লে কি *বিভীষিকা* আমাদের নাগালের বাইরে চ'লে যাবে না ? লেক ইরির জল ছেড়ে, পাশের যে-কোনো রাজ্যে গিয়ে সে হাজির হ'তে পারে, স্থলপথেই—কিংবা হয়তো ডেট্রয়েট নদী দিয়ে ভেসে চ'লে যাবে লেক হুরন-এ, তারপর গ্রেট লেক্‌স-এ, আরো ওপরে। *ব্ল্যাক রক ক্রীকের* সংকীর্ণ খালের জলে যে-মওকা এসেছে, তা কি আর পাওয়া যাবে কখনও।

'অন্তত,' আমি ওয়েল্‌সকে গলা নামিয়েই বললুম, 'অন্তত আমরা আছি চারজন। তারা যেহেতু কোনো অতর্কিত হামলার প্রত্যাশা করছে না, তারা গোড়ায় ভড়কেই যাবে —ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাবে। তারপর ফলাফল তো দৈবের হাতে।'

আমি আমার সহকারী দুজনকে ডাকতে যাবো, যখন ওয়েল্‌স আবার আমার হাত চেপে ধরলে। 'ঐ শুনুন !'

তীর থেকে একজন জাহাজটাকে কাছে আসতে বললে, আর অমনি জাহাজটা আরো এগিয়ে এলো পাথুরে তীরের কাছে। তীরের দুজনকে ডেকে সম্ভবত কাপ্তেনই জিগেস করলে : 'ওখানে, সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো ?'

'বিলকুল।'

'আরো দু-বাণ্ডিল কাঠ প'ড়ে আছে ওখানে ?'

'হ্যাঁ, দুই।'

'তাহ'লে আরেকবার গেলেই তাদের *বিভীষিকায়* এনে তোলা যাবে।'

বিভীষিকা ! আর সন্দেহ নেই : *সে-ই* !

'হ্যাঁ, আরেকবার গেলেই হবে।'

'বেশ, তাহ'লে ভোর হ'লেই আমরা বেরিয়ে পড়তে পারবো।'

তাহ'লে কি জাহাজটায় কুললে তিনজন লোকই আছে? কাপ্তেন, অর্থাৎ *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড*, আর তার এই দুই স্যাঙাৎ?

তারা তাদের সব কাঠকুটো জাহাজে নিয়ে গিয়ে তুলতে চাচ্ছে। তারপর জাহাজে উঠে তারা যে-যার বার্থে প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমুবে। তাহ'লে তখনই অতর্কিতে তাদের ওপর চড়াও হ'লে হয় না—কাঁচা ঘুম থেকে উঠে তারা আত্মরক্ষা করার কোনো সুযোগই তখন পাবে না!

জাহাজের কাপ্তেন হুঁশিয়ার হ'য়ে সজাগ দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে যখন, তখন জাহাজে গিয়ে লাফিয়ে নেমে সেটা দখল ক'রে নেবার বদলে, ওয়েল্‌স আর আমি ঠিক করলুম, তীরে লোকদুটোকে মাঝপথে না-আটকে তাদের বরং নিরাপদেই জাহাজে ফিরে যেতে দেয়া ভালো—তারপর সবাই নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়লে পর না-হয় আমাদের পালা আসবে।

এখন রাত সাড়ে-দশটা বাজে। আবারও বালিয়াড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেলো। লণ্ঠন-হাতে লোকটা আর তার সঙ্গী আবারও নয়ানজুলির ঢাল বেয়ে বনের দিকে উঠে গেলো। তারা যখন দূরে চ'লে গেছে, আমরা কিছু বললে আর শুনতে পাবে না, তখন ওয়েল্‌স গিয়ে হার্ট আর ওয়াকারকে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়ে এলো, আর আমি চুপি-চুপি পা টিপে-টিপে গিয়ে একেবারে জলের ধার ঘেঁসে দাঁড়ালুম।

একটা ছোট্ট মোটা তার দিয়ে *বিভীষিকা* বাঁধা। অন্ধকারে যতটা আন্দাজ করা গেলো, মনে হ'লো সে লম্বা, ছিপছিপে, একটা টর্কুর মতো দেখতে; তার কোনো চিমনি নেই, কোনো মাস্তুল নেই, দড়িদড়া খাটাবার জন্যে কোনো সটান-দাঁড়ানো খুঁটিও নেই: নিউ-ইংল্যাণ্ডের জলে যখন সে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলো, তখন এই আকৃতির কথাই বারে-বারে বলা হয়েছে।

আবার আমি নিজের জায়গায় ফিরে এলুম, আমার সহকারীরা নয়ানজুলিতে তাদের কুলুঙ্গির ভেতর লুকিয়ে আছে। একবার হাত দিয়ে আমি আমার রিভলবারটা ছুঁয়ে নিলুম, এটা হয়তো একটু পরেই কাজে লাগবে।

লোক দুটি বনের মধ্যে চ'লে যাবার পর পাঁচ মিনিট কেটে গিয়েছে।—এখন তারা যে-কোনো মুহূর্তে ফিরে আসবে। তারপর অন্তত একঘন্টা সবুর করতে হবে আমাদের, এদের ঘুমিয়ে পড়বার সময় দিতে হবে—তারপর আমরা অতর্কিতে হামলা করবো। তারা যাতে কিছুতেই তাদের জাহাজ পুরোদমে চালিয়ে তীরবেগে লেক ইরি থেকে বেরিয়ে যেতে না-পারে, কিংবা যেন ভুউশ ক'রে জলের তলায় ডুবে না-যায়—এ-দুটি জিনিশ আমাদের ঠেকাতেই হবে।

এতদিন ধ'রে পুলিশে কাজ করছি, অথচ এর আগে আমি কখনও এমন অস্থির বোধ করিনি। মনে হ'লো, লোক দুটো হঠাৎ যেন বনের মধ্যে আটকা প'ড়ে গেছে—কিছু-একটা যেন তাদের ফেরার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে।

হঠাৎ একটা জোর আওয়াজে রাতের স্তব্ধতা ছিঁড়ে গেলো। শোনা গেলো ঘোড়ার

খুরের দাপাদাপি, টগবগ ক'রে খ্যাপার মতো যেন কতগুলো ঘোড়া ছুটেছে তীর ধ'রে।

আমাদেরই ঘোড়া, ভয় পেয়ে, হঠাৎ আঁৎকে উঠে, ধারে হয়তো কোচোয়ান ছিলো না, বনের ওপাশটার ফাঁকা জায়গা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে—আর এখন তীর ধ'রে তুলকালাম ছুট লাগিয়েছে।

আর ঠিক তখনই, লোক দুটো ফিরে এলো, এবার তারা প্রাণপণে ছুটছে। অর্থাৎ, সন্দেহ নেই আর, তারা আমাদের শিবিরটা আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছে যে আশপাশে কোনো পুলিশবাহিনী ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। তারা টের পেয়ে গেছে যে তাদের ওপর সজাগ নজর আছে পুলিশের, তাদের এক্ষুনি পাকড়ে ফেলা হবে। কজেই তারা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে নয়ানজুলি দিয়ে ছুটে আসছে, তারপর ঐ লোহার শেকলটা খুলে দিয়ে তারা লাফিয়ে গিয়ে উঠে পড়বে *বিভীষিকায়*। আর উল্কার মতো *বিভীষিকা* অদৃশ্য হ'য়ে যাবে মুহূর্তে, আমাদের সব চেষ্টারই এমনি বিদঘুটেভাবে সলিল সমাধি হবে!

'এগিয়ে এসো! ফরওয়ার্ড!' ব'লে চেঁচিয়েই আমি নয়ানজুলির অন্যধারটা দিয়ে এগিয়ে গেলুম : *এই লোক দুটোর পথ আটকাতেই হবে!*

যেই তারা আমাদের দেখতে পেলে, হাতের বাণ্ডিল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রিভলভার তাগ ক'রে পর-পর গুলি ছুঁড়লে। একটা গুলি এসে জন হার্টের পায়ে লাগলো।

আমরাও উলটে আমাদের রিভলভারের ঘোড়া টিপলুম, কিন্তু ছুটন্ত লোকদুটোর গায়ে কোনো আঁচড়ই লাগলো না। তারা তেমনি সমানে ছুটে চলেছে—একটুও থমকে যায়নি ভয়ে। খালের মুখটার কাছে এসে, লোহার শেকল বা দড়িটা খোলবার কোনো চেষ্টা না-ক'রেই তারা লাফিয়ে গিয়ে *বিভীষিকায়* উঠে পড়লো।

তাদের কাপ্তেন, লাফিয়ে এগিয়ে এসে, আমাদের তাগ ক'রে পর-পর গুলি ছুঁড়লো। একটা গুলি ওয়েল্‌সের গা ছ'ড়ে চ'লে গেলো।

ন্যাব ওয়াকার আর আমি লোহার শেকলটা চেপে ধ'রে *বিভীষিকাকে* হ্যাঁচকা টান দিয়ে তীরে নিয়ে আসবার চেষ্টা করলুম। তারা কি দড়িদড়া খুলে আমাদের হাত থেকে পালিয়ে যাবে?

আচমকা লোহার শেকলটা যেন প্রচণ্ড একটা হ্যাঁচকা টানে পাথর ভেঙে ছত্রখান ক'রে ছিটকে চ'লে গেলো। আর তার একটা আংটা আটকে গেলো আমার কোমরের বেল্‌টে, আর অন্য-একটা আংটার দুরন্ত ঘা খেয়ে ওয়াকার ছিটকে পড়লো কয়েক হাত তফাতে। আংটাটা আমাকে আটকে রেখেছে, আর একটা দুরন্ত টানে আমাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—

বিভীষিকা, তার এনজিন তখন পুরোদমে জেগে উঠেছে, যেন এক লাফেই *ব্ল্যাক রক ক্রীকের* মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলো লেক ইরির জলে।

১৩

দুর্বারগতি *বিভীষিকা*

যখন আমার জ্ঞান ফিরে এলো, তখন দিনের আলো ফুটেছে। পুরু কাচের ঘুলঘুলি দিয়ে ক্ষীণ একটা আলোর ছটা এসে ঢুকেছে সংকীর্ণ ক্যাবিনটায়; কেউ-একজন নিশ্চয়ই এই কুঠুরিটায় আমাকে রেখেছে, সে-যে ঠিক কত ঘণ্টা আগে, তা আমার জানা নেই! কিন্তু যে-রকম বাঁকাভাবে রোদ্দুর এসে ঢুকেছে ঘুলঘুলিটা দিয়ে, তাতে মনে হ'লো সূর্য নিশ্চয়ই দিগন্ত থেকে বেশি ওপরে ওঠেনি।

একটা সরু বাঙ্কের ওপর আমি শুয়ে আছি, গায়ে কম্বল ঢাকা। আমার জামাকাপড় কোণায় একটা আংটায় ঝুলছে, এখন শুকিয়ে গেছে। আমার বেল্‌টটা সেই আংটার বিকট টানে ছিঁড়েই গিয়েছে, প'ড়ে আছে মেঝেয়।

গায়ে কোথাও কোনো ক্ষত নেই, কোনো চোটজখমও লাগেনি, শুধু একটু দুর্বল বোধ করছি। আমি যদি চেতনা হারিয়ে থাকি, তবে সেটা কোনো আঘাত খেয়ে নয়। ঐ শেকল আর দড়িদড়ার সঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে আমি নিশ্চয়ই জলে প'ড়ে গিয়েছিলুম, হয়তো মাথাটা শুদ্ধু জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছিলুম। কেউ যদি আমাকে টেনে না-তুলতো তবে আমি দমবন্ধ হ'য়ে ম'রেই যেতুম।

কোথায় আছি আমি এখন? *বিভীষিকায়*? কাপ্তেন আর দুই স্যাঙাতের সঙ্গে আমি একাই কি আছি এই জাহাজে—আমার সঙ্গীরা কেউ এখানে আমার সঙ্গে নেই? তা-ই সম্ভবত ঘটেছে, সম্ভবত কেন, নিশ্চিতই ঘটেছে। জ্ঞান হারাবার আগে কী দেখেছিলুম, আবার তা আমার মনশ্চক্ষুতে ভেসে উঠলো: হার্ট প'ড়ে আছে বালিয়াড়িতে, রক্তাক্ত, জখম; ওয়েল্‌স পাগলের মতো তার রিভলভার থেকে পর-পর গুলি ছুঁড়ে চলেছে; যে-মুহূর্তে আংটাটা আমার বেল্‌টে জড়িয়ে গেছে, সেই মুহূর্তেই শেকলের প্রচণ্ড ধাক্কায় ওয়াকার ছিটকে পড়েছে মাটিতে! আমার সম্বন্ধে কী ভাবছে এখন আমার সঙ্গীরা? যে, আমি লেক ইরির জলে তলিয়ে গেছি!

বিভীষিকা এখন কোথায়—কীভাবেই বা কাজ করছে তার এনজিন? সে কি এখন রূপান্তরিত হয়েছে স্বতশ্চল শকটে, পাশের কোনো রাজ্যের রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে? তা যদি হয়, আর আমি যদি অনেক ঘণ্টা অজ্ঞান প'ড়ে থাকি, তাহ'লে এই দুর্দান্ত গতিওলা যান এতক্ষণে নিশ্চয়ই অনেক দূরে চ'লে এসেছে। না কি, ডুবোজাহাজ হিশেবে, আমরা অন্যকোনো হ্রদের তলা দিয়ে চলেছি?

না, *বিভীষিকা* এখন বিশাল-চঞ্চল কোনো জলের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে। আমার এই ছোট্ট ক্যাবিনের গবাক্ষ দিয়ে যখন ঘরের মধ্যে রোদ্দুর এসে পড়েছে, তখন বোঝাই যাচ্ছে আমরা জলের তলা দিয়ে চলছি না। এদিকে সবচেয়ে ভালো শানবাঁধানো

রাস্তাতেও গাড়িতে ক'রে গেলে যে-রকম ঝাঁকুনি লাগে, সে-রকম কোনো ঝাঁকুনিও লাগছে না। তার মানে *বিভীষিকা* এখন ডাঙার ওপর দিয়ে যাচ্ছে না।

তবে সে এখন লেক ইরির ওপর দিয়ে চলছে কিনা, সেটা আমার এই চিৎপাত অবস্থায় বোঝা দুষ্কর। কাপ্তেন কি এতক্ষণে ডেট্রয়েট নদীতে এসে পড়েনি, কিংবা সেটা পেরিয়ে লেক হুরনে—কিংবা হয়তো তাকেও পেরিয়ে চ'লে এসেছে লেক সুপিরিয়রে! বোঝা মুশকিল।

কিন্তু যেখান দিয়েই যাক, আমি ঠিক করলাম সটান ডেকে চ'লে যাবো। সেখান থেকে আশপাশে তাকিয়ে দেখে হয়তো আন্দাজ করতে পারবো কোথা দিয়ে চলেছি। বাঙ্কটা থেকে কোনোমতে হিঁচড়ে নামালুম নিজেকে, তারপর হাত বাড়িয়ে আমার জামাকাপড় তুলে নিয়ে পোশাক প'রে নিলুম। এইটুকু কাজ করতেই কী-রকম হাঁফ ধ'রে যাচ্ছিলো, বড্ড ক্লান্ত লাগছে—অথচ এতক্ষণ ঘুমিয়ে বেশ ঝরঝরে লাগারই কথা। তারপর বেরুতে গিয়েই খটকা লাগলো : এই ক্যাবিনে আমায় বন্দী ক'রে রাখা হয়নি তো? বেরুবার রাস্তা তো দেখছি একটা সিঁড়ি, সোজা ছাতে চ'লে গেছে, ঢাকনা আটকানো হ্যাচওয়েতে। আমি একটু ঠেলা দিতেই ঢাকনাটা উঠে গেলো, আমি ডেকের ওপর আদ্ধেকটা শরীর গলিয়ে দিলুম।

আমার প্রথম চেষ্টা হ'লো সামনে, পেছনে এবং দু-পাশে তাকিয়ে দেখা। সবখানেই বিশাল-সব ঢেউয়ের পরে ঢেউ! কোথাও ডাঙার কোনো নামগন্ধও দেখা যাচ্ছে না। শুধু আকাশ আর জল—দুয়ে মিলে দূরে দিগন্তের বঙ্কিম রেখা তৈরি ক'রে দিয়েছে।

কোনো বিশাল হ্রদ, না সমুদ্র—তা হয়তো চট ক'রেই বুঝে নিতে পারবো। তীরের মতো ছুটে চলেছে ধাতুর তৈরি এই লম্বা চুরুটটা, গলুই জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে তরতর ক'রে, দু-পাশে ঢেউ উঠছে ক্ষিপ্ত, উৎক্ষিপ্ত, আর পিচকিরির ছিটের মতো জল এসে লাগছে আমার গায়ে।

একটু চেখেই দেখলুম ঐ জল। না, লোনা নয়, মিষ্টি জল, সম্ভবত লেক ইরিরই জল। সূর্য মধ্যগগনের পথে আধরাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে, তার মানে সবশুদ্ধু হয়তো সাত-আট ঘন্টা কেটেছে আমার ঐ অজ্ঞান অবস্থায়, সেইসময়েই *ব্ল্যাক রক ক্রীক* থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলো *বিভীষিকা*।

আজ তাহ'লে নতুন দিন, একত্রিশে জুলাই।

লেক ইরি প্রায় আড়াইশো মাইল লম্বা আর পঞ্চাশ মাইল চওড়া। আমি যে আশপাশে কোথাও ডাঙা দেখছি না, তাতে তাই অবাক হবার কিছু নেই—দক্ষিণপূবে না দেখা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জমি, না-দেখা যাচ্ছে উত্তরপশ্চিমে ক্যানাডার জমি।

ডেকের ওপর এখন দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, একজন গলুইয়ের কাছে, তাকিয়ে দেখছে দূরে; অন্যজন হালের কাছে, দিক ঠিক রাখছে জলযানের; সূর্যের অবস্থা দেখে আমার মনে হ'লো *বিভীষিকা* এখন উত্তরপুবদিকে চলেছে। গলুইয়ের কাছে যে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে আমি চিনি, তাকেই আমি দেখেছিলুম *ব্ল্যাক রকের* নয়ানজুলিতে, সেই

ওয়াশিংটনে আমার বাড়ির ওপর নজর রেখেছিলো। দ্বিতীয়জন তার সেই সঙ্গী, যার হাতে লণ্ঠন ছিলো। এরা যাকে কাপ্তেন ব'লে ডাকছিলো তাকে চাক্ষুষ দেখবার জন্যে মিথ্যেই আমি আশপাশে তাকালুম—তাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

এই দুর্ধর্ষ যানটার বাহাদুর নির্মাতার মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্যে আমি যে কী-রকম অধীর হ'য়ে পড়েছিলুম, তা নিশ্চয়ই না-বললেও চলে। কী-যে আশ্চর্য প্রতিভা সে, সারা পৃথিবীটাকেই সে চমকে দিয়েছে;—দুঃসাহসী, বেপরোয়া, স্পর্ধায় গরীয়ান—সারা জগতের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে সে পেছ-পা হয়নি, যে কিনা নিজেকে বলে নিখিলের প্রভু জগতের প্রভু—*দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড*!

গলুইয়ের কাছে যে-লোকটা দাঁড়িয়েছিলো, আমি তার দিকে এগিয়ে গেলুম। 'কাপ্তেন কোথায়?'

সে যেন অর্ধনিমীলিত স্তিমিত নয়নে আমার দিকে তাকালে, যেন আমার কথা সে আদপেই বুঝতে পারেনি। অথচ কাল রাতে আমি নিজের কানে শুনেছি, সে ইংরেজি বলতে পারে। তাছাড়া, আমি যে আমার ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এসেছি তা দেখে সে মোটেই অবাক হয়নি। আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে সে আবার অনিমেষ লোচনে দিগন্তের দিকে তকিয়ে রইলো।

আমি হালের দিকে এগিয়ে গেলুম। এই লোকটাকেই না-হয় কাপ্তেনের কথা জিগেস করবো। কিন্তু তার দিকে দু-পা এগুতেই সে তার হাত নেড়ে আমাকে স'রে যেতে বললে। তার কাছ থেকেও আর-কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না।

তাহ'লে এখন আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এই দুর্ধর্ষ যানটাকেই শুধু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে পারি, যার ওপর থেকে আমাদের তাগ ক'রে গুলি ছোঁড়া হয়েছিলো, যখন আমরা তার দড়িদড়া ধ'রে প্রবল বেগে টান দিয়েছিলুম।

আমি তাই এই যন্ত্রটাকে কীভাবে তৈরি করা হয়েছে, তা-ই সময় নিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলুম। কোথায় চলেছে এই *বিভীষিকা*, আমাকে নিয়ে? ডেক আর তার ওপরের সবকিছু এমন-এক ধাতু দিয়ে তৈরি, যেটা আমি চিনতে পারলুম না কিছুতেই। ডেকের ঠিক মাঝখানটায় আদ্ধেক-ওঠানো রয়েছে একটা মস্ত ঢাকনা, তার তলায় ছোটো-একটা ঘর, তাতে কতরকম কলকব্জা বসানো, সেখানে এনজিন অবিরাম কাজ ক'রে যাচ্ছে, প্রায় নিঃশব্দেই। আগেই যেমন বলেছি, কোনো মাস্তুল নেই, দড়িদড়া বাঁধবার কোনো খুঁটি বা চাকা নেই! এমনকী গলুইয়ের কাছেই ঝাণ্ডা পোঁতবার কোনো খুঁটি নেই! গলুই থেকে বরং দেখা যাচ্ছে একটা পেরিস্কোপের চোখের ওপরটা—তার মধ্য দিয়ে তাকিয়েই নিশ্চয়ই জলের তলা দিয়ে চালানো হয় *বিভীষিকাকে*। দু-পাশে রয়েছে, ভাঁজ-করা, দুটো গ্যাঙওয়ের মতো দেখতে, হালকা ধাতুর পাত, যেমন দেখা যায় কোনো-কোনো ওলন্দাজ জাহাজে। এ-দুটো যে কী কাজে লাগে, তা আমার মাথায় ঢুকলো না। গলুইয়ের কাছে তৃতীয় একটা হ্যাচওয়ের ঢাকনা ওঠানো—*বিভীষিকা* যখন বিশ্রাম করে, তখন এই লোক দুটো নিশ্চয়ই ঐ ঘরে নেমে গিয়ে ঘুমোয়।

হালের কাছে আরেকটা ঢাকনা—এখন নামানো রয়েছে। সেটা সম্ভবত কাপ্তেনের ক্যাবিনে যাবার দরজা—তাকে অবিশ্যি এখনও চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য—বা দুর্ভাগ্য—আমার হ'লো না। এই বিভিন্ন ঢাকনাগুলো যখন নামানো থাকে, তাদের ওপর পরানো হয় রবারের খোলশ, তাতে সবটাই জলহাওয়ানিরোধ ক'রে শক্ত হ'য়ে এঁটে যায়, যাতে সমুদ্রের তলা দিয়ে যাবার সময় ভেতরে জল ঢুকে যেতে না-পারে।

আর মোটরটা? যেটা এই যন্ত্রটাকে এমন দুরন্ত গতি দেয়, আমি তার কিছুই দেখতে পেলুম না, এমনকী প্রপেলারও না। এই ক্ষিপ্রবেগে ছুটে-জলা জলযান এখন পেছনে ফেলে রেখে যাচ্ছে দীর্ঘমসৃণ ফেনিল জলের স্রোত। যানটার পাশগুলো এমন মসৃণ যে প্রায় কোনো ঢেউই তৈরি করে না, শুধু হালকাভাবে তরতর ক'রে এমনকী খ্যাপা ঢেউয়ের পিঠে চ'ড়েও এগিয়ে যেতে সাহস করে।

আগেই আমরা জেনেছি, যে-শক্তি এ-যন্ত্রটাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় সেটা বাষ্পও নয় গ্যাসোলিনও নয়, কিংবা এমন-কোনো তরল পদার্থ নয় যার গন্ধ থেকে সেটাকে শনাক্ত করতে পারা যায়—সাধারণত যে-ধরনের তরল পদার্থের সাহায্যে কোনো স্বতশ্চল শকট বা ডুবোজাহাজ চলে। সন্দেহ নেই, যে, এখানে যে-শক্তি ব্যবহার করা হয় তা বিদ্যুৎ—রাশি-রাশি জ্বালানি থেকে, না কি সঞ্চয়কোষ থেকে, ব্যাটারি থেকে? কিছু এ-সব জ্বালানি কোন অগ্নিকুণ্ডে জ্বলে? এ-সব ব্যাটারি চার্জ করে কীভাবে? যদি-না বিদ্যুৎ সরাসরি টেনে-আনা হয় আশপাশের হাওয়া বা জল থেকে—এমন-কোনো পদ্ধতি ব্যবহার ক'রে যার কথা কারুরই জানা নেই। আর আমি মনে-মনে ভেবে নিলুম একবার: একবার যখন এই জাহাজে এসে উঠেছি তখন কি এ-সব রহস্য জেনে নেবার কোনো সুযোগই আমি পাবো না?

তারপরেই মনে প'ড়ে গেলো আমার সঙ্গীসাথীদের কথা, যাদের *ব্ল্যাক রক ক্রীকের* তীরে ফেলে রেখে এসেছি। আমি তো জানি, একজন জখম হ'য়ে প'ড়ে ছিলো; হয়তো অন্যরাও শেষে আহত হয়েছে। আমাকে জাহাজের কাছি টেনে নিয়ে জলে নিয়ে ফেলেছিলো—তা-ই দেখে এটা কি তারা ভেবে নিতে পারবে যে অবশেষে *বিভীষিকাই* আমাকে সলিলসমাধি থেকে উদ্ধার করেছে? না নিশ্চয়ই। সন্দেহ নেই, আমার অপঘাত মৃত্যুর কথা টলেডো থেকে টেলিগ্রাম ক'রে মিস্টার ওয়ার্ডকে এতক্ষণে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন তাহ'লে *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড*-এর বিরুদ্ধে কে আর নতুন অভিযানের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে? ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে যখন কাপ্তেনের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করছি তখন এইসব ভাবনাই আমাকে কুরে-কুরে খাচ্ছিলো। কিন্তু কাপ্তেনের কোনো পাত্তাই নেই।

এদিকে আবার প্রচণ্ড খিদে পাচ্ছে: সম্ভবত গত চব্বিশ ঘণ্টায় পেটে কোনো দানাপানি পড়েনি। বনের মধ্যে তাড়াহুড়ো ক'রে সেই-যে একটু নাশ্‌তা খেয়েছিলাম, তারপর আর-কিছুই খাইনি।—আর যদি তা কাল সন্ধের সময় হ'য়ে থাকে, তাহ'লেও অনেকটা সময় গেছে উপোশ ক'রে। আর এখন আমার জঠরটা যেভাবে মোচড় দিচ্ছে,

তাতে এমনটা হওয়াও বিচিত্র নয় যে আমাকে দু-দিন আগে টেনে তোলা হয়েছিলো *বিভীষিকায়*—কিংবা হয়তো তারও আগে।

তারা কি আমাকে ক্ষুন্নিবৃত্তির সুযোগ দেবে, কেমন ক'রেই বা খাওয়াবে আমায় —এই প্রশ্নের সদুত্তরটা কিন্তু তক্ষুনি মিলে গেলো। গলুইয়ের লোকটা তার পাহারার জায়গা ছেড়ে চ'লে গেলো, ঢাকনা তুলে নিচে নেমে গেলো কোথাও, এবং পরক্ষণেই ফিরে এলো আবার। তারপর, মুখে একটি কথাও না-ব'লে, সে আমার সামনে এসে কিছু খাবার রেখে দিয়ে ফের গলুইতে তার পাহারায় চ'লে গেলো। একটা পাত্রে কিছু মাংস, জারানো শুঁটকি মাছ, বিস্কুট আর এক পাত্র বিয়ার—যেটা এতই কড়া যে আমাকে তার সঙ্গে খানিকটা জল মিশিয়ে নিয়ে হালকা ক'রে নিতে হ'লো। এই সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যের প্রতি যথেষ্ট সুবিচারই করেছিলুম আমি। আমি ক্যাবিন থেকে বেরুবার আগে আমার সহযাত্রীরা নিশ্চয়ই খেয়ে নিয়েছিলো, তাই তারা আমার সঙ্গে ভোজে বসেনি।

ডেকের ওপর আর-কিছুই তেমনভাবে কৌতূহলযোগ্য ব'লে মনে হ'লো না। আমি বরং আবার আমার উত্তেজিত ভাবনাগুলোর মধ্যে তলিয়ে গেলুম। এই অ্যাডভেনচারের শেষ পরিণাম কী হবে? এই অদৃশ্য কাপ্তেনকে কি আমি চাক্ষুষ দেখতে পাবো কখনও? সে কি আমাকে ছেড়ে দেবে, মুক্তি দেবে? সে না-দিলেও, আমি কি নিজের চেষ্টাতেই মুক্তি পেতে পারবো? সেটা অবশ্য নির্ভর করবে, পরিস্থিতি কতটা ঘোরালো হ'য়ে ওঠে, তার ওপর। কিন্তু *বিভীষিকা* যদি তীর থেকে এতখানি দূর দিয়েই চলতে থাকে, কিংবা কখনও ঠিক ক'রে নেয় যে জলের তলা দিয়েই যাবে বাকি পথ, তাহ'লে এখান থেকে আমি পালাবো কী ক'রে? যতক্ষণ-না ডাঙায় গিয়ে পৌঁছুই, আর এই যান রূপান্তরিত হ'য়ে যায় স্বতশ্চল শকটে, ততক্ষণ কি পালিয়ে যাবার সব আশা আমাকে ছেড়েছুড়ে দিয়ে হতাশ ব'সে থাকতে হবে?

তাছাড়া, এটাই বা কবুল করবো না কেন? *বিভীষিকার* গোপন কথা কিছুই না-জেনে শুধু প্রাণটা বাঁচাবার জন্যে পালিয়ে যাওয়া—তাতে সবসময়েই আমার মনটা খচখচ করবে। যদিও আমার এই অভিযানের এই দশার জন্যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করার কোনোই কারণ নেই, যদিও প্রায় এক চুলের জন্যে প্রাণে-মরা থেকে আমি বেঁচে গিয়েছি, আর যদিও ভবিষ্যৎ মনে হচ্ছে আরো-সমস্ত ভয়াবহ অলুক্ষুনে বিপদে ভরপুর—তবু, মানতেই হয় যে, কোনোরকমে তো এক-পা এগুনো গেছে। সত্যি-যে এখানে এ-অবস্থায় থাকলে, জগতের সঙ্গে আর-কোনোদিনই আমি কোনো যোগাযোগ করতে পারবো না, *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড* যেমন স্বেচ্ছায় নিজেকে আইনকানুনের পরপারে স্থাপন করেছে, আমি স্বেচ্ছায় না-হোক দৈববশেই প'ড়ে আছি মনুষ্যজাতির নাগালের বাইরে—তা যদি না-হ'তো, আমি যে অন্তত *বিভীষিকায়* এসে উঠেছি, এই তথ্যটাকেও লোকে মূল্যবান ব'লে গণ্য করতো।

এই জলযান তেমনি সমানে একটানা উত্তর পুবদিকে চলেছে, লেক ইরির সবচেয়ে দীর্ঘ অক্ষটাকেই বেছে নিয়ে অর্ধগতিতে ছুটেছে। তার যে তেমন তাড়া দেখা যাচ্ছে না, তা হয়তো এইজন্যেই সে সবকিছু ঠিকঠাক সারাই করিয়ে নিতে পারেনি, না-হ'লে

এতক্ষণে তো তার হ্রদটার উত্তরপুব সীমান্তেই পৌঁছে যাবার কথা।

এদিকটায় নায়াগ্রা নদী ছাড়া লেক ইরি থেকে বাইরে বেরুবার আর-কোনো রাস্তা নেই। নায়াগ্রা মারফৎই তার জল গিয়ে পড়ে লেক অন্টারিওতে। বাফেলো থেকে মাইল পনেরো দূরে এই নদী একটা প্রচণ্ড প্রপাতের আকারে নদীতে গিয়ে পড়েছে। *বিভীষিকা* যেহেতু ডেট্রয়েট নদীতে পেছিয়ে আসেনি, যা দিয়ে সে ওপরের হ্রদগুলো থেকে এখানে এসে নেমেছিলো, কেমন ক'রে তবে সে এই জলপ্রপাত থেকে রেহাই পাবে—যদি-না অবশ্য শেষ মুহূর্তে সে ঠিক ক'রে নেয় যে সে ডাঙা দিয়েই বাকি পথটা পেরুবে?

সূর্য এতক্ষণে মধ্যগগন পেরিয়ে গেছে। চমৎকার টলটলে একটা দিন, উষ্ণ—তবে গরম নয়, কারণ একটা মৃদু হাওয়া ব'য়ে যাচ্ছে হ্রদের ওপর। হ্রদের দু-তীর এখনও অগোচর : না দেখা যাচ্ছে মার্কিন তীর, না-বা ক্যানাডার সীমান্তরেখা।

কাপ্তেন কি মনে-মনে ঠিক ক'রেই ফেলেছে আমার কাছে সে দেখা দেবে না? নিজেকে এ-রকম গোপন ক'রে রাখবার বিশেষ-কোনো কারণ আছে কি তার? তার এই সতর্কতা দেখে মনে হয় সে হয়তো আমাকে সন্ধের সময় ছেড়ে দেবে—তখন *বিভীষিকা* সকলের অগোচরে তীরের কাছে গিয়ে পৌঁছুতে পারবে।

দুটো নাগাদ—অবশ্য—ছোট্ট একটা আওয়াজ শুনতে পেলুম, দেখলুম মাঝখানের হ্যাচওয়ের ঢাকনাটা উঠে আসছে। যে-লোকটাকে চাক্ষুষ একবার দেখবার জন্যে আমি এমন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলুম, এতক্ষণে সে ডেকে এসে দাঁড়ালে।

কবুল করতেই হবে তার স্যাঙাৎরা যেমন আমাকে কোনো পাত্তাই দেয়নি, সেও আমাকে তেমনিভাবেই কোনো পাত্তা দিলে না। হালের কাছে গিয়ে সে নিজেই এখন হালের চাকা ধ'রে বসলো। যে-লোকটাকে সে ছুটি দিলে তার সঙ্গে নিচু গলায় কী-একটা বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করলে সে; লোকটা তারপর সামনের হ্যাচওয়ে দিয়ে নিচে নেমে গেলো। কাপ্তেন, দিগন্তের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, কম্পাসটা লক্ষ করলে, তারপর জাহাজের মুখটা একটু বদলে দিলে। *বিভীষিকার* গতি ক্রমশ বেড়ে উঠলো।

কাপ্তেনের বয়েস সম্ভবত পঞ্চাশের ওপর। মাঝারি উচ্চতা, বৃষস্কন্ধ, মেরুদণ্ড সোজা; প্রকাণ্ড মাথা, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, শাদা নয়—ছাইরঙা, মসৃণ কামানো গাল, আর ছোট্ট একটুকু মুচমুচে দাড়ি। বিশাল চওড়া বুক, চোয়াল চোখা বেরিয়ে আছে, আর সারা শরীরটাতেই যেন টগবগ ক'রে ফুটছে সুস্বাস্থ্য, ঝোপের মতো জোড়া ভুরু। যেন ইস্পাতে-গড়া তার কাঠামোটা, চমৎকার স্বাস্থ্যের দীপ্তি, আর তার রোদে-পোড়া চামড়ার নিচে উষ্ণ লাল রক্ত যেন ফুটছে। সঙ্গীদের মতো, কাপ্তেনও প'রে আছে নাবিকের পোশাক, তার ওপরে চাপানো অয়েলক্লথের কামিজ, মাথায় একটা পশমি টুপি—ইচ্ছে করলে সে-টুপি হয়তো নাকের ডগা অব্দি নামিয়ে-আনা যায়।

এটা কি এখন ব'লে দেয়া উচিত, যে, লং স্ট্রিটে আমরা বাড়ির ওপর কিছুদিন আগে যে-দুজন লোক নজর রাখছিলো, এই কাপ্তেন ছিলো দুজনেরই একজন। তাছাড়া, আমি যদি তাকে চিনতে পেরে থাকি, তবে সেও নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছে যে আমিই

হলুম চীফ-ইন্‌স্‌পেক্টর স্ট্রক, যার ওপর ভার পড়েছিলো *গ্রেট আইরির* রহস্যভেদ করার!

প্রগাঢ় কৌতূহল নিয়ে তার দিকে তাকালুম আমি। সে যদিও চোখ সরিয়ে নেয়নি, তবু তার জাহাজে যে একজন বাইরের লোক আছে সে-সম্বন্ধে তার চোখেমুখে একটা পরম ঔদাসীন্যের—না কি তাচ্ছিল্যের—ভাব। তাকে দেখতে-দেখতে হঠাৎ আমার কেমন যেন মনে হ'লো—না, ওয়াশিংটনে তাকে যে আগে বাড়ির সামনে দেখেছি, তা নয়—এর আগে কোথাও যেন এই চেহারা আমি আগেই দেখেছি। পুলিশের দফতরে যে-সব ফোটোগ্রাফ আছে, তাদের মধ্যে কি? না কি তার ছবি দেখেছি আমি কোনো দোকানের জানলায়? আবছা যেন মনে পড়তে চাচ্ছে কোথায় এই মুখ আগে দেখেছি, অথচ ঠিক ধরতে পারছি না। হয়তো সবই আমার মনের ভুল।

তার স্যাঙাৎরা অবশ্য আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো কোনো ভদ্রতা দেখায়নি, কিন্তু এর ব্যবহার হয়তো তাদের চেয়ে সভ্য ও শালীন হ'তে পারে। আমারই ভাষায় সে কথা বলে, যদিও সে কোনো মার্কিন কিনা সেটা ঠিক ক'রে বলা মুশকিল। সে হয়তো আমার কথা বুঝতে না-পারার ভান করবে যাতে আমি যতক্ষণ তার *বিভীষিকায়* কয়েদ হ'য়ে আছি ততক্ষণ আমার সঙ্গে তার কোনো কথাবার্তা না-হয়।

তা যদি হয়, তবে সে আমাকে নিয়ে কী করতে চাচ্ছে? সে কি কোনো ভদ্রতার বালাই না-রেখেই আমার একটা সদ্‌গতি ক'রে ফেলতে চাচ্ছে? না কি সে অপেক্ষা করছে কখন রাত নামে—তারপর আমাকে নামিয়ে দেবে জাহাজ থেকে? না কি তার সম্বন্ধে অল্প যা-কিছু আমি জেনেছি—সামান্যই—তা-ই আমাকে তার কাছে এতটা বিপজ্জনক ক'রে তুলেছে যে আমাকে খতম ক'রে না-ফেলে তার কোনো স্বস্তি হবে না? কিন্তু তা-ই যদি তার ইচ্ছে ছিলো, তবে জল থেকে তুলে আমাকে না-বাঁচালেও তো পারতো। আবার ফিরে-একবার আমাকে জলে ডুবিয়ে মারার হাত থেকে নিজেকে তাহ'লে বাঁচাতে পারতো সে।

আমি ফিরে দাঁড়িয়ে, সোজা হালের দিকে এগিয়ে গিয়ে, ঠিক তার মুখোমুখি দাঁড়ালুম। তখন, অবশেষে, আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে না-তাকিয়ে সে পারলে না—কিন্তু তার চোখ দুটো যেন দপদপ ক'রে জ্বলছিলো।

'আপনিই এ-জাহাজের কাপ্তেন?' আমি তাকে শুধোলুম।

তার মুখে টুঁ শব্দটি নেই।

'এই জাহাজ! এ কি সত্যি *বিভীষিকা* জাহাজ?'

এই প্রশ্নের উত্তরে তার কাছ থেকে কোনো সাড়াই পাওয়া গেলো না। তারপর আমি তার দিকে একটু ঝুঁকে পড়লুম, হয়তো তার হাতটা ধরতুম, কিন্তু গায়ের জোর না-দেখিয়েই সে আমার হাতটা সরিয়ে দিলে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছিলো তার ঐ ভঙ্গিটার আড়ালে কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি।

আবার তার সামনে নিজেকে দৃঢ়ভাবে দাঁড় করিয়ে, আমি অপেক্ষাকৃত জোর গলায় জানতে চাইলুম: 'আমাকে নিয়ে আপনি কী করবেন ব'লে ভাবছেন?'

তার মুখ থেকে যেন একরাশ কথা ফুটে বেরুতে গিয়েও থমকে গেলো, অনেক কষ্টে নিজেকে সে দমন করলে—কথা বলবে না। মুখটা সে একপাশে ফিরিয়ে নিলে। তার হাত সামনের যন্ত্রটার কী-একটা বোতামে চাপ দিলে, অমনি দুম ক'রে *বিভীষিকার* গতি বিষম বেড়ে গেলো।

রাগে আমার পা থেকে মাথা অব্দি জ্ব'লে যাচ্ছিলো। চেঁচিয়ে বলতে চাচ্ছিলুম: '*ঠিক* আছে! তা-ই হোক তবে! পুষে রাখো তোমার *ঐ* স্তব্ধতা! আমি জানি তুমি কে—যেমন জানি তোমার এই যন্ত্রটাকেও—লোকে যাকে দেখেছে ম্যাডিসনে, বস্টনে, লেক কিরডালে। হ্যাঁ, তুমি, তুমিই—যে-তুমি অমন খ্যাপার মতো ঝড়ের বেগে ছুটে গেছো আমাদের জলে-ডাঙায়! তোমার এই জাহাজের নাম *বিভীষিকা*, তুমিই তার মালিক, তুমিই সরকারকে অমন স্পর্ধিত চিঠি লিখেছিলে! তুমি ভেবেছো তোমার এই *দুর্বারগতি বিভীষিকা* নিয়ে আস্ত জগৎটার সঙ্গে লড়বে! নিজেকে তুমি কি না বলো নিখিলের প্রভু, জগতের প্রভু, *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড!*'

আর যদি তা বলতুম, কথাগুলো তবে সে অস্বীকার করতো কী ক'রে! কেননা ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার চোখে প'ড়ে গেছে সারেঙের ঢাকার গায়ে লেখা আদ্যক্ষরগুলো: *মা. আ. ও.*!

ভাগ্যিশ আমি নিজেকে সংযতই রেখেছিলুম; আর, কোনো কথারই কোনো উত্তর পাবো না বুঝতে পেরে, নিরাশ, ভগ্নোদ্যম, আমি ফিরে এলুম আমার ক্যাবিনে যাবার হ্যাচওয়েটার পাশের আসনে।

অনেক, অনেকক্ষণ ধ'রে, দীর্ঘ সুদীর্ঘ সব ঘণ্টা, বিলম্বিত সব প্রহর, আমি হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলুম দিগন্তের দিকে—কখন ডাঙা চোখে পড়ে। হ্যাঁ, ব'সে-ব'সে অপেক্ষাই করছিলুম ডাঙার জন্যে। কেননা হ্রস্বীভূত হ'তে-হ'তে এখন আমি তা-ই হ'য়ে উঠেছি: মনুষ্যদেহের মধ্যে জলজ্যান্ত এক প্রতীক্ষা! দিন শেষ হবার আগে, *বিভীষিকা* যে লেক ইরির শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছুবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই—কেননা সে সামনে, একটানা, সেই উত্তরপুবদিকেই চলেছে।

১৪

প্রপাতের নাম নায়াগ্রা

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলো অথচ পরিস্থিতিতে একফোঁটাও বদল নেই। অন্য স্যাঙাৎরা আবার ফিরে এসেছে ডেকে, আর কাপ্তেন, নেমে গিয়ে, এনজিনের কলকব্জা নিয়ে কী-সব খুটখাট শুরু করেছে। গতি-বেড়ে-যাওয়া সত্ত্বেও যন্ত্র কিন্তু কোনো আওয়াজ না-

ক'রেই নিঃশব্দে কাজ ক'রে চলেছে—আর কী ছিমছাম মসৃণ সবকিছু। কোথাও একবারও কোনো ছেদ পড়ছে না, সাধারণত যেমন হয় সব মোটরেই, এক-আধবারে হয়তো পিস্টন দু-এক সেকেণ্ড থেমে যায়। আমার মনে হ'লো, *বিভীষিকার* যখন একেকটা রূপান্তর হয়, তখন সেটা ঘটায় কোনো রোটারি যন্ত্র। অবশ্য এটা আমার অনুমান, ঠিক ক'রে যাচাই ক'রে নেবার কোনো সুযোগই ছিলো না। এতক্ষণ ধ'রে একবারও দিক বদলায়নি *বিভীষিকা*। সারাক্ষণই আমরা শুধু হ্রদের উত্তরপুবদিকে চলেছি—তার মানে বাফেলোর দিকে।

কাপ্তেন যে কেন এই পথেই চলেছে, সেটাই আমি সারাক্ষণ অবাক হ'য়ে ভেবেছি। সে নিশ্চয়ই বাফেলোতে থামতে চাচ্ছে না, সেখানে তো সারাক্ষণই কত ধরনের নৌকোর ভিড় লেগেই আছে। যদি জলপথেই এই হ্রদ ছেড়ে সে চ'লে যেতে চায় তাহ'লে বাকি থাকে শুধু নায়াগ্রা নদী—আর তার জলপ্রপাত এমন-একটা আশ্চর্য যানের পক্ষেও অতিক্রম করা অসম্ভব। বেরুবার আরেকটা রাস্তা ছিলো ডেট্রয়েট নদী, অথচ *বিভীষিকা* তো সারাক্ষণই তাকে পেছনে ফেলে আসছে।

হয়তো কাপ্তেন আসলে রাত্তিরেরই অপেক্ষা করছে—হয়তো তখন অন্ধকারের গা ঢেকে সকলের অগোচরে জলযানকে স্বতশ্চল শকটে রূপান্তরিত ক'রে শেষে চটপট পাশের রাজ্যগুলো পেরিয়ে যাবে। ডাঙার ওপর দিয়ে যখন যাবে, তখন যদি আমি পালাতে না-পারি, আমার মুক্তি পাবার সব আশাই ধূলিসাৎ হ'য়ে যাবে।

এখনও-অব্দি কেউ যা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি, তা হয়তো আমি এর মধ্যে আবিষ্কার ক'রে ফেলবো—অবশ্য সে যদি তার মধ্যেই আমাকে *খতম* ক'রে না-ফ্যালে—কেননা তার মঙ্গলের পক্ষে বিপজ্জনক বড্ড-বেশি কথা আমি এর মধ্যেই জেনে ফেলেছি।

লেক ইরির উত্তরপুব প্রান্তটা আমি ভালোই চিনি, কারণ অনেকবারই নিউ-ইয়র্ক রাজ্যের অ্যালবানি থেকে বাফেলো অব্দি আমাকে যাতায়াত করতে হয়েছে। তিন বছর আগে, কোনো-একটা পুলিশি তদন্তের কাজে আমাকে নায়াগ্রা নদীর দু-তীর ভালো ক'রে পরীক্ষা করতে হয়েছিলো, জলপ্রপাতের দুই পাশেই, এমনকী সাস্‌পেনশন ব্রিজের ওপরেও। বাফেলো আর ছোট্ট শহর নায়াগ্রা ফল্‌স-এর মধ্যকার বড়ো দুটি দ্বীপেও আমি গিয়েছি; ভালো ক'রে দেখে এসেছি নেভি আইল্যাণ্ড আর গোট আইল্যাণ্ড—এই দুটো দ্বীপই মার্কিন প্রপাতটিকে ক্যানাডার প্রপাত থেকে আলাদা ক'রে রেখেছে।

ফলে, পালিয়ে যাবার কোনো সুযোগ যদি এসেই পড়ে, একেবারে অচেনা কোনো বিজনবিভুঁয়ে গিয়ে পড়বো না আমি। কিন্তু তেমন-কোনো সুযোগ কি সত্যি আসবে? আর আমার অন্তরের অন্তস্তলেও, আমি কি তা সত্যি-সত্যি কামনা করছি—কিংবা সুযোগ এলে সেটা কি আমি সত্যি গ্রহণ করবো? আর-কোন রহস্য ঘোরপ্যাঁচ তৈরি ক'রে আছে ব্যাপারটায়, যা আমার সৌভাগ্য—না কি সে দুর্ভাগ্যই?—আমাকে এমনভাবে পাকে-পাকে জড়িয়ে ফেলেছে?

নায়াগ্রা নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছুবার সত্যি কোনো আশা আছে ব'লে অবশ্য আমার মনে হয় না। যেখান থেকে বেরুবার কোনো রাস্তাই নেই, সেখানে গিয়ে ঢোকবার মতো দুঃসাহস *বিভীষিকার* হবে কেন? হয়তো সে হ্রদটার শেষ প্রান্ত অব্দি যাবেই না।

আর এইসব উলটোপালটা ভাবনাই আমার মগজের মধ্যে অনবরত পাক খাচ্ছিলো—আর চোখ দুটো সারাক্ষণ চুম্বকের মতো আটকে ছিলো শূন্য দিগন্তের দিকে। আর সবসময়েই ছিলো নাছোড় একটা প্রশ্ন, যার মীমাংসা আমার জানা নেই। কাপ্তেন কেন নিজে আমাকে অমনভাবে হুমকি দিয়ে চিঠিটা লিখেছিলো? ওয়াশিংটনে আমার বাড়ির ওপর সে নজর রেখেছিলো কেন? সে-কোন বন্ধন তাকে *গ্রেট আইরির* সঙ্গে বেঁধে রেখেছে? মাটির তলায় অজানা সুড়ঙ্গের মতো খাল হয়তো আছে লেক কিরডালে, যে-সুড়ঙ্গ দিয়ে সে গিয়ে ঢুকতে পেরেছিলো ঐ হ্রদে, কিন্তু কেমন ক'রে সে *গ্রেট আইরির* অভেদ্য দুর্গপ্রাকার ভেদ ক'রে ভেতরে ঢুকবে? না, না, সে যতই অদ্ভুতকর্মা মায়াবী পুরুষ হোক না কেন, এটা তার পক্ষেও অসাধ্য।

বিকেল চারটে নাগাদ, *বিভীষিকার* গতিবেগ দেখে আর যেদিকে চলেছে সেদিকে খেয়াল রেখে, আমি বুঝতে পারলুম আমরা নিশ্চয়ই বাফেলোর কাছে এসে পৌঁছেছি—আর, সত্যিই, প্রায় পনেরো মাইল আগে থাকতেই, দূর থেকে তার তীরের রেখা দেখা যেতে লাগলো। এতটা পথ চলবার সময় দূর থেকে জলে কয়েকটা নৌকো বা স্টীমবোট দেখা গেছে বটে, তবে সেগুলো এত দূর দিয়ে গেছে—কিংবা যদি নাও যেতো, এই কাপ্তেনই ইচ্ছে ক'রে দূরত্ব বজায় রেখে দিতো—যে তাকে এ-সব পোতের সঙ্গে *দেখা-হওয়া* বলে না। তার ওপর, এই চুরুটের মতো লম্বা *বিভীষিকা* জলের থেকে বেশি ওপরে থাকে না কখনোই, নিচুই থাকে সে, তাতে এক মাইল দূর থেকে দেখলে সে আছে কি নেই তা-ই হয়তো বোঝা সম্ভব হ'তো না।

এখন অবশ্য, বাফেলো থেকেও দূরে, তার পরপারে, লেক ইরির শেষ প্রান্তটাকে ঘিরে যে-পাহাড়গুলো আছে সেগুলোকে দেখা যেতে লাগলো। একটা চোঙের মতো যেন, আর তারই মধ্য দিয়ে গিয়ে লেক ইরির জল পড়েছে নায়াগ্রা নদীতে। ডানদিকে উঠে গেছে কতগুলো বালিয়াড়ি, এখানে-সেখানে জড়াজড়ি ক'রে আছে গাছপালা। দূরে, কতগুলো মালবওয়া স্টীমার আর জেলে-নৌকো ভেসে চলেছে। আকাশে কোথাও-কোথাও ধোঁয়ার কুণ্ডলি, এ-সব স্টিমারের চোঙ দিয়ে সে-সব ধোঁয়া আকাশে উঠছে, তারপরেই হালকা ভেসে যাচ্ছে পুরবৈঁয়া হাওয়ায়।

এখনও বাফেলোর দিকেই এগিয়ে চলেছে ব'লে আমাদের কাপ্তেন যে কী ভাবছে, তা-ই বুঝতে পারলুম না। বিচক্ষণতা ব'লে তার যদি কিছু থেকে থাকে, সে কি তবে তাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছে না? প্রতি মুহূর্তেই আশা করছি, চাকা ঘুরিয়ে সে জলযানের দিক পালটে পশ্চিমমুখো চ'লে যাবে, আর নয়তো, সে প্রস্তুতি নেবে ভুউশ ক'রে জলের মধ্যে ডুবে যাবার। কিন্তু জাহাজের গলুইটা সারাক্ষণ বাফেলোর দিকে জেদির মতো চালিয়ে সে-যে কী করতে চাচ্ছে, তা-ই বোঝা যাচ্ছিলো না।

অবশেষে—এতক্ষণ যাকে সারেঙ ব'লে মনে হচ্ছিলো—যার চোখদুটি উত্তরপুবের তীরে চুম্বকের মতো আটকে ছিলো, তার সাথীর দিকে তাকিয়ে কী-একটা ইঙ্গিত করলে। সাথীটি গলুই ছেড়ে সোজা চ'লে গেলো মধ্যেকার হ্যাচওয়ের দিকে আর এনজিন-ঘরে নেমে পড়লো। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কাপ্তেন এসে হাজির হ'লো ডেকে, আর সারেঙের কাছে গিয়ে নিচু গলায় তার সঙ্গে কী-এক আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে পড়লো।

সারেঙ, বাফেলোর দিকে হাত বাড়িয়ে, ছোটো-ছোটো দুটি কালো-কালো ফুটকির মতো কী যেন দেখালে—জাহাজ থেকে পাঁচ-ছ মাইল দূরে রয়েছে সেই কালো বিন্দুগুলি। কাপ্তেন গভীর মনোনিবেশ সহকারে সেগুলো নিরীক্ষণ করলে, তারপর তাচ্ছিল্যভরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে, সে চাকার হাতলের কাছে ব'সে পড়লো। *বিভীষিকা* কিন্তু সমানে সামনেই এগিয়ে চললো, তার চলার পথ পালটালো না।

মিনিট পনেরো পরে, আমি দেখতে পেলুম ঐ কালো-কালো ফুটকিগুলো আর-কিছু নয়, কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলি। আস্তে-আস্তে সেই ধূম্রকুণ্ডলির তলায় কালো জিনিশগুলো স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, দুটো লম্বা নিচু স্টীমার, বাফেলোর বন্দর থেকে বেরিয়ে তারা দ্রুতবেগে *বিভীষিকার* দিকে ছুটে আসছে।

আচমকা আমার মনে হ'লো এই দুটো সেই টরপেডো-ডেস্ট্রয়ার নয় তো, একদিন প্রসঙ্গক্রমে মিস্টার ওয়ার্ড যাদের কথা বলেছিলেন! আরো বলেছিলেন, দরকার মনে হ'লে, আমি যেন তাদের খবর দিই।

এই ডেস্ট্রয়ারগুলো সর্বাধুনিক কারিগরিবিদ্যার নিদর্শন। এ-দেশে বানানো সবচেয়ে দ্রুতগামী স্টীমবোট। সর্বাধুনিক প্রকৌশলবিদ্যায় তৈরি অতীব-শক্তিশালী এনজিন এদের চালায়। এরা এর মধ্যেই ঘণ্টায় প্রায় তিরিশ মাইল পথ পেরিয়ে এসেছে। সত্যি-যে, *বিভীষিকা* আরো-দ্রুততর বেগে যেতে পারে, আর চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরলে সে ভুউশ ক'রে ডুবে গিয়ে সকলের হাত এড়িয়ে যেতে পারে। *বিভীষিকাকে* যদি আক্রমণ করতেই হয়, তাহ'লে এই ডেস্ট্রয়ারগুলোকে ডুবোজাহাজও হ'তে হবে, না-হ'লে সাফল্যের কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। আর তৎসত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা সমানে-সমানে হবে কি না, সে-বিষয়ে আমার সবিশেষ সন্দেহ ছিলো।

তবে হাবভাব দেখে মনে হ'লো এই দুই ডেস্ট্রয়ারের কম্যাণ্ডারদের নিশ্চয়ই হুঁশিয়ার ক'রে দেয়া হয়েছে : হয়তো ওয়েল্‌স চটপট টলেডো ফিরে গিয়ে টেলিগ্রাম ক'রে আমাদের হারের কথা জানিয়ে দিয়েছে। এও মনে হ'লো, এই জাহাজগুলো বুঝি *বিভীষিকাকে* দেখতেও পেয়েছে, কেননা তারা পুরোদমে *বিভীষিকাকে* লক্ষ্য ক'রেই ছুটে আসছে। অথচ *বিভীষিকার* কাপ্তেন তাদের কোনো পাত্তাই না-দিয়ে সোজা নায়াগ্রা নদীর দিকে এগিয়ে চলেছে। এ-অবস্থায় এই ডেস্ট্রয়ারগুলো কী করবে? হয়তো তারা এমন কৌশল ক'রে হ্রদের সেই সরুপথটা আটকে দাঁড়াবে যেখান দিয়ে হ্রদের জল গিয়ে নায়াগ্রায় পড়েছে—যাতে *বিভীষিকা* কিছুতেই ঐ নদীতে গিয়ে পড়তে না-পারে।

বিভীষিকার কাপ্তেন স্বয়ং এবার হালে বসেছে, সারেঙের চাকায় তার হাত। একজন

সাগরেদ গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে, অন্যজন নিচে এনজিনঘরে। আমাকে কি তাহ'লে এখন হুকুম করা হবে নিচে আমার ক্যাবিনে চ'লে যেতে?

সে-রকম কোনো নির্দেশ এলো না দেখে আমি বরং খুব খুশিই হলুম। সত্যি-বলতে, আমাকে এরা কেউই কোনো পাত্তা দিচ্ছিলো না। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিলো, বুঝি আমি কখনও *বিভীষিকায়* এসে উঠিইনি। সেইজন্যেই আমি মিশ্র মনোভাব নিয়ে সেই ডেস্ট্রয়ার দুটির ধেয়ে-আসা লক্ষ করতে লাগলাম। ঠিক যখন এদের সঙ্গে *বিভীষিকার* দূরত্ব মাত্র দু-মাইলের মতো, তখন এরা দু-পাশে চ'লে গেলো, যাতে দু-পাশ থেকে *বিভীষিকাকে* তাগ ক'রে কামান দাগতে পারে।

আর *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড*? তার হাবভাবে প্রচণ্ড একটা তাচ্ছিল্য ফুটে বেরুচ্ছিলো। ভঙ্গিটা এমন, জানেই যে ডেস্ট্রয়ার দুটি তার বিরুদ্ধে কিছু করতে অক্ষম। তাদের গতি যা-ই হোক না কেন, একটা বোতাম টিপলেই সে তাদের পাল্লা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। কিংবা হয়তো ডুবই মারবে হ্রদের জলে, আর কোনো নিক্ষিপ্ত অস্ত্রই তার আর নাগাল পাবে না জলের তলায়।

পাঁচ মিনিট পরে, ডেস্ট্রয়ার দুটির সঙ্গে দূরত্ব হ্রাস পেয়ে প্রায় একমাইল হ'য়ে এলো। *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড* তাদের আরো এগুতে দিলে। তারপর যখন তারা কাছে এসে পড়েছে, অমনি একটা হাতল ধ'রে টান দিলে সে। *বিভীষিকা* প্রায় যেন দ্বিগুণ গতিতে আচমকা হ্রদের জলে লাফিয়ে এগিয়ে গেলো। ডেস্ট্রয়ারগুলোর সঙ্গে সে যেন ছেলেখেলা খেলছে, বেড়াল যেমন ক'রে খেলে ইঁদুরদের সঙ্গে! ভয় পেয়ে কোথায় পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে, তা নয়, সে বরং সোজা আপন খেয়ালখুশি মতো নিজের পথেই চলেছে। কখনও কি সে তার বিষম দম্ভ আর ঔদ্ধত্য দেখিয়ে দুই দুশমনের মাঝখান দিয়ে তাচ্ছিল্য-ভরে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করবে? টোপ যেন, লোভ দেখাবে তাদের, তার পেছন নিতে তাতিয়ে দেবে তাদের, তারপর ঘুটঘুটে আঁধার রাত নেমে এলে বাধ্য হ'য়ে নিজে থেকেই ডেস্ট্রয়ারগুলো এই রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাবে!

হ্রদের পাশে বাফেলো নগরী তখন স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। মস্ত-সব দালানকোঠা দেখতে পাচ্ছি আমি, বড়ো-বড়ো সব বিশাল-উঁচু অট্টালিকা, চার্চগুলোর গম্বুজ, শস্য মাড়াইয়ের কলের চাকা ঘুরে যাচ্ছে অবিরাম। মাত্র চার-পাঁচ মাইল সামনে, উত্তর দিকে, খুলে গিয়েছে নায়াগ্রার নদীর জলপথ।

এই অভিনব পরিস্থিতিতে আমার নিজের কী করা উচিত? যখন ডেস্ট্রয়ারগুলোর সামনে দিয়ে যাবো, আমি *বিভীষিকা* থেকে লাফিয়ে পড়বো জলে? আমি ভালো সাঁতার জানি, এবং এ-রকম সুযোগ হয়তো আর-কখনোই আসবে না। *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড* নিশ্চয়ই থেমে প'ড়ে আমাকে ফের কয়েদ করবার চেষ্টা করবে না। ডুবসাঁতার দিয়ে গিয়ে আমি কি এদের বন্দুকের গুলিকে এড়িয়ে যেতে পারবো না? ডেস্ট্রয়ারগুলোর খালাশিরা নিশ্চয়ই আমাকে দেখতে পাবে জলে সাঁতার কাটছি, নিশ্চয়ই তাদের সতর্ক ক'রে দেয়া হয়েছে যে আমি *বিভীষিকায়* বন্দী হ'য়ে আছি। আমাকে উদ্ধার করার জন্যে তারা কি কোনো নৌকো ভাসিয়ে দেবে না?

বিভীষিকা যদি নায়াগ্রা নদীর সরু খাতটায় ঢোকে, আমার পালাবার সম্ভাবনা অনেকগুণ বেড়ে যাবে। নেভি আইল্যাণ্ডে আমি এমন শক্ত জমির ওপর পা রাখতে পারবো, যার সব হাল-হদিশ আমার জানা। কিন্তু *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড* ঢুকবে এই সরু নদীর খাতে, তাহ'লে-যে বিশাল জলপ্রপাতটা থেকে তাকে নিচে আছড়ে পড়তে হবে! তা নিশ্চয়ই সে করবে না। আমার বরং অপেক্ষা করা উচিত ডেস্ট্রয়ার দুটো কখন সবচেয়ে কাছে আসে।

অথচ তবু আমার এই পালাবার ইচ্ছেটা আদৌ উদগ্র ছিলো না—কেমন-একটা অর্ধমনস্ক ভঙ্গিতেই আমি এ-সব কথা ভাবছিলুম। এই রহস্য ভেদ করার সমস্ত আশা জলাঞ্জলি দিতে কোথায় যেন বাধো-বাধো ঠেকছিলো। পুলিশের গোয়েন্দা হিশেবে আমার সমস্ত অন্তরাত্মাই যেন পালাবার পরিকল্পনার বিপক্ষে রুখে উঠেছে। যে-লোকটাকে সরকার *আইনকানুনের পরপারে* ব'লে ঘোষণা করেছে, *সমাজবিরোধী* ব'লে চিহ্নিত করেছে, তাকে পাকড়ে ধরতে হ'লে শুধু একটা হাত বাড়ালেই হয়! আমি কি তাকে আমার কবল থেকে পালিয়ে যেতে দেবো? না, জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করবোই না! অথচ এটাও কি জানি, *বিভীষিকা* আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে, আর কী তোলা আছে আমার কপালে?

সোয়া-ছটা বাজে এখন। ডেস্ট্রয়ারগুলো এমনই পুরোদমে কাছে এগিয়ে আসছে যে তারা থরথর ক'রে কাঁপছে। সরাসরি সামনে এসে পড়েছে তারা এখন—দুটি ডেস্ট্রয়ার পরস্পরের মধ্যে মাত্র সামান্য দূরত্ব রেখেছে, যাতে মাঝখানে চেপে ধরতে পারে *বিভীষিকাকে*। আর *বিভীষিকা,* গতি বাড়াবার কোনো চেষ্টা না-ক'রেই দেখতে পেলে, দু-দিক থেকে দুটো ডেস্ট্রয়ার তাকে কোণঠাশা ক'রে ফেলবার চেষ্টা করছে।

আমি আমার জায়গা থেকে একপাও নড়িনি। গলুইয়ের লোকটা আমার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। সারেঙের চাকার সামনে নিশ্চল দাঁড়িয়ে কুঞ্চিত জোড়াভুরুর তলায় দপদপ জ্বলন্ত চোখে, অপেক্ষা ক'রে আছে *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড*। সে হয়তো আস্তিনে লুকিয়ে-রাখা কোনো শেষ চাল চেলে এক্ষুনি এই অনুসরণকারীদের ভড়কে দিয়ে পালিয়ে যাবে!

হঠাৎ, আমাদের বাঁ পাশের ডেস্ট্রয়ারটা থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে একঝলক ধোঁয়া উঠলো। একটা টরপেডো, জল প্রায় ছুঁয়েই, *বিভীষিকার* সামনে দিয়ে ছুটে চ'লে গেলো, ডান পাশের ডেস্ট্রয়ারটার কাছ দিয়ে।

উৎকণ্ঠিতভাবে তাকিয়ে দেখি উঁচু টঙের ওপর *লুকআউটের* পাখির খোপ থেকে কে-একজন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা ক'রে আছে *বিভীষিকার* কাপ্তেনের কাছ থেকে কী ইঙ্গিত আসে। *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড* এমনকী মুখ ঘুরিয়ে সেদিকটায় তাকায়নি পর্যন্ত : তখন তার মুখে যে-তাচ্ছিল্য আর ঘৃণা আমি দেখেছিলুম, তা আমি জীবনেও ভুলবো না।

আর ঠিক তক্ষুনি, আচমকা এক ধাক্কায় আমাকে আমার ক্যাবিনটার হ্যাচওয়ের দিকে ঠেলে দেয়া হ'লো, তারপর যেই আমি ক্যাবিনে নেমেছি অমনি ওপরের ঢাকনাটা

বন্ধ হ'য়ে গেলো। শব্দ শুনে বুঝতে পারলুম, অন্য হ্যাচওয়েগুলোও তখন এঁটে বন্ধ ক'রে দেয়া হয়েছে। ডেক এখন জল-নিরোধ-করা। কোথায় একটা এনজিনে একটা হালকা ধকধক আওয়াজ হ'লো, আর অমনি *বিভীষিকা* ডুবে গেলো জলের তলায়।

আমাদের মাথার ওপর তখনও কামান দাগার আওয়াজ উঠছে। তাদের প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি কানে বাজলো কিছুক্ষণ, তারপর সব স্তব্ধ, চুপচাপ। আমার ক্যাবিনের গবাক্ষটা দিয়ে শুধু ক্ষীণ-একটু আলো ঢুকছে ভেতরে। ডুবোজাহাজ মসৃণ গতিতে পিছনে এগিয়ে যাচ্ছে জলের তলা দিয়ে। কী দ্রুতবেগে, কী অনায়াসে যে এই রূপান্তর ঘটেছিলো, তা আমি নিজের চোখেই দেখেছি। হয়তো যখন সে স্বতশ্চল শকটে রূপান্তরিত হবে, তখনও বদলটা হবে এমনি ক্ষিপ্র ও আয়াসহীন।

কী করবে এখন *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড*? হয়তো ডুবোজাহাজের দিকবদল করবে সে, যদি-না সে ডাঙায় উঠে স্থলপথে রাজ্যের পর রাজ্য পেরিয়ে যেতে চায়। পশ্চিমে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে, ডেস্ট্রয়ারগুলোর সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি ক'রে, আবারও হয়তো গিয়ে পড়তে পারে ডেট্রয়েট নদীতে। শুধু হয়তো কামানের পাল্লা থেকে বেরিয়ে আসতে যতটুকু সময় লাগে, ততক্ষণই আমরা থাকবো জলের তলায়, কিংবা হয়তো ততক্ষণই ডুবে থাকবো, যতক্ষণ-না নেমে আসে রাতের আঁধার।

ভবিতব্য, অবশ্য, এই উত্তেজনায়-ভরা পেছন-ধাওয়ার অন্যরকম উপসংহারই স্থির ক'রে রেখেছিলো। দশ মিনিটও কাটেনি, হঠাৎ মনে হ'লো ডুবোজাহাজের মধ্যে কী-একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। এনজিন-ঘরে দ্রুত কী-সব কথা চালাচালি হচ্ছে। যে-এনজিন এতক্ষণ নিঃশব্দে চলছিলো, এখন সেটা বিদঘুটে সব ছন্দহারা আওয়াজ করতে শুরু করেছে। কোনো দুর্ঘটনার জন্যে এখন বুঝি ডুবোজাহাজ তবে আবার ভেসে উঠবে জলের ওপর!

আমার ধারণা যে নির্ভুল, তার প্রমাণ হিশেবেই পরক্ষণে আমার ক্যাবিনের আবছায়া ভ'রে গেলো খটখটে দিনের আলোয়। *বিভীষিকা* আবার জলের ওপর ভেসে উঠেছে। ডেকের ওপর কাদের যেন পায়ের শব্দ। আবার ঢাকনা খুলে দেয়া হ'লো হ্যাচওয়েগুলোর, এমনকী আমারটার শুদ্ধু। আমি লাফ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম ওপরে।

দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড আবারও সারেঙের চাকায় দাঁড়িয়ে, অন্য দুজন নিচে এনজিনঘরে ব্যস্তভাবে কী-সব খুটখাট করছে। ডেস্ট্রয়ারগুলো এখনও পেছন ছাড়েনি, তারা সম্ভবত মাত্র সিকি মাইল দূরে, এখন! *বিভীষিকাকে* দেখে তারা পুরোদমে ছুটে আসছে—আর *বিভীষিকা* আবারও ছুটে চলেছে নদী-নায়াগ্রার দিকে।

কবুল করি, এই রণকৌশলের মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারিনি। যেন একটা কানাগলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে *বিভীষিকা*, কোনো অভাবিত যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে জলের তলা দিয়ে পালিয়ে যেতে পারছে না সে, ডুবোজাহাজ হিশেবে, আর তার ফেরবার রাস্তা ডেস্ট্রয়ারগুলোর জন্যে রুদ্ধ। তাহ'লে সে কি এখন ডাঙায় উঠে যেতে চাচ্ছে? আর তা যদি সে করে, পর-পর যে-সব টেলিগ্রাম চালাচালি হবে সারা মার্কিন মুলুকে, সব রাজ্যে পুলিশ যখন হুঁশিয়ার হ'য়ে যাবে, তখন সে তাদের হাত এড়িয়ে কোথায়

পালাবে, কোথায় যাবে?

এমনকী মাত্র আধমাইলও আর আমরা এগিয়ে নেই। ডেস্ট্রয়াররা আমাদের পেছনে পুরোদমে ধেয়ে আসছে : এখন সরাসরি আমাদের পেছনে থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের কামান দাগবার মতো অবস্থায় নেই মোটেও। *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড* শুধু এই ব্যবধানটুকু বজায় রেখেই খুশি, যদিও ইচ্ছে করলে সে *বিভীষিকার* গতি আরো বাড়িয়ে দিতে পারতো —তারপর রাত নেমে এলে ডেস্ট্রয়ারগুলোর চোখে ধুলো দিয়ে তাদের হাত এড়িয়ে পালিয়ে যেতে পারতো।

-এরই মধ্যে আমাদের ডানদিকে বাফেলো হারিয়ে গেছে, আর সন্ধে সাতটার একটু পরই নদী নায়াগ্রার মুখটা আমাদের সামনে খুলে গেলো। যদি সে ওখানে ঢোকে, আর-যে ফিরে যেতে পারবে না সেটা জেনেই; তাহ'লে বুঝতে হবে যে *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড*-এর মাথাটা পুরোপুরি বিগড়ে গিয়েছে। আর, সত্যি-তো, পাগলই তো সে আসলে, নইলে কেউ নিজেকে অমনভাবে নিখিলের প্রভু জগতের প্রভু ব'লে ঘোষণা করে? আমি তাকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলুম শুধু : শান্ত, উদাসীন, ছন্নছাড়া, একবারও ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে না পর্যন্ত ডেস্ট্রয়ারগুলো এখন কতটা এগিয়ে এসেছে। আমি লোকটাকে যত দেখছি, ততই তাজ্জব হ'য়ে যাচ্ছি।

হ্রদের এ-প্রান্তটা ফাঁকা, পরিত্যক্ত। আপার-নায়াগ্রার তীরের শহরগুলোতে মালবোঝাই যে-সব স্টীমার যায়, চিরকালই তাদের সংখ্যা কম থাকে, যেহেতু এদিকটায় কোনো পোত চালানো দারুণ বিপজ্জনক। কাউকে কোথাও চোখে পড়ছে না এখন : এমনকী কোনো ছোট্ট জেলেডিঙিও এতক্ষণে *বিভীষিকার* পথে পড়েনি। ডেস্ট্রয়ার দুটোকে অব্দি একটু পরেই থমকে থেমে গিয়ে ভাবতে হবে আর তারা ধাওয়া ক'রে আসবে কি না, যদি আমরা এমন খ্যাপার মতো প্রপাতটার দিকেই এগিয়ে যাই!

আগেই বলেছি, নদী-নায়াগ্রা নিউ-ইয়র্ক রাজ্য আর ক্যানাডার মধ্য দিয়ে ব'য়ে চলেছে। চওড়ায় সে মোটমাট হয়তো পৌনে-এক মাইল হবে, যত প্রপাতটার দিকে এগিয়ে যায় ততই সংকীর্ণ হ'য়ে আসে। লেক ইরি থেকে লেক অনটারিও অব্দি ধরলে তার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় পনেরো লিগ, যে ব'য়ে যায় উত্তরমুখো, যতক্ষণ-না সে লেক সুপিরিয়র, মিশিগান, হুরন আর ইরির জল লেক অন্টারিওতে ঢেলে দেয়, এই বিশাল হ্রদগুলোর সবচেয়ে পশ্চিমে এই লেক। এই নদীটার ঠিক মাঝখানটায় সেই জগৎবিখ্যাত জলপ্রপাত, দেড়শো ফিট ওপর থেকে নিচে আছড়ে পড়ে জল, গ্যালন-গ্যালন, অনর্গল। কেউ-কেউ একে বলে হর্সশু ফল্‌স, কেননা ভেতর দিকে সে ঘোড়ার নালেরই মতো বেঁকে গিয়েছে। ইণ্ডিয়ানরা তার নাম দিয়েছে *জলের বজ্র*, আর সত্যি-বলতে বাজ ফাটার মতোই জল আছড়ে পড়ে নিচে, তার উচ্ছ্বাস আর প্রতিধ্বনি শোনা যায় কত-যে মাইল দূর থেকে।

লেক ইরি আর ছোট্ট নায়াগ্রা ফল্‌স শহরটার মাঝামাঝি নদীর তুলকালাম জলপ্রবাহকে দ্বিধাবিচ্ছিন্ন ক'রে গেছে দুটি ছোটো দ্বীপ, প্রপাতটার এক লিগ ওপরে

আছে নেভি আইল্যাণ্ড, আর গোট আইল্যাণ্ড—যে-অজদ্বীপ আমেরিকা আর ক্যানাডার প্রপাত দুটিকে আলাদা ক'রে রেখেছে। এই দ্বীপের শেষমুখটায় একদা দাঁড়িয়েছিলো *টেরাপিন টাওয়ার*, যে-স্তম্ভটা দুঃসাহসী মিস্ত্রিরা তৈরি করেছিলো প্রপাতের জল আছড়ে পড়ার ঠিক মুখটাতে। অবিশ্রাম জলের ঘায়ে খ'য়ে যেতে-যেতে সেই স্তম্ভটা এখন ভেঙে পড়েছে।

ফোর্ট ইরি শহরটা দাঁড়িয়ে আছে ক্যানাডায়, ঠিক নদীর মুখটায়। প্রপাতের ওপরে, তীর ঘেঁসে আরো-দুটি শহর গ'ড়ে উঠেছে, ডান তীরে—শ্লসার, বামতীরে—চিপেওয়া, নেভি আইল্যাণ্ডের দুই পাশে দুই ছোটো শহর। এইখানে এসেই খরস্রোত, সরু-একটা খাল দিয়ে বাঁধা, আরো-প্রচণ্ড-বেগে ছুটতে শুরু করে। আর দু-মাইল এগিয়ে গিয়ে জলপ্রপাত হিশেবে দেড়শো ফিট উঁচু থেকে আছড়ে পড়ে।

বিভীষিকা এরই মাঝে ফোর্ট ইরিকে পেরিয়ে গেছে। পশ্চিমে, সূর্য গিয়ে ছুঁয়েছে ক্যানাডার দিগন্ত। ক্ষীণ দেখা যাচ্ছে চাঁদ, জলের ছিটেয় তৈরি বাষ্পের আড়ালে সে দক্ষিণে ওঠবার চেষ্টা করছে। আর একটি ঘণ্টা পরেই অন্ধকার আমাদের ঢেকে ফেলবে।

ডেস্ট্রয়ারগুলো তাদের চোঙ দিয়ে কালো ধোঁয়া ওগরাতে-ওগরাতে একমাইল পেছনে ধেয়ে আসছে। স্পষ্ট, বোঝাই যাচ্ছে, যে *বিভীষিকা* আর ফিরে যেতে পারবে না। ডেস্ট্রয়ারগুলো তার ফেরবার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ ক'রে দিয়েছে। এটা ঠিক যে, আমি যেমন জানি যে কোনো যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন *বিভীষিকা* এতক্ষণ ধ'রে জলের ওপরেই থাকতে বাধ্য হয়েছে, সে-কথা ডেস্ট্রয়ার দুটির কম্যাণ্ডাররা জানে না—ফলে তারা জানে না হঠাৎ কখনও *বিভীষিকা* ভুউশ ক'রে ডুবে যাবে কি না জলে। তারা শুধু শেষ মুহূর্ত অব্দি তাকে ধাওয়া ক'রে আসতে চাচ্ছে।

এই বিপজ্জনক জলের মধ্য দিয়ে তার যেভাবে একগুঁয়ের মতো এগুচ্ছে, তাতে আমি তাদের তারিফ না-ক'রে পারলুম না। কিন্তু তার চাইতেও আমি তাজ্জব মানছি *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড*-এর ধরনধারণ দেখে। আর-তো মাত্রই আধঘণ্টা, তারপরই নায়াগ্রা জলপ্রপাত। যত মজবুতই হোক না কেন তার এই আশ্চর্য যান, এই বিশাল জলপ্রপাতের বিষম আক্রোশ সে এড়াবে কী ক'রে? একবার যদি এই প্রচণ্ড স্রোত টান মারে *বিভীষিকাকে*, তাকে বাগে পেয়ে কাবু ক'রে ফ্যালে, তবে তাকে নিয়ে লোফালুফি খেলতে-খেলতে দুশো ফিট নিচে আছড়ে ফেলে দেবে। হয়তো এখনও *বিভীষিকা* ডাঙার গাড়ি হ'য়ে তীরে নেমে প'ড়ে স্থলপথে ছুট লাগাবার কথাই ভাবছে।

এই তুলকালাম উত্তেজনার মাঝে, আমি, স্ট্রক, পুলিশের গোয়েন্দা—আমি কী করবো? আমি কি লাফিয়ে নামবো নেভি আইল্যাণ্ডে, যদি আমরা তার ধার ঘেঁসে যাই? এ-সুযোগটা হেলায় হাতছাড়া হ'তে দিলে আর আমার মুক্তি নেই : *বিভীষিকার* এত-সব রহস্য জেনে যাবার পর *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড* কিছুতেই আমায় ছেড়ে দেবে না।

অবশ্য এখন বুঝি আর পালাবার চেষ্টা করার কোনোই মানে হয় না। যদি আমাকে

ক্যাবিনে কয়েদ ক'রে রাখা না-হ'য়ে থাকে, তাহ'লে আড়চোখে হ'লেও কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই আমার ওপর নজর রাখছে। কাপ্তেন সারেঙের চাকা ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে বটে, তবে গলুইয়ের লোকটা এতক্ষণ একবারও আমার ওপর থেকে তার চোখ সরায়নি। একটু উলটোপালটা নড়লেই আমাকে পাকড়ে তারা ক্যাবিনটায় ঢুকিয়ে দিয়ে বন্দী ক'রে রাখবে। অর্থাৎ, আমার নিয়তি আমাকে এখন *বিভীষিকার* সঙ্গেই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

ডেস্ট্রয়ার দুটির সঙ্গে আমাদের ব্যবধান এখন আরো হ্রাস পেয়েছে। একটু পরেই তারা সম্ভবত দড়িদড়ার নাগালেই এসে পড়বে। যান্ত্রিক গোলযোগের পর থেকে *বিভীষিকার* এনজিন কি আর পুরোদমে চলতে পারছে না? কাপ্তেনর চোখেমুখে, অথচ, উদ্বেগের কিছুমাত্র চিহ্ন নেই—ডাঙায় নামবার কোনো চেষ্টাই সে করছে না।

ডেস্ট্রয়ারগুলোর পুরোদমে-চালানো বাষ্পের এনজিনের হিসহিস শব্দটা অব্দি এখন কানে আসছে, আর চোঙ দিয়ে ভলকে-ভলকে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। কিন্তু তার চাইতেও জোরালো হ'য়ে কানে আসছে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের তুলকালাম গর্জন।

নেভি আইল্যাণ্ড পেরিয়ে যাবার সময় *বিভীষিকা* নদীটার বাম শাখা বেছে নিলে। এখান থেকে অনায়াসেই ডাঙায় গিয়ে নামা যায়—কিন্তু তবু সে ছুটেই চলেছে সামনে। পাঁচ মিনিট পরে আমরা গোট আইল্যাণ্ডের প্রথম গাছপালাগুলো দেখতে পেলুম। স্রোত ক্রমেই তীব্র, অপ্রতিরোধ্য হ'য়ে উঠছে। *বিভীষিকা* যদি না-থামে, ডেস্ট্রয়ারগুলি এখন আর তাকে অনুসরণ করতে পারবে না। *বিভীষিকার* কাপ্তেন যদি প্রপাতের মরণঘূর্ণির মধ্যে গিয়েই ঝাঁপ খেতে চায়, ডেস্ট্রয়ার দুটি অন্তত সেই বাসনা করবে না। করেওনি—পরক্ষণেই তারা পরস্পরকে সংকেত ক'রে পশ্চাদ্ধাবন থামিয়ে দিলে। প্রপাত থেকে তারা বেশি-হ'লে তখন মাত্র ছশো ফিট দূরে। তারপর যেন বাজ ফেটে পড়লো পর-পর, *বিভীষিকার* গায়ে কোনো আঁচড়ই লাগলো না, তবু তারা আক্রোশ মেটাবার জন্যে পর-পর কয়েকবার তাকে তাগ ক'রে কামান দাগলে।

সূর্য অস্ত গেছে, প্রদোষের ছায়ান্ধকারে দক্ষিণ থেকে ফুটি-ফুটি করছে চাঁদের আলো। প্রপাতের তুলকালাম স্রোতের টানে *বিভীষিকা* উন্মত্তের মতো ছুটে চলেছে। পরের মুহূর্তেই নিশ্চয়ই আমরা প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়বো জলের-ছিটে-লাগা কালো শূন্যতায়—পাতালে। আতঙ্কিত বিস্ফারিত চোখে আমি দেখলাম অজ দ্বীপ বিদ্যুদ্বেগে পেছনে চ'লে গেলো।—তারপরেই এলো *তিন বোনের দ্বীপ,* পাতালের ফোয়ারায় জলাচ্ছন্ন।

আমি লাফিয়ে উঠে শেষ মরীয়া চেষ্টায় যেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেছি, কে যেন পেছন থেকে আমাকে সজোরে জাপটে ধরলে।

আমাদের পোতের মধ্যে এতক্ষণ যে-এনজিনটা দপদপ করছিলো, হঠাৎ তার মধ্য থেকে তীক্ষ্ণ ধারালো একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো। *বিভীষিকার* দু-পাশে গ্যাঙওয়ের মতো ধাতুর যে-ফালি দুটো আটকানো ছিলো, তারা ফরফর ক'রে ছড়িয়ে পড়লো বিশাল

দুই পাখনার মতো, আর ঠিক যে-মুহূর্তে *বিভীষিকা* গিয়ে প্রপাতের মুখটা ছুঁয়েছে, তখনই সে সোজা উঠে পড়লো শূন্যে, আকাশে, চান্দ্র রামধনুর মায়ায় জড়ানো বজ্রগর্জনতোলা প্রপাত থেকে সে এখন উদ্ধার পেয়েছে আকাশে—এখন সে তার *একে-তিন-তিনে-এক* নয়, তার চেয়েও বেশি, *চার নম্বর যানও সে*, অর্থাৎ উড়োজাহাজ, বিমান !!

১৫

ঈগল পাখির বাসা

পরদিন, যখন গভীর একটা ঘুম থেকে আমি উঠলুম, সতেজ, ঝরঝরে, আমাদের যান মনে হচ্ছিলো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যে ডাঙার ওপর দিয়ে যাচ্ছি না, সেটা অন্তত স্পষ্ট। আর জলের ওপর দিয়ে বা তলা দিয়েই যাচ্ছি না, উড়াল দিচ্ছি না এমনকী সপ্ততল বিমানেও। তবে কি এই অবিশ্বাস্য আবিষ্কারটি তার গোপন আড্ডায় ফিরে এসেছে—যেখানে তার আগে আর-কোনো মানুষই পা দেয়নি ? আর এখন কি তবে তার সব গোপন কথাই আমি জেনে ফেলবো ?

এখন ভাবলে তাজ্জব লাগে, যখন আকাশ দিয়ে উড়ে আসছি, তখন সারাটা পথই আমি কি না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি ! একটু ভড়কে যাবার মতোই ব্যাপার : আমাকে তারা কোনো ঘুমের ওষুধ খাওয়ায়নি তো ? যাতে আমি বুঝে ফেলতে না-পারি কোথায় এসে এই আকাশযান নামলো ? শুধু এইটুকু মনে আছে, কাল সন্ধেবেলা যখন *বিভীষিকা* দু-দিকে তার দুই ডানা ছড়িয়ে প্রপাতের ওপর থেকে আকাশে উঠে গিয়েছিলো, তখন আমি কী-রকম স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলুম। না, হতভম্ব নয়, *স্তম্ভিত* !

তাহ'লে এই যান *একের ভেতরে চার* : স্বতশ্চল শকট, জলেভাসা জাহাজ, ডুবোজাহাজ আর আকাশযান—একই সঙ্গে চার রকম ! মাটিপৃথিবী, বিশাল জল, সীমাহারা আকাশ—সব সে জয় করেছে ! আর কেমন বিদ্যুৎগতিতে সে সম্পন্ন ক'রে এক যান থেকে আরেকরকম যান হ'য়ে-ওঠা ! একই এনজিন চলে জলে, ডাঙায়, অন্তরিক্ষে ! আর আমি কিনা সাক্ষী ছিলাম এইসব রূপান্তরের ! এখনও সেটা জানি না—ভবিষ্যতে কখনও হয়তো জানতে পারবো—তা হ'লো এই যানের এই বিপুল শক্তির উৎস কী। আর কেই-বা এই দুর্ধর্ষ বৈজ্ঞানিক, একা-একা পুরো ব্যাপারটা উদ্ভাবন ক'রে যে বিপুল স্পর্ধায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছে সারা জগৎকেই ! কী তার স্পর্ধা, কী দুঃসহ তার দম্ভ !

বিভীষিকা যখন ক্যানাডার প্রপাতের ওপর থেকে উড়াল দিয়েছিলো, আমাকে

তখন আমার ক্যাবিনের হ্যাচওয়ের সামনে চেপে ধ'রে রাখা হয়েছিলো। সন্ধ্যায় ফুটফুটে স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় আমি এটা অন্তত দেখতে পেয়েছিলুম কোন দিক লক্ষ্য ক'রে *বিভীষিকা* আকাশে উড়লো। নদীরই খাত ধ'রে সে উড়াল দিয়েছিলো, পেরিয়ে গিয়েছিলো সাস্‌পেনশন ব্রিজ, যেখানটায় নায়াগ্রা নদী ক্ষিপ্র একটা মোচড় মেরে নেমে গিয়েছে লেক অন্টারিওর দিকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা পুবদিকে মোড় ঘুরেছি। কাপ্তেন তেমনি সটান দাঁড়িয়েছিলো সারেঙের চাকা আর হাতলগুলোর সামনে। আমি তার সঙ্গে কোনো কথাই বলবার চেষ্টা করিনি তখন। কী লাভ হ'তো কিছু জিগেস ক'রে—সে-তো কোনো উত্তরই দিতো না। তখন শুধু এটাই সবিস্ময়ে লক্ষ করেছিলাম *বিভীষিকা* অনায়াসেই আকাশে উড়ে যেতে পারে—যেন জল বা ডাঙার মতো আকাশের পথগুলোও তার অনেকদিনকার চেনা।

এমন আশ্চর্য একটা যানের উদ্ভাবক কেন-যে নিজেকে *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড* বলে সেটা আন্দাজ-করা এখন আর মোটেই কঠিন নয়। মানুষের হাতে এ-যাবৎ যত যান রচিত হয়েছে, তাদের সবার চাইতে এটা শতগুণে সেরা।—এর কাছে অন্যসব যান নেহাৎই তুচ্ছ, নগণ্য, সাধারণ! সত্যি-বলতে, তার এই পরম বিস্ময়ের রহস্যটা সে খামকা কাউকে বিক্রিই বা করবে কেন? ঐ দুশো কোটি ডলার তো তার কাছে খোলামকুচির মতোই তুচ্ছ। হ্যাঁ, এখন আমি পুরোপুরি বুঝতে পারি তার সীমাহীন আত্মবিশ্বাসের কারণ—যা প্রায় দম্ভের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছেছে। যদি তার নিজের উচ্চাশা তাকে উম্মত্ততার ওপারে নিয়ে না-যায়, তবে সে কোথায়-কতদূরে-গিয়েই না পৌছুতে পারবে!

বিভীষকা আকাশে ওড়বার আধঘণ্টা পরেই আমি এই গভীর ঘুমে তলিয়ে যাই—বুঝতেও পারিনি যে ঘুমে দু-চোখের পাতা বুজে আসছে। নিশ্চয়ই কোনো ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেয়া হয়েছিলো আমার খাবারে। নিশ্চয়ই তার ইচ্ছে ছিলো না *বিভীষিকা* কোনদিকে যায়, সেটা আমি লক্ষ করি।

কাজেই এটা আমি জানি না সে কি বৈমানিকই এতটা পথ পেরিয়েছে, না কি পাগল-হে-নাবিক আবার ভেসে পড়েছে জলে, না কি শোফেয়ার তার গাড়ি ছুটিয়েছে আমেরিকার রাস্তায়-রাস্তায়। একত্রিশে জুলাই রাত্রিবেলা সত্যি-যে কী ঘটেছিলো তার কোনো স্মৃতিই আমার নেই।

এখন, এই রগরগে, রোমাঞ্চকর, রুদ্ধশ্বাস অভিযান শেষ হবে কোথায়? আর আমার নিজেরই বা কী হবে?

আগেই বলেছি, ঘুম থেকে জাগবামাত্র আমার মনে হয়েছিলো যে *বিভীষিকা* কোথাও যেন নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনড়। আমার ভুল হয়নি; তার চলার ধরন যা-ই হোক না কেন, আকাশে বা জলে, সবসময় আমি একটা মৃদু থর্থর কম্পন অনুভব করেছি। এখন সেই কম্পন আর নেই। এখন আমার প্রথম কাজ হ'লো ডেকে উঠে গিয়ে দেখা আমরা কোথায় আছি। বার্থ থেকে নেমে ক্যাবিনের সিঁড়ি বেয়ে হ্যাচওয়ের

কাছে গিয়ে দেখি ঢাকনাটা বাইরে থেকে আটকানো। 'আহা!' আমি ভেবেছি, '*বিভীষিকা* ফের তার অস্থির চলা শুরু না-করা অব্দি আমাকে তাহ'লে এখানেই কয়েদ হ'য়ে থাকতে হবে!' আর বন্দী হ'য়ে থাকবার কথা ভেবেই আমার কেমন যেন অস্থির লাগলো। উদ্বেগও কম ছিলো না। কী আছে ভবিষ্যতের গর্ভে? কী আমার ভবিতব্য?

জানতে অবশ্য পনেরো মিনিটও অপেক্ষা করতে হয়নি। ওপর থেকে হ্যাচওয়ের ওপরকার ঢাকনা সরাবার আওয়াজ কানে এলো আমার, পরক্ষণেই ক্যাবিনে এসে ঢুকলো প্রখর একঝলক আলো আর টাটকা হাওয়ার দমক! এক লাফেই আমি ডেকে উঠে এলাম। মুহূর্তের মধ্যে দিগন্ত ঝেঁটিয়ে এলো আমরা দৃষ্টি।

যা ভেবেছি, তা-ই। *বিভীষিকা* নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে নিরেট জমির ওপর। পনেরোশো থেকে আঠারোশো ফিট বেড়-এর একটা পাথুরে নয়ানজুলিতে সে দাঁড়িয়ে আছে। নিচে ছড়িয়ে আছে হলদে খোয়া আর কাঁকর, কোথাও কোনো উদ্ভিদের চিহ্নমাত্র নেই।

চারপাশের পাহাড়ের মাঝখানে এটা যেন ডিম্বাকার একটা কোটর—উত্তর-দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত লম্বা। চারপাশে যে-সটান-দাঁড়ানো পাথুরে দেয়াল সেটা কত উঁচু, চূড়াটাই বা কী-রকম, সেটা আমি কোনোভাবেই আন্দাজ করতে পারলুম না। মাথার ওপর ঘন হ'য়ে জ'মে আছে নিবিড় কুয়াশা, রোদ্দুরের বর্শাফলকগুলো হাজার চেষ্টা ক'রেও যেন সেই কুয়াশার চাদর ফুঁড়ে বেরুতে পারছে না। হলুদ বালির মেঝের ওপর পেঁজা-পেঁজা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। হয়তো এখনও বেশি বেলা হয়নি, পরে কখনও হয়তো এই কুয়াশা কেটে যাবে।

রীতিমতো ঠাণ্ডা পড়েছে এখানে, অথচ আজ কি না পয়লা আগস্ট! তাহ'লে এই জায়গাটা বুঝি গভীর-উত্তরে কোথাও, সমুদ্রতল থেকে অনেকটাই ওপরে। হয়তো এখনও আমরা আমেরিকারই কোথাও আছি, *নতুন মহাদেশেই,* কিন্তু ঠিক কোনখানে যে আছি সেটাই আন্দাজ করা মুশকিল।

হঠাৎ দেখতে পেলুম, *বিভীষিকার* কাপ্তেন নিচে একটা পাথরের খোঁড়লের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে—সম্ভবত কোনো সুড়ঙ্গের মধ্য থেকেই, কেননা কুয়াশায় জায়গাটা কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছিলো। মাঝে-মাঝে ওপরে, কুয়াশার পর্দার ওপর, বিশাল সব পাখির ছায়া ভাসে। এই গভীর স্তব্ধতা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে মাঝে-মাঝে শুধু তাদেরই রুক্ষ কর্কশ চীৎকার শোনা যাচ্ছে। কে জানে, এই দুর্ধর্ষ অতিকায় পক্ষীদানবকে দেখে এই বিশাল পাখিগুলো হঠাৎ বিষম আঁৎকে উঠেছে কি না।

সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে তার যাত্রার ফাঁকে-ফাঁকে *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড* এখানে এসেই আশ্রয় নেয়। এটাই সম্ভবত তার মোটরগাড়ির গ্যারাজ; তার জাহাজের বন্দর; তার আকাশযানের হ্যাঙার। আর এখন এই বিশাল পাহাড়ি কোটরের মধ্যে *বিভীষিকা* দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল। অবশেষে এখন আমি ধীরে-সুস্থে যানটাকে খুঁটিয়ে দেখতে পারবো। আর সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে এর মালিকরা আমাকে নিরস্ত করার

কথা আদপেই ভাবছে না। সত্যি-বলতে, *বিভীষিকার* কাপ্তেন যেন আগের মতোই আমাকে মোটেই আমল দিচ্ছে না। নিচে তার দুই স্যাঙাৎ তার সঙ্গে গিয়ে জুটেছে, তারপরে তিনজনেই ফের সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়েছে। যন্ত্রটাকে খুঁটিয়ে দেখবার এটাই সুবর্ণ সুযোগ, অন্তত তার বাইরেটা তো দেখা যাবে! ভেতরে কী-সব কলকব্জা আছে, খুঁটিয়ে দেখেও আমি তার কতটা কী বুঝতে পারবো কে জানে—হয়তো নিছক কতগুলো জল্পনা করাই সার হবে!

দেখতে পেলুম, আমার ক্যাবিনের হ্যাচওয়ে ছাড়া আর-সবগুলো হ্যাচওয়েই কুলুপ দিয়ে ক'ষে আটকানো, আমার পক্ষে সেগুলো খোলবার চেষ্টা করা নিতান্তই পণ্ডশ্রম হবে! তার চেয়ে বরং এটা দেখাই লাভজনক হবে আমার পক্ষে—*বিভীষিকাকে* তার বিভিন্ন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সে-কোন *প্রপেলার* চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

আমি এক লাফ দিয়ে নিচে নেমে পড়লুম। কেউ কোথাও বাধা দেবার নেই—ফলে ধীরে-সুস্থেই দেখা যাবে সব।

যানটা—আগেই বলেছি—একটা টর্কুর মতো দেখতে। পুচ্ছের দিকটার চাইতে গলুইটা অনেক-বেশি তীক্ষ্ণ হ'য়ে এসেছে। যানটা অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে বানানো, কিন্তু পাখনা দুটো যে কোন ধাতুতে তৈরি, সেটা কিছুতেই আন্দাজ করতে পারলুম না। যানটা চারটে চাকার ওপর দাঁড়িয়ে আছে—একেকটা চাকার বেড় হবে প্রায় দু-ফিট। সেগুলোর গায়ে এমন পুরু টায়ার পরানো যে যে-কোনো বেগেই তারা অনায়াসে চলতে পারবে। চাকার একেকটা শিক অক্ষের গায়ে পরানো, সেগুলো দেখতে জেলেডিঙির বৈঠার মতো; জলে কিংবা ডাঙায়—যখনই *বিভীষিকা* ছোটে সেগুলো চক্রাকারে ঘুরে গিয়ে নিশ্চয়ই তার গতি বাড়িয়ে দেয়। তবে এই চাকাগুলো কিন্তু যানটার প্রধান *প্রপেলার* নয়। চালক-পাখাগুলো আসলে দুটো বড়ো-বড়ো *টারবাইন,* যানটার তলির দু-দিকে বসানো। এনজিন চালিয়ে দিলে তীব্রবেগে এরা ঘুরতে থাকে, আর তার দুই প্যাঁচ-দিয়ে বসানো চাকা তাকে জলের মধ্যে দিয়ে যেন হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যায়, সম্ভবত এরাই হাওয়াতেও উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে, এত জোরে ওরা নিজের অক্ষের ওপর পাক খেতে থাকে। আকাশে চলবার প্রধান সহায় অবশ্য ঐ দুই বিশাল পাখা, এখন যারা আবার গ্যাঙওয়ের মতো দু-পাশে ভাঁজ ক'রে গুটিয়ে রাখা। কাজেই *বাতাসের চাইতেও ভারি* উড়নযানের তত্ত্বটাকেই ব্যবহার করেছে আবিষ্কারক, এমন-এক ব্যবস্থা এটা যে দ্রুততম পাখির চাইতেও ক্ষিপ্রবেগে এটা আকাশে ভেসে যেতে পারে। তবে, সে-কোন শক্তি, যা দিয়ে এই ভিন্ন-ভিন্ন কলকব্জা চলে, তা, আবারও আমার মনে হ'লো, তড়িৎপ্রবাহ ছাড়া আর-কিছু নয়। কিন্তু সে-কোন উৎস থেকে এই তড়িৎকোষগুলো তাদের শক্তি পায়, ফিরে-ফিরে তাদের চার্জ করা যায়, তা আমি বুঝতে পারলাম না। কোথাও কি তবে তার কোনো বিদ্যুৎতৈরির কেন্দ্র আছে—যেখানে তাকে বারে-বারে ফিরে আসতে হয়? এই পাহাড়ি কোটরটার কোনো খোঁদলে এখনও কি তার ডায়নামোগুলো গুঞ্জন ক'রে চলেছে?

যন্ত্রটা যে চাকা আর *টারবাইনের* স্ক্রু আর পাখা ব্যবহার করে, তা তো দেখতেই

পাচ্ছি—কিন্তু তার এনজিনটা কেমন দেখতে অথবা সে-কোন তুমুল শক্তি তাকে চালায়, তার কিছুই আমি এতক্ষণেও জানতে পারিনি। তবে জানলেই বা কী হ'তো? এই জ্ঞান ধুয়ে আমি কোন জীবনদায়ী জল পান করতুম? কিছু করতে হ'লে আমাকে তো আগে এখান থেকে—অথবা এদের খপ্পর থেকে—পালাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আর যতটুকু আমি এতক্ষণে জেনেছি, তা যতই তুচ্ছ বা নগণ্য হোক না কেন, *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড* তারপরে কিছুতেই আমাকে আর ছেড়ে দেবে না। পালাবার কোনো সুযোগ কি দৈবাৎ, আচমকা, অপ্রস্তুত অবস্থায় এসে হাজির হবে? যতক্ষণ *বিভীষিকা* অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে, ততক্ষণ তো কোনো সুযোগই পাইনি। এখন, এখানে, তার এই গোপন আড্ডায়, সত্যি কি আমি হঠাৎ পালিয়ে যাবার কোনো সুযোগ পাবো?

এই পার্বত্য কোটরটা ঠিক কোনখানে অবস্থিত, প্রথমে আমাকে সেটাই বার করতে হবে। আশপাশের অঞ্চলের সঙ্গে এখান থেকে যোগাযোগ করারই বা কী উপায়; আছে—কোন মাধ্যম? এখান থেকে শুধু কি কোনো আকাশযানে ক'রেই বেরুনো যায়? আর মার্কিন মুলুকের সে-কোন অঞ্চলে আমরা আছি—কেউ কি এর কোনো শুলুকসন্ধান জানে? আমি যখন ঘুমের ঘোরে অচৈতন্য, তখন *বিভীষিকা* যে ক-শো লিগ পথ পেরিয়ে এসেছে, তা-ই বা কে জানে?

একটি বিষয় নিয়ে আমার উত্তেজিত মন কিন্তু তখনই জল্পনা করতে শুরু ক'রে দিয়েছিলো। *গ্রেট আইরি* ছাড়া আর সে-কোন প্রকৃতিনির্মিত *স্বাভাবিক* বন্দর আছে *বিভীষিকার*? আমাদের এই বৈমানিকের পক্ষে কি চূড়া অব্দি উড়ে-আসা খুব কঠিন হবে? ঈগল বা কণ্ডর যেখানে উড়ে বেড়ায়, সেখানে কেন এই বিমান উড়ে যেতে পারবে না? *গ্রেট আইরিই* কি *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ডকে* সেই অনধিগম্য আশ্রয় জোগায়নি, যেটা আমাদের সহস্রচক্ষু পুলিশের সজাগ দৃষ্টিকেও এড়িয়ে গেছে? তাছাড়া, নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে ব্লু রিজ শৈলশ্রেণীর এই অঞ্চলের দূরত্ব বস্তুত সাড়ে-চারশো মাইলের বেশি হবে না—যতটুকু পথ উড়াল দেয়া *বিভীষিকার* কাছে কিছুই-না।

হ্যাঁ, এই ভাবনাটা ক্রমেই আমাকে দখল ক'রে বসতে লাগলো। অন্যসব অসমর্থিত অনুমানকে এই ভাবনাটা যেন ঝেঁটিয়ে বার ক'রে দিচ্ছিলো। এতেই কি প্রমাণ হয় না, *বিভীষিকার* সঙ্গে *গ্রেট আইরির* কী সম্বন্ধ আর কেন আমি অমন একটা হুমকি দেয়া চিঠি পেয়েছিলুম? স্পষ্ট শাসানি ছিলো তাতে: আবারও যদি আমি *গ্রেট আইরিতে* ওঠবার চেষ্টা করি, তবে আমাকে *একহাত দেখে নেয়া* হবে! সেই জন্যেই কি দিনের পর দিন আমার বাড়ির ওপর নজর রাখা হয়নি? আর *গ্রেট আইরির* ওপর ঐ অদ্ভুত শিখা, ঐ উৎকট আওয়াজ, ঐ তুলকালাম তুফান—তা কি এই *বিভীষিকারই* নাটমঞ্চের পরিবেশ তৈরি ক'রে দিয়ে যায়নি? হ্যাঁ, *গ্রেট আইরিই*। ঈগল পাখির এই বাসাই *বিভীষিকার* গোপন আড্ডা!

কিন্তু একবার যখন বেদম চেষ্টা ক'রেও এখানে ঢুকতে পারিনি, তখন এখান থেকে বেরিয়ে-যাওয়াও কি আমার পক্ষে একেবারে-অসম্ভব হবে না? আহ্, যদি কুয়াশা একবার সরতো! হয়তো আমি তা'হলে চিনতে পারতুম জায়গাটা। যেটা এখন নিছকই একটা

জল্পনা মাত্র, সেটা যথার্থ ব'লে প্রমাণিত হ'তো তাহ'লে!

সে যা-ই হোক, এখানে যখন আমার চ'লে-ফিরে বেড়াবার স্বাধীনতা আছে, তখন পাহাড়ের মধ্যকার এই কোটরটাকেই না-হয় ভালো ক'রে—তন্ন তন্ন ক'রে—পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক। এই ডিম্বাকৃতি বিস্তারের উত্তরদিকের একটা সুড়ঙ্গে গিয়ে ঢুকছে তিনজনে। সেইজন্যে আমি আমার অনুসন্ধান শুরু করবো দক্ষিণ দিকে।

পাথুরে দেয়ালটার পাদদেশে গিয়ে, আমি তার গা ঘেঁসে চলতে-চলতে দেখতে পেলুম দেয়ালের গায়ে নানা জায়গায় অনেকগুলো ফাটল গজিয়েছে—কিন্তু তারপরেই আকাশ অব্দি যেন উঠে গেছে নিরেট পাথরের দেয়াল, আলেঘেনিতে যেমনতর পাথর দেখা যায়। কুয়াশা না-সরলে কিছুতেই বোঝা যাবে না এই নিরেট দেয়াল সটান কতটা ওপরে উঠে গিয়েছে। ফাটলগুলো দেখছি মোটেই গভীর নয়—সুড়ঙ্গের মতো দেয়ালের মধ্যে তা ঢুকে পড়েনি। কতগুলো গর্ত মানুষেরই হাতে-ফেলা জঞ্জালে ভর্তি। কাঠকুটো, শুকনো ঘাস। মাটির ওপর কাদের পায়ের ছাপ। সম্ভবত, কাপ্তেন আর তার স্যাঙাৎদের। আমার কারারক্ষকরা এখন নিশ্চয়ই সুড়ঙ্গের মধ্যে মালপত্র জড়ো ক'রে বাণ্ডিল বাঁধতে ব্যস্ত। তারা কি তবে বাণ্ডিলগুলো *বিভীষিকায়* নিয়ে গিয়ে তুলতে চাচ্ছে? তবে কি তারা চিরস্থায়ীভাবে এই আড্ডা ছেড়ে চ'লে যেতে চাচ্ছে?

আধঘণ্টার মধ্যেই আমি আমার অনুসন্ধান শেষ ক'রে আবার এই কোটরের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ালুম। এখানে-সেখানে স্তূপ হ'য়ে আছে ছাইভস্ম—জল-হাওয়ার শিকার, বিবর্ণ, রংচটা। পোড়া কাঠ প'ড়ে আছে, তাদের কারু গায়ে-বা জংধরা লোহার পাত আটকানো, কিংবা মরচে-পড়া আংটা; ধাতুর পাত প'ড়ে আছে আশপাশে, প্রবল উত্তাপে বেঁকে দুমড়ে-যাওয়া। কোনো জটিল কারখানাকে যেন এখানে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে,অনতিকাল আগে, দাউদাউ ক'রে একদিন আগুন জ্বলেছিলো—ইচ্ছাকৃত, অথবা দৈবাৎ। তারই শিখা নিশ্চয়ই নিচে থেকে দেখেছে ভয়ার্ত মানুষ—প্লেজেন্ট গার্ডেনে, মরগ্যানটনে। কিন্তু সে-কোন যন্ত্রপাতির ধ্বংসাবশেষ এ-সব? কেনই বা এদের ধ্বংস-করা হয়েছে?

সেই মুহূর্তে হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া ব'য়ে গেলো—পুবদিক থেকে আসা হাওয়া। আকাশ থেকে হ'ঠে গেলো কুয়াশার আস্তর, দিগন্ত আর মধ্যগগন থেকে ঝলসে নেমেছে সূর্যের আলো, এই কোটরটা আলোয় ফটফটে হ'য়ে উঠেছে।

আপনা থেকেই আমার মুখ ফুটে একটা অস্ফুট বিস্ময়ধ্বনি বেরিয়ে এলো! পাথুরে দেয়ালের চূড়া উঠে গেছে একশো ফিট ওপরে। পুবদিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শিখরদেশ—উড়াল দিতে উদ্যত একটা ঈগলের মতো দেখতে বিশাল এক পাথরখণ্ড। এই চূড়াটাই মিস্টার এলিয়াস স্মিথ আর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো একদিন, যখন আমরা *গ্রেট আইরির* বাইরে থেকে তাকিয়েছিলুম চূড়ার দিকে।

আর-কোনো সন্দেহই নেই। রাত্তিরে, তার ঐ উড়ালের সময় আকাশযান লেক

ইরি থেকে নর্থ-ক্যারোলাইনার দূরত্ব অতিক্রম ক'রে এসেছে। এই *ঈগল পাখির বাসাতেই* আকাশযান তার আশ্রয় বানিয়ে নিয়েছে। এই সেই নীড়, এই আবিষ্কারকের অতিকায় ও বিপুল শক্তিশালী পাখির যোগ্য বাসাই এই ব্লু রিজের শিখর! এমন-এক দুর্গ যার দেয়াল বেয়ে উঠতে পারার সাধ্য এই আবিষ্কারক ছাড়া আর-কারু নেই। হয়তো কোনো সুড়ঙ্গও সে আবিষ্কার করেছে এখানে—যার মধ্য দিয়ে *বিভীষিকাকে* সে স্থলপথেই চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে—হয়তো সবসময় যে আকাশপথেই এখানে আসতে হবে, তেমন-কোনো বাধ্যবাধকতা তার নেই।

অবশেষে সবকিছুই স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে! সেইজন্যেই সে *গ্রেট আইরি* থেকে আমাকে হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলো। যদি আমরা আগের বারে এই কোটরটায় এসে পৌঁছুতে পারতুম, কে জানে!, তাহ'লে হয়তো *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড*-এর গুপ্তকথা জগতের কাছে মোটেই গুপ্ত থাকতো না!

সেখানে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, নিশ্চল, আবিষ্ট : আমার দৃষ্টি চুম্বকের মতো আটকে আছে শিখরের ঐ পাষাণ ঈগলের ওপর, মনের মধ্যে তীব্র-প্রচণ্ড আলোড়ন! আমার নিজের কপালে যা থাকে থাক, আমার কি এখন কর্তব্য নয় এই যন্ত্রটাকে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়া, *এক্ষুনি, এখানে,* আবার সে আকাশে তার ঐ মারাত্মক উড়াল শুরু করার আগেই!

আমার পেছন থেকে কাদের পায়ের শব্দ এগিয়ে এলো। ঝটিতি, আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। বৈজ্ঞানিক স্বয়ং আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, থমকে থেমে তাকিয়েছে আমার মুখের পানে। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। আপনা থেকেই মুখ ফুটে নামটা বেরিয়ে এলো : '*গ্রেট আইরি! গ্রেট আইরি!*'

'ঠিকই চিনেছেন, ইন্‌স্পেক্টর স্ট্রক। *গ্রেট আইরিই!*'

'আর আপনি! আপনিই *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড?*'

'সেই জগতের প্রভু, যার কাছে আমি এর মধ্যেই প্রমাণ ক'রে দিয়েছি যে আমিই সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ—*অতিমানুষ!*'

'*আপনি!*' স্তম্ভিত, আমি বোকার মতো আবার বললুম কথাটা।

'হ্যাঁ,' অহমিকায় সটান দাঁড়িয়ে সে বললে, 'হ্যাঁ, আমি, হ্রবু—*দিগ্বিজয়ী হ্রবু!*'

১৬

হ্রবু—হে বিজয়ী বীর!

দিগ্বিজয়ী হ্রবু! তাহ'লে চেহারার এই মিলটাই আমার আবছাভাবে মনে পড়ছিলো। কয়েক বছর আগে এই অসাধারণ মানুষটির ছবি বেরিয়েছিলো আমেরিকার সব কাগজেই,

তেরোই জুনের তারিখের তলায়, কেননা ঠিক তার আগের দিন হুবু (বা রবয়ু) ফিলাডেলফিয়ার ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভায় আবির্ভূত হ'য়ে প্রচণ্ড শোরগোল তুলেছিলো—প্রায় হুলুস্থুলই—ফরাশি ঔপন্যাসিক মঁসিয় জুল ভের্ন পরে তাঁর *ক্লিপার অভ দ্য ক্লাউড্‌স* উপন্যাসে তার বিস্তৃত বিবরণ ছাপিয়েছিলেন।

তখন, যখন কাগজে-কাগজে ছবিটা বেরিয়েছিলো, আমি তার চেহারার চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করেছিলুম—একবার দেখে ভুলে-যাবার মতো চেহারা তার ছিলো না : প্রশস্ত বৃষস্কন্ধ, পৃষ্ঠদেশ প্রায় যেন একটা অসমান্তরাল বাহুবিশিষ্ট চতুর্ভুজের মতো, তার দীর্ঘতর দিকটা রচনা করেছে জ্যামিতিক স্কন্ধদেশ; হৃষ্টপুষ্ট দৃঢ় গ্রীবা; বিশাল বর্তুলাকার শিরোদেশ। একটু-কিছু হ'লেই তার চোখ দুটি ধকধক ক'রে জ্ব'লে ওঠে, আর ঠিক তার ওপরেই আছে ভারি, চিরকুঞ্চিত ঝোপের মতো ভ্রূযুগল, যা থেকে চ্ছুরিত হ'য়ে পড়ে প্রচণ্ড শক্তির ইঙ্গিত। ছোটো-ছোটো খাড়া-খাড়া চুল, আলো পড়লে ধাতুর মতো ঝকঝক ক'রে ওঠে। বিশাল বক্ষোদেশ যেন কামারের হাপরের মতো সবসময় উঠছে-নামছে; আর ঊরুদেশ, বাহুযুগল, করতল—সবই সেই সবল বিশাল দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তৈরি। অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ মাথাটিও তাই, নিখুঁত কামানো গাল পরিস্ফুট ক'রে দিচ্ছে তার চোয়ালের সবল পেশীগুলো।

আর এই হ'লো হুবু, *দিগ্বিজয়ী হুবু*, এখন সে দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে, একটিমাত্র কথায় সে তার আত্মপরিচয় দিয়েছে, আমার দিকে নামটা ছুঁড়ে দিয়েছে যেন শাসানোর ভঙ্গিতে, তার এই অভেদ্য দুর্গের ভেতরে স্পর্ধায় গরীয়ান!

এখানে একটু সংক্ষেপে মনে ক'রে নেয়া যাক সেই কাহন, যা কিছুদিন আগে দিগ্বিজয়ী হুবুর দিকে সারা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো, মঁসিয় জুল ভের্ন যার চমৎকার বিবরণ লিখেছেন তাঁর *ক্লিপার অভ দ্য ক্লাউড্‌স* বইতে। ওয়েলডন ইনস্টিটিউট ছিলো বিমানবিদ্যায় সমর্পিতচিত্ত একটি ক্লাব, তার সভাপতি ছিলেন ফিলাডেলফিয়ার এক মান্যগণ্য মাতব্বর ব্যক্তি—আঙ্কল প্রুডেন্ট, আর সচিব ছিলেন মিস্টার ফিলিপ ইভান্‌স। ইনস্টিটিউটের সদস্যরা ভেবেছিলো *বায়ুর চাইতেই লঘু* কোনো বিমানই আকাশে উড়তে পারবে; আর আঙ্কল প্রুডেন্ট আর ফিল ইভান্‌সের তত্ত্বাবধানে ইনস্টিটিউট তখন এক গ্যাস-দিয়ে-ফোলানো অতিকায় বেলুন বানাচ্ছিলো, তার নাম দেয়া হয়েছিলো *গো-অ্যাহেড*।

একটি সভায় ক্লাবের সদস্যরা যখন তাদের এই বেলুন নির্মাণ করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করছে, তখন হঠাৎ সেখানে এই অজ্ঞাতপরিচয়, উটকো, হুবু এসে আবির্ভূত হয়, আর তাদের সব পরিকল্পনাকেই বিঁধিয়ে-বিঁধিয়ে টিটকিরি দিয়ে কথার তুবড়ি ছুটিয়ে দেয় : জোর দিয়ে বলে উড়াল শুধু তখনই সম্ভব হবে যখন *বাতাসের চেয়েও ভারি* কোনো বিমান বানানো যাবে—আর সে-যে কোনো মিথ্যে জল্পনা ক'রে আকাশযানের বদলে আকাশকুসুম রচনা করছে না, তার প্রমাণই হ'লো সে নিজে ঠিক ঐরকম একটি বিমান বানিয়েছে, আর তার নাম সে দিয়েছে *অ্যালবাট্রস*।

এবার উলটে তার কথাতেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলো ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সদস্যরা—বিদ্রূপ ক'রে তারা তখন তার নাম দিয়েছিলো *দিগ্বিজয়ী হুবু*। তারপর যে-হুলুস্থুল কাণ্ড হয়েছিলো তার মধ্যে গ'র্জে উঠেছিলো—গুড়ুম ! গুড়ুম !—অনেকগুলো রিভলবার, আর এই হৈ-চৈ এর মাঝখানে এই উটকো আগন্তুকটি অন্তর্ধান করেছিলো।

সেই একই রাত্তিরে সে জোর ক'রে গুম ক'রে নিয়েছিলো ওয়েলডন্ ইনস্টিটিউটের সভাপতি ও সচিবকে, রাগে-গরগর আঙ্কল প্রুডেন্ট ও ধিক্কারে-মুখর ফিল ইভান্সকে, আর তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, জোর ক'রেই, তাদের নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছিলো মহাশূন্যে, আকাশপথে, বিশ্বভ্রমণে, তার ঐ আশ্চর্য আকাশযান *অ্যালবাট্রসে*। সে চেয়েছিলো এইভাবেই সে—অর্থহীন কথাকাটাকাটির বদলে—তার তত্ত্বটিকে হাতে-কলমে—বা শূন্যে, হাওয়ায়—প্রমাণ ক'রে দেবে। এই *অ্যালবাট্রস* আকাশযান ছিলো একশো ফিট লম্বা, হাওয়ায় তাকে ভাসিয়ে রাখতো সারি-সারি কতগুলো দিগন্তশায়ী স্ক্রু, আর তাকে সামনে-পেছনে চালিয়ে নিয়ে যেতো গলুইতে আর ল্যাজের দিকে সটান-দাঁড়-করানো কতগুলো উল্লম্ব স্ক্রু। এই *অ্যালবাট্রসে* কর্মী ছিলো তার অন্তত আধডজন অনুচর—যারা ছিলো তাদের নেতা হুবুর একান্ত অনুগত ও বশম্বদ।

বিশ্বভ্রমণেই বেরিয়েছিলো তখন *অ্যালবাট্রস*, ঘুরে এসেছিলো গোটা বিশ্বই, ছয় মহাদেশই। শেষটায়, মরীয়া হ'য়ে, *অ্যালবাট্রসকে* বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে, আঙ্কল প্রুডেন্ট আর ফিল ইভান্স পালিয়ে যান : তাঁরা ভেবেছিলেন ঐ মারাত্মক বিস্ফোরণে *অ্যালবাট্রস* বুঝি চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে গেছে—আর তার সমস্ত অনুচরকে নিয়ে হুবু তখন প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়েছিলো প্রশান্ত মহাসাগরে।

আঙ্কল প্রুডেন্ট আর ফিল ইভান্স তারপর ফিলাডেলফিয়ায় নিজেদের মহল্লায় ফিরে আসেন। এটুকু তাঁরা জেনে এসেছিলেন প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো অজ্ঞাত দ্বীপে—তাঁরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন *আইল্যাণ্ড এক্স—অ্যালবাট্রসকে* বানানো হয়েছিলো; কিন্তু এই দ্বীপটির অবস্থান যেহেতু সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলো, কেউ-যে একদিন গিয়ে দ্বীপটা আবিষ্কার করবে, সেই সম্ভাবনা ছিলো সুদূরপরাহত। তাছাড়া তার খোঁজে বেরিয়ে-পড়ার কোনো দরকার ছিলো ব'লেও কারু মনে হয়নি, কেননা এই অনিচ্ছুক কয়েদিরা প্রতিহিংসার বশে হুবুকে সদলবলে নিধন ক'রে এসেছেন ব'লেই ভেবেছিলেন।

তাই এই দুই ক্রোড়পতি, বাড়ি ফিরে এসে, পরম নিশ্চিন্ত মনে অতঃপর তাঁদের *গো-অ্যাহেড* বেলুনের নির্মাণেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন; ভেবেছিলেন, এই বেলুনে ক'রেই একদিন তাঁরা সেই আকাশে উড়বেন, যে-আকাশপথে একদিন তাঁদের জোর ক'রে নিয়ে গিয়েছিলো হুবু, আরো ভেবেছিলেন তাঁদের *গো-অ্যাহেড—বাতাসের চেয়ে হালকা*—অন্তত এই *বাতাসের চেয়ে ভারি অ্যালবাট্রসের* সমান না-হোক, উড়নবিদ্যায় তার চেয়ে মোটেই কম হবে না। তাঁরা যদি একগুঁয়ের মতো ফের ঐ কাজে আত্মনিয়োগ না-করতেন, তাহ'লে তাঁরা যথার্থ মার্কিনই বা হতেন কেমন ক'রে?

পরের বছর, বিশে এপ্রিল, অবশেষে, *গো-অ্যাহেড*-এর নির্মাণ সম্পূর্ণ হ'লো, এবং

ফিলাডেলফিয়ার ফেয়ারমাউন্ট পার্ক থেকে প্রুডেন্ট আর ইভান্‌সকে নিয়ে গো-অ্যাহেড আকাশে উড়লো। হাজার-হাজার দর্শকের মধ্যে আমিও সেদিন ছিলুম ঐ ফেয়ারমাউন্ট পার্কে। দেখেছিলুম, ঐ বিশাল বেলুন রাজহাঁসের মতো সাবলীল ছন্দে উঠে গেলো আকাশে, আর তার স্ক্রুগুলোর সৌজন্যে এদিক-ওদিক-সবদিকেই বিস্ময়কর স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ঘুরলো-ফিরলো। আর এমনি সময়েই আচমকা একটা চীৎকার উঠেছিলো দর্শকদের মধ্য থেকে : দূর আকাশের কোণায় ঠিক তখন দেখা দিয়েছিলো আরেকটি আকাশযান, আর বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে সেটা ক্রমশ কাছে এসে পড়ছিলো। আরেকটা *অ্যালবাট্রস* —ফিনিক্স পাখির মতো সে ধ্বংস থেকে উঠে এসেছে, সম্ভবত আগেরটার চাইতেও উৎকর্ষে সে অনেক এগিয়ে গেছে। হুবু আর তার অনুচরেরা প্রশান্ত মহাসাগরে সলিল সমাধি থেকে বেঁচেছে—আর প্রতিশোধের স্পৃহায় জ্বলতে-জ্বলতে ফের তাদের ঐ *আইল্যাণ্ড এক্স*-এ এই দ্বিতীয় আকাশযানটি বানিয়ে নিয়েছে।

বিশাল, অতিকায় একটা শিকারি পাখির মতো *অ্যালবাট্রস* ছোঁ মেরে নেমে এসেছিলো *গো-অ্যাহেড*-এর ওপর। হুবু, প্রতিশোধ নেবার চাইতেও বেশি ক'রে চেয়েছিলো সকলের চোখের সামনে হাতে-কলমে প্রমাণ ক'রে দেবে *বাতাসের চেয়েও ভারি* আকাশযানের অপরিমেয় শ্রেষ্ঠত্ব । আঙ্কল প্রুডেন্ট আর ফিল ইভান্‌স আত্মরক্ষা করার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। *অ্যালবাট্রসের* মতো তাঁদের বেলুন *গো-অ্যাহেড* সোজা, খাড়া, সরাসরি ওপরে উঠে যেতে পারে না—এটা তাঁরা জানতেন; তাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের বেলুন *অ্যালবাট্রসের* চাইতে অনেক হালকা ব'লে তাঁরা বুঝি সহজেই তার চাইতেও অনেক ওপরে উঠে যেতে পারবেন। সমস্ত ভারি জিনিশ, যাবতীয় *ব্যালাস্ট*, তাঁর *গো-অ্যাহেড* থেকে ফেলে দিয়েছিলেন, তরতর ক'রে উঠে গিয়েছিলেন কুড়ি হাজার ফিট ওপরে। কিন্তু সমানে পাল্লা দিয়ে উঠেছিলো *অ্যালবাট্রসও*, *গো-অ্যাহেডকে* পেরিয়ে আরো ওপরে উঠে গিয়েছিলো, তারপর *গো-অ্যাহেডকে* ঘিরে পাক খেতে শুরু ক'রে দিয়েছিলো, যেন উল্লাসে একটা নাচই সে জুড়ে দিয়েছে আকাশে।

হঠাৎ শোনা গিয়েছিলো এক বিস্ফোরণের আওয়াজ। বিশাল গ্যাসে-পোরা-থলে অর্থাৎ এই বেলুন *গো-অ্যাহেড* এত উঁচুতে উঠে যাবার ফলে গ্যাস বেরিয়ে গিয়ে একটা উৎকট আওয়াজ ক'রে ফেটে যায়। দরদর ক'রে গ্যাস বেরিয়ে গিয়ে বেলুনটা দ্রুতবেগে নিচে নেমে আসতে থাকে—এই বুঝি প্রচণ্ডবেগে আছাড় খেলো!

তারপর, সারা বিশ্বকেই অবাক ক'রে দিয়ে, *অ্যালবাট্রস* তীরবেগে নেমে এসেছিলো তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে, সর্বনাশটাকেই ত্বরান্বিত ক'রে দিতে নয়, বরং তাঁদের উদ্ধার করবার জন্যে। হ্যাঁ, হুবু, তার প্রতিহিংসার কথা ভুলে গিয়ে, প'ড়ে-যেতে-থাকা *গো-অ্যাহেড*-এর গায়ে এসে ঠেকে, আর তার অনুচরেরা *গো-অ্যাহেড* থেকে *অ্যালবাট্রস*-এ তুলে নেয় আঙ্কল প্রুডেন্ট, ফিল ইভান্‌স আর তাঁদের সহযোগী বৈমানিকটিকে। তারপর বেলুনটি, এখন-একেবারেই-ফাঁকা, চুপসে গিয়ে ধ'সে পড়ে ফেয়ারমাউন্ট পার্কের গাছপালার ওপর।

দর্শকরা সবাই ভয়ে-বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলো! এখন হ্রবু তার কয়েদিদের আবার তার বাগে পেয়েছে, কীভাবে সে এখন এঁদের ওপর শোধ নেবে? এবার কি সে এঁদের চিরকালের মতো উড়িয়ে নিয়ে যাবে নীল শূন্যে?

অ্যালবাট্রস তখন সবেগে, অনবরত, নিচেই নেমে আসছিলো, যেন ফেয়ারমাউন্ট পার্কের ফাঁকায় নেমে পড়বে! কিন্তু সে যদি নাগালের মধ্যে এসে পড়ে, ক্ষিপ্ত দর্শকেরা কি তার ওপর হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে না, ক্ষিপ্ত হ'য়ে ছিঁড়ে ফেলবে না কি হ্রবুকে, আর তার এই চমকপ্রদ আবিষ্কারকে?

অ্যালবাট্রস মাটি থেকে যখন ছ-ফিট ওপরে, তখন হঠাৎ থমকে থেমে দাঁড়িয়েছিলো। আমার এখনও মনে পড়ে, কী-রকম ক্ষিপ্তভাবে লোকে তার ওপর হামলা চালাতে যাচ্ছিলো—আর ঠিক তখনই গমগম ক'রে উঠেছিলো হ্রবুর গলা, সে-যে কী বলেছিলো তখন, আমি যেন এখনও তা হুবহু পুনরাবৃত্তি ক'রে দিতে পারি :

> 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ! মন দিয়ে শুনুন আপনারা। ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি এবং সচিব এখন আবার আমার কবলে এসে পড়েছেন। তাঁরা আমার যে-ক্ষতি করেছিলেন, যেভাবে আমাকে এবং আমার সঙ্গীদের বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তাতে আমি যদি তাঁদের যাবজ্জীবন বন্দী ক'রে রাখি তবে অন্যায় কিছুই করবো না, বরং সে হবে যথার্থ ন্যায়বিচারেরই দৃষ্টান্ত। কিন্তু *অ্যালবাট্রস*-এর সাফল্য দেখে তাঁদের এবং আপনাদের মধ্যেও যে-পরিমাণ ক্রোধ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে মনে হয় সাধারণ মানুষের আত্মা এখনও আকাশ বিজয়ের জন্যে প্রস্তুত নয়, বরং এই অসীম ক্ষমতাকে সে হয়তো মানুষের অকল্যাণেই কাজে লাগাবে। আঙ্কল প্রুডেন্ট, ফিল ইভান্স, যান, আপনারা মুক্ত—আপনারা যেখানে-খুশি চ'লে যেতে পারেন!'

বেলুন থেকে উদ্ধার-পাওয়া তিনজন মানুষই তখন *অ্যালবাট্রস* থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে পড়েছিলেন। আকাশযান অমনি প্রায় তিরিশ ফিট উঁচুতে নাগালের বাইরে উঠে গিয়েছিলো, আর হ্রবু ফের বলতে শুরু করেছিলো :

> 'মার্কিন যুক্তরাষ্টের নাগরিকগণ! মানুষ আকাশকে জয় করেছে—কিন্তু এই ক্ষমতা উপযুক্ত সময় না-আসা পর্যন্ত আপনাদের হাতে তুলে দেয়া হবে না। আমি এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি, সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি আমার আকাশযানের রহস্য। মানুষের কাছ থেকে অন্তরিক্ষবিজয়ের এই চাবিকাঠিটি কখনও হারিয়ে যাবে না, তবে যখন তারা শিখবে কী ক'রে এই ক্ষমতার অপব্যবহার না-করতে হয়, শুধু তখনই এর তত্ত্ব ও তথ্যগুলো তাদের হাতে তুলে দেয়া হবে। বিদায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ, আদিউ!'

তারপর *অ্যালবাট্রস* তার বিশাল স্ক্রুগুলোর প্রচণ্ড ঘূর্ণনের ফলে আকাশে উঠে গিয়েছিলো,

আর প্রতিহিংসা নেবার এই অপূর্ব রূপ দেখে মুগ্ধ মানুষের উল্লাসধ্বনির মধ্যে তীরবেগে দূরে, দিগন্তে, মিলিয়ে চ'লে গিয়েছিলো।

এই শেষ দৃশ্যটা আমি বেশ-কিছু খুঁটিনাটি সমেতই এখানে আমার পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে চেয়েছি, কেননা তাতেই বোধহয় আমার সামনে এখন যে-দিগ্বিজয়ী বীর হুবু দাঁড়িয়ে আছে তার মনের অবস্থা কিছুটা উদ্‌ঘাটিত করা যাবে। মানবজাতির প্রতি তার সে-রকম কোনো বিদ্বেষ বা বিরূপ মনোভাব নেই। সে এখনও অনাগত ভবিষ্যতের প্রতীক্ষাতেই আছে, যেদিন তার ধারণা মানুষ সত্যি-সত্যি এই বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলোর যোগ্য হ'য়ে উঠবে। তবে এও সত্যি যে এর মধ্য দিয়ে নিজের প্রতিভার ওপর তার অগাধ আস্থাই প্রকাশ পাচ্ছে : যে-অতিমানুষিক শক্তি তার মধ্যে কাজ ক'রে যাচ্ছে তার কথা যে সে শুধু সচেতনভাবে জানে তা-ই নয়, তা নিয়ে তার দুর্দান্ত অহমিকাতেও কোনো ঘাটতি নেই।

এটা মোটেই বিস্ময়কর নয় যে তার এই স্পর্ধা আর অহমিকাই নিজেকে সারা জগতের প্রভু ব'লে একদিন নিজের পরিচয় দিতে তাকে উসকে দিয়েছে—সেটাই সে জানিয়েছে তার *খোলা চিঠিতে*। নিশ্চয়ই কিছু-একটা হয়েছে এই অন্তর্বর্তী সময়ে, যেটা তাকে মানুষ সম্বন্ধে এতটা বিতৃষ্ণ ক'রে তুলেছে। *অ্যালবাট্রসের* সেই শেষ প্রস্থানের পর অন্তর্বর্তীকালে কী হয়েছে সে-সম্বন্ধে আমি কেবল অনুমানই করতে পারি। এই পরাক্রান্ত উদ্ভাবক শুধু নিছক একটা আকাশযান তৈরি ক'রেই ক্ষান্ত হয়নি। সে এমন-একটা যন্ত্র বানাতে চেয়েছিলো যেটা জল-মাটি-আকাশ সবকিছুকেই যেন একসঙ্গে জয় ক'রে নিতে পারে। হয়তো *আইল্যাণ্ড এক্স*-এর সংগোপন কারখানায় তার অনুগত অনুচরদের সাহায্যে সে এক-এক ক'রে এই আশ্চর্য যানের বিভিন্ন অংশ তৈরি করেছে, যে যান *একের ভেতরেই চার*, যে অনায়াসে ভোজবাজির মতো রূপান্তরিত হ'তে পারে একধরনের যান থেকে অন্যধরনের যানে। তারপরে তার দ্বিতীয় *অ্যালবাট্রস* নিশ্চয়ই এইসব বিভিন্ন যন্ত্রাংশ বহন ক'রে নিয়ে এসেছে *গ্রেট আইরিতে*, যেখানে সে সব আলাদা-আলাদা টুকরোকে জুড়ে দিয়ে বানিয়ে তুলেছে এই *বিভীষিকা*, কেননা দূর প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো অজ্ঞাত দ্বীপের চাইতে *গ্রেট আইরি* তার কাছে নিশ্চয়ই মনে হয়েছে অধিকতর সহজগম্য। *অ্যালবাট্রস* নিশ্চয়ই কালক্রমে একদিন ধ্বংস হ'য়ে গেছে—কোনো দুর্ঘটনায়, নয়তো-বা ইচ্ছে ক'রেই হয়তো সেটার সে বিনাশ ঘটিয়েছে—এই *আইরিতেই*। তারপরেই আচমকা একদিন আবির্ভূত হয়েছে *বিভীষিকা*, মার্কিন মুলুকের জলে-ডাঙায় এক তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছে। *অ্যালবাট্রস* থেকে *বিভীষিকা*—নামকরণের ভঙ্গির এই রূপান্তরের মধ্যেই হয়তো নিহিত রয়েছে তার মানসিক অস্থিরতা ও পরিবর্তনের ইঙ্গিত। তারপর তো আমি আগেই বলেছি, ঠিক নায়াগ্রা জলপ্রপাতের মুখটায় এসে, এই আশ্চর্য জলযান হঠাৎ কেমন ক'রে বিশাল দুই ডানা মেলে দিয়ে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে সাধারণ মানুষের অনধিগম্য এই *গ্রেট আইরিতে*।

১৭

আইন মোতাবেক

এই রোমাঞ্চকর অ্যাডভেনচারের মূল প্রসঙ্গটা, তাহ'লে, কী? আমি কি তার কোনো পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারি—এখনই, কিংবা পরে কোনোদিন? হুবুর হাতেই কি সমস্তকিছু নির্ভর ক'রে নেই? আঙ্কল প্রুডেন্ট আর ফিল ইভান্‌স একদিন প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ থেকে যেভাবে পালিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন, সে-রকম কোনো সুযোগ আমি নিশ্চয়ই পাবো না—হুবু নিশ্চয়ই দু-বার সেই একই ভুল করবে না। আমি শুধু অপেক্ষাই করতে পারি এখন। কে জানে এই প্রতীক্ষা কতটা দীর্ঘ, ও প্রলম্বিত, হবে!

এক-অর্থে, আমার কৌতূহল কিন্তু আংশিক চরিতার্থ হয়েছে। এখন আমি এটা অন্তত বুঝতে পেরেছি *গ্রেট আইরিতে* কী হয়েছিলো। এই রোমাঞ্চকর বৃত্তান্তের এতদূর অব্দি এসে আমি জানি ব্লু রিজ মাউন্টেনের আশপাশে লোকে কী দেখে এমন ভড়কে গিয়েছিলো। অন্তত এটা জানি যে এই অঞ্চলে কোনাদিনই অগ্ন্যুৎপাত বা ভূমিকম্পের ভয় ছিলো না—এখনও তার কোনো সম্ভাবনা নেই। পাহাড়ের পেটের মধ্যে কোনো অপার্থিব ভুতুড়ে শক্তি এসে কোনো নারকীয় নৃত্য জুড়ে দেয়নি। আলেঘেনির এই কোনাটায় কোনো জ্বালামুখ জেগে ওঠেনি অপ্রত্যাশিত ও আচম্বিত। *গ্রেট আইরি* নিছকই ছিলো দিগ্বিজয়ী হুবুর আশ্রয়। এই অনধিগম্য গোপন আশ্রয়েই সে জমিয়ে রাখতো তার রসদ বা যন্ত্রপাতির টুকরো। *অ্যালবাট্রস*-এ ক'রে একদিন আকাশপথে বেরিয়েই নিশ্চয়ই সে আবিষ্কার করেছিলো এমন নিরাপদ আশ্রয়স্থল। প্রশান্ত মহাসাগরের সেই *আইল্যাণ্ড এক্স*-এর চাইতেও এই আশ্রয়কে তার নিশ্চয়ই অধিকতর সুরক্ষিত ও নিরাপদ মনে হয়েছিলো।

এইটুকুই শুধু জানি আমি; কিন্তু তার এই আশ্চর্য যান কীভাবে তৈরি, কোন ধাতুতে, কোন চালকশক্তিতে, কী তার নির্মাণতত্ত্ব—তার কতটুকুই বা আমি জানি? না-হয় ধ'রেই নিচ্ছি যে এই *একের ভেতরে চার*, এই বহুধার্থসাধক যান বিদ্যুতে চলে। কিন্তু আমরা তো আগেই জেনেছি যে *অ্যালবাট্রসও* তড়িৎশক্তিতে চলতো—আর এই তড়িৎপ্রবাহ সে কোনো অভিনব আশ্চর্য উপায়েই শুষে নিতো চারপাশের আবহমণ্ডল থেকে। কিন্তু কী সেই যান্ত্রিক সৃষ্টি, তার কোনো অনুপুঙ্খই তো আমার জানা নেই। আমাকে কখনোই ঐ এনজিনটা দেখতে দেয়া হয়নি; সন্দেহ নেই যে সেটা আমি কোনোদিনই দেখতে পাবো না—আমাকে দেখতে দেয়া হবে না।

আর আমার মুক্তি? এটা তো তর্কাতীত যে হুবু এখনও সকলের অগোচরেই থাকতে চাচ্ছে—সবার অচেনা। তার এই অভাবিত যানটিকে নিয়ে সে-যে কী করবে, তা আমি জানি না—তবে তার *খোলা চিঠিটা* যদি কোনো ইঙ্গিত হয়, তাহ'লে জগৎ তার কাছ

থেকে কোনো মঙ্গলের বদলে শুধু অমঙ্গলই আশা করতে পারে। কিন্তু যেভাবে সে এতদিন লোকের চোখে ধুলো দিয়ে নিজের পরিচয় গোপন ক'রে রেখেছে, তাতে এটাই মনে হয় যে নিকট-ভবিষ্যতে সে কারু কাছেই নিজের পরিচয় ফাঁস ক'রে দিতে রাজি হবে না। এখন শুধু একজন-মাত্র লোকই পারে *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড* আর *দিগ্বিজয়ী বীর হ্রবুর* পরিচয় ফাঁস ক'রে দিতে—আর সে হলুম আমি, যে আমার ওপর ভার পড়েছে তাকে গ্রেফতার করার। নিয়তির এমনই নির্মম পরিহাস যে আমি তাকে গ্রেফতার করার বদলে সে-ই এখন আমাকে বন্দী ক'রে রেখেছে। অথচ আমার উচিত এক্ষুনি তার কাঁধে হাত রেখে বলা : 'ন্যায়বিচারের নামে, আইন মোতাবেক—'

বাইরে থেকে কেউ কি কোনোদিন এখানে এসে আমায় উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাবে? উঁহু, তার কোনো সম্ভাবনাই নেই। *ব্ল্যাক রক ক্রীকে* কী হয়েছিলো, পুলিশ নিশ্চয়ই এতক্ষণে তার সব কথা জানে। সব কথা শুনে মিস্টার ওয়ার্ড নিশ্চয়ই এভাবে তাঁর যুক্তির পইঠাগুলো সাজাবেন : *বিভীষিকা* যখন তার দড়িদড়ায় আমাকে জড়িয়ে ফেলে ক্রীক ছেড়ে ছুটে বেরিয়েছিলো, তখন হয় আমি ডুবে মরেছি (যদিও আমার মৃতদেহ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি), আর নয়তো বন্দী হিশেবে আমাকে *বিভীষিকায়* তুলে নেয়া হয়েছে—এবং আমি, অকর্মণ্য ও অসমর্থ, অসহায় প'ড়ে আছি *বিভীষিকারই* কাপ্তেনের হাতে। প্রথম অনুমানটাই যদি সত্যি হয়, তাহ'লে ওয়াশিংটনের ফেডারেল পুলিশের চীফ ইন্‌স্‌পেক্টর জন স্ট্রকের নামের পাশে ঢ্যাড়া কেটে মৃত ব'লে ঘোষণা না-ক'রে কোনো উপায় নেই। আর দ্বিতীয়টার বেলায়? আমার সহকর্মীরা কি কোনোদিনই আবার আমাকে ফিরে দেখতে পাবার আশা করতে পারবে? যে-দুটি ডেস্ট্রয়ার *বিভীষিকার* পেছন-পেছন নদী-নায়াগ্রা অব্দি তাড়া ক'রে এসেছিলো, প্রপাতে পড়বার বিপদ দেখে একসময় তারা থেমে পড়েছিলো। তখন রাত নেমে আসছিলো, আঁধার ঘিরে ধরছিলো চারপাশ থেকে—ডেস্ট্রয়ারের ওপর থেকে তারা তখন কী ভেবেছিলো? যে, *বিভীষিকা* বুঝি প্রপাতের তীব্র স্রোতে আর ঘূর্ণিতে পাক খেতে-খেতে দুশো ফিট ওপর থেকে নিচে আছড়ে পড়েছে? রাতের আঁধারে কেউই নিশ্চয়ই দেখতে পায়নি যে *বিভীষিকা* তখন দু-ধারে পাখা মেলে দিয়ে হর্সশু ফল্‌সের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছে, শেষটায় উড়ে এসেছে পাহাড়ের ওপর দিয়ে এই *গ্রেট আইরিতে*।

আমি কি আমার কপালে কী আছে, সে নিয়ে হ্রবুকে এখন কোনো প্রশ্ন করবো? সে কি আমরা কথা কানে নেবে? শুধু নিজের নামটাই আমার দিকে মস্ত ঢেলার মতো ছুঁড়ে দিয়েই সে কি খুশমেজাজ হ'য়ে ওঠেনি? তার কি এটাই মনে হবে না যে তার নামটাই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে?

বেলা গড়িয়েই চললো, কিন্তু অবস্থার আর-কোনো তারতম্য হ'লো না। হ্রবু আর তার স্যাঙাৎরা অবিশ্রাম এনজিনটা নিয়ে কাজ ক'রে চলেছে, বোঝাই যাচ্ছে তার একটা বড়ো-রকম মেরামতি দরকার। তারা নিশ্চয়ই চট ক'রেই আবার বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছে, নইলে এত তাড়া থাকতো না। আর, আমাকেও নিশ্চয়ই তারা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে।

আমাকে যদি *গ্রেট আইরির* এই কোটরেই তারা বন্দী ক'রে রেখে চ'লে যায়, তাহ'লেও আমার অনুযোগ করার কিছু থাকবে না। আর এখানে রেখে গেলে কিছুতেই আমি এখান থেকে পালাতে পারবো না—তবে রসদ যা থাকবে তাতে আমি হয়তো অনেকদিনই কাটিয়ে দিতে পারবো।

আমি শুধু সারাক্ষণ হুবুর মনটাকেই পড়বার চেষ্টা করছিলাম। কী আছে তার মনের মধ্যে? সারাক্ষণই সে যেন কোনো দুরন্ত উত্তেজনায় তেতে আছে। তার ঐ চিরজ্বলন্ত মগজের মধ্যে কোন আগুন এখন দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছে? ভবিষ্যতের জন্যে কী পরিকল্পনা সে আঁটছে তার ঐ নব-নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার বশে? এবার সে কোন দিকে ফেরাবে উড্ডীন *বিভীষিকার* মুখ? সে কি একাই দাঁড়াবে সারা জগতের বিরুদ্ধে, যে-হুমকিটা সে দিয়েছে তার ঐ *খোলা চিঠিতে*, কোনো উন্মাদের যেটা আস্ফালন?

সেই প্রথম দিনের রাত্তিরে, আমি গ্রেট আইরির একটা খোঁদলের মধ্যে সেঁধিয়ে শুকনো ঘাসের বিছানায় শুয়েছিলুম। প্রতিদিনই আমার সামনে খাবার রেখে দিয়ে যাওয়া হ'তো। দোসরা ও তেসরা আগস্ট তিনজনেই মুখে টু শব্দটি না-ক'রে সারাক্ষণ অবিরাম কাজ ক'রে গেলো। যখন মনে হ'লো হুবুর সন্তোষ-মতো এনজিনগুলো সারাই হ'য়ে গেছে, সবাই মিলে তখন মালপত্তর ওঠাতে লাগলো *বিভীষিকায়*, মনে হচ্ছিলো কোনো দীর্ঘ ভ্রমণেই তারা বেরুবে এবার। হয়তো বিভীষিকা এবার দিকে-দিগন্তে যাবে, পেরিয়ে যাবে দূর-দূরান্তর, হয়তো আবার গিয়ে হুবু পৌঁছুতে চাচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের ঐ *আইল্যাণ্ড এক্স-এই*!

মাঝে-মাঝে তাকে দেখতে পাই বিষম চিন্তামগ্ন, সে পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছে *আইরিতে*; কিংবা কখনও-কখনও সে তার দুই হাত তুলে বিষম স্পর্ধায় যেন ঈশ্বরকেই তার বিরুদ্ধে রণে-আহ্বান করে। তার এই দুরন্ত দম্ভ তাকে কি ক্রমশ উন্মত্ততার দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে না? এমন-এক উন্মত্ততা যেটা কারু সাধ্য নেই দমায়—এমনকী তার ঐ দুই অনুচরেরও না, কেননা তারাও যেন কোন-এক উত্তেজনায় সারাক্ষণ টগবগ ক'রে ফুটছে! একসময় তার ছিলো শুধুমাত্র *অ্যালবাট্রস*, তখন সে শুধু আকাশকেই জয় করেছিলো; এখন সে জয় করেছে জল-মাটি-আকাশ—এই তিনকেই। এখন তার কাছে যেন কোনো রুদ্ধ দুয়ার খুলে গিয়েছে, দিগন্ত পেরুনো কোনো সীমাহারা পথ—কোনো কিছু নেই, না ডাঙা, না জল, না আকাশ, সেই পথে কোনো দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করতে পারে।

আর সেইজন্যেই ভবিষ্যতের গর্ভে সে-কোন অভাবিত আতঙ্ক লুকিয়ে আছে, ভেবে-ভেবে আমি ভয়েই কাঁটা হ'য়ে যাচ্ছিলুম। এই *গ্রেট আইরি* থেকে আমার পক্ষে কিছুতেই পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, আমাকে তারা তাদের এই উন্মাদ অভিযানে টেনে নিয়ে যাবেই! আর *বিভীষিকা* যখন সীমাহারা মহাসাগর কিংবা দিগন্তহীন মহাকাশ পাড়ি দেবে, তখন কী ক'রে পালাতে পারবো আমি? আমার একমাত্র সুযোগ শুধু তখনই

আসবে, যখন সে ডাঙার ওপর দিয়ে পাড়ি দেবে—আর তাও যদি সে শ্লথমন্থর গতিতেই পাড়ি জমায়! এই সুদূর, দুর্বল আশাটিকেই শুধু খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরতে পারি আমি!

গ্রেট আইরিতে এসেই, আমি হুবুর কাছ থেকে একটা সদুত্তর জানতে চাচ্ছিলুম —আমাকে নিয়ে সে কী করবে ব'লে ভেবেছে। সে তাতে কোনো সাড়াই দেয়নি, কোনো উচ্চবাচ্য না.। এই শেষ দিনে আমি আরেকবার তার কাছে প্রশ্নটা তুললুম। বিকেলবেলায় আমি সেই সুড়ঙ্গটার মুখে গিয়ে দাঁড়ালুম যেখানে তারা একমনে কাজ ক'রে যাচ্ছিলো। সুড়ঙ্গের মুখটায় দাঁড়িয়ে হুবু কোনো কথা না-ব'লে নীরবে শুধু আমার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করলে। সে কি তাহ'লে আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছে?

আমি তার কাছে এগিয়ে গেলুম, বললুম, 'কাপ্তেন হুবু! আপনাকে আমি আগেই একটা প্রশ্ন জিগেস করেছিলুম—আপনি তার কোনোই উত্তর দেননি। আমি সেই একই প্রশ্ন আপনাকে আবার জিগেস করছি: আপনি আমাকে নিয়ে কী করতে চান?'

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমরা, দুজনের মধ্যে ব্যবধান দু-পাও হবে কি না সন্দেহ। বুকের ওপর দু-হাত ভাঁজ-করা, সে তার জ্বলন্ত চক্ষু মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে —তার বিস্ফরিত চোখে সেই দীপ্ত দৃষ্টি দেখে আমি যেন একেবারে শিউরে উঠলুম। ভীত, সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত—তাতেও বোধহয় আমার বুকের কাঁপুনির বিবরণ সঠিক হয় না। এ-যে কোনো সুস্থ লোকের চাউনি নয়, এ-যে একেবারে পাগলের চোখ, বদ্ধ উম্মাদের চোখ!

আমি আবারও, একটু চ্যালেন্‌জের সুরেই, *আবারও* আমার প্রশ্নটা জিগেস করলুম। মুহূর্তের জন্যে মনে হ'লো হুবু এবার বুঝি তার নীরবতা ভাঙবে।

'কী করতে চান আপনি আমায় নিয়ে? আমাকে কি আপনি ছেড়ে দেবেন? না কি এখানে আমায় সারাজীবন আটকে রাখতে চান?'

আবার দণ্ডমুণ্ডের এই মালিকের মন তখন নিশ্চয়ই অন্যকিছুতে আবিষ্ট হ'য়ে ছিলো —আমি যেন আচমকা তাকে তার সেই আবেশ থেকে এক হ্যাঁচকা টানে বার ক'রে নিয়ে এসেছি। তারপরেই সে আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে অসীম স্পর্ধার সঙ্গে তার মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে ধরলে। যেন কোনো অপ্রতিরোধ্য শক্তিই তাকে বারে-বারে এভাবে ঊর্ধ্ব আকাশে টেনে নিয়ে যেতে চাচ্ছে—সে যেন আর এই মাটিপৃথিবীরই মানুষ নয়, যেন তার নিয়তিই তাকে টেনে নিয়ে এসেছে এই অন্তরিক্ষে—যেন সে আকাশের মেঘেরই চিরবাসিন্দা। আমাকে সে কোনো উত্তরই দিলে না, মনেই হ'লো না যে সে আমার কথা কিছু বুঝতে পেরেছে। মোহাবিষ্টের মতো পা ফেলে সে আবার গিয়ে ঢুকলো ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে।

কতক্ষণ যে *বিভীষিকা* এখানে নিশ্চল প'ড়ে থাকবে, তা আমি জানি না। তবে তেসরা আগস্ট বিকেলবেলায় দেখতে পেলুম মেরামতির কাজ আর তার ওপর জিনিশপত্তর তোলার কাজ সাঙ্গ হয়েছে। এই যানের সমস্ত ভাঁড়ারই বোধহয় সুড়ঙ্গ থেকে

রসদপত্র এনে ভর্তি ক'রে দেয়া হয়েছে। তারপর তার দুজন সহকারীর একজন, যাকে মনে হ'লো হুবুর প্রধান সহকর্মী, যাকে এখন আমি চিনতে পারলুম *অ্যালবাট্রস*-এর ফার্স্ট মেট জন টারনার ব'লে, আরো-একটা কাজে লেগে পড়লো। তার সঙ্গীর সাহায্যে, সে ঐ মস্ত কোটরটার মাঝখানে নিয়ে এলো বাকি সমস্ত জিনিশপত্রই : খালি বাক্স, কাঠের টুকরোটাকরা, ছুতোরের সব সাজসরঞ্জাম, এমন-কতগুলো অদ্ভুত দেখতে কাঠ যা মনে হ'লো আগে ছিলো *অ্যালবাট্রস*-এরই অংশ, যাকে হয়তো শেষ পর্যন্ত এই অভিনব এবং আরো শক্তিশালী যানের কাছেই আহুতি দেয়া হয়েছে। আর এই বিশাল স্তূপের তলায় প'ড়ে রইলো রাশি-রাশি শুকনো ঘাস। হঠাৎ মনে হ'লো, হুবু বুঝি চিরকালের মতো তার এই আশ্রয় ছেড়ে চ'লে যেতে চাচ্ছে!

সত্যি-বলতে, এটা তো ঠিক যে সে মোটেই হাবা নয়। সে তো জানে যে এর মধ্যেই *গ্রেট আইরির* ওপর পুলিশের নজর পড়েছে—হয়তো শিগগিরই এই পাষাণপ্রাচীর ভেঙে ভেতরে ঢোকবার জন্যে নতুন ক'রে তোড়জোড় শুরু হবে। হয়তো একদিন-না-একদিন এ-সব চেষ্টা সফলও হবে—কেউ-একজন এসে হয়তো ঢুকবে ভেতরে, আর তার গোপন আড্ডা আর মোটেই গোপন থাকবে না! সে নিশ্চয়ই চাইবে পুলিশের লোক এসে কিছুতেই যেন তার কোনো চিহ্ন দেখতে না-পায়, কোনো সূত্রই যেন প'ড়ে না-থাকে!

ব্লু রিজের শিখরের আড়ালে সূর্য ঢাকা প'ড়ে গেলো। এখন এসে শেষবেলাকার রোদ্দুর পড়েছে উত্তরপশ্চিমে, *ব্ল্যাক ডোমের* ওপর। হয়তো *বিভীষিকা* অপেক্ষা ক'রে আছে কখন ঘন হ'য়ে রাতের আঁধার নেমে আসে, যখন সে তার নতুন অভিযান শুরু ক'রে দেবে। জগৎ তো এখনও জানে না যে এই স্বতশ্চল শকট এবং আশ্চর্য জলযান আবার একটা উড়োজাহাজও বটে। আজ অব্দি কেউই তাকে আকাশে দ্যাখেনি। *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড* নিশ্চয়ই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার চতুর্থ রূপান্তরের কথা গোপন রাখবে—সহজে লোককে জানতে দেবে না যে তার এই যান আকাশেও উড়তে পারে!

ন-টা নাগাদ কোটরের মধ্যে নেমে এলো নিবিড় অন্ধকার। আকাশে একটাও তারা নেই। প্রখর পূর্বী হাওয়া তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে ভারি-ভারি মেঘ, সারা আকাশ তাতে ঢাকা প'ড়ে গেছে। *বিভীষিকা* যদি এখন আকাশে ওড়ে, কেউই তাকে দেখতে পাবে না।

হঠাৎ তখন জন টারনার এসে কোটরের মাঝখানে ঐ স্তূপাকার জঞ্জালের তলায় শুকনো ঘাসের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিলে। পুরো স্তূপটাই তক্ষুনি দপ ক'রে জ্ব'লে উঠলো। নিবিড় ধোঁয়ার মাঝখান থেকে লকলক ক'রে বেরিয়ে এলো লেলিহান শিখা, *গ্রেট আইরির* শিখরের ওপরেও গিয়ে যেন পৌঁছুলো সেই শিখা। আবারও নিশ্চয়ই মরগ্যানটন আর প্লেজেন্ট গার্ডেনের সাধারণ লোক বিশ্বাস ক'রে বসবে যে জ্বালামুখ তার বিকট হা ক'রে লোল জিহ্বা বার ক'রে দিয়ে আকাশ চাটছে। তারা হয়তো ভাববে, এ বুঝি আগুনের পাহাড়েরই আরেকটা উৎকট কীর্তি।

সেই আগুনের কুণ্ডের দিকে তাকিয়ে রইলুম আমি। কানে আসছে দাউ-দাউ আগুনের ফোঁসফোঁস, কাঠ-ফেটে-যাওয়ার আওয়াজ, দুরন্ত পুবী হাওয়া যেন আরো অস্থির হ'য়ে উঠেছে। *বিভীষিকার* ডেক থেকে, হুবুও অনিবেমষ লোচনে তাকিয়ে আছে বহ্নিমান শিখার দিকে।

শিখার খ্যাপা রাগ যে-সব টুকরোটাকরা চারপাশে ছিটিয়ে দিচ্ছিলো, জন টারনার আর তার সঙ্গী আবার সেগুলো *ঠেলেঠুলে* ঢুকিয়ে দিচ্ছিলো আগুনের কুণ্ডের মাঝখানে। আস্তে-আস্তে আগুন সব খেয়ে শেষ ক'রে দিলে, শিখা নুয়ে এলো নিচে, ছাইভস্মের কাছে, জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর দপদপ করলো খানিকক্ষণ। তারপর আবার সব স্তব্ধ—আবার নিকষকালো রাত্রি, অবতামসী।

হঠাৎ কে যেন আমার হাত চেপে ধরলো। তাকিয়ে দেখি, টারনার। সে আমাকে টেনে নিয়ে চললো *বিভীষিকার* দিকে। কোনো প্রতিরোধ নিতান্তই অর্থহীন হ'তো। তাছাড়া এখানে একা পরিত্যক্ত, প'ড়ে-থাকার চাইতে অধম আর ভয়াল কী-ই বা হ'তে পারতো? এই জেলখানার দেয়াল ডিঙিয়ে আমি তো কোথাও যেতে পারবো না!

টারনারও আমার সঙ্গে-সঙ্গে *বিভীষিকার* ডেকে পা রাখলে। তার সঙ্গী গিয়ে দাঁড়িয়েছে টঙের ওপর, লুক-আউটে, দ্যাখন-কুঠুরির খোপে; টারনার সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো এনজিন-ঘরে, ভেতরে বিজলি বাতি জ্বলছে, কিন্তু বাইরে তার লেশমাত্র স্ফুরণ নেই। হুবু নিজে দাঁড়িয়ে আছে সারেঙের চাকায়, হালে, তার হাতের নাগালে আছে রেগুলেটর, যাতে সে শুধু গতিই নয়, *বিভীষিকা* কোন দিকে যাবে, তার ওপরও নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। আমাকে তারপরই *ঠেলে* থামিয়ে দেয়া হ'লো আমার ক্যাবিনটায়, মাথার ওপর আটকে দেয়া হ'লো হ্যাচওয়ের ঢাকনা। নায়াগ্রা থেকে বেরুবার সময় যেমন হয়েছিলো, আজও তাই, আমাকে *বিভীষিকার* উড়াল দেখতে দেয়া হবে না।

আমি যদিও *বিভীষিকার* ওপর কী হচ্ছে, তা দেখতে পাচ্ছি না, এনজিনের সব আওয়াজ কিন্তু শুনতে পাচ্ছি ধ্বকধ্বক! হঠাৎ যেন *বিভীষিকা* মাটি থেকে উঠে এলো বেশামাল, একটুক্ষণ, তারপরেই হাওয়ায় নিজেকে শামলে নিয়ে ভেসে চললো। নিচের *টারবাইন* তখন দুরন্ত গতিতে পাক খাচ্ছে, আর বিরাট ডানা দুটো যেন আকাশ হাৎড়াতে শুরু ক'রে দিয়েছে!

এইভাবেই *বিভীষিকা*, হয়তো-বা চিরকালের জন্যেই, ছেড়ে এলো তার ঈগল পাখির বাসা, *গ্রেট আইরি*, হাওয়ায় ভেসে চললো, জলে যেমন ক'রে ভেসে চলে কোনো জাহাজ। হুবু উড়াল দিয়েছে আলেঘেনির দু-পাল্লা শৈলশ্রেণীর ওপর—আর হয়তো সে কোনোদিনই এখানে ফিরবে না।

কিন্তু কোনদিক লক্ষ্য ক'রে সে চলেছে? সে কি পেরিয়ে যাবে নর্থ ক্যারোলাইনার সমভূমি, হন্যে হ'য়ে খুঁজবে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরকে? না কি সে ছুটতে শুরু করেছে পশ্চিমে, প্রশান্ত মহাসাগরের উদ্দেশে? হয়তো চলেছে দক্ষিণে, মেহিকোর গাল্‌ফের দিকে। দিন যখন আসবে, আমি কি তখন চিনতে পারবো কোথায় চলেছি, যদি আকাশ

আর সমুদ্র একাকার হ'য়ে রচনা ক'রে দেয় দিগন্ত?

ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেলো, আর একেকটা ঘন্টা কী-যে দীর্ঘ ও প্রলম্বিত প্রহর ব'লে মনে হ'লো আমার! খ্যাপা সব অসংলগ্ন ভাবনা ভিড় ক'রে আসছে আমার মনে। যেন আমি ঝেঁটিয়ে চ'লে যাচ্ছি আদিগন্ত কল্পনার জগতের ওপর দিয়ে—যে-দুরন্ত গতিতে *বিভীষিকা* এখন দুর্দাম ছুটেছে, তাতে এই অনিঃশেষ তমসায় কোথায় যে গিয়ে পৌঁছুবো, কে জানে! আমার মনে প'ড়ে গেলো, *অ্যালবাট্রস*-এর সেই অবিশ্বাস্য উড়ান—যার একটা বিস্তৃত বিবরণ ছাপিয়েছিলেন মঁসিয় জুল ভের্ন, ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সব নথিপত্তর ঘেঁটে। হুবু তার সেই প্রথম আকাশযান নিয়ে যা করেছিলো, এখন এই *একের ভেতর চারকে* নিয়ে তারও কত বেশি ক'রে তাড়া ক'রে যেতে পারবে অসম্ভবকে!

অবশেষে ঐ ছোট্ট ঘুলঘুলি দিয়ে দিনের প্রথম আলোর রশ্মি এসে ঢুকলো আমার ক্যাবিনে। এখন কি তবে আমায় ওপরে যেতে দেয়া হবে, ডেকের ওপর, যাতে নিজের চোখে সবকিছু দেখতে পারি, যেমন একদিন দেখেছিলাম লেক ইরির ওপর? আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে হ্যাচওয়ের ঢাকনাটা ঠেললুম, অমনি সেটা খুলে গেলো, আমি অর্ধেকটা উঠে এলুম ওপরে।

চারদিকেই শুধু আকাশ আর সমুদ্র। আমরা কোনো সমুদ্রের ওপর দিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছি, সম্ভবত হাজার-বারোশো ফিট ওপর দিয়ে—অন্তত সব দেখেশুনে আমার তা-ই মনে হ'লো। হুবুকে কোথাও দেখতে পেলুম না—সম্ভবত সে গিয়ে ঢুকেছে তার এনজিনঘরে। সারেঙের চাকায় দাঁড়িয়ে আছে টারনার, তার সঙ্গী আছে ঐ দ্যাখন-খোপে, *লুকআউটে*।

এবার আমি স্বচক্ষে দেখতে পেলুম বিশাল ডানাগুলোর ঝাপটানি, আগের বার উড়ালের সময় যা আমি দেখতে পাইনি। সূর্যের অবস্থান দেখে—যখন সে আস্তে-আস্তে দিগন্ত থেকে উঠে এলো—আমি বুঝতে পারলুম আমরা দক্ষিণ দিকে চলেছি। অর্থাৎ রাত্তিরে যদি *বিভীষিকা* তার নিশানা বদলে না-থাকে, তাহ'লে এখন আমাদের নিচে যে সীমাহারা জল ঢেউ তুলে যাচ্ছে, সেটা মেহিকোর উপসাগর।

তপ্ত একটা দিন ঘোষণা ক'রে দিলে দিগন্তে ঝুলে-থাকা ভারি রাগি লাল মেঘ। আসন্ন ঝড়তুফানের এই লক্ষণ হুবুরও নজর এড়ায়নি, আটটা নাগাদ সে এসে টারনারকে ছুটি দিয়ে নিজেই দাঁড়ালে সারেঙের চাকায়। হয়তো *অ্যালবাট্রস* যে ভয়ংকর তুফানের পাল্লায় প'ড়ে ধ্বংস হ'তে বসেছিলো তার কথা ভেবে সে নিজেই এসে দাঁড়িয়েছে হালের কাছে। তবে *অ্যালবাট্রস* প্রকৃতির যে-দুর্দম শক্তির সঙ্গে যুঝতে পারেনি, এই দুর্দান্ত *বিভীষিকা* তাকে অনায়াসেই এড়িয়ে যেতে পারবে, কেননা সঙিন সময় এলে সে নেমে যেতে পারবে সমুদ্রে, সেখানেও ঝড় যদি তার ঝুঁটি ধ'রে নাড়াতে চায় তবে ডুবে যেতে পারবে অতলে, সমুদ্র যেখানে থাকে শান্ত, নিস্তরঙ্গ। তবে হুবু হয়তো সব লক্ষণ প'ড়ে নিয়ে এটাই বুঝেছে যে কালকের আগে এই তুফান এখানে ফেটে পড়বে না। আর তা-ই হুবু আকাশ ছেড়ে জলে নেমে এলো না—উড়েই চললো *বিভীষিকা*, তারপর বেলা

গড়িয়ে গিয়ে বিকেল হওয়ায় সে বিশ্রাম দিলে ঐ দুরন্ত ডানা দুটিকে, নেমে পড়লো জলের ওপর, আর সেখানে ফটফট করছে স্বচ্ছ অপরাহ্ণ, ঝড়ের কোনো পূর্বাভাসই সেখানে নেই। *বিভীষিকা* যেন কোনো সমুদ্রের পাখি, কোনো গাংচিল, কোনো *অ্যালবাট্রস*, যারা ঢেউয়ের ওপর অনায়াসেই বিশ্রাম করতে পারে, সাবলীল ছন্দে ভেসে যেতে পারে। তবে পাখির চাইতে *বিভীষিকার* সুবিধে বেশি—আর ধাতুর শরীর ককখনো ক্লান্ত হ'য়ে পড়বে না, অফুরান শক্তি পাবে তার বিদ্যুতের সঞ্চয়কোষ থেকে!

আমাদের চারপাশে বিশাল সিন্ধু সম্পূর্ণ শূন্য প'ড়ে আছে। কোনো পালের চিহ্ন নেই কোথাও, কোথাও কোনো চোঙ দিয়ে ভলকে-ভলকে ধোঁয়া উঠছে না। অর্থাৎ, কেউ আমাদের দেখতে পায়নি, কেউ জানে না যে আমরা এখন গাল্‌ফ অভ মেহিকো দিয়ে ভেসে যাচ্ছি, কোনো টেলিগ্রাম কাউকে আগে থেকে সে-খবর জানায়নি। *বিভীষিকা* তার নিজের ছন্দে অবিরাম এগিয়ে চলেছে—কোথাও কোনো বাধার মুখে তাকে পড়তে হয়নি। হুবুর মনে যে কী আছে, তা সে-ই জানে। আমরা যদি অবিশ্রাম এভাবে এগিয়ে চলি, দিক যদি না-পালটাই, তবে একসময় গিয়ে পৌঁছুবো ক্যারিবিয়নে, পশ্চিম ইনডিসে, অথবা তাকেও পেরিয়ে গিয়ে ভেনেসুয়েলায় বা কোলোম্বিয়ায়। তবে রাত যখন নামবে, তখন হয়তো আবার আমরা উঠে পড়বো আকাশে, যাতে গুয়াতেমালা আর নিকারাগুয়ার পাহাড়ের বাধা পেরিয়ে যেতে পারি, সোজা ছুটে চ'লে যেতে পারি প্রশান্ত মহাসাগরে, সেই অজ্ঞাত *আইল্যাণ্ড এক্স*-এর দিকে।

সন্ধে এলো। সূর্য ডুবে গেলো দিগন্তে, রক্তের মতো রাঙা। *বিভীষিকার* আশপাশে সমুদ্রে লোহিত ছোপ চমকাচ্ছে—যেন রঙিন সব ফুলঝুরি, এমনভাবে ফেনিল ঢেউ ভেঙে পড়ছে পোতের পেছনে। সম্ভবত হুবু ভেবে থাকবে যে ছোটোখাটো একটা ঝড় উঠছে, আমাকে আবার আমার ক্যাবিনে পাঠিয়ে দিলে, আমরা মাথার ওপর আবার আটকে দেয়া হ'লো হ্যাচওয়ের ঢাকনা। পরের কয়েক মুহূর্ত এমন-সব আওয়াজ শুনতে পেলুম, যা থেকে বুঝতে পারলুম *বিভীষিকা* এবার জলের তলায় ডুবে যাচ্ছে। পাঁচ মিনিট পরেই সে অনায়াসেই সমুদ্রের গভীর দিয়ে শঙ্কাহীন চ'লে যেতে লাগলো।

আমি অবসাদে যেন ভেঙে পড়ছি তখন। কোনো শারীরিক শ্রমের জন্যে এই অবসাদ নয়, উত্তেজনা আর উদ্বেগই যেন আমাকে নিংড়ে আমার মধ্য থেকে সব শক্তি বার ক'রে নিয়েছে। নিজের অজান্তেই কখন একসময় গভীর ঘুমে ঢ'লে পড়লুম, এবার কোনো ওষুধ দিয়ে কেউ আমার ঘুম পাড়ায়নি, অবসাদই এই ঘুমের কারণ। কতক্ষণ পরে যে ফের জেগে উঠেছি, জানি না, কিন্তু *বিভীষিকা* তখনও জলের ওপর ভেসে ওঠেনি—ডুবোজাহাজ সেজেই সে চলেছে তখনও।

বিভীষিকা জলের ওপর ভেসে উঠলো আরো-খানিকক্ষণ পরে, যখন ঘুলঘুলি দিয়ে ক্যাবিনে এসে পড়লো দিনের প্রথম আলোর ছটা। আর ভেসে উঠতেই সমুদ্র ছোট্ট খোলার মতো ক'রে দোলাতে লাগলো *বিভীষিকাকে*—সমুদ্রের ঢেউয়ের এই এক বিশ্রী স্বভাব, সবকিছু সে নাড়িয়ে দেয়।

আবারও ডেকের ওপর উঠে এলুম আমি, এসেই আমার প্রথম চিন্তা হ'লো আবহাওয়া সম্বন্ধে। উত্তরপশ্চিম থেকে ধেয়ে আসছে খ্যাপা হাওয়া, তুফান। ঘন কালো মেঘের মধ্যে চমকে-চমকে যাচ্ছে বিদ্যুতের যত সরীসৃপ। এরই মধ্যে দূর থেকে ভেসে আসছে বাজের শব্দ—গড়িয়ে যাচ্ছে ঢেউয়ের ওপর দিয়ে—**গুম গুম গুম**! আমি চমকে গেলুম—চমকে ঠিক নয়, ভয় পেয়ে গেলুম, এমন আচম্বিতে দ্রুত ছুটে এলো তুফান। এই ঝড়ের ঝাপটা সামলাতে গিয়ে কোনো পালের জাহাজ হয়তো তার পালগুলো গোটাবারও সময় পেতো না। যেমন দুর্দাম তার গতি, তেমনি ভয়াল—ভয়াল নয়, করাল! বাতাস এমনভাবে ফেটে পড়েছে যেন হাজার বৎসর সে অবরুদ্ধ ছিলো, এখন তার জেলখানা ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে, এক-আধখানা নয়, যেন উনপঞ্চাশখানা পবনই! তারই সঙ্গে তাল রেখে উত্তাল সমুদ্র থেকে উঠেছে এক ভয়ংকর জলস্তম্ভ। ঢেউয়ের পর ঢেউ গর্জাচ্ছে, আছড়াচ্ছে, আর ফেনিল জল পাক খাচ্ছে *বিভীষিকার* চারপাশে। আমি যদি প্রাণপণে রেলিঙ আঁকড়ে না-থাকতুম, ঢেউ তবে আমাকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে চ'লে যেতো!

এখন শুধু একটাই জিনিশ করার আছে—*বিভীষিকাকে* আবার ডুবোজাহাজে রূপান্তরিত ক'রে জলের তলায় নিয়ে-যাওয়া। জলের একটু তলাতেই সে পেয়ে যাবে প্রশান্ত নিরাপত্তা—জলের ওপর সে কিছুতেই এই রাক্ষুসে প্রকৃতির সঙ্গে যুঝতে পারবে না। হুবু স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছে ডেকে, আমি অপেক্ষা করছি এই বুঝি সে আমায় বলে নিচে চ'লে যেতে—কিন্তু ককখনো আর সেই নির্দেশ এলো না। জলে ডুবে যাবার কোনো প্রস্তুতিও চোখে পড়লো না। আগের চেয়েও তীব্রভাবে জ্ব'লে উঠেছে তার চোখ, ভাবলেশহীন সে চেয়ে আছে ঝড়ের দিকে, যেন অসীম স্পর্ধায় সে তাকে অস্বীকার করতে চাচ্ছে, যেন সে নীরব মহাশব্দে এই কথাই ব'লে দিতে চাচ্ছে এই প্রকৃতিকে—সে মোটেই ডরায় না, মোটেই না!

আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না-ক'রে *বিভীষিকার* এখন ডুবোজাহাজ হিশেবে জলের তলায় চ'লে-যাওয়া উচিত। অথচ হুবুর যেন সে-বিষয়ে কোনো চেতনাই নেই। না, সে তেমনি অসীম ঔদ্ধত্যে, প্রচণ্ড স্পর্ধায় প্রকৃতির সব তাণ্ডবকেই তাচ্ছিল্য করতে চাচ্ছে। যেন সে সবকিছুর ঊর্ধ্বে, যেন সে কোনো মর্তমানুষ নয়!

তাকে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একসময় আমারই কেমন আচ্ছন্ন লাগলো, মনে হ'লো সত্যি কি সে কোনো অতিমানব, কোনো অতিপ্রাকৃত জগৎ থেকে আচমকা বেরিয়ে এসেছে!

হঠাৎ তুফানের সমস্ত গর্জন ছাপিয়ে তার মুখ ফুটে এক চীৎকার বেরিয়ে এলো, 'আমি হুবু, দিগ্বিজয়ী হুবু, *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড*, কাউকে আমি মানি না!'

সে হাত নেড়ে এমন-একটা ইঙ্গিত করলে, যা টারনার ও তার সহযোগী বিনাবাক্যব্যয়েই বুঝে ফেললে। দ্বিধাহীন তারা পালন করলে হুবুর নির্দেশ, যেন তারাও হুবুর মতোই বুদ্ধিভ্রংশ। ছিটকে বেরিয়ে এলো ডানা দুটি, আর *বিভীষিকা* উঠে এলো ঝড়ের আকাশে, ঠিক যেমন সেদিন সে উঠে গিয়েছিলো নায়াগ্রার ওপর। কিন্তু সেদিন

সে ঐ ভয়াল প্রপাতকে ফাঁকি দিতে পেরেছিলো, কিন্তু আজ—এই হারিকেনকে সে এড়াবে কেমন ক'রে—ঝড়ের চোখ যেন আজ তারই ওপর এসে আক্রোশ ফলাচ্ছে!

উড়োজাহাজ সোজা উঠে এলো আকাশে, সরাসরি, পাশে চমকাচ্ছে হাজার বিদ্যুৎ, প্রচণ্ড নাদে ফেটে পড়ছে হাজারটা বজ্র—আর তারই মধ্যে অন্ধের মতো ছুটেছে *বিভীষিকা*, যেন প্রতি মুহূর্তেই আলিঙ্গন করতে চাচ্ছে অনিবার্য ধ্বংসকে।

হুবুর ভঙ্গিতে একফোঁটাও বদল নেই। এক হাত হালে, আরেক হাত রেগুলেটরে, দু-পাশে বিশাল দুটি ডানা অবিশ্রাম ঝাপটাচ্ছে নিজেদের, হুবু সরাসরি যেন ঝড়ের চোখ লক্ষ্য ক'রে চালিয়ে দিয়েছে *বিভীষিকাকে*, আর মেঘ থেকে মেঘে লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটে চলেছে বিদ্যুৎ, চারপাশেই।

যদি সে এই *গগনচুল্লির* মাঝখানে তার বিমান নিয়ে যেতে চায়—তবে তাকে এক্ষুনি ঠেকাতে হবে। তাকে বাধ্য করতে হবে নিচে নামতে, জলের তলার শান্ত আধারকেই খুঁজতে হবে তার এক্ষুনি—খুঁজতে নয়, তাকে দিয়ে খোঁজাতে হবে—নইলে কিছুতেই আর রেহাই নেই!

তারপর নিজের এই উত্তাল ভাবনার মধ্যে হঠাৎ আমার সমস্ত চৈতন্যই যেন কর্তব্যপরায়ণ হ'য়ে উঠলো। হ্যাঁ, এও একরকম উন্মত্ততা, কিন্তু তবু মরবার আগে আমাকেও শেষবার আমার দায়িত্ব পালন ক'রে যেতে হবে—যাকে আমার দেশের সরকার আইনকানুনের পরপারে কোনো সমাজবিরোধী ব'লে ঘোষণা করেছে, যে তার ভয়াল আবিষ্কার মারফৎ সারা জগতের নিরাপত্তাই বিপন্ন ও বিঘ্নিত ক'রে তুলেছে, তাকে কি গ্রেফতার করা আমার কর্তব্য নয়? আমার কি উচিত নয় তার কাঁধে হাত রেখে বলা, 'ওহে মানুষ! ন্যায়বিচারের কাছে আত্মসমর্পন করো!' আমার নাম কি জন স্ট্রক নয়, ফেডারেল পুলিশের যে চীফ ইন্‌স্পেক্টর? আমি ভুলেই গেলুম কোথাও আছি, এও ভুলে গেলুম যে এরা তিনজন আর আমি একা ফুঁসে-ওঠা এক সমুদ্রের ওপর বজ্রবিদ্যুতে সমাচ্ছন্ন এক আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছি! আমি লাফিয়ে গিয়ে পড়লুম হুবুর ওপর, ঝড়কে ছাপিয়ে চীৎকার ক'রে উঠেছে আমার গলা:

'হুবু, আইন মোতাবেক, বিচারের নামে আমি—'

অকস্মাৎ *বিভীষিকা* এমনভাবে কেঁপে উঠলো যেন সে বিদ্যুতের ছোবল খেয়েছে! তড়িতাহত! তার সারা কাঠামোটাই কেঁপে উঠেছে থর্থর, ঠিক তার তড়িৎকোষের ওপর এসে ভেঙে পড়েছে বজ্র, আর সেই আকাশযান যেন চৌচির হ'য়ে ভেঙে প'ড়ে যাচ্ছে চার কোণায়।

ডানা দোমড়ানো, স্ক্রু চুরমার, কাঠামোর মধ্যে কিলবিল ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছে কত-যে বিদ্যুৎ, কত-যে ঝলসে-ওঠা সরীসৃপ, *বিভীষিকা* হাজার ফিট ওপর থেকে, লাট খেতে-খেতে, ভেঙে পড়লো নিচের গর্জে-ওঠা সমুদ্রে!

১৮

বুড়ি দাসীর শেষ মন্তব্য

কত ঘণ্টা যে সংজ্ঞাহীন প'ড়ে থাকার পর আমার চেতনা যখন ফিরে এলো, তাকিয়ে দেখি আমি যে-ক্যাবিনে শুয়ে আছি তার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একদল খালাশি —তারাই আমাকে বাঁচিয়েছে। আমার শিয়রের কাছে ব'সে কে-একজন আমায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে চলেছে, আর আস্তে-আস্তে যতই আমার ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করতে শুরু করছে, ততই আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি, কী হয়েছিলো।

সব, *সব* কথাই আমি তাকে খুলে বলেছি। হ্যাঁ, সবকিছু! আর আমার শ্রোতারা নিশ্চয়ই ভেবেছে যে নেহাৎই-বেচারা মানুষ আমি, আমার জ্ঞান ফিরেছে বটে অবশেষে, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি সব বুঝি লোপ পেয়েছে।

আমি রয়েছি মেহিকো উপসাগরে, *অটোয়া* স্টিমারের ওপর, সেটা চলেছে নিউ-অর্লিন্সের দিকে। এই স্টিমার কোনোক্রমে এড়িয়েছিলো তুফানটা, ঠিক সেটা কেটে যাবার পরেই হাওয়া তাকে সমুদ্রের ওদিকটায় তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলো, আর জলের ওপর তারা দ্যাখে ভাঙা জাহাজের কাঠকুটো, যার একটাকে আঁকড়ে ধ'রে আমি—সংজ্ঞাহীন —ভেসে যাচ্ছি।

এইভাবেই আবার আমি ফিরে এসেছি সাধারণ মানুষের মাঝখানে, আর হুবু—*দিগ্বিজয়ী হুবু*—তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে তার রোমাঞ্চকর অভিযান সাঙ্গ করেছে মেহিকো উপসাগরের জলে। চিরতরেই হারিয়ে গেছে *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড*, বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ, যার তুলকালাম প্রচণ্ডতার বিরুদ্ধে সে দাঁড়িয়েছিলো বেপরোয়া, প্রচণ্ড স্পর্ধায়। সে তার সঙ্গে নিয়ে গেছে তার এই আশ্চর্য আবিষ্কারের সমস্ত গোপন রহস্য।

পাঁচ দিন পরে *অটোয়া* দেখতে পেয়েছে লুইসিয়ানার তীর, আর দশই আগস্ট ভোরবেলায় পৌঁছেছে তার বন্দরে। আমার উদ্ধারকর্তাদের কাছ থেকে উষ্ণ সম্ভাষণে বিদায় জানিয়ে তক্ষুনি আমি চেপে বসেছি ওয়াশিংটনের ট্রেনে। মাঝখানে কয়েকদিন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে আবার আমি এই শহর দেখতে পাবো। স্টেশনে নেমেই, আমি সোজা ছুটে গিয়েছি পুলিশের সদর দফতরে, সবচেয়ে আগে সব কথা খুলে বলতে চেয়েছি মিস্টার ওয়ার্ডকে, যিনি একদিন আমায় না-জেনেই পাঠিয়েছিলেন হুবুর সন্ধানে।

মিস্টার ওয়ার্ডের ঘরের দরজা খুলে ঢোকবামাত্র আমাকে দেখে তাঁর মুখচোখে পর-পর যে-সব ভাব উঠেছিলো তা এইরকম : বিস্ময়, স্তম্ভিত হতবাক দশা, এবং হর্ষোল্লাস। আমার সঙ্গীদের কাছ থেকে তিনি যে-প্রতিবেদন পেয়েছিলেন, তাতে তিনি ধ'রেই নিয়েছিলেন যে লেক ইরির জলে আমার সলিলসমাধি হয়েছে—অন্যরকম কিছু ভাববার কোনো অবকাশই ঐ প্রতিবেদনের পরে ছিলো না।

তারপর আমি তাঁকে বিস্তারিতভাবে খুলে বলেছি সব কথা : লেক ইরির জলে আমি অদৃশ্য হ'য়ে যাবার পর কী-কী ঘটেছিলো : লেকের জলে সেই রুদ্ধশ্বাস অ্যাডভেনচার যখন ডেস্ট্রয়ারগুলো তাড়া ক'রে এসেছিলো *বিভীষিকাকে*, নায়াগ্রার জলপ্রপাতের ওপর থেকে একেবারে শেষ মুহূর্তে কীভাবে উড়াল দিয়েছিলো হুবুর আশ্চর্য যান, *গ্রেট আইরির* কোটরের ভেতর তার সাময়িক বিশ্রাম, আর সবশেষে মেহিকো উপসাগরের জলে প্রচণ্ড তুফানের মধ্যে তার ধ্বংসলীলা কীভাবে, কেমন ক'রে, সম্পন্ন হয়েছিলো।

এই-প্রথম তিনি জানতে পেলেন কী আশ্চর্য যন্ত্র তৈরি করেছিলো হুবুর অসাধারণ প্রতিভা, *একের ভেতরে চার*, যে জল-মাটি-আকাশ সবকিছুকেই জয় করেছিলো।

সত্যি-বলতে, এমন আশ্চর্য ও পূর্ণাঙ্গ কোনো যন্ত্র যে বানাতে পারে, তারই পক্ষে *দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড* নাম নেয়া মানায়। যে-নামে হুবু এই *খোলা চিঠি* লিখেছিলো। এটা ঠিক যে হুবু এবং তার যন্ত্র যদি এখনও থাকতো, তাহ'লে পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের জীবন হয়তো স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ থাকতো না—তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সব ব্যবস্থাই হয়তো নিষ্ফল এবং অকেজো হ'তো। কিন্তু তবু আমি গর্বে ও স্পর্ধায় উদ্দীপ্ত এই মানুষটিকে যেভাবে প্রকৃতির সব তুলকালাম শক্তির বিরুদ্ধে যুঝতে দেখেছি, যেন সমানে-সমানেই এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাতে আমি যেন পুরোপুরি বিহ্বল হ'য়ে পড়েছিলুম। আমি যে এই করাল তুফান থেকে প্রাণে বেঁচেছি, সেটাই যেন চূড়ান্ত অলৌকিক ঘটনা।

মিস্টার ওয়ার্ড ভেবেই পাচ্ছিলেন না আমার এই কাহনের কতটুকু তিনি বিশ্বাস করবেন। 'তাহ'লে, স্ট্রক,' শেষটায় তিনি বলেছেন, 'তুমি শেষ অব্দি যে প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছো, সেটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। দিগ্বিজয়ী বীর হুবুর পরেই তোমার নাম এখন সবখানে ছড়িয়ে পড়বে—তুমি হবে এই মুহূর্তে দ্বিতীয় বিখ্যাত মানুষ। আশা করি তাতে তোমার মাথা দেমাকে ঘুরে যাবে না—হুবু যেভাবে জাঁক দেখাতে গিয়ে শেষটায় নিজের সর্বনাশ ঘটিয়ে বসেছে, আশা করি তোমার মধ্যে সে-রকম কোনো অহমিকার ভাব গজাবে না—'

'না, মিস্টার ওয়ার্ড,' আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছি, 'আমার মাথা মোটেই ঘুরে যাবে না। তবে এটাও তো মানবেন যে এর আগে আর-কোনো লোকই নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করতে গিয়ে এমনভাবে জলেস্থলেআকাশে হুলুস্থুল তুলে ঘুরে বেড়ায়নি!'

'মানি, স্ট্রক মানি! আর, *গ্রেট আইরির* দুর্বোধ্য প্রহেলিকা, *বিভীষিকার* অমন আশ্চর্য সব রূপান্তর, তার এই ভয়ালভয়ংকর পরিণাম—সবই তুমি আবিষ্কার করেছো, নিজের চোখে দেখে এসেছো! তবে সবচেয়ে আপশোশের কথাই হ'লো এটা—হুবুর সঙ্গে-সঙ্গেই তার সব গোপন কথাও হারিয়ে গেলো—ঐ যন্ত্রের রহস্য আর-কোনোদিনই আমাদের জানা হবে না!'

সেদিনই খবরকাগজগুলোর সান্ধ্য সংস্করণে সাতকাহন ক'রে বেরিয়েছে আমার এই রোমাঞ্চকর বৃত্তান্ত, কারু কল্পনারই সাধ্যি ছিলো না তার ওপর কোনো রং চড়ায়।

মিস্টার ওয়ার্ড ঠিকই বলেছিলেন, সেদিন—হুবুর পরেই—আমিই ছিলুম সবচাইতে বিখ্যাত মানুষ।

একটি কাগজ লিখেছে :

ইন্‌স্‌পেক্টর স্ট্রকের সৌজন্যে আবারও আরেকবার প্রমাণ হ'লো যে মার্কিন পুলিশবাহিনীই এখনও সবার সেরা। অন্যদেশের পুলিশ হয়তো জলে-স্থলে অভিযান চালিয়ে কৃতকার্য হয়েছে, কিন্তু মার্কিন পুলিশ এবার দেখিয়েছে যে, শুধু জলে-স্থলেই নয়, দরকার হ'লে সে আকাশেও ঝাঁপ খেতে পারে।

অথচ, *বিভীষিকার* পেছনে ধাওয়া ক'রে গিয়ে আমি যা-যা করেছি, এই শতাব্দীতে হয়তো তার চেয়েও দুর্ধর্ষ কাজ করবে গোয়েন্দাবাহিনী—হয়তো জলেস্থলেআকাশে দাপটের সঙ্গে ছুটে বেড়ানো তাদের নিত্যকর্ম হ'য়ে উঠবে।

এটা তো না-বললেও চলে আমি যখন লং স্ট্রিটে আমার বাড়িতে গিয়ে ঢুকেছিলুম, আমার বুড়ি দাসী আমাকে কীভাবে অভ্যর্থনা করেছিলো। যখন আমার ছায়ারূপ—তাই তো বোধহয় বলে ভূতকে, তাই না?—তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিলো সে বুঝি ধপ ক'রে প'ড়ে গিয়ে হার্টফেল ক'রে বসবে! বেচারা! তারপর আমার বৃত্তান্ত সব শুনে-টুনে সে বলেছে—তার চোখ থেকে অঝোরে দরদর ক'রে জল ঝরছে তখন—ভগবানের অসীম দয়া ছাড়া এমন আশ্চর্যভাবে নিশ্চিত মরণ থেকে কেউ বাঁচে না।

'এবার আপনিই বলুন,' সে বলেছে, 'আমি ঠিক কথা বলেছিলাম কি না?'

'ঠিক বলেছো? কোন কথা?'

'বলিনি কি, *গ্রেট আইরি* হ'লো গিয়ে শয়তানের বাসা!'

'ধুর, কী-যে বলো! হুবু মোটেই কোনো শয়তান নয়!'

'তা হয়তো নয়,' বুড়ি দাসীই শেষ কথাটি বলেছে, 'তবে শয়তান হবার সব যোগ্যতাই তার ছিলো!'

দ্য সিক্রেট অভ ভিলহেল্‌ম স্টোরিৎস

প্রথম পরিচ্ছেদ

আর যত শিগগির পারিস আসিস কিন্তু ভাই, অঁরি ; আমি খুব অধীরভাবেই তোকে আসতে লিখছি। তাছাড়া, এ-দেশটাও চমৎকার, দক্ষিণ হাঙ্গেরির এই জেলাটা সত্যি যে-কোনো এনজিনিয়ারকে উস্‌কে দিতে পারে। অন্তত শুধু সেই কারণেও এখানে আসবার জন্যে কষ্ট স্বীকার করাটা তোর কখনও ক্ষোভের কারণ হবে না।

তোকে ভালোবাসা জানাই,

তোরই

মার্ক ভিদাল

চৌঠা এপ্রিল ১৭৫৭তে আমার ছোটোভাইটির কাছ থেকে আমি যে-চিঠি পেয়েছিলুম, তা শেষ হয়েছিলো এইভাবে।

এ-চিঠি এসে পৌঁছুবার আগে কোনো অলুক্ষুণে হুঁশিয়ারি আমায় উৎকণ্ঠায় ভ'রে দেয়নি : চিঠিটা বরং এসেছে যথানিয়মে, পর-পর অনেক ডাক-হরকরার হাত-ফেরতা হ'য়ে, শেষটায় আমার বাড়ির দারোয়ান এবং আমার খাশ খিদমৎগার মারফৎ, এসে পৌঁছেছে।—সে যথারীতি একটা রেকাবিতে চিঠিটা সাজিয়ে এনেছিলো আমার কাছে —বেচারা টেরও পায়নি এই মুহূর্তটার গুরুত্ব পরে কী-রকম ফুলে-ফেঁপে অতিকায় হ'য়ে উঠবে।

আর যখন ছুরি দিয়ে লেফাফার মুখ কেটে আমি চিঠিটা পড়তে শুরু করি, আমিও ছিলুম শান্তসুস্থির, এবং একনিশ্বাসে আমি গিয়ে পৌঁছেছি এই শেষ অনুচ্ছেদটায়, একবারও না-থেমে প'ড়ে ফেলেছি মার্ক-এর লেখা শেষ বাক্যগুলো, ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি যে-অদ্ভুত ঘটনাগুলোয় আমি জড়িয়ে পড়তে চলেছি, এই অনুরোধ-উপরোধে তারই বীজ লুকিয়ে আছে।

মানুষের অন্ধত্ব এইরকমই! এইভাবেই তো মানুষের অজ্ঞাতসারে তার ভবিতব্য গোপনে-গোপনে তার ভাগ্যের রহস্যময় বেড়াজাল বুনে যায়!

আমার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি সত্যিকথাই লিখেছিলো। হাঙ্গেরি যাবার জন্যে যত পথশ্রমই স্বীকার ক'রে থাকি না কেন, তা কখনও আমার খেদ বা মনস্তাপের কারণ হয়নি। কিন্তু এখন এ-সব কাহন লিখতে ব'সে আমি কি ঠিক করছি? জীবনে এমন কিছু-কিছু ব্যাপারও কি থাকে না যে-সম্বন্ধে চিরকালই আমাদের চুপচাপ থাকা উচিত? এ-রকম অদ্ভুত-এক কাহনকে বিশ্বাসই বা করবে কে? যে-আশ্চর্য কাহিনী এমনকী

সবচেয়ে দুঃসাহসী কবিও লিখতে গিয়ে দু-বার থমকে যাবেন?

তা, কেউ বিশ্বাস করুক চাই না-করুক! আমি বরং ঝুঁকিটাই নেবো। আমার কাহন কেউ বিশ্বাস করুক বা না-করুক, আমি বরং এই আশ্চর্য ঘটনাগুলো বর্ণনা করতে-করতে আরেকবার অনুভব ক'রে নেবো এই অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলোর অপ্রতিরোধ্য টান। আমার ছোটোভাইটির চিঠিটি ছিলো সেই ঘটনাচক্রেরই আপাতনিরীহ প্রস্তাবনা।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি, মার্ক, তখন আঠাশ বছরের যুবক, পোর্ট্রেট আঁকিয়ে হিশেবে সে এর মধ্যেই দারুণ সাফল্য অর্জন ক'রে বসেছিলো। আমাদের দু-ভাইয়ের মধ্যে ছিলো স্নেহ-ভালোবাসার নিবিড় বন্ধন। আমার দিক থেকে স্নেহটা একটু পিতৃস্নেহের মতনই ছিলো, কেননা আমি মার্ক-এর চাইতে ঠিক আটবছরের বড়ো। অল্প বয়েসেই আমরা বাবা-মা দুজনকেই হারিয়েছিলুম, আর তারপর মার্ক-এর দেখাশুনোর ভার এসে পড়েছিলো তার বড়োভাই এই আমারই ওপর। মার্ক মাঝে-মাঝে ঠাট্টা ক'রে বলতো আমি নাকি বড্ড-বেশি *দাদাগিরি* ফলাচ্ছি, ধরনটা ঠিক নাকি বহু-কথিত *বিগ ব্রাদার*-এরই মতো; তবে এটা ঠিক যে আমারই ওপর দায় বর্তেছিলো মার্ক-এর লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করার। আর চিত্রকলায় তার আশ্চর্য ঝোঁক আর নৈপুণ্য দেখে, আমিই তাকে তাতিয়ে ছিলুম চিত্রশিল্পী হ'তে—আর তারপর তো দেখা গেছে অল্পদিনের মধ্যেই তার নাম শিল্পরসিকদের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। তার এই সাফল্য আদপেই প'ড়ে-পাওয়া কিছু ছিলো না—ছিলো সাধনা আর প্রতিভার সমন্বয়।

তো, এই-তো সেই-মার্ক এখন বিয়ে করতে যাচ্ছে। কিছুকাল ধ'রেই সে থাকছিলো রাগ্‌ৎসে-এ, দক্ষিণ হাঙ্গেরির এক প্রধান শহরে। তার আগে কয়েকটা সপ্তাহ কাটিয়েছিলো বুডাপেশ্‌ট-এ, সেখানে বেশ জমকালো দক্ষিণার বদলে এঁকেছিলো গোটা কয়েক প্রোর্ট্রেট, ছবি হিশেবে সেগুলো খুব আদৃতও হয়েছিলো, আর হাঙ্গেরিতে যেভাবে শিল্পীদের সাগ্রহে বরণ ক'রে নেয়া হয়, সেটাও মার্ক-এর খুব ভালো লেগে গিয়েছিলো। তারপর সে বুডাপেশ্‌ট থেকে দানিউব ধ'রে গেছে দক্ষিণে—রাগ্‌ৎস-এ।

এই শহরের প্রধান পরিবারগুলো অন্যতম ছিলো ডাক্তার রডারিখ-এর পরিবার, চিকিৎসক হিশেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো সারা হাঙ্গেরিতেই। এমনিতেই উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন বিস্তর ধনসম্পদ—তার সঙ্গে যোগ হয়েছিলো চিকিৎসক হিশেবে তিনি যে বিপুল বিত্ত আহরণ করেছিলেন। বছরে একবার ক'রে তিনি ছুটি নিয়ে দেশবিদেশ বেড়াতে বেরুতেন, আর তাঁর ধনী মক্কেলরা কেউই তাঁর এই দেশভ্রমণক পছন্দ করতো না। গরিবগুরবোরাও তাঁর এই বাৎসরিক ছুটিকে পছন্দ করতো না, কারণ তিনি চিরকালই বিনা মূল্যে, *বিনা ফি-তে*, তাদের চিকিৎসা ক'রে এসেছেন। তাঁর দানধ্যানের পরিমাণও ছিলো বিপুল, দীনের থেকেও দীন তাঁর কৃপা থেকে কখনও বঞ্চিত হয়নি—আর তাঁর এই লোকসেবাই তাঁর সম্বন্ধে এক সার্বজনীন শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের কারণ হয়েছিলো।

পরিবার বলতে ডাক্তার রডারিখ-এর বাড়িতে ছিলো আরো তিনজন—তাঁর স্ত্রী, তার

ছেলে কাপ্তেন হারালান, আর তাঁর মেয়ে মাইরা। অতিথিবৎসল এই পরিবারের বাড়িতে মাঝে-মাঝে এসেছে মার্ক, আর তার ফলেই এই তরুণীর রূপলাবণ্য আর স্নিগ্ধ শ্রীর সংস্পর্শে এসে মুগ্ধ না-হ'য়ে পারেনি—আসলে তা-ই সম্ভবত রাগ্ৎস-এ তার অবস্থানকে প্রলম্বিত করেছে। তবে মাইরা রডারিখ যেমন মার্ক ভিদালকে আকৃষ্ট করেছিলো, তেমনিভাবে এই-কথাটা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে মাইরাও মার্কের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে আকৃষ্ট হয়েছে। এটাও মানতে কে আপত্তি করবে যে মার্ক ছিলো—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখনও আছে—চমৎকার মানুষ : মাঝারি উচ্চতা, সজীব উজ্জ্বল দুটি নীল চক্ষু, চেস্টানাটরঙের চুল, কবিদের মতো ললাটদেশ, আর মুখচোখ দেখে এটাই বোঝা যেতো যে জীবন তাকে শুধু বেঁচে-থাকার মধুর দিকগুলোই দেখিয়েছে; বন্ধুবৎসল, দরাজদিল, আর শিল্পীদের যেমন হ'য়ে থাকে—রূপমুগ্ধ।

আর মাইরা রডারিখ ? তার কথা আমি শুধু মার্কের উচ্ছ্বাসে-ভরা চিঠিগুলো থেকেই জেনেছি, আর এই চিঠিগুলো প'ড়েই তাকে একবার চাক্ষুষ দেখবার জন্যে আমি খুবই উৎসুক হ'য়ে উঠেছিলুম। আর ভ্রাতৃপ্রবর আমার সঙ্গে শুধু তার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যেই উন্মুখ হ'য়ে থাকেনি, আমাকে প্রায় কাকুতি-মিনতি ক'রে লিখছিলো রাগ্ৎস-এ চ'লে আসতে, বাড়ির কর্তা হিশেবেই, আরো জোর দিচ্ছিলো আমি সেখানে গিয়ে যেন অন্তত মাসখানেক থাকি। তার বাগ্‌দত্তা—অনবরত আমাকে লিখে জানিয়েছে সে—অধীরভাবে আমার জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে আছে, আর আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছুবামাত্র তারা বিয়ের দিন ঠিক ক'রে ফেলবে। কিন্তু তার আগে মাইরা, নিজের চোখে, আমাকে একবার দেখে নিতে চায়, জানতে চায় কে তার হবু ভাশুর, কার সম্বন্ধে মার্ক এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে—অন্তত সেইভাবেই মাইরা নাকি তার মনের কথা মার্ককে খুলে বলেছে। যে-পরিবারে বিয়ে ক'রে বউ হ'য়ে আসতে যাচ্ছে, সে-পরিবারের অন্যান্য মানুষরা কেমন, এটা জানবার জন্যে স্বাভাবিকভাবেই তার কৌতূহল জন্মাতে পারে, আগ্রহ জাগতে পারে। বস্তুত, সে নাকি চূড়ান্ত সম্মতি দেবেই না, যতক্ষণ-না আঁরির সঙ্গে মার্ক তার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে।

এই-সমস্ত কথাই আমার উত্তেজিত ভাইটি চিঠিগুলো বার-বার ক'রে লিখেছে আর সে-সব চিঠির ভাব ও ভাষা থেকে এটা বুঝতে আমরা অসুবিধে হয়নি যে মাইরার প্রেমে সে তখন একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে।

আমি তাকে বুঝিয়ে লিখেছি যে আমি তো মেয়েটিকে শুধু মার্কের উচ্ছ্বাসভরা চিঠি থেকেই জেনেছি। আর, আমার ভাই শিল্পী ব'লেই, বিশেষত পোর্ট্রেট-আঁকিয়ে ব'লেই, এটা আশা করেছি যে মার্কের পক্ষে ভাষায় নিজেকে প্রকাশ না-ক'রে রেখা ও রঙে তাকে ফুটিয়ে-তোলাই সহজ আর স্বাভাবিক হ'তো, সে মাইরাকে মডেল ক'রে ছবি এঁকে, ক্যানভাস না-হোক, কাগজেই এঁকে আমার কাছে পাঠাতে পারতো, আর আমি তখন তার *ছায়ারূপ*—তা-ই তো বলে লেখকরা, *ছায়া-মাইরা*—দেখে তার তারিফ করতে পারতুম।

কিন্তু মাইরার তাতে সায় নেই। মডেল হ'তে সে নারাজ। মার্ক ঘোষণা ক'রে জানিয়েছে, সশরীরেই সে আমার ধাঁধিয়ে-যাওয়া চোখের সামনে আবির্ভূতা হবে। প'ড়ে আমার মনে হয়েছে মার্ক হয়তো মেয়েটির সিদ্ধান্ত পালটাবার জন্যে খুব-একটা চেষ্টাই করেনি। দুজনে মিলে একযোগে এটাই চেয়েছে যে অঁরি ভিদাল তার এনজিনিয়ারিং বিদ্যে ও দায়িত্ব শিকেয় তুলে রেখে যেন সরাসরি হাঙ্গেরি গিয়ে রডারিখভবনের বৈঠকখানায় নিজের এত্তেলা দেয়—বিয়ের উৎসবের সর্বপ্রথম অতিথি হিশেবে।

আমার মনস্থির ক'রে ফেলবার জন্যে সত্যি কি এতসব যুক্তির দরকার ছিলো? মোটেই না। আমার ছোটোভাইটি বিয়ে করবে অথচ সেখানে আমি সশরীরে হাজির থাকবো না, এ আমি কিছুতেই হ'তে দিতুম না। বেশি দেরি না-ক'রে এক্ষুনি বরং আমার উচিত মাইরার সঙ্গে আলাপ ক'রে নেয়া—সে আমার ভ্রাতৃবধূ হবার আগেই।

তাছাড়া, *অধিকন্তু*, চিঠি আমায় বলেছে, হাঙ্গেরির ঐ অঞ্চলে গেলে আমার যে শুধু ভালোই লাগবে তা নয়, আখেরে আমার লাভই হবে। একে তো এটা মাগিয়ারদের দেশ, যাদের অতীত শৌর্যবীর্যের গৌরবগাথায় ভরা, যারা জার্মানদের সঙ্গে বেমালুম মিশে যেতে না-চেয়ে, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে, মধ্যইওরোপের ইতিহাসে একটা মস্ত ভূমিকা নিয়েছে।

আমি ঠিক করেছিলুম খানিকটা রাস্তা আমি যাবো ডাকের গাড়িতে, তারপর যাবার সময় বাকি রাস্তাটা যাবো দানিউব ধ'রে দক্ষিণে, আর ফেরবার সময় পুরো রাস্তাটাই আসবো ডাকের গাড়িতে। দানিউবের সৌন্দর্য আর মহিমার কথা কেই বা জানে না? আমি ভিয়েনা থেকেই দানিউব ধ'রে যাবো। আমি যদি তার সাতশো লিগ ধারাপথ ধ'রে পুরোপথটা নাও যাই, অন্তত দানিউবের তীরের সবচেয়ে সুন্দর অঞ্চলগুলো আমার চাক্ষুষ দেখা হ'য়ে যাবে—অস্ট্রিয়া আর হাঙ্গেরির মধ্য দিয়ে যে-দানিউব গেছে, সরাসরি একেবারে রাগৎস অব্দি, সার্বিয়ার একেবারে সীমান্তে।

আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত আপাতত শেষ হবে সেখানে গিয়েই। সময়ের অভাবেই আমার পক্ষে সম্ভব হবে না লৌহতোরণ পেরিয়ে কৃষ্ণসাগরে যেখানে গিয়ে দানিউব যেখানে সমুদ্রের অথৈ জলে পড়েছে, সেই ত্রিবেণী সঙ্গমে যাওয়া। আমি যতদূর যাবো তার জন্যে তিন মাসের ছুটিই যথেষ্ট হবে ব'লে আমি ভেবেছি। পারী থেকে রাগৎস গিয়ে পৌঁছুতে লাগবে একমাস ; মাইরা রডারিখ নিশ্চয়ই এতটা অধীর হ'য়ে নেই যে আমাকে পথের জন্যে অন্তত এই সময়টুকু ব্যয় করতে দেবে না। আমার ভাইয়ের নতুন দেশে গিয়ে তারপর আমি একটা আস্ত মাস কাটাবো, আর তারপর সেখানে থেকে ফ্রান্স ফিরে আসতে আরো-একটা মাস আমি ব্যয় করতে পারবো।

আমার জরুরি কাজগুলো চটপট সেরে নিলুম। মার্ক কতগুলো দলিলপত্র নিয়ে যেতে লিখেছিলো, সেগুলোও জোগাড় ক'রে নিলুম। এবার যাত্রার জন্যে তৈরি হ'তে হবে। তৈরি-হওয়া বলতে বিস্তারিত বা বিশদ-কিছু করার ছিলো না। বেশি মালপত্র নিয়ে অহেতুক পথের ঝামেলা বাড়াবার ইচ্ছে আমার আদপেই ছিলো না। নেবো তো শুধু

একটা তোরঙ্গ, মোটামুটি প্রমাণ মাপেরই, কিছু জামাকাপড়, বিয়ের উৎসবে যোগদান করার জন্যে যথোচিত পোশাক, আর টুকিটাকি যা-সব লাগে। ও-দেশের ভাষা নিয়ে আমার অযথা কোনো মাথাব্যথা ছিলো না—এর আগে কাজে-অকাজে আমায় জার্মানি যেতে হয়েছে, তাই আলেমান ভাষা আমার জানা। আর মাগিয়ার ভাষা? সেটা বুঝতে আমায় হয় তো তেমন মুশকিলে পড়তে হবে না। তাছাড়া সারা হুঙ্গেরিতেই তো চমৎকার ফরাশি চলে, আর-কেউ জানুক না-জানুক অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা তো জানবেই, তাছাড়া মার্ক জানিয়েছে অস্ট্রিয়ার সীমান্ত পেরিয়ে ওপাশে গিয়ে ভাষার জন্যে তাকে কোনো অসুবিধেয় পড়তে হয়নি।

'আপনি যেহেতু ফরাশি, হাঙ্গেরিতে আপনার নাগরিক অধিকার আছে ব'লে জানবেন,' একবার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাদের দেশের কাউকে জানিয়েছিলেন। আর সেই উষ্ণ অভ্যর্থনাতেই বোঝা যাচ্ছিলো ফ্রান্সের প্রতি মাগিয়ারদের প্রকৃত মনোভাব কী।

কাজেই মার্কের শেষ চিঠির উত্তরে আমি তাকে লিখে জানিয়েছি যে সে যেন মাইরাকে জানিয়ে দেয় তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমিও তারই মতো সমান অধীর হ'য়ে আছি। আরো যোগ করেছি : ভাবী ভাতৃবধুর সঙ্গে দেখা করতে আমি অচিরেই হাঙ্গেরির উদ্দেশে রওনা হ'য়ে পড়ছি, তবে ঠিক কবে যে রাগৎস-এ গিয়ে পৌঁছুবো তা আমি নিজেই সঠিক জানি না, কেননা সেটা নির্ভর করবে পথের অবস্থা ও ঘটনাসংযোগের ওপর। তবে সেইসঙ্গে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিকে এও ভরসা দিয়ে জানিয়েছি যে পথে আমি কখনোই লেটলতিফ চালে চলবো না। কাজেই রডারিখ পরিবার যদি চান তো অবিলম্বেই মে মাসের শেষে বিয়ের জন্যে একটা দিন স্থির ক'রে নিতে পারেন।

'দয়া ক'রে আমাকে দুমদাম ক'রে অভিশাপ দিসনে,' আমি যোগ করেছি চিঠিতে, 'যদি পথের বিভিন্ন স্থান থেকে নাও লিখে জানাই যে কবে কোথায় গিয়ে হাজির হয়েছি, এটা জানিস যে অন্তত মাঝে-মধ্যে মাদ্‌মোয়াজেল মাইরাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে আমি নিশ্চয়ই জানিয়ে দেবো তাঁদের পৈতৃক ভবন থেকে আমি ঠিক কত লিগ দূরে আছি —যাতে সে আমার পৌঁছুনো সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা ক'রে নিতে পারে। তবে পরে তোকে ঠিকই জানিয়ে দেবো—যথাসময়েই—ঠিক ক-টার সময় গিয়ে রাগৎস-এ পৌঁছুবো, সম্ভব হ'লে এমনকী ক-টা বেজে কত মিনিটে তাও জানিয়ে দেবো।'

রওনা হবার আগের দিন সন্ধেবেলায়, ১৩ই এপ্রিল, আমি পুলিশ-লিউটেনান্টের দফতরে গিয়ে হাজির হয়েছি; লিউটেনান্টের সঙ্গে আমার সদ্ভাবই ছিলো, বন্ধুতাই প্রায়; ফলে পাসপোর্টটা নেয়া এবং তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেয়া—এক ঢিলে দুই পাখিই খতম করার জন্যে তাঁর দফতরে যেতে চেয়েছি আসলে। পাসপোর্টটা হাতে তুলে দেবার সময় পুলিশ-লিউটেনান্ট আমার ভাইয়ের উদ্দেশে সহস্র অভিনন্দন জানিয়েছেন; মার্কের বিস্তর খ্যাতি ছড়িয়েছে আজকাল, অনেকেই তার নাম জানে, তবে তিনি তাকে ব্যক্তিগতভাবেও

জানতেন, তাছাড়া তার বিয়ের কথা নাকি সম্প্রতি তিনি কার কাছ থেকে শুনেছেন।

'আর এটাও জানি,' পুলিশ-লিউটেনান্ট আরো বলেছেন, 'আপনার ভাই যে-রডারিখ পরিবারে বিয়ে করতে যাচ্ছেন, রাগ্‌ৎস-এ সে-পরিবারের দারুণ সুনাম আছে।'

'আপনাকে কেউ এ-সম্বন্ধে জানিয়েছেন বুঝি?' আমি জিগেস করেছি।

'হ্যাঁ, এই তো গতকালই, অস্ট্রিয়ার অ্যামবাসাডারের বাড়িতে সন্ধের সময় পার্টি ছিলো, তখনই তো—'

'আর তিনিই আপনাকে এই খবর দিয়েছেন?'

'বুডাপেশ্‌টের একজন উঁচু অফিসার—হাঙ্গেরির রাজধানীতে থাকবার সময় আপনার ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা হয়েছিলো—তিনি তো তাঁর প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। তাঁর সাফল্য ছিলো তর্কাতীত, আর বুডাপেশ্‌ট তাঁকে যেমন উষ্ণভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো, রাগ্‌ৎস-এ গিয়ে তিনি তাঁর চেয়েও বেশি সমাদর পেয়েছেন—খ্যাতি তো হাওয়ার বেগে দৌড়োয়। তাতে অবশ্য আমাদের অবাক হবার কিছু নেই, ভিদাল।'

'কিন্তু,' আমি নাছোড়ভাবে খুঁচিয়েছি, 'সেই অফিসার রডারিখ পরিবারের প্রশংসাতেও কি তেমনি উচ্ছ্বসিত ছিলেন?'

'খুবই উচ্ছ্বসিত। ডাক্তার রডারিখকে সবাই প্রায় ঋষির মতো শ্রদ্ধাভক্তি করে। অস্ট্রিয়া আর হাঙ্গেরি—দু-দেশের সর্বত্রই তাঁর খুব নাম। যত-রকম ভূষণ, পদক, খেতাব সম্ভব—সবই তিনি পেয়েছেন। কাজেই আপনার ভাই চমৎকার একটি পরিবারেই বিয়ে করতে যাচ্ছেন, কারণ যতটুকু শুনেছি মাদমোয়াজেল মাইরা রডারিখও খুব আকর্ষণীয়া ব্যক্তিত্ব।'

'আপনি নিশ্চয়ই অবাক হবেন না,' উত্তরে আমি তাঁকে বলেছি, 'যখন বলবো যে মার্কেরও ধারণা ও-রকম মেয়ে কেউ হয় না; সে প্রায় আপ্লুত হ'য়ে আছে মাইরাতে।'

'সে-তো দারুণ ব্যাপার, ভিদাল, খুবই ভালো কথা। আমার শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন তাঁকে জানিয়ে দেবেন—আমি ঠিক জানি নবদম্পতির সুখসমৃদ্ধি বিস্তর লোকের ঈর্ষার কারণ হবে।...তবে,' একটু দোনোমনা করেছেন পুলিশ-লিউটেনান্ট, 'জানি না কোনো বেফাঁস কথা ব'লে ফেলছি কি না...তবে—'

'বেফাঁস কথা?' আমি তাজ্জব হ'য়ে গেছি।

'তাহ'লে মার্ক আপনাকে জানাননি যে তিনি রাগ্‌ৎস-এ যাবার মাস কয়েক আগে...'

'মার্ক রাগ্‌ৎস-এ যাবার আগে?' আমি বুঝি হতভম্বের মতো ঐ কথাই আবার আউড়েছি।

'হ্যাঁ...মাদমোয়াজেল মাইরা রডারিখ...তা, ভিদাল, এমনও হ'তে পারে যে আপনার ভাই সে-কথা শোনেনইনি।'

'হেঁয়ালি ছেড়ে ব'লে ফেলুন তো কী ব্যাপার—কারণ আপনি যে কী বলতে চাচ্ছেন সেটা আমার মগজে ঢুকছেই না।'

'বেশ, বলছি। যদ্দুর শুনেছি—এবং তাতে আশ্চর্য হবারও কিছু নেই—মাদমোয়াজেল রডারিখ-এর বিস্তর পাণিপ্রার্থী ছিলো—আর তাদের মধ্যে একজন অন্তত ছিলো যার সম্বন্ধে খুব-একটা শ্রদ্ধা হবার কোনো কারণ নেই। এই কথাই সেদিন পার্টিতে আমার বন্ধু আমাকে বলেছিলেন। ব্যাপারটা ঘটেছিলো পাঁচ সপ্তাহ আগে, তখন আপনার ভাই ছিলেন বুডাপেশ্‌ট-এ।'

'আর এই প্রতিদ্বন্দ্বীটি— ?'

'ডাক্তার রডারিখ তাকে দরজা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।'

'তাহ'লে আর এ-ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার কী আছে । তাছাড়া, মার্ক যদি না-জানে যে তার কোনো-একজন প্রণয়প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো, অন্তত কোনো চিঠিতেই সে ঘুণাক্ষরেও এমন-কোনো কথা উল্লেখ করেনি, তাহ'লে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বেশি দূরে গড়ায়নি—সেটা নিশ্চয়ই তেমন গুরুতর-কিছু নয়।'

'তা ঠিক।'

'আপনি আমাকে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়ে ঠিকই করেছেন—নেহাৎ যদি কেচ্ছাগুজব না-হয়...'

'না, ভিদাল। যে-খবরটা পেয়েছি তা মোটেই হালকা-কিছু নয়—'

'খবরটা হয়তো হালকা নয়, তবে বিষয়টার কোনো গুরুত্বই নেই।' আমি বলেছি, 'আর সেটাই সবচেয়ে বড়ো কথা।' আমি ওঠবার উপক্রম করেছি। 'কিন্তু আপনার বন্ধু কি সেই প্রতিদ্বন্দ্বীটির নাম বলেছিলেন—ঐ যাকে ডাক্তার রডারিখ দরজা দেখিয়ে দিয়েছিলেন ?'

'বলেছিলেন।'

'আর তার নাম?'

'ভিলহেল্ম স্টোরিৎস।'

'ভিলহেল্ম স্টোরিৎস?! রসায়ন-পণ্ডিতের—না, না, সেই কিমিয়াবিদের ছেলে ?'

'হ্যাঁ।'

'হ্যাঁ, এটা একটা নাম বটে! এমন-এক বিজ্ঞানসাধকের নাম যাঁর আবিষ্কারগুলো তাঁকে দারুণ বিখ্যাত করেছিলো।'

'এবং যাঁর সম্বন্ধে গোটা জার্মানি সংগতভাবেই খুব গর্বিত।'

'কিন্তু তিনি কি মারা যাননি ?'

'হ্যাঁ, বেশ ক-বছর আগেই মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর ছেলে বেঁচে আছে—এবং, আমার কাছে যে-খবর আছে, সেই অনুযায়ী, এই ভিলহেল্ম স্টোরিৎস তেমন সুবিধের লোক নয়।'

'সুবিধের লোক নয় ? *অর্থাৎ* ?'

'কীভাবে যে আপনাকে কথাটা বলবো, সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আমার অফিসারবন্ধুর কথা বিশ্বাস করতে হ'লে বলতে হয় এই ভিলহেল্ম স্টোরিৎস আদৌ তার বিখ্যাত বাবার মতো নয়।'

'তাই নাকি ?' আমি তখন আবহাওয়াটা হালকা করবার জন্যে রসিকতা করেছি। 'তাহ'লে অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হয়। তা এই প্রণয়প্রার্থীটির কি তিনটে পা আছে —না কি চারটে হাত—না কি শুধুই আছে ষষ্ঠেন্দ্রিয় ?'

'তা অবশ্য তেমন স্পষ্ট নয়,' আমার বন্ধু হেসে উঠেছেন, 'তবে আমার ধারণা *বাবার মতো নয়* কথাটার মর্মার্থ কিন্তু শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলছে না, বরং তার নৈতিক দিক সম্বন্ধেই কটাক্ষ করছে। এর সম্বন্ধে একটু সাবধান থাকাই উচিত।

'বেশ, সাবধানই থাকবো না-হয়—অন্তত বিয়েটা চুকে না-যাওয়া অব্দি নিশ্চয়ই চোখকান খোলা রাখবো।'

অতঃপর এই তথ্যটি নিয়ে আর-তেমন মাথা না-ঘামিয়ে, আমি পুলিশ-লিউটেনান্টের সঙ্গে করমর্দন করেছি, তারপর বাড়ি গিয়ে আমার যাত্রার প্রস্তুতি সাঙ্গ করতে লেগে গিয়েছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ডাকের গাড়িতে ক'রে আমি পারী ছেড়েছি ১৪ই এপ্রিলের সকালবেলায়, সাতটার সময়। দশদিনের মধ্যেই আমার অস্ট্রিয়ার রাজধানীতে পৌঁছে-যাওয়া উচিত।

আমার যাত্রার প্রথম অংশটার কেবল বুড়ি ছুঁয়ে যেতে চাই আমি। পথে তেমন-কোনো ঘটনাই ঘটেনি, আর যে-সব জায়গায় ভেতর দিয়ে আমাদের গাড়ি গেছে তা পাঠকের এতই জানা যে সে নিয়ে নতুন-কিছু বলতে যাওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র।

আমরা প্রথম গিয়ে থেমেছি স্ট্রাসবুর্গে, আর আমি বেশ কয়েকটা রাত্রি কাটিয়েছি রাজপথের খোয়ার ওপর চলন্ত চাকার গান শুনে-শুনে, আর এই অবিশ্রাম গুঞ্জনটা এমনই যা স্তব্ধতার চেয়েও অনায়াসে যে-কাউকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আরো-কতগুলো শহরের মধ্য দিয়েও গেছি আমি, তারপর অস্ট্রিয়ার সীমান্তের কাছে এসে আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে সাল্‌ৎসবুর্গে আটকে থাকতেও হয়েছে। তারপর, অবশেষে, ২৫শে এপ্রিল, সন্ধে ছটা পঁয়ত্রিশে, মুখে-ফেনা-তোলা ঘোড়াগুলো খটাখট আওয়াজ ক'রে গিয়ে ঢুকেছে ভিয়েনার সেরা হোটেলটার চত্বরে।

সেখানে আমি সবশুদ্ধু মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টা থেকেছি—শুধু দুটো রাত্রিই কাটিয়েছি ঐ রাজধানীতে। ফেরবার পথে ঠিক করেছি আরো ভালো ক'রে হ্বীন বা ভিয়েনার একটা সরেজমিন তদন্ত করবো।

দানিউব কিন্তু ভিয়েনার মধ্য দিয়েও যায়নি, অথবা গা ঘেঁসেও যায়নি ; আমাকে অন্য-একটা কোচবাক্সে ক'রে এক লিগ পেরিয়ে তবেই যেতে হয়েছে সেই নদীর তীরে

যার সহায় সলিল আমাকে সরাসরি রাগ্‌ৎস-এ এগিয়ে পৌঁছে দেবে। আগের রাত্তিরেই আমি হালকা জলপোত *ডরোথিতে* যাত্রীদের ভিড়ভাট্টা সত্ত্বেও একটা টিকিট কেটে রাখতে পেরেছি।

ডরোথিতে উঠে দেখি সেখানে প্রায় সকলেরই কিছু-না-কিছু আছে : সব ধরনের লোক, আলেমান, অস্ট্রিয়ান, মাগিয়ার, রুশী, ইংরেজ—কে বাদ নেই। যাত্রীরা আছে ডেকে, গলুইয়ের কাছে, নিচে খোলের মধ্যে মালপত্র এত ঠাশা যে কারুই কোনো জায়গা হ'তো না সেখানে।

আমার প্রথম ভাবনাটা ছিলো কী ক'রে সার্বজনীন ডরমিটরিতে একটা বাঙ্ক বাগিয়ে নেয়া যায়। আমার তোরঙ্গটা সেখানে নিয়ে যাবার কোনো কথাই ওঠেনি : খোলা হাওয়ায় সেটা ডেকের ওপরেই ফেলে যেতে হবে, পারলে কোনো বেঞ্চির কাছে, যাতে তার ওপর ব'সে অনেকক্ষণ সময় কাটাতে পারি দানিউবকে দেখতে-দেখতে, আর তাতে আমার তোরঙ্গটার ওপরও নজর রাখতে পারবো।

একে স্রোতের বেগ ক্ষিপ্রপ্রবল, তায় জোর হাওয়া দিচ্ছিলো—এই দুয়ের যোগসাজসে বজরাটা ভেসে চলেছিলো দ্রুতবেগেই, গলুইটা তরতর ক'রে গেরি জল কেটে এগুচ্ছিলো, কারণ কিংবদন্তি যা-ই বলুক না কেন দানিউব ঠিক নীল ছিলো না, যেন গেরুয়া রঙেই ছোপানো ছিলো। পথে অনেক নৌযানের দেখা পাওয়া গিয়েছে, হাওয়ায় ফাঁপানো তাদের পাল, দেশগাঁয়ের জিনিশপত্র নিয়ে বড়ো গঞ্জে বা শহরগুলোর উদ্দেশে চলেছে। সেই বিশাল ভেলাগুলোর একটার পাশ কাটিয়ে গিয়েছে *ডরোথি*, ভেলাটা যেন আস্ত একটা জঙ্গলের গাছপালা জুড়ে-জুড়ে বানানো, আর তার ওপর যেন তুলে-আনা হয়েছে আস্ত একখানা গ্রামকেই, যেটা ঠিক যাত্রার সূচনায় বানিয়ে নেয়া হয় আর গন্তব্যে পৌঁছুলে ফের খুলে ফেলা হয়, ঠিক মনে করিয়ে দেয় আমাজোনের ওপর মস্ত-সব ভাসমান গ্রামগুলো, ব্রাজিলের যা বৈশিষ্ট্য। তারপর ছোটো-ছোটো দ্বীপের পর দ্বীপ, যেন কোনো পরিকল্পনা না-ক'রেই বসানো হয়েছে একেকটা মাটির ঢিবি, তার কোনো-কোনোটা নেহাৎ ছোটোও নয়, তবে তাদের বেশির ভাগই যেন জল থেকে মাথাটা একটুখানি শূন্যে তুলে তাকিয়ে আছে—ভয় পেলেই ফের ভুউশ ক'রে ডুবে যাবে—এতই নিচু জমি যে বান ডাকলে সবই জলের তলায় মিলিয়ে যাবে। অথচ কী উর্বর জমি, কী সতেজ, কী প্রফুল্ল, গাছপালার সবুজ আর কত রঙের ফুলেরই যে বর্ণালি তাতে, কত রংবাহার; কত গন্ধময় হাওয়া তাতে খেলে বেড়ায়। আমরা আরো পেরিয়ে গিয়েছি জলের ওপর গ'ড়ে-তোলা গ্রাম, নৌকোয় গড়া গ্রাম, বজরায়-বজরায় থাকার আস্তানা, তীরের খুঁটির গায়ে দড়ি বা লোহার শেকল দিয়ে বাঁধা, অনবরত হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। দু-একবার তো এমন হয়েছে যে আমাদের পালতোলা বজরা এদের দড়ির তলা দিয়ে গেছে, একতীর থেকে আরেকতীরে খুঁটিতে-খুঁটিতে বাঁধা দড়ি, মনে হয়েছে আমাদের বজরার পাল বুঝি তাতে ধাক্কা খাবে, অথচ আশ্চর্য, কেমন সন্তর্পণে যেন সে-সব পেরিয়ে এসেছে *ডরোথি*।

এইভাবেই অবশেষে আমরা এসে পৌঁছেছি বুডাপেশ্‌ট; সেখানে আমি কয়েকদিন কাটিয়েছি, আশপাশে সব দ্রষ্টব্য ঘুরে-ঘুরে দেখে। যাত্রার আগের দিন আমি একটা বড়ো হস্টেলে গিয়েছি বিশ্রাম করতে। আমি হাঙ্গেরির বিখ্যাত শাদা ওয়াইন খাচ্ছিলুম, এমন সময় আমার চোখ পড়েছে একটা খোলা খবরকাগজের ওপর। কিছু না-ভেবেই সেটা আমি হাতে তুলে নিয়েছি, আর অমনি আমার চোখে প'ড়ে গেছে মস্ত-মস্ত গথিক হরফে লেখা দুটি শব্দ :

স্টোরিৎস্‌ স্মৃতিবার্ষিকী

এই নামটাই তো বলেছিলেন পুলিশ-লিউটেনান্ট, এটাই তো সেই নামজাদা আলেমান কিমিয়াবিদের নাম, এটা তো মাইরা রডারিখের হ'লেও-হ'তে-পারতো পাণিপ্রার্থীর নামও। সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই আমার ছিলো না।

সেই কাগজে যা পড়েছি তা এই :

আর তিন সপ্তাহ পর, ২৫শে মে, অটো স্টোরিৎস-এর স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে স্প্রেমবার্গ-এ। এটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে এই প্রসিদ্ধ জ্ঞানসাধকের জন্মস্থলে দলে-দলে লোক গিয়ে গোরস্থানে হাজির হবে।

এটা সকলেরই জানা যে, এই অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁর আশ্চর্য সব উদ্ভাবনী মারফৎ সারা জার্মানিকেই বিখ্যাত ক'রে গেছেন, বস্তুবিজ্ঞানের অগ্রগতির পিছনে এই বিজ্ঞানসাধকের কাজের অবদান যে কতটা, তাও কারু নিশ্চয়ই অজ্ঞাত নেই।

নিবন্ধকার যে কোনো অত্যুক্তি করেননি, সেটা ঠিক। অটো স্টোরিৎস্‌-এর নাম সংগত কারণেই ভৌতবিজ্ঞানজগতে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। কিন্তু যেটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিলো, সেটা এর পরের কথাগুলোই :

এ-কথাও নিশ্চয়ই কারু অজ্ঞাত নেই যে তাঁর জীবদ্দশায় অতিপ্রাকৃতে যাঁদের বিশ্বাস ছিলো তাঁদের কাছে অটো স্টোরিৎস প্রায় ঐন্দ্রজালিক হিশেবেই গণ্য হতেন। দু-এক শতাব্দী আগে এটাও সম্ভব ছিলো যে তিনি নিশ্চয়ই গ্রেফতার হতেন কোতোয়ালির হাতে, তারপর বিচারের পর হাটের মাঝখানে তাঁকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হ'তো। আমরা আরো জানাতে চাই যে তাঁর মৃত্যুর পর অনেক লোকই —বিশেষত গালগল্প শুনে যাঁরা ম'জে যান—তাঁকে এখন আরো বেশি ক'রে জাদুবিদ্যার সাধক ব'লেই ভাবছেন, ভাবছেন যে তিনি নিশ্চয়ই অতিমানুষিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তবে তাঁদের যা আশ্বস্ত করে সেটা এই তথ্য যে তিনি তাঁর নিজের যাবতীয় গুপ্তকথা নিয়েই কবরে গেছেন। তাঁদের কাছে অবশ্য অটো স্টোরিৎস চিরকালই থেকে যাবেন মন্ত্রসিদ্ধ ঐন্দ্রজালিক, এমনকী নব্য শয়তানিবিদ্যারও উপাসক।

যে যা-খুশি তা-ই ভাবুক, কিন্তু তথ্য হ'লো এটাই যে—আমি ভেবেছি—তাঁর ছেলেকে ডাক্তার রডারিখ কিছুদিন আগে তাঁর দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন। তা না-হ'লে কে কী ভাবলো, তাতে আমার ব'য়েই যেতো।

নিবন্ধটি অবশ্য তার পরেও এই কথাগুলো ব'লে উপসংহার টেনেছিলো :

কাজেই এ-কথা ভাবা যুক্তিসংগত হবে যে জনসমাবেশ হবে বিপুল, যেমন প্রতিবারই স্মৃতিবার্ষিকীর দিনে হ'য়ে থাকে। আর তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব যে চিরকালই তাঁর অনুরক্ত থেকে যাবেন, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। এটা ভাবলেও বাড়াবাড়ি হবে না স্প্রেমবার্গ-এর কুসংস্কারগ্রস্ত লোকজন কোনো অলৌকিক কীর্তির জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে, তারা এই আশ্চর্য ও অলৌকিককে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে চায়। শহরে আজকাল যে-সব জনরব শোনা যাচ্ছে, তা থেকে অনুমান হয় গোরস্থান সেদিন অদ্ভুত অসম্ভব কোনো দৃশ্যের পটভূমি হ'য়ে উঠবে। যদি সাধারণ ভয়ভীতির মধ্যে সেদিন কবরের পাথর ঠেলে সরিয়ে এই অদ্ভুতকর্মা কিমিয়াবিদ আবার উঠে দাঁড়ান, স্প্রেমবার্গ-এর লোক তাতে আদৌ অবাক হবে না।

কারু-কারু মতে, অটো স্টোরিৎস আদৌ মারা যাননি, এবং তাঁর অন্ত্যেষ্টি ছিলো নিছকই একটি ধাপ্পা।

এই আজগুবি বুজুর্গ-এর অবিশ্বাস্য কীর্তিকথা নিয়ে আমরা অধিকতর বাক্যব্যয় করতে চাই না। তবে সকলেই তো জানেন, কুসংস্কারের সঙ্গে কদাপি যুক্তি বা কাণ্ডজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। এবং কাণ্ডজ্ঞান যখন এইসব হাস্যকর কিংবদন্তির সমূহ বিনাশ ঘটাবে, তার আগে নিশ্চয়ই আরো-অনেক বছর জাদুবিশ্বাসেই কেটে যাবে।

এই লেখাটা পড়ার পর কতগুলো মন-খারাপ-করা চিন্তার উদয় হ'য়ে গিয়েছিলো আমার মধ্যে। অটো স্টোরিৎস যে মারা গেছেন, তাঁকে যে যথারীতি কবর দেয়া হয়েছে, এ-সম্বন্ধে ককখনো কারু মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না। ২৫শে মে সেই তাঁর কবরটা যে খুলে যাবে আর তিনি কোনো নতুন ল্যাজারাসের মতো ভিড়ের সামনে এসে আবির্ভূত হবেন—এটা এমনই-এক অদ্ভুত কুসংস্কার যে এ-সম্বন্ধে দ্বিতীয়বার কিছু ভাবারও অবকাশ নেই। তবে পিতার মৃত্যু বিষয়ে কোনো প্রশ্ন যেমন ওঠে না, তেমনি এটাও তো মেনে নিতে হবে পুত্রটি বহালতবিয়তেই আছেন, এবং রডারিখ পরিবার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ভিলহেল্ম স্টোরিৎসই যে ঐ পুত্রসন্তান সে-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। সে-যে মার্ককে কোনো মুশকিলে ফেলবে না—এটা কিন্তু কেউই নিশ্চয় ক'রে জানে না; বিয়ের সময় সে নানারকম ওজর-আপদ তৈরি করতেই পারে।

'নাঃ,' কাগজটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে আমি নিজেকেই বুঝিয়েছি, 'আমি বড্ড

যুক্তিহীন হ'য়ে উঠছি। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস মাইরার পাণিপ্রার্থনা করেছিলো, এবং তার প্রস্তাব উপেক্ষা করা হয়েছিলো...তো কী? তারপর থেকে এই স্টোরিৎসের তো কোনো পাত্তাই পাওয়া যায়নি, আর মার্কও এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। আমার তবে কেন খামকা মনে হচ্ছে এই ঘটনাটার মধ্যে বিপদের বীজ লুকিয়ে আছে!'

আমি তক্ষুনি মার্ককে একটা চিঠি লিখতে ব'সে গিয়েছি, তাকে জানিয়েছি যে আমি পরদিনই বুডাপেশ্‌ট থেকে রওনা হ'য়ে যাবো, আর রাগ্‌ৎস গিয়ে পৌঁছুবো ১১ই মে-র অপরাহ্ণে, কারণ আমি তো রাগ্‌ৎস থেকে এখন মাত্র পঁয়ষট্টি লিগ দূরে আছি। এটাও উল্লেখ করেছি যে এ-যাবৎ আমার যাত্রায় না-কোনো অযথা বিলম্ব করার কারণ ঘটেছে, না-বা কোনো অভাবিত উৎপাত এসে হাজির হয়েছে, ফলে আমার ধারণা বাকি পথটুকুও উপদ্রবহীন কেটে যাবে। সেইসঙ্গে অবশ্য ডাক্তার ও মাদাম রডারিখকে সম্ভাষণ জানাতে আমি ভুলিনি, মাদমোয়াজেল মাইরারও কুশল কামনা করেছি; ঠিক জানতুম মার্ক পত্রপাবামাত্র যথাস্থানে বার্তা পৌঁছে দেবে।

পরদিন সকাল আটটায় *ডরোথি* তার নোঙর তুলে তার গন্তব্যের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছে। এটা তো বলাই বাহুল্য যে, ভিয়েনা ছাড়ার পর থেকেই যতবার আমরা থেমেছি ততবারই যাত্রীদের ওঠানামা চলেছে, পুরোনো যাত্রীরা অনেকেই নেমে গেছে, আবার নতুন যাত্রীরা এসে বজরায় উঠেছে। শুধুমাত্র পাঁচ-ছজন যাত্রীই—তাদের মধ্যে দু-তিনজন ইংরেজও ছিলো—অস্ট্রিয়ার রাজধানীতে বজরায় উঠেছিলো—তারা নামেনি, তারা সরাসরি কৃষ্ণসাগরের দিকে চলেছে। অন্য জায়গার মতো, বুডাপেশ্‌টেও, কিছু নতুন যাত্রী এসে *ডরোথিতে* উঠেছিলো। তাদের মধ্যে একজন তার অদ্ভুত চেহারার জন্যে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। যাত্রীটির বয়েস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, ঢ্যাঙা, গলানো সোনার মতো চুল মাথায়, চোখ দুটি জ্বলজ্বলে নীল, মুখ-চোখে কেমন-একটা রূঢ় বিরূপ ভঙ্গি। তার হাবভাবে কেমন-একটা বিশ্রী ঔদ্ধত্যের ছাপ। যতবারই সে *ডরোথি*-র কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলেছে, ততবারই তার কথাবার্তায় একটা রুক্ষ কাটা-কাটা ভঙ্গি ফুটে বেরিয়েছে। এই যাত্রীটির মধ্যে অন্য-কারু সম্বন্ধে কোনো গরজ বা কৌতূহলই ছিলো না। তাতে অবশ্য আমার কিছুই এসে যায়নি, কেননা অ্যাদ্দিন অব্দি আমি সহযাত্রীদের সঙ্গে একটা ভদ্র ও শোভন দূরত্ব বজায় রেখেই চলেছি। শুধু বজরার কাপ্তেনের সঙ্গেই আমার যা দু-চারটে কথাবার্তা হয়েছে।

এই যাত্রীটির কথা যতবারই আমার মনে হানা দিয়েছে, ততবারই আমার ধারণা হয়েছে সে নিশ্চয়ই আসলে আলেমান, সম্ভবত প্রুশিয়া থেকে এসেছে—সেটা প্রায় যেন বোঝাই যাচ্ছিলো, কেননা তার সবকিছুর মধ্যেই কেমন-একটা রুক্ষ টিউটনিক ছাপ। মাগিয়ারদের সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলাটা আদপেই যেন সম্ভব ছিলো না—তাছাড়া বীর মাগিয়াররা চিরকালই ছিলো ফ্রান্‌সের প্রকৃত বন্ধু।

পাঠক নিশ্চয়ই অবাক হবেন—যদি ধ'রেই নেয়া যায় কোনোদিন আমার কোনো পাঠক জুটবে!—যদি আমার যাত্রাটা এতই নির্বিঘ্ন ও ঘটনাহীন হ'য়ে থাকে, তবে কেন

এই কাহন আমি শুরু করেছিলুম যাত্রাটাকে অদ্ভুত বা আশ্চর্য ব'লে অভিহিত ক'রে। তা যদি তাঁর মনে হ'য়ে থাকে, তবে আমার সেই পাঠককে একটু ধৈর্য ধরতে বলবো। একটু পরেই তিনি দেখতে পাবেন আমার এই ভ্রমণবৃত্তান্তটা সত্যি কতটা রহস্যময় আর অদ্ভুত হ'য়ে উঠেছিলো।

সত্যি-বলতে, বুডাপেশ্‌ট ছাড়ার পর-পরই একটা ঘটনা ঘটেছিলো যার কথা ভাবলে এখনও আমার আশ্চর্য লাগে। সত্যি-বলতে ঘটনাটি ছিলো অতীব তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। এমন তুচ্ছ-কোনো বিষয় নিয়ে কাহন ফাঁদতে গিয়ে এই খটকাটা জাগবেই যে সত্যি একে কোনো *ঘটনা* বলা যাবে কি না। তাছাড়া হয়তো পুরোটাই ছিলো কল্পনার সৃষ্টি—অন্তত ব্যাপারটা যে আদপেই বাস্তব নয় তার প্রমাণ আমি তো প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই পেয়েছিলুম। ব্যাপারটা না-হয় খুলেই বলা যাক।

আমি দাঁড়িয়েছিলুম গলুইয়ের কাছে, আমার তোরঙ্গটার পাশেই—তার ডালার ওপর একটা কাগজ সাঁটা ছিলো, তাতে যে-কেউই আমার নাম, ধাম, পেশা সম্বন্ধে সমস্ত তথ্যই পেয়ে যেতে পারতো। রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে আমি অলস শূন্য চোখে দানিউবের দৃশ্য দেখছিলুম; আর এটাও সোজাসুজি ব'লে রাখি, আমি তখন কিছুই ভাবছিলুম না।

হঠাৎ কেমন-একটা অদ্ভুত অনুভূতি হ'লো আমার—কে যেন ঠিক আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

এটা সত্যি যে আমাদের কারুই পেছনে কোনো চোখ নেই, তবু অনেকেই নিশ্চয়ই এই অনুভূতি বোধ করেছেন যদি তাঁদের অজ্ঞাতসারেই কেউ একদৃষ্টে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে। আসলে যে-অনুভূতিটা তখন হচ্ছিলো, আমি তা হয়তো ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না। আর-কিছু না-হোক, অনুভূতিটা কেমন যেন কুহেলিভরা ছিলো। এটা ঠিক যে অন্তত সেই মুহূর্তে আমি তা-ই অনুভব করেছিলুম।

এবং অমনি আমি পেছন ফিরে তাকিয়েছি—আর আশ্চর্য!—আমার আশপাশেই কেউ তখন ছিলো না।

পেছন ফিরে কাউকে দেখতে পাবো—এই ধারণাটা এমনই তীব্র ছিলো যে পেছন ফিরে সত্যি যখন কাউকে দেখতে পাইনি, আমি কেমন ভড়কে গিয়েছি। শেষটায় অবশ্য প্রত্যক্ষ (কিংবা *অপ্রত্যক্ষ*) প্রমাণটাকেই স্বীকার না-ক'রে উপায় থাকেনি—আমার সহযাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে কাছে যিনি ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার দূরত্ব ছিলো অন্তত দশ ফ্যাদম।

স্নায়ুর এই বেশামাল অবস্থার জন্যে নিজেকেই তিরস্কার করতে-করতে আমি আবার রেলিঙ ধ'রে নদীর দৃশ্যের দিকে তাকিয়েছি, আর নিশ্চয়ই এই নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনাটা আমার মনেই থাকতো না যদি-না এর পরে যে-সব অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলির আবর্তে গিয়ে আমি পড়েছিলুম সেগুলো এই অলৌকিক ঘটনাকে ফের আমার স্মৃতির মধ্যে জাগিয়ে দিতো।

তখন অবশ্য এ-ব্যাপার নিয়ে আমি আর-কিছুই ভাবিনি, মনের ভুল ব'লেই সব

মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি, আর তাকিয়ে থেকেছি বদলে-যেতে-থাকা দানিউবের জলের দিকে—জলের ওপর রোদ্দুর প'ড়ে কেমন-একটা মরীচিকার মতো মায়া রচনা ক'রে বসেছিলো তখন।

পরের দিনে আর-কোনোকিছুই ঘটেনি, আর ৯ই মে আমরা আবার যথাসময়ে নোঙর তুলে বেরিয়ে পড়েছি।

ন-টা নাগাদ, ঠিক যখন আমি ক্যাবিনে ঢুকতে যাবো, দেখি সেই সোনালিচুল আলেমান যাত্রীটি ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে আসছে। প্রায় ধাক্কাই খেতে যাচ্ছিলুম তার সঙ্গে এমন আচমকা সে বেরিয়েছিলো, আর তারপরে সে যে-রকম অদ্ভুত চোখে আমাকে নিরীক্ষণ করেছিলো তাইতেই আমি কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলুম। এই-প্রথম দৈব আমাদের মুখোমুখি এনে ফেলেছে, অথচ তবু তার দৃষ্টিতে কেমন-একটা উদ্ধত তাচ্ছিল্যের ভাব—আর সেইসঙ্গে দৃষ্টির মধ্যে মেশানো ছিলো—আমি হলফ ক'রে বলতে পারি—অদ্ভুত-একটা বিজাতীয় ঘৃণার ভাব।

আমার বিরুদ্ধে কী রাগ সে পুষে রেখেছিলো? আমি ফরাশি ব'লেই কি তার মধ্যে অমন তাচ্ছিল্য আর ঘৃণার ভাব? কেননা তক্ষুনি আমার মনে প'ড়ে গিয়েছিলো যে সে তো ক্যাবিনে আমার তোরঙ্গটার ওপরই আমরা নামধাম প'ড়ে ফেলতে পেরেছে। হয়তো সেইজন্যেই সে অমন অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। বেশ, সে যদি আমার নাম জেনেই থাকে, তো কী? আমি গায়ে প'ড়ে তার নামধাম জানতে যাবো না। তার সম্বন্ধে কোনো কৌতূহলই নেই আমার। তার সঙ্গে আলাপ করারও গরজ নেই কোনো।

দশ তারিখে লোকটার সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে ডেকের ওপর, আর প্রতিবারই সে যেমন ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে থেকেছে যেটা আমার মনে হয়েছে ভারি বিরক্তিকর। আমি এমনিতে গায়ে প'ড়ে কখনও কারু সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে চাই না, সেটা আমার ধাতেই নেই, কিন্তু তাই ব'লে এমন বিচ্ছিরিভাবে *ঠোঁট* বেঁকিয়ে কেউ আমার দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকবে, সেটা বিনাবাক্যব্যয়ে সহ্য ক'রে চলাও ছিলো আমার পক্ষে মুশকিল। তার যদি আমাকে কিছু বলারই থেকে থাকে, তবে এই উদ্ধত লোকটা সে-কথা সরাসরি মুখ ফুটে ব'লে ফেলছে না কেন? এ-রকম পরিস্থিতিতে কেউ তো শুধু চোখের ভাষাতেই কথা বলে না, আর সে যদি ফরাশি না-ই জানে আমি তো তার নিজের ভাষাতেই তার কথার জবাব দিয়ে তার সব কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারতুম। তবে দৈবাৎ যদি এই টিউটন মাতব্বরটির সঙ্গে আমাকে কখনও কথাই বলতে হয়, তবে তার সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নেয়া উচিত আমার। কাজেই আমি *ডরোথির* কাপ্তেনের কাছে গিয়ে জিগেস করেছি তিনি এর সম্বন্ধে কিছু জানেন কি না।

'এঁকে এই প্রথমবারই চোখে দেখছি আমি,' কাপ্তেন আমায় জানিয়েছেন।

'লোকটা জার্মান,' আমি তাঁকে তাতাবার চেষ্টা করেছি।

'তাতে তো কোনো সন্দেহই নেই, মঁসিয় ভিদাল, তবে আমার মনে হয় এ হচ্ছে

ডবোল-জার্মান, সাধারণ জার্মানের দুনো, নিশ্চয়ই প্রুশিয়ান।'

'তা, দুনো না-হ'য়ে নিছক-জার্মান হ'লেই হ'তো!' আমার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে এসেছে। জানি, কথাটা বলা ঠিক হয়নি, কোনো ভদ্রলোকের মুখে এমনতর কথা মানায় না, এ মোটেই সুস্থ মার্জিত রুচির পরিচয় হয় না, তবে কাপ্তেন এ-কথা শুনে একটু খুশিই হয়েছেন, কেননা জন্মসূত্রে তিনি মাগিয়ার, হাঙ্গেরীয়।

পরদিন, নদীর অগুনতি বাঁক ঘুরে, *ডরোথি* শেষকালে গিয়ে পৌঁছেছে ভুকোভার-এ। সেই শহরটা ছেড়ে আসবার পর সেই জার্মানটিকে জাহাজে আর দেখতে পাইনি আমি, তার মানে সে নিশ্চয়ই ভুকোভার-এই নেমে গিয়েছে। যাক, আমি ভেবেছি, লোকটার হাত থেকে অবশেষে রেহাই পাওয়া গেলো, না-হ'লে আমাকে হয়তো তার কাছে ঐ অস্বাভাবিক তাকিয়ে-থাকার জন্যে একটা কৈফিয়ৎ চাইতে হ'তো।

তবে, তখনও, আমার মন অন্য-কতগুলো চিন্তায় ভারাক্রান্ত ছিলো। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তো রাগৎস-এ গিয়ে পৌঁছুবো। এক বছরেরও ওপর হ'লো মার্কের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়েছে—এবার আবার তার সঙ্গে দেখা হবে, তার মারফৎ তার হবু-শ্বশুরবাড়ির সঙ্গেও আলাপ হবে। আমি সেই চিন্তাতেই মশগুল হ'য়ে ছিলুম।

বেলা পাঁচটা নাগাদ, বামতীরের গাছপালার আড়াল দিয়ে, কতগুলো চার্চের দেখা পাওয়া গেলো, কতগুলোর মাথায় উঁচু-উঁচু গম্বুজ, কতগুলোর মিনার আবার যেন আকাশের পটে এঁকে রেখে গেছে কেউ। সেই মস্ত শহরটার প্রথম যা চোখে পড়ে জাহাজ থেকে, তা এই চার্চগুলোই, নদীর শেষ মোহানাটায় শহরটা পুরোপুরি উন্মোচিত হয়েছে চোখের সামনে, কতগুলো উঁচু পাহাড়ের তলায় ছবির মতো সাজিয়ে বসানো—একটু উঁচু পাহাড়ের ওপর দেখা গেলো পুরোনো-একটা দুর্গ, হাঙ্গেরির পুরোনো শহরগুলোর যেন কুললক্ষণই এ-সব কেল্লা।

হাওয়ার চালে বজরাটা যখন জেটিতে এসে ভিড়বে, ঠিক তখনই আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের দ্বিতীয় রহস্যময় ঘটনাটি ঘটেছে। এটা ঠিক বলবার মতো কোনো তথ্য কিনা, তা আমার জানা নেই।... পাঠককে নিজেই তার বিচার ক'রে নিতে হবে।

আমি দাঁড়িয়েছিলুম গ্যাঙওয়েতে, তীরের দিকে তাকিয়ে; বেশির ভাগ যাত্রীই তাড়াহুড়ো ক'রে তখন নামবার চেষ্টা করছে। তীরে, যেখানে গ্যাঙওয়ে গিয়ে লেগেছে, সেখানে কয়েকটা ছোটো-ছোটো দলে ভাগ হ'য়ে কিছু লোক দাঁড়িয়েছিলো—মার্ক যে এদেরই মধ্যে কোথাও আছে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিলো না।

তারপর, যখন আমি মুখ তুলে তাকিয়ে তাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করছি, তখন শুনতে পেলুম, খুব কাছে থেকেই কে যেন আলেমান ভাষায় কাটা-কাটা ভাবে অপ্রত্যাশিত কথাগুলো বলছে: 'মার্ক ভিদাল যদি মাইরা রডারিখকে বিয়ে করে, তবে সর্বনাশ হোক মাইরার, সর্বনাশ হোক মার্কের!'

শোনবামাত্র, আমি তড়াক ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়েছি... কেউ নেই আমার আশপাশে, আমি একই আছি! অথচ এইমাত্র কেউ আমার সঙ্গে কথা বলেছে! আমি স্পষ্ট শুনতে

পেয়েছি কথাগুলো, আর আমি এ-কথাও জোর দিয়ে বলতে পারি এই অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর আদৌ আমার অপরিচিত ছিলো না !...

অথচ কেউই নেই আশপাশে, আবারও বলছি, কেউই ছিলো না ধারে-কাছে ! কথাগুলো শুনেছি ব'লে যে মনে হয়েছে তা নিশ্চয়ই আমার বিভ্রম, নাস্তানাবুদ ঘাবড়ে-যাওয়া কল্পনার ফসল, কোনো অলীক ও বেঘোর মায়া... আমার স্নায়ুগুলো নিশ্চয়ই কোনোকারণে একবারে ছিঁড়ে যেতে বসেছে, না-হ'লে দু-দিনের মধ্যেই দু-দুবার এমন ভুল !... হতভম্ব, ভ্যাবাচাকা, আমি আবারও চারপাশে তাকিয়ে দেখেছি !... তারপর কাঁধ-ঝাঁকিয়ে, অসহায়ভাবে, নিজেকে মনের জোর আনতে ব'লে, তীরে নেমে-যাওয়া ছাড়া আমার আর কীই-বা করার ছিলো।

আর আমি তা-ই করেছি, তীরে নেমে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ ক'রে বেরিয়ে এসে চেষ্টা করেছি মার্ককে কোথাও চোখে পড়ে কিনা, তাকিয়ে দেখতে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যা ভেবেছি, মার্ক আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। দেখেই, দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরেছি। তারপর মার্ক আমার হাত চেপে ধ'রে রুদ্ধ স্বরে ব'লে উঠেছে : 'অঁরি ... অঁরি !' শুধু-যে তার গলাতেই আবেগ ছিলো তা নয়, তার চোখে দুটোও জলে ভ'রে উঠেছিলো—ওদিকে সারা চোখমুখে আবার সেইসঙ্গেই ফুটে উঠেছে আনন্দের উদ্ভাস।

'আয়, মার্ক,' আমি বলেছি, 'ফের হাতে হাত দেয়া যাক।' তারপর অনেক দিন পর দুই ভাইয়ের মধ্যে দেখা হবার প্রথম আবেগপ্লুত মুহূর্ত কেটে যাবার পর আমি তাকে বাস্তব অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছি, বলেছি : 'চল। এখান থেকে যাওয়া যাক। তুই আমাকে তোর সঙ্গে নিয়ে যেতে এসেছিস তো !'

'হ্যাঁ। তোকে আমার হোটেলেই নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছি। হোটেলটা কাছেই, দশ মিনিটের পথও নয়। কিন্তু আয়, তার আগে তোর সঙ্গে আমার হবু শ্যালকের আলাপটা করিয়ে দিই।'

ততক্ষণ অব্দি আমি খেয়াল করিনি যে মার্কের পেছনেই সামরিক ধরাচুড়ো পরা পদাতিক বাহিনীর একজন কাপ্তেন দাঁড়িয়ে আছে। বয়েস বেশি হ'লে হবে আঠাশ বছর, ঢ্যাঙা, চেস্টনাট রঙের দাঁড়িগোঁফ, কী-রকম একটা মাগিয়ার আভিজাত্য ফুটে বেরুচ্ছে চেহারা থেকে, যেন আজন্ম লোককে হুকুম করতেই সে অভ্যস্ত। অথচ তার চোখে অভ্যর্থনার ছাপ, মুখে মৃদু হাসি।

মার্ক পরিচয় করিয়ে দিয়েছে : 'কাপ্তেন হারালান রডারিখ !'

কাপ্তেনের প্রসারিত হাত দু-হাতে তুলে নিয়ে আমি সম্ভাষণ জানিয়েছি।

আর সে বলেছে : 'মঁসিয় ভিদাল, আপনার সঙ্গে দেখা হ'য়ে আমরা সবাই যে কতটা খুশি হয়েছি তা ব'লে বোঝাতে পারবো না। আপনি ভাবতেও পারবেন না আমাদের গোটা পরিবারটা কেমন অধীরভাবে আপনার আগমনের প্রতীক্ষা করছিলো !'

'মাদমোয়াজেল মাইরাও খুশি হয়েছেন তো ?' আমি একটু ফোড়ন কেটেছি।

মার্ক আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেছে : 'নিশ্চয়ই ! আর অঁরি, এটা মোটেই মাইরার দোষ নয় যে তোরা ভিয়েনা ছাড়বার পর থেকে *ডরোথি* ঘণ্টায় দশ লিগ পথও যেতে পারেনি !'

একটুক্ষণের মধ্যেই আমি টের পেয়েছি যে কাপ্তেন হারালান চমৎকার ফরাশি বলে, সাবলীলভাবে, তার বাড়ির সকলেই স্বচ্ছন্দে ফরাশি বলে, কারণ তারা ফ্রানসে বেড়িয়ে গিয়েছে আগে। তাছাড়া আমার আর মার্কের আলেমান ভাষায় দখলও যথেষ্ট, আর হাঙ্গেরীয় ভাষারও দুটো-একটা কথা আমি জানি। ফলে আমাদের কথাবার্তায় এই তিনটে ভাষাই অনায়াসে মিলে-মিশে যাচ্ছিলো।

একটা কোচবাক্সে ক'রে মালপত্তর সমেত আমরা হোটেলে এসে পৌঁছেছি।

পরদিন প্রথমবার আমি রডারিখ পরিবারকে সম্ভাষণ জানাতে যাবো, এই ব্যবস্থা ক'রে মার্কের সঙ্গে হোটেলের মস্ত আরামপ্রদ ঘরটায় তারপর কয়েকঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি আমি, মার্ক থাকে এই হোটেলেরই পাশের ঘরে, রাগ্‌ৎস-এ পদার্পণ করার পর থেকেই এইঘরেই সে থাকে।

'তারপর মার্ক,' আমি বলেছি, 'তাহ'লে আবার দুই ভাইয়ে দেখা হ'লো—দুজনেরই তো শরীরস্বাস্থ্য দিব্বি ভালোই আছে।'

'হ্যাঁ, অঁরি,' আমার ছোটোভাইটি বলেছে, 'ক্যালেণ্ডারের হিশেবে একবছরের একটু বেশি, অথচ মনে হচ্ছে কতদিন যেন দুজনের মধ্যে দেখা হয়নি। মাইরা না-থাকলে এই সময়টাকেই আরো দীর্ঘ ও অসহ্য ব'লে বোধ হ'তো। শেষের কয়েক মাস মাইরার সঙ্গে আলাপ হবার পর যেন চক্ষের পলকে কেটে গিয়েছে। তা, অবশেষে, এখানে তোর আবির্ভাব হ'লো। এটা ভাবিসনি যে এই ক-দিনের অনুপস্থিতিতে আমি বেমালুম ভুলে গিয়েছি তুই আমার বড়োভাই—তোর দাদাগিরির কথা আমি মোটেই ভুলিনি।'

'দাদাগিরি বলছিস কেন, মার্ক ? আমরা তো ভালো বন্ধুও।'

'তা তুই ভালো ক'রেই জানিস, অঁরি। সেইজন্যেই তোর অনুপস্থিতিতে কিছুতেই আমাদের বিয়েটা হ'তে পারতো না। আর, তাছাড়া, বিয়ের আগে আমি তোর কাছ থেকে একটা অনুমতিও তো চাচ্ছি।'

'অনুমতি ?'

'বাঃ রে, বাবা বেঁচে থাকলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি চাইতুম না বুঝি আমি ? তবে বাবাও যেমন বিয়ের প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করতেন না, তেমনি তুইও কোনো বাগড়া

দিবি না—এটা আমি জানি। বিশেষত একবার মাইরার সঙ্গে দেখা হ'লেই তুই বুঝতে পারবি...'

'তোর চিঠি থেকেই মনে হয় তাকে আমি জেনে গিয়েছি। তাছাড়া এও আমি জানি তুই কত সুখী হয়েছিস—'

'তুই ভাবতেও পারবি না আমি কী-রকম সুখী হয়েছি। তবে তোর সঙ্গে তো ওর দেখা হবে, তুই নিজেই আন্দাজ ক'রে নিতে পারবি ওকে কেমন পছন্দ করা যায়, তুইও ওকে স্নেহ করবি—এ আমি ঠিক জানি। সত্যিকার এক ছোটোবোন পাবি তুই।'

'তা, ছোটোবোনটিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাই। তোর পছন্দে যে কোনো খুঁত থাকবে না, এ আমি জানি, মার্ক। কিন্তু আজই কেন আমরা ডাক্তার রডারিখের বাড়ি যাচ্ছি না!'

'না-না, কাল যাবো... আমরা ভাবতেও পারিনি যে তোর বজরা এত তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছুবে, ভেবেছি তুই আজ সন্ধের পর এসে পৌঁছুবি। নেহাৎ বিচক্ষণ আর দূরদর্শী ব'লেই আমি আর হারালান সকালবেলায় জাহাজঘাটায় গিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম সাবধানের মার নেই—*ডরোথি* হয়তো আগেই চ'লে আসতে পারে। সেইজন্যেই তুই ঘাটে পা দেবামাত্র তোর সঙ্গে আমাদের দেখা হ'লো। ইশ! মাইরা যদি জানতো!... তোকে অভ্যর্থনা করতে যেতে পারেনি ব'লে বেচারা নিশ্চয়ই ভারি কষ্ট পাবে।... হ্যাঁ, যা বলছিলুম, কালকের আগে তুই আসতে পারবি না ভেবে, মাদাম রডারিখ তাঁর মেয়েকে নিয়ে আজ এক জায়গায় নিমন্ত্রণে গেছেন। কাল তাঁরা তোর কাছে এইজন্যে ক্ষমা চাইবেন।'

'বেশ। তা-ই হবে তাহ'লে। এখন বরং শোনা যাক এই দীর্ঘ একবছুরে তুই কী করেছিস।'

মার্ক তারপর কাহন ফেঁদেছে, পারী ছাড়বার পর থেকে সে কী-কী করেছে, কোথায়-কোথায় গেছে, কোন-কোন শহরে তার নামডাক হয়েছে, ভিয়েনা আর স্প্রেমবার্গ-এ কেমন ছিলো সে, বিশেষত কীভাবে ও-সব শহরে শিল্পের আর শিল্পীদের জগৎ কেমন সাগ্রহে দুয়ার খুলে তাকে বরণ ক'রে নিয়েছিলো। কিন্তু এ-সব গল্প আমায় নতুন-কোনো তথ্যই জোগায়নি। মার্ক ভিদালের নাম স্বাক্ষর করা যে-কোনো পোর্ট্রেটই এখন ধনী অস্ট্রিয়ান আর ধনী মাগিয়ারদের মধ্যে যে চড়া দামে বিকোয়, তা তো আমি আগেই জেনে গিয়েছি।

'এত লোকের চাহিদা আমি আদপেই মেটাতে পারিনি, অঁরি। সবখান থেকে অনবরত তাগিদ আসছিলো, বায়না আসছিলো। স্প্রেমবার্গের বুর্জোয়াদের মধ্যে মুখে-মুখেই ছড়িয়ে গিয়েছিলো যে "প্রকৃতির চাইতেও ভালো ক'রে কাউকে খুটিয়ে তুলতে পারে মার্ক ভিদাল।" কাজেই,' মার্ক রসিকতা ক'রে বলেছে, 'শিগগিরিই একদিন হয়তো ভিয়েনার রাজসভা থেকে তলব আসবে, রাজসভার সবাইকার পোর্ট্রেট এঁকে

দিতে হবে।'

'সাবধান কিন্তু, মার্ক, সাবধান। তোকে যদি এখন রাগ্‌ৎস ছেড়ে ভিয়েনার রাজসভায় গিয়ে পারিষদদের ছবি আঁকতে ব'সে যেতে হয়, তবে সেটা তেমন সুবিধের ব্যাপার হবে না!'

'জাগতের সবচেয়ে জাঁহাবাজ এত্তেলা পেলেও আমি তাকে কোনো পাত্তা দেবো না, অঁরি। অন্তত এই মুহূর্তে কারু কোনো পোর্ট্রেট আঁকার প্রশ্নই ওঠে না। কিংবা অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলতে পারি, আমার শেষ পোর্ট্রেটটা আমি এঁকেই ফেলেছি!'

'মাইরার?'

'মাইরার—আর ওতে কোনো সন্দেহই নেই যে আমার জীবনের সবচেয়ে ওঁচা কাজ হয়েছে ওটাই।'

'কে জানে?' আমি ব'লে উঠেছি, 'কোনো শিল্পী যখন কোনো পোর্ট্রেটের চাইতে তার মডেল নিয়েই বেশি মাথা ঘামায়—'

'তা, অঁরি, সেটা তুই নিজের চোখেই দেখতে পাবি।... আবারও তোকে বলছি, "প্রকৃতির নিজের হাতের কাজের চাইতেও ভালো—সত্যি যা হওয়া উচিত!"... লোকে তো বলে, সেটাই নাকি আমার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা!... তবে, এটা ঠিক যে মাইরা যখন ছবি আঁকবার জন্যে বসেছিলো, আমি ছবি আঁকবো কি, ওর ওপর থেকে চোখই সরাতে পারিনি। ওর কাছে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক ঠাট্টা ছিলো না। সে তো আর বাগ্‌দত্তকে নয়, শিল্পীকেই ঐ দুটি ঘণ্টা দিতে চেয়েছিলো,... আর আমার তুলি পটের ওপর যেন ছিটকে চলেছিলো... আর কেমন দুর্ধর্ষ আবেগ ছিলো তুলির... মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিলো গালাতেয়ার মূর্তির মতো এই ছবিটাও বুঝি জ্যান্ত হ'য়ে উঠবে।'

'ধীরে, পিগমালিয়ন, ধীরে! বরং খুলে বল তো রডারিখ পরিবারের সঙ্গে তোর আলাপ হ'লো কী ক'রে?'

'সে-তো কপালে লেখা ছিলো।'

'তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু...'

'আমি রাগ্‌ৎস এসে পৌঁছুবামাত্র এখানকার অভিজাত মহলের ড্রয়িংরুমের দরজা আমার জন্যে খুলে গিয়েছিলো। আর আমারও তাতে কোনো আপত্তি ছিলো, না—বিদেশ-বিভুঁয়ে একটা অচেনা শহরে অন্তত দীর্ঘ সন্ধ্যাবেলাগুলো কাটাবার একটা উপায় হ'লো তো! এইরকমই একটা বাড়িতে সন্ধেবেলার একটা পার্টিতে কাপ্তেন হারালানের সঙ্গে আবার নতুন ক'রে আলাপ জমাবার সুযোগ হ'য়ে গেলো।'

'আবার? মানে?'

'হ্যাঁ, অঁরি, *আবার*। কারণ বুডাপেশ্‌ট-এ এর আগে তার সঙ্গে আমার কয়েকবার দেখা হয়েছিলো। সামরিক বাহিনীতে তার দারুণ সুনাম, সকলেরই ধারণা ভবিষ্যতে একজন কেউকেটা হবে, অথচ দারুণ ভদ্র, আদৌ দেমাক-টেমাক নেই। তা, তারপর থেকেই রোজই সন্ধেবেলায় তার সঙ্গে দেখা, আড্ডা, শেষটায় বন্ধুতাই হ'য়ে গেলো।

একদিন এসে বললে বাড়ির লোকদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে চায়, আর আমিও তক্ষুনি একপায়ে খাড়া, কারণ তারই আগে একটা পার্টিতে মাইরার সঙ্গে আমার পরিচয় হ'য়ে গিয়েছিলো, আর...'

'আর,' আমি হেসে বলেছি, 'বোনটিও যেহেতু ভাইয়ের চাইতে কম মনোহারিণী নন, অতএব তুই রডারিখদের বাড়ি যাওয়া শুরু ক'রে দিলি।'

'হ্যাঁ, আঁরি, আর গত তিনমাসে একটা সন্ধেও বাদ যায়নি, যেদিন আমি ওদের বাড়ি যাইনি। কিন্তু আমি মাইরা সম্বন্ধে যা-ই বলি না কেন, তুই নিশ্চয়ই ভাববি আমি বাড়িয়ে বলছি...'

'না, তা আমি বলছি না মোটেই। আমি ঠিক জানি তোর ভাবী স্ত্রী সম্বন্ধে তুই নিশ্চয়ই কিছু বাড়িয়ে বলছিস না। তাছাড়া এটা তো ঠিক যে তুই হাঙ্গেরির একটি বিশেষ সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে করতে যাচ্ছিস—'

'হ্যাঁ, আঁরি,' মার্ক বলেছে, 'চিকিৎসক হিশেবে ডাক্তার রডারিখকে সারা দেশের লোক শ্রদ্ধাভক্তি করে, তাছাড়া মাইরার মাতৃদেবীও সম্মানিতা মহিলা, সমাজসেবার জন্যে তাঁর দারুণ নাম—'

'এবং এই দম্পতি যেন আসলে অপার্থিবই। সারা ফ্রান্স চুঁড়ে বেড়ালেও তুই হয়তো এঁদের মতো শ্বশুর-শাশুড়ি খুঁজে পেতিস না। তাই না, মার্ক?'

'হ্যাঁ, তুই ঠাট্টাই ক'রে চল। যত-ইচ্ছে ফোঁড়ন কাট। তবে এটা মনে রাখিস আমরা এখন আর ফ্রান্সে ব'সে নেই, বরং হাঙ্গেরিতে রয়েছি—মাগিয়ারদের এই দেশে পুরোনো দিনের ঐতিহ্য এখনও ধ'রে রেখেছে লোকে, অভিজাত্যকে লোকে এখানে দাম দেয়—'

'তারপর, বলুন, অভিজাতমশাই, কেননা ক-দিন পর তুইও তো আভিজাত্যের বড়াইই করবি।'

'অভিজাত্য থাকার মধ্যে আবার মন্দ কী আছে?'

'তা জানি না, তবে তোর এই প্রণয়োপাখ্যান খুব-একটা অসাধারণ-কিছু নয়—বরং এ-রকম গল্প হাজারগণ্ডা ব'লে দেয়া যায়। কাপ্তেন হারালানের সৌজন্যে তার পরিবারের সঙ্গে তোর আলাপ হ'লো, তাঁরা ভদ্রতা ক'রে তোকে সমাদর করেছেন, আর সেটাও অবাক কাণ্ড কিছু না—কারণ শিল্পী হিশেবে এরই মধ্যে তোর বেশ নামডাক হয়েছে। আর তারপর তুই মাদমোয়াজেল মাইরার রূপ দেখে একেবারে ভির্মি খেয়ে পড়েছিস—'

'বল, তোর যা-ইচ্ছে।'

'সেইসঙ্গে মাদমোয়াজেল মাইরাও মার্ক ভিদালকে দেখে একেবারে মোহিত—'

'আমি কিন্তু তা বলিনি, আঁরি!'

'কিন্তু আমি বলছি—অন্তত সত্যের খাতিরে। আর ডাক্তার এবং মাদাম রডারিখ—তাঁরা যখন বুঝতে পারলেন কী ঘটতে চলেছে, তাঁরা কোনো আপত্তি করেননি। ফলে

একদিন শুভক্ষণে মার্ক ভিদাল তাঁর হৃদয়টা কাপ্তেন হারালানের কাছে খুলে ধরলেন। এবং কাপ্তেন হারালানও ব্যাপারটাকে বিরূপভাবে নেননি। বরং তিনি তাঁর পিতামাতার কাছে গোপন কথাটি খুলে বললেন, তাঁরা তারপর বললেন তাঁদের বিদুষী ও রূপসী কন্যাটিকে। তারপর মার্ক ভিদাল একদিন প্রকাশ্যে বিবাহের প্রস্তাব করলেন, কন্যাপক্ষ সেটি সানন্দে লুফে নিলে এবং প্রণয়োপাখ্যানটি এ-রকম বহু উপাখ্যানের মতোই ঘটাপটা ক'রে শেষ হ'তে চলেছে—'

'তুই যাকে শেষ বলছিস, অঁরি,' মার্ক মাঝখানে প'ড়ে বলেছে, 'আমার কাছে সেটাই কিন্তু সত্যিকার শুভারম্ভ ব'লে মনে হচ্ছে।'

'তুই ঠিকই বলেছিস, মার্ক, আমার গোড়া থেকেই শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত ছিলো...তা বিয়ের দিনটা ধার্য হয়েছে কবে?'

'তুই এলে পর দিন ঠিক হবে, এইজন্যে অ্যাদ্দিন আমরা অপেক্ষা করছিলুম।'

'বেশ, যখন তোদের ইচ্ছে, তখনই হ'তে পারে...ছ-হপ্তা...ছ-মাস...কিংবা ছ-বছর...'

'শুনুন, এনজিনিয়ার অঁরি,' মার্ক উত্তর দিয়েছে, 'আমি জানি যে একজন এনজিনিয়ারের কাছে সময় কতটা মূল্যবান, এবং আপনি যদি ততদিন এই রাগ্‌ৎস নগরে কাটাতে চান তাহ'লে সারা সৌরজগৎই তো বানচাল হ'য়ে যাবে—'

'অর্থাৎ আমিই যাবতীয় বান, বন্যা, ভূমিকম্প এবং ঐজাতীয় সমস্ত দুর্বিপাকের জন্য দায়ী হবো!'

'হ্যাঁ, তা-ই। আর সেইজন্যেই আমরা অনুষ্ঠানটিকে ততদিন পেছিয়ে দিতে পারবো না।'

'বেশ, তাহ'লে পরশুই বিয়েটা হ'য়ে যাক, কিংবা চাইলে আজ সন্ধেতেই বিয়ে হ'তে আটকাচ্ছে কীসে?... তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস, মার্ক, যা দরকার আমি তা-ই বলবো। তুমি যতটা ভাবছিস, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়মমতো চালাতে আমার অবশ্য ততটা কারদানি লাগে না। তাই মাসকাবারের আগেই আমি মঁসিয় ও মাদাম মার্ক ভিদালের বাড়িতে সান্ধ্যনেমন্তন্ন চাই।'

'সে-তো চমৎকার হবে!'

'কিন্তু, মার্ক, ঠাট্টা থাক। তোর সত্যিকার প্ল্যানটা কী বল তো? বিয়ের পরই কি তুই রাগ্‌ৎস ছেড়ে চ'লে যেতে চাচ্ছিস?'

'সেটা এখনও ঠিক হয়নি,' মার্ক আমায় জানিয়েছে, 'সে নিয়ে ভাববার জন্যে পরে ঢের সময় পাওয়া যাবে। ভবিষ্যৎ নয়, আমি এখন বর্তমান নিয়েই মশগুল। ভবিষ্যৎ বলতে শুধু এই বুঝি যে শিগগিরই আমার বিয়ে হ'তে চলেছে। তারপর কী হবে, সে আর আমি এখন ভাবতে পারছি না।'

'অতীত আমাদের আঁকড়ে ধ'রে নেই,' আমি উদ্ধৃতি দিয়েছি, 'ভবিষ্যৎও এখনও এসে হাজির হয়নি। বর্তমানই সবকিছু।'

এইভাবেই খাবার সময় আসা অব্দি আমাদের কথাবার্তা চলেছে। পরে, খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'লে পরে, আমরা দুজনে দুটো চুরুট জ্বালিয়ে দানিউবের বাম তীর ধ'রে হাঁটতে বেরিয়ে পড়েছি। বলাই বাহুল্য, তখনও আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু তেমন-একটা পালটায়নি, তখনও মাইরা রডারিখকে ঘিরেই আমাদের কথা চলেছে। আর এই আলোচনা চলতে-চলতেই কী-একটা কথা থেকে হঠাৎ আমার মনে প'ড়ে গেছে : আমি পারী ছাড়বার আগে পুলিশ-লিউটেনান্ট আমায় কী বলেছিলেন। মার্ক এমন-কিছু ঘুণাক্ষরেও বলেনি যাতে মনে হ'তে পারে তাদের রোম্যান্সের মধ্যে কখনও-কিছু গণ্ডগোলের বিষয় ছিলো। অথচ এই প্রেমে মার্কের যদি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না-থেকে থাকে, সে নিশ্চয়ই অতীতে কখনও ছিলো, কেননা অটো স্টোরিৎস-এর ছেলে একদিন তার পাণিপ্রার্থনা করেছিলো। এ-রকম কোনো সম্ভ্রান্ত এবং বিদুষী ও রূপসী তরুণীর যে অনেক গুণমুগ্ধ ভক্ত থাকবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

হঠাৎ আমার মনে প'ড়ে গেছে *ডরোথি* থেকে নামবার সময় আচমকা কী কথা আমি শুনতে পেয়েছিলুম ব'লে আমার মনে হয়েছিলো। তখনও আমার মনে হচ্ছিলো পুরোটাই নিশ্চয়ই আমার বিভ্রম ছিলো। সত্যি-যদি এই হুঁশিয়ারি কেউ উচ্চারণ ক'রে থাকে, তবে তা থেকে কী সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি? কে-যে এই কথাগুলো বলতে পারে তা কিছুই আমার মাথায় ঢোকেনি। কার স্বার্থ, এই হুমকি দিয়ে? বুডাপেশ্‌টে সেই-যে জার্মানটি এসে বজরায় উঠেছিলো এ হয়তো তারই কাজ—কিন্তু তাও তো নয়-সে তো ভুকোভার-এই বজরা ছেড়ে নেমে গিয়েছিলো। তাহ'লে এ হয়তো অচেনা কারু মজা করবারই নমুনা—যদিও এমনতর মজার ধারণা আমার অন্তত ককখনো হ'তো না। ঘটনাটার কথা আমি অবশ্য মার্ককে বলিনি। তবে কোনো ছুতোয় ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর কথা পাড়বো ব'লেই আমি ঠিক ক'রে রেখেছিলুম।

নামটা করতে-না-করতেই মার্ক তার স্বভাবসিদ্ধ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়েছে। তারপর অবহেলার সুরে বলেছে, 'হ্যাঁ, হারালান একবার লোকটার কথা বলেছিলো বটে। সে-ই সম্ভবত মায়াসিদ্ধ অটো স্টোরিৎস-এর একমাত্র ছেলে—অন্তত জার্মানিতে অটো স্টোরিৎসের পরিচয় ইন্দ্রজালবিদ্যায় ওস্তাদ হিশেবেই। অথচ এটা ভারি অন্যায়—অটো স্টোরিৎস বোধহয় বড়ো বৈজ্ঞানিকও ছিলেন—রসায়নে আর পদার্থবিদ্যায় তাঁর নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। হ্যাঁ, তাঁর ছেলে যদি কোনো প্রস্তাব ক'রেও থাকে, সে-প্রস্তাব কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলো।'

'তোর প্রস্তাব গৃহীত হবার অনেক আগেই নিশ্চয়ই?'

'তার অন্তত চার-পাঁচ মাস আগে।'

'তাহ'লে এই দুয়ের মধ্যে কোনো সম্বন্ধই নেই বলছিস?'

'কিছুমাত্র না।'

'মাদমোয়াজেল মাইরা কি জানে যে ভিল্মহেল্ম স্টোরিৎস এককালে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো?'

'বোধহয় না।'

'আর তারপর আর-কিছুই হয়নি?'

'কিস্‌সু না। লোকটা নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছিলো যে তার কোনো সম্ভাবনাই নেই। ফলে ব্যাপারটা সেখানেই চুকে-বুকে গিয়েছে।'

'কিন্তু তার কোনো সম্ভাবনা ছিলো না কেন? সে কি তার বদনামের জন্যে?'

'না। ভিলহেল্‌ম স্টোরিৎস-এর সে-রকম কোনো বদনামই নেই। লোকটা ভারি রহস্যময়। কী করে, না-করে, সব কুহেলিঢাকা। সবসময়েই সে লোকচক্ষুর অগোচরে থাকে।'

'এখানে থাকে? রাগ্‌ৎস-এ?'

'হ্যাঁ, বুলভার তেকেলির এককোণায় একটা বিচ্ছিন্ন বাড়িতে থাকে ভিলহেল্‌ম স্টোরিৎস। কেউই এমনিতে ও-তল্লাটটা মাড়ায় না। লোকে তাকে একটু ভয়ই পায় —লোকটা নাকি কেমনতর; বিদঘুটে, উদ্ভট সব বাতিক আছে নাকি তার; এছাড়া তার আর-কোনো খ্যাতি-কুখ্যাতি কিছুই নেই। কিন্তু সে তো আগাপাশতলা জার্মান—আর ডাক্তার রডারিখ যে তার প্রস্তাবটায় পাত্তাই দেবেন না, সেজন্যে *সে-যে জার্মান*, এই তথ্যটাই যথেষ্ট। কারণ মাগিয়াররা সাধারণত টিউটনদের খুব-একটা পছন্দ করে না।'

'তোর সঙ্গে তার কখনও দেখা হয়েছে?'

'হয়েছে দু-তিনবার, একবার আর্ট গ্যালারিতেও। সে আমাদের দেখতে পায়নি–কাপ্তেন হারালানই তার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।'

'সে কি এখন রাগ্‌ৎস-এ আছে নাকি?'

'সেটা তোকে সঠিক বলতে পারবো না। শুধু এটুকু জানি যে গত দু-তিন হপ্তায় কেউ তাকে একবারও এখানে দ্যাখেনি।'

'শহর ছেড়ে চ'লে গিয়ে থাকলেই ভালো।'

মার্ক তখন বলেছে: 'যাক, লোকটা যে-চুলোয় যেতে চায়, যাক! তবে যদি কখনও কোনো ফ্রাউ ভিলহেল্‌ম স্টোরিৎস দেখা দেন, তিনি যে মাইরা রডারিখ হবেন না, এটা ঠিক...'

'তা ঠিক, কেননা তখন তিনি হবেন,' আমি হেসে বলেছি, 'মাদাম মার্ক ভিদাল।'

জাহাজঘাটার পাশ দিয়েই, স্ট্র্যাণ্ড ধ'রে, আমরা হাঁটছিলুম। এই পদব্রজে ঘুরে বেড়ানোটা ইচ্ছে ক'রেই প্রলম্বিত করছিলুম আমি। কেননা বেশ-কিছুক্ষণ ধ'রেই আমার মনে হচ্ছিলো কেউ যেন সারাটা পথ আমাদের অনুসরণ ক'রে আসছে। শুধু অনুসরণই করছে না, এমনভাবে পেছনে লেগে আছে যেন আমাদের কথাবার্তা শুনতে চাচ্ছে আড়ি পেতে। আমি এ-সম্বন্ধে নিশ্চিত হ'তে চাচ্ছিলুম।

সেতুর ওপর এসে আমরা মিনিট কয়েকের জন্যে থেমেছিলুম। এই অবকাশে আমি পেছন ফিরে দেখতে চাচ্ছিলুম কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে কি না। কিছুটা দূরে মাঝারি উচ্চতার একটা লোককে দেখা গেলো বটে, কিন্তু তার চলাফেরার শ্লথমন্থর ভঙ্গিতে মনে হ'লো লোকটার নিশ্চয়ই অনেক বয়েস হয়েছে।

সে যা-ই হোক, ব্যাপারটা নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাইনি। আমি তখন মার্ককে আশ্বস্ত ক'রে বলেছি তার শেষ চিঠিতে মার্ক যে-সব দলিলপত্তর সঙ্গে আনতে বলেছিলো সব আমি নিয়ে এসেছি। বিয়ের জন্যে যে-সব দলিল জরুরি, সে-সম্বন্ধে তাকে কিছু ভাবতে হবে না—এই ব'লে তাকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছি আমি।

আমাদের কথাবার্তা ঘুরে-ফিরে মাইরার দিকেই চলেছে সারাক্ষণ—ঠিক যেমন ক'রে চুম্বককে টানে মেরুতারা। আমরা হোটেলের দিকে ফিরে এসেছি তারপর। হোটেলের কাছে এসে শেষবারের মতো একবার আমি পেছন ফিরে তাকিয়েছি। রাস্তাটা তখন ফাঁকা, জনশূন্য। যে এতক্ষণ আমাদের পিছু নিয়েছিলো—যদি পুরোটাই আমার বেঘোরবিভ্রম না-হ'য়ে থাকে—সে যেন মায়াবলে হাওয়ায় উবে গিয়েছে, কেননা আমাদের পেছনে কোনো জনমানুষ নেই।

সাড়ে-দশটার সময় মার্ক আর আমি হোটেলে যে যার ঘরে। আমি তক্ষুনি গিয়ে শুয়ে পড়েছি বিছানায়, তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়েও পড়েছি। কিন্তু হঠাৎ আঁৎকে উঠেছি ঘুম থেকে। কোনো স্বপ্ন? দুঃস্বপ্ন? কোনো আবেশ? কেননা ঘুমের ঘোরেও আবার আমি শুনতে পেলুম, যে-কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলুম *ডরোথিতে*! যে-কথাগুলো মার্ক আর মাইরাকে বিষমভাবে শাসিয়েছিলো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরের দিনই আমি সামাজিক সৌজন্যের খাতিরে রডারিখদের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছি।

ডাক্তার রডারিখের বিশাল বাড়ির চারপাশে মস্ত একটা বাগান থাকলে কী হবে, ভবনটি বস্তুত আধুনিক কারিগরিবিদ্যারই ফসল—আর সর্বত্রই সুরুচির চিহ্ন ছড়ানো। চমৎকার একটা স্ফটিক বসানো দরদালান—সারি-সারি দরজা বসানো, দরজাগুলোর ওপর প্রাচীন মাগিয়ার দারুশিল্পের নিদর্শন। এ-রকমই একটি দরজা নিয়ে যায় ডাক্তার রডারিখের পড়ার ঘরে, একটা যায় বৈঠকখানায়, আর আরো-একটা খাবারঘরে। টানা, লম্বা বারান্দাটার একপাশে একটা ইজেল, আমি মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে দেখেছি মাদমোয়াজেল মাইরার পোর্ট্রেট—না, মার্ক নেহাৎ তার নাম সইই ক'রে দেয়নি, সত্যি একটা চমৎকার পোর্ট্রেটও এঁকেছে।

ডাক্তার রডারিখের বয়েস হবে পঞ্চাশ, যদিও তাঁকে দেখে অত বয়েস হয়েছে ব'লে মনে হয় না; ঋজু, বলিষ্ঠ, দীর্ঘ শরীর; ঝাঁকড়াচুল শাদা হ'য়ে আসছে; উপচে-পড়া স্বাস্থ্যের আভা দেখে মনে হয় কখনও কোনো রোগ ভোগ করেননি। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবামাত্র তাঁর উষ্ণ করমর্দন থেকেই প্রতিভাত হয়েছে যে মানুষটা সত্যি সিধে-সহজ।

মাদাম রডারিখ, তাঁর বয়েস হয়তো পঁয়তাল্লিশ বছর, এখনও তাঁর যৌবনের সৌন্দর্য সারা শরীরে ধ'রে রেখেছেন; স্নিগ্ধ সৌজন্যের প্রতিমা, দেখে মনে হয়েছে বাড়িঘর ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি খুবই হৃষ্ট ও সুখী। আমার সঙ্গে পরিচয় হবামাত্র যেভাবে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করেছিলেন, তা আমাকে খুবই স্পর্শ করেছিলো। আমাকে আশ্বস্ত ক'রে বলেছিলেন, মার্ক ভিদালের ভাইও এ-বাড়িরই লোক, তবে একটা শর্ত আছে : অঁরি ভিদালকেও কিন্তু এ-বাড়িটাকে নিজের বাড়ি ব'লে মনে করতে হবে।

আর মাইরা ? তার সম্পর্কে আর কী বলবো ? সে মৃদু হেসে প্রায় দুই বাহু বাড়িয়ে দিয়েই সম্ভাষণ করতে এগিয়ে এসেছিলো। হ্যাঁ, সত্যি, এই তরুণীটি আমার ছোটোবোনের অভাব পূরণ ক'রে দেবে। না, মার্ক কিছুই বাড়িয়ে বলেনি। বাইরে, ক্যানভাসে যে-মেয়েটির প্রতিরূপের দিকে আমি মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়েছিলুম, এ তারই জীবন্ত প্রফুল্ল রূপ। তার সুগঠিত মাথাটিতে সোনালি চুলের ঢাল, মুখটি যেন সদ্যফোটা হাঙ্গেরীয় কারনেশন, ঘন নীল দুই চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, বুদ্ধির সঙ্গে কৌতুকও মেশানো, মুখের ডৌলটি ভারি সুন্দর, আধোখোলা রক্তিম ওষ্ঠাধরের মধ্য দিয়ে দেখা গেলো ফেনশুভ্র দন্তরুচি। সাধারণের চাইতে একটা লম্বাই, সাবলীল সচ্ছন্দ ভঙ্গি, সে যেন নিজেই কোনো উজ্জীবন্ত মায়া। মার্ক যদি চারপাশে এইজন্যে সমাদর পেয়ে থাকে যে সে তার পোর্ট্রেটের মধ্যে ভেতরের মানুষটিকে ঠিক ফুটিয়ে তুলতে পাবে, তবে বলতেই হয় মাইরার ছবিতে সে মেয়েটির অনেকটা অংশই ফুটিয়ে তুলতে পারেনি।

তার মায়ের মতো, মাইরা রডারিখও প'রে ছিলো মাগিয়ার পোশাক, গলাবন্ধ এক জামা, মণিবন্ধ অব্দি নেমে-আসা সূচিকাজ করা হাতা, ধাতুর বোতাম-আঁটা ঢোলা ঘাগরা, জরি-বসানো কোমরবন্ধ, আর নরম চামড়ায় তৈরি চপ্পল—যেন আলেমান ফ্যাশনের কোনো পোশাক পরবে না ব'লেই বিশেষ ক'রে এই দেশীয় সাজ—অথচ বাড়াবাড়ি বা দেখানেপনা নেই কোথাও।

কাপ্তেন হারালানও ছিলো সেখানে, কড়াইস্ত্রিকরা সামরিক উর্দিতে ফিটফাট, আর এখন একসঙ্গে দুজনকে দেখে দুই ভাইবোনের চেহারার আশ্চর্য সাদৃশ্যটাও চোখে পড়লো। সেও হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আমার দিকে, সেও তার বড়োভাইয়ের মতোই ব্যবহার করেছে আমার সঙ্গে, আর আমার তো মনে হচ্ছিলো তার সঙ্গে আমার যেন কতকালের ভাব, যদিও তার সঙ্গে আমার দেখাই হয়েছে মাত্র একদিন আগে।

তাহ'লে পুরো পরিবারটিকেই এখন আমি জানি।

'আপনাকে এ-বাড়িতে দেখে কী ভালোই যে লাগছে, মঁসিয় ভিদাল!' অভ্যর্থনা

জানাবার ভঙিতে হাত দুটি বাড়িয়ে দিয়ে আবারও-একবার আমায় বলেছে মাইরা রডারিখ। 'পথে বোধহয় বড্ড বেশি সময় লেগেছে আপনার—আমরা তো ভাবনায় প'ড়ে গিয়েছিলুম। বুডাপেশ্‌ট থেকে আপনার চিঠি আসার আগে অব্দি আমরা কেউই কোনো স্বস্তি পাইনি।'

'নিজেকে বড্ড দোষী *ঠেকছে*, মাদমোয়াজেল মাইরা,' আমি উত্তরে বলেছি, 'পথে এতটা সময় নিয়ে নেয়ার জন্য বড্ড অপরাধী লাগছে। ভিয়েনা থেকে ডাকের গাড়িতে ক'রে এলে আমি আরো আগেই রাগ্‌ৎস এসে পৌঁছুতে পারতুম। তবে হাঙ্গেরির কেউই কখনও আমায় ক্ষমা করতো না যদি দানিউবকে আমি অবহেলা করতুম।'

'ঠিক আছে, দানিউবের সুবাদেই আপনাকে না-হয় ক্ষমা করা গেলো, মঁসিয় ভিদাল,' মাদাম রডারিখ আমায় আশ্বস্ত করেছেন, 'কেননা অবশেষে আপনি তো সশরীরে এসে হাজির হয়েছেন—এখন আর এই ছেলেমেয়ে দুটির বিয়েটা স্থগিত রাখার কোনো কারণ নেই।' কথা বলার সময় তিনি অবশ্য মার্ক আর মাইরার ওপর একবার প্রশ্রয় ও স্নেহের ভঙ্গিতে তাকিয়েছেন।

সেদিন অপরাহ্ণে বেড়াতে বেরুবার কোনো কথাই ওঠেনি। মা আর মেয়ে ঘুরে-ঘুরে সারা বাড়িটা দেখিয়েছেন আমায়, দেখিয়েছেন কত-কী অপরূপ মাগিয়ার শিল্পকর্মে সারা বাড়ি সাজানো।

'আর মিনারটা?' মাইরা যেন টগবগ ক'রে উঠেছে, 'মঁসিয় ভিদাল কি ভেবেছেন মিনারটায় না-উঠে এ-বাড়িতে তাঁর পদার্পণ আদৌ সম্পূর্ণ হবে?'

'না, মাদমোয়াজেল মাইরা, না!' আমি বলেছি, 'সত্যি-বলতে, মার্কের এমন-কোনো চিঠি আমি পাইনি, যাতে এই মিনারটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছিলো না। আমি তো ফ্রান্‌স থেকে এসেছি শুধু এই মিনারটার ওপরে ওঠবার জন্যেই!'

আমার রসিকতাকে বিন্দুমাত্র আমল না-দিয়ে মাদাম রডারিখ বলেছেন, 'তাহ'লে আমাকে বাদ দিতে হবে। আমার পক্ষে মিনারটা বড্ড উঁচু।'

'বাঃ-রে!' মাইরা আপত্তি করেছে, 'মাত্র-তো একশো ষাটটা ধাপ!'

'তোর বয়েসে তাকেই মাত্র চারটে ধাপ ব'লে মনে হয়।' বলেছে কাপ্তেন হারালান। 'বেশ, মা, তুমি তবে বাগানেই থেকো—আমরা এসে সেখানেই তোমার সঙ্গে দেখা করবো।'

'তাহ'লে চলো *মহাকাশবিজয়ে*,' খিলখিল ক'রে হেসে উঠেছে মাইরা।

সে প্রায় ছুটেই উঠেছে ওপরে। তার হালকা পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে আমাদের বেশ কষ্টই হচ্ছিলো। কিন্তু কয়েক মিনিট পরে যখন ওপরে উঠে দাঁড়িয়েছি পুরো ল্যাণ্ডস্কেপটা যেন গোটানো পটের মতো আচমকা আমাদের চোখের সামনে খুলে গিয়েছে। *চমৎকার*!

সত্যিই, দিগন্ত অব্দি ছড়ানো এই চমৎকার ভূদৃশ্য দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলুম। মাইরার মনে হচ্ছিলো, এতেও শেষ হয়নি, কতগুলো বিশেষ দ্রষ্টব্য নির্দে

ক'রে দেখানোই যেন রাগ্‌ৎস-এর বাসিন্দা হিশেবে তার কাজ।

'ঐ-যে, দেখছেন,' সে বিশদ ক'রে বলেছে, 'ওটা হ'লো এখানকার অভিজাত পাড়া—বলতে পারেন বৈভবমহল্লা। জমকালো প্রাসাদ, চকমেলানো ইমারত, লাল চক নীল চক, সারি-সারি মূর্তি—কী নেই ওখানে। ঐ দিকেই আরো এগিয়ে গেলে আপনি গিয়ে পড়বেন বড়োবাজারে, এখানকার বাণিজ্যকেন্দ্র, ভিড়ভাট্টা, দোকানপাট, ব্যস্ততা, হুড়োহুড়ি—সব পাবেন।...আর দানিউব—ঘুরে-ফিরে সবসময়েই আমরা দানিউবে ফিরে আসি—দানিউবকে এখন কী-রকম ঝলমলে দেখাচ্ছে, না! আর ঐ সবুজ দ্বীপটা, তার ঝোপঝাড়, বীথিকা, কুঞ্জবন আর হাজার রকমের ফুল! আমার ভাই যেন আপনাকে শিগগিরই একদিন সবুজ দ্বীপটা দেখিয়ে আনে।'

'তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস,' কাপ্তেন হারালান তক্ষুনি ব'লে উঠেছে, 'রাগ্‌ৎস-এর সবচেয়ে ঘিঞ্জি গলিটাও আমি মঁসিয় ভিদালকে দেখাতে ছাড়বো না।'

'আর আমাদের চার্চগুলো,' মাদমোয়াজেল মাইরার মুখ থেকে ফুলঝুরি ছুটেছে, 'দেখতে পাচ্ছেন ঐ চার্চগুলো আর তাদের ঘণ্টাঘর? রোববার দিন শুনতে পাবেন ঘণ্টার শব্দ—একের পর এক, সুরে মেলানো। আর আমাদের পুরভবন—তার গুণিজন-সম্বর্ধনা ঘর, তার উঁচু ছাত, তার বিশাল সব রঙিন কাচ বসানো জানলা, আর ঘণ্টাঘর—যেখান থেকে দানাদার গলার স্বর প্রতিঘণ্টায় প্রহর হাঁকে!'

'কালকেই,' আমি তাকে নিশ্চিন্ত করেছি, 'কালকেই গিয়ে আমি পুরভবনে হাজিরা দেবো—আমি যে এ-শহরে এসেছি সেটা তো জানাতে হবেই।'

'তারপর মঁসিয়,' মাদমোয়াজেল মাইরা তখন মার্কের দিকে ফিরেছে, 'আমি যখন আপনার ভ্রাতৃদেবকে পুরভবন দেখাচ্ছিলুম, আপনি তখন কী দেখছিলেন?'

'ক্যাথিড্রালটি, মাদমোয়াজেল মাইরা, ক্যাথিড্রালটি। কী তার আশ্চর্য কাজকরা গম্বুজ, কী তার বিশাল আয়তন, আর মাঝখানের ঐ উঁচু মিনারটা যেন প্রার্থনার মতোই আকাশের দিকে উঠে গিয়েছে—'

ছবির মতো খুলে গিয়েছিলো রাগ্‌ৎস, দেখে-দেখে যেন আশ মেটে না। তবু একসময় আমরা নিচে নেমে এসেছি বাগানে, যেখানে মাদাম রডারিখ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

সেদিন রডারিখ পরিবারেই আমাকে আতিথ্য নিতে হয়েছে; শুধু ভোজই নয়, সারা সন্ধেটাই কাটিয়েছি আমরা একসঙ্গে, সবাই মিলে। একাধিকবার, মাইরা গিয়ে বসেছে ক্লাভিকর্ডে, আর সুললিত কণ্ঠে গেয়ে শুনিয়েছে সেইসব আশ্চর্য মাগিয়ার লোকগীতির সুর, যা যেমন উচ্ছল তেমনি মনমাতানো। শেষটায় একসময় কাপ্তেন হারালান যদি সময় সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করিয়ে না-দিতো তাহ'লে আরো-কতক্ষণ যে ওভাবে মশগুল কেটে যেতো, কে জানে।

হোটেলে ফিরে আসার পর, নিজের ঘরে যাবার আগে, মার্ক আমার সঙ্গে-সঙ্গে আমার ঘরে এসেছে ঢুকেছে। 'কী? আমি কি বাড়িয়ে বলেছিলুম?' সোজাসুজি আক্রমণ

করেছে সে আমাকে, 'জগতে কোথাও এ-রকম আর-কোনো মেয়ে—'

'*আর-কোনো?*' আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে উলটে চড়াও হয়েছি, 'আমার তো এর মধ্যেই মনে হচ্ছে ও-রকম কেউ সত্যি আছে কি না? একজনও? পুরোটাই মায়া, না মতিভ্রম? মাদমোয়াজেল মাইরা ব'লে সত্যি কি কেউ আছে?'

'ওঃ, অঁরি, তুই বুঝতেই পারবি না আমি কী-রকম প্রেমে প'ড়ে গিয়েছি!'

'তাতে আমি আশ্চর্য হইনি, মার্ক। বরং তুই যদি প্রেমে না-পড়তিস, তবে তোকে আমার ভাই ব'লে স্বীকার করতেই বাধতো।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন ভোর-ভোরই কাপ্তেন হারালানের সঙ্গে আমি রাগৎস সরেজমিন ঘুরে দেখতে বেরিয়ে পড়েছি। বিয়ের জোগাড়যন্তরতদ্বিরে মার্ক ব্যস্ত ছিলো ব'লে আমাদের সঙ্গে যায়নি, বিয়ের দিন ধার্য হয়েছে পয়লা জুন, তিন হপ্তার মধ্যেই। এদিকে কাপ্তেন হারালান ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলো তার জন্মভূমি কত সুন্দর, কত ঐতিহ্যমণ্ডিত—সেটাই ঘুরে-ঘুরে দেখাতে। এর আগে কোথাও গিয়ে এমন-কোনো গাইড পাইনি আমি যে শুধু শিক্ষিত, পরিশীলিত, দক্ষই ছিলো না—যে তার নিজের বিষয়কে এমন ভালোবাসতো।

যদিও স্মৃতির মধ্যে একগুঁয়ের মতো বারে-বারে হানা দিয়ে আমাকে চমকে-চমকে দিচ্ছিলো সেই বেঘোর-বিভ্রমে শোনা হুঁশিয়ারগুলো (যা হয়তো নিছকই মতিভ্রম ছিলো —যার কোনো বাস্তব ভিত্তি অন্তত আমার নজরে পড়েনি), তবু আমি একবারও ঘুণাক্ষরেও ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের নাম করিনি। কাপ্তেন হারালান এ নিয়ে কোনো কথাই বলেনি, হয়তো এ-কথা কখনও তার মাথাতেই আসেনি।

সারা শহর আমরা চ'ষে বেড়িয়েছি, সব-শেষে এসেছি সেই চকে, যেখানে রৌদ্রে ঝলমল ক'রে উঠেছিলো রাজভবন। সেখানে একটু থমকে থেমে সব খুঁটিয়ে দেখেছি আমরা। কাপ্তেন হারালান আমাকে জানিয়েছে: 'এটা রাজভবন—রাজ্যপালের বাসভবন। এখানেই বিয়ের অনুষ্ঠানে ক্যাথিড্রালে যাবার আগে মার্ক আর মাইরাকে এসে রাজ্যপালের কাছ থেকে অনুজ্ঞাপত্র নিতে হবে।'

'*অনুজ্ঞাপত্র?* তার মানে বিয়ে করতে হ'লে রাজ্যপালের অনুমতি চাই?'

'হ্যাঁ। এটা এখানকার ভারি প্রাচীন একটা রীতি। নগরের সর্বোচ্চ অধিনায়কের অনুমতি ছাড়া কোনো বিয়েই হ'তে পারে না এখানে। শুধু তা-ই নয়, এই অনুজ্ঞাপত্র পাত্রপাত্রীর মধ্যে একটা দৃঢ় বন্ধন তৈরি করে। তখনও বিয়ে হয়নি অবশ্য, কেননা চার্চের অনুষ্ঠান হয়নি, তবে নিছক বাগ্‌দানের চাইতে আরো-সুদৃঢ় একটা স্বীকৃতি পাওয়া যায়

—যদি কোনো অপ্রত্যাশিত অভাবিত কারণে বিয়ে পেছিয়ে যায় তবুও পাত্রপাত্রী কেউই নতুন-কোনো বন্ধন স্বীকার ক'রে নিতে পারবে না।'

এই স্মরণীয় রীতিটি ব্যাখ্যা করতে-করতে কাপ্তেন হারালান আমাকে নিয়ে এসেছিলো সেই রাস্তায়, যা গিয়ে শেষ হয়েছে সন্ত মিখায়েলের ক্যাথিড্রালের সামনে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পুরোনো এই ক্যাথিড্রালটির যত বৈশিষ্ট্য ছিলো, সব বেশ খুঁটিয়ে বলেছিলো কাপ্তেন হারালান। 'পরে কখনও ভেতরে গিয়ে খুঁটিনাটি সব ঘুরে-ঘুরে দেখা যাবে। এখন বরং চলুন দুর্গটা গিয়ে দেখে আসি। তারপর বুলভার ধ'রে-ধ'রে সারা শহরটা ঘুরে ঠিক লাঞ্চের আগেই আমরা ফিরে যেতে পারবো।'

দুর্গের দিকে যেতে হ'লে ঐ ছোটো-বড়ো বাজারগুলোর একটার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তখনই পুরোদমে বিকিকিনি চলেছে, সবখানেই ব্যস্ততা আর হুড়োহুড়ি, কিন্তু আমরা বাজারটার মধ্যে গিয়ে পড়বার আগেই সেখানে এমন-একটা শোরগোল উঠলো, যেটাকে নিছকই দৈনন্দিন কেনাবেচার গুঞ্জন ব'লে মনে হয়নি।

কয়েকজন স্ত্রীলোক একটা লোককে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়েছে, লোকটা মাটিতে প'ড়ে কাৎরাচ্ছে, চেষ্টা ক'রেও উঠতে পারছে না।

'কেউ-একজন ধাক্কা দিয়েছে আমাকে...জোরে ঠেলা দিয়েছে...এত জোরে ধাক্কা মেরেছে যে আমি হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গিয়েছি।'

'কিন্তু তোমায় ধাক্কাটা দিলে কে?' স্ত্রীলোকদের একজন জিগেস করেছে। 'আমার দোকান থেকে স্পষ্ট দেখেছি হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে যাবার সময় তোমার আশপাশে কেউই ছিলো না। কেউ না।'

'ছিলো, নিশ্চয়ই ছিলো।' লোকটা চেঁচিয়ে বলেছে। 'ঠিক বুকে ধাক্কা মেরেছে! শয়তানে নিক হতচ্ছাড়াকে, এখনও বুকে ব্যথা করছে!'

কাপ্তেন হারালান লোকটাকে জিগেস ক'রে যা জানতে পেলে, তা এইরকম : চাষীটি রাস্তা দিয়ে চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিলো, এমন সময় সজোর একটা ধাক্কা খায়, যেন কোনো দশাসই পালোয়ান এসে তার গায়ে বেশামাল পড়েছে। এতই জোরে, যে সে প্রায় ডিগবাজি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সত্যি—তার কোনো সংশয়ই নেই—কারু সঙ্গে ধাক্কা খেয়েই এই চোটটা পেয়েছে সে। কিন্তু সে-যে কে তাকে অমনভাবে ধাক্কা দিয়েছে, সে-সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই নেই—কোনোরকমে ওঠবার চেষ্টা করার সময় সে নিজেও আশপাশে কাউকে দেখতে পায়নি।

কতটা সত্য ছিলো এই গল্পে? সত্যিই কি লোকটা আচমকা ও-রকম বেদম একটা ধাক্কা খেয়েছে? কিন্তু ধাক্কা খাওয়ার মানে কেউ তাকে সেই ধাক্কা দিয়েছে—এমনকী দমকা হাওয়া এসেও যখন আচমকা ঠেলা দেয় তখন তো এটা জানা থাকে যে দমকা হাওয়া এসেছিলো! কিন্তু হাওয়াও তো শান্ত এখন। শুধু একটা জিনিশই নিশ্চিত : লোকটা আচমকা প'ড়ে গিয়েছে, এবং তার কোনো বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাও পাওয়া যাচ্ছে না। আর সেইজন্যেই এখানে এত উত্তেজনা। কেউ-কেউ বলতে শুরু করেছে লোকটা হয় মতিচ্ছন্ন

মাতাল, আর নয়তো জেগে-জেগেই দুঃস্বপ্ন দ্যাখে। শুধু মাতালরাই বেটাল চলতে গিয়ে দুমদাম প'ড়ে যায়। লোকটা কিন্তু সজোরে উলটো কথাই বললে : গত চব্বিশ ঘণ্টায় সে একফোঁটাও মদ খায়নি। শেষটায় একজন পাহারাওলা এসে লোকটাকে আর গোল না-পাকিয়ে কেটে পড়তে বলেছে।

আমরা তারপর উৎরাই বেয়ে একটা রাস্তা ধ'রে দুর্গের দিকে এগিয়েছি—একটা ছোটো টিলার ওপর নিরেট বসানো দুর্গটা।

এবারও কাপ্তেন হারালান ঘুরে-ঘুরে তার বৈশিষ্ট্যগুলো দেখিয়েছে। শেষটায় তারই ইঙ্গিতে সদর দরজাটাও খুলে গিয়েছে। তারপর ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে আমরা দুশো চল্লিশটা ধাপ পেরিয়ে শেষটায় এসে পৌঁছেছি তার ছাতে। আর সেখান থেকে আবার শহরটাকে দেখা গেছে, ঠিক যেমনভাবে পাখির চোখ দূরের আকাশ থেকে নিচের সবকিছু দ্যাখে।

শুধু দ্রষ্টব্য বিষয় নিয়েই নয়, আরো নানা বিষয়ে সারাক্ষণ আমরা আলোচনা চালিয়ে গিয়েছি। একবার কাপ্তেন হারালান আমায় বলেছে : 'আমাদের শহরে কিন্তু আপনি তেমন গরিব মানুষ দেখতে পাবেন না। দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ দেখা গেলেই কর্তৃপক্ষ নানারকম ব্যবস্থা নিয়ে দারিদ্র্য দূর করার চেষ্টা করেন।'

'সেটা বোঝা যায়।' আমি বলেছি, 'ডাক্তার রডারিখ যে কখনও গরিবদের চিকিৎসার জন্যে কোনো ত্রুটি করেন না, সেটা আমি এখানে আসার আগেও লোকের কাছে শুনেছি ! তাছাড়া শুনেছি মাদাম রডারিখ আর মাদমোয়াজেল মাইরাও নানারকম সমাজসেবার কাজে লেগে আছেন !'

'আমার মা-বোন যা করেন তা যে-কোনো অবস্থাপন্ন ঘরের মানুষেরই করা উচিত। আমার মতে, মানুষ সমাজে থাকে ব'লেই সমাজসেবা মারফৎ সে সমাজের কাছে তার ঋণ শোধ করবার একটু চেষ্টা করতে পারে। তাছাড়া এ-শহরটা এমনিতে নির্বিরোধী, শান্তিপ্রিয়। তেমন-কোনো রাজনৈতিক উত্তেজনা বা হুলুস্থুলও নেই। অথচ তবু শহরের সকলেই নিজের দাবি ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন—কেন্দ্রীয় সরকার ককখনও কোথাও বাড়াবাড়ি করলেই তার প্রতিবাদ ওঠে। এখানকার লোকদের শুধু একটাই দোষ।'

'আর, সেটা ?'

'তাদের নানারকম সংস্কার আছে; অলৌকিকে বিশ্বাস করে, অতিপ্রাকৃত নিয়ে মাথা ঘামায়। ভূতের গল্প আর শয়তানের কীর্তি সম্বন্ধে বড্ড বেশিই মাথা ঘামায়।'

'এমনকী সব শিক্ষিত মানুষও ?'

'সব না-হ'লেও বেশির ভাগই। বিজ্ঞানচেতনা বা শিক্ষা এ-দিকটায় তেমন প্রভাব ফ্যালেনি। কেন-যে লোকদের এই দুর্বলতা, তা জানি না। আমি তো ভেবে-ভেবে এর কোনো মাথামুণ্ডু খুঁজে পাইনি। কেন-যে ভূত-প্রেতে লোকের এমন বদ্ধমূল বিশ্বাস, তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়াই কঠিন।'

দুর্গটা দেখে বেরিয়ে আসার সময় কাপ্তেন হারালান জানিয়েছে, শহরে একটা

পুরোনো কেল্লায় মস্ত খাবারঘরে একটা হোটেল থেকে লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়। আমরা সেখানেই দুপুরবেলায় খেয়ে নেবো। আবারও কথা বলতে-বলতেই আমরা শহরের অন্যপ্রান্তের দিকে এগিয়েছি। একটু পরেই আমরা বুলভার তেকেলিতে এসে পড়েছি, আর অমনি চোখে পড়েছে একটা বিরাট বাগানের মধ্যে একটা মস্ত অট্টালিকা। দেখে মনে হয় পোড়োবাড়ি, ছন্নছাড়া পরিত্যক্ত চেহারা, বন্ধ জানলাগুলো বোধহয় স্মরণকালের মধ্যে কখনও খোলা হয়নি, দেয়ালে শ্যাওলা আর পরগাছা গজিয়েছে। শহরের অন্য বাড়িগুলোর পাশে এটাকে কেমন-যেন হানাবাড়ি ব'লেই মনে হয়। রেলিঙঘেরা বাড়িটার সামনে লৌহফটক, তারপর উঠোন, খোয়ারিবিছানো রাস্তার দু-পাশে দুটো উইলো গাছ, শুকনো, মরা—গাছ দুটি এতই প্রাচীন যে যেন বয়েসের ভারেই ম'রে গিয়েছে। বাড়িটার সামনের দিকে আরো-একটা দরজা, তার ওককাঠের পাল্লাগুলো রংচটা, জীর্ণ। তিনটে ভাঙা সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে পৌঁছুনো যায় ঐ দরজায়। দোতলাও আছে, তারপর উঁচু দর্শন-অলিন্দ। পুরু পর্দা দিয়ে ঢাকা সরু-সরু গবাক্ষ। যদি-বা বাড়িটা বাসযোগ্যও হয়, দেখে মনে হয় না বাড়িটায় কেউ থাকে।

আমি জিগেস করেছি : 'কার বাড়ি এটা?'

'ভারি আজব একজন লোকের,' কাপ্তেন হারালান বলেছে।

আমি বলেছি : 'বুলভারের বাকি বাড়িগুলোর পাশে ভারি বেমানান। পুরসভার উচিত বাড়িটা কিনে নিয়ে ভেঙে ফেলে নতুন ক'রে কিছু তৈরি ক'রে দেয়া।'

'সত্যি তা-ই উচিত। বাড়িটা ভেঙে ফেললে হয়তো তার অদ্ভুত মালিকটিও শহর ছেড়ে চ'লে যেতে বাধ্য হবে। শহরের জনরব বিশ্বাস করলে বলতে হয় তাহ'লেই হয়তো সে তার নিকটতম আত্মীয় বীলজেবারের বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নেবে।'

'তা-ই না কি? তা এই বিদঘুটে ব্যক্তিত্বটি কে?'

'একজন জার্মান।'

'জার্মান?'

'হ্যাঁ, প্রুশিয়ার লোক।'

'আর তার নাম?'

ঠিক যখন কাপ্তেন হারালান নামটা বলতে যাবে, অমনি আচমকা বাড়ির সামনের ঐ দরজার রংচটা কবাটগুলো খুলে গেলো, আর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো দুটি লোক। দুজনের মধ্যে যে বড়ো, তার সত্যি বয়েস হয়েছে, অন্তত ষাট তো হবেই, সে সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে রইলো, অন্যজন নেমে চ'লে এলো ফটক বেরিয়ে বুলভারে।

'আচ্ছা!' কাপ্তেন হারালান কেমন অদ্ভুত স্বরে বললে। 'মহাশয় তবে এখানেই আছেন। আমি ভেবেছিলুম সে চ'লে গিয়েছে শহর ছেড়ে!'

সে ফিরতেই লোকটা আমাদের দেখতে পেলে। সে কি চেনে কাপ্তেন হারালানকে? সন্দেহ করার জো কী—কেননা দুজনেই প্রচণ্ড বিদ্বেষের চোখে পরস্পরের দিকে তাকিয়েছে।

আমিও তখন লোকটাকে চিনতে পেরেছি। সে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই আমি ব'লে উঠেছি : 'তাহ'লে সত্যি-সত্যি *এ-ই* সেই লোক ?'

'আপনার সঙ্গে *এর* আগে দেখা হয়েছে ?' কাপ্তেন হারালান একটু আশ্চর্যই হয়েছে।

'হয়েছে।' আমি জানিয়েছি, 'বুডাপেশ্‌ট থেকে ভুকোভার অব্দি এর সঙ্গেই আমি *ডরোথিতে* ক'রে এসেছি। তবে এটা বলবো যে এর সঙ্গে যে রাগ্‌ৎস-এ ফের দেখা হ'য়ে যাবে, এটা আমি আশা করিনি।'

কাপ্তেন হারালানও সায় দিয়ে বলেছে : '*এ* এখানে না-থাকলেই ভালো হ'তো।'

'মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে এই জার্মানের খুব-একটা ভাব নেই ?'

'কারই বা ভাব থাকবে ? তাছাড়া আমার তো একে অপছন্দ করবার বিশেষ কারণ আছে। এর ধৃষ্টতা একবার ভেবে দেখুন। এ কি না আমার বোনকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো ! কিন্তু বাবা আর আমি এমনভাবে প্রস্তাবটা নাকচ ক'রে দিয়েছি যে দ্বিতীয়বার *সে* আর এই প্রস্তাবটা করতে সাহস পাবে না।'

'তার মানে ? তবে *এ-ই সেই লোক* ?'

'আপনি তাহ'লে *একে* চেনেন ?'

'হ্যাঁ, কাপ্তেন। এতক্ষণে আমি বুঝে গিয়েছি যে এইমাত্র যাকে দেখতে পেয়েছি সে হ'লো ভিলহেল্‌ম স্টোরিৎস, স্প্রেমবার্গের বিখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী অটো স্টোরিৎস-এর সুপুত্র।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এটা কবুল করতেই হয় যে আমার সমস্ত সচেতন চেষ্টা সত্ত্বেও পরের দু-দিনে ভিলহেল্‌ম স্টোরিৎসের নাম বারে-বারে আমার মনের মধ্যে হানা দিয়েছে। তাহ'লে এই রাগ্‌ৎস-এই সে সাধারণত থাকে, আর এটাও আমি তারপরেই জেনে গিয়েছি যে তার সঙ্গে থাকে একজনই মাত্র ভৃত্য, হেরমান, সেও তার প্রভুর মতোই রূঢ়, ভ্রূকুটিপরায়ণ, এবং প্রভুর মতোই সে সারাক্ষণ তার মুখে কুলুপ এঁটে ব'সে থাকে। আমার কেবলই থেকে-থেকে এটাও মনে হচ্ছিলো যে, সেদিন যে-লোকটা আমাদের পিছু নিয়েছিলো ব'লে আমার ধারণা হয়েছিলো, যাকে আমি ভেবেছিলুম চোখের ভুল অথবা মতিভ্রম ব'লে, তার চলাফেরার ভঙ্গির সঙ্গে এই হেরমানের চলাফেরার ভঙ্গির কোনোই তফাৎ নেই।

বুলভার তেকেলিতে আমি আর কাপ্তেন হারালান আচমকা কার মুখোমুখি গিয়ে পড়েছিলুম, তা মার্কের কাছে ব'লে দিয়ে কোনো লাভ হবে না ব'লেই আমি ভেবেছিলুম। ভিলহেল্‌ম স্টোরিৎস যে রাগ্‌ৎস-এ ফিরে এসেছে এটা শুনলে মার্ক হয়তো বেশ বিচলিত

হ'য়েই পড়বে। শঙ্কার ছায়া ফেলে খামকা বেচারার মনখারাপ ক'রে দিয়ে কী লাভ ? আমি নিজে অবশ্য মনে-মনে একটু ঘাবড়েই গিয়েছি—মার্ক আর মাইরার বিয়ের আগেই মার্কের প্রতিদ্বন্দ্বীর এই আবির্ভাব কোনো গণ্ডগোলের সূত্রপাত নয় তো ?

ষোলো তারিখ সকালবেলায় আমি যখন হাঁটতে বেরুবো ব'লে তৈরি হচ্ছি, এমন সময়ে হঠাৎ কাপ্তেন হারালান এসে হাজির। একটু অবাকই হ'য়ে গেছি আমি তাকে দেখে, কেননা এটা স্থির হয়েছিলো সে-দিন আর হারালানের সঙ্গে আমার দেখা হবে না, কেননা তার নাকি সামরিক বাহিনীতে কী-একটা জরুরি কাজ আছে।

'আরে ! তুমি!' আমি বিস্মিতভাবে ব'লে উঠেছি, 'হঠাৎ যে ! তা, ভালোই হ'লো !'

আমার হয়তো দেখারই ভুল হ'য়ে থাকবে, কিন্তু তার মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছিলো সে যেন কোনো কারণে ভারি উদ্বিগ্ন হ'য়ে আছে। সে শুধু বললে, 'মঁসিয় ভিদাল, বাবা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান। তিনি বাড়িতে আপনারই জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'চলো, তোমার সঙ্গেই যাই,' আমি উত্তর করেছি ; খুবই আশ্চর্য বোধ করেছি আমি, একটু যেন অস্বস্তিও—যদিও এর কোনো স্পষ্ট কারণ ছিলো না। আবার কী নতুন উৎপাত হ'লো যে ডাক্তার রডারিখ এই সাতসকালে আমাকে তলব ক'রে পাঠিয়েছেন ? মার্কের বিয়ে সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারেই কি ? কোনো কথা না-ব'লেই দুজনে আমরা তারপর হেঁটে গিয়েছি রডারিখ-ভবনে।

ডাক্তার একাই বসেছিলেন তাঁর পড়ার ঘরের টেবিলে । মুখ তুলে তাকাতেই মনে হ'লো ছেলের চেয়েও বেশি যেন ঘাবড়ে গিয়েছেন তিনি।

'নিশ্চয়ই কিছু-একটা হয়েছে,' আমি মনে-মনে ভেবেছি, 'আর ছোটোহাজরির টেবিলে সকালে যখন মার্কের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তখন সে এর বিন্দুবিসর্গও কিছু জানতো না।'

আমি ডাক্তার রডারিখের মুখোমুখি একটা আরাম কেদারায় ব'সে পড়েছি, কাপ্তেন হারালান ম্যান্টলপীসে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। তারপর আমি একটু শঙ্কিতভাবেই ডাক্তার কী কথা পাড়েন, তার জন্যে চুপচাপ অপেক্ষা করেছি। 'আপনি যে সব কাজ ফেলে এক্ষুনি দেখা করতে এসেছেন, সেইজন্যে,' ডাক্তার রডারিখ বলেছেন, 'সেইজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।'

আমি উত্তর দিয়েছি, 'আমি সবসময়েই আপনার কাজ করতে প্রস্তুত, ডাক্তার রডারিখ।'

'আমি হারালানের উপস্থিতিতেই আপনার সঙ্গে একটা বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।'

'বিয়ের ব্যাপারে কিছু ?'

'হ্যাঁ, বিয়ের ব্যাপারেই।'

'তার মানে আপনি যে-কথা বলতে চাচ্ছেন তা নিশ্চয়ই খুবই সিরিয়াস-কিছু ?'

'হ্যাঁও বটে, আবার নাও বটে,' ডাক্তার একটু ইতস্তত করেছেন, 'তবে এ-ব্যাপারটা কিন্তু আমার স্ত্রী-কন্যা অথবা আপনার ভাই—কেউই কিছু জানেন না। আপনাকে যা বলতে যাচ্ছি, তা এঁদের কানে উঠুক, এটা আমি ঠিক চাই না। সবকিছু শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন আমার এ-সিদ্ধান্ত ঠিক কি না।'

প্রায় যেন আঁতের মধ্যেই আমি ততক্ষণে টের পেয়ে গেছি বুলভার তেকেলির হানাবাড়ির সামনে সেদিন যার সঙ্গে আমার আর হারালানের দেখা হয়েছিলো, সে-ই কোনোভাবে এই প্রহেলিকাটির মূলে।

'গতকাল, অপরাহ্ণে,' ডাক্তার রডারিখ ততক্ষণে প্রসঙ্গটি পেড়েছেন, 'মাদাম রডারিখ আর মাইরা যখন বাড়ি ছিলো না, আর আমার রুগি দেখার সময় এগিয়ে এসেছে, হঠাৎ আমার পরিচারক এসে জানালে যে এমন-একজন ব্যক্তি আমার দর্শনপ্রার্থী, যার সঙ্গে আমার ঠিক দেখা করার ইচ্ছে ছিলো না। সেই দর্শনপ্রার্থীই হ'লো ভিলহেল্ম স্টোরিৎস, কিন্তু আপনি হয়তো এই জার্মানটার কথা কিছু শোনেননি...'

'আমি তার সম্বন্ধে জানি,' আমি বাধা দিয়ে জানিয়েছি।

'তাহ'লে এও নিশ্চয়ই আপনি জানেন যে প্রায় মাস ছয়েক আগে, আপনার ভাই মাইরার পাণিপ্রার্থনা করার অনেক আগে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস এসে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো। আমার স্ত্রী ও ছেলের সঙ্গে কথা ব'লে—তার সম্বন্ধে তাঁদেরও একই রকম বিতৃষ্ণা ছিলো—আমি ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে জানিয়ে দিয়েছিলুম যে আমি তার প্রস্তাবে সম্মত হ'তে অপারগ। এই প্রত্যাখ্যানটা মেনে না-নিয়ে সে সরাসরি সরকারিভাবে বিয়ের প্রস্তাব ক'রে পাঠায়—আমিও সরাসরি এমনভাবে তাকে আমাদের অসম্মতি জানিয়ে দিই যে তার যে এ-ব্যাপারে কোনোই আশা নেই, সেটা বুঝতে পারার কোনো অসুবিধে তার ছিলো না।'

ডাক্তার রডারিখ যখন পুরো ব্যাপারটা বিশদ ক'রে আমায় জানাচ্ছিলেন, কাপ্তেন হারালান তখন কেমন অস্থিরভাবে সারা ঘরে পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছিলো। বেশ কয়েকবারই একটা জানলার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে বুলভার তেকেলির দিকে তাকাচ্ছিলো।

'ডাক্তার রডারিখ,' আমি ততক্ষণে তাঁকে জানিয়েছি, 'এই প্রস্তাবের কথা আগেই আমার কানে এসেছে। আমি এও জানি যে আমার ভাই বিয়ের প্রস্তাব করার আগেই ভিলহেল্ম স্টোরিৎস তার প্রস্তাব করেছিলো।'

'হ্যাঁ, প্রায় তিন মাস আগে।'

'কাজেই,' আমি বলেছি, 'এ তো আর এমন নয় যে মার্কের সঙ্গে আগেই বিয়ে ঠিক হ'য়ে গিয়েছিলো ব'লে ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে উপেক্ষা করা হয়েছে, বরং তাতে এটাই বোঝা যায় যে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে আপনাদের আদপেই ইচ্ছে করেনি—'

'তা তো করেইনি!' আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ডাক্তার রডারিখ বলেছেন, এ-রকম কোনো বিবাহসম্বন্ধে আমরা কিছুতেই সম্মতি দিতুম না—তাছাড়া মাইরা নিজেও

সে-বিয়েতে বেঁকে বসেছিলো, সে নিজেই এ-বিয়েতে রাজি হয়নি—'

'সে কি ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের সামাজিক পদমর্যাদার জন্যে ? না কি আরো-কোনো ব্যক্তিগত আপত্তি ছিলো ?'

'তার সামাজিক পদমর্যাদা হয়তো অনেকের চাইতেই বেশ ওপরে,' ডাক্তার রডারিখ আমায় বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, 'এটা ধ'রেই নেয়া যায় যে তার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পিতৃদেব তার জন্যে অতুল বৈভব রেখে গিয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তি হিশেবে সে নিজেই—'

'আমি তাকে জানি, ডাক্তার রডারিখ।'

'আপনি ওকে চেনেন ?'

আমি তখন খুলে বলেছি কী ক'রে আমার সঙ্গে *ডরোথিতে* তার দেখা হয়েছিলো, যদিও তখন আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি সে আসলে কোন মহদাশয়। কারণ সেই জার্মান তো মাত্র তিন-চারদিনই আমার সহযাত্রী ছিলো, আর আমি যখন রাগ্‌ৎস পৌঁছেছি সে তখন বজরায় ছিলো না—সেইজন্যেই আমি ধ'রে নিয়েছিলুম যে সে ভুকোভারে নেমে গিয়েছে।

'সেদিন,' আমি আরো বলেছি, 'আমি আর কাপ্তেন হারালান তার বাড়ির পাশ দিয়ে যখন হেঁটে যাচ্ছিলুম, শুধু তখনই তাকে ঐ বাড়ি থেকে বেরুতে দেখে আমি বুঝতে পারি যে আমার সেই সহযাত্রীটিই আসলে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস।'

'অথচ তবু কি না লোকের মুখে শুনেছি সে কয়েক সপ্তাহ আগেই রাগ্‌ৎস ছেড়ে চ'লে গিয়েছে,' বলেছেন ডাক্তার রডারিখ।

'লোকে তা-ই ভেবেছে। আর সে-যে অন্তত কিছুদিনের জন্যে শহর ছেড়ে চ'লে গিয়েছিলো তার আরো প্রমাণ হ'লো যে মঁসিয় ভিদাল তাকে বুডাপেশ্‌ট-এ দেখেছেন,' এবার কাপ্তেন হারলান তার মত ব্যক্ত করেছে, 'তবে সে-যে আবার রাগ্‌ৎস-এ ফিরে এসেছে, তাতে আর-কোনো সন্দেহই নেই।'

ডাক্তার রডারিখ আবার নিজের কথার খেই তুলে নিয়েছেন, 'তার সামাজিক পদমর্যাদা সম্বন্ধে আমার কী ধারণা, তা তো আমি আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি, মঁসিয় ভিদাল। আর তার জীবনযাপনের ধরন—তার বাঁচনরীতি—সেটা যে কী, তা কেই-বা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে যে সে তা জানে ? সেটা পুরোপারি কুহেলিঢাকা, প্রহেলিকায় ভরা। লোকটা যেন মনুষ্যসমাজের বাইরেই তার সময় কাটায়।'

'এটা কি আপনি একটু বাড়িয়ে বলছেন না ?' আমি আপত্তি জানিয়েছি।

'আমি জানি যে এতে একটু হয়তো অতিশয়োক্তি আছে, কিন্তু তবু এটা তো ঠিক যে তার উদ্ভব হয়েছে কোনো সন্দেহজনক বংশে। তার আগে তার বাবা অটো স্টোরিৎসও বিস্তর উদ্ভট কিংবদন্তির বিষয় হয়েছিলেন।'

'সেই কিংবদন্তিগুলো তাঁর মৃত্যুর পরও যে বেঁচে আছে তার প্রমাণ তাঁর সম্বন্ধে আমি ভারি অদ্ভুত সমস্ত কথা বুডাপেশ্‌টের একটা খবরকাগজে পড়েছি। উপলক্ষ ছিলো

তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী, যেটা প্রতি বছরই স্প্রেমবার্গে ধুমধাম ক'রে উদ্‌যাপিত হয়—স্প্রেমবার্গে ঠিক নয়, উদ্‌যাপিত হয় তার কবরখানায়। সেই খবরকাগজটাকে যদি সাক্ষী মানতে হয় তবে বলতেই হয় যে কুসংস্কারে-ভরা যে-সব কিংবদন্তির কথা আপনি বললেন, সময় তাতে একটা আঁচড়ও কাটতে পারেনি। মৃত বৈজ্ঞানিক এখনও নিজের সম্বন্ধে যাবতীয় উপকথাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। লোকের মতে, তিনি না কি ছিলেন মায়াবিদ্যায় সুপণ্ডিত এক ঐন্দ্রজালিক, যিনি পরলোকের সব রহস্য জানেন এবং এখনও যাবতীয় অতিপ্রাকৃত শক্তির চর্চা ক'রে থাকেন। প'ড়ে মনে হ'লো, লোক আশা করে প্রতি বছরই তাঁর বার্ষিকীর দিনে তাঁর গোরস্থানে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত কিছু ঘটবে।'

'তাহ'লে, মঁসিয় ভিদাল,' ডাক্তার রডারিখ আলোচনায় ইতি টেনেছেন তারপর, 'স্প্রেমবার্গে লোকে কী বিশ্বাস করে এটা জানবার পর আপনার নিশ্চয়ই এটা জেনে বিস্ময় জাগবে না, রাগ্‌ৎস-এ লোকে ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে কী অদ্ভুত চোখে দ্যাখে। ... আর সেই লোকই এসে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো। শুধু তা-ই নয়, তার ধৃষ্টতা এমনই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে, গতকাল এসেও সে আবার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে।'

'*গতকাল!*' আমি বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠেছি।

'হ্যাঁ, গতকাল, যখন কাল বিকেলে সে এখানে এসেছিলো।'

'আর,' কাপ্তেন হারালান তখন ঘোষণা করেছে, 'আর-কিছু যদি সত্যি নাও হয়, সে-যে প্রুশিয়ান এটা তো ঠিক। আর তার প্রস্তাব উপেক্ষা করার পেছনে সেটাই যথেষ্ট কারণ।'

ঐতিহ্য এবং পরম্পরা মাগিয়ারদের রক্তে জার্মানদের সম্বন্ধে যে-ঘৃণা যে-জাতিবৈরিতা বুনে দিয়েছে, কাপ্তেন হারালানের এই ঘোষণায় সেটাই স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে।

'কী হয়েছিলো, বলছি, শুনুন।' ডাক্তার রডারিখ বিশদ ক'রে বলেছেন। 'আপনার ব্যাপারটা পুরোপুরি জানাই ভালো। আমাকে যখন এসে বললে যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস এসেছে, আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, আমি একটু দোনোমনা করেছিলুম... তাকে কি ভেতরে আসতে বলবো, নাকি সরাসরি ব'লে দেবো যে তার সঙ্গে দেখা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়?'

'হয়তো সেই কথাই জানিয়ে দেয়াই ভালো হ'তো, বাবা,' কাপ্তেন হারালান মাঝখানে প'ড়ে মন্তব্য করেছে, 'কারণ প্রথমবারে তার বিয়ের প্রস্তাব উপেক্ষা করার পর লোকটার বোঝা উচিত ছিলো, কোনো অছিলাতেই তার আর এ-বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে পা দেয়া উচিত নয়।'

'হ্যাঁ, সে হয়তো ঠিক,' ডাক্তার রডারিখ বলেছেন, 'তবে আমার আবার এ-রকম কাঠখোট্টাভাবে কিছু ব'লে দিতে ভয় করে—তা থেকে না আবার কোনো কেলেঙ্কারির সৃষ্টি হয়।'

'তাহ'লে আমি তার একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলতুম, বাবা!'

'আর শুধু তোকে আমি জানি ব'লেই,' ডাক্তার রডারিখ তাঁর ছেলের হাত চেপে ধরেছেন, 'ঠিক সেইজন্যেই আমি মাথা ঠাণ্ডা রেখে, কোনো গোলমাল যাতে না-হয়, তার চেষ্টা করেছি... যা-ই হোক না কেন, আমি তোকে তোর মা, বোন বা আমার কথা মনে রাখতে আরজি জানাচ্ছি—যদি কোনো প্রকাশ্য কেলেঙ্কারির মধ্যে মাইরার নাম একবার উঠে পড়ে তাহ'লে সেটা তার পক্ষে ভারি বেদনাদায়ক হবে। এই ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যদি কোনো গোল পাকায়, তবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ-টুদ্ধ তার কোনো উত্তর হবে না।'

কাপ্তেন হারালানকে আমি তো সবে গত কয়েকদিন ধ'রে দেখেছি, তাতেই আমার মনে হচ্ছিলো যতই ভদ্র বা শীলিত হোক না কেন, তার মাথায় বড্ড চট ক'রেই রক্ত চ'ড়ে যায়, নিজের বংশমর্যাদা সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সচেতন, বংশের সুনামে একটা ছোট্ট আঁচড় পড়লেও সে তা আদপেই সহ্য করবে না। আর সেইজন্যেই আমার মনে হ'লো মার্কের এই প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বীর পুনরাবির্ভাব এবং পুনরায় বিবাহপ্রস্তাব পাঠানো কেন যেন একটা শোচনীয় সর্বনাশের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ডাক্তার রডারিখ তখন সেদিনকার মোলাকাৎটার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন—যাবতীয় খুঁটিনাটি সমেত। আমরা যে-ঘরটায় ব'সে আলোচনা করছি, সেই ঘরটাতেই ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে অভ্যর্থনা করা হয়েছিলো। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস গোড়ায় এমন সুরে কথা বলেছে, যাতে বোঝা যাচ্ছিলো সে একেবারে নাছোড়বান্দা লোক, একটা-কিছু তার মাথায় এলে সে তাতে আঠার মতো লেগে থাকতে পারে। তার বক্তব্য ছিলো, সে-যে ডাক্তার রডারিখের দর্শনপ্রার্থী হ'য়ে এসেছে এতে অবাক হবার কিছু নেই, রাগ্‌ৎস-এ ফিরেই সে *সবিনয়ে* আবার-একবার *সনির্বন্ধ* অনুরোধ ক'রে দেখবে ব'লে সে আগেই ঠিক ক'রে রেখেছিলো।

মিথ্যেই তখন ডাক্তার রডারিখ ভদ্রভাবে তার প্রস্তাবটি আবার প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যুদ্ধে বা প্রণয়ে হারবার পাত্র নয়, তার গলার স্বর ক্রমশ চড়েছে, শোভনতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে, সে চেঁচিয়ে বলেছে মাদমোয়াজেল মাইরার সঙ্গে মার্ক ভিদালের যে-বাগ্‌দান হযেছে সেটা এক্ষুনি নাকচ ক'রে দিতে হবে, তার দাবিটাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য, সে এই তরুণীর প্রণয়াসক্ত, এবং এই তরুণী যদি শেষ পর্যন্ত তার না-হয় তবে সে যাতে আর-কারু না-হয় সেই ব্যবস্থা সে করবে।

'কী ঔদ্ধত্য!... কী আস্পর্ধা!' চেঁচিয়ে উঠেছে কাপ্তেন হারালান, 'এমন কথা বলবার দুঃসাহস তার হয় কী ক'রে! আমি যদি তখন এখানে থাকতুম তবে তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দিতুম!'

'ঠিক জানি,' আমি মনে-মনে ভেবেছি, 'এরা দুজনে যদি কখনও পরস্পরের মুখোমুখি হয় তবে ডাক্তার রডারিখ যে-ভয় পাচ্ছেন তা-ই হবে—একটা রক্তারক্তি কাণ্ড এড়ানো মুশকিল হবে—সংঘর্ষ একটা অনিবার্য!'

‘শেষে যখন সে চেঁচিয়ে এই হুমকিটা দিয়েছে,’ ডাক্তার রডারিখ বলেছেন, ‘আমি তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে ইঙ্গিত করেছি আমি তার এ-রকম কথা শুনতে আদৌ প্রস্তুত নই। বিয়ের সব কথা ঠিক হয়েছে, আর কয়েক দিনের মধ্যেই অনুষ্ঠানটা পাকাপাকিভাবে ঘ’টে যাবে।

‘ “কয়েকদিন কেন, কোনোদিনই আর ঐ অনুষ্ঠান হবে না,” ভিলহেল্ম স্টোরিৎস হুমকি দিয়েছে।

‘ “মহাশয়,” আমি তখন তাকে দরজাটা দেখিয়ে বলেছি, “অনুগ্রহ ক’রে বিদেয় হোন!” অন্য যে-কেউ হ’লে বুঝতে পারতো তার পক্ষে এই আলোচনা প্রলম্বিত করা মোটেই উচিত নয়।

‘কিন্তু ভিলহেল্ম স্টোরিৎস অন্য ধাতে গড়া, সে ব’সেই থেকেছে, আবার নামিয়ে এনেছে গলার স্বর, ভয় দেখিয়ে যা আদায় করতে পারেনি তা সে এবার বিনয় দেখিয়ে বশে আনতে চেয়েছে—অন্তত এই কথাটা আদায় করতে চেয়েছে যে মাইরা ও মার্কের বিয়ের প্রস্তাবটা বাতিল ক’রে দেয়া হয়েছে। আর-কোনো উপায় না-দেখে দরজার কাছে গিয়ে আমি ঘণ্টা বাজিয়েছি ভৃত্যদের জন্য। সে অমনি আমার হাতটা চেপে ধরেছে, আবার তার ঐ বদরাগ ফিরে এসেছে শতগুণে—আরক্ত চোখে, ধমকের সুরে, চীৎকারে—এতটাই সে চ্যাচাচ্ছিলো যে মনে হচ্ছিলো বাইরে থেকেও তা শোনা যাচ্ছে। ভাগ্যিশ আমার স্ত্রী বা কন্যা কেউই তখন বাড়ি ছিলেন না।

‘অবশেষে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস—*অগত্যা*—যেতে রাজি হ’লো, কিন্তু যাবার আগে ভয়ংকর-সব হুঁশিয়ারি দিয়ে গেলো। মাইরা যেন কিছুতেই মার্ককে বিয়ে না-করে। এমন-সমস্ত বাধাবিপত্তির উদ্ভব হবে যে অনুষ্ঠানটাই অসম্ভব হ’য়ে উঠবে। স্টোরিৎসদের এমন অনৈসর্গিক শক্তি আছে যা সমস্ত মানুষী চেষ্টাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে, আর তাকে যে-পরিবার এমন উপেক্ষা করেছে, তুচ্ছ করেছে, তার বিরুদ্ধে এই অনৈসর্গিক ক্ষমতা ব্যবহার করতে সে মোটেই দ্বিরুক্তি করবে না... তারপর সে স্টাডির দরজা হ্যাঁচকা টান দিয়ে সজোরে খুলে দাপাতে-দাপাতে চ’লে গেলো; আর আমি তার ঐ-সব দুর্বোধ হুমকিতে বিচলিত হ’য়ে হতভম্বভাবে মাথায় হাত দিয়ে ব’সে রইলুম।’

ডাক্তার রডারিখ আবারও পই-পই ক’রে আমাদের বলেছেন, এর একটা কথাও যেন ঘুণাক্ষরেও মাইরা বা মাদাম রডারিখের কানে গিয়ে না-পৌঁছোয়—মার্ক যে এর বিন্দুবিসর্গও টের পাক, তাও তাঁর ইচ্ছে নয়। তাদের অন্তত এই উদ্বেগ ও আশঙ্কা থেকে অব্যাহতি দেয়া উচিত। তাছাড়া, আমিও এটা ভালো ক’রেই জানতুম যে মার্কও কাপ্তেন হারালানের মতোই ব্যাপারটার এক্ষুনি একটা হেস্তনেস্ত ক’রে ফেলতে চাইবে, চাইবে একটা চূড়ান্ত ফয়সালা। কাপ্তেন হারালান অবশ্য তখনকার মতো তার বাবার কথা গত্যন্তর না-দেখে মেনে নিয়েছে। বলেছে, ‘বেশ, আমি গিয়ে ঐ হতভাগাটাকে কোনো সাজা দেবো না। কিন্তু ধরো সে নিজেই যদি গোল পাকাতে আমাদের কাছে আসে?... ধরো সে-ই গিয়ে যদি আচমকা মার্কের ওপর হামলা করে?... ধরো সে যদি ক্রমাগত খুঁচিয়ে-

খুঁচিয়ে আমাদের উত্ত্যক্ত ক'রেই চলে?'

না, ডাক্তার রডারিখ এ-সব অবাঞ্ছিত সম্ভাবনার কোনো উত্তরই দিতে পারেননি।

এই বিমূঢ় দশাতেই তখনকার মতো আমাদের আলোচনা শেষ হয়েছে। যা-ই ঘটুক না কেন, আমাদের শুধু অপেক্ষাই ক'রে যেতে হবে। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যদি নেহাৎই কথার কথা না-ব'লে থাকে, যদি হুমকিগুলো সত্যি-সত্যি সে কাজে খাটাতে চায়, তাহ'লে ঝুলির বেড়াল তো বেরিয়ে পড়বেই, কোনো কথাই আর ধামাচাপা থাকবে না। কিন্তু তা না-হ'লে, আমরা কেউই যদি এ-সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য না-করি, তাহ'লে কেউই কোনোদিন এই বিশ্রী অবাঞ্ছিত ব্যাপারটার কথা জানতে পারবে না। কিন্তু কীই-বা করতে পারে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস? বিয়েটা সে বন্ধ করবে কোন উপায়ে? সে কি প্রকাশ্যে সকলের সামনে মার্ককে অপমান ক'রে তাকে বাধ্য করবে দ্বন্দ্বযুদ্ধে? মাইরাকে সে কি বীর্যশুল্কা হিশেবেই মানুষের পর্যায় থেকে একেবারে নামিয়ে আনবে নিছক *পুরস্কার* বা *পণ্যে*—আবারও পিতৃতান্ত্রিক পৌরুষ হাঁকিয়ে জাঁকিয়ে বসবে এইখানে?

আর তক্ষুনি খবর এলো প্রথম দফায় কী কাণ্ড ঘটাবে তার ঐ *অপার্থিব* ক্ষমতা! পুরভবনের দেয়ালে, যেখানে মার্ক আর মাইরার বিয়ের নোটিস টাঙানো ছিলো, সেটা নাকি দিনের বেলায়, *প্রকাশ্যে*, সকলের চোখের সামনে হ্যাঁচকা টানে উপড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে কেউ। *কে-সে*? কেউ-না। কারণ সবাই যা চোখে দেখেছে, তা হ'লো: নিজে-নিজেই দেয়াল থেকে উঠে এলো কাগজটা, আর ছিঁড়ে গেলো—আপনা থেকেই, *নিজে-নিজেই*। কেননা দেয়ালের গা ঘেঁসে কোথাও কেউ তখন ছিলো না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এই প্রহেলিকা—ব্যাখ্যারও-অতীত এই-যে ব্যাপারটা ঘ'টে গেলো, কে তার ঘটক হ'তে পারে? তাতে যার নিজের স্বার্থ জড়িয়ে আছে, সে-ই তো। এই প্রথম আক্রমণের পর আরো-আক্রমণ হবে, এর চেয়েও গুরুতর, সাংঘাতিক? রডারিখ পরিবারের বিরুদ্ধে শোধ নেবার জন্যে একটানা যত-সব ভীষণ কাণ্ড ঘটানো হবে, এ তারই সূচনা নয় তো? তখন আমরা শুধু এই কথাই ভেবেছি।

পরদিন ভোরবেলায়—কাপ্তেন হারালান যখন তার বাবাকে পুরো ঘটনাটা খুলে বলেছিলো, তখন, বোঝাই যেতে পারে, তিনি কী-রকম ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠেছিলেন।

'নিশ্চয়ই ঐ বদমায়েশটার কাজ এটা,' বিষম চ'টে গিয়ে হারালান ব'লে উঠেছিলো, 'কেমন ক'রে যে কাণ্ডটা বাধিয়েছে, সেটা অবশ্য আমার মাথায় ঢুকছে না। এখানেই সে-যে থেমে থাকবে না, তা জানি—কিন্তু ফের কোনো গোল না-পাকাতে পারে, আমাকে

তারই কোনো-একটা উপায় ভেবে বার করতে হবে!'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, হারালান,' আমি বলছি, 'আর এমন-কিছুই কোরো না যা গোটা ব্যাপারটাকে আরো-গোলমেলে ক'রে তুলবে।'

'বাবা যদি, লোকটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার আগে, আমায় হুঁশিয়ার ক'রে দিতেন, কিংবা তার পরেও যদি আমাকে কিছু-একটা করবার অনুমতি দিতেন, তবে এতক্ষণে আমরা হতচ্ছাড়ার হাত থেকে নিষ্কৃত পেয়ে যেতুম।'

'আমার কিন্তু এখনও মনে হয়, হারালান, তোমার নিজের এ-ব্যাপারটায় জড়িয়ে-পড়া মোটেই ঠিক হবে না।'

'আর ও যদি জ্বালাতন করতেই থাকে?'

'তাহ'লে তখন পুলিশকে ব্যাপারটা হাতে নিতে বলতে হবে। তোমার মা-র কথা ভাবো, বোনের কথা ভাবো—'

'কী ঘটেছে, তারা কি তা আর জানতে পাবে না?'

'আমরা ওঁদের কিছুই বলবো না, মার্ককেও কিছুই জানাবো না, আগে বিয়েটা হ'য়ে যাক, তারপর দেখা যাবে কী ক'রে এর একটা সুব্যবস্থা করা যায়।'

'পরে... ?' বলেছে কাপ্তেন হারালান, 'কিন্তু তখন যদি বড্ড-বেশি দেরি হ'য়ে যায়?'

ডাক্তার রডারিখের মনের ভেতরটায় যতটাই না বিষম উদ্বেগ থেকে থাকুক, সেদিন তাঁর স্ত্রী বা কন্যার মনের ভেতর কিন্তু আসন্ন সান্ধ্য-মজলিশের কথা ছাড়া আর-কোনো ভাবনাই ছিলো না—সেই রাত্তিরেই বিয়ের চুক্তিটায় সই করা হবে। ডাক্তার অনেক লোককেই নেমন্তন্ন চিঠি পাঠিয়েছিলেন, আর এখানে, যেন কোনো নিরপেক্ষ ভূমিতেই, মাগিয়ার অভিজাত সমাজ সরকারি-সব কর্মচারীর সঙ্গেই মেশামিশি করবে, সামরিক বাহিনী, বিচারবিভাগ, পৌর দফতর—সব জায়গার লোকই থাকবে এখানে। মস্ত সব ঘর, অনায়াসেই দেড়শো অভ্যাগত ধ'রে যাবে এখানে, আর সান্ধ্য-মজলিশের পর গ্যালারিতে আয়োজন করা হবে নৈশভোজের।

মাইরা রডারিখ যে তার প্রসাধনের ব্যাপারে মশ্‌গুল হ'য়ে ছিলো, এতে নিশ্চয়ই অবাক হবার কিছু নেই, যদিও মার্ক তার সাজগোজের বহর আর বাহার দেখেই তার প্রতি আসক্ত হয়নি।

অপরাহ্ণে, প্রস্তুতি সমস্তই যখন সারা আর মহিলারা বিশ্রাম করছেন, আমি হঠাৎ একটা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে দেখে বুঝি বেশ-একটু উত্যক্তই বোধ করেছি। সে কি দৈবাৎ এখানে এসে হাজির হয়েছে? মনে তো হয় না। নদীর ধার দিয়ে হেঁটে চলেছে সে, মন্থর পায়ে, মাথাটা একটু নোয়ানো। কিন্তু যেই সে বাড়িটার উলটো দিকটায় এসে পৌঁছেছে, অমনি থমকে থেমে গিয়ে খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়েছে সে, আর তার চোখ থেকে যেন আগুন বর্ষাতে শুরু করেছে।

বেশ কয়েকবার বাড়িটার বিপরীত দিকের শানরাস্তায় এদিক-ওদিক পায়চারি করেছে

সে, শেষটায় এমনকী মাদাম রডারিখেরও নজরে প'ড়ে গিয়েছে। তিনি তাঁর স্বামীর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করেছেন, কিন্তু ডাক্তার তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, ভাবনার কিছু নেই—এই অদ্ভুত লোকটা যে সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো, সেটা তিনি ঘুণাক্ষরেও ফাঁস করেননি।

এখানে এই তথ্যটাও জুড়ে দেয়া উচিত মার্ক আর আমি যখন আমাদের হোটেলে যাবো ব'লে বেরিয়েছি, তখন একটা চকের মাথায় লোকটার সঙ্গে আমাদের দেখা হ'য়ে গেছে। মার্ককে দেখবামাত্র সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, একটু যেন দোনোমনা করেছিলো, পথের মাঝেই আমাদের সঙ্গে কোনো ঝামেলা পাকাবে কি না। কিন্তু সে অনড় দাঁড়িয়েই রইলো, নিশ্চল, মুখটা থেকে সব রং যেন শুষে নিয়েছে কেউ, হাত দুটো এমনভাবে আড়-ধরা যেন সে বিষম এক মৃগীরোগেরই শিকার—ওখানে রাস্তাতেই আচমকা দুম ক'রে প'ড়ে যাবে নাকি? তার চোখ দুটো—জ্বলজ্বলে বিস্ফারিত আগুন-ধরা চোখ দুটি—মার্ককে পারলে যেন ভস্মই ক'রে ফেলতো। মার্ক অবিশ্যি এমন ভান করেছে যেন লোকটাক সে দেখতেই পায়নি।

ভিলহেল্‌ম স্টোরিৎসকে ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে যাবার পরেই মার্ক আমাকে জিগেস করেছে : 'ঐ লোকটাকে তুমি দেখলে?'

'হ্যাঁ, মার্ক।'

'ও-ই হ'লো ভিলহেল্‌ম স্টোরিৎস, যার কথা সেদিন আমি তোমায় বলেছিলুম।'

'আমি জানি।'

'তাহ'লে একে তুমি চেনো?'

'কাপ্তেন হারালানই একে চিনিয়ে দিয়েছে—'

'আমি ভেবেছিলুম লোকটা বুঝি রাগ্‌ৎস ছেড়ে চ'লে গিয়েছে,' মার্ক বলেছে।

'দেখাই তো যাচ্ছে যে যায়নি—অথবা ক-দিনের জন্যে যদি গিয়েও থাকে, তবে আবার ফিরে এসেছে।'

'অবিশ্যি এতে কিছুই এসে-যায় না।'

'না, কী-ই বা এসে-যায়?' মুখে এ-কথা বলেছি বটে, তবু ভেতরে-ভেতরে নিশ্চয়ই ভেবেছি ভিলহেল্‌ম স্টোরিৎস এখানে না-থাকলেই বুঝি বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করা যেতো।

সন্ধে নটা নাগাদ, ডাক্তার রডারিখের বাড়ির সামনে প্রথম কোচগাড়িগুলো এসে থামলো, আর ঘরগুলো লোকের ভিড়ে সরগরম হ'য়ে উঠলো। সামরিক উর্দি আর পোশাকি বেশভূষার মাঝে চারপাশ আলো ক'রেই যেন ঝলমল করছে মহিলাদের পোশাক। অতিথিরা ঘরে বা গ্যালারিতে পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছে, ডাক্তার রডারিখের পড়ার ঘরে সাজিয়ে-রাখা ছিলো ঝকঝকে সব বিয়ের উপহার—সবাই তার তারিফ করছে, হাসি-ঠাট্টা রসিকতা চুটকি গল্প দিয়ে কেউ-কেউ আসর জমাবার চেষ্টা করছে। মস্ত বৈঠকখানাটার একটা টেবিলে সাজিয়ে-রাখা আছে *বিয়ের চুক্তিপত্র*, একটু পরেই সেটাতে স্বাক্ষর করা হবে; অন্য-একটা টেবিলে জমকালো একটা গোলাপের তোড়া আর

নারঙ্গি মুকুল—আর মাগিয়ার ঐতিহ্য অনুযায়ী, তার পাশেই, মখমলের জাজিমে, শোভা পাচ্ছে কনের মাথার মুকুট, বিয়ের দিন যখন মাইরা ক্যাথিড্রালে যাবে তখন সেটা পরবে।

ঠিক ছিলো, সন্ধের আসরটাকে তিন ভাগে ভাগ করা হবে : কনসার্ট আর বলনাচের মজলিশের মাঝখানে সম্পাদিত হবে সবচেয়ে জরুরি কাজ—চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা হবে। ত্রিগানেস-এর বিখ্যাত অর্কেস্ট্রার ওপরই সংগীত পরিবেষণের ভার পড়েছে, তাদের দলের নেতাকে নিয়ে সবশুদ্ধু জনা-বারো বাজিয়ে সেইজন্যে এখানে এসে জমায়েৎ হয়েছে।

মাগিয়ারদের সংগীতপ্রীতির কথা ইওরোপে কে না জানে, তবে মার্কের মন এই গানবাজনার দিকে ছিলো কি না সন্দেহ; সে সারাক্ষণ যেন অনিমেষ-লোচনেই তাকিয়েছিলো মাইরার দিকে। হাততালির উচ্ছ্বাস থেমে-যাবার পর বাজিয়েরা একে-একে যে যার আসন থেকে উঠতেই ডাক্তার রডারিখ আর কাপ্তেন হারালান এমন উচ্ছ্বসিতভাবে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে তারিফ করলেন যে অর্কেস্ট্রার লোকেরা যেন লজ্জাই পেলে একটু।

এর পরেই এলো *বিবাহ-চুক্তিতে* স্বাক্ষরের পালা, যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গেই সাঙ্গ হ'লো সেটা, আর তারপরে সাময়িক একটা বিরতি এলো আসরের কাজে। অতিথিরা নিজেদের আসন ছেড়ে উঠে ছোটো-ছোটো দলে ভাগ হ'য়ে আড্ডা দিচ্ছে, কেউ-কেউ গেছে আলোঝলমল বাগানটায় খোলা হাওয়ায়; পানপাত্রগুলো কখনোই আর শূন্য থাকছে না।

এতক্ষণের মধ্যে মজলিশের কোনো অনুষ্ঠানেই কোনো ঝামেলা হয়নি। যেমন হর্ষ ও আনন্দে তার সূচনা হয়েছে তেমনি হর্ষ ও আনন্দেই তার কেন সমাপ্তি হবে না, তার কোনো কারণ আমি অন্তত দেখিনি। সত্যি-বলতে, আগে মনের মধ্যে একটা কাঁটা যদি খচখচ ক'রেও থাকে, এখন কিন্তু আমি রীতিমতো আশ্বস্তই বোধ করছিলুম—স্বস্তিও। কাজেই অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্যে মাদাম রডারিখকে অভিনন্দন জানাতে আমার ভুল হয়নি।

মানুষের স্মৃতি ব্যাপারটা ভারি রহস্যময়, ঠিক যেন একটা ধাঁধার মতো। কোথায় কখন কী কথার অনুষঙ্গে কোন কথা মনে প'ড়ে যায়, কে বলবে। কেন-যে হঠাৎ ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর কথাই আমার মনে হানা দিচ্ছে, জানি না। তবে এও জানি, এই স্মৃতিও মন থেকে একদিন উধাও হ'য়ে যাবে।

অর্কেস্ট্রা আবার তৈরি হ'য়ে আছে, কাপ্তেন হারালানের কাছ থেকে ইঙ্গিত পাবামাত্র তারা ফের বাজানো শুরু ক'রে দেবে। কিন্তু গ্যালারির দিকে, যেখানে বাগানের দিকে দরজা খুলে গেছে, সেখান থেকে কার একটা গলা ভেসে এলো। আওয়াজটা এখনও বেশ দূরে, কিন্তু বড্ড যেন রূঢ়, রুক্ষ আর কর্কশ, আর উৎকট একটা গানের সুরে বেজে উঠেছে গলাটা, কিম্ভূত তার লয়, বিদঘুটে তার ছন্দ, গলায় সুরের লেশমাত্র চিহ্ন নেই, বেতালা, বেসুরো, অদ্ভুত একটা গান।

প্রথম ভাল্‌জ নাচের জন্যে যে-যুগলরা প্রায় পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলো তারা কেমন

যেন থমকে গিয়েছে... উৎকর্ণ হ'য়ে গানটা শুনছে তারা—সান্ধ্য আসরের অংশ হিশেবেই কি এই চমকটার ব্যবস্থা করা হয়েছে?

কাপ্তেন হারালান আমার দিকে এগিয়ে এলো।

'কী এটা?' আমি জিগেস করলুম।

'জানি না,' এমন-একটা সুরে সে উত্তর দিলে যার মধ্যে উদ্বেগের ভাবটা স্পষ্ট।

'কোত্থেকে আসছে গানটা? রাস্তা থেকে?'

'উঁহু... সে-রকম তো মনে হচ্ছে না।'

সত্যিই, অমন উৎকট বেসুরো গানটা যে গাইছে সে যেন বাগান থেকে ক্রমেই গ্যালারির দিকে এগিয়ে আসছে—প্রায় যেন ঢুকেই পড়েছে ভেতরে, বলা যায়!

কাপ্তেন হারালান আমার হাতটা চেপে ধ'রে আমাকে বাগানে যাবার দরজাটার দিকে টেনে নিয়ে গেলো। আমি বুঝি একটু আঁৎকে গিয়েই তার অনুসরণ করেছি, বাগানটা আলোয় ঝলমল করছে, এখান থেকে সম্ভবত পুরো বাগানটাকেই আমরা দেখতে পাবো...

কিন্তু কাউকেই আমরা দেখতে পাইনি।

ততক্ষণে ডাক্তার ও মাদাম রডারিখও আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, ডাক্তার রডারিখ নিচু গলায় কী যেন বলেছেন তাঁর ছেলেকে, আর সে শুধু ঘাড় নেড়েই তার উত্তর দিয়েছে।

অথচ সেই উৎকট বেতালা গানটা কিন্তু এখনও শোনা যাচ্ছে—কেউ যেন গলা ছেড়ে গান গাইছে, আর শুধু তা-ই নয়, গানটা যেন ক্রমেই এগিয়ে আসছে কাছে...

মার্কও, মাইরার হাতে ধ'রে, গ্যালারিতে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে; মাদাম রডারিখ ফিরে গেছেন অন্য মহিলাদের মধ্যে—তাঁরা ঘাবড়ে গিয়ে নানারকম প্রশ্ন করছেন, কিন্তু মাদাম রডারিখ তার কোনো জবাব দেবেন কী, তিনি নিজেই তো জানেন না এই অদ্ভুত হেঁড়েগলার গানটি কার অবদান।

'আমি গিয়ে দেখছি কী ব্যাপার!' ব'লে, কাপ্তেন হারালান সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো। আর তার পেছন-পেছন গেলেন স্বয়ং ডাক্তার রডারিখ, তাঁর কয়েকজন ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে। কৌতূহলী হ'য়ে আমিও তাঁদের পেছন-পেছন গেলুম।

আচমকাই, যখন মনে হচ্ছে, এই গায়ক গ্যালারিটা থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে আছে, তখন গানটা থেমে গেলো।

আমরা বাগানে গিয়ে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখলুম। সবখানেই আলো জ্বলছে, কোথাও এমন-কোনো কোণা নেই যেটা ঝাপসা অন্ধকারে বা ছায়ায় ঢাকা—খুঁজতেও আমরা কোনো কোণা বাকি রাখিনি, অথচ তবু কাউকেই আমাদের চোখে পড়লো না...

এই হেঁড়ে গলাটা তবে কার? বুলভার তেকেলির সেই ভবঘুরে গায়কটির?

সেটা সম্ভব ব'লে মনে হ'লো না, তাছাড়া দেখতে পেলুম বুলভারটিও সম্পূর্ণ জনশূন্য প'ড়ে আছে।

শুধু একটা আলো জ্বলছে, বামদিকে, পাঁচশো গজ দূরে, অতদূর থেকে সেই মিটমিটে আলোটা স্পষ্ট দেখাই যায় না। আলোটা এসে পড়েছে কোন-এক জানলা থেকে

—ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর বাড়ির মিনার থেকে।

গ্যালারিতে যখন ফিরে গেলুম, তখন অভ্যাগতদের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে আমরা শুধু অর্কেস্ট্রাকে আবার ভাল্‌জের বাজনা শুরু ক'রে দিতেই বলতে পেরেছি। কাপ্তেন হারালান অর্কেস্ট্রাকে ইঙ্গিত করতেই আবার যুগলেরা সবাই নাচের জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়ালে।

'কী?' মাইরা আমায় হেসে জিগেস করলে, 'আপনার নাচের সঙ্গিনী বেছে নেননি এখনও?'

'আমার সঙ্গিনী? সে-তো মাদমোয়াজেল আপনিই হবেন—তবে সে শুধু দ্বিতীয় ভাল্‌জটার জন্যে।'

'তা'হলে, অঁরি,' মার্ক বললে, 'আমরা তোমাকে বেশিক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবো না।'

মার্ক কিন্তু ভুল বলেছিলো। মাইরা আমার সঙ্গে যে-ভাল্‌জটা নাচবে ব'লে কথা দিয়েছিলো, তার জন্যে আমায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। সত্যি-বলতে, আমি এখনও সেই নাচটার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছি।

অর্কেস্ট্রা তখন শুধু তার ভনিতা শেষ করেছে, আর অমনি, গায়ককে কেউ এবারও দেখতে পায়নি, হেঁড়েগলার গানটা বাজনা ছাপিয়ে বেসুর জাগিয়ে দিলে—এবারে বৈঠকখানাটির ঠিক মাঝখান থেকেই উঠলো আওয়াজ।

অতিথিরা শুধু আঁৎকেই ওঠেনি, সেইসঙ্গে তাদের পুরো ব্যাপারটাই জঘন্য লেগেছে। হেঁড়ে গলা ঘর ফাটিয়ে গেয়ে চলেছে ফ্রেডারিক মারগ্রাডে-র *ঘৃণাবিদ্বেষের স্তব*, সেই আলেমান স্তোত্রগান, হিংসা ও হিংস্রতা ছড়ায় ব'লে সবখানেই যার জঘন্য কুখ্যাতি। মাগিয়ার স্বদেশপ্রেমের প্রতি ইচ্ছে ক'রে, সরাসারি, কেউ কুৎসিত কটাক্ষ করছে—না, কটাক্ষমাত্র নয়, তাকে অপমানই করছে।

অথচ যার ঐ হেঁড়ে গলা গাঁক-গাঁক ক'রে উঠেছে বৈঠকখানার ঠিক মাঝখানটায় কেউই তাকে দেখতে পাচ্ছে না... নিশ্চয়ই সে এখানে আছে, সকলের মাঝখানে, *অথচ* কেউ তার শ্রীমুখটিকে দেখতে পাচ্ছে না...

নাচিয়েরা সবাই বৈঠকখানার বিভিন্ন প্রান্তে ছিটকে ছড়িয়ে গেছে, গ্যালারিতেও গেছে অনেকে, আর কেমন-একটা গা-শিরশির-করা ভয় ছড়িয়ে পড়ছে সবখানে, বিশেষত মহিলাদের মধ্যে।

কাপ্তেন হারালান ছুটে গেলো ড্রয়িংরুমটার এদিক থেকে ওদিক, তার চোখ দুটি থেকে আগুন ঝরছে, যে-লোকটাকে চর্মচক্ষু দেখতে পারছে না, পেলেই তাকে পাকড়ে ধরবে সজোরে, এমনিভাবে বাড়ানো তার হাত দুটি। আর সেই মুহূর্তেই শোনা গেলো *ঘৃণাবিদ্বেষের স্তব*-এর শেষ স্বরগুলো, তারপরেই গলাটা আবার মিলিয়ে গেলো।

আর তারপরেই আমি দেখতে পেয়েছি—হ্যাঁ, অন্তত আরো একশোজন আমার সঙ্গে দেখতে পেয়েছে আমি তখন যা দেখেছি—আর আমার মতোই তারাও কেউ নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে চায়নি।

টেবিলের ওপর গোলাপের যে-তোড়া ছিলো সারা ঘরটায় রঙ জ্বালিয়ে, হঠাৎ সেটা কুটি-কুটি ক'রে ছিঁড়ে ছড়িয়ে গেলো মেঝেয়, অদৃশ্য কার দাপাদাপি-করা পায়ের তলায় সেগুলো থেঁৎলে গেলো... ঐ-যে, মেঝের ওপর ছড়িয়ে আছে—কুটি-কুটি-করা—*বিয়ের চুক্তিপত্রটা!*

এবার আতঙ্কই নেমে এলো সকলের মধ্যে, যেন কোনো বিভীষিকা দেখে সকলেরই চোখ বিস্ফারিত। এ-রকম অপার্থিব ভুতুড়ে জিনিশ দেখে সবাই স্তম্ভিত, সন্ত্রস্ত, সকলেই যেন প্রাণ হাতে নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে। আমি বুঝি তখন নিজেকে বারে-বারে জিগেস করছি : আমার মাথা ঠিক আছে তো, আমি পাগল হ'য়ে যাচ্ছি না তো, এই প্রহেলিকা কি তবে এই বিজ্ঞানের যুগেও বিশ্বাস করতে হবে!

কাপ্তেন হারালান এসে সদ্য তখন আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। রাগে তার মুখ যেন রক্তশূন্য! অস্ফুট স্বরে সে বলেছে : 'এ সেই হতভাগাই—ভিলহেল্ম স্টোরিৎস!'

ভিলহেল্ম স্টোরিৎস!... হারালান পাগল হ'য়ে যায়নি তো?

তবে সে যদি পাগল না-হ'য়ে গিয়ে থাকে, আমার যে শিগগিরই মাথাখারাপ হ'য়ে যাবে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই! জেগে আছি আমি, কোনো আবেশ *নেই* তন্দ্রার. অথচ আমি তখন দেখতে পেয়েছি, হ্যাঁ, *আমার নিজের চোখেই আমি দেখেছি*, সেই মুহূর্তে, বিয়ের মুকুটটা মখমলের জাজিমের ওপর থেকে নিজে-থেকেই-যেন শূন্যে উঠে যাচ্ছে! কোন হাত যে সেটা উঠিয়েছে টেবিল থেকে, তা আমরা কেউই দেখিনি, কিন্তু আমাদের ফ্যালফ্যাল চোখের সামনেই সেটা ড্রয়িংরুম পেরিয়ে গিয়ে, গ্যালারির মধ্য দিয়ে, বাগানে চ'লে গেলো—আর তারপরেই সেটা, *বেমালুম*, অদৃশ্য হ'য়ে গেলো!

'এ-যে ভীষণ ব্যাপার!'... অস্ফুট স্বরে ব'লে উঠেছে কাপ্তেন হারালান।

ড্রয়িংরুম থেকে সে তখন তীরের মতো ছুটে বেরিয়েছে, গিয়ে নেমেছে বুলভার তেকেলিতে! আমিও তক্ষুনি তার পেছন-পেছন ছুটেছি।

একজনের পেছনে আরেকজন, আমরা হুড়মুড় ক'রে ছুটে গিয়েছি ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর বাড়িতে। উঁচুতে, মিনারের শুধু-একটা-মাত্র জানলা তখনও মিটমিট ক'রে জ্বলছে অন্ধকারে। হারালান ফটকের হাতলটা ধ'রে তখন সজোরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। আমার ওপরও কী-যে ভর করেছে, জানি না, আমিও তার সঙ্গে সেই হাতল ধ'রে তারই সঙ্গে প্রাণপণে টান দিয়েছি। নিরেট, ভারি পাল্লা সেই ফটকের, দুজনে মিলেও তাকে একফোঁটাও নড়াতে পারিনি। কয়েক মুহূর্ত ধ'রে শুধু প্রাণপণেই টেনেই গেছি আমরা হাতল। রাগে আমরা বোধহয় তখন সব চেৎভেদ হারিয়ে ফেলেছিলুম...

হঠাৎ ফটকের পাল্লাটা তার কব্জার উপর সশব্দে ন'ড়ে উঠেছে...

ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে অভিযুক্ত ক'রে কাপ্তেন হারালান স্পষ্টই একটা মস্ত ভুল ক'রে বসেছিলো... ভিলহেল্ম স্টোরিৎস ককখনো বাড়ি ছেড়ে বেরোয়নি সন্ধেবেলায়, কারণ ফটকের পাল্লা দুটি খুলে আমাদের সামনে এসে এখন যে দাঁড়িয়েছে সে খোদ ভিলহেল্ম স্টোরিৎসই, সশরীরে, জলজ্যান্ত, তর্কাতীত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরদিন ভোরবেলাতেই এ-সব ঘটনার সত্য-মিথ্যা বিবরণ দাবানলের মতো গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিলো। প্রথমত, লোকে যে এ-সব ঘটনাটাকে স্বাভাবিক ব'লে মেনে নেবে না, এটা তো জানা কথাই ছিলো। অথচ স্বাভাবিক যদি না-হয়, তবে কী ? বুদ্ধিতে এর কোনো ব্যাখ্যা চলে না—অন্তত এখনও এর কোনো ব্যাখ্যা কারু জানা নেই। তবে কি অতিপ্রাকৃত-কিছু ? অলৌকিক ?

সন্ধের মজলিশ তো তার পরেই ভণ্ডুল হ'য়ে গিয়েছিলো। সব ভেস্তে যাওয়ায় মার্ক আর মাইরাও বিষম বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলো। তাদের ফুলের তোড়া কেউ দাপাদাপি ক'রে থেৎলে দিয়েছে পায়ের তলায়, ছিঁড়ে কুটি-কুটি করেছে বিয়ের চুক্তি, এমনকী সকলের ফ্যালফ্যাল চোখের সামনে দিয়ে চুরি হ'য়ে গেছে কনের মুকুট!... বিয়ের ঠিক আগেই, এ-কী অলুক্ষুণে কাণ্ড!

দিনের বেলায় দলে-দলে লোক ভিড় ক'রে এসেছে বাড়ির সামনে, উত্তেজিতভাবে কত-কী বলাবলি করেছে। কারু-কারু মুখে তো উড়ো-খইয়ের মতো তুলকালাম সব অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা ফুটেছে, কেউ-কেউ শুধু ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে দেখেছে বাড়িটা। হানাবাড়ি নাকি ?

রোজ যেমন সকালবেলায় বেড়াতে বেরোন, তেমনিভাবে মাদাম বা মাদমোয়াজেল রডারিখ আজ আর বেড়াতে বেরোননি। মাইরা সারাক্ষণ তার মায়ের সঙ্গে-সঙ্গে থেকেছে ছায়ার মতো, পুরো ব্যাপারটায় বিষম ঘাবড়েই গিয়েছে সে, তার নিশ্চয়ই পরিপূর্ণ বিশ্রাম দরকার।

আটটার সময় মার্ক আমার ঘরের দরজা খুলে ঢুকেছে, সঙ্গে তার ডাক্তার রডারিখ আর কাপ্তেন হারালান। সব ভালো ক'রে আলোচনা ক'রে নিতে হবে আমাদের, জরুরি কী-ব্যবস্থা করা যায় সে-বিষয়টা ঠিক ক'রে নিতে হবে। ভালো হয়, যদি সেই আলোচনাসভা রডারিখভবনে না-বসে। সারা রাত মার্ক আর আমি একসঙ্গে থেকেছি, শুধু দিন ফোটবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে বেরিয়ে পড়েছে মাদাম রডারিখ আর তার ভাবী বধুর খবর নিতে। তারপর, তারই পরামর্শে, ডাক্তার তাঁর ছেলেকে নিয়ে এখানে চ'লে এসেছেন।

'অঁরি,' মার্ক শুরু করেছে, 'আমি ব'লে দিয়েছি, কাউকে যেন এ-ঘরে ঢুকতে না-দেয়, এখানে কেউ আমাদের কথাবার্তা শুনতে পাবে না, আমরা ছাড়া ঘরে আর-কেউ নেই—*কেউই নেই!*' কিন্তু এ-কী দশা হয়েছে মার্কের! আগের দিন সন্ধেবেলায় যে-মুখটা ছিলো হর্ষোজ্জ্বল, সুখী, এখন সেই মুখই কেমন যেন ঝুলে পড়েছে, রক্তহীন, ফ্যাকাশে, তবে এমন অবস্থায় সকলেই যেমন ঘাবড়ে গিয়েছে, তার চেয়ে বেশিকিছু তার হয়নি সম্ভবত।

ডাক্তার রডারিখ প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে যাচ্ছেন, যাতে তাঁর সংযমের বাঁধ ভেঙে না-পড়ে। তাঁর ছেলের অবস্থা অবশ্য ঠিক তাঁর উলটোই, *ঠোঁট* চাপা, চোখ দুটো রক্তবর্ণ, উত্তেজিত; সে-যে কী-রকম ঘোরের মধ্যে আছে, তার মুখচোখ দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে।

মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে—নিজেকে আমি সারাক্ষণ পই-পই ক'রে বুঝিয়েছি। তাছাড়া আমাকে তো প্রথমে মাদাম রডারিখ ও তাঁর মেয়ের কুশল জেনে নিতে হবে।

'কাল যা কাণ্ড হয়েছে, তাতে দুজনেই ভারি বিচলিত হ'য়ে পড়েছেন,' ডাক্তার আমার প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছেন, 'তাঁদের সেরে উঠতে কয়েকদিন লেগে যাবে। তবে মাইরা—গোড়ায় সে ভারি ঘাবড়েই গিয়েছিলো—এখন সামলে ওঠবার চেষ্টা করছে, মাকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করছে—তিনি তো তার চাইতেও বেশি মুষড়ে পড়েছেন। আশা করি কাল সন্ধ্যাবেলাকার স্মৃতি শিগগিরই তাঁর মন থেকে মুছে যাবে—যদি-না অবশ্য আবার ও-রকম জঘন্য কোনো কেলেঙ্কারি হয়...'

'আবার কোনো কেলেঙ্কারি?' আমি জিগেস করেছি, 'তার কোনো ভয় নেই আমাদের, যে-অবস্থায় অমন বিদঘুটে কাণ্ডটা হয়েছে—বিদঘুটে বা উৎকট ছাড়া আর কী-ই বা বলবো একে—সে-রকম কোনো পরিস্থিতি আর হবে না।'

'কে জানে?' ডাক্তার রডারিখ বুঝি কিছুতেই আশ্বস্ত হ'তে পারেননি। 'কে জানে? বিয়েটা এখন ভালোয়-ভালোয় হ'য়ে গেলেই বাঁচি। এখন আর আমি ও-সব হুমকিকে অবিশ্বাস করতে পারছি না...'

পুরো বাক্যটা তিনি শেষ করতে চাননি, কিন্তু আসলে তিনি কী বোঝাতে চাচ্ছিলেন, কাপ্তেন হারালান এবং আমার তা মোটেই অগোচর থাকেনি। মার্ক যেহেতু ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর শেষ অপকীর্তির কোনো খবর রাখে না, সে তাই ঐ হুমকির কথাটা ঠিক ধরতে পারেনি।

কাপ্তেন হারালানের একটা নিজস্ব মত ছিলো, তবে সে টু শব্দটি না-ক'রে চুপচাপ থেকেছে, সম্ভবত জানতে চাচ্ছে গত রাতের কাণ্ডটা সম্বন্ধে আমি সত্যি-সত্যি কী ভাবছি।

'মঁসিয় ভিদাল,' ডাক্তার জিগেস করেছেন, 'এ-সব অদ্ভুত কাণ্ড দেখে আপনার কী মনে হচ্ছে?'

আমার মনে হয়েছে আমি যদি কোনো অবিশ্বাসীর ভূমিকায় অভিনয় করি, তাহ'লেই ভালো করবো : কাল রাতে যে-সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে, তাদের ওপর তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়তো ঠিক হবে না। আপাতত কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না ব'লেই যে ওদের ভুতুড়ে বা অতিপ্রাকৃত ব'লে ভাবতে হবে, এমন মাথার দিব্বি কে দিয়েছে। তবু, এখানে চুপি-চুপি কবুল করি, ডাক্তার রডারিখের প্রশ্নটা আমায় ভারি অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে দিয়েছিলো।

'ডাক্তার রডারিখ,' আমি শুধু বলেছি, 'আমার মনে হয় ও-সব ব্যাপারকে খুব-একটা পাত্তা না-দিলেও চলবে। কারু কোনো রসিকতা, কোনো *প্র্যাকটিক্যাল* জোক, এছাড়া আর এদের নিয়ে কী ভাববো, বলুন। আপনার অতিথিদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন-

কেউ ছিলো যে নানারকম হাতসাফাইয়ের খেলা দেখায়, কোনো *ম্যাজিশিয়ান*, আর কোনো ওস্তাদ হরবোলা, সন্ধের মজলিশটা সে তার নিজের কারদানি দেখিয়ে জমাতে চেয়েছিলো... আপনি তো জানেনই এ-সব জাদুবিদ্যায় আজকাল কত লোক ওস্তাদ হ'য়ে উঠেছে... তবে তার রুচিটা অবশ্য একটু উৎকট গোছের ছিলো, এটা মানতেই হয়...'

কাপ্তেন হারালান আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনিমেষ-লোচনে শুধু আমাকে নিরীক্ষণই করেছে তখন, যেন বুঝতে চেয়েছে, মুখে যা-ই কেন না-বলি, ভেতরে-ভেতরে আমি সত্যি কী ভাবছি। তার দৃষ্টিটা যেন এই কথা বলতে চেয়েছে : 'আমরা কিন্তু এ-সব উটকো ছেঁদো কথা শুনতে আসিনি!'

'তার মানে, মঁসিয় ভিদাল,' ডাক্তার ব'লে উঠেছেন, 'কাল যা হয়েছে, তা আসলে ছিলো কারু ম্যাজিকের খেলা...'

'ডাক্তার রডারিখ,' আমি তাঁকে থামিয়ে দিয়েই বলেছি, 'এই ব্যাখ্যাটা বিশ্বাস না-করলে বলতে হয় কাল যা ঘটেছিলো তা কোনো অতিপ্রাকৃত ঘটনা—কিন্তু সেটা আমি আদপেই মানতে রাজি নই...'

'অতিপ্রাকৃত বা অনৈসর্গিক নয়,' এতক্ষণে কথার মাঝখানে ঢুকেছে কাপ্তেন হারালান, 'স্বাভাবিক কোনো ব্যাপারই ছিলো—তবে কীভাবে কেউ এ-সব কাজ হাঁসিল করেছে, সেই পদ্ধতিগুলোই শুধু আমাদের জানা নেই।'

আমি আবারও জোর দিয়ে বলেছি, 'কাল যার গলা আমরা শুনেছি, সেটা মানুষেরই গলা। আর তা যদি হয়, তবে তা যদি কোনো হরবোলার বদ রসিকতার নিদর্শন না-হয়, তবে কী?'

ডাক্তার রডারিখ তখন এমনভাবে মাথা নেড়েছেন যেন এমন ব্যাখ্যা তার কিছুতেই মনঃপূত হচ্ছে না।

তখন, তর্কের খাতিরে, আমি আবারও বলেছি, 'এত অতিথির মধ্যে কোনো উটকো লোক যে ঢুকে পড়েনি, তা-ই বা কে বলবে? সে সম্ভবত ড্রয়িংরুমে গিয়ে তার হরবোলার খেল দেখিয়ে *ঘৃণাবিদ্বেষের স্তবটা* গেয়ে মাগিয়ারদের জাতীয়তাবোধকেই ঘা দিতে চেয়েছিলো। সম্ভবত লোকটা আলেমান—বা তা যদি নাও হয়, তাদেরই পোষা কোনো চর!'

যদি আমরা ব্যাপারটাকে অমানুষিক-কিছু ব'লে না-ভাবি, তাহ'লে এই অনুমানটাকে অবিশ্বাস করার বা সত্য ব'লে না-মানার কোনো কারণ নেই। ডাক্তার রডারিখ এ-সম্ভাবনাটাকে উড়িয়ে না-দিলেও খুব সহজ একটা সত্য কথা বলেছেন :

'আপনার কথাটাকেই যদি মেনে নিই, মঁসিয় ভিদাল, যে কোনো হরবোলা—বা কোনো উদ্ধত আলেমান চরই—*অনামন্ত্রিত* ড্রয়িংরুমে ঢুকে প'ড়ে আমাদর তার কারদানি দেখিয়ে ভড়কে দিতে চেয়েছিলো—আমার অবশ্য এ-কথায় আদৌ কোনো সায় নেই—তবে ঐ ফুলের তোড়া মাড়িয়ে থেঁৎলে দেয়া, বিয়ের চুক্তিপত্রটা কুচি-কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলা বা অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে ঐ বিয়ের মুকুট নিয়ে কেটে পড়া—এদের আপনি কী

ক'রে ব্যাখ্যা করবেন ?'

ঠিকই, যত-বড়ো জাদুগরই হোক না কেন, কেউ কিছু টের পেলে না, আর সে দিব্বি সকলর চোখে ধুলো দিয়ে এ-সব অপকীর্তি ক'রে গেলো, এটা অবশ্য মানতে মন চায় না। অথচ আছে তো নিশ্চয়ই দুর্দান্ত সব জাদুগর, অদ্ভুতকর্মা ম্যাজিশিয়ান!

কাপ্তেন হারালান তখন আমায় খুঁচিয়েছে, 'কী, কিছু বলছেন না কেন, মঁসিয় ভিদাল। ফুলের তোড়াটা যে ছিঁড়েছে, বিয়ের চুক্তিপত্রটা যে কুচি-কুচি করেছে, বিয়ের মুকুটটা তুলে নিয়ে ড্রয়িংরুম থেকে চোরের মতো যে কেটে পড়েছে, সে কেমনতর হরবোলা —আর এ-সবই বা কেমনতর *প্র্যাকটিক্যাল জোক* ?'

আমি এ-কথার কোনো উত্তর দিইনি।

কাপ্তেন হারালান কেমন তেতে উঠেই বলেছে, 'আপনি কি আমাদের এটাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে আমরা সবাই কোনো বেঘোরবিভ্রমের শিকার হয়েছি—পুরোটাই ছিলো সমবেত *অলীকদর্শন*!'

'উঁহু, তা নিশ্চয়ই নয়, কোনো বেঘোরবিভ্রমই নয়—একশোরও বেশি লোক সবকিছু নিজেদের চোখে দেখেছে—এমন সমবেত বিভ্রম ঠিক স্বাভাবিক নয়।'

আমাকে কোনো উচ্চবাচ্য করতে না-দেখে ডাক্তার রডারিখই তারপর নিজের মত দিয়েছেন : 'যা যেমনভাবে ঘটেছে, তাকে তেমনভাবেই আমাদের মেনে নেয়া উচিত। নিজেদের যেন আমরা ঠকাবার চেষ্টা না-করি। এমন-সব জিনিশ ঘটেছে এখনও যার কোনো স্বাভাবিক ব্যাখ্যা আমাদের হাতে নেই—অথচ এগুলো যে ঘটেছে তাও আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছি না। তবে, আমরা যদি মূল প্রসঙ্গটা থেকে দূরে স'রে যেতে না-চাই, তাহ'লে আমাদের মানতেই হবে যে এ কারু ঠাট্টাইয়ার্কি ছিলো না, বরং শত্রুর কাজ, নেহাৎই কোনো দুশমনের অপকীর্তি, যে সারা সন্ধ্যার উৎসবটাকে ভেস্তে দিয়ে আমাদের ওপর শোধ নিতে চাচ্ছিলো!'

'দুশমন!' এতক্ষণে মার্কের বিস্ময় আরো বহুগুণ চ'ড়ে গিয়েছে। 'আপনার দুশমন? আমার? আপনি তাকে চেনেন?'

'হ্যাঁ,' এবার কাপ্তেন হারালান ঝুলি থেকে বেড়ালটাকে বার ক'রে দিয়েছে, 'হ্যাঁ, মার্ক। এ সেই পাজিটা যে তোমার আগে আমার বোনকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো।'

'ভিলহেল্ম স্টোরিৎস ?'

'*ভিলহেল্ম স্টোরিৎস*!'

মার্ক যা জানতো না, এবার তাকে তা-ই খুলে বলা হয়েছে। কয়েকদিন আগে আবার সে-যে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলো, তার কথা বিশদভাবে খুলে বলেছেন ডাক্তার রডারিখ। তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায়, সে যে-সব হুমকি দিয়েছিলো, তার কথাও বলতে হয়েছে ডাক্তার রডারিখকে। কেননা, কাল সন্ধেবেলায় যে-সব বেয়াড়া ব্যাপার ঘটেছে, তার জন্যে যদি কাউকে দায়ী করতে হয়, তবে তার ওপরেই যে সব সন্দেহ এসে বর্তায়, এটা এর পর আর এড়িয়ে-যাওয়া যায়নি।

'আর আপনারা আমাকে এর একটি কথাও ঘুণাক্ষরেও জানাননি!' মার্ক বেশ তেতেই উঠেছে। 'শুধু আজ আমাকে কথাটা বলছেন, যখন কি না মাইরার জীবন বিপন্ন, তাকে শাসিয়ে গেছে পাজি লোকটা!... বেশ, এই ভিলহেল্ম স্টোরিৎস, আমি তাকে দেখে নেবো—তাকে ঢুঁড়ে বার করবো আমি, তারপর—'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কাপ্তেন হারালান বলেছে, 'তার ভার তুমি আমাদের ওপর ছেড়ে দিতে পারো, মার্ক। সে গিয়ে তো আমাদের বাড়িই কলুষিত ক'রে এসেছে, আমাদেরই উচিত তার দূষিত—'

মার্ক নিজেকে আর সামলাতে পারেনি। 'কিন্তু সে অপমান করেছে আমারই বাগ্‌দত্তাকে!'

রাগ বোধহয় দুজনকেই অন্ধ ক'রে ফেলেছিলো। ঐ ভিলহেল্ম স্টোরিৎস আসলে রডারিখ পরিবারের ওপরই শোধ নিতে চেয়েছে, চেয়েছে তাদের ওপর নির্মম কোনো প্রতিশোধ নেবে। আচ্ছা, তর্কের খাতিরে এতটুকু না-হয় মানা গেলো। কিন্তু কালকের ঐ ঘটনায় যে তারই হাত আছে, সে-যে ব্যক্তিগতভাবে ব্যাপারটার সঙ্গে জড়ানো, সেটা প্রমাণ করা একেবারেই অসম্ভব। আমরা তো শুধু আর নিছক অনুমানের ওপর নির্ভর ক'রে কোনো নালিশ করতে পারি না, বলতে পারি না: 'ওহে স্টোরিৎস, কাল সন্ধেবেলা *তুমিও* অতিথিদের ভিড়ের মধ্যে ছিলে। তুমিই *ঘৃণাবিদ্বেষের স্তবটা* গেয়ে আমাদের সবাইকে অপমান করেছো। তুমিই ছিঁড়ে ফেলেছো ফুলের তোড়া আর বিয়ের কাগজ। তুমিই চুরি ক'রে নিয়ে গেছো ঐ বিয়ের মুকুট!' কেউই তাকে চোখে দ্যাখেনি, কেউ না!

তাছাড়া, আমরা কি গিয়ে নিজের চোখেই দেখে আসিনি যে সে তার বাড়িতেই ছিলো সে-রাতে? এটা ঠিক যে আমরা যখন ফটকের দরজাটা নিয়ে ঠেলাঠেলি করছি, সে তখন বড্ড বেশি সময় নিয়েছিলো, রডারিখ-ভবন থেকে চ'লে আসবার পক্ষে সে সময় যথেষ্টই ছিলো, কিন্তু কাপ্তেন হারালান বা আমি কেউই তাকে দেখতে পেলুম না—অথচ সে দিব্বি *আমাদের সামনে দিয়ে* ফিরে এলো!

এর সব কথাই আমি তখন খুঁটিয়ে বলেছি তাদের, চেঁচিয়েও উঠেছি একবার, বলেছি, মার্ক আর হারালানের উচিত আমার কথা মন দিয়ে শোনা—ডাক্তার রডারিখ অবশ্য আমার যুক্তির সারবত্তা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। আমার চোটপাট সত্ত্বেও মার্ক বা হারালান—কেউই তখন আমার কথা শুনতে চায়নি, তারা তক্ষুনি বুলভার তেকেলিতে সরাসরি ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর বাড়ি চ'লে যেতে চেয়েছে।

তবে শেষটায়, অনেক তর্কাতর্কির পর, আমরা মোটামুটিভাবে—সম্ভবত একমাত্র—তথ্যযুক্তিওলা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পেরেছি। আমি তাদের বাৎলেছি: 'আমাদের বরং টাউনহলে চ'লে-যাওয়া উচিত এখন। পুলিশের বড়োকর্তাকে সব খুঁটিনাটি জানিয়ে বুঝিয়ে বলা উচিত, এ-যাবৎ কী-কী ঘটেছে। রডারিখ পরিবারের সঙ্গে এই আলেমানটির কী সম্বন্ধ, সেটাও খোলশা ক'রে জানানো উচিত, বলা উচিত মার্ক আর তার বাগ্‌দত্তাকে

সে কীভাবে শাসিয়েছে। সে এমন-সব পদ্ধতি ব্যবহার করবে ব'লে হুমকি দিয়েছে যা নাকি সমস্ত মানুষী শক্তিকে অগ্রাহ্য করতে পারবে—নিছকই গালভরা বুলি নিশ্চয়ই সে-সব—তবু সে-যে এ-সব কথা ব'লে শাসিয়েছে, এটা পুলিশের জানা উচিত। এরপর পুলিশের বড়োকর্তাই ঠিক করবেন, তিনি এই আলেমানটি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেবেন কি না।'

এই পরিস্থিতিতে, আমাদের পক্ষে এটাই কি সবচেয়ে ভালো কাজ হবে না? সাধারণ কোনো নাগরিকের চাইতে পুলিশ অনেক-বেশি ক্ষমতা ধরে। কাপ্তেন হারালান আর মার্ক ভিদাল গিয়ে যদি তার বাড়ির ফটকে ঘা মারে, তবে সে-দরজা খোলা না-খোলা সম্পূর্ণ তার খামখেয়ালের ওপর নির্ভর করবে। সে-যদি দরজা না-খোলে, তবে কি জোর ক'রে ঢুকে পড়বে ভেতরে? কোন অধিকারে? সেটা কি তাদের পক্ষে *অনধিকার প্রবেশ* হবে না? অথচ পুলিশ কিন্তু ইচ্ছে করলেই, পরোয়ানা নিয়ে গিয়ে, জোর ক'রে ভেতরে ঢুকে পড়বে। তাহ'লে কি আমাদের পক্ষে এখন মুশকিল আসানের জন্যে পুলিশের সাহায্য নেয়াই ঠিক হবে না?

শেষটায়, সবাই এ-কথা মেনে নেবার পর ঠিক হয়েছে, মার্কের এক্ষুনি রডারিখভবনে ফিরে-যাওয়া উচিত, আর ডাক্তার রডারিখ, কাপ্তেন হারালান আর আমি—আমরা তিনজনে যাবো টাউনহলে।

তখন সাড়ে-দশটা বেজে গিয়েছে। সারা রাগৎস ততক্ষণে আগের রাতের হট্টগোলের কথা জেনে গিয়েছে। ফলে লোকে যখন দেখেছে ডাক্তার তাঁর ছেলেকে নিয়ে হন্তদন্তভাবে টাউনহলের দিকে চলেছেন, তখন তারা অনায়াসেই বুঝে গিয়েছে তাঁর কী মৎলব।

আমরা যেতেই, ডাক্তার খোদ পুলিশের বড়োকর্তার কাছে নিজের নাম পাঠিয়েছেন, আর অমনি, অবিলম্বে, তাঁর ঘরে আমাদের ডাক পড়েছে।

মঁসিয় হেনরিখ স্টেপার্ক মানুষটি এমনিতে বেশ ছোটোখাটো হ'লে কী হবে, সারাক্ষণই তিনি যেন টগবগ ক'রে ফুটছেন প্রাণচাঞ্চল্যে। মানুষটি বিশেষ কাণ্ডজ্ঞান ধরেন, সত্যিকার গোয়েন্দার সব গুণগুলোই তাঁর আছে, এর আগে বেশ কয়েকটি জটিল রহস্য ভেদ ক'রে তিনি তারই প্রমাণ দিয়েছেন। যদি এই প্রহেলিকার ওপর কেউ কোনো আলো ফেলতে পারে, তবে সন্দেহ নেই সেই মানুষটি হবেন মঁসিয় হেনরিখ স্টেপার্ক। তবে এই বিশেষ পরিস্থিতিটায় তিনি কি সত্যিকিছু করতে পারবেন? যা-কিছু কাল রাতে ঘটেছে, তা সত্যি-বলতে—মোটেই কোনো মানুষী কাজ ব'লে তো মনে হয় না। অন্যদের মতো তিনিও ঘটনাগুলো সম্বন্ধে ভাসা-ভাসাভাবে কিছু কথা শুনেছেন, তবে শুধু এখনই তিনি আমাদের কাছে জানতে পেলেন সত্যি-সত্যি কী হয়েছে।

'আমি ধ'রেই নিয়েছিলুম, ডাক্তার রডারিখ, যে আপনি এসে দেখা করবেন,' আমাদের স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'সত্যি-বলতে, আমি তার ওপর ভরসা ক'রে ছিলুম। আপনি যদি না-আসতেন তো আমাকেই শেষে আপনার কাছে যেতে হ'তো।

আপনার বাড়িতে কী-সব তাজ্জব ব্যাপার ঘটেছে, তার কথা কাল রাতেই আমার কানে পৌঁছে ছিলো, আপনার অতিথিরা যে শুধু ভড়কেই যাবেন না, বিষম ভয় পেয়েও যাবেন, সেটাও আশ্চর্য কিছু ছিলো না। কিন্তু যেটা আরো-ভয়ানক—সেই আতঙ্ক এখন গোটা রাগ্‌ৎসেই ছড়িয়ে পড়েছে, খুব সহজে যে লোকের ভয় কেটে যাবে, তা আমার মনে হয় না। গোড়াতেই শুধু আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন, ডাক্তার রডারিখ। কেউ কি সম্প্রতি আপনার ওপর বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছে? এতটাই ক্ষুব্ধ যে মাদমোয়াজেল মাইরা রডারিখের সঙ্গে মঁসিয় মার্ক ভিদালের বিয়েটা ভেস্তে দিতে চাচ্ছে? ভাবছে যে এভাবে সব পণ্ড ক'রে দিয়ে আপনার ওপর শোধ নেবে?'

'আমার তো তা-ই মনে হয়,' ডাক্তার তাঁকে বলেছেন।

'আর, সে-লোকটা কে?'

'ভিলহেল্ম স্টোরিৎস নামে একটা লোক।'

কাপ্তেন হারালানই প্রচণ্ড ঘৃণাভরে নামটা বলেছিলো, শুনে যে পুলিশের বড়োকর্তা খুব-একটা যে অবাক হয়েছেন, এমনটা মোটেই মনে হয়নি আমার।

ডাক্তার রডারিখ তারপর সব খুঁটিনাটি জানিয়েছেন, ধারাবাহিকভাবে, তাঁর বৃত্তান্ত থেকে এই কথাটা বাদ দেননি, ঠিক কোন কথা ব'লে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস তাঁকে শাসিয়েছিলো, বলেছিলো, বিয়েটা এমনভাবে ভণ্ডুল ক'রে দেবে, মানুষ যার কথা কোনোদিনও কল্পনাও করেনি।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ,' মঁসিয় স্টেপার্ক সায় দিয়েছেন, 'আর সে তার ঐ অমানুষিক শক্তির পরিচয় দেয় গোলাপের তোড়া ছিঁড়ে ফেলে, অথচ কেউ তাকে সে-কাজ করতে দ্যাখেনি—তা-ই তো!'

আমরা সকলেই কথাটায় সায় দিয়েছি।

তবে আমাদের এই মতৈক্য মোটেই কিন্তু প্রহেলিকাটির ওপর কোনো আলোই ফেলতে পারেনি, যদি-না আমরা বলি যে সে এক পিশাচসিদ্ধ, শয়তানের চেলা। কিন্তু পুলিশ তো আর ভূতপ্রেতপিশাচ নিয়ে কাজ করে না, তাকে কাজ করতে হয় বাস্তবের সীমার মধ্যেই। পুলিশ তার প্রকাণ্ড হাতটা শুধু কারু রক্তমাংসের ঘাড়েই ফেলতে পারে। ভূতপ্রেতপিশাচকে গ্রেফতার করায় এখনও তারা সিদ্ধহস্ত হ'য়ে উঠতে পারেনি। যে-লোকটা বিয়ের কাগজ কুচি-কুচি ক'রে ছিঁড়েছে, গোলাপের তোড়াটাকে পায়ের তলায় মাড়িয়েছে, যে বেমালুম বাঁটপাড়ি করেছে ঐ মুকুটটা, সে যদি মানুষ হয় তবেই তারা তাকে পাকড়াতে পারবে।

আমাদের সন্দেহ যে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সে-বিষয়ে মঁসিয় স্টেপার্কের কোনো দ্বিমত ছিলো না।

'এই ভিলহেল্ম স্টোরিৎস,' তিনি বলেছেন, 'এ-লোকটার ওপর যে কবে থেকেই আমার নজর ছিলো, যদিও সরকারিভাবে কেউ কোনোদিনই তার বিরুদ্ধে কোনো নালিশ করেনি। ভারি ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় তার সব বিষয়ে, ভীষণ একাচোরা—কীভাবে থাকে,

কী করে, কী তার জীবিকা—কেউই তা জানে না। কেন-যে সে স্প্রেমবার্গ ছেড়ে এসে এখানে জুটলো! সেটা তো তার জন্মভূমি। দক্ষিণ প্রুশিয়ার লোক হ'য়েও কেন সে এসে মাগিয়ারদের এই দেশে আস্তানা গেড়েছে? কেন কেবল একজন বুড়ো চাকরকে নিয়ে সে বুলভার তেকেলির ঐ হানাবাড়িটায় থাকে—যেখানে, কোনো মানুষ তো দূরের কথা, সম্ভবত কোনো কাকপক্ষীও ঢোকে না। তার সমস্তই ভারি সন্দেহজনক—খুবই সন্দেহজনক।'

কাপ্তেন হারালান তখন আসল কথাটা পেড়েছে, 'আপনি এখন কী করবেন ব'লে ভাবছেন, মঁসিয় স্টেপার্ক?'

'স্পষ্টই তো বোঝা যাচ্ছে,' খোদ পুলিশের বড়োকর্তার মুখ থেকে জবাব এসেছে, 'এক্ষুনি গিয়ে তার বাড়ি চড়াও হ'তে হবে, হয়তো খুঁজে দেখলে অনেক সাবুদ মিলবে সেখানে, অনেক নথিপত্র—হয়তো কোনো ইঙ্গিত মিলবে—'

'কিন্তু সেভাবে গিয়ে চড়াও হ'তে হ'লে,' জিগেস করেছেন ডাক্তার রডারিখ, 'রাজ্যপালের মঞ্জুরি লাগবে না? কোনো পরোয়ানা?'

'ব্যাপারটা একজন বিদেশীকে নিয়ে, আর সেই বিদেশী আপনাকে ও আপনার পরিবারকে যা-নয়-তা-ই ব'লে শাসিয়ে এসেছে। রাজ্যপাল যে পরোয়ানাটা মঞ্জুর করবেন, তাতে কোনো সন্দেহই নেই।'

আমি তখন শুধু জানিয়েছি, 'কাল স্বয়ং রাজ্যপাল অকুস্থলে ছিলেন।'

'জানি, মঁসিয় ভিদাল, এবং তিনি নিজের চোখে কী দেখে এসেছেন, সে নিয়ে এরই মধ্যে আলোচনা করেছেন।'

'তিনি কি তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন?' জিগেস করেছেন ডাক্তার রডারিখ।

'না, তিনি বলেছেন সাধারণ-বুদ্ধিতে তার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।'

'কিন্তু,' আমি বলেছি, 'তিনি যখন শুনবেন যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস এই ব্যাপারটায় জড়িয়ে আছে—'

'তা বরং ব্যাপারটা বোঝবার জন্যে তাঁকে আরো উদগ্রীব ক'রে তুলবে।' বলেছেন মঁসিয় স্টেপার্ক, 'আপনারা বরং অনুগ্রহ ক'রে এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমি সোজা রাজভবন চ'লে যাবো—আধঘণ্টার মধ্যেই বুলভার তেকেলির হানাবাড়িটা খানাতল্লাশ করবার পরোয়ানা নিয়ে এসে হাজির হবো। বাড়িটা আমরা একেবারে তছনছ ক'রে খুঁজে দেখবো, ডাক্তার রডারিখ।'

'আমরাও তাহ'লে আপনার সঙ্গে যাবো,' প্রস্তাব করেছে কাপ্তেন হারালান।

'যদি তাতে আপনার তৃপ্তি হয়, কাপ্তেন হারালান। আপনিও না-হয় চলুন আমাদের সঙ্গে, মঁসিয় ভিদাল,' পুলিশের বড়োকর্তা আমাকেও আহ্বান করেছেন।

'মঁসিয় স্টেপার্কের দলবলের সঙ্গে তোমরাই না-হয় যেয়ো,' কাপ্তেন হারালানকে

বলেছেন ডাক্তার রডারিখ, 'আমি বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে একটু উৎকণ্ঠিত হ'য়ে আছি। খানাতল্লাশ শেষ হ'য়ে যাবামাত্র তোমরাও বাড়ি ফিরে এসো।'

'কেউ গ্রেফতার হ'লে পর, তবেই,' মনে হ'লো এই অরুচিকর ব্যাপারটার ইতি টেনে দেবার জন্যে মঁসিয় স্টেপার্ক রীতিমতো প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'সে আছেন।

তক্ষুনি তিনি রাজভবনের দিকে বেরিয়ে গেলেন, ডাক্তার রডারিখও তাঁরই সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন, বাড়ি ফিরবেন ব'লে।

কাপ্তেন হারালান আর আমি পুলিশের দফতরেই ব'সে-ব'সে মঁসিয় হেনরিখ স্টেপার্কের ফিরে-আসার প্রতীক্ষা করেছি, কিন্তু নিজেদের মধ্যে আর বিশেষ কোনো কথা হয়নি। তাহ'লে অবশেষে ঐ হানাবাড়িটায় ঢুকবো আমরা ?... বাড়ির মালিককে কি তখন বাড়িতেই পাওয়া যাবে ? তাকে দেখে কাপ্তেন হারালান নিজেকে সামলে রাখতে পারবে তো?

আধ ঘণ্টা পরেই মঁসিয় স্টেপার্ক পরোয়ানাটা নিয়ে এসে পৌঁছেছেন—তাতে অবস্থা বুঝে যে-কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করবারই মঞ্জুরি দেয়া হয়েছে তাঁকে। পরোয়ানাটা দেখিয়ে তিনি বলেছেন, 'আপনারা বরং আগেই চ'লে যান। আমি একদিক দিয়ে যাবো, আমার সেপাইশান্ত্রী অন্যদিক দিয়ে যাবে। কুড়ি মিনিটের মধ্যেই আমরা ঐ বাড়িটায় পৌঁছে যাবো। ঠিক !'

'ঠিক,' উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বলেছে কাপ্তেন হারালান। আমিও তার সঙ্গে-সঙ্গে তক্ষুনি টাউনহল থেকে বেরিয়ে বুলভার তেকেলির দিকে পা বাড়িয়েছি।

নবম পরিচ্ছেদ

মঁসিয় স্টেপার্ক যে-রাস্তাটা ধ'রে গিয়েছিলেন, সেটা তাঁকে শহরের উত্তরভাগ দিয়ে নিয়ে যাবে, আর তাঁর পুলিশবাহিনী, জোড়ায়-জোড়ায়, যাচ্ছিলো শহরের মাঝখানটা দিয়ে। আমি কাপ্তেন হারালানের সঙ্গে দানিউবের তীর ঘেঁসেই চলেছি।

আকাশ সেই থেকে মেঘে ভ'রে আছে। মস্ত-সব ধূসর মেঘের পাঁজা পরস্পরকে তাড়া ক'রে আসছে পুব থেকে, আর জোরালো টাটকা হাওয়ায় দানিউবের হলদে জলের মধ্যে ঢেউ কেটে-কেটে চলেছে নৌকোগুলো। জোড়ায়-জোড়ায় সারস আর গাংচিল সোজা চ'লে যাচ্ছে হাওয়ার দিকেই, আর তীক্ষ্ণ চেরা সুরে থেকে-থেকে ডুকরে উঠছে। এখনও বৃষ্টি পড়ছে না বটে, কিন্তু ওপরের মেঘের রাশি অনবরত ভয় দেখাচ্ছে, হয়তো যে-কোনো সময় তুলকালাম বাদল শুরু হ'য়ে যাবে।

শহরের হাট-বাজারগুলো ছাড়া—সেগুলোতে অবিশ্যি চাষীদের সঙ্গে-সঙ্গে

শহরবাসীও ভিড় জমিয়েছে—রাস্তায় এমনিতে পথচারী খুব-একটা নেই। তবে স্বয়ং পুলিশের বড়োকর্তা তাঁর বাহিনী নিয়ে যদি আমাদের সঙ্গে আসতেন, তবে দেখতে-না-দেখতে চারপাশে ভিড় জ'মে যেতো, সেদিক থেকে টাউনহল থেকে বেরিয়ে আমরা যে আলাদা-আলাদা পথে চলেছি, সেটা ভালোই হয়েছে।

কাপ্তেন হারালান আবারও মুখে কুলুপ এঁটে আছে। এখনও তার মেজাজটা যে-রকম তিরিক্ষি আর তেরিয়া হ'য়ে আছে, তাতে ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলে সে-না একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড ক'রে বসে! শুধু সেইজন্যেই আমার মনে হচ্ছিলো, মঁসিয় স্টেপার্ক আমাদের তাঁর সঙ্গে আসতে দিয়ে বোধহয় ভালো করেননি।

ডাক্তার রডারিখের বাড়ি রাস্তার যে-মোড়টায়, সেখানে পৌঁছুতে আমাদের মিনিট পনেরোর বেশি লাগেনি। একতলার কোনো জানলাই খোলা নেই, মাদাম রডারিখ আর তাঁর কন্যা যে-ঘর দুটোয় থাকেন তাদেরও জানলার খড়খড়ি নামানো। আগের রাতের উৎসবের মেজাজের সঙ্গে কী তফাৎ আজকের দিনটার ! কাপ্তেন হারালান বুঝি নিজের অজান্তেই একবার থমকে গিয়ে ঐ বন্ধ খড়খড়িগুলোর দিকে তাকিয়েছে। তার বুক চিরেই বুঝি বেরিয়ে এসেছে একটি দীর্ঘশ্বাস, কিন্তু একটাও কথা বলেনি। মোড়টা ঘুরে, আমরা বুলভার তেকেলির পথ ধরেছি তারপর, সোজা গিয়ে নেমেছি ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর বাড়িটার সামনে।

খুব তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ফটকের সামনে একটা লোক পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছে, হাত দুটো পকেটে গোঁজা। কাছে গিয়ে দেখি, মঁসিয় স্টেপার্ক। আগেকার কথা অনুযায়ী আমি আর কাপ্তেন হারালান গিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছি। প্রায় তক্ষুনি, উর্দি না-পরা একদল পুলিশম্যান এসে হাজির হয়েছে। মঁসিয় স্টেপার্কের ইঙ্গিতে তারা রেলিঙের সামনে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে তারপর। তাদের সঙ্গে এক কামারও এসে হাজির হয়েছে —যদি দরকার হয় তবে তালা ভেঙেই ভেতরে ঢুকতে হবে। যথারীতি জানলাগুলো বন্ধ, মিনারের জানলায় খড়খড়িগুলো নামানো।

'ভেতরে কেউ আছে ব'লে তো মনে হচ্ছে না।' আমি মঁসিয় স্টেপার্ককে বলেছি।

'সেটাই আমরা এক্ষুনি জেনে নিতে চলেছি,' তিনি উত্তর দিয়েছেন। 'তবে বাড়িটা একেবারে ফাঁকা দেখলে আমি একটু অবাকই হবো। ঐ-তো, দেখুন-না, বাঁদিকের ঐ চিমনিটাকে, চোঙ থেকে তো ধোঁয়া বেরুচ্ছে।'

আর সত্যিই, ছাতের ওপর হালকা, সূক্ষ্ম ধোঁয়ার কুণ্ডলি।

'প্রভু যদি বাড়ি নাও থাকে,' মঁসিয় স্টেপার্ক জুড়ে দিয়েছেন, 'ভৃত্যটি নিশ্চয়ই বাড়ি আছে। আমাদের ভেতরে ঢুকতে দেবার জন্যে তাতে অবশ্য কিছুই এসে-যায় না, প্রভু-ভৃত্যের যে-কোনো-একজন বাড়ি থাকলেই হ'লো।'

আমি অবশ্য কাপ্তেন হারালানের ভাবগতিক দেখে ভেবেছি ভিলহেল্ম স্টোরিৎস বাড়ি না-থাকলেই ভালো, আরো-ভালো হয় সে যদি রাগৎস ছেড়ে অন্য-কোথাও চ'লে গিয়ে থাকে।

মঁসিয় স্টেপার্ক এদিকে প্রায় বজ্রনিনাদে কড়া নেড়ে চলেছেন। তারপর একটু থেমে দাঁড়িয়ে আমরা অপেক্ষা করেছি ভেতর থেকে কেউ এসে যদি ফটকটা খুলে দেয়। মিনিটখানেক কেটে গেলো। কারু কোনো পাত্তা নেই। আবার ফটকের কড়ার বজ্রনিনাদ।

'বাড়ির লোকগুলো নিশ্চয়ই কালা,' মঁসিয় স্টেপার্ক ফোড়ন কেটেছেন, 'কানে শোনে না।' তারপর, কামারের দিকে ফিরে বলেছেন, 'দ্যাখো, তুমি কী করতে পারো।'

পুলিশের হ'য়ে কাজ না-করলে এ-কামার নিশ্চয়ই ওস্তাদ চোর হ'তে পারতো। সে তার ঝোলা থেকে ছুঁচলো একটা ফলা বার করেছে, সেটা তালার ফোকরে ঢুকিয়ে দু-বার ঘোরাবামাত্র অত-বড়ো লোহার দরজাটা খুলে গিয়েছে।

আমাকে আর কাপ্তেন হারালানকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশের বড়োকর্তা তারপর উঠোনে পা রেখেছেন। সঙ্গে আরো-চারজন পুলিশও চলেছে, শুধু দুজন রয়েছে বাইরে, পাহারায়।

তিন পৈঠার এক সিঁড়ি আমাদের নিয়ে গেছে বাড়ির দরজায়—বাইরের ফটকটার মতো সেটাও বন্ধ।

মঁসিয় স্টেপার্ক তাঁর হাতের ছড়িটা দিয়ে তিনবার ঠকঠক করেছেন দরজায়।

কোনো সাড়া নেই। ভেতরেও কারু-কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

ওস্তাদ কামার ফের তার ঝোলা থেকে এক সবখোল চাবি বার ক'রে তালায় ঢুকিয়েছে। কে জানে এই তালা হয়তো দু-তিন পাক দিয়ে আটকানো, ভেতর থেকে হুড়কোও আটকানো থাকতে পারে। হয়তো বাইরে পুলিশবাহিনী মোতায়েন আছে দেখে তারা যাতে ভেতরে না-ঢোকে, সেইজন্যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস ভেতর থেকে খিল তুলে দিয়েছে। কিন্তু না, সে-রকম কিছুই নয়। চাবি ঘুরেছে তালায়, দরজাও তক্ষুনি খুলে গিয়েছে।

'চলুন, ভেতরে যাই,' বলেছেন মঁসিয় স্টেপার্ক।

দরজার ওপরেই স্কাইলাইট, তার মধ্য দিয়ে আলো গিয়ে পড়েছে করিডরে, ঢাকাবারান্দায়, আর করিডরের ঠিক শেষ প্রান্তে দ্বিতীয়-একটা দরজা খুলে গেছে পেছনের বাগানে, তার ওপরে কাচের পাল্লা দেয়া একটা জানলা—সেদিক থেকেও আলো এসে পড়েছে এই ঢাকাবারান্দায়।

পুলিশের বড়োকর্তা কয়েক পা এগিয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়েছেন : 'কেউ কি ভেতরে আছো ?'

কোনো সাড়াই নেই, যদিও মঁসিয় স্টেপার্ক গলাটা আরো চড়িয়ে প্রশ্নটা করেছেন। বাড়ির মধ্য থেকে কোনো আওয়াজই আসছে না। তবে, উৎকর্ণ হ'য়ে, প্রায় সর্বাঙ্গকে শ্রবণেন্দ্রিয়ে রূপান্তরিত ক'রে, অবশেষে আমাদের মনে হয়েছে পাশের কোনো-একটা ঘরে কি-রকম একটা কিছু যেন ঘসটে নিয়ে-যাওয়ার আওয়াজ হচ্ছে... কিন্তু সেটা যে ঘোর বিভ্রম বৈ আর-কিছু নয়, সে-সন্দেহটা উঁকি মেরেছে মনের মধ্যে।

মঁসিয় স্টেপার্ক সোজা এগিয়ে গেছেন করিডর ধ'রে, আমি গেছি তাঁর পেছন-

পেছন, আর কাপ্তেন হারালান আমায় অনুসরণ করেছে। সেপাইদের একজন দাঁড়িয়ে থেকেছে সিঁড়ির কাছে, পাহারায়।

দরজাটা খুলে দিতেই, পুরো বাগানটাকেই দেখতে পেয়েছি আমরা। দেয়াল দিয়ে ঘেরা, মাঝখানটায় একটা লন, আগে হয়তো কেয়ারি-করা ছিলো, কিন্তু অনেকদিন নিশ্চয়ই কোনো কাস্তে বা কাঁচির ব্যবহার হয়নি এখানে, ঘাসগুলো লম্বা, তবে কেমন যেন শুকিয়ে-যাওয়া, মরা। তার পাশ দিয়েই ঘুরে-ঘুরে গেছে পথ, দু-ধারে ঘন ঝোপঝাড়ের আঁচল। তার ওপাশে দেখা যাচ্ছে ঢ্যাঙা সব গাছ, তাদের পোঁতা হয়েছিলো দেয়ালের ধার ঘেঁসেই, তাদের ঝাঁকড়া ডালপালা ঠিক পাশের দুর্গপ্রাচীরের ছাঁচ অব্দি উঠে গিয়ে শাসন করছে যেন এখন।

সবকিছু থেকেই চূড়ান্ত অবহেলার লক্ষণ ফুটে বেরুচ্ছে।

তন্নতন্ন ক'রে, তারপর, খোঁজা হয়েছে বাগানটা। সেপাইরা কাউকেই দেখতে পায়নি সেখানে, যদিও পথের ওপর দেখা গেছে সাম্প্রতিক যাতায়াতের পদচিহ্ন।

এদিকটায় জানলাগুলো বাইরে থেকে খড়খড়ি তুলে বন্ধ ক'রে দেয়া—শুধু একতলার *শেষ জানলাটা* বাদে—সেখান থেকে গিয়েই আলো প'ড়ে সিঁড়ির পইঠা আলো ক'রে দিয়েছে।

'লোকজন যে একটু আগেও এ-পথ দিয়ে এসেছিলো, তাতে কোনো সন্দেহই নেই,' মন্তব্য করেছেন মঁসিয় স্টেপার্ক, 'কারণ দরজাটায় শুধু তালাই লাগানো—হুড়কোটা অব্দি তুলে দেয়া হয়নি।... লোকগুলো যদি আগে থেকেই হুঁশিয়ার হ'য়ে পালিয়ে না-যেতো—'

'আপনার কি মনে হয় যে তারা আগে থেকেই জানতে পেরেছে?' আমি বলেছি, 'আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমার বরং মনে হচ্ছে তারা হয়তো এক্ষুনি যে-কোনো-সময় এসে হাজির হবে।'

মঁসিয় স্টেপার্ক অবিশ্যি তাতে সন্দেহভরে মাথা নেড়েছেন।

'তবে,' আমি আরো জুড়ে দিয়েছি, 'ঐ-যে একটা চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে যে ভেতরে কোথাও আগুন জ্বলছে!'

'কোথায় আছে আগুন, দ্যাখো!' অমনি পুলিশের বড়োকর্তার সতর্জন গর্জন কানে এসেছে!

বাগানে যে কেউ কোত্থাও নেই, এটা পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হ'য়েই মঁসিয় স্টেপার্ক আমাদের ভেতরে চ'লে যেতে বলেছেন, তারপর বাগানের দরজাটা ফের বন্ধ ক'রে দেয়া হয়েছে।

করিডরটা গেছে চার-চারটে ঘরের পাশ দিয়ে। তাদেরই একটায়, বাগানের পাশেই, কেউ যেন কিছু-একটা রান্না করছিলো। আরেকটা ঘর থেকে গিয়ে পড়া যায় দোতলার সিঁড়িতে, সিঁড়িটা তারপর সোজা চিলেকোঠার দিকে চ'লে গিয়েছে।

থানাতল্লাশি পুরোদমে শুরু হয়েছে ঐ রসুইঘর থেকেই। সেপাইদের একজন

জানলার পাল্লা খুলে খড়খড়ি তুলে দিয়েছে, তাতে অবশ্য অল্পই আলো এসে পড়েছে রান্নাঘরে।

রান্নাঘর, তবে সে নামেই। থাকার মধ্যে আছে লোহার এক চুল্লি, তার চিমনিটা উধাও হয়েছে দেয়াল-থেকে-বেরিয়ে আসা এক ছাঁচের তলায়; তার দু-পাশে দুটো দেরাজ; ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল; দুটো বেতের চেয়ার আর দুটো জলচৌকি; দেয়াল থেকে ঝুলছে গোটা কতক হাতাখুন্তি; এককোণায় একটা *পিতামহ ঘড়ি* যেটা সারাক্ষণ টিকটিক ক'রে বেজেই চলেছে, আর সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে তাতে কাল সন্ধেবেলাতেই চাবি ঘুরিয়ে দম দেয়া হয়েছে।

চুল্লিটার মধ্যে তখনও জ্বলছে কতগুলো কয়লা; তারই ধোঁয়া আমরা দেখেছি বাইরে থেকে।

'রান্নাঘর তো দেখলুম,' আমি বলেছি, 'কিন্তু রাঁধুনি যে না-পাত্তা!'

'এবং তার প্রভু—সে-ই বা কোথায়?' জিগেস করেছে কাপ্তেন হারালান।

'আমি অত সহজে ছাড়ছি না, সব তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখবো,' জানিয়েছেন মঁসিয় স্টেপার্ক।

একতলার অন্য-দুটো ঘরও পর-পর দেখা হয়েছে। একটা নিশ্চয়ই বৈঠকখানা, পুরোনো ভারি আশবাবপত্রে ভরা, শৈলীগুলো টিউটানিক। শিকবসানো ফায়ার-প্লেসের ওপর, ম্যান্টলপীসের ওপর, নানারকম কারুকাজ-করা একটা ঘড়ি—রুচির তাতে কোনো চিহ্নই নেই; তার নিশ্চল কাঁটাগুলো আর ওপরকার জ'মে-থাকা পুরুধুলোর আস্তর দেখে বোঝা গেছে অনেকদিন হ'লো সে-ঘড়ি আর চলছে না। জানলার মুখোমুখি দেয়ালটায় ডিম্বাকার একটা ফ্রেমে-পোরা একটা পোর্ট্রেট : তলায় গথিক হরফে নাম লেখা : *অটো স্টোরিৎস*।

ছবিটার দিকে আমরা অসীম কৌতূহলভরে তাকিয়েছি, তুলির টানে একটা বেপরোয়া স্পর্ধার ভাব, কিন্তু রঙের ব্যবহার বড্ড স্থূল যেন, কোনো অজ্ঞাত শিল্পীর আঁকা—তার নাম দস্তখৎ করা আছে তলায়, অর্থাৎ যথার্থ একটা শিল্পকর্ম। কাপ্তেন হারালান তো ক্যানভাসটার ওপর থেকে যেন চোখই সরাতে পারছিলো না। আর আমি? অটো স্টোরিৎস-এর মুখটা আমায় গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলো। সে কি আমার মনের এমন অস্থির দশার জন্যে?... না কি, আমি, নিজের অজান্তেই, হানাবাড়িটার পরিবেশের শিকার হ'য়ে পড়েছি? এ-দুয়ের যা-ই হোক না কেন, এই ফাঁকা ঘরে, এখানটায় অটো স্টোরিৎসকে কোনো কিংবদন্তির জীবের মতোই দেখাচ্ছিলো। সেই বিশাল মাথা, সেই উশকোখুশকো আলুথালু ঝাঁকড়া চুল, ঐ উন্নত ললাট, ঐ জ্বলন্ত দুই চক্ষু, ঐ মুখটা —তার ঠোঁট দুটো যেন জ্যান্ত—যেন কেঁপে উঠছে আধো আলোছায়ায়—আমার মনে হয়েছে এই প্রতিকৃতিটা যেন সজীব, যেন সেটা এক্ষুনি লাফিয়ে নেমে আসবে তার *ডিম্বাকার কাঠামো* থেকে, যেন কোনো অপার্থিব ভুতুড়ে গলায় এক্ষুনি চীৎকার ক'রে উঠবে : 'কে তোমরা? এখানে তোমাদের কে ঢুকতে দিয়েছে? কেন তোমরা দুম ক'রে

এসে আমার শান্তি ভঙ্গ করছো?'

জানলার ভিনিসীয় খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে অল্প-অল্প আলো এসে পড়েছিলো ঘরে, তাই জানলার পাল্লা খোলবার কোনো দরকার হয়নি, আর সেই জন্যেই ঐ ছায়ার জাফরির মধ্যে প্রতিকৃতিটাকে সম্ভবত আরো-কিম্ভূত আরো-দুর্দান্ত দেখাচ্ছিলো।

অটো আর ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের চেহারার সাদৃশ্য দেখে মঁসিয় স্টেপার্ক বুঝি একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেছেন। 'বয়েসের তফাৎ যদি না-থাকতো,' তিনি আমায় বলেছেন, 'তবে আমি ভাবতুম এ বুঝি পিতৃদেবতার নয়, পুত্রদেবতারই ছবি। দুজনেরই চোখগুলো একরকম, কপালটাও তা-ই, মস্ত ধড়ের ওপর তেমনি মস্ত মাথা বসানো... আর ঐ পিশাচের মতো চাউনি, ঐ অভিব্যক্তি! ওঝা ডেকে দুজনকেই ঝাড়িয়ে নিতে পারলেই বোধকরি ভালো হ'তো!'

'হ্যাঁ,' আমিও সায় দিয়েছি, 'সাদৃশ্যটা, সত্যি, চমকপ্রদই!'

কাপ্তেন হারালানকে কেউ যেন পেরেক ঠুকে ঐ ক্যানভাসের সামনেই আটকে দিয়েছে! যেন কোনো প্রতিকৃতি নয়, আসল মানুষটিই আছে তার সামনে।

'কী কাপ্তেন, যাবেন না?' আমি তার ঘোরটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি।

করিডর দিয়ে তারপর আমরা গেছি পাশের ঘরটায়। এটা হচ্ছে কাজের জায়গা, ল্যাবরেটরি, ওয়ার্কশপ, *কর্মশালা*—কিন্তু সবকিছুই যেন লণ্ডভণ্ড হ'য়ে আছে। শাদা কাঠের তাক, পর-পর, তাতে সারি-সারি বইপুথি—বেশির ভাগই বাঁধানো নয়, আর বেশির ভাগ বইই গণিত, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্র বিষয়ে। কোণায় কতগুলো যন্ত্রপাতি, নানা আকারের নানা ধরনের, একটা তোলা-উনুন—এদিক-ওদিক সরানো যায়, কতগুলো বকযন্ত্র, পাতনযন্ত্র আর নানা ধরনের ধাতুর নমুনা—যার কয়েকটাকে নিজে এনজিনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও আমি চিনতেই পারিনি। ঘরের মাঝখানে, একটা টেবিল—কাগজ ঠাশা, আরো-সব লেখালিখির জিনিশ, অটো স্টোরিৎস-এর *রচনাসমগ্র-র* তিনটে বা চারটে খণ্ড। তাদের পাশে একটা পাণ্ডুলিপি প'ড়ে আছে। ঝুঁকে প'ড়ে দেখি, সেই *বিখ্যাত* নামটাই দস্তখৎ-করা : *আলোকবিদ্যা বিষয়ক একটি প্রস্তাব*। কাগজপত্র, পুথির পর পুথি, পাণ্ডুলিপি—সব পর-পর মোহর-করা, বেঁধে-রাখা।

এ-ঘরেও খোঁজাখুঁজি ক'রে কোনো লাভ হয়নি। আমরা যখন ঘরটা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি, তখন হঠাৎ ম্যান্টলপীসের ওপর কিম্ভূত-কিমাকার দেখতে নীলচে একটা শিশির ওপর মঁসিয় স্টেপার্কের নজর পড়েছে।

সে কি তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করতেই, না কি তাঁর রহস্যভেদী গোয়েন্দাবুদ্ধির তাগিদে, তিনি শিশিটা ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখবেন ব'লে সেটা ধরতে হাত বাড়িয়েছেন। কিন্তু হয়তো অসাবধান হ'য়ে থাকবেন, ঠিক মতো খেয়াল করেননি—শিশিটা ছিলো ম্যান্টলপীসের একেবারে ধার ঘেঁসে, যেই তিনি ধরতে যাবেন, অমনি ঠেলা লেগে হাত ফসকে শিশিটা মেঝেয় প'ড়ে গিয়ে চুরমার হ'য়ে গেলো।

তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো হলদে রঙের সরু সুতোর মতো তরল কী-যেন,

দারুণ দাহ্য-কিছু নিশ্চয়ই, অদ্ভুত একটা গন্ধ ছড়িয়ে তক্ষুনি সেটা বাষ্প হ'য়ে একেবারেই উবে গেলো। ভারি ক্ষীণ হালকা ছিলো গন্ধটা, কিন্তু আমার জানা কোনো রাসায়নিকের গন্ধের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই।

'হুম!' ব'লে উঠেছেন মঁসিয় স্টেপার্ক, 'একেবারে সময় বুঝে নিচে গিয়ে পড়েছে শিশিটা—'

'তাতে আর সন্দেহ কী?' আমি বলেছি, 'নিশ্চয়ই অটো স্টোরিৎস-এর উদ্ভাবিত কিছু ছিলো শিশিটায়।'

'ছেলের কাছে নিশ্চয়ই ফর্মুলাটা থাকবে,' মঁসিয় স্টেপার্ক বলেছেন, 'ঐ সূত্র ধ'রেই সে জিনিশটা যত-ইচ্ছে বানিয়ে নিতে পারবে।' তারপর, দরজার দিকে ফিরে, বলেছেন, 'এবার তাহ'লে দোতলায় যাওয়া যাক।' সেপাইদের একজনকে তিনি নিচে করিডরে পাহারায় থাকতেই নির্দেশ দিয়েছেন।

এখানে, রান্নাঘরের মুখোমুখি যে-দরজাটা, সেটা খুলে গেছে দোতলার সিঁড়িতে, দু-পাশে কাঠের রেলিঙ, আমাদের পায়ের তলায় পইঠাগুলো মচমচ ক'রে উঠে যেন আপত্তিই জানিয়েছে।

ল্যাণ্ডিঙে, পাশাপাশি দুটো ঘর। তাদের দরজাগুলো ভেজানো ছিলো, কিন্তু তালা লাগানো ছিলো না, হাতল ঘোরাতেই খুলে গেছে।

প্রথম ঘরটা নিশ্চয়ই ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর শোবার ঘর। থাকার মধ্যে আছে একটা লোহারখাট, শিয়রের কাছে একটা টেবিল, ওক কাঠে তৈরি বিছানার চাদর ইত্যাদি রাখার একটা দেরাজ, তামার পায়ার ওপর দাঁড়-করানো প্রসাধন টেবিল, একটা সোফা, পুরু মখমলের গদি আঁটা একটা আরামকেদারা, আর দুটো চেয়ার; বিছানার ওপর না আছে কোনো চাঁদোয়া, না-বা মশারি; জানলাতে কোনো পর্দা নেই; আশবাব যা আছে তা নেহাৎই কেজো, যা না-হ'লে চলে না। কোনো নথিপত্র নেই, না ম্যান্টলপীসের ওপর, না কোণার গোল টেবিলটার ওপর। বিছানাটা এলোমেলো হ'য়ে আছে, সম্ভবত রাতে এই বিছানায় কেউ শুয়েছিলো। প্রসাধন টেবিলটার কাছে গিয়ে মঁসিয় স্টেপার্ক আবিষ্কার করেছেন সেখানে একটা গামলায় জল আছে, তার ওপর সাবানের ফেনা ভাসছে।

'যদি,' আমাদের তিনি বুঝিয়ে বলেছেন, 'ঐ জল ব্যবহার করা হবার পর চব্বিশ ঘণ্টা কেটে যেতো, তবে এতক্ষণে সাবানের ঐ বুড়বুড়িগুলো মিলিয়ে যেতো। তা যখন হয়নি, তখন তা থেকে অনুমান করতে পারি আমাদের শ্রীমান সকালবেলায় এখানেই মুখ ধুয়েছেন—বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগেই—'

'তাতে কি মনে হয় না যে সে আবার এখানেই ফিরে আসবে?' আমি বলেছি, 'যদি-অবশ্য আপনার সেপাইদের সে এখানে মোতায়েন না-দ্যাখে।'

'সে যদি আমার সেপাইদের দেখে ফ্যালে, তবে আমার সেপাইরাও তাকে দেখে ফেলবে। তাদের ওপর হুকুম দেয়াই আছে, তাকে দেখতে পেলেই যেন ধ'রে নিয়ে আসে। তবে আমার মনে হয় না, সে আমাদের কাছে ধরা দেবে।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই আমরা একটা ক্যাঁচকেঁচে আওয়াজ শুনতে পেয়েছি, যেন কেউ এইমাত্র কোনো নড়বোড়ে কাঠের মেঝেয় পা রেখেছে। আওয়াজটা যেন এসেছে পাশের ঘর থেকে, ঐ ওয়ার্কশপের ঠিক ওপরেই যে-ঘরটা।

এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাবার একটা দরজা আছে। অর্থাৎ, ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের ল্যাণ্ডিঙ দিয়ে ঘুরে যেতে হবে না।

মঁসিয় স্টেপার্কের আগেই কাপ্তেন হারালান একলাফে ঐ দরজার কাছে গিয়ে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ততক্ষণে দরজার কবাটটা খুলে ফেলেছে।

কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই ভুল শুনেছি সবাই। ঘরটায় কেউ নেই।

এটাও সম্ভব যে আওয়াজটা হয়তো ওপরের চিলেকোঠা থেকেই এসেছে—যেখান থেকে সরাসরি মিনারটায় যাওয়া যায়।

এই দ্বিতীয় ঘরটা আগের ঘরটার চাইতেও যেন শাদাসিধে, বাহুল্যবর্জিত। একটা কাঠামোর ওপর একটা শক্ত ক্যানভাস চাপানো, একটা জাজিম—বহু ব্যবহারে চেপটে গিয়েছে, কিছু পুরু কম্বল, একটা পশমিনা চাদর, একটা জলের কুঁজো, একটা ফায়ারপ্লেস —যাতে কোনো ছাই বা ভস্মাবশেষ নেই—তার ওপরকার ম্যান্টলপীসের ওপর একটা বেলেপাথরের গামলা, আর ওক কাঠের একটা দেরাজ— যার ভেতর রাশি-রাশি বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি। এ-ঘরটা নিশ্চয়ই সেই পুরাতন ভৃত্য হেরমানেরই। আগের ঘরটার জানলা যদি-বা ঘরে যাতে হাওয়া আসে, সেজন্যে একটু খোলা ছিলো, এ-ঘরের জানলা কিন্তু ছিটকিনি দিয়ে আটকানো। নিকট-অতীতে কোনোদিনই যে সে-জানলা খোলা হয়েছে, তা মনে হ'লো না। ছিটাকিনিটা জংধরা, আড় হ'য়ে আছে। লোহার-ফ্রেমে-আঁটা খড়খড়িটা শুদ্ধু নাড়ানো গেলো না।

কিন্তু মোদ্দা কথা এটাই যে, ঘরটা ফাঁকা। যদি চিলেকোঠা, মিনার, রান্নাঘরের নিচে মাটির তলার ভাঁড়ার—সব এ-রকমই শূন্য প'ড়ে থাকে, তাহ'লে বুঝতে হবে প্রভু-ভৃত্য দুজনেই বাড়িটা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে—আর-কখনও ফিরে আসবে কিনা, তা-ই বা কে জানে!

'আপনার কি মনে হয়,' আমি মঁসিয় স্টোপার্ককে জিগেস করেছি, 'ভিলহেল্ম স্টোরিৎস কোনোভাবে আগেভাগেই এই তদন্তের কথা জেনে গিয়েছিলো?'

'না, মঁসিয় ভিদাল, যদি-না সে টাউনহলে আমার ঘরে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থেকে থাকে, অথবা রাজভবনে আমি যখন রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলছি, তখন সেখানে যদি লুকিয়ে না-থাকে, তাহ'লে এ-কথা তার ঘুণাক্ষরেও জানবার কথা নয়!'

'আমরা বুলভার দিয়ে যখন আসছি, তখন নিশ্চয়ই তার চোখে প'ড়ে থাকবো।'

'হয়তো—কিন্তু আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে তারা পালাবে কোন চুলোয়?'

'খিড়কির দুয়োর দিয়ে যদি খোলা মাঠটায় চ'লে যায়—'

'বাগানের ঐ দেয়াল টপকাবার সময় তারা পেতো কোথায়? দেয়ালটা তো খুবই

উঁচু। তাছাড়া অন্যপাশটা দিয়ে তো কেল্লার প্রাচীর গিয়েছে—সেটা তারা পেরুবে কী ক'রে?'

মঁসিয় স্টোপার্কের ধারণা : ভিলহেল্ম স্টোরিৎস আর হেরমান নিশ্চয়ই আমরা বাড়ির ধারে-কাছে আসার অনেক আগেই চম্পট দিয়েছে।

আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ল্যাণ্ডিঙের সিঁড়ি দিয়ে যেই ওপরে উঠতে যাবো, অমনি কানে এসেছে একতলার সিঁড়িতে কার দুপদাপ পায়ের শব্দ, যেন কেউ হুড়মুড় ক'রে ছুটে যাচ্ছে। আর ঠিক তারই সঙ্গে কানে এসেছে কার প'ড়ে যাবার শব্দ, আর আর্তনাদ।

রেলিঙ থেকে ঝুঁকে দেখি, আমরা যে-সেপাইকে নিচে পাহারায় রেখে এসেছিলুম সে উঠে প'ড়ে তার পেছনটা ডলছে।

অমনি মঁসিয় স্টেপার্ক শুধিয়েছেন, 'কী হয়েছে, লুডভিগ?'

লুডভিগ ইনিয়েবিনিয়ে যা বলেছে তার সারমর্ম এই : সে সিঁড়ির দ্বিতীয় পইঠায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলো, এমন সময় তার কানে এসেছে কে যেন দুপদাপ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে ছুটেছে। তাড়াতাড়িতে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে যেই দেখতে যাবে কী ব্যাপার, সে নিশ্চয়ই আচমকাই বড্ড জোরে ঘুরেছিলো, কারণ তা দু-পাই সিঁড়ি দিয়ে হড়কে যায়, আর সে চিৎপাত হ'য়ে বেকায়দায় প'ড়ে যায়। কেমন ক'রে যে পড়েছে সেটাই এক রহস্য। তার নিশ্চিত ধারণা, কেউ যেন তার পা ধ'রে হ্যাঁচকা একটা টান দিয়েছিলো—কিংবা এমন জোরে ধাক্কা দিয়েছিলো যে সে টাল সামলাতে না-পেরে প'ড়ে গেছে। অথচ সেটাও কোনোমতেই সম্ভব নয়। কারণ সদর দরজার কাছে যে-সেপাইরা পাহারা দিচ্ছে, তারা ছাড়া এখানে কোনো জনমানব ছিলো না।

'হুম!' চিন্তার এই ছোট্ট আওয়াজটুকু ছাড়া মঁসিয় স্টেপার্কের মুখ থেকে আর-কোনো আওয়াজ বেরোয়নি।

তার মিনিট খানেক বাদেই আমরা গিয়ে তেতলায় পৌঁছেছি।

সারা তেতলা জুড়ে, এ-মাথা থেকে ও-মাথা অব্দি, একটাই চিলেকোঠা, দুটো স্কাইলাইট থেকে আলো ঢুকছে সে-ঘরে, একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই আমরা বুঝেছি, এখানেও কেউ এসে আশ্রয় নেয়নি। মাঝখানে একটা কাঠের সিঁড়ি, সেটা গেছে মিনারে, ছাতের ওপর। সিঁড়িটা যেখানে ছাত ছুঁয়েছে, সেখানে একটা ওপর-দরজা, পাল্লাটা ঠেললে ওপরদিকে উঠে যায়।

'দরজাটা খোলা দেখছি,' আমি মঁসিয় স্টেপার্কের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। তিনি অবশ্য ততক্ষণে মইটার পইঠায় পা রেখেছেন।

'হ্যাঁ, মঁসিয় ভিদাল, আর ওখান দিয়ে বেশ টাটকা হাওয়াও আসছে ঘরটায়। আমরা নিশ্চয়ই তারই আওয়াজ শুনে থাকবো। আজ বেশ জোর হাওয়া দিচ্ছে—ছাতের ওপর হাওয়ামোরগটা বেশ আওয়াজ ক'রেই পাক খাচ্ছে।'

'কিন্তু,' আমি একটু আপত্তিই জানিয়েছি, 'আওয়াজটা মনে হচ্ছিলো কারু যেন

পায়ের শব্দ।'

'কিন্তু কে আর হাঁটবে, বলুন ? বাড়িটায় তো কারু চুলের ডগাটিও দেখা গেলো না।'

'যদি সে ঐ ওপরে থাকে, মঁসিয় স্টেপার্ক ?'

'ঐ পাখির বাসায় ? আকাশে ?'

কাপ্তেন হারালান এতক্ষণ চুপচাপ আমাদের আলাপ শুনেছে। এবার সে মিনারটা দেখিয়ে চলেছে, 'চলুন, ওপরে যাই।'

মঁসিয় স্টেপার্কই প্রথমে মইটা বেয়ে উঠেছেন, পাশে একটা মোটা দড়ি ঝুলছিলো, সেটা ধ'রে-ধ'রে। তারপর কাপ্তেন হারালান, সব শেষে আমি। আট ফিট x আট ফিট হবে আয়তন, সম্ভবত দশ ফিট উঁচু, আর বেশ অন্ধকার, যদিও ওপরে একটা কাচের পাল্লা আছে। আসলে ঘরটা যে আঁধার হ'য়ে আছে, তার কারণ ভারি-ভারি পশমের পর্দা ঝুলছে চারপাশে। সেগুলো টেনে সরাতেই পুরো জায়গাটা ফটফটে দিনের আলোয় ভেসে গেলো।

প্রথমেই বলা উচিত, এই মিনারটাও ফাঁকাই ছিলো—কেউ কোথাও ছিলো না। পরোয়ানা নিয়ে এসে মঁসিয় স্টেপার্কের এই ছোঁ-মেরে-পড়া একেবারেই নিষ্ফল হয়েছে —আমরা এখনও জানি না কাল রাতে ঐ রহস্যময় ব্যাপারগুলো কী ছিলো।

আমি ভেবেছিলুম, এই কাচের মিনার হয়তো তৈরি হয়েছে আকাশটাকে পড়বার জন্যে—হয়তো জ্যোতির্বিদ্যার যন্ত্রপাতি থাকবে সেখানে। আমি ভুল ভেবেছিলুম। থাকার মধ্যে সেখানে ছিলো একটা টেবিল আর কাঠের চেয়ার।

টেবিলের ওপর প'ড়ে ছিলো কতগুলো কাগজ। তার মধ্যে বুডাপেশ্‌টে যে-খবরকাগজ পড়েছিলুম, তারই একটা সংখ্যা—সেই-যাতে আসন্ন স্টোরিৎস-বার্ষিকীর কথা বেরিয়েছিলো। অন্য-সব কাগজপত্তরের সঙ্গে-সঙ্গে এ-সব কাগজও পুলিশ বাজেয়াপ্ত করলে।

বোঝাই যাচ্ছে, তার ল্যাবরেটরি বা ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস এখানেই এসে বিশ্রাম করে। খবরটা যে সে মন দিয়ে পড়েছে, তার প্রমাণ-স্বরূপ খবরটার পাশে লাল কালি দিয়ে একটা ঢ্যাড়া আঁকা।

ঠিক সেই মুহূর্তে ক্রুদ্ধ বিস্ময়ের একটা চীৎকার সেই মিনারের পাখির বাসায় ফেটে পড়েছে।

কাপ্তেন হারালান দেয়ালের গায়ে একটা তাকে একটা ছোট্ট হালকা কাঠের বাক্স দেখে, সেটার ডালা শুধু খুলেছিলো...

আর বাক্সটা থেকে কী ওটা বার ক'রে নিয়ে এসেছে সে ?

সেই *বিয়ের মুকুটটা* ! সেটা কাল রাত্তিরে ডাক্তার রডারিখের বাড়ি থেকে কেউ সকলের তাজ্জব চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে এসেছিলো!

দশম পরিচ্ছেদ

তাহ'লে এ-বিষয়ে আর-কোনো সন্দেহই নেই যে কাল সন্ধের ব্যাপারগুলোয় ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর হাত আছে : এখন আর এটা নিছকই সন্দেহ বা অনুমানের স্তরে নেই। যাকে বলে বাস্তব সাবুদ, তা-ই এখন হাতে আছে আমাদের। চুরিটা যেই হাতে-নাতে ক'রে থাক, এই কিম্ভূত মুকুটহরণের ব্যাপারটি যে তারই *সুবিধের* জন্যে ঘটানো হয়েছে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, আমরা যদিও-অবশ্য এখনও জানি না সে-কোন আজব উপায়ে দৃশ্যমান না-হ'য়েও চুরিটা কে করেছে।

কাপ্তেন হারালানের গলা তখন রাগে কেঁপে উঠেছে। 'এখনও কি আপনার কোনো সন্দেহ আছে, মঁসিয় ভিদাল?'

মঁসিয় স্টেপার্ক কেমন যেন থম মেরে গিয়েছেন। এই আশ্চর্য প্রহেলিকাটির প্রায় বেশির ভাগ অংশই এখনও অজ্ঞাত র'য়ে গেছে। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর অপরাধ যদিও এখন তর্কাতীতভাবে প্রমাণ হ'য়ে গেছে, সে-যে কোন আজব পদ্ধতি মারফৎ কাজটা হাসিল করেছে, সেটা কারু জানা নেই, কেউ কোনোদিন জানতে পারবে কি না তাও জানা নেই।

কাপ্তেন হারালান যদিও তার ক্ষুব্ধ কুপিত প্রশ্নটা আমাকেই জিগেস করেছে, আমি তবু তাকে কোনো উত্তর দিইনি। কীই-বা বলতে পারতুম আমি?

সে কিন্তু তখনও রেগে-তিনটে হ'য়ে ব'লেই চলেছে : 'এই হতচ্ছাড়াই কি আমাদের মুখের ওপর *ঘৃণাবিদ্বেষের স্তব* ছুঁড়ে দিয়ে আমাদের নিদারুণভাবে অপমান ক'রে যায়নি —যে-গানটা মাগিয়ার স্বদেশপ্রেমের গালে প্রচণ্ড-একটা থাপ্পড় কষিয়েছে! হ্যাঁ, এটা ঠিক যে আপনারা তাকে চাক্ষুষ দেখতে পাননি, তবে তার গলা যে নিজের কানেই শুনেছেন, সেটা তো আর অস্বীকার করতে পারবেন না। তাকে আমরা চোখে না-দেখলেও এই পাজির পাঝাড়াটা অকুস্থলেই ছিলো! আর যে-মুকুটটাকে তার স্পর্শ অমনভাবে কলুষিত করেছে, আমি চাই না তার কোনো অংশ অটুট থাকুক!'

মুকুটটা সে প্রায় ভেঙে ফেলতেই যাচ্ছিলো, শুধু শেষ মুহূর্তে মঁসিয় স্টেপার্ক তাকে সামলেছেন। 'এটা ভুলে যাবেন না, কাপ্তেন হারালান, সাবুদ হিশেবে এটাকে দেখাতে হবে। আর তা জরুরিও হবে, কারণ আমার ধারণা ব্যাপারটা বিস্তর জল ঘোলা ক'রে দেবে।'

শুনে অবিশ্যি কাপ্তেন হারালান মুকুটটা তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে, তারপর আমরা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসেছি। নিষ্ফলভাবে বাড়ির প্রত্যেকটা ঘর আরো-একবার খুঁজে তল্লাশ ক'রে আমরা তারপর বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসেছি।

সদর দরজা আর ফটক বন্ধ ক'রে সীল ক'রে দেয়া হ'লো, আর দুজন সেপাই রইলো পাহারায়।

মঁসিয় স্টেপার্ক আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় পই-পই ক'রে ব'লে দিয়েছেন আমরা যাতে এই তদন্তের কথাটা গোপন রাখি, ঘুণাক্ষরেও কাউকেই যেন এ-কথা জানতে দিই না যে ঐ *হানাবাড়িটায়* গিয়ে আমরা সব তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে এসেছি, বিয়ের মুকুটটাকে পেয়েছি মিনারের পাখির বাসাটায়।

বুলভার দিয়ে আমি যখন কাপ্তেন হারালানের সঙ্গে রডারিখ-ভবনের দিকে হেঁটে আসছি, সে কিন্তু তখনও নিজেকে সামলে উঠতে পারেনি—তার প্রতিটি আচার-আচরণে ভাবেভঙ্গিতে পদক্ষেপে প্রচণ্ড রাগ ফুটে বেরুচ্ছিলো। মিথ্যেই আমি চেষ্টা করেছি তাকে শান্ত করতে। এটাও মনে-মনে আশা করেছি যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস হয়তো এখন শহর ছেড়ে কেটে পড়েছে—কিংবা নাও যদি গিয়ে থাকে, এখন যখন তার বাড়ি খানাতল্লাশ ক'রে হাতে-নাতেই জানা গেছে যে সে এই ব্যাপারটার সঙ্গে লিপ্ত আর সাবুদটা পুলিশ বাজেয়াপ্ত ক'রে নিজের হেফাজতে রেখেছে, তখন সে চম্পট দেবারই চেষ্টা করবে। আমি তাকে বলেছি, 'শোনো, হারালান, আমি তোমার এই রাগের কারণটা ভালোই বুঝতে পারি, এও বুঝতে পারি তুমি চাও এ-সব পেজোমির জন্যে সে উপযুক্ত সাজা পাক। কিন্তু এটাও ভুলে যেয়ো না যে মঁসিয় স্টেপার্ক পই-পই ক'রে ব'লে গিয়েছেন পুরো ব্যাপারটা গোপন রাখতে।'

'আর বাবা? আর তোমার ভাই মার্ক? তারা কি এই তদন্তের ফল কী হ'লো, তা জানতে চাইবে না?'

'চাইবে, তবে আমরা তাঁদের শুধু এই কথাটাই বলবো যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর সঙ্গে আমরা কিছুতেই দেখা করতে পারিনি—সম্ভবত সে রাগৎস ছেড়েই কেটে পড়েছে। এটা ঠিক মিথ্যেও বলা হবে না।'

'মুকুটটা কোনখানে পাওয়া গেছে, সে-কথা আপনি তাঁদের জানাবেন না?'

'জানাবো, তাঁদের সেটা জানাও উচিত। তবে তোমার মাকে বা বোনকে এ-সম্বন্ধে কিছু বলার কোনো মানে হয় না। খামকা তাঁদের শঙ্কা বা উদ্বেগ বাড়িয়ে লাভ কী? আমি হ'লে শুধু বলতুম যে মুকুটটা তোমাদের বাগানেরই এককোণায় পাওয়া গেছে। ব'লে তোমার বোনকে মুকুটটা দিয়ে দিতুম।'

এ-রকম মিথ্যের আশ্রয় নিতে কাপ্তেন হারালানের মন ওঠেনি বটে, তবে শেষ পর্যন্ত তার মনে হয়েছে আমিই বোধহয় ঠিক বলেছি। মঁসিয় স্টেপার্ক অবশ্য মুকুটটা হাতছাড়া করতে চাইবেন না, তবে ঠিক হ'লো, আমি গিয়ে তাঁর কাছ থেকে সেটা নিয়ে আসবার চেষ্টা করবো।

এ-সব কথা মুখে বলেছি বটে, তবে মার্ককে আড়ালে ডেকে নিয়ে সব কথা খুলে বলতে চাচ্ছিলুম আমি। আরো-বেশি-ক'রে চাচ্ছিলুম, বিয়েটা এবার ভালোয়-ভালোয় উৎরে গেলেই হয়।

রডারিখভবনে পৌঁছুবামাত্র ভৃত্য এসে আমাদের পড়ার ঘরে নিয়ে গেছে—সেখানেই মার্ক ডাক্তার রডারিখের সঙ্গে ব'সে-ব'সে আমাদের প্রতীক্ষা করছিলো। এতই তারা

অধীর হ'য়ে উঠেছিলো যে আমরা চৌকাঠ পেরুবার আগেই তারা আমাদের প্রশ্নে-প্রশ্নে জর্জরিত ক'রে ফেলেছে।

যখন আমরা সব খুলে বলেছি, বুলভার তেকেলির ঐ হানাবাড়িতে কী-কী দেখেছি বা হয়েছে, তখন দুজনেই ঘৃণায়-ক্রোধে-বিস্ময়ে একেবারে রি-রি ক'রে উঠেছে ! মার্ক তো রীতিমতো মাথাগরম ক'রে ফেলেছিলো। কাপ্তেন হারালানের মতো তারও মত, ও-সব ন্যায়বিচার-টিচার মাথায় থাক, এক্ষুনি গিয়ে বাছাধনকে একটা উচিত শিক্ষা দিয়ে আসা যাক।

মিথ্যেই আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে তার এই *পহেলা দুশমনটি* নিশ্চয়ই রাগ্‌ৎস ছেড়ে চ'লে গিয়েছে।

শুনেই, মার্ক ব'লে উঠেছে : 'রাগ্‌ৎস-এ যদি না-থাকে, তবে নিশ্চয়ই স্প্রেমবার্গে আছে। যাবে কোথায় !?'

আমি তাকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছি না দেখে শেষে ডাক্তার রডারিখ আমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। 'মার্ক, তোমার দাদা যা-বলছেন, সে-কথা তোমার শোনা উচিত। যা হবার তা হয়েছে—এবার এই বিশ্রী ব্যাপারটা মন থেকে তাড়িয়ে দাও—ভুলে যাবার চেষ্টা করো। এ নিয়ে আর আলোচনা কোরো না, তবেই দেখবে ব্যাপারটা মন থেকে স'রে গিয়েছে।'

দু-হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে মার্ক যখন ক্রুদ্ধ ও হতাশ ব'সে থেকেছে, তখন তার দিকে আর তাকানো যাচ্ছিলো না। তার মনের মধ্যে কী-যে তোলাপড়া চলেছে, তার সবটা না-হোক, অনেকটাই আমি আন্দাজ করতে পারছিলুম।

ডাক্তার রডারিখ আরো জানিয়েছেন : তিনি নিজে রাজভবনে গিয়ে রাগ্‌ৎস-এর *বড়োলাটের* সঙ্গে দেখা করবেন। হাজার হোক, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস এখানে বিদেশী, রাজ্যপাল নিশ্চয়ই তাকে এখান থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিতে কোনো দ্বিধা করবেন না। যে-বিষয়টায় আমাদের সতর্ক হ'য়ে লক্ষ রাখা উচিত, তা হ'লো, কাল যা-সব আজব অপকীর্তি ঘ'টে গিয়েছে, তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাক বা না-যাক, সে-রকম কোনো কেচ্ছাকেলেঙ্কারি যাতে আর না-ঘটে। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যে জাঁক দেখিয়ে হুমকি দিয়ে গেছে, তার তাঁবেদারিতে ভূতপ্রেতপিশাচ আছে, অতিপ্রাকৃত সব শক্তি, তাকে আর পাত্তা না-দেয়াই ঠিক হবে।

আবারও আমি জোর দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছি কেন মাদাম রডারিখ ও মাইরাকে এ-বিষয়ে সব বিশদ ক'রে ব'লে দেবার দরকার নেই। মুকুটটা সম্বন্ধে আমার পরামর্শটাকেই মেনে নেয়া হ'লো। মার্ক গিয়ে তাকে বলবে যে সেটাকে তারা শেষ অব্দি বাগানেই খুঁজে পেয়েছে। তাতে অন্তত মনে হবে যে এ কারু বদ রসিকতা বৈ আর-কিছু নয়, তাকে খুঁজে বার ক'রে উচিত সাজাই দেয়া হবে পরে।

সেদিনই আবারও একবার টাউনহলে যেতে হয়েছে আমায়। মঁসিয় স্টেপার্ককে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে মুকুটটা নিয়ে আমি রডারিখ-ভবনে ফিরে গেছি।

সেদিন সন্ধেবেলায় আমরা যখন মাদাম রডারিখ আর মাইরার সঙ্গে আসর জমিয়ে ব'সে চুটিয়ে গল্পগুজব করছি, মার্ক একটু খোলা হাওয়ায় হেঁটে আসবে ব'লে বাইরে গিয়েই, ফের হন্তদন্ত হ'য়ে ফিরে এসেছে। 'মাইরা ! মাইরা। এই দ্যাখো, তোমার জন্যে আমি কী নিয়ে এসেছি !'

দেখেই, আসন থেকে উঠে মাইরা ছুটে গেছে তার দিকে। '*এ-যে আমার মুকুট !*'

'হ্যাঁ, কী কাণ্ড দ্যাখো, বাগানের একটা ফুলের ঝাড়ের পাশে প'ড়ে ছিলো।'

'কিন্তু কেমন ক'রে ? কেমন ক'রে গেলো ওখানে !' মাদাম রডারিখ বিস্ময়ে থ।

'কেমন ক'রে আবার ?' ডাক্তার রডারিখ ব'লে উঠেছেন, 'উটকো কোনো লোক নিশ্চয়ই রবাহূত ঢুকে পড়েছিলো অতিথিদের মধ্যে। তারপর বিশ্রী, কুরুচিকর একটা রসিকতা করেছে লোকটা। যাক, এই আজগুবি ব্যাপারটা নিয়ে আর আমাদের খামকা মাথা ঘামাতে হবে না।'

মাইরার চোখ ফেটে ততক্ষণে টলটলে মুক্তোর মতো জল বেরিয়ে এসেছে। সে শুধু বারে-বারে বলেছে, 'ওহ্, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে, মার্ক, *ধন্যবাদ !*'

পরের দিনগুলোয় আর-নতুন কোনো ঘটনা ঘটেনি, মাগিয়ার শহরটাও ফিরে পেয়েছে তার অভ্যস্ত নিস্তরঙ্গ জীবনযাপনের ভঙ্গিমা। বুলভার তেকেলির হানাবাড়িটায় পুলিশ যে তন্নতন্ন ক'রে খানাতল্লাশ চালিয়ে এসেছে, সে-কথা কেউ জানতেও পায়নি, কেউই এ-প্রসঙ্গে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর নামও আর উল্লেখ করেনি। এখন আমাদের শুধু ধীরস্থিরভাবে—কিংবা হয়তো অস্থিরভাবেই—অপেক্ষা করতে হবে শুভদিনটার জন্যে, যেদিন মার্ক আর মাইরার বিয়েটা ঘটা ক'রেই সম্পন্ন হবে।

মার্ক বেশির ভাগ সময়টাই আমায় একা কাটাতে দিয়েছে। আমি সময়টা কাটিয়েছি রাগ্‌ৎস-এর আশপাশে ঘুরে বেড়িয়ে, আর মাঝে-মাঝেই কাপ্তেন হারালানও *যথারীতি* আমার সঙ্গী হয়েছে। বুলভার তেকেলি দিয়ে না-গিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে শহরের বাইরে যাওয়াটা একটু অস্বাভাবিকই হ'তো আমাদের পক্ষে। সেই হানাবাড়িটা যেন হারালানকে চুম্বকের মতো টানছিলো। কিন্তু তাতে এটা কেবল আমরা বুঝতে পেরেছি বাড়িটা অন্তত-এখনও ফাঁকাই প'ড়ে আছে, তাছাড়া এখনও দুজন সেপাই সারাক্ষণ মোতায়েন আছে পাহারায়। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যদি ফিরে আসতো তবে কিছুতেই সেপাইদের চোখে ধুলো দিতে পারতো না—এবং তক্ষুনি তাকে গ্রেফতার করা হ'তো। তাছাড়া, সে-যে এখানে নেই এখন, এবং রাগ্‌ৎস-এর রাস্তায় যে আচমকা তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই, এটার একটা প্রমাণও আমাদের হাতে এসে গিয়েছিলো।

২৯শে মে খোদ মঁসিয় স্টেপার্কের মুখ থেকে আমি জানতে পেরেছিলুম যে অটো স্টোরিৎস-এর মৃত্যুর সেই পূর্বঘোষিত বার্ষিকী উৎসব ২৫শে মে স্প্রেমবার্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসবে অনেক লোক হয়েছিলো, আশপাশের শহর থেকেই শুধু নয়, বার্লিন থেকেও নাকি লোক এসেছিলো। হাজার-হাজার লোক হয়েছিলো সেখানে, এত লোক যে কবরখানায় আঁটেনি, লোক তার আশপাশেও উপচে পড়েছিলো। অনেক হৈ-হট্টগোল-

হ্যাঙ্গামাও হয়েছে, দুর্ঘটনা অপঘাতমৃত্যুও বাদ যায়নি। ভিড়ের মধ্যে দম আটকে, বা ভিড়ের চাপে পিষে গিয়েও, অনেক লোক নাকি মারা গিয়েছে সেই করবখানায়।

এটা তো কেউ ভুলে যায়নি যে অটো স্টোরিৎস-এর জীবনমৃত্যুকে ঘিরে কত-কী কিংবদন্তি গজিয়ে উঠেছিলো, এবং এত-সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধবিশ্বাসী মানুষ তার *অলৌকিক ক্ষমতার* একটা মরণোত্তর নিদর্শন দেখতে চাচ্ছিলো। আশ্চর্য-কিছু যদি এই উৎসবে না-ঘটে, তবে আর অটো স্টোরিৎস-এর মাহাত্ম্য রইলো কী? আর-কিছু না-হোক প্রুশিয়ার এই সিদ্ধপুরুষটিকে তো সর্বসমক্ষে কবর থেকে উঠে আসতে হয়। আর সেই মুহূর্তে পৃথিবীর আহ্নিক গতিতে যদি বিষম-কোনো ঝামেলা পাকিয়ে বসে, তাহ'লেও লোকে হয়তো অবাক হবে না। পৃথিবী হয়তো দিনরাত্রির আবর্তনটা হঠাৎ উলটো দিকে ঘুরেই শুরু ক'রে দিলে নতুন ক'রে, পশ্চিম থেকে পুবে ঘুরলেই বা পৃথিবীকে *ঠেকাচ্ছে* কে। তাতে সৌরজগৎ গোল্লায় যাক, তো, যাক-না!

লোকের মধ্যে এমনি-সব কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিলো তখন। আসলে কিন্তু পুরো অনুষ্ঠানটাই হয়েছিলো নীরস, সাধারণত এমন-সব স্মরণোৎসব যেমন হ'য়ে থাকে তেমনি। কবরের পাথর ভেতর থেকে হ্যাঁচকা টান মেরে কাঁচা ঘুম ভেঙে কেউ জেগে ওঠেনি। প্রেতসিদ্ধই হোক বা বিজ্ঞানসাধকই হোক, মৃত ব্যক্তি তার পারলৌকিক আশ্রয় ছেড়ে আদপেই বেরোয়নি আর পৃথিবীও তার আপন অক্ষচক্রকে কেন্দ্র ক'রে যেমন ঘুরতো তেমনি ঘুরে চলেছে তার আহ্নিকগতিতে।

কিন্তু যে-তথ্যটা এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সেটা এই : অটো স্টোরিৎস-এর পুত্রবর সেই অনুষ্ঠানে *সশরীরে* উপস্থিত ছিলো। সে-যে রাগ্‌ৎস ছেড়ে চ'লে গিয়েছে, এটাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমি শুধু আশা করেছি যে সে যেন তার ভৃত্যকে নিয়ে আর এখানে ফিরে না-আসে।

তক্ষুনি আমি খবরটা পৌঁছে দিয়েছি মার্ক আর কাপ্তেন হারালানকে—যেহেতু তারা তখনও মাথাগরম ক'রে *অহেতুক* (?) ক্ষুব্ধ হ'য়ে ব'সে ছিলো।

যদিও এই তাজ্জব ঘটনাগুলো যে-শোরগোল তুলেছিলো, তার প্রায় অনেকটাই তখন মিলিয়ে এসেছে, রাগ্‌ৎস-এর রাজ্যপাল কিন্তু তখনও বেশ-একটু অস্বস্তি বোধ করেছেন। পুরোটাই কি কারু হাতসাফাই ছিলো, ভেলকির খেলা ছিলো, না কি সত্যি এর মধ্যে ছিলো ব্যাখ্যাতীত কোনোকিছুর উপস্থিতি—সেই রহস্যটার এখনও-অব্দি কোনো কিনারা হয়নি, আর এটাও ঠিক যে কানাঘুষোয় এ-ব্যাপারটা শহরের শান্তি যথেষ্ট বিঘ্নিত করেছিলো; এ-রকম যাতে আর-কখনও না-হয় তার ব্যবস্থা করা জরুরি ব'লেই রাজ্যপালের মনে হচ্ছিলো। সেইজন্যেই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে মঁসিয় স্টেপার্ক তাঁকে যখন ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর হুমকি ও অপকীর্তির কথা খুলে বলেছিলেন, তখন তিনি কতটা বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলেন। তাই এই তদন্তের ফলাফল জেনে, বিশেষত ও-বাড়িতে *চোরাইমাল* পাওয়া গেছে জেনে রাজ্যপাল ঠিক করেছিলেন বিদেশীকে এজন্যে বিশেষ কঠোর দণ্ড দেবেন। আর-কিছু না-হোক, একটা জিনিশ চুরি হয়েছে;

ভিলহেল্ম স্টোরিৎস নিজে ঐ চুরি ক'রে থাকুক বা না-থাকুক, তার *উশকানিতেই* ব্যাপারটা ঘটেছে অথবা এতে তার *সরাসরি হাত* আছে—কোনোভাবে। সে যদি রাগ্‌ৎস ছেড়ে চ'লে না-যেতো, তবে তাকে গ্রেফতার করা হ'তো, আর একবার তাকে হাজতে পুরে ফেলতে পারলে আবার *দৃশ্য বা অদৃশ্য ভাবে* ডাক্তার রডারিখের বাড়িতে গিয়ে তার পক্ষে নতুন-কোনো অপকর্ম করা সম্ভব হবে না। সেইজন্যেই ৩০শে মে রাজ্যপালের সঙ্গে মঁসিয় স্টেপার্কের যে-কথোপকথন হয়েছিলো সেটা এইরকম :

'আপনি এ-সম্বন্ধে আর নতুন-কোনো খবর পাননি?'

'না, ইওর এক্সেলেন্সি।'

'ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যে ফের রাগ্‌ৎস ফিরে আসবার মৎলব এঁটেছে, এমন মনে করবার কোনো কারণ ঘটেনি আশাকরি?'

'কিছুমাত্র না—কোনো কারণই নেই।'

'তার বাড়ির ওপর সেপাইরা এখনও নজর রেখেছে?'

'দিবারাত্রি—চব্বিশ ঘন্টাই।'

'আমি ভেবেছি এ-বিষয়ে বুডাপেশ্‌টে সবিশেষ লিখে-জানানো আমার কর্তব্য,' জানিয়েছেন রাজ্যপাল, 'এ-ব্যাপারটা এখানে কতখানি শোরগোল তুলেছে সেটা বুডাপেশ্‌টের জানা উচিত। ব্যাপারটার যাতে এখানেই ইতি ঘটে, সেইজন্যে যা-যা করা দরকার সবকিছুর আগাম অনুমোদন জানিয়ে সেখান থেকে বার্তা এসেছে।'

'যতক্ষণ-না ভিলহেল্ম স্টোরিৎস রাগ্‌ৎসে ফিরে আসছে,' মঁসিয় স্টেপার্ক বলেছেন, 'ততক্ষণ তার কাছ থেকে ভয় করবার কিছু নেই আমাদের। সে-যে অন্তত পঁচিশ তারিখে স্প্রেমবার্গ ছিলো, সে-খবর আমরা নিশ্চিতভাবে জানি।'

'তা ঠিক, তবে সে হয়তো এখানে ফিরে আসবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠতে পারে। যাতে সে এখানে ফিরে না-আসতে পারে, তারই ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।'

'তার চাইতে সহজ আর-কিছু নেই, ইওর এক্সেলেন্সি। যেহেতু ব্যাপারটা একজন বিদেশীকে নিয়ে, তাই বহিষ্কারের ফতোয়া জারি ক'রে দিলেই চলবে।'

'এমন-এক ফতোয়া, যা তাকে যে শুধু রাগ্‌ৎস থেকেই বার ক'রে দেবে তা নয় —গোটা অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় রাজ্য থেকেই বার ক'রে দেবে।'

'হুকুমনামাটা হাতে পাবামাত্র,' মঁসিয় স্টেপার্ক কথা দিয়েছেন, 'আমি সীমান্তের সব পাহারাদারদেরই নির্দেশ পাঠিয়ে দেবো।'

ফতোয়াটায় তক্ষুনি দস্তখৎ ক'রে সীলমোহর ক'রে দেয়া হয়েছে—আর গোটা দেশেই ভিলহেল্ম স্টোরিৎস অবাঞ্ছিত বিদেশী ব'লে ঘোষিত হ'য়ে গেছে।

ব্যবস্থাটা নেয়া হয়েছিলো আমাদের সবাইকেই আশ্বস্ত করার জন্যে। কিন্তু তখন আমরা যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেতুম যে কী হ'তে চলেছে, তাহ'লে হয়তো অমন মিথ্যা আশ্বাসে স্বস্তি পেতুম না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে। শিগগিরই পয়লা জুনের সূর্য—শেষ অব্দি পয়লা জুনই বিয়ের দিন হিশেবে ঠিক হয়েছে—উঠবে রাগ্‌ৎস-এর দিগন্তে।

এটা আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে মাইরা—কচি বয়েসে লোকে এমনিতে অনেককিছু নিয়ে অকারণেই মাথা ঘামায়, কিন্তু মাইরা ঐ দুর্বোধ প্রহেলিকাটিকে তেমন ক'রে আর মনে রাখেনি। এটাও ঠিক যে তার বা তার মায়ের সামনে একবারও অবশ্য ভিলহেল্‌ম স্টোরিৎসের নামটাই পাড়া হয়নি।

তার বিশেষ-কোনো সখী ছিলো কি না জানি না, তবে আমিই তার মনের কথা খুলে বলবার অন্তরঙ্গ শ্রোতা হ'য়ে উঠেছিলুম। পরে কী করবে না-করবে সে-সম্বন্ধে সে কী ভাবছে, তা সে আমায় খুলে বলেছিলো, অবশ্য সেগুলো তার স্বপ্নই, কখনও সফল হবে কি না কে জানে। মার্কের সঙ্গে ফ্রান্‌সে গিয়ে সেখানেই থাকবে ব'লে কি মনস্থ করেছে ? হ্যাঁ, যাবে ফ্রান্‌সে, থাকবেও, তবে এখন নয়, পরে। এক্ষুনি বাবা-মাকে ছেড়ে চ'লে যেতে হ'লে ভারি কষ্ট পাবে সে।

'তবে,' এটাও সে জুড়ে দিয়েছিলো, 'আপাতত পারী গিয়ে কয়েক হপ্তা কাটিয়ে আসবো—আপনিও আসবেন তো আমাদের সঙ্গে, আসবেন না ?'

'নিশ্চয়ই। তবে সত্যি-সত্যি তোমরা তৃতীয় ব্যক্তিকে সঙ্গে চাইবে কি না কে জানে।'

'তা ঠিক। নবদম্পতি কোনোকালেই বেড়াতে যাবার যোগ্য সঙ্গী হয় না।'

'আমি না-হয় অসুবিধেগুলো মেনেই নেবো,' অগত্যা যেন মেনেই নিয়েছিলুম আমি।

ডাক্তার রডারিখের কাছে মনে হয়েছিলো ফ্রান্‌সে চ'লে যাবার এই পরিকল্পনাটা খুবই ভালো। সবদিক বিবেচনা ক'রেই মনে হয়েছে, দু-এক মাসের জন্যে রাগ্‌ৎস ছেড়ে চ'লে গেলে ভালোই হবে। মাদাম রডারিখ হয়তো কন্যা কাছে না-থাকায় একটু কষ্ট পাবেন, কিন্তু মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেলে কী আর করা ?

আর মার্ক ? মাইরার সঙ্গে যখন থাকে, তখন সময় কেমন ক'রে কেটে যায় টেরই পায় না। অন্যসময় সে অরুচিকর প্রসঙ্গটা ভুলেই থাকতে চাইতো—কে আর হৃদয় খুঁড়ে অমনতর বিশ্রী জিনিশ নিয়ে মনখারাপ ক'রে থাকে ! তবে শুধু আমার কাছেই সে খুলে বলতো তার দুর্ভাবনাগুলো—আমি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চাইলেও সবসময় এই আশঙ্কা সে কাটিয়ে উঠতে পারতো না। থেকে-থেকেই আমায় জিগেস করতো, 'নতুন-কিছু হয়েছে নাকি, আঁরি ?'

'না, কিছুই হয়নি,' আমি বলতুম, আর মিথ্যেও বলতুম না।

একদিন তার মনে হয়েছে আমাকে বোধহয় আগে থেকে ব'লে রাখা উচিত।

'শহরে কানাঘুষো কিছু কানে এলে, বা মঁসিয় স্টেপার্কের কাছ থেকে কিছু জানতে পেলে—'

'আমি তোকে হুঁশিয়ার ক'রে দেবো, মার্ক।'

'সে তুই যা-ই শুনিস না কেন, আমি চাইবো না তুই আমার কাছ থেকে কিছু লুকোস।'

'আমি-যে কিছুই তোর কাছ থেকে লুকোবো না, সে-বিষয়ে তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস। তবে তোকে এই আশ্বাসটুকু দিতে পারি যে এ নিয়ে এখন আর কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। শহর ফের আগের মতোই দিব্বি নির্ভাবনার পালে ফুরফুরে হাওয়া লাগিয়ে চলেছে। কেউ তার ব্যাবসা দেখছে, কেউ-বা খুঁজে বেড়াচ্ছে প্রমোদ, আর বাজারদর তো কেবলই বেড়ে চলেছে...'

'তুই ঠাট্টা করছিস, অঁরি।'

'সেটা তোকে এটাই বোঝাতে যে আমার মনের মধ্যে কোনো শঙ্কা নেই।'

'অথচ তবু,' মার্কের মুখচোখে কালাছায়া পড়েছে, 'যদি সেই লোকটা—'

'বাঃ! সে অমন গাড়ল নয়। সে বেশ ভালোই জানে যে হাঙ্গেরির কোথাও পা দেবামাত্র তাকে গ্রেফতার ক'রে হাজতে পোরা হবে। জার্মানিতে অনেক মেলা হয়—সেখানে সে তার ভেলকি দেখিয়ে সবাইতে তাক লাগিয়ে দিতে পারবে।'

'তাহ'লে সে-যে ভুতুড়ে পিশাচশক্তি লেলিয়ে দেবার হুমকি দিয়েছিলো—'

'ছেলেভোলানো গল্প হিশেবে সেগুলো চমৎকার ছিলো, চটকদারও!'

'তাহ'লে তুই সে-সবে বিশ্বাস করিস না?'

'তুই যতটুকু করিস, তার চেয়ে বেশি নিশ্চয়ই নয়। শোন, মার্ক, তুই বরং এখন থেকে প্রহর গোন, হিশেব ক'রে দ্যাখ আর ক-মিনিট বাকি আছে শুভলগ্নের। আর-কিছু করার না-থাকলে ফের আবার এক থেকে গুনতে শুরু করতে পারিস।'

'ধুর! তুই বড্ড বাজে বকিস।'

'তুই ভারি ছেলেমানুষি করছিস, মার্ক। মাইরা তোর চাইতে অনেক-বেশি কাণ্ডজ্ঞান ধরে।'

'সে তো কেবল এইজন্যে যে আমি যা জানি ও তা জানে না।'

'কী জানিস তুই, বল-তো! এটা জানিস যে লোকটা এখন আর রাগৎস-এ নেই, সে আর এখানে ফিরে আসতে পারবে না—কারণ তার নামে একটা হুলিয়া বেরিয়েছে; এও জানিস যে তার সঙ্গে আর-কখনোই আমাদের কোনো মোলাকাৎ হবে না। এত-সব জেনেও তুই যদি অবুঝের মতো ভয় পাস...'

'সে তুই কী জানবি, অঁরি। আমার মনের মধ্যে কেবলই কু ডাকছে...'

'এর চেয়ে হাস্যকর আর-কিছু হয় না, মার্ক! শোন, বরং তুই মাইরার কাছে গিয়েই আড্ডা দে। তখন হয়তো এ-সব আবোলতাবোল ভাবনা ভুলে থাকতে পারবি!'

'হ্যাঁ, তুই ঠিকই বলেছিস, অঁরি। ওকে আমার ছেড়ে-থাকা ঠিক না—এক মিনিটের

জন্যেও ওর কাছছাড়া হওয়া উচিত হবে না।'

বেচারা! ওর দিকে তাকাতেও আমার কষ্ট হচ্ছিলো, শুনতেও। যতই বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে ততই তার আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে। আমিও একটু উদ্বিগ্ন বোধ করছিলুম বৈ কি!—মার্কের কথা ভেবেই। তবে মার্ককে যদি-বা মাইরা ঠাণ্ডা রাখতে পারে, কাপ্তেন হারালানকে নিয়ে আমি করবো কী? যে-মুহূর্তে সে শুনেছে যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে স্প্রেমবার্গে দেখা গেছে, সে অমনি সেখানে যাবার জন্যে প্রায় পা বাড়িয়ে দিয়েছিলো। অনেক কষ্টে, অনেক বুঝিয়ে-শুঝিয়ে, তবে আমি তাকে *ঠেকিয়েছি*। স্প্রেমবার্গ মাত্র তো দুশো লিগ দূরে, দিন-চারেকের মধ্যেই এ-পথটুকু পেরিয়ে যাওয়া যায়, অনেক তুইয়ে-বুইয়ে তাকে *ঠেকিয়েছি* বটে, ডাক্তার রডারিখও ছেলেকে অনেক বুঝিয়েছেন, তবু সে মন থেকে ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলতে পারেনি—স্প্রেমবার্গে গিয়ে একটা হেস্তনেস্ত ক'রে আসবার জন্যে তার হাত-পা যেন নিশপিশ করছিলো। আমার ভাবনা হচ্ছিলো সে হয়তো আমাদের না-ব'লেই একদিন চ'লে যাবে। সেদিন সকালে সে যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, তখন তার ভাবভঙ্গি দেখেই আমার মনে হয়েছে যে সে ওখানে যাবে ব'লেই মনস্থির ক'রে ফেলেছে।

'এটা কিন্তু তোমার করা ঠিক হবে না, হারালান,' আমি তাকে আবারও বলেছি, 'এ-কাজ তুমি *কোরো না*। ঐ প্রুশিয়ানের সঙ্গে তোমার দেখা হওয়া অসম্ভব। আমি তোমাকে অনুনয় ক'রে বলছি, হারালান, রাগ্‌ৎস ছেড়ে তুমি কোথাও যেয়ো না।'

'শুনুন, ভিদাল,' কাপ্তেনের গলার স্বরে কঠিন দৃঢ়তা, 'ঐ পাজির পাঝাড়াটাকে একটা কঠিন সাজা দিতেই হবে!'

'অপকর্মের সাজা সে পাবেই—দু-দিন আগে আর পরে?' আমি ব'লে উঠেছি, 'এ নিয়ে তুমি মনে কোনো সন্দেহই পুষে রেখো না। তবে তাকে পাকড়াবার দায়িত্ব সেপাইদের—তোমার নয়।'

কথাটা তার মনে ধরেছে বটে, কিন্তু তবু সে তার জেদ ছাড়বে না, বলেছে, 'ভিদাল, আপনি যেভাবে ব্যাপারটাকে দেখছেন, আমি সেভাবে দেখছি না। আমাদের দেখার ধরনটাই ভিন্ন। আমার পরিবারকে—আপনার ভাইও তার অংশ হ'তে চলেছে—কলুষিত করেছে সে, আর আমি তার কোনো শোধ নেবো না? কোনো হিশেবনিকেশ হবে না তার?'

'প্রতিশোধ কোনো কথাই নয়, হারালান। মূল কথা: ন্যায়বিচার। আর তার দায়িত্ব অন্যদের।'

'কিন্তু লোকটা যদি না-ই ফেরে, তবে তার বিচার হবে কেমন ক'রে? এই-যে আজ রাজ্যপাল বহিষ্কারের ফতোয়ায় সই করেছেন, তাতে স্টোরিৎস তো আর-কখনও এখানে ফিরতেই পারবে না। পর্বত আর মহম্মদ—কে কার কাছে যাবে, ভিদাল? সে যদি না-আসে, তবে আমি গিয়ে তাকে তার ডেরা থেকে টেনে বার ক'রে নিয়ে আসবো। যদি সে স্প্রেমবার্গে থেকে থাকে—'

'মানি, আর-কিছুতেই ব্যাপারটার কোনো ফয়সালা না-হ'লে হয়তো তা-ই করতে হবে আমাদের, তবে অন্তত বোনের বিয়ে-হ'য়ে-যাওয়াটা অব্দি অপেক্ষা করো। আর-তো শুধু কয়েকটা দিন, তারপর আমি নিজেই তোমাকে বলবো, এবার গিয়ে একটা এস্পার-ওস্পার ক'রে এসো। আমি নিজেই তোমার সঙ্গে স্প্রেমবার্গ যাবো তখন।'

এই কথাটা আমি এতই জোর দিয়ে বলেছি যে আমাদের কথাবার্তা শেষটায় সাঙ্গ হয়েছে প্রায় একটা *কথা* দিয়েই যে বিয়ে হ'য়ে-যাওয়ার পর আমি আর-কোনো আপত্তিই করবো না, এবং আমি তখন তার সঙ্গ নেবো।

পয়লা জুন যেন আর আসতেই চাচ্ছে না। অথচ আমার বারে-বারে মনে হয়েছে এই সময়টার মধ্যে কেউ যেন আর ঘাবড়ে না-যায়, তাদের আমি অনবরত চাঙ্গা ক'রে তোলবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার নিজের মন থেকে অস্বস্তিটা কিছুতেই কাটেনি। কাজেই, সে-যে কোন অলুক্ষুণে আশঙ্কা আমায় তাড়িয়ে নিয়ে গেছে জানি না, তবে বারে-বারে আমি বুলভার তেকেলির হানাবাড়িটার সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছি।

সেপাইরা ছোঁ মেরে পড়বার পর যেমন সীল ক'রে গিয়েছিলো দরজা, হানাবাড়িটা তেমনি প'ড়ে আছে। দরজা-জানলা বন্ধ, উঠোন বা বাগান পরিত্যক্ত। বুলভার থেকে চারপাশে ছড়িয়ে আছে সেপাইদের সদাজাগ্রত পাহারা। প্রভু বা ভৃত্য—কেউই আর ফিরে এসে বাড়িতে ঢোকবার চেষ্টা করেনি। অথচ, মার্ক বা হারালানকে পই-পই ক'রে যা বলেছি, নিজেকেও আমি বারে-বারে যে-সব কথা ব'লে বুঝিয়েছি; সব সত্ত্বেও, যেন একটা ঘোরের মতো, *আবেশের মতো,* আমার মনে হয়েছে যে যদি চিমনি থেকে কোনো ধোঁয়া উঠতে দেখি, বা কোনো মুখ দেখি জানলায় বা মিনারের পাখির বাসায়, তবে আমি যেন আদৌ অবাক হবো না।

রাগৎস-এর লোকজন যদিও অ্যাদ্দিনে তাদের ভয়টা কাটিয়ে উঠেছে, ঐ-সব আজব কাণ্ড নিয়ে আর-কোনো উচ্চবাচ্যই করছে না কেউ, আমরা নিজেরা—ডাক্তার রডারিখ, মার্ক ভিদাল, কাপ্তেন হারালান এবং আমি, স্বয়ং অঁরি ভিদাল—আমরা কেউই যেন ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে মন থেকে তাড়াতে পারছি না, সে যেন নিছক হানাই দিচ্ছে না আমাদের মনে, সেখানে সে যেন একটা মৌরসীপাট্টাই গেড়ে বসেছে।

সেদিন—তিরিশে মে—মনের বোঝাটা হালকা করবার জন্যে বিকেলবেলায় আমি দানিউবের তীরে বেড়াতে গিয়েছিলুম; জাহাজঘাটার পাশ দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি একটা হালকা মালখালাশ-নৌকো তরতর ক'রে উজান বেয়ে আসছে। তক্ষুনি আমার মনে প'ড়ে গেছে, পর-পর পটের গায়ে ছবির মতো, আমার নিজের যাত্রার কথা : কী ক'রে জার্মানটির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলা, তার সেই অপমানকর ব্যবহার, প্রথম দেখেই তার বিরুদ্ধে মনটা আমার কেমন রি-রি ক'রে উঠেছে; তারপরেই, যখন আমি ধ'রে নিয়েছি যে সে তীরে নেমে গিয়েছে, তখনই কথাগুলো কানের পাশে উচ্চারণ করেছে সে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই *সে-ই* এ-সব কথা ব'লে শাসিয়েছিলো, ডাক্তার রডারিখের বৈঠকখানায় তার গলা শুনেই আমি সেটা চিনতে পেরেছি। সেই উচ্চারণের ভঙ্গি, সেই রুক্ষ কর্কশ

চোয়াড়ে গলা, সেই আলেমান ঔদ্ধত্য! এ-সব স্মৃতি যখন মনের মধ্যে হানা দিচ্ছে, আমি নিজের অজান্তেই তাকিয়ে ছিলুম যাত্রীদের দিকে—কারা-কারা নামছে রাগৎস-এ। সেই রংজ্বলা মুখ, সেই অদ্ভুত চাউনি, সেই পৈশাচিক অভিব্যক্তিটা খুঁজে বেড়িয়েছে আমার চোখ। কিন্তু, যেমন বইয়ে বলে, অত তাকিয়ে দেখেও কোনো লাভই হয়নি।

ছটার সময় আমি যথারীতি গিয়ে হাজির পারিবারিক ভোজের আসরে। মাদাম রডারিখকে দেখে মনে হয়েছে আগের চাইতে অনেক ভালো আছেন, নিজেকে তিনি চমৎকার সামলে নিয়েছেন। আর আমার ভ্রাতাটি তো মাইরা পাশে থাকলে বিশ্বসংসারই ভুলে যায়। এমনকী কাপ্তেন হারালানকেও বেশ শান্ত দেখাচ্ছিলো, যদিও মুখের মধ্যে একটা কালো ছায়া লেগেই ছিলো।

আমি ঠিক ক'রে রেখেছিলুম যে এদের মন থেকে বিচ্ছিরি স্মৃতিগুলো তাড়িয়ে দিয়ে আনন্দ ফুটিয়ে তোলবার জন্যে দরকার হ'লে তিনবার ডিগবাজিও খাবো টেবিলটায়। অসম্ভবকেই সম্ভব ক'রে তুলবো। আমার পরিকল্পনাকে চমৎকার সহায়তা করেছিলো মাইরা : সে-ই ছিলো সেই সন্ধের হাসিখুশি হুল্লোড়ের উৎস—আর সন্ধে গড়িয়ে গিয়েছিলো গভীর রাতে। কেউ কিছু না-বলতেই সে গিয়ে বসেছে ক্লাভিকর্ডের কী-বোর্ডে, আমরা সবাই গলা মিলিয়ে গান ধরেছি—পুরোনো সব মাগিয়ার গান, যেন সেই জঘন্য *ঘৃণাবিদ্বেষের স্তবের* রেশটুকুকে মুছে দিতে চাচ্ছি সবাই।

ঠিক যখন আমরা বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি, মাইরা হালকা চটুল গলায় মৃদু হেসে বলেছে : 'ভুলে যাবেন না, মঁসিয় অঁরি, যে কালকেই—'

'ভুলবো, মাদামোয়াজেল?' আমারও গলা বুঝি সমান চটুলই শুনিয়েছে।

'না, ভুলবেন না যে কালকেই আমরা রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর অনুমোদন নেবো—'

'আরে, তা-ই তো, কালকেই তো!'

'আর আপনি আপনার ভাইয়ের তরফে সাক্ষী হবেন।'

'আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে খুব ভালো করেছেন, মাদমোয়াজেল মাইরা। আমার ভাইয়ের তরফে সাক্ষী! আমি যে বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলুম।'

'আমি অবশ্য তাতে মোটেই অবাক হইনি। দেখছি, ক-দিন ধ'রেই আপনি যেন কীসের—বা কার—ধ্যান ক'রে চলেছেন!'

'কবুল করছি, ঘাট হয়েছে। তবে কথা দিচ্ছি আর ও-রকম ভুল হবে না। আর মার্ক যতক্ষণ না-ভুলছে...'

'তার হ'য়ে আমিই কথা দিচ্ছি। তাহ'লে ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় চারটেয়।'

'চারটেয়, মাদমোয়াজেল মাইরা? কী কাণ্ড, এদিকে আমি ভেবেছিলুম বুঝি সাড়ে-পাঁচটায়... ঠিক আছে, ভেবো না! আমি চারটে বাজতে দশ মিনিটেই ওখানে হাজির হ'য়ে যাবো।'

'তাহ'লে, শুভরাত্রি!'

‘শুভরাত্রি, মাদমোয়াজেল মাইরা!’

পরদিন সকালে মার্কের কতগুলো জায়গায় যাবার কথা ছিলো। আমি ভেবেছি, সে বুঝি তার ভয়-টয় কাটিয়ে উঠেছে, তাই তাকে যেতে দিয়েছি।

তবে, সাবধানের মার নেই ভেবে, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যে শেষ মুহূর্তে এখানে এসে হাজির হয়নি, এটা জানতে আমি সরাসরি টাউনহলে গিয়ে হাজির হয়েছি।

আমাকে দেখেই মঁসিয় স্টেপার্ক আমার প্রশ্নটা বুঝে নিয়েছেন। বলেছেন, ‘না, মঁসিয় ভিদাল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—আমাদের শ্রীমানকে রাগ্‌ৎস-এর কোথাওই দেখা যায়নি।’

‘এখনও স্প্রেমবার্গেই আছে নাকি সে?’

‘এটুকু শুধু বলতে পারি যে চারদিন আগেও সে ওখানেই ছিলো।’

‘আপনি নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবরটা পেয়েছেন?’

‘হ্যাঁ, আলেমান পুলিশের এক চর মারফৎ।’

‘যাক, আশ্বস্ত হওয়া গেলো।’

‘আমি কিন্তু বড্ড বিরক্তি বোধ করছি। এই পিশাচটা—পিশাচ ছাড়া একে আর কী-নামে ডাকবো, বলুন—পিশাচটা কিছুতেই সীমান্ত পেরিয়ে এখানে আসতে চাচ্ছে না! অপেক্ষা ক’রে-ক’রে ক্লান্ত হ’য়ে যাচ্ছি।’

‘না-এলেই কিন্তু ভালো, মঁসিয় স্টেপার্ক!’

‘আপনাদের পক্ষে হয়তো ভালো। তবে পুলিশ তার ঘাড়েটাড়ে হাত রাখতে পারলে খুশি হতুম আমি। পিশাচটাকে জেলে পুরতে পারলে স্বস্তি পেতুম! যাক—সে না-হয় পরে কোনোদিন করা যাবে।’

এ-কথার পর তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ফিরে এসেছি।

বিকেল চারটের সময় আবার আমরা সকলে রডারিখ-ভবনে জমায়েৎ হয়েছি। বুলভার তেকেলিতে দুটো কোচবাক্স অপেক্ষা করছিলো: একটায় যাবে তার বাবা-মা এবং পারিবারিক বন্ধু বিচারপতি নয়মানের সঙ্গে মাইরা; অন্যটায় মার্ক, কাপ্তেন হারালান, তার জিগরি দোস্ত লিউটেনান্ট আর্মগাড়, আর আমি। মঁসিয় নয়মান আর কাপ্তেন হারালান কনের দিককার সাক্ষী; লিউটেনান্ট আর্মগাড় আর আমি বরের পক্ষের সাক্ষী।

কাপ্তেন হারালান আগেই আমাকে এখানকার দস্তুরটা বুঝিয়ে বলেছিলো। এটা আসলে বিয়ে নয় ঠিক, বরং তার প্রস্তুতি। রাজ্যপালের অনুমোদন পাবার পরই শুধু, কাল, ক্যাথিড্রালে বিয়ের আসল অনুষ্ঠানটা হবে। ততক্ষণ অব্দি, বাগ্‌দত্তরা আইনের চোখে বিবাহিত দম্পতি নয়, তবে তার প্রায় পনেরো-আনা কাছাকাছি—কেননা তারপর যদি কোনো অভাবিত বিপত্তির ফলে বিয়েটা না-হয় তাহ’লে তাদের সারাজীবন অবিবাহিত থেকে যেতে হবে।

ফ্রান্‌সের ফিউড্যাল ব্যবস্থায় এরই কাছাকাছি একটা নিয়ম ছিলো, যা থেকে পিতৃতান্ত্রিকতার বাড়াবাড়িটা বোঝা যায়: সমাজপতি নিজেকে সমাজের পিতা ব’লেই

গণ্য করতেন—আর সেই প্রথাটা আজও রাগ্‌ৎস-এ বজায় আছে।

কনের পরনে চমৎকার একটা ঝলমলে ঘাগরা; মাদাম রডারিখও সূক্ষ্মভাবে সেজেছেন, তবে ভঙ্গিটা শাদাসিধে হ'লে কী হবে, ভীষণ দামি তাঁর সাজপোশাক, ডাক্তার এবং বিচারপতি পরেছেন রাজভবনে যাবার উপযোগী পোশাক, যেমন পরেছি আমি আর মার্ক, আর সামরিক বাহিনীর অফিসার দুজন পরেছে পুরোদস্তুর সামরিক উর্দি।

বুলভারে অনেকেই জমায়েৎ হয়েছিলো, বর-কনের গাড়ি কখন এখান দিয়ে যায়; বেশির ভাগই কিশোরী এবং বয়স্কা মহিলা, তাদের কাছে যে-কোনো বিয়েই বোধহয় দারুণ উত্তেজনার খোরাক। তবে পরদিন যে ক্যাথিড্রালে মস্ত ভিড় জ'মে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই—রডারিখ পরিবারের যা নামডাক, তাতে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক।

কোচগাড়ি দুটো রডারিখ-ভবন থেকে বেরিয়ে সরাসরি রাজভবনের দিকেই ছুটেছে। শহরের রাস্তায় আর রাজভবনের সামনে দস্তুরমতো ভিড়ই জ'মে গিয়েছে। সম্ভবত বিয়েটাকে ঘিরে আগে যা-সব আজব ব্যাপার ঘ'টে গিয়েছে তাতেই তারা এত কৌতূহলী হ'য়ে উঠেছে, হয়তো ভেবেছে যে আবার-কোন্ নতুন ফ্যাসাদ বেধে যায় এখন!

কোচগাড়ি দুটো তারপর সোজা রাজভবনের চকমেলানো সিঁড়ির সামনে গিয়ে থেমেছে। পরক্ষণেই বাবার বাহু ধ'রে নেমে এসেছে মাইরা, মঁসিয় নয়মানের বাহু ধ'রে নেমেছেন মাদাম রডারিখ, তারপর মার্ক, কাপ্তেন হারালান, লিউটেনান্ট আর্মগাড় আর আমি দরবারঘরে আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় চ'লে গেছি। ঘরের মাঝখানে বড়ো-একটা টেবিল, তাতে দুটো ঝুড়ি ভর্তি ফুল ঝলমল ক'রে উঠেছে।

কনের বাবা-মা হিশেবে রডারিখ দম্পতি বসেছেন বাগ্‌দত্ত দুজনের দু-পাশে দুটি বিশাল আরামকেদারায়। তাদের পেছনে বসেছি আমরা—সাক্ষী চারজন । ঘোষক জানিয়েছে রাজ্যপালের আগমনবার্তা : তিনি ঢুকতেই সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে।

তাঁর সিংহাসনে বসবার পর রাজ্যপাল সরকারিভাবে কনের পিতামাতাকে জিগেস করেছেন মার্ক ভিদালের সঙ্গে তাঁদের মেয়ের বিয়ে দিতে তাঁদের সম্মতি আছে কি না। তারপরে তিনি হবু দম্পতিকে আলাদা-আলাদা ক'রে প্রথাগত প্রশ্ন জিগেস করেছেন।

'মার্ক ভিদাল, তুমি মাইরা রডারিখকে তোমার বৈধ পত্নী হিশেবে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো কি?'

'আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম,' মাগিয়ার আদবকায়দা মার্ক বেশ তালিম দিয়েছিলো।

'মাইরা রডারিখ, তুমি মার্ক ভিদালকে বৈধ পতি হিশেবে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো কি?'

'আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম,' কথার কোনো খেলাপই হবে না, এমনি একটা ভঙ্গি ক'রে বলেছে মাদমোয়াজেল মাইরা!

'আমরা, রাগ্‌ৎস-এর রাজ্যপাল,' রাজ্যপাল ঘোষণা করেছেন, 'আমাদের উপর সম্রাজ্ঞীর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, রাগৎস-এর যুগসঞ্চিত প্রথা অনুযায়ী, মাইরা রডারিখের সহিত মার্ক ভিদালের শুভ পরিণয়ে অনুমোদন প্রদান করিলাম। ইহাই আমাদের অভিপ্রায়

ও নির্দেশ যে উক্ত বিবাহ-অনুষ্ঠান যেন নগরীর ক্যাথিড্রালে যথাবিহিত প্রথা অনুযায়ী সমাধা হয়।'

সবকিছুই দস্তুর অনুযায়ী সোজাসুজি শেষ হ'য়ে গেলো। যারা এতে অংশ নিয়েছে তাদের অস্বস্তির কোনো কারণ ঘটেনি। যে-কাগজটায় আমরা সবাই সই করেছি, কোনো অদৃশ্য হাত ভেলকি দেখিয়ে সেটা শূন্যে তুলে নিয়ে কুচি-কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফ্যালেনি —কিংবা সই করবার আগে কোনো ভূতপ্রেত এসে আমাদের হাত থেকে কলমটা কেড়ে নেয়নি।

ভিলহেল্ম স্টোরিৎস তাহ'লে সত্যিই নিশ্চয়ই স্প্রেমবার্গেই থেকে গিয়েছে। জার্মানদের মনে হর্ষ জাগিয়ে তাদের মধ্যেই সে না-হয় কাটিয়ে দিক তার চিরটা কাল। আর যদি সে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে রাগ্‌ৎস এসে থাকে, তাহ'লে তার সব জাদুবলই হয়তো উধাও হ'য়ে গেছে। কিন্তু এই পিশাচসিদ্ধ ভেলকিবাজ এখন চাক বা না-চাক, মাইরা রডারিখ এখন শুধু মার্ক ভিদালের পত্নীই হবে, তা না-হ'লে—আর-কারুই নয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

এসে পৌঁছেছি পয়লা জুনে। অবশেষে একসময়। অথচ সময় এমনই ধীর লয়ে কাটছিলো যে মনে হচ্ছিলো বহুপ্রতীক্ষিত এই পয়লা জুন বুঝি আর আসবেই না। কিন্তু ক্যালেণ্ডারের পাতায় যথানিয়মেই সে এসে হাজির এখন। আর মাত্রই কয়েকটা ঘণ্টা, তারপরেই রাগ্‌ৎস-এর ক্যাথিড্রালে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'য়ে যাবে।

পনেরো দিন আগে যে-দুর্বোধ্য প্রহেলিকার মুখোমুখি হ'য়ে আমরা একেবারেই ভড়কে গিয়েছিলুম, আর তার জের হিশেবে যে-শঙ্কার বোধ মনের মধ্যে হানা দিচ্ছিলো, রাজ্যপাল সকাশে গিয়ে তা এখন একেবারেই মুছে গিয়েছে।

আমি উঠেছি ভোরবেলাতেই। ভেবেছি, বড্ড আগেই বুঝি ঘুমটা ভেঙে গেলো, কিন্তু উঠে দেখি মার্ক আমারও আগে উঠে পড়েছে। আমি যখন সাজপোশাক পরছি, সে পুরোদস্তুর সাজগোজ ক'রে আমার ঘরে এসে হাজির। বরের সাজই প'রে ফেলেছে সে। মুখটা আনন্দে ঝলমল করছে, কোত্থাও কোনো ছায়া নেই সেই আনন্দের মধ্যে। সে আমাকে উদ্ভাসিত সুরে *সুপ্রভাত* জানিয়েছে, আর আমি তার হাতে হাত রেখেছি।

'মাইরা তোমায় বলতে বলেছে যে—' সে বেশ গুছিয়েই শুরু করেছিলো, কিন্তু আমি হো-হো ক'রে হেসে ফেলেছি, বলেছি, 'যে, *মহাকাণ্ডটা* আজকেই হবে। তা, তুই ওকে ব'লে দিস যে রাজভবনে যখন দেরি ক'রে যাইনি, তখন ক্যাথিড্রালেও দেরি হবে না। কাল আমি একেবারে চার্চের বড়োঘড়িটার সঙ্গে আমার ঘড়ি মিলিয়েছি। তবে তোর,

মার্ক, তোর উচিত হবে না ওদের অপেক্ষা করিয়ে রাখা! তোর উপস্থিতি কতটা জরুরি, সেটা নিশ্চয়ই জানিস তুই : ওরা তোকে ছাড়া কিছু শুরু করতেই পারবে না!'

মার্ক অমনি হন্তদন্ত হ'য়ে বেরিয়ে গেছে আর আমিও তাড়াহুড়ো ক'রে আমার কাজ শেষ করেছি—অথচ তখন কিন্তু সকাল নটাও বাজেনি।

ডাক্তার রডারিখের বাড়ি গিয়ে দেখা করার কথা আমাদের। সেখান থেকেই কোচগাড়িগুলো পর-পর বেরুবে। সময়ানুবর্তিতার বদলে বেশ-একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছি আমি, যখন গিয়ে পৌঁছুনো উচিত তার ঢের আগেই চ'লে এসেছি এবং তা দেখে কনে ফিক ক'রে হেসেছে একটু। আমি গিয়ে তারপর বসেছি ড্রয়িংরুমে।

একের পর এক অতিথিরা আসতে শুরু করেছে, বিশেষ ক'রে যারা রাজভবনের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলো। সব্বাই, তখনও যেমন, আজকেও তেমন—যেন পাল্লা দিয়ে মাঞ্জা দিয়েছে। সামরিক বাহিনীর অফিসার দুজন ফিটফাট সেজে আছে পুরোপুরি সামরিক পোশাকে, পদক-ভূষণ সমেত।

মাইরা রডারিখ—তা মাইরা ভিদাল বললেই বা ক্ষতি কী এখন? যেহেতু বাগ্‌দত্তরা এখন রাজ্যপালের ফরমান-বলে চিরবন্ধনে আবদ্ধ—মাইরা, শুক্লবসনাসুন্দরী, হালকা ফিনফিনে রেশমি আঁচল বিছিয়ে আছে পেছনে, নারঙ্গি মুকুলও আছে যথারীতি, কোমরে ফুলের কটিহার, আর ঝলমলে সোনালি চুলে দারুণ মানিয়েছে বিয়ের মুকুটটিকে, তার তলা থেকেই মুখের ওপর বেছানো জালি-ওড়না। এই মুকুটটাই *বাগানে কুড়িয়ে পেয়েছে* ব'লে মার্ক তাকে এনে দিয়েছিলো—এটা ছাড়া আর-কোনো মুকুট সে পরবেই না। মায়ের সঙ্গে মরালগতিতে ড্রয়িংরুমে ঢুকেই সোজা সে আমার দিকে এসে তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি সেটা স্নেহভরে আমার হাতে টেনে নিয়ে ঝাঁকিয়েছি। তারপর, চোখ দুটো থেকে আলো ঝ'রে পড়ছে যেন, সে ব'লে উঠেছে : 'দাদা! কী-যে খুশি হয়েছি, কী বলবো!'

এর আগে, এই বিয়ে নিয়েই, এই বাড়ির ওপর দিয়ে যে-ঝড় ব'য়ে গিয়েছে, এখন আর তার কোনো চিহ্নই নেই। শুধু কাপ্তেন হারালানই সব কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি, কিন্তু সেও আমার হাতে হাত মিলিয়ে বলেছে, 'নাঃ, ও-সব বাজে ব্যাপারে আর মাথা ঘামানো ঠিক হবে না!'

'দিনের কাজের সূচি সকলেরই মনের মতো ক'রে ঠিক করা হয়েছিলো। কাঁটায়-কাঁটায় পৌনে দশটায় আমরা ক্যাথিড্রালের উদ্দেশে রওনা হ'য়ে পড়বো, যেখানে স্বয়ং রাজ্যপাল শহরের অন্যান্য মান্যগণ্যদের নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকবেন। বিয়ের জন্যে চার্চের খ্রিষ্টযাগ হবে, আর সন্ত মিখায়েলের সুরক্ষিত স্যাক্রিস্টিতে সঞ্চিত নথিসেরেস্তায় সই করা হবে—অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ইত্যাদি। তারপর ফিরে-আসা হবে মধ্যাহ্নভোজে—মোটমাট জনাপঞ্চাশ নিকট-বন্ধু থাকবেন তাতে। সন্ধেবেলায় নৃত্যগীত, বল, আনন্দ-মজলিশ, তার জন্যে এরই মধ্যে দুশো নিমন্ত্রণপত্র বিলি হ'য়ে গেছে।

যাবার সময় কোচগুলিতে বসবার ব্যবস্থা ছিলো আগের দিনটারই মতন। ক্যাথিড্রাল

থেকে ফেরবার সময় মার্ক আর মাইরা ভিদাল বসবে একই কোচবাক্সে—এবার তারা চিরকালের মতো যুগলবন্দী। অন্য কোচগাড়িগুলোয় আসবে বাকি সব লোক।

পৌনে দশটার সময় কোচগাড়িগুলো *রডারিখ-ভবন* থেকে বেরুলো। আবহাওয়া চমৎকার, সূর্য উঠে এসেছে অনেকটাই, ঝিরঝিরে হাওয়া পাঠিয়ে দিয়েছে দানিউব, প্রায়-একটা শোভাযাত্রাই যেন চলেছে ক্যাথিড্রালের দিকে, রাস্তা থেকেও লোক এসে যোগ দিয়েছে। সবাই তাকিয়ে আছে সামনের কোচগাড়িটার দিকে, মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সবাই কনের দিকে, মার্কের প্রতিও কম তারিফের ভাব নেই। রাস্তার দু-পাশের খোলা জানলায় হাস্যোজ্জ্বল সব মুখ, চারপাশ থেকে আসছে অভিনন্দনের ধ্বনি—এত লোক যে ডাক্তার রডারিখদের গুণমুগ্ধ, এই শোভাযাত্রা না-দেখলে তা বিশ্বাস করা শক্ত হ'তো।

আমি আমার মনোভাব ধ্বনিতেই ব্যক্ত করেছিলুম : 'এই শহর থেকে আনন্দ-স্মৃতি নিয়েই ফ্রান্‌সে ফিরে যাবো দেখছি!'

'হাঙ্গেরীয়রা আপনাদের সম্মান দেখাবার ছলে আসলে ফ্রান্‌সকেই সম্মান জানাচ্ছে, মঁসিয় ভিদাল,' লিউটেনান্ট আর্মগাড় আমার কথা শুনে বলেছে, 'আর এই বিয়ে মারফৎ রডারিখ পরিবারে এখন যে একজন ফরাশি সদস্যও আছে, তাতেও তারা ভারি খুশি।'

চকের সামনে পৌঁছুবামাত্র এত ভিড় জ'মে গেছে যে ঘোড়াগুলো শুধু আস্তে, দুলকি চালেই, এগুতে পেরেছে।

দূরে ক্যাথিড্রালের মিনার থেকে ঘণ্টার উল্লাস ফেটে পড়েছে, আর পুব-থেকে-আসা হাওয়া সেই ধ্বনিই উড়িয়ে নিয়ে এসেছে এদিকে, আর ঠিক দশটার সময় প্রহরতোরণের সুমধুর প্রহরঘণ্টার সঙ্গে মিশেছে সন্ত মিখায়েলের ধ্বনিগম্ভীর গভীর নাদ। আর তার পাঁচ মিনিট পরে আমাদের কোচগাড়ি দুটো এসে থেমেছে সিঁড়ির সামনে, ক্যাথিড্রালের প্রধান দুয়ারের কবাটগুলো খোলা, আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে।

সবচেয়ে আগে নেমেছেন ডাক্তার রডারিখ, তারপর নেমেছে তাঁর মেয়ে, নেমেই তাঁর বাহু আঁকড়ে ধরেছে। মঁসিয় নয়মান তাঁর বাহু বাড়িয়ে দিয়েছেন মাদাম রডারিখের দিকে, তারপর গিয়েছি আমরা, মার্কের পেছন-পেছন, দর্শকদের সারির মধ্য দিয়ে, আর সেই মুহূর্তেই ক্যাথিড্রালের বিশাল অর্গ্যানটা বেজে উঠেছে, আর সেই ধ্বনিমহিমার মধ্যেই শোভাযাত্রা ঢুকেছে সেই পবিত্র খ্রিষ্টমন্দিরে।

উঁচু বেদিটার সামনেই দুটো চেয়ার পাশাপাশি পাতা, মার্ক আর মাইরা এগিয়ে গেছে তাদেরই দিকে। তাদের পেছনে কনের বাবা-মা এবং সাক্ষীরা গিয়ে যে-যার নির্দিষ্ট আসনে ব'সে পড়েছে।

অগুনতি অভ্যাগত এরই মধ্যে ভরিয়ে ফেলেছে সারি-সারি আসনগুলো : রাগৎস-এর রাজ্যপাল ধর্মাধিকরণের বিচারপতিরা, দুর্গের সমস্ত উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার, শাসনব্যবস্থায় যাঁদেরই একটু প্রতাপ আছে তাঁদের সবাই, স্বজনবন্ধু, এবং তাঁদের সকলের শেষে ব্যাবসাবাণিজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। মহিলাদের জন্যে ভিন্ন ব্যবস্থা ছিলো বসবার,

সেখানে একটাও আসন শূন্য ছিলো না—ঝলমলে সাজপোশাকে সেখানে যেন প্রজাপতির হাট ব'সে গিয়েছিলো।

আর শহরের অন্য লোকেরা? তারা যেন উপচে পড়েছিলো চার্চ ছাপিয়ে, যে যেখানে পেরেছে কোনোরকমে কোনো আসনে ব'সে পড়েছিলো—কিন্তু তাছাড়াও কত লোক যে ভেতরে ঢুকতে পারেনি, তারা দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, সিঁড়িতে।

এই জমায়েতের যদি কয়েকজন লোকেরও মনে থেকে থাকে কিছুদিন আগে সে-কোন তাজ্জব ভেলকির খেলা শহরটাতে আলোড়ন তুলেছিলা, তারা কি তবু ভাবতে পেরেছিলো যে ক্যাথিড্রালেও তার কোনো পুনরাবৃত্তি হবে? নিশ্চয়ই না, কারণ লোকে তখন ভেবেছিলো সে-সব পিশাচসিদ্ধ কারু কাজ, শয়তানের কোনো চেলার; সাধ্য কী যে সে ফের এই দিব্যভূমি চার্চে এসে কোনো গোল পাকায়? 'শয়তানের সব জারিজুরি কি চার্চের চৌকাঠেই খতম হ'য়ে যায় না!'

গায়কদের সারির ডান দিক থেকে এসেছেন প্রধান যাজক, এবং তারপর তাঁর সহযোগীরা—পদমর্যাদা অনুযায়ী পর-পর, সব-শেষে শিশুগায়কদের দল।

যা-কিছু মহিমা আছে আনুষ্ঠানিক খ্রিষ্টযাগের কিছু বাদ যায়নি, আবারও নতুন ক'রে উঁচু পর্দায় বেজেছে *কিরিয়ে ইলাইসন* আর *গ্লোরিয়া*।

তারপর যেই ঘণ্টা বেজেছে সুগম্ভীর, আস্ত জমায়েৎ উঠে দাঁড়িয়েছে, যাজক গেয়ে শুনিয়েছেন *মথি লিখিত সুসমাচার*; তারপর প্রধানযাজক, মার্ক আর মাইরার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সরাসরি ভাবগম্ভীর ভঙ্গিতে, তাদের উদ্দেশ ক'রে তাঁর কথা বলেছেন। তাঁর গলা তেমন জোরালো ছিলো না। পক্ককেশ লোলচর্ম কোনো বৃদ্ধের গলা সেটা, কিন্তু যা বলেছেন তা এমন সহজসরল ও শাদাসিধে যে তা যেন সরাসরি গিয়ে মাইরার অন্তর স্পর্শ করেছিলো। তিনি গুণকীর্তন করেছেন তার সম্ভ্রান্ত বংশের, বলেছেন বংশানুক্রমিকভাবে কীভাবে এই পরিবার আর্ত ও দুঃস্থের সেবা ক'রে এসেছে। তিনি আশীর্বাদ করেছেন এই বিবাহবন্ধনকে—যা কোনো ফরাশির সঙ্গে কোনো হাঙ্গেরীয়কে বাঁধবে আত্মীয়তার সূত্রে, তারপর প্রার্থনা করেছেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

মার্ক আর মাইরা তাদের আসন ছেড়ে উঠে বেদির পইঠার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তারপর, চুম্বন করেছে পরস্পরকে, চুম্বন করেছে খ্রিষ্টের নৈশভোজের রুটি রাখার রেকাবিকে, তারপর আর ফিরে এসে বসেছে যে যার আসনে। মাইরাকে এমন ঝলমলে-সুন্দরী—না, এর আগে আর-কখনোই দেখায়নি, আর সেই রূপকে ঘিরে যেন জ্যোতির্বলয়ের মতো ছটা ছড়াচ্ছিলো কোনো সুখস্বপ্ন।

প্রধানযাজক তারপর তাঁর দুজন সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে এসেছেন মার্ক আর মাইরার দিকে।

সব স্তব্ধ তখন, আর তারই মধ্যে শোনা গেছে তাঁর কম্পিত, দুর্বল কণ্ঠস্বর : 'মার্ক ভিদাল, তুমি কি মাইরা রডারিখকে তোমার বৈধ পত্নী রূপে গ্রহণ করতে রাজি আছো?'

'হ্যাঁ।'

'মাইরা রডারিখ, তুমি কি মার্ক ভিদালকে তোমার বৈধ পতি রূপে গ্রহণ করতে রাজি আছো?'

'হ্যাঁ।' মাইরার গলাটা যেন স্নিগ্ধ একটা দীর্ঘশ্বাস।

আধ্যাত্মিক সংস্কারের প্রথাবিহিত কথাগুলো বলবার আগে প্রধানযাজক মার্কের কাছ থেকে বিয়ের আংটি দুটো নিয়ে তাদের আশিস করেছেন, তারপর একটু ঝুঁকে নববধূর অনামিকায় পরাতে গেছেন সেই আংটি...

আর অমনি... অমনি সারা চার্চ কাঁপিয়ে শোনা গেছে এক আর্তনাদ, দারুণ দুঃখে ফেটে-পড়া।

আর আমি যা তখন নিজের চোখে দেখেছি, আরো হাজার জনও তা বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখেছে। যাজকের সহকারীদের কেউ যেন ঠেলে, ধাক্কা দিয়ে, টালমাটাল হটিয়ে দিচ্ছে—যেন ভয়ংকর কোনো শক্তি হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে কোন অন্ধকার থেকে; প্রধানযাজক—তাঁর ঠোঁট দুটো থরথর কাঁপছে—তাঁর মুখে নিদারুণ যাতনার ছাপ, চোখে দুর্নিবার আতঙ্ক—যেন কোনো অদৃশ্য পিশাচের সঙ্গে যুঝতে-যুঝতে শেষটায় দুমড়ে প'ড়ে গেছেন হাঁটু মুড়ে...

তারপরেই, বিদ্যুৎবেগে, চকিতের মধ্যে ঘটনাগুলো ঘ'টে গেলো, কেউ যে গিয়ে বাধা দেবে তারও যেন অবসর হয়নি, ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থেকেছে সবাই, যেন চোখের সামনে যা ঘ'টে যাচ্ছে তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না, বুঝতেও পারছে না আদপেই : কেউ যেন শূন্য থেকে আছাড় মেরে ছুঁড়ে ফেলেছে মার্ক আর মাইরাকে, ঐ বেদির সামনেটায়...

তারপর কুলুঙ্গির ওপর দিকে শূন্যে ছুটেছে আংটি দুটো, একটা আবার আমার নাকে প্রচণ্ড একটা ঘুষির মতো পড়েছে...

আর সেই মুহূর্তে আমি শুনেছি, এবং আমার সঙ্গে-সঙ্গে সমবেত হাজার জনেও শুনেছে, কার যেন চোয়াড়ে ভয়ংকর গলা থেকে বিকট চীৎকারে বেরিয়ে আসছে এই কথা ক-টি—সে-কার গলা, তা আমরা সবাই জানি, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর গলা :

'অভিশপ্ত হোক নবদম্পতি—*অভিশপ্ত!*'

যেন লণ্ডভণ্ড ঘরের মধ্যেই চীৎকার ক'রে সে এই অভিশাপ দিচ্ছে; আর এই অভিশাপের সঙ্গে-সঙ্গে যেন কাছেই, জনতার মধ্য থেকে, প্রচণ্ড আতঙ্কের ধ্বনি উঠেছে। তারপরেই এক নিদারুণ আওয়াজ! এক বুকভাঙা আর্তনাদ! মাইরা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছিলো মেঝে থেকে, এক বুকফাটা চীৎকার ক'রে জ্ঞান হারিয়ে সে লুটিয়ে পড়েছে আতঙ্কিত মার্কের দু-বাহুর মাঝে!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ক্যাথিড্রালে যে-অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা ঘটেছে, রডারিখ-ভবনে যে-আজব ঘটনা ঘটেছিলো, দুয়েরই উদ্দেশ্য ছিলো এক। তাদের উৎসও ছিলো এক। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস, শুধু ভিলহেল্ম স্টোরিৎসই এই তুলকালাম হুলুস্থুলের জন্যে দায়ী। হাতসাফাই? ম্যাজিক? জাদুবিদ্যা? ভেলকির খেলা?... এর উত্তর হবে একটাই : না। ক্যাথিড্রালে কেলেঙ্কারি বা মুকুট নিয়ে মোক্ষম মার—কোনোটাকেই নিছক কারু হাতের কৌশল বলা যাবে না। মামুলি ম্যাজিক কখনও এমনতর হয় না।

এই জার্মানটি নিশ্চয়ই তার বাবার কাছ থেকে কোনো গোপন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পেয়েছে, হয়তো আবিষ্কার করেছে এমন-কোনো সূত্র বা সংকেত, যার মারফৎ সে নিজেকে ইচ্ছেমতো অদৃশ্য ক'রে ফেলতে পারে।... আর, তা, অসম্ভবই বা হবে কেন? ...এমন-কতগুলো রশ্মি তো থাকতেই পারে যা অনচ্ছ-কিছুর মধ্যে দিয়ে ব'য়ে যেতে পারে, যেন সেগুলো স্বভাবস্বচ্ছ কোনো পদার্থ?... কিন্তু না, আমার ভাবনারা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।... *অদৃশ্য মানুষ*! বাজে কথা! *আজগুবি*! এমন-একটা আজগুবি, যে কাউকে সে-কথা বললেই সে ভাববে যে এ-সব আজব কাণ্ড দেখে আমার মাথাটাই বুঝি বিগড়ে গেছে!

মাইরাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তখনও তার জ্ঞান ফেরেনি; তাকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয়া হয়েছে তার বিছানায়, কিন্তু সমস্ত সেবাযত্নই ব্যর্থ হয়েছে, সে প'ড়ে থেকেছে হতচেতন, অবশাঙ্গ, ডাক্তার রডারিখের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও তার আর জ্ঞান ফেরেনি। অথচ তার নিশ্বাস পড়ছে কিন্তু, সে *এখনও বেঁচেই আছে*। আমার বরং এই ভেবেই অবাক লাগছে যে পর-পর এত-সব বিপর্যয়ের পরেও, বিশেষত ক্যাথিড্রালের এই কেলেঙ্কারির পরেও, সে-যে ম'রে যায়নি, এটাই বরং ভারি আশ্চর্য।

ডাক্তার রডারিখের বিস্তর বন্ধু ও সহব্যবসায়ীরা তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে তক্ষুনি তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। মাইরার বিছানাটা ঘিরে চারপাশে দাঁড়িয়ে থেকেছেন তাঁরা : সে প'ড়ে আছে অনড়, নিশ্চল, নিমীলিতনয়ন, মুখটা যেন মোমের মতো রক্তহীন, হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত স্পন্দনের তালে-তালে ক্ষীণভাবে বুকটা উঠছে-নামছে, নিশ্বাস পড়ছে ক্ষীণ—অতি মৃদু-দীর্ঘশ্বাসের মতো—যা থেকে প্রতিমুহূর্তেই কেউ যেন নিংড়ে বার ক'রে দিচ্ছে প্রাণশক্তি!

মার্ক তার পাশেই আছে, তার হাত ধ'রে। কাঁদছে সে, ধরাগলায় বারে-বারে ডেকেছে তাকে : 'মাইরা, চোখ মেল, তাকিয়ে দ্যাখ, এই-যে, আমি তোর মা!'

মাইরার মুদিতনয়ন মুদিতই থেকেছে। কারু ডাকই যেন সে শুনতে পায়নি।

চিকিৎসকেরা নানাভাবে চেষ্টা করেছেন, একবার মনেও হয়েছিলো—এই বুঝি জ্ঞান ফিরে এলো... অস্ফুট স্বরে কী যেন বলেছিলো সে বিড়বিড় ক'রে, এমনই জড়ানো ছিলো

কথাগুলো যে কিছুই বোঝা যায়নি, তার আঙুলগুলো থরথর ক'রে একটু কেঁপেছে মার্কের মুঠোয়, তার চোখের পাতা বুঝি একটুখানি খুলেওছে। কিন্তু কী-যে ফাঁকা দৃষ্টি ঐ আধো-নিমীলিত নয়নে, কী-যে অদ্ভুত-কাঁপা নীরব অর্থহীন দৃষ্টি!

মার্ক বুঝি বুঝতে পেরেছে কী সেটা! হঠাৎ সে চমকে পেছিয়ে এসে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছে :

'পাগল! পাগল! *একেবারে পাগলের দৃষ্টি*।'

মার্কের দিকে ছুটে গিয়েছি আমি, ভেবেছি এও কি আবার নিজের মাথাটা খেয়ে বসেছে নাকি? এ-ঘরে ডাক্তারেরা একটা বিষম সংকট নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন—এমন-এক সংকট যে মাইরার জীবনটাই এখন বিষম সংশয়ে আছে। সেখানে মার্কের এই আর্ত ডুকরানি! তাকে তক্ষুনি পাশের একটা ঘরে নিয়ে যেতে হ'লো।

কীভাবে শেষ হবে এই পালার? শোচনীয়? বিয়োগান্ত? আমরা কি দুঃসাহসে ভর ক'রে এই আশাটা করতে পারবো যে মাইরা আবার তার কাণ্ডজ্ঞান ফিরে পাবে; যে, সেবাযত্ন শেষটায় তার বুদ্ধিভ্রংশতা সারিয়ে তুলবে; যে, এ নেহাৎই একটা সাময়িক উন্মত্ততা?

একবার কাপ্তেন হারালান আমাদের সঙ্গে একটু একা হ'তেই বলেছে : 'যে-ক'রেই হোক এই পৈশাচিক ব্যাপারটায় একটা ইতি টানতে হবে!'

ইতি টানতে হবে? কী বলতে চাচ্ছে সে? যে, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস ফের রাগৎস ফিরে এসেছে; যে, সে-ই এই অনাচারের জন্যে দায়ী; যে, আমাদের মধ্যে এ নিয়ে এখন আর-কোনোই সন্দেহ নেই! কিন্তু তাকে আমরা পাবো কোথায়? কেমন ক'রে পাকড়াবো ধরাছোঁয়ার-বাইরেকার এই মানুষটাকে?

আর গোটা শহরটার ওপরই বা এই ভ্রষ্টাচারের প্রভাব কী হয়েছে? লোকে কি এ-সব ব্যাপারের কোনো সাধারণ—না, সাধারণ নয়, তবে স্বাভাবিক—ব্যাখ্যা মেনে নেবে? আমরা তো আর ফ্রান্সে নেই এখানে, যেখানে হয়তো এ-সব ব্যাপার হাসিঠাট্টার বিষয় হ'য়ে উঠতো, হাসির গান গেয়ে যেখানে লোকে একে বিদ্রূপ করতো। এই দেশে—হাঙ্গেরিতে—সব বিষয়ই তো অন্যরকম।

মাগিয়ারদের মধ্যে যে অলৌকিকের প্রতি একটু বিশেষ প্রীতি আছে, সেটা তো আমি আগেই বলেছি। তাদের কুসংস্কার —বিশেষত অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে—প্রায় অনপনেয়। অত্যন্ত শিক্ষিত লোকদের হয়তো বোঝানো যেতে পারে যে এ-সব কোনো ভৌতবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা বা রসায়নিক শাস্ত্রে বিশেষ-গবেষণালব্ধ জ্ঞান। কিন্তু যখন *অনালোকিত* মনের কথা ভাবা যায়, তখন পদার্থবিদ্যা নয়, অপবিদ্যাই প্রধান হ'য়ে ওঠে, সব হ'য়ে ওঠে শয়তানের চেলার কীর্তি, প্রেতসিদ্ধ পিশাচসিদ্ধ কারু কেরামতি, আর ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে তারা বীলজেবাবের চেলা নয়, খোদ শয়তানেরই প্রতিমূর্তি ব'লে ভাববে।

তাছাড়া রাগৎস-এর রাজ্যপাল যে-বিদেশীর বহিষ্কারের জন্যে ফরমান জারি

করেছেন, সে-যে এই *অসহ্য ও অপার্থিব* ঘটনাগুলোর সঙ্গে সরাসরি জড়িত, এ-তথ্য আমরা এখন আর লুকোবো কী ক'রে? এতদিন আমরা অনেক ক'রে সযত্নে যে-সব ব্যাপার চাপা দিয়ে রেখেছি, সন্ত মিখায়েলের ক্যাথিড্রালে এই বিষম কেলেঙ্কারির পর, সে-সব এখন আর অস্পষ্ট আবছায়ায় ঢেকে রাখা যাবে না।

পরদিন থেকে তুমুল এক হুলুস্থুলু উঠে গেলো শহরে। রডারিখ-ভবনে আগে যা-যা হয়েছিলো, তার সঙ্গে এবার ক্যাথিড্রালের ঘটনাকে জড়িয়ে নিলে লোকে। লোকের মধ্যে যে-শান্তসুস্থির ভাবটা নেমেছিলো, এবার তা নতুন শোরগোলে উবে গেলো। প্রত্যেক বাড়িতে, প্রতিটি পরিবারে, যখনই কেউ ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর নাম করে, অমনি এ-সব বিদঘুটে উদ্ভট ভয়াবহ ঘটনার স্মৃতি জেগে ওঠে, অথবা যেন এই অদ্ভুত লোকটা—লোক? না পিশাচ?—যে তার আস্ত জীবনটাই বুলভার তেকেলির ঐ হানাবাড়ির বদ্ধ জানালা আর স্তব্ধ দেয়ালের মধ্যে কাটিয়েছে, সবসময় সে যেন লোকের ঘাড়ে তার ফোঁস-ফোঁস নিশ্বাস ফ্যালে। কাজেই এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে সব ব্যাপারটা জানাজানি হ'য়ে যাবার পর গোটা শহরের লোকজন গিয়ে ভিড় করেছে বুলভারে, তারা নিজেরাও বুঝিয়ে বলতে পারবে না সে-কোন্ অপ্রতিরোধ্য শক্তি তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেছে সেখানে ।

এমনিভাবেই দলে-দলে লোক গিয়ে ভিড় করেছিলো স্প্রেমবার্গের কবরখানায়, সেখানে অবশ্য এই প্রেতসাধকের (?) বিজ্ঞানসাধকের (?) দেশবাসী আশা করেছিলো নিজের চোখে তাকিয়ে দেখবে কোনো *অবিশ্বাস্য* উদ্ভট ঘটনা—কোনো শত্রুতার ভাবই তাদের সেখানে তাড়িয়ে নিয়ে যায়নি। এখানে, ঠিক তার উলটো : তুলকালাম প্রকাশ পেয়েছে রি-রি ঘৃণা, প্রতিহিংসার বোধ—কোনো গণশত্রুর যা প্রাপ্য। আর এও ভুললে চলবে না ধর্মপ্রাণ লোকেরা ক্যাথিড্রালে এই কেলেঙ্কারি দেখে কী-সাংঘাতিক বিহ্বল হ'য়ে পড়েছে। এই অতি-উত্তেজনা শুধু-যে বেড়েই চলবে তাতে কোনো সন্দেহই নেই : বেশির ভাগ লোকই এই *দুর্বোধ্য প্রহেলিকার* কোনো স্বাভাবিক ব্যাখ্যা যে থাকতে পারে, তা বিশ্বাসই করবে না।

রাগ্‌ৎস-এর রাজ্যপালকে আবার গোটা শহরের মনের ভাবটাকেও হিশেবে ধরতে হয়েছে; পরিস্থিতি যেমন-যেমন দাবি করবে, পুলিশ যেন তক্ষুনি তেমন-তেমন ব্যবস্থা নেয়—এই মর্মে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন মঁসিয় স্টেপার্ককে। লোকে ভয় পেয়ে যখন দেয়ালে গিয়ে পিঠ ঠেকায়, তখন যে কী ভয়ংকর কাণ্ড ঘ'টে যেতে পারে, সে-সম্বন্ধে তাঁকে শুধু সচেতন থাকলেই চলবে না, অবস্থাটা যাতে আয়ত্তের বাইরে চ'লে না-যায় তারও ব্যবস্থা করতে হবে। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস নামটা উচ্চারণ করতে যতক্ষণ সময় লাগে, তার মধ্যেই লোকে গিয়ে তছনছ ক'রে আসতে পারে বুলভার তেকেলির ঐ বাড়ি—তারা লুঠতরাজ শুরু করতে পারে, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চাইতে পারে বাড়িটা—আর রাজ্যপাল হিশেবে তাঁর দায়িত্ব কিছুতেই যাতে শহরের শান্তিশৃঙ্খলা ভেঙে না-পড়ে সে-বিষয়ে নজর রাখা। এদিকে আমি কিছুতেই মন থেকে আমার ধারণাগুলো

তাড়াতে পারিনি, বরং সেগুলো যেন ক্রমেই দানা বাঁধছে। আগে যে-অনুমানটাকে উদ্ভট ব'লে ঝেড়ে ফেলেছিলুম, এখন সেই ধারণাটাকে নিয়েই গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছি আমি। যদি এই অনুমানটা নিছকই জল্পনা না-হয়, যদি কোনো লোক নিজেকে অদৃশ্য ক'রে ফেলবার কোনো সূত্র আয়ত্ত ক'রে থাকে, তাহ'লে লোকের স্বস্তি যাবে, শান্তি যাবে, শহরটা একটা আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলার ডিপো হ'য়ে উঠবে। আমার মনে প'ড়ে গেছে প্লাতো-র *প্রজাতন্ত্র* সেই কাহন, যেখানে গাইগেস নামে এক রাখাল এক দৈত্যের কবরখানায় এমন-একটা আংটি পেয়ে গিয়েছিলো, যেটা একটু বিশেষভাবে ঘোরালে সে অদৃশ্য হ'য়ে যেতো; সেটাকে কাজে খাটিয়েই সে রাজা কানদাউলের রাজসভায় গিয়ে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা ক'রে তাঁর সব ক্ষমতা দখল ক'রে বসেছিলো। সেই গ্রীক উপকথাই যদি আজ সত্যি হ'য়ে যায়, তবে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ব'লে কারু আর-কিছু থাকবে না।

ভিলহেল্ম স্টোরিৎস রাগৎস-এ ফিরে এসেছে, অথচ কেউ তাকে চর্মচক্ষে দ্যাখেনি; সে-যে এখানে আছে—অথবা নেই—এটা কেউ কী ক'রে বুঝবে, যদি তাকে চোখেই দেখা না-যায়! তাছাড়া, এই আবিষ্কারটা সম্ভবত তার বাবার, কিন্তু সে কি সূত্রটা গোপন রেখেছে নিজের কাছে? তার কাজের লোক হেরমানও কি ওভাবে অদৃশ্য হ'য়ে যেতে পারে? অন্যরাও কি পারবে? নিজেদের সুবিধের জন্যে—কিংবা ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকেই মদত দেবার জন্যে? ইচ্ছেমতো লোকের বাড়িতে তখন ঢুকে-পড়া যাবে—শুধু তা-ই নয়, অন্য লোকের জীবনকেও চালানো যাবে অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে। লোকের কি কোনো *ব্যক্তিগত জীবন* ব'লে কিছু থাকবে তখন, কোনো *আপন কথা*? নিজের বাড়িতে শুয়ে-ব'সেও কি কেউ নিশ্চিত হ'তে পারবে যে, ঘাড়ের ওপর থেকে কেউ তার ওপর সারাক্ষণ নজর রেখে যাচ্ছে না? শুনছে না সব মনের কথা? একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকারে মিশে না-গেলে কে কী করছে না-করছে, তা সব ফাঁস হ'য়ে যাবে। আর রাস্তায়—সারাক্ষণ এই-যে ভয় কেউ-একজন *অদৃশ্য* পেছন-পেছন আসছে, যে তোমাকে কিছুতেই তোমাকে নজর থেকে স'রে যেতে দেবে না, যে তোমাকে নিয়ে যা-খুশি তা-ই করতে পারবে, সে-ভয়টার বিরুদ্ধেই বা কেউ লড়বে কী ক'রে? বেড়াল যখন ইঁদুরকে নিয়ে খেলে, তখন ইঁদুর তাকে দেখতে পায়—কিন্তু ভাবো এমন ইঁদুরের কথা, যে বেড়ালটাকে দেখতে পাচ্ছে না, অথচ বেড়ালটা সারাক্ষণই পাশে-পাশে আছে! কী ক'রে লোকে আত্মরক্ষা করবে, অদৃশ্যের এই হামলার কাছ থেকে? তা কি কিছুদিনের মধ্যেই সমাজজীবনের সমূহ সর্বনাশ ক'রে দেবে না?

তারপরেই আমার মনে প'ড়ে গেছে, কাপ্তেন হারালান আর আমি সেদিন গঞ্জের বাজারে কী দেখেছিলুম: একটা লোককে কে যেন (*অদৃশ্য মানুষ?*) ভীষণ জোরে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে পেড়ে ফেলেছে। এখন তো আর সন্দেহ নেই যে সে-যে অদৃশ্য হামলার কথা বলেছিলো, সেটা ঠিকই বলেছিলো। সত্যিই তাকে কেউ ধাক্কা দিয়েছিলো। কে সে? ভিলহেল্ম স্টোরিৎস, নাকি হেরমান, না কি অন্য-কেউ!'

আরো-সব খুঁটিনাটি ভিড় ক'রে এসেছে আমার স্মৃতিতে। ক্যাথিড্রালের গা থেকে উপড়ে ছিঁড়ে-ফেলা সেই বিজ্ঞপ্তি, আর বুলভার তেকেলিতে আমরা যখন খানাতল্লাশ চালাচ্ছি, সেই-যে বিভিন্ন ঘরে আমরা পায়ের আওয়াজ শুনেছি, সেই-যে শিশিটা *ছোঁবার আগেই* প'ড়ে গিয়ে ভেঙে চুরমার হ'য়ে গিয়েছিলো। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আর-কোনো সন্দেহই নেই : উনপাঁজুরে হতচ্ছাড়াটা সেখানেই ছিলো তখন, হয়তো তার হেরমানও ছিলো তার সঙ্গে। আমরা যে ভেবেছিলুম সে শহর ছেড়ে চম্পট দিয়েছে, সেটা ভুল ভেবেছিলুম। কেননা শুধু তাতেই ব্যাখ্যা করা যায় গামলার মধ্যে সাবানজল, রান্নাঘরের উনুনে জ্বলন্ত অঙ্গার। ... হ্যাঁ-হ্যাঁ, তারা দুজনেই *অদৃশ্য* থেকে মজা দেখাচ্ছিলো, যখন আমরা পাঁতি-পাঁতি ক'রে খুঁজছিলুম বাগান, লন, উঠোন, বাড়ির মধ্যেটা। যদি বিয়ের মুকুটটা সেদিন *মিনারের পাখির বাসায়* আমরা পেয়ে থাকি, তবে তা শুধু এইজন্যেই যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস এই অতর্কিত হামলায় তখন আর সময়ই পায়নি সেটাকে নিয়ে চ'লে যাবার। আর, আমি তো এও জানি, যখন *ডরোথি* জাহাজে ক'রে দানিউব দিয়ে আসছিলুম তখন যে-সব রহস্যময় ঘটনা ঘটেছিলো, আজও সে-সবের কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। যে-যাত্রীকে ভেবেছিলুম তীরে নেমে গেছে, সে তবে পাশেই ছিলো আমাদের, অথচ কেউই তাকে দেখতে পায়নি।

কাজেই, নিজেকে আমি বারে-বারে ভজিয়েছি, সে জানে কেমন ক'রে মুহূর্তের মধ্যে *অদৃশ্য হ'য়ে যেতে হয়*। ইচ্ছে-মতো সে আবির্ভূত হ'তে পারে, কিংবা অদৃশ্য হ'য়ে যেতে পারে, যেন সে জাদুদণ্ড হাতে কোনো ওস্তাদ জাদুগর, তবে সে যদিও যে-পোশাক প'ড়ে আছে তাকে অদৃশ্য ক'রে দিতে পারে, হাতে-ধরা কোনোকিছু কিন্তু সে এখনও হাওয়া ক'রে দিতে পারে না—দেখেছি তো কী ক'রে কুচিকুচি ক'রে ছিঁড়েছিলো বিয়ের হলফনামা, ফুলের ঐ তোড়া, কী ক'রে সকলের চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো বিয়ের মুকুট, কিংবা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মেরেছিলো বিয়ের আংটিগুলো, ক্যাথিড্রালে।

অথচ এ-কোনো ভেলকিবাজি নয়, নয় কোনো গুহ্য মন্ত্রতন্ত্রের ব্যাপার, নয় কোনো বাজিকরের *চিচিংফাঁক*, অথবা পিশাচসাধনা। বাস্তব তথ্যগুলো কী, সেগুলোই বরং খতিয়ে দেখা যাক। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস নিশ্চয়ই এমন-কোনো রাসায়নিকের সূত্র জেনেছে, যা পান করলেই অদৃশ্য হ'য়ে-যাওয়া যায়... কোন-সে *রাসায়নিক পানীয়*? নিশ্চয়ই ঐ শিশির মধ্যে যা ছিলো, যেটা ভেঙে-যাবামাত্র ভাপ হ'য়ে উঠে গিয়েছিলো। কোন সূত্র, কোন ফর্মূলা ব্যবহার ক'রে এই রাসায়নিক পানীয় বানায়, তা আমরা এখনও জানি না—কিন্তু সেটা আমাদের এক্ষুনি জানা উচিত; যদিও—খুবই-সম্ভব যে সেটা আমরা কোনোদিনই জানতে পাবো না!...

আর খোদ ভিলহেল্ম স্টোরিৎস ? এখন যখন সে *অদৃশ্য মানুষ*, তাকে পাকড়ানো কি একেবারেই অসম্ভব ? সে দৃষ্টির অগোচর হ'তে পারে, কিন্তু স্পর্শেরও কি অগোচর ? ধরাছোঁয়ার বাইরে ? যে-ত্রিরায়তনিক কাঠামো থাকে মানুষের, সেই তিনটি আয়তন তো আর সে হারায়নি—হারায়নি তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ। এখনও সে আছে তার ঐ শরীর

নিয়ে, *রক্তমাংসে-সশরীর*। অদৃশ্য বটে, তবে স্পর্শাতীত নয়। সে হয়তো ভূতপ্রেতপিশাচের বেলায় খাটে, কিন্তু আমরা তো আর কোনো ভূতপ্রেত নিয়ে কারবার করছি না! যদি কোনো সুযোগে একবার পাকড়ে ফেলা যায় তার ঠ্যাং, কিংবা হাতদুটোই, কিংবা যদি বাছাধনের মাথাটাই চেপে-ধরা যায়, অন্তত আমরা তার গায়ে প্রাণপণে লেপটে থাকতে পারবো তো! আর যতই চমকপ্রদ কারসাজি সে জানুক না কেন, কোনো জেলখানার দেয়াল ফুঁড়ে বেরুবে সে কী ক'রে!

আমি তো কেবল ভেবেছিই কথাগুলো, মোটামুটি গ্রাহ্য করার মতোই অনুমান, প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি যা-হ'লে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু পরিস্থিতি তাই ব'লে কম গুরুতর নয়, একটা বদখত অবস্থায় বেশামাল আছি আমরা, গোটা নিরাপত্তারই গেছে! এখন থেকে শুধু এক ভয়াবহ বিপদের মধ্যেই থাকতে হবে আমাদের। আর-ককখনো আমরা নিজেদের নিরাপদ ব'লে ভাবতে পারবো না—না-ঘরে, না-বাইরে, দিনে বা রাত্রে—কখনোই নয়। কোথায় কোন ঘরে একটু মৃদু আওয়াজ উঠলো, মেঝের নড়বোড়ে কাঠ ক্যাঁচকেঁচ ক'রে উঠলো, হাওয়ায় ন'ড়ে গেলো জানলার খড়খড়ি, কিংবা জোরে ঘুরপাক খেলো ছাতের ওপর হাওয়ামোরগ, কানে শুনতে পেলুম ঝিঁঝির ডাক, দরজার ফোকর দিয়ে ব'য়ে গেলো শোঁ-শোঁ হাওয়া—আর অমনি আমরা আঁৎকে উঠবো। সারা পৃথিবীটাই যেন সন্দেহে গিজগিজ করছে। প্রতিদিনকার জীবনযাপন, খাবার সময়ে টেবিল, সন্ধের সময় আড্ডা, রাত্তিরবেলায় ঘুম—যদি ধ'রেও নেয়া যায় মনের এই তীব্র অশান্তির মধ্যে ঘুম সম্ভব—আমরা কিছুতেই নিঃসন্দেহ হ'য়ে জানতে পাবো না কোনো অনাহুত আগন্তুক আছে কি না বাড়ির মধ্যে, জানতে পারবো না ভিলহেল্ম স্টোরিৎস অথবা তার কোনো অনুচর সারাক্ষণ নজর রেখে যাচ্ছে কি না—আমরা কী করছি, কী বলছি, কী মৎলব আঁটছি—সব জেনে ফেলছে কি না, এমনকী ঢুকে পড়েছে কি না দেরাজে, যেখানে লুকোনো আছে গোটা-কয়েক পারিবারিক কঙ্কাল, গোপন-সব কাশুন্দি।

এই জার্মান হয়তো রাগৎস ছেড়ে এতক্ষণে স্প্রেমবার্গেই চ'লে গিয়েছে। কিন্তু ডাক্তার রডারিখ ও কাপ্তেন হারালান, স্বয়ং রাজ্যপাল ও পুলিশের বড়োকর্তা—সকলের সঙ্গে আলোচনা ক'রে এটাই বুঝেছি, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যে আরো-কিছু জঘন্য মৎলব এঁটে ব'সে সেগুলো করবে ব'লে সারাক্ষণ তাকে-তাকে ব'সে নেই, এটা কী ক'রে জানা যাবে? রাজ্যপাল যখন বিয়ের অনুমোদন দিয়েছিলেন, তখন যে সে কোনো বিদঘুটে কাণ্ড ক'রে বসেনি, সে-তো নিশ্চয়ই এই কারণেই যে সে তখনও স্প্রেমবার্গ থেকে ফিরে আসেনি। কিন্তু বিয়ের আসল অনুষ্ঠানটায় সে বিচ্ছিরি নাটুকেপনা ক'রে বাগড়া দিয়েছে। মাইরা যদি সেরেও যায়, সে কি আবারও বিয়েটা ভণ্ডুল ক'রে দিতে চাইবে না? ডাক্তার রডারিখের প্রতি যে-বিজাতীয় ঘৃণা সে প্রকাশ করেছে, সে-তো আর তার কোনো হার্দ্য পরিবর্তনে মৈত্রীতে বদলে যায়নি—সে বরং আরো-কোনো নারকীয় মৎলব হয়তো এঁটে ব'সে আছে, যাতে ডাক্তারের জীবনটাই দুর্বিষহ হ'য়ে ওঠে? যে-বাজখাঁই গলায় সেদিন সে অভিসম্পাত দিয়েছে ক্যাথিড্রালে, তা-ই কি বোঝায় না যে সে একটা

হেস্তনেস্ত না-ক'রে ছাড়বে না? না-না, ব্যাপারটা আদপেই এখনও শেষ হ'য়ে যায়নি, আর যখন মনে প'ড়ে যায় প্রতিশোধ নেবার জন্যে যে কী-আশ্চর্য সুযোগ আছে তার দখলে, তখন যে-কোনোকিছু থেকেই নতুন-কোনো আপদ এসে হাজির হ'তে পারে! ডাক্তার রডারিখের বাড়িতে যদিও চব্বিশ ঘন্টাই পাহারা আছে এখন—তবু তার পক্ষে ভেতরে ঢুকে যেতে অসুবিধে কোথায়? আর একবার ভেতরে যেতে পারলে সে-যে কী করবে, তা স্বয়ং *বীলজেবাবও* জানে কি না সন্দেহ।

এই থেকেই বোঝা যাবে আতঙ্কটা কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। কুসংস্কারে বিশ্বাস করলে তো কথাই নেই, কিন্তু তথ্যে আস্থা রেখেও কি কেউ আশঙ্কা থেকে রেহাই পাবে? তাছাড়া, সত্যি-তো, তাকে *ঠেকাবার* উপায়টাই বা কী? কীসে মুশকিল আসান? আমি তো কবুলই করছি যে আমার মাথায় কোনো ফন্দি আসছে না। মার্ক আর মাইরা যদি এখান থেকে চ'লেও যায় তাতেও অবস্থার একচুলও তারতম্য হবে না। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস কি আর তাদের সহজেই অনুসরণ ক'রে যেতে পারবে না? তাছাড়া, মাইরার শরীরের এখন যে-হাল, তাতে রাগ্‌ৎস ছেড়ে চ'লে যাবার কোনো কথাই ওঠে না!

আর কোন্‌খানেই বা আছে সে এখন, আমাদের এই বেপরোয়া ও অধরা দুশমন? যদি-না পর-পর এ-সব বিদঘুটে ঘটনা ঘ'টে যেতো, আঘাতের পর আঘাত হেনে, তাহ'লে হয়তো কারু পক্ষেই এটা নিশ্চয় ক'রে বলা সম্ভব হ'তো না যে সে এখনও তাদের মধ্যেই আছে, অসহ স্পর্ধায় দম্ভে সে যাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে, আতঙ্কে যাদের সে প্রায় জবুথবু ও অকর্মণ্য ক'রে তুলতে পারে!

এ-সব ঘটনার প্রথমটা আমাদের হতচকিত দশাকে যেন নিরাশার শেষসীমায় নিয়ে গিয়েছিলো। সন্ত মিখায়েলের ক্যাথিড্রালের ঐ বিপর্যয়ের পর দু-দুটো দিন কেটে গিয়েছে অথচ মাইরা বেচারির অবস্থার কোনোই উন্নতি হয়নি—এখনও তার সুস্থবুদ্ধি ফিরে আসেনি, এখনও সে শুয়ে আছে বিছানায়, এখনও জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দুলছে তার প্রাণ।

চৌঠা জুন, মধ্যাহ্নভোজনের পর, রডারিখ পরিবারের সবাই,—তার মধ্যে মার্কও আছে, আমিও আছি,—ব'সে আছি গ্যালারিতে, উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছি কীভাবে এই বীলজেবাবের চেলাকে জব্দ করা যায়, এমন সময়ে সত্যিকার একটা পৈশাচিক হাসির রক্তজল-করা দমকা উঠলো ঘরের ভেতর।

আঁৎকে, ধড়মড় ক'রে, যে যার আসন থেকে উঠে পড়েছি আমরা। মার্ক আর কাপ্তেন হারালান যেন ঘোরের মধ্যেই তেড়ে গিয়েছে গ্যালারির যেদিক থেকে এই অট্টহাসির তুবড়ি ফেটে পড়েছে, কিন্তু কয়েক পা গিয়েই তারা থমকে থেমে গিয়েছে।

সবকিছুই ঘ'টে গেছে মাত্রই দুটি মুহূর্তে। ঐ দুই মুহূর্তের মধ্যেই আমি দেখেছি আলো ঝিকিয়ে উঠেছে রক্তলোলুপ একটা ছুরির দ্রুতধাবমান ফলায়; দেখেছি মার্ক টালমাটাল থুবড়ে পড়বার আগেই দুই বাহুর মধ্যে তাকে ধ'রে ফেলেছে কাপ্তেন হারালান...

আমি ছুটে গিয়েছি তাদের সাহায্যে, আর সেই মুহূর্তে একটা বাজখাঁই রুক্ষ কর্কশ স্বর—সেই গলাটা এতদিনে আমরা সবাই চিনে ফেলেছি—দুর্ধর্ষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ব'লে উঠেছে : 'মাইরা রডারিখ ককখনো মার্ক ভিদালের বউ হবে না! *ককখনো না!*'

তারপরেই এক প্রচণ্ড দমকা হাওয়ার ঝাপটায় থরথর ক'রে কেঁপে উঠেছে ঝাড়লণ্ঠনগুলো, বাগানে যাবার দরজাটা দুম ক'রে খুলে গিয়েই বন্দুকের গুলির মতো আওয়াজ ক'রে আবার বন্ধ হ'য়ে গেছে, আর আমরা আবারও হাত কামড়াতে-কামড়াতেই বুঝি উপলব্ধি করেছি যে আমাদের এই অপ্রশম্য দুশমন ফের আমাদের নাগাল থেকে পালিয়ে গিয়েছে!

একটা ডিভানের ওপর এনে মার্ককে তারপর শুইয়েছি আমরা, ডাক্তার রডারিখ মন দিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন জখমটা। ভাগ্যি ভালো, ছোরাটা বেশি গভীরে বেঁধেনি! বাম কাঁধের হাড়ের ওপর দিয়ে হড়কে গিয়েছিলা, শুধু লম্বা একটা কাটা দাগ, যদিও দেখাচ্ছে রাগি-লাল, তেমন গুরুতর নয় আসলে, কয়েকদিনেই সেরে যাবে। এবার হয়তো আততায়ী তাড়াহুড়োয় লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি, কিন্তু পরের বার কি সে আবারও ফসকাবে?

মার্ককে কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর হোটেলে পাঠিয়ে দেয়া হ'লো। আমি গিয়ে ব'সে রইলুম তার বিছানার পাশে, আর সেখানে যে তার ওপর শুধুই নজর রেখেছি তা নয়, মনে-মনে সারাক্ষণ নাড়াচাড়া করেছি সমস্যাটা নিয়ে। বুদ্ধির খেলায় এই শয়তানকে যদি হারানো না-যায়, তাহ'লে শেষ পর্যন্ত কত জনকে প্রাণ দিয়ে তার প্রতিহিংসার বলি হ'তে হবে?

এটা কবুল করা ভালো যে আমি যেদিক দিয়ে তদন্ত করলে ব্যাপারটার মীমাংসা করা যাবে ব'লে ভেবেছিলুম, সেদিকে কিছু করার আগেই অন্য-সব অপঘটনা এসে ব্যাপারটাকে আরো-জটিল ক'রে তুলেছে। খুব-একটা পিলেচমকানো নাটুকে যদি-বা নাও হয়, এই অপঘটনাগুলো সত্যি ভারি কিম্ভূতকিমাকার আর অসংলগ্ন ও অপ্রত্যাশিত ছিলো। অবশ্য সবকিছুই তো ছিলো অপ্রত্যাশিত ও অতর্কিত। কিন্তু তাদের নিয়ে ভাবতে হবে অনেক, শুধু বিহ্বল হ'য়ে ব'সে থাকলেই চলবে না।

সেই দিনই—সেই চৌঠা জুনের—সন্ধেবেলায়, দারুণ জোরালো একটা আলো দেখা গিয়েছিলো অনেক দূর থেকে, ঘণ্টাঘরের সবচেয়ে উঁচু জানলাটা থেকে আলোর ছটা পড়েছিলো সন্ধ্যার আকাশে। যেন একটা জ্বলন্ত মশাল উঠছে আর নামছে, এপাশ থেকে ওপাশে যাচ্ছে, যেন কোনো গুণ্ডা এসে বিদ্বেষবশে কোনো বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিতে চাচ্ছে।

পুলিশের বড়োকর্তা স্বয়ং তাঁর সঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে হুড়মুড় ক'রে উঠে পড়েছিলেন ঘণ্টাঘরে। আলোটা ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে, আর মঁসিয় স্টেপার্ক যেমন ভেবে বসেছিলেন, তাই-ই ঠিক হয়েছে : কাউকেই আর অকুস্থলে পাওয়া যায়নি। মেঝের ওপর পড়েছিলো একটা নিবে-যাওয়া মশাল, তা থেকে রজনের গন্ধ বেরুচ্ছে—যে-লোকটা

আগুন ধরাতে এসেছিলো, তার কোনো পাত্তাই নেই কোথাও।

হয় সেই লোকটা—তর্কের খাতিরে না-হয় ধ'রেই নেয়া যাক যে খোদ ভিলহেল্ম স্টোরিৎসই সে—পিঠটান দেবার যথেষ্ট সময় পেয়েছে, অথবা সেখানেই গা-ঢাকা দিয়ে আছে, ঐ ঘন্টাঘরেরেই কোথাও, এবং তাকে খুঁজে-পাওয়া অসম্ভব।

চকে যে-জনতা এসে জমায়েৎ হয়েছিলো, তাদের প্রতিহিংসার জিগির নিষ্ফল হ'লো—বরং সে-সব দেখেশুনে বদমায়েশটার নিশ্চয়ই হাসিই পাচ্ছিলো।

পরদিন, সকালবেলায়, অর্ধোন্মত্ত শহরের উদ্দেশে ছুঁড়ে মারা হ'লো আত্মম্ভরিতার আরো-সব জমকালো নিদর্শন।

সবে-মাত্র তখন সাড়ে-দশটার প্রহর বেজেছে, এমন সময় ঢং-ঢং ক'রে বেজে উঠেছে গা-শিউরে-তোলা ভয়ংকর ঘন্টার শব্দ ঢং ঢং ঢং, যেন কারু অন্ত্যেষ্টির ঘোষণা, যেন আতঙ্কেরই কোনো বাদনধ্বনি।

কোনো-একজন লোকের পক্ষে এমনভাবে ক্যাথিড্রালের ঘন্টাগুলো পর-পর ঢং ঢং ক'রে বাজানো সম্ভব হ'তো না। ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের নিশ্চয়ই আরো-সব স্যাঙাৎ ছিলো সঙ্গে—আর অনেক কেউ যদি নাও হয়, তার কাজের লোক হেরমান তো ছিলোই।

শহরের লোকেরা ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছিলো সন্ত মিখায়েলের চকে, ছুটে এসেছিলো শহরের দূর-দূর কোণা থেকে, এই পারলৌকিক বাদনধ্বনি যেন বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিলো সারা শহরে। আবারও একবার দলবল নিয়ে অকুস্থলে ছুটে গিয়েছেন মঁসিয় স্টেপার্ক। উত্তরমিনারের ঘোরানো সিঁড়ির দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেছেন তাঁরা, ছুটে-ছুটে উঠেছেন সিঁড়ি বেয়ে, ঢুকেছেন সেই ঘরটার যেখানে পর-পর সব ঘন্টাগুলো বসানো, স্কাইলাইটগুলো দিয়ে আলো এসে ঘরটাকে ফটফটে দিনের আলোয় যেন ধুয়ে যাচ্ছিলো...

কিন্তু মিথ্যেই তাঁরা তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেছেন ঘরটা, খুঁজেছেন ওপরের গ্যালারিটা... কেউ নেই! কেউ-না!... পুলিশ যখন গিয়ে ঘরটায় পৌঁছেছে, তখন ঘন্টাগুলো এমনকী দুলছিলোও না, স্তব্ধ প'ড়ে ছিলো পর-পর... অদৃশ্য ঘন্টাবাজিয়েরা যেন কর্পূরের মতো উবে গিয়েছে সে-ঘর থেকে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

তাহ'লে, আমি যা ভয় করেছিলুম, তা-ই হয়েছে। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস মোটেই রাগৎস ছেড়ে চ'লে যায়নি, আর ডাক্তার রডারিখদের বাড়িতেও সে দিব্বি অনায়াসেই ঢুকে পড়েছিলো। এটা ঠিক যে, সে লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি! কিন্তু সেটা তো আর

ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কোনো গ্যারান্টি হ'তে পারে না। একবার সে যা করবার চেষ্টা করেছে, আবারও সে তা-ই করবে, আর পরের বার হয়তো সে মোটেই তাগ ফসকাবে না। কাজেই সেই দুরাচারের কাছ থেকে আবারও কোনো আঘাত আসার আগেই আমাদের প্রতিরোধব্যবস্থাটাকে অটুট ক'রে তুলতে হবে।

কী-যে করা যায়, সেটা ঠিক ক'রে নিতে আমাকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। যাদের-যাদের সে হুমকি দিয়েছে, তাদের সব্বাইকে একজায়গায় জড়ো ক'রে এমন-একটা দুর্ভেদ্য দেয়াল তাদের চারপাশে তুলে দিতে হবে, যাতে কারু পক্ষেই তাদের ধারে-কাছে ঘেঁসা সম্ভব না-হয়। কী ক'রে সেটা করা যায়, সেটাই গোড়ায় ভেবে দেখতে হবে।

ছয়ই জুন সকালবেলায়, হামলা হবার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই, মার্ককে সরিয়ে ফেলা হ'লো রডারিখ-ভবনে, মাইরা যে-ঘরে আছে ঠিক তার পাশের ঘরটাতেই। ভাগ্যিশ মার্কের কাঁধের জখমটা তেমন গুরুতর হয়নি—এর মধ্যেই সেটা শুকোতে শুরু করেছিলো, রক্তপাতও এমন-কিছু হয়নি যে খুব দুর্বল হ'য়ে পড়বে। প্রথমে মার্কের একটা ব্যবস্থা করবার পরই আমি আমার পরিকল্পনাটা ডাক্তার রডারিখকে খুলে বলেছি, আর সব শুনে তিনি সেটা পুরোপুরি অনুমোদনও করেছেন। আমার হাতে প্রায় সব দায়িত্বই ছেড়ে দিয়েছেন ডাক্তার রডারিখ, তাঁর মতে *আমিই নাকি আক্রান্ত দুর্গের প্রধান সেনাধিপতি*।

এবং তৎক্ষণাৎ আমি সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি। মার্ক আর মাইরার পাহারায় শুধু একজন কাজের লোককে রেখে—সেই ঝুঁকিটা আমাকে নিতেই হয়েছে!—গোড়ায় আমি খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছি বাড়ির চারপাশ। অবশ্য পুরো বাড়িটা সরেজমিন তদন্ত ক'রে দেখতে সকলেই আমায় সাহায্য করেছেন, মায় কাপ্তেন হারালান ও মাদাম রডারিখ শুদ্ধু। আমার নির্দেশেই তিনি মাইরার শয্যার পাশ থেকে উঠে এসেছিলেন।

আমরা শুরু করেছিলুম ওপর থেকে। কনুইতে কনুই ঠেকিয়ে, আমরা চিলেকোঠার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখেছি। তারপর খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেছি সবগুলো ঘর; কোনো কোনাখামচি, কোনো কুলুঙ্গি, কোনো ফাঁকফোকর—কিচ্ছু বাদ দিইনি—মানুষ তো দূরের কথা কোনো নেংটি ইঁদুরও ও-সব ফাঁকফোকরে লুকিয়ে থাকতে পারতো না। পর্দা তুলে দেখেছি আমরা, চেয়ারগুলো জায়গাবদল করেছি অনবরত, খাটের তলায় ঢুকে গিয়ে দেখেছি, দেরাজের মধ্যেও হাৎড়েছি, আর একবারও, এক মুহূর্তের জন্যেও, পরস্পরের স্পর্শচ্যুত হইনি আমরা, কনুইতে কনুই ঠেকিয়ে পাশাপাশি থেকেছি। একেকটা ক'রে ঘর দেখা সাঙ্গ হয়েছে, আমরা দরজা বন্ধ ক'রে তালা লাগিয়ে দিয়েছি—এবং চাবিটা আমি আমারই পকেটে রেখেছি।

এতে দু-ঘণ্টারও বেশি সময় লেগেছে আমাদের, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজটা সুষ্ঠুভাবেই সমাধা হয়েছে, আর এই ক'রে-ক'রে গিয়ে পৌঁছেছি বহির্দ্বারে, নিশ্চিত হয়েছি, সুনিশ্চিত, বস্তুপৃথিবীতে যতটা নিশ্চিত হওয়া যায় ততটাই, যে, কোনো বহিরাগত এসে বাড়ির

মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে নেই! তারপর বাইরের দরজার কবাট এঁটে কুলুপ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, হুড়কোও, তারপর তালা বন্ধ ক'রে দিয়ে চাবিটা আমিই পকেটে রেখেছি। এখন আমাদের অনুমতি ছাড়া কেউই হুট ক'রে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তে পারবে না। আর আমি নিজেকে পই-পই ক'রে বলেছি, 'সবসময় তোমাকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে, অঁরি, যাতে চেনা লোককে ভেতরে ঢুকতে দেবার সময় লুকিয়ে, অদৃশ্য হ'য়ে, কেউই ভেতরে অনধিকার প্রবেশ করতে না-পারে।

আর সেই মুহূর্ত থেকে, কেউ এসে দরজা ধাক্কালে বা কড়া নাড়লে, আমি, শুধু আমি একাই দরজা খুলে দিয়েছি। এই দ্বারপালের কাজ করার সময় হয় আমার সঙ্গে থেকেছে কাপ্তেন হারালান, অথবা কাজের লোকদের কেউ, যাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কবাট শুধু একটুখানি খোলা হ'তো, আর পাল্লা সরালে যতটা ফাঁক হ'তো তাতে গিয়ে আমি নিজে দাঁড়াতুম, আমার সঙ্গী থাকতো আমার পেছনেই। অভ্যাগতকে কি ভেতরে ঢুকতে দেয়া হবে? যদি হয়, তবে তিনজনে গায়ে গা ঠেকিয়ে, পায়ে-প্যায়ে পেছিয়ে এসেছি আমরা, আর দরজাটা ফের বন্ধ ক'রে দেয়া হয়েছে সন্তর্পণে, সাবধানে। অর্থাৎ এখন নিশ্চয়ই রডারিখ-ভবন একটা সত্যিকার দুর্গই হ'য়ে উঠেছে, সুরক্ষিত ও নিরাপদ।

জানি-জানি, আমার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সে-কোন আপত্তি তোলা হবে! দুর্গ তো নয়, যেন এক বন্দীশালা! তবে সাময়িক বন্দিত্ব সওয়া যায়, অন্তত জীবননাশের চাইতে তো সেটা ভালো! আর আমরা তো আর *যাবজ্জীবন* বন্দী থাকবো না এভাবে, এই দশা বেশিদিন থাকবে না ব'লেই আমার আশা। কেননা ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর গুপ্ত রহস্যটার পুরোপুরি মীমাংসা ক'রে না-ফেললেও আমি ব্যাপারটা সমাধান করার দিকে খানিকটা অন্তত এগিয়েছি বৈ কি! সেটা, না-হয় নিরেস ঠেকলেও, তত্ত্বকথা ব'লে মনে হ'লেও, একটু নেড়ে-চেড়ে দেখা যাক।

যখন কোনো ত্রিশিরা কাচের ফলার মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো ঝলমল ক'রে ওঠে, তখন সে সাত-সাতটা রঙে ভেঙে প'ড়ে যায়, যেগুলোর মিশোল থেকেই জ্ব'লে ওঠে শাদা আলো। এই রঙগুলো—বেগুনি, নীল, আশমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল [*বেনীআসহকলা*]—তৈরি ক'রে দেয় *সৌরবর্ণালি*।

কিন্তু দৃশ্যমান এই বর্ণচ্ছটা হয়তো গোটা বর্ণালির নিছকই একটা অংশমাত্র ছাড়া আর-কিছু নয়। অন্য কোনো-কোনো রঙও থাকতে পারে, যেগুলো নেত্রপটের অগোচর; এই-যে *এখনও-অজানা* সব রশ্মি, তাদের *হয়তো* এমন-সব বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো আমাদের জানা সৌররশ্মির চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, *পুরোপুরি আলাদা*। আমাদের চেনা সৌর বর্ণালি অনেক নিরেট জিনিশের মধ্য দিয়েই চ'লে যেতে পারে—যেমন, কাচ—আর তা যদি হয়, তবে এই অজানা রশ্মিগুলো *সমস্ত নিরেট জিনিশের* মধ্য দিয়েই বা চ'লে যেতে পারবে না কেন? [অঁরি ভিদাল এই পাণ্ডুলিপি লেখার পর অবলোহিত বা রঙ্গপূর্ব ও বেগনিপারের আলো অন্তত অনেকটাই মঁসিয় ভিদালের এই অনুমানকে সত্য ব'লে প্রমাণ

করেছে।—জুল ভের্ন-এর টীকা।] সত্যি-যদি তা হয়, তাহ'লে খালি চোখে দেখে সেগুলো কিছুই বোঝা যাবে না—আমাদের নেত্রপট মোটেই এ-সব রশ্মির দ্বারা প্রভাবিত হয় না—যদি অবশ্য আমরা ধ'রে নিই যে এমন-সব রশ্মি আছে।

আর এটা হ'তেই পারে যে, এমনতর বিশিষ্টতাসংবলিত রশ্মিগুলোকে অটো স্টোরিৎস একদিন আবিষ্কার ক'রে বসেছিলেন; তিনি কোনো রাসায়নিকেরও একটা সূত্র পেয়ে গিয়েছিলেন, যেটা কোনো সজীব বস্তুর মধ্যে সংক্রমিত করা হ'লে, দুটো বৈশিষ্ট্য পেয়ে যায়—উপরিতল দিয়ে পুরো পরিণাহ বা পরিকাঠামোতেই তখন সে ছড়িয়ে যায়, আর *সৌরবর্ণালির* মধ্যে বিভিন্ন রশ্মির স্বভাব বা প্রকৃতিকেও আমূল বদলে ফ্যালে।

আর এই অনুমানটা মেনে নিলেই শুধু সবকিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আলো, কোনো অনচ্ছ বস্তুর উপরিতলে পৌঁছুবার পর এই রাসায়নিক পদার্থে ভরপুর হ'য়ে যায়, আলাদা-আলাদা হ'য়ে যায় বর্ণচ্ছটাগুলো, আর যে-সব রশ্মি তাদের রচনা করে তারা নির্বিচারে রূপান্তরিত হ'য়ে যায় এইসব অন্যান্য স্বতঃপ্রভ এখনও-অগোচর রশ্মিতে, যার অস্তিত্ব আছে ব'লেই আমি ধ'রে নিয়েছি। এইসব রশ্মি তখন বস্তুর নিরেট জমির মধ্য দিয়ে অনায়াসেই ব'য়ে যাবে। তারপর, তারা যখন উৎসারিত হবে, তারা আবার একটা বিপরীত রূপান্তরণের মধ্য দিয়ে যাবে, ফিরে পেয়ে যাবে তাদের নিজস্ব মৌলরূপ আর এমনভাবে আমাদের নেত্রপটের ওপর প্রভাব ফেলবে যেন ঐ অনচ্ছ বস্তুর কোনো অস্তিত্বই নেই।

সন্দেহ নেই, কতগুলো বিষয় তবু অস্পষ্টই থেকে যাচ্ছে। কেমন ক'রে এটা ব্যাখ্যা করবো যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে যেমন খালি চোখে দেখা যায় না তেমনি তার পোশাকআশাকও দেখা যায় না, অথচ যা-কিছু সে হাতে ধ'রে থাকে, তা তখনও দৃশ্যমান থেকে যায়? আর কী সেই *রাসায়নিক* যেটা এমন আশ্চর্য প্রভাব ফেলতে পারে, যার মধ্যে সে ঢুকে পড়ে, তারই ওপর? সেটা আমার জানা নেই, আর এতে আমার বেশ মনখারাপই হ'য়ে গেছে, কারণ তাহ'লে আমি নিজের ওপর সেটা ব্যবহার ক'রে আমাদের এই শত্রুর সঙ্গে সমানে-সমানে যুঝতে পারতাম। তবে, শেষ অব্দি, হয়তো, এই বাড়তি সুবিধেটুকু ছাড়াই বুদ্ধির খেলায় দুশমনকে কুপোকাৎ ক'রে দেয়া যাবে।

অবস্থাটা উভয়সংকটের মতো : এই অজানা রাসায়নিকটা যা-ই হোক না কেন, তার প্রভাব হয় তাৎক্ষণিক হবে, আর নয়তো, চিরস্থায়ী। প্রথমটাই যদি সত্যি হয়, ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে তাহ'লে হয়তো নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট-মাত্রায় এই রাসায়নিক নিজের শরীরে ঢোকাতে হয়—পান ক'রে, অথবা সুঁই ফুঁড়ে। তার প্রভাবটা যদি চিরস্থায়ী হয়, তবে প্রতিষেধক কোনো ওষুধ দিয়ে, ঠিক উলটো-কোনো রাসায়নিক দিয়ে তাকে আগের রাসায়নিকের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে হয়, কেননা এমন-অনেক পরিস্থিতি আসবে যখন অদৃশ্য-হওয়াটা সুবিধে হওয়ার বদলে বরং অসুবিধেই হ'য়ে উঠবে। দুটোর মধ্যে যেটাই সত্য হোক না কেন, সে নিশ্চয়ই বাধ্য হবে আগে থেকেই বেশি পরিমাণে ঐ রাসায়নিক মজুত ক'রে রাখতে, কেননা যে-পরিমাণ রাসায়নিক সে সবসময় পকেটে রাখতে পারবে তা তো আর তেমন-বেশি হবে না।

এদিকটার তো একটা না-হয় যেমন-তেমন ব্যাখ্যা হ'লো, কিন্তু চার্চে গিয়ে ঐ ঢং ঢঙা ঢং ঘণ্টা বাজানোই বা কেন, কিংবা মশাল জ্বেলে আলার ছটা ক্ষিপ্রবেগে নাড়ানোই বা কেন? কী মানে হ'তে পারে এর? কী-রকম খাপছাড়া, উদ্ভট, অসংলগ্ন ব'লে মনে হয় তাদের—তখনই আমার তা মনে হয়েছে। এ থেকে কি এটাই ধ'রে নিতে হবে যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস, ক্ষমতার মদে মত্ত হ'য়ে, এ-সব অর্থহীন কাণ্ড ক'রে নিছকই বারফট্টাই করেছে, জাঁক দেখিয়েছে? না কি তার মাথাটাই বিগড়ে যেতে বসেছে!

এমন-সব সাত-পাঁচ ভাবনা নিয়েই আমি মঁসিয় স্টেপার্কের খোঁজে বেরিয়েছি। তাঁকে আমি আমার মনের কথা খুলে বলেছি, আর সঙ্গে-সঙ্গেই ঠিক হয়েছে যে বুলভার তেকেলির বাড়িটার ওপর আরো-কড়া নজরদারি দরকার—সেজন্যে দরকার হ'লে সেনাবাহিনীরও সাহায্য নেয়া হবে। এমনভাবে পাহারা বসাতে হবে, গায়ে গা ঠেকিয়ে সারি-সারি সেপাই বা পল্টন, যাতে বাড়ির মালিকের পক্ষে রক্তমাংসের শরীর নিয়ে ভেতরে যাওয়া অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। সে অদৃশ্য হ'য়ে যাবার ক্ষমতা ধরে বটে, কিন্তু শরীরটা তো রক্তমাংসের! তাতে সে যেমন তার ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে পাবে না, তেমনি তার গোপন ভাঁড়ারও তার নাগালের বাইরে থেকে যাবে। আর বিপাকে প'ড়ে তখন তাকে আগেই হোক বা ক-দিন পরেই হোক, আবার ঐ মানুষী চেহারাই নিতে হবে, অথবা অদৃশ্য মানুষ হিশেবেই চিরটা কাল কাটিয়ে দিতে হবে—আর সেটাই তখন হ'য়ে উঠবে তার *আকিলিসের গোড়ালি*, তার দুর্বলতা। আর তার যে ক্রমেই মাথাখারাপ হ'য়ে যাচ্ছে, এই অনুমানটা যদি ভিত্তিহীন না-হয়, তবে এইসব বাধাবিপত্তিদুর্বিপাক তাকে বাধ্য করবে রাস্তায়-রাস্তায় ঘরছাড়া দিকহারা ঘুরে বেড়াতে, এবং মাথাটা তখন আরো যাবে।

মঁসিয় স্টেপার্ক হন্তদন্ত হ'য়ে বেরিয়ে গেছেন বটে, আমাকে কিন্তু তাঁর সঙ্গে যেতে বলেননি। তাহ'লে কি তিনিও কোনো ফন্দি এঁটেছেন, কোনো রণকৌশল ঠিক করেছেন, যা থেকে—তাঁর ধারণা—আমি তাঁকে বিরত করবার চেষ্টা করবো? তিনি কি সেই অসম্ভবেরই প্রত্যাশা ক'রে আছেন যে আচমকা একসময় তাঁর সঙ্গে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর মুখোমুখি দেখা হ'য়ে যাবে? স্প্রেম্বার্গে যাকে খবর আনতে পাঠিয়েছিলেন, তার ফিরে-আসার অপেক্ষা করছেন কি? ভাবছেন কি যে সে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর পাকা খবর এনে দেবে, বলবে কোথায় তাকে পাওয়া যাবে? আমি নিশ্চয়ই তাঁকে টেনে ধ'রে রাখতুম না। বরং তাঁর সঙ্গেই যেতুম, এই সমাজবিরোধিকে পাকড়াবার ব্যাপারে তাঁকে বরং সাহায্যই করতুম। কিন্তু সে-রকম কিছু হবার সম্ভাবনা আছে কি—মুখোমুখি দেখা হবার? নিশ্চয়ই না। রাগৎস-এ তো নয়ই, অন্য-কোথাওও নয়।

এগারো জুন সন্ধেবেলায় মার্কের সঙ্গে আমার একটা দীর্ঘ শলাপরামর্শ হয়েছে। ভারি কাতর হ'য়ে পড়েছে মার্ক, বিহ্বল; আগের চাইতেও অনেক-বেশি; আমার তো ভয়ই হচ্ছিলো পাছে সে কঠিন-কোনো অসুখ বাধিয়ে বসে। তাকে যদি এই শহরটা থেকেই সরিয়ে দেয়া যেতো, ফ্রান্সে যদি নিয়ে যাওয়া যেতো, তবে ভালো হ'তো; কিন্তু আমি এও জানতুম সে কিছুতেই এই মুহূর্তে মাইরার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে

চাইবে না। আচ্ছা, গোটা রডারিখ পরিবারকেই যদি কিছুদিনের জন্যে রাগৎস থেকে অন্য-কোথাও নিয়ে-যাওয়া যায় ? এটাও কি বিবেচনা ক'রে দেখার মতো একটা প্রস্তাব নয় ? আচ্ছা, পরে একসময় স্বয়ং ডাক্তারের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলাপ ক'রে দেখতে হবে।

সেদিন, মার্কের সঙ্গে নানা কথাবার্তার পর, আমি বলেছি : 'শোন, মার্ক, দেখতে পাচ্ছি তুই একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছিস। এটা কিন্তু তুই ভুল করছিস, মার্ক। মাইরার তো আর জীবনসংশয় নয়—সব ডাক্তারই বলেছেন, এ-যাত্রায় সে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। আর যদি তার যৎকিঞ্চিৎ বুদ্ধিভ্রংশ বা মতিভ্রম হ'য়ে থাকে, তবে সেও নিতান্তই সাময়িক। বিশ্বাস কর আমায়—এটা কোনো মিথ্যে স্তোক নয়। আবার তার চৈতন্য ফিরে আসবে, কাণ্ডজ্ঞান ফিরে আসবে, আবার সে আগেকার মাইরা হ'য়ে উঠবে, *নিজেই নিজের মতো*—'

'তুমি চাচ্ছো আমি যাতে আশা ছেড়ে না-দিই,' মার্কের গলাটা বুঝি ধ'রে এসেছে। 'কিন্তু বেচারি যদি আবার বুদ্ধিশুদ্ধি ফিরে পায়, তখনও কি সে ঐ রাক্ষসটার দয়ার ওপর নির্ভর করবে না ? তোমার কি ধারণা ঐ দুর্বৃত্তটা এ-যাবৎ যা অপকীর্তি করেছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে? যদি সে তার প্রতিহিংসাটাকে আরো-বহুদূরে টেনে নিয়ে যেতে চায় ? ... যদি, চায় ?... বুঝতে পারছো, আঁরি, আমি কী বলতে চাচ্ছি? সে-তো যা-খুশি তা-ই করতে পারে, আমরা তাকে ঠেকাবো কেমন ক'রে ?'

'না, না, মার্ক,' তক্ষুনি আমি সজোরে আপত্তি জানিয়েছি, ' তার সঙ্গে যোঝা যাবে —মোটেই অসম্ভব নয় তা—'

'কিন্তু কেমন ক'রে ?' মার্ক বুঝি ডুবন্ত মানুষের মতো নিছক একটা খড়কুটোই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। '*কীভাবে* ?—না, আঁরি, তুমি সত্যি যা ভাবছো তা কিন্তু মোটেই খুলে বলছো না। না, এই পিশাচটার কাছে আমরা অসহায়, প্রতিরোধহীন ! তাকে এড়াবার উপায় তো একটাই : যাবজ্জীবন একটা দুর্গে বন্দী হ'য়ে-থাকা। আর তারপরেও আমরা জানি না কখনও কোনো ফাঁক পেয়ে এই দুর্ভেদ্য দুর্গেও সে ঢুকে পড়বে কি না !'

মার্কের উত্তেজনা আর হতাশা আমার যেন দম আটকে দিয়েছে। সে কেবল নিজের কথাই শুনছে, আর-কারু কথা কানেই নিচ্ছে না। আমার হাত দুটি চেপে ধ'রে সে আবার বলেছে :

'কে বলবে এখানে আমরা দুজনেই শুধু আছি কি না ! আমি এ-ঘর থেকে ও-ঘর যাই, ড্রয়িংরুমে যাই, গ্যালারিতে যাই, আর সবসময় মনে-মনে বলি, ঐ নিশ্চয়ই সে আসছে আমার পেছন-পেছন ! সবসময় কেউ যেন আমার সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটছে ! অথচ সে আমার ধরাছোঁয়ার মধ্যে নেই, কেবলই নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে... যেই তাকে চেপে ধরতে যাই, অমনি সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, এড়িয়ে যায় আমাকে...'

ধরা গলায় আর্তভাবে ভাঙা-ভাঙা কথা বলতে-বলতে সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে ছুটে বেরিয়েছে মার্ক, যেন কাউকে তাড়া ক'রে যাবার চেষ্টা করেছে। কিছুতেই তাকে আর শান্ত করা যাচ্ছে না, কোনো সান্ত্বনাই কাজ দিচ্ছে না। সবচেয়ে ভালো হয়, ওকে যদি

এখান থেকে দূরে-কোথাও নিয়ে যাই, দূরে, *অনেক দূরে!*

'কে জানে,' ব'লেই চলেছে সে ছেঁড়া-ছেঁড়া কথাগুলো, 'আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করেছি সব সে আড়ি পেতে শুনেছে কি না! আমরা ভাবছি, বেশ আছি, সে অনেক দূরে আছে। কিন্তু সে-যে এখানে, *এই মুহূর্তে এখানে*, নেই তা কে বলতে পারবে?—ঐ তো! দরজার ওপাশে আমি তার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি! ঐ-যে, ওখানে!... কই? যাও, পাকড়াও গিয়ে ওকে, পেড়ে ফ্যালো!... কিন্তু পারবে কি তুমি কখনও?...এ কি আদৌ সম্ভব?... এই পিশাচ—তার মাথায় এখন মরণ ভর করেছে!...'

আমার ছোটোভাইটির অবস্থা এখন এমনই শোচনীয় দশায় গিয়ে পৌঁছেছে! আমি কি আগেই এই আশঙ্কা করিনি যে বিষম সংকটের মধ্যে গিয়ে পড়লে মাইরার মতো তারও বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাবে! অটো স্টোরিৎস যদি দুর্দান্ত বৈজ্ঞানিকই হবেন, তবে তাঁর কি এমন অভিশপ্ত কোনো রাসায়নিক আবিষ্কার না-করলেই চলছিলো না? কেন এমন-একটা হাতিয়ার এমন লোকের হাতে তুলে দিয়েছেন যার ধাতটাই স্বভাবদুর্বৃত্তের, বিপথগামী! বৈজ্ঞানিকেরা তো দার্শনিকও হন—তাঁরা কী বুঝতে পারেন না কোন আবিষ্কারে কী হয়?

শহরের হালচালও মোটেই ভালো না। যদিও সেই ক্যাথিড্রালের ঘণ্টাবাদনের পর আর-কোনো ঘটনাই শহরের লোকজনকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়নি, তবু শহরটা যেন ধুঁকছে, ভয়েই আধমরা। সকলের বাড়িই যেন হানাবাড়ি হ'য়ে উঠেছে, যেন অদৃশ্য-কেউ এসে ভর করেছে বাড়িটায়। *অদৃশ্যের উপস্থিতি*! কী দুর্দান্ত পরিহাস! ক্যাথিড্রালে ঐ ঘটনা ঘটার পর জিশুর শরণ নিয়েও যেন আর-কারু পার নেই। কর্তৃপক্ষ মিথ্যেই চেষ্টা করছেন শহরের সন্ত্রস্ত মানুষজনকে আশ্বস্ত করতে—মিথ্যেই, কেননা এই আতঙ্ককে *ঠেকাবার* সাধ্য যেন কিছুরই নেই! একটা নজির দিলেই বোঝা যাবে, শহরের মনোবল কোন তলানিতে গিয়ে *ঠেকেছে*।

বারোই জুন সকালে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম পুলিশের বড়োকর্তার সঙ্গে দেখা করতে যাবো ব'লে। সন্ত মিখায়েলের চক থেকে যখন মাত্র দুশো গজ দূরে পৌঁছেছি, দেখি কাপ্তেন হারালান। তাকে দেখেই আমি বলেছি : 'আমি মঁসিয় স্টেপার্কের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। সঙ্গে আসতে চাও, কাপ্তেন?' কোনো উত্তর না-দিয়ে একটা কলের পুতুলের মতো সে আমাকে অনুসরণ করেছে। আমরা যেই একটা চকের কাছে পৌঁছেছি, অমনি কানে এসেছে তুলকালাম আতঙ্কের ধ্বনি।

একটা ঘোড়ায়টানা ডাকের গাড়ি জোরকদমে ছুটে আসছিলো রাস্তা দিয়ে, দিগ্বিদিকহারা, রাশ না-টানা; পথচারী যে যেদিকে পারে ডানে-বাঁয়ে ছিটকে পড়েছে। দেখে মনে হয়েছে, কোনো কোচোয়ানই নেই গাড়িতে, ঘোড়াগুলো নিজেরাই ছুটেছে, চালকবিহীন! হয়তো চালক কোথাও টাল সামলাতে না-পেরে প'ড়ে গিয়েছে রাস্তায়। কিন্তু তার ফলে যা হয়েছে, তাকে কি চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করা যায়? ঐ পাগলা

স্প্রেমবার্গে দেখা গেছে।'

'*স্প্রেমবার্গে!*' অস্ফুট স্বরে ব'লে উঠেছে কাপ্তেন হারালান। তারপর আমার দিকে ফিরে বলেছে : 'তাহ'লে চলুন! এক্ষুনি স্প্রেমবার্গ চলুন! আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন।'

উত্তরে যে কী বলবো, তা আমি ভেবে পাইনি। কেননা আমি নিশ্চিত জানি খামকাই আমরা বুনোহাঁসের পেছনে তাড়া ক'রে যাবো!

'সবুর, কাপ্তেন, সবুর!' মঁসিয় স্টেপার্কই তাকে থামিয়েছেন। 'খবরটা ঠিক কি না জানতে আমি স্প্রেমবার্গে লোক পাঠিয়েছি। যে-কোনো মুহূর্তে সে এসে পড়বে।'

আধঘণ্টাও কাটেনি, আর্দালি এসে একটা চিরকুট এনে দিয়েছে, দ্রুত ডাকের গাড়িতে স্প্রেমবার্গ থেকেই এসেছে সেটা। আগে যে-খবরটা এসেছিলো, তার কোনো বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি নেই। ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে আদপেই দেখা যায়নি ওখানে, বরং এটাই বিশ্বাস করবার যুক্তিসংগত কারণ আছে যে সে সম্ভবত রাগ্‌ৎস ছেড়েই বেরোয়নি।

আরো দু-দিন কেটেছে, মাইরার অবস্থার কোনো বদল হয়নি। মার্ককে বরং আগের চাইতে একটু শান্ত দেখিয়েছে। আমি শুধু ফাঁক খুঁজেছি কখন ডাক্তার রডারিখের কাছে শহর ছেড়ে চ'লে যাবার কথাটা পাড়বো।

চোদ্দই জুন দিনটা কিন্তু আগের কয়েকদিনের মতো শান্ত ছিলো না। লোকের উত্তেজনা আর রোষ গিয়ে চরমে পৌঁছেছে, কর্তৃপক্ষ বুঝতে শুরু করেছেন এই উত্তেজনা প্রশমন করার ব্যাপারে তাঁরা কতটাই অক্ষম।

এগারোটা নাগাদ, আমি যখন দানিউবের তীর ধ'রে হাঁটছি, আমার কানে এই কথাগুলো এলো :

'ফিরে এসেছে!... ফিরে এসেছে!'

কে-যে ফিরে এসেছে, সেটা বুঝতে কোনো অসুবিধে হবারই কথা নয়। তবু একজন পথচারীকে ডেকে আমি জিগেস করেছি কী ব্যাপার। তাতে সে বলেছে : 'তার বাড়ির চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে।' অন্য-একজন অমনি গায়ে প'ড়ে বলেছে: 'মিনারের জানলায় তার ঐ অতি-বদখৎ বিশ্রী মুখটা দেখা গেছে!'

এ-সব কথা বিশ্বাস করা ঠিক হবে কি না কে জানে। আমি নিজেই তখন হনহন ক'রে গেছি বুলভার তেকেলির দিকে।

অমন বেপরোয়াভাবে কি ভিলহেল্ম স্টোরিৎস নিজেকে জাহির করবে? শুধু বেপরোয়াই নয়, একটু হাঁদার মতোই *ঠেকেছে* ব্যাপারটা। কেউ যদি তাকে একবার বাগে পায়, তবে তার যে কী দশা হবে সে কি তা জানে না? অকারণে সে অমনতর ঝুঁকি দেবে কেন? কেন তার *অতিপরিচিতবিশ্রীমুখ* সে দেখাতে দেবে তার বাড়ির জানলায়?

সত্য হোক, মিথ্যা হোক, খবরটার মাহাত্ম্য ছিলো। আমি গিয়ে দেখি, এর মধ্যেই কয়েক হাজার লোক জড়ো হয়েছে সেখানে, পুলিশ বেষ্টনী বানিয়ে কর্ডন ক'রে তাদের

ঘোড়াদেরই মতোই জনা-কয়েক পথচারীর মাথায় একটা পোকা যেন কুটুস ক'রে কামড়েছে—তাদের মনে হয়েছে কোনো অদৃশ্য কোচোয়ানই বুঝি গাড়িটা চালাচ্ছে! খোদ ভিলহেল্ম স্টোরিৎসই বসেছে চালকের আসনে! আর্ত চীৎকার ছিঁড়েছে আকাশ-বাতাস: 'ঐ সে! খোদ লুসিফার! শয়তানটা নিজেই! ভিলহেল্ম স্টোরিৎস!'

আমি ঘাড় ফিরিয়ে কাপ্তেন হারালানকে কী যেন বলতে যাচ্ছিলুম, দেখি সে তখন আর পেছনে নেই, সোজা সে ছুটেছে পাঁই-পাঁই কোচগাড়ির দিকে, সামনে এলেই ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সেটা সে থামাবে!

তখন বাজারহাটের সময়, রাস্তাঘাট ভর্তি লোকজনে, আর সবখান থেকেই ধ্বনি উঠছে: 'ভিলহেল্ম স্টোরিৎস! ভিলহেল্ম স্টোরিৎস!' পাগলা ঘোড়াগুলোকে তাগ ক'রে ঢিল ছুঁড়েছে লোকে, মোড়ের মাথার পাহারাওলা তার গাদাবন্দুক ছুঁড়েছে একবার! হৈ-হৈ রৈ-রৈ বেশামাল অবস্থা!

একটা ঘোড়া থুবড়ে পড়েছে রাস্তায়, তার পায়ে গুলি লেগেছে! আর গাড়িটা, টালমাটাল, দু-বার পাক খেয়ে উলটে পড়েছে ঘোড়াটারই গায়ে। তক্ষুনি ক্রুদ্ধ জনতা ছুটে গেছে গাড়িটার দিকে, মুহূর্তে সব লণ্ডভণ্ড ছত্রভঙ্গ, কেউ খুলেছে চাকা, কেউ মুগুর মেরেছে গাড়িতে, একজন খুলে নিয়েছে অক্ষদণ্ডটাই! একশো-জোড়া হাত নিশপিশ ক'রে ছুটে গিয়েছে ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের টুঁটি টিপে ধরবে ব'লে!... বদলে, তারা শুধু আঁকড়ে ধরেছে শূন্যতাই!

তাহ'লে সেই অদৃশ্য চালক গাড়িটা ওলটাবার আগেই লাফিয়ে নেমে পালিয়ে গিয়েছে! কারণ, শহরের লোককে আবার একটা নতুন অপকর্ম ক'রে সে-যে ঘাবড়ে দিতে চেয়েছিলো, এ নিয়ে লোকের মনে কোনো সন্দেহই ছিলো না। পরক্ষণেই অবশ্য জানা গেছে আসল ব্যাপারটা—অমন-কিছুই হয়নি! তক্ষুনি এসে হাজির এক চাষী, সে গাঁ থেকে তার ঘোড়ার গাড়িতে ক'রে এসেছিলো গঞ্জে, এটা মোটেই ডাকের গাড়ি নয়, গাড়িটা রাস্তায় রেখে সে একটা দোকানে গিয়ে ঢুকেছিলো, অমনি ঘোড়াগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগায়। একটা ঘোড়াকে চিৎপাত রক্তাপ্লুত হাড়গোড়ভাঙা প'ড়ে থাকতে দেখে সে-তো রেগে কাঁই! লোকে তার কথা শুনলে তো! আমার মনে হচ্ছিলো এই কাণ্ডজ্ঞানহারানো জনতার ক্ষিপ্ত রোষের হাত থেকে এই চাষীরই বুঝি আর পরিত্রাণ নেই। অনেক কষ্ট ক'রে সব্বাইকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে তবে এই চাষীটিকে বাঁচিয়েছি আমরা!

কাপ্তেন হারালানকে আমি ডেকে নিয়ে গিয়েছি সঙ্গে, সে টু শব্দটি না-ক'রেই আমার সঙ্গে গিয়েছে টাউনহলে। রাস্তায় কী হয়েছে, সেটা এর মধ্যেই জেনে গিয়েছিলেন মঁসিয় স্টেপার্ক। 'গোটা শহরটাই পাগল হ'য়ে গেছে,' আমাকে তিনি আপশোশ ক'রে বলেছেন, 'আর এ-পাগলামি যে শেষটায় কী ক'রে বসবে, তা-ই কেউ জানে না।'

আমি প্রথমেই পুরোনো প্রশ্নটা ক'রে নিয়েছি। 'নতুন-কিছু খবর পেলেন?'

'হ্যাঁ,' মঁসিয় স্টেপার্ক জানিয়েছেন, 'খবর পেয়েছি, ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে নাকি

ঠেকাতে চাচ্ছে, কিন্তু পারছে না। শুধু-যে বাড়ির চারপাশেই, তা নয়। আশপাশের রাস্তাতেও ভিড় উপচে পড়ছে। আর বারে-বারেই চীৎকার ক'রে জিগির তুলছে : 'ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর কালো হাত—ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও! ভিলহেল্ম স্টোরিৎস —মুর্দাবাদ!'

অযৌক্তিক কিন্তু অমোচনেয়—কী কারণ থাকতে পারে এই বিশ্বাসের পেছনে যে *সে* ওখানে আছে, *সে*, আর তার সঙ্গে আছে তারই অজস্র অদৃশ্য সাগরেদ? এই অভিশপ্ত বাড়িটার গায়ে যে উন্মাদ জনতা বাঁধভাঙা প্রস্রবণের মতো ভেঙে পড়েছে, এই *উত্তাল জলতরঙ্গ রোধিবে কে*? পারবে পুলিশ তাদের *ঠেকাতে*? আর ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যদি সেখানে থেকে থাকে, পারবে সে এই উন্মাদ জনতার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে? আর জানলায় যদি তাকে দেখা গিয়েই থাকে, সে তবে তখন মোটেই *অদৃশ্য* ছিলো না, তার বস্তুচেহারাই দেখেছে লোকে। আবার অদৃশ্য হ'য়ে যাবার আগেই তো সে ধরা প'ড়ে যাবে, আর তাকে ছিঁড়ে খাবে জনতা।

কর্ডন সত্ত্বেও, মঁসিয় স্টেপার্কের অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও, রেলিঙগুলো ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে, বাড়ির মধ্যে হামলে পড়েছে ভিড়, দরজা ভেঙেছে, চুরমার হ'য়ে গেছে জানলার কাচ, ভেতর থেকে আশবাব ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে উঠোনে—লনে, ল্যাবরেটরির সব যন্ত্রপাতি চূর্ণবিচূর্ণ, পদদলিত। তারপর একতলা থেকে লেলিহান লোলজিহ্বা মেলে দিয়ে হাওয়া চেটেছে আগুন, তারপর পাকে-পাকে শিখা পেঁচিয়ে ধরেছে গোটা বাড়িটাই, আর হানাবাড়িটা থুবড়ে পড়েছে দাউ-দাউ আগুনে, হয়তো-বা জাহান্নামেরই আগুন সেটা।

আর ভিলহেল্ম স্টোরিৎস? মিথ্যেই লোকে তাকে হাৎড়ে বেরিয়েছে বাড়িটায়, বাগানে, উঠোনে। সে এ-সব জায়গার কোথাও নেই—অথবা এও বলা যায়, তাকে খুঁজে-পাওয়া ছিলো অসম্ভব।

দশ জায়গা থেকে আগুনের জিভ লকলক চেটেছে বাড়িটাকে, আস্ত গিলে খেয়েছে, একঘন্টা প'রে প'ড়ে থেকেছে শুধু চারটে ভাঙাচোরা দগ্ধ দীর্ণ দেয়াল।

হয়তো বাড়িটা যে ধ্বংস হ'য়ে গেছে, সে একদিক থেকে ভালোই হ'লো। কে জানে, এতে রাগ্‌ৎসের লোকের উত্তেজনার প্রশমন হ'লেও হ'তে পারে। তারা হয়তো ভেবে বসতে পারে যে হানাবাড়িটার সঙ্গে-সঙ্গে অভিশপ্ত ভিলহেল্ম স্টোরিৎসও ভস্মীভূত হ'য়ে গেছে—অদৃশ্যই হোক, আর দৃশ্যই হোক।

কিন্তু কোথায় তার ঐ ভস্মাবশেষ?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হানাবাড়িটা ধ্বংস হ'য়ে যাবার পর শহরের টগবগ উত্তেজনা একটু শান্ত হয়েছে, অন্তত লোকে এই ভেবে আশ্বাস পেয়েছে যে শয়তানের ডেরাটা ধ্বংস ক'রে দেয়া গেছে বটে। অনেকে আবার এও ভেবে নিয়েছে যে এই *পিশাচসিদ্ধ* স্বয়ং ছিলো তখন বাড়িটায়, আর সেও ঐ বহ্নিমান চিতায় পুড়ে মরেছে। আসলে কিন্তু ছাইভস্ম তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও এই বিশ্বাসের যাথার্থ্য আদৌ প্রমাণ করা যায়নি। বাড়িটা আক্রান্ত হবার সময় ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যদি বাড়িতে থেকেও থাকে তবে সে এমন-কোথাও লুকিয়েছিলো আগুন অনেক খুঁজেও যেখানে তার সন্ধান পায়নি।

এদিকে, স্প্রেমবার্গ থেকে আরো চিঠি এসেছে, আর তাদের বয়ান অবিকল এক না-হ'লেও একটা বিষয়ে সবাই একমত : তাকে সেখানে দেখা যায়নি, তার স্যাঙাৎ হেরমানকেও সেখানে দেখা যায়নি, আর এরা দুজনে যে কোথায় গিয়ে আস্তানা গেড়েছে সে-বিষয়ে কারুই কোনো ধারণা নেই।

দুর্ভাগ্য এটাই যে শহরের উত্তেজনা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হ'লেও রডারিখ-ভবনে কিন্তু ঠিক তার উলটোটাই ঘটেছে। মাইরার মানসিক ভারসাম্যহীনতার কোনো হেরফের হয়নি। অচৈতন্য, সমস্ত সেবাযত্নে নিঃসাড়, সে এখনও কাউকে চিনতেই পারে না—শুধু ফ্যালফ্যাল ক'রে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এতদিনে ডাক্তাররা আর আশা দেখাবার মতো দুঃসাহস পাচ্ছেন না। তবে, যদিও অতিরিক্ত দুর্বল সে, তার জীবনের কোনো আশঙ্কা নেই। সে শুধু প'ড়ে আছে এলায়িত, আলুথালু, অনড়, মৃত্যুর মতো বিবর্ণ। যদি কেউ তাকে তুলে ধ'রে বসাতে চায়, তার বুক থেকে বেরিয়ে আসে চাপা কান্না, চোখে ফুটে ওঠে সাতরাজ্যের আতঙ্ক, হাতদুটো অস্থির ওঠে-নামে, অসংলগ্ন সব কথা অস্ফুট বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে। তবে কি তার স্মৃতি ফিরে আসছে ধীরে, অতি ধীরে ? সে কি আবার মনে-মনে বেঁচে নিচ্ছে সেইসব দুঃসহ আতঙ্ক, সান্ধ্য-মজলিশের দৃশ্য, ক্যাথিড্রালের কেলেঙ্কারি ? এখনও কি তার কানে বেজে যাচ্ছে তার আর মার্কের প্রতি উদ্দিষ্ট সেই ভয়ংকর অভিসম্পাত ? হোক বিভীষিকা, তবু এও ভালো, যে তার মন অতীতের স্মৃতিকে রক্ষা করতে পেরেছে।

ভাবা কি যায়, কীভাবে বেঁচে আছে এই বাড়ির মানুষগুলো ? মার্ক বাড়ি ছেড়ে এক পাও নড়ে না। ডাক্তার আর মাদাম রডারিখের সঙ্গে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে মাইরার রোগশয্যার পাশে, রোগিণীকে নিজের হাতে দাওয়াই দেয় পথ্য খাওয়ায়, আর তার অস্থির চোখ হন্যে হ'য়ে খুঁজে বেড়ায় মাইরার চোখে চৈতন্যের কোনো ছাপ ফুটে উঠছে কি না।

ষোলো তারিখের বিকেলবেলায় আমি একা-একাই এলোমেলো ঘুরে বেড়িয়েছি রাগ্‌ৎসের পথে-পথে, হঠাৎ মাথায় একটা ভাবনার উদয় হয়েছে : দানিউবের ডান তীরে

—ওপারে—চ'লে গেলে কেমন হয়। অনেকদিনই ভেবেছি, একদিন যেতে হবে ওদিকটায়, কিন্তু এ-সব বিপর্যয়ের মধ্যে অ্যাদ্দিন একফোঁটাও ফুরসৎ পাইনি যে নিজের খেয়ালখুশি মতো বেড়াবো। তাছাড়া বেড়াবার আনন্দের প্রশ্ন অবশ্য এমন অবস্থায় ওঠেই না। তবু আমি এগিয়ে গেছি সেতুর দিকে, পেরিয়ে গেছি নদীর মাঝখানকার দ্বীপটা, শেষটায় এসে পা রেখেছি সারবিয়ার তীরে।

ভেবেছিলুম একটু বেড়িয়েই ফিরে আসবো, শেষে কিন্তু অনেকটাই সময় কেটে গেলো। সেতুর কাছে যখন ফিরে এসেছি, তখন সাড়ে-আটটার ঘণ্টা বেজেছে; নদীর পাড়েই একটা সারবিয় সরাইখানায় সেরে নিয়েছি ডিনার। জানি না মাথায় তখন কোন ভূত চেপেছিলো। সরাসরি ফিরে-যাবার বদলে, আমি শুধু সেতুটার প্রথম অর্ধেকটা পেরিয়েছি, তারপর নেমে গিয়েছি মস্ত সেই সড়কটা দিয়ে সোজা মাঝনদীর সেই দ্বীপটাতে।

দশ গজও গিয়েছি কি না সন্দেহ, আমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হ'য়ে গিয়েছে মঁসিয় স্টেপার্কের। তাঁর সঙ্গে আর-কেউ ছিলো না; আমাকে দেখবামাত্র আমার কাছে এসে আলাপ জুড়ে দিয়েছেন, এবং ঘুরে-ফিরে তো সেই একই কথা—ভিলহেল্ম স্টোরিৎস বিনা তো কোনো গীত নেই।

দুজনে মিলে হাঁটতে-হাঁটতেই আলোচনা করছিলুম। হয়তো তিরিশ মিনিটের বেশি হবে না, আমরা পৌঁছে গেছি দ্বীপটার উত্তরবিন্দুতে। সবে রাত নেমে এসেছে তখন, গাছপালার তলায় ফাঁকা পরিত্যক্ত রাস্তায় ছায়া ঘনিয়েছে। শ্যালেগুলো সব রুদ্ধদ্বার, পথে কারু সঙ্গেই আমাদের দেখা হয়নি।

রাগ্‌ৎস-এ ফিরে যাবার সময় হয়েছে। আমরা ফিরে আসতে যাবো, এমন সময় হঠাৎ কতগুলো কথা আমার কানে পৌঁছুলো। তক্ষুনি আমি থমকে পড়েছি, মঁসিয় স্টেপার্কের হাতটা চেপে ধ'রে তাঁকেও থামিয়েছি। তারপর ঝুঁকে ফিশফিশ ক'রে তাঁর কানে-কানে বলেছি—যাতে আর-কেউ শুনতে না-পায়— 'ঐ শুনুন! কে যেন কথা বলছে... আর ঐ গলা—রুক্ষ, চেয়াড়ে... ঐ গলা তো ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের!'

তেমনি নিচু গলায় মঁসিয় স্টেপার্ক ব'লে উঠেছেন, 'ভিলহেল্ম স্টোরিৎস!'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের ও দেখতে পায়নি!'

'না। রাত সবই সমান ক'রে দেয়—আমাদেরও ওর মতোই অদৃশ্য ক'রে দেয়।'

গলাটা অস্পষ্টভাবে কানে আসছে—কিংবা বলা যায় গলাগুলো, কারণ অন্তত দুজন লোক নিশ্চয়ই আছে ঐ আবছায়ায়।

'হুঁ... একা নয়,' মঁসিয় স্টেপার্ক ফিশফিশ ক'রে বলেছেন।

'না... সম্ভবত ওর সেই কাজের লোক—'

মঁসিয় স্টেপার্ক আমাকে একরকম টেনেই নিয়ে গেছেন একটা গাছতলায়, মাটিতে

গুঁড়ি মেরে ব'সে পড়েছেন। অন্ধকারকে ধন্যবাদ, হয়তো তার সৌজন্যে আমরা কোনোরকমে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আরো-একটু কাছে গিয়ে স্পষ্ট ক'রে শুনতে পাবো এরা কী বলছে। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যেখানে আছে ব'লে আন্দাজ করেছি তার থেকে দশ-পা দূরে গিয়ে আমরা গুঁড়ি মেরে লুকিয়ে আছি। তাদের আমরা দেখতেই পাইনি, দেখতে পাবো ব'লেও আশা করিনি—আর সেইজন্যেই নিরাশও বোধ করিনি। বরং কেমন যেন চনমনেই বোধ করেছি। তার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবার পর থেকে আমাদের এই পহেলা দুশমনটি যে কোথায় আছে আর কী-সব বদ মৎলব আঁটছে সেটা জানবার কোনো সুযোগই আমরা পাইনি। হয়তো আজ একে পাকড়াবারও একটা মওকা মিলে যাবে।

উৎকর্ণ হ'য়ে সব শুনছি আমরা। আমরা যে ধারে-কাছেই কোথাও আছি, তা বোধহয় ভিলহেল্ম স্টোরিৎস ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারেনি। ডালপালার মাঝে গুঁড়ি মেরে, ঝুঁকে, শ্বাস ফেলবারও সাহস হচ্ছে না, আমরা অবর্ণনীয় মানসিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যেতে-যেতে কান পেতে শুনছি কী-শলাপরামর্শ করছে তারা, কখনও স্পষ্ট কখনও একটু-বা অস্পষ্ট, কেননা প্রভুভৃত্য এই গাছপালার ফাঁকে পায়চারি করতে-করতেই বলছিলো কথাবার্তা।

প্রথম যে-কথাটা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি, সেটা ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের। 'আমরা কাল থেকে ওখানে যেতে পারবো তো?'

'কাল থেকে,' বলেছে তার অদৃশ্য সহচর—সম্ভবত তার কাজের লোক হেরমান, 'আর আমরা যে কোথায় আছি তা কাকপক্ষীতেও টের পাবে না।'

'কখন তুমি রাগ্‌ৎসে ফিরে গিয়েছিলো?'

'আজ সকালেই।'

'বেশ... আর ঐ বাড়িটা? ভাড়া নেয়া হ'য়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, বেনামে।'

'তুমি ঠিক জানো যে আমরা খোলাখুলিই থাকতে পারবো ওখানে? কেউ আমাদের চেনে না ঐ—'

হতাশাটা কোন পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে, তা নিশ্চয়ই আন্দাজ করাই যায়। কী দুর্ভাগ্য! ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যখন শহরটার নাম বলেছে, কথা বলতে-বলতে সে দূরে চ'লে গিয়েছে আমাদের কাছ থেকে, শহরটার নাম আমরা শুনতেও পারিনি। তবে যতটুকু শুনেছি, তাতেই বোঝা গেছে আমাদের এই দুশমনটি আর খুব-একটা দেরি না-ক'রেই যাতে *দৃশ্যমান* হ'য়ে-যাওয়া যায়, মানুষী রূপ ফিরে পায়, তার ওপরই নির্ভর ক'রে আছে। এত তাড়া কীসের তার? কেনই-বা এ-রকম একটা ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে? তবে কি বেশিদিন অদৃশ্য থাকলে ঐ রাসায়নিকের প্রভাবে স্বাস্থ্যের খুব ক্ষতি হয়?

স্বরগুলো আবার যখন কাছে ফিরে এলো, হেরমান তখন কী-একটা কথা পেড়ে তারই জের টেনে ব'লে চ'লেছে যার শেষটুকুই শুধু আমরা শুনতে পেয়েছি: 'ঐ ছদ্মনাম

নিলে রাগ্‌ৎসের আহাম্মক পুলিশগুলো আমাদের কোনোদিনই খুঁজে বার করতে পারবে না।'

রাগ্‌ৎসের পুলিশ?... তার মানে হাঙ্গেরিরই কোথাও তারা থাকতে চাচ্ছে?

তারপর আবার তাদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলো। তার ফলেই মঁসিয় স্টেপার্ক প্রায় অস্ফুস্ট স্বরে বলতে পেরেছেন, 'কোন্ শহর? কী-সব ছদ্মনাম? প্রথমে আমাদের এই তথ্যগুলোই জেনে নিতে হবে—যে-ক'রেই হোক।'

আমি কোনো উত্তর দেবার আগেই পায়ের আওয়াজ কাছে এসে পড়েছে, আমাদের চেয়ে মাত্র কয়েক পা দূরে এসে তারা থেমেছে।

'স্প্রেমবার্গে যাওয়া কি,' জিগেস করেছে হেরমান, 'এতই জরুরি?'

'ভীষণ। কারণ টাকাকড়ি সব সেখানকারই ব্যাঙ্কে আছে। এখানেও আছে, তবে এখানে ব্যাঙ্কের ধারে-কাছেও নিরাপদে যাওয়া যাবে না। আর ওখানে—'

'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে রক্তমাংসের শরীরে গিয়ে সেখানে দেখা দেবেন?'

'অগত্যা। তাছাড়া আর উপায়ই বা কী? চোখে না-দেখে কেউ তো আর ঝুলি থেকে কানাকড়িও বার করবে না।'

তাহ'লে আমি যা ভেবেছিলুম, সেটাই ঘটেছে। স্টোরিৎস এখন এমন-একটা জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে অদৃশ্য হ'য়ে-থাকাটা তার পক্ষে আর মোটেই সুবিধেজনক নয়। তার এখন টাকা চাই, আর সেইজন্যে এখন তাকে তার এই আশ্চর্য ক্ষমতাটাকে ত্যাগ করতে হবে। সে কিন্তু তখনও ব'লে চলেছে : 'সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হ'লো এটাই যে কী-যে করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। ঐ আকাটগুলো গিয়ে আমার ল্যাবরেটরিটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে—দু-নম্বর সলিউশনের একটা শিশিও আর নেই। ভাগ্যিশ গাড়লগুলো বাগানের মধ্যকার গোপন জায়গাটা খুঁজে পায়নি, কিন্তু এখন তো সেটাও *ঐ ধ্বংসস্তূপের* তলায় চাপা প'ড়ে গিয়েছে। সে-জায়গাটা গিয়ে তোমায় সাফ ক'রে দিতে হবে।'

'যেমন বলবেন, তা-ই হবে,' বলেছে হেরমান।

'পরশু দশটা নাগাদ এসো। দিন বা রাত্রি—সবই তো সমান এখন আমাদের কাছে, তবে একটু স্পষ্ট দেখা যাবে, এই যা।'

'কেন? কাল নয় কেন?

'কাল আমাকে অন্য-একটা কাজ করতে হবে। আবার একটা জম্পেশ গোছের তাকলাগানো কাণ্ডের ফন্দি এঁটেছি আমি—আর আমরা তো জানিই কে-সে এ-কাজটা খুব-একটা পছন্দ করবে না।'

দুজনে আবার পায়চারি করতে-করতে দূরে চ'লে গিয়েছে। ফের যখন কাছে ফিরে এসেছে, তখন :

'না, আমি রাগ্‌ৎস ছেড়ে চ'লে যাবো না, কিছুতেই না,' গররর্ ক'রে উঠেছে

ভিলহেল্ম স্টোরিৎস। 'যতক্ষণ মাইরা আর ঐ ফরাশি ছোকরা এখানে থাকবে, পরিবারটাকে আমি মজা দেখিয়ে ছাড়বো। কী-যে ঘৃণা করি ওদের!'

একটা যেন ক্রুদ্ধ গর্জন বেরিয়ে এসেছে তার মুখ থেকে, মানুষের ভাষার বদলে। তখন সে আমাদের একেবারে কাছ দিয়ে যাচ্ছিলো, হয়তো হাত বাড়ালেই তাকে পাকড়ে ফেলা যেতো তখন। কিন্তু আমাদের সমস্ত মনোযোগ তখন হেরমানের কথার ওপর গিয়ে পড়েছে : 'এখন রাগ্‌ৎস্‌-এ সব্বাই জানে যে আমরা ইচ্ছে করলেই অদৃশ্য হ'য়ে যেতে পারি, কিন্তু *কেমন ক'রে*, সেটা জানে না।'

'আর, সেটা তারা কোনোদিনই জানবেও না,' ভিলহেল্ম স্টোরিৎস ঘোষণা করেছে। 'রাগ্‌ৎস্‌ এখনও আমার শেষ দ্যাখেনি। ভেবেছে, আমার বাড়ি পুড়িয়ে ফেলে বুঝি আমার সব গোপন কথাই পুড়িয়ে ফেলেছে !—গাড়লের দল !... না, রাগ্‌ৎস্‌ আমার প্রতিহিংসার হাত থেকে রেহাই পাবে না। এই শহরের একটা ইট, একটা পাথরও আমি আস্ত রাখবো না!'

শহরের সর্বনাশ ঘটাবার সংকল্প যেখানে ঝনঝন ক'রে বেজে উঠেছে, সেই কথাগুলো তখনও বোধহয় শেষ হয়নি, গাছপালাগুলো ভীষণভাবে ন'ড়ে উঠেছে। মঁসিয় স্টেপার্ক আর নিজেকে সামলাতে না-পেরে বুনো মোষের মতো কণ্ঠস্বরগুলোর দিকে ছুটে গেছেন, চীৎকার ক'রে ব'লে উঠেছেন, 'আমি একটাকে পাকড়েছি, ভিদাল ! আপনি অন্যটাকে পাকড়ান !'

তাঁর হাত, দৃশ্যমান না-হ'লেও, রক্তমাংসেরই কোনো শরীরের ওপর পড়েছে। কিন্তু তাঁকে এমন জোরে ধাক্কা দিয়েছে কেউ, যে উলটে তিনিই চিৎপটাং প'ড়ে যাচ্ছিলেন, শুধু শেষ মুহূর্তে আমি তাঁকে আঁকড়ে ধ'রে ধাক্কার বেগটা কমিয়ে দিয়েছি।

আমি ভেবেছিলুম, আমরাই বেকায়দায় পড়েছি, আমরা তো আর আমাদের শত্রুদের দেখতে পাচ্ছি না—এরা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি। বরং হো-হো ক'রে আমাদের বামদিকে কেউ বিদ্রূপের সুরে অট্টহাসি হেসে উঠেছে, আর তারপরেই দূরে মিলিয়ে গেছে ছুটন্ত পায়ের শব্দ।

'শয়তানটাকে বাগে পেয়েও কাবু করতে পারিনি !' আপশোশ ক'রে চেঁচিয়ে উঠেছেন মঁসিয় স্টেপার্ক। 'তবে একটা জিনিশ এখন আমরা নিঃসংশয়ে জেনে গিয়েছি —অদৃশ্য হয়েছে ব'লে এদের শরীর যে আঁকড়ে ধরতে পারবো না, তা নয় !'

কিন্তু বরাৎটাই খারাপ, তারা তবু আমাদের হাত এড়িয়ে পিঠটান দিয়েছে, এবং কোথায় যে তাদের গা-ঢাকা দেবার আস্তানা, তার কোনো হদিশই আমাদের জানা নেই। তা সত্ত্বেও মঁসিয় স্টেপার্কের উৎফুল্লভাবটার কোনো কমতিই হয়নি।

'এবার বাছাধনদের বাগে পেয়েছি,' ফেরবার পথে নিচু গলায় কোনো গোপান কথা আমায় ফাঁস ক'রে দেবার ভঙ্গিতে তিনি আমায় বলেছেন, 'শত্রুদের দুর্বল জায়গাটা আমরা জানি, জানি যে স্টোরিৎস তার ভাঙা বাড়িটায় পরশুদিন যাবে। তাতে আমরা দু-ভাবে তাকে কব্জা করতে পারবো। একটা ভেস্তে গেলেও অন্যটা সফল হবেই !'

মঁসিয় স্টেপার্কের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর আমি রডারিখ-ভবনেই ফিরে গিয়েছি। সেখানে, মাদাম রডারিখ আর মার্ক যখন মাইরার শুশ্রূষা করবার জন্যে রোগিণীর ঘরেই থেকে গেছে, আমি ডাক্তার রডারিখের সঙ্গে একটা ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে তাঁকে খুলে বলেছি এইমাত্র দ্বীপে কী হয়েছে।

ডাক্তারের মনে হয়েছে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যেভাবে হুমকি দিয়েছে, গোটা রাগ্‌ৎস সমেত রডারিখ পরিবারের ওপর যেভাবে বদলা নেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হ'য়ে আছে, তাতে বোধহয় সবাইকে নিয়ে রাগ্‌ৎস ছেড়ে চ'লে যাওয়াই মঙ্গল। এবার এখান থেকে পালাতে হবে সবাইকে, এবং পালাতে হবে গোপনে—যত শিগগির পারা যায়, ততই ভালো।

'আমিও আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত,' আমি তাঁর প্রস্তাবে সায় দিয়েছি, 'তবে আমার শুধু একটাই খটকা আছে। মাইরার শরীরের যা অবস্থা, তাতে সে কি পথের ধকল সইতে পারবে?'

'তার স্বাস্থ্যের কোনো উনিশবিশ হয়নি নতুন ক'রে,' ডাক্তার রডারিখ আমায় জানিয়েছেন, 'শরীরে তার কোনো কষ্ট নেই। শুধু তার মনের ওপর দিয়েই দারুণ একটা ঝড় চলেছে।'

'সেটা সে সময়ে সামলে উঠবে,' আমি আশ্বাস দিয়েছি, 'হাওয়াবদল হ'লে এমনিতেই মনমেজাজ ভালো হ'য়ে যায়, তার ওপর এমন-কোনো দেশে যদি যায় যেখানে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই'—

'কিন্তু হায়!' খেদ ব্যক্ত করেছেন ডাক্তার, 'আমরা কি এখান থেকে চ'লে গিয়েই বিপদটাকে এড়াতে পারবো? ভিলহেল্ম স্টোরিৎস কি আর কোনো দুষ্ট গ্রহের মতো আমাদের পেছন নেবে না?'

'কোথায় যেতে চাচ্ছি, কখন যেতে চাচ্ছি, এ-সব যদি আমরা গোপন রাখতে পারি, তাহ'লে সে আমাদের পেছন নেবে কী ক'রে?'

'আর গোপন!' মন-খারাপ-করা সুরে ব'লে উঠেছেন ডাক্তার।

মার্কের মতো স্বয়ং ডাক্তার রডারিখও তাহ'লে এখন জিগেস করছেন, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর কাছ থেকে কোনোকিছুই গোপন রাখা যায় কি না! সে হয়তো এখন এই ঘরে ব'সে-ব'সে আমাদেরই সব আলোচনা শুনছে!

তবু যাওয়াই ঠিক হয়েছে, এবং মাদাম রডারিখও কোনো আপত্তি তোলেননি। তাঁরও ধারণা, হাওয়াবদল করলেই বোধহয় মাইরা সেরে উঠবে। মার্কেরও কোনো দ্বিমত নেই। আমি অবশ্য তাকে দ্বীপের ঘটনাটা খুলে বলিনি, ব'লে ফায়দাটাই বা কী হ'তো, মাঝখান থেকে সে আরো-ঘাবড়ে যেতো! তবে কাপ্তেন হারালানকে আমি আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সব খুলে বলেছি। যাবার ব্যাপারে তারও কোনো আপত্তি নেই। সে শুধু জিগেস করেছে : 'আপনিও আসবেন তো আপনার ভাইয়ের সঙ্গে?'

'আর কীই-বা করতে পারি, বলো—'

'আমি কিন্তু যাবো না।' এমন দৃঢ় গলায় সে কথাটা বলেছে যে মনে হয়েছে তার এই সংকল্পের আর-কোনো নড়চড় হবে না।

'যাবে না ?...'

'না... আমি রাগ্‌ৎস্‌-এই থাকবো, কেননা শয়তানের বাচ্চাটাও এখানেই আছে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, থেকে গেলেই আমি ভালো করবো।'

তর্ক ক'রে কোনো লাভ নেই, অতএব এ নিয়ে আমি কোনো তর্কই করিনি, বরং বলেছি, 'বেশ, তাহ'লে তা-ই হবে, কাপ্তেন।'

'আমি কিন্তু আপনার ওপর ভরসা ক'রে আছি, মঁসিয় ভিদাল—আপনি আমার বদলে বাড়ির সকলের কাছে-কাছেই থাকুন। এখন তো আপনি আমাদেরই একজন হ'য়ে গেছেন।'

'সে তুমি আমার ওপর ভরসা করতে পারো,' আমি তাকে আশ্বাস দিয়েছি।

আর তার পরেই আমি যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করেছি। দিনে-দিনেই বেরিয়ে গিয়ে দুটো ভালো দেখে গাড়ি ভাড়া করেছি, যাতে আরামে যাওয়া যায়, তারপর মঁসিয় স্টেপার্কের সঙ্গে দেখা করতে গেছি : আমাদের পরিকল্পনাটা তাঁকে অন্তত জানিয়ে যাওয়া উচিত। তিনিও আমাদেরই তরফে রায় দিয়েছেন, 'এটা আপনারা খুব ভালো ভেবেছেন। শহরশুদ্ধু লোকজনও যদি তা-ই করতে পারতো তো খুবই ভালো হ'তো !'

তাঁকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিলো। দেখাবে না-ই বা কেন ? কাল রাতে আমরা নিজের কানে যা শুনে এসেছি তারপর কেই-বা আর স্বস্তিতে থাকতে পারে ?

সাতটার সময় আমাকে শহরে গিয়ে নিজের চোখে একবার দেখে আসতে হবে সব ঠিকঠাক ব্যবস্থা হয়েছে কি না।

আটটার সময় ঘোড়ায়-টানা গাড়িগুলো এসে হাজির হয়েছে। একটাতে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন রডারিখদম্পতি, অন্যটায় আমি আর মার্ক। দুটো গাড়ি দুটো আলাদা রাস্তা দিয়ে শহরের বাইরে যাবে—যাতে পর-পর দুটো গাড়ি দেখে কারু মনে কোনো সন্দেহ উঁকি না-মারে।

আর ঠিক তখনই এমন-একটা ঘটনা ঘটেছে, যেটা ছিলো কল্পনাতীত—নাটুকে ঘটনাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভীষণ, ভয়াবহ !

গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে তৈরি, একটা প্রধান ফটকে, অন্যটা বাগানের দিকে, খিড়কির পাশে। ডাক্তার রডারিখ মার্ককে নিয়ে মাইরার ঘরে গেছেন, তাকে ধরাধরি ক'রে নিচে নামিয়ে আনবেন ব'লে।

আতঙ্কে হতচকিত, স্তম্ভিত হ'য়ে, তাঁরা দাঁড়িয়ে পড়েছেন চৌকাঠে।

বিছানা শূন্য !

মাইরা যেন হাওয়ায় উবে গিয়েছে !!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মাইরা উধাও হ'য়ে গিয়েছে !

আতঙ্কিত চীৎকারে সারা বাড়িটা যখন কেঁপে উঠেছে, গোড়ায় কেউই বুঝতে পারেনি কী হয়েছে...উধাও ? তার তো কোনোই মানে হয় না ! শুধু অপ্রত্যাশিতই নয়, অবিশ্বাস্য !

মাইরা তার রোগশয্যায় যে-ঘরটায় শুয়েছিলা, আধঘণ্টা আগেও মার্ক আর মাদাম রডারিখ সে-ঘরে ছিলেন। ততক্ষণে তাকে পথের জন্যে পোশাক পরানো হ'য়ে গিয়েছিলো, শান্তই ছিলো সে, নতুন-কোনো অস্থিরতা তার ঘুমের মধ্যটা ছিঁড়ে দিচ্ছে ব'লে মনে হয়নি। তার একটু আগেই মার্ক তাকে পথ্য খাইয়েছে, তারপর নিজে গেছে খাবারটেবিলে। আর খাওয়া শেষ হ'তেই ডাক্তার রডারিখকে নিয়ে সে মাইরার ঘরে ফিরে গেছে—তাকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে আসবে ব'লে, কোচগাড়ির কাছে। আর ঠিক তখনই এই জবরদস্ত নাটুকে আঘাতটা পড়েছে, আচমকা ! তারা তাকে তার ঘরে, তার বিছানায় দেখতে পায়নি। ঘরটা প'ড়ে আছে ফাঁকা, পরিত্যক্ত, জনমানবহীন !

'মাইরা!' আর্ত ডুকরে উঠেই মার্ক ছুটে চ'লে গিয়েছে জানলায়, গিয়ে ছিটকিনিটা খোলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ছিটকিনি খুলতে সে পারেনি সে, জং-ধ'রে যেন সেটা শক্তভাবে এঁটে আছে ! কেউ যদি মাইরাকে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়ে থাকে, গুম ক'রে থাকে, তবে তাকে এই জানলা খুলে কেউ নিয়ে যায়নি।

মাদাম রডারিখ ছুটে এসেছেন আলুথালু, তার পেছন-পেছন কাপ্তেন হারালান। তাঁর সারা বাড়িটা টুঁড়ে বেরিয়েছেন, চীৎকার ক'রে ডেকেছেন, 'মাইরা !... মাইরা !'

সে-যে কোনো উত্তর দেয়নি, সেটা তো সহজেই বোঝা যায়, কেউই তার কোনো সাড়া পাবে ব'লেও আশা করেনি। কিন্তু এই-যে ঘর থেকে সে উধাও হ'য়ে গেছে, এর যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা কী হবে ? তার পক্ষে কি সম্ভব ছিলো যে সে বিছানা ছেড়ে উঠবে, তারপর পাশে, মায়ের ঘরের মধ্য দিয়ে গিয়ে, সিঁড়ির পইঠা দিয়ে নিচে নেমে যাবে ? —অথচ কেউই তাকে দেখতে পায়নি !

আমি তখন কোচগাড়িগুলোয় মালপত্র ঠিকমতো গুছিয়ে রাখার কাজটা তদারক করছিলুম—এমন সময় এই চীৎকার ও শোরগোল শুনে আমি আঁৎকে উঠেছি। ছুটে আমি উঠে গিয়েছি দোতলায়।

ডাক্তার রডারিখ আর মার্ক ক্রমাগত চেঁচিয়ে তার নাম ধ'রে ডেকেই চলেছে আর খ্যাপার মতো এ-ঘরে ও-ঘরে ছুটোছুটি করছে।

'*মাইরা !*' আমি জিগেস করেছি, 'এ তুই কী বলছিস, মার্ক ?'

ডাক্তারের যেন কথা বলবার শক্তিটুকুও আর ছিলো না। তিনি শুধু ভাঙা গলায় বলেছেন, 'আমার মেয়ে—*উধাও* হ'য়ে গেছে !'

মাদাম রডারিখ ততক্ষণে সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন, তাঁকে ধরাধরি ক'রে তাঁর বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয়া হয়েছে। কাপ্তেন হারালানের মুখটা বিকৃত হ'য়ে আছে, কোটর থেকে এই-বুঝি চোখদুটি ফুটে বেরুবে, সে শুধু আমার কাছে এসে বলেছে : '*সে... আবারও সে!*'

কিন্তু আমি শুধু কোনোরকমে ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করেছি। কাপ্তেন হারালানের শঙ্কার পেছনে যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু স্টেরিৎসই এসে যে কাজটা করেছে, এ-কথা মানা যাবে কী ক'রে? আমরা যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছি, সবাই যে-রকম হুঁশিয়ার ছিলুম, তাতে এটা মানা শক্ত যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস এসে এ-বাড়িতে ঢুকতে পেরেছিলো। তর্কের খাতিরে না-হয় মেনেই নেয়া গেলো যে যাত্রার প্রস্তুতির জন্যে যখন বাড়িটায় হুড়োহুড়ি চলেছে, তখন সে একফাঁকে সকলের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে—কিন্তু তা করতে হ'লে তাকে তো সর্বক্ষণ নজর রাখতে হয়েছে বাড়িটার ওপর, তক্কে-তক্কে থাকতে হয়েছে, কখন একটা মওকা মেলে, আর তখন নিশ্চয়ই অবিশ্বাস্য তাড়াহুড়োয় পুরো কাজটা হাঁসিল করতে হয়েছে! অথচ এই সন্দেহটাকে সত্য ব'লে মেনে নিলেও, কাউকে এসে সে গুম ক'রে ফেলেছে, এটা অবিশ্বাস্য। গ্যালারির কাছের দরজাটা ছেড়ে একমুহূর্তের জন্যেও আমি কোথাও যাইনি—কোচগাড়িটা দাঁড়িয়েছিলো সেখানেই, মাইরা সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বাগানে যাবে—অথচ আমি তাকে দেখতে পাবো না, এটা কী ক'রে হয়। না-হয় মেনেই নিলুম যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস অদৃশ্য হ'য়ে যাবার ক্ষমতা ধরে, কিন্তু *সে, মাইরা?...*

আমি নিচে গ্যালারিতে গিয়ে কাজের লোককে ডাক দিলুম। বুলভার তেকেলির দিকে দরজাটা তালা বন্ধ, তার চাবি আমি নিজের কাছেই রেখেছি। তারপর পুরো বাড়িটা, চিলেকোঠা, মাটির তলার ভাঁড়ারঘর, মিনার আর তার অলিন্দ—সবকিছু আমি তন্নতন্ন ক'রে হাৎড়ে দেখেছি, একটা কোণাও বাকি রাখিনি। তারপর বাগান...

কাউকেই দেখতে পাইনি আমি।

আমি মার্কের কাছে ফিরে গেলুম। সে তখন খোলাখুলি, প্রায় হাউ-হাউ ক'রেই, কাঁদছে। তাকে এখন আমি কোন সান্ত্বনা দিই?

আমার মনে হচ্ছিলো, প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে মঁসিয় স্টেপার্ককে গিয়ে সবকিছু জানিয়ে আসা। 'আমি টাউনহলে যাচ্ছি। তুমিও আমার সঙ্গে চলো।' আমি বলেছি কাপ্তেন হারালানকে।

কোচগাড়িগুলো তখনও দাঁড়িয়েছিলো। গাড়িতে ক'রেই চটপট গিয়ে টাউনহলে পৌঁছেছি আমরা।

মঁসিয় স্টেপার্ক তাঁর খাশকামরাতেই কতগুলো নথিপত্র খুলে কী-সব দেখছিলেন। আমি তাঁকে সব খুলে বলেছি। সাধারণত মঁসিয় স্টেপার্ককে কখনও খুব-একটা ভড়কে যেতে দেখিনি আমি, কিন্তু এবারে তিনিও তার বিস্ময় চাপতে পারেননি।

স্তম্ভিতভাবে ব'লে উঠেছেন, 'মাদমোয়াজেল রডারিখ উধাও!'

'হ্যাঁ,' আমি তাঁকে জানিয়েছি। 'শুনে অবিশ্বাস্য ঠেকতে পারে, মনে হ'তে পারে অসম্ভব। তবে সে আপন খেয়ালে কোথাও চ'লে গিয়েছে কি না, অথবা তাকে কেউ গুম করেছে কি না জানি না—তবে মোদ্দা কথা হ'লো সে আর ও-বাড়িতে নেই।'

'তার মানে সেই দুর্বৃত্ত স্টোরিৎসই এর পেছনে আছে!' অস্ফুট স্বরে বলেছেন মঁসিয় স্টেপার্ক। কাপ্তেন হারালানের সঙ্গে তিনিও একমত যে স্টোরিৎসই এই দুষ্কর্মের হোতা। একটু চুপ ক'র থেকে তিনি বলেছেন, 'এই সেই ভীষণ চক্রান্ত যার কথা সেদিন বলছিলো হেরমানকে!'

মঁসিয় স্টেপার্ক মোটেই ভুল বলেননি। হ্যাঁ, সত্যি-তো, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস তো সেদিনই বলেছিলো যে সে এমন-একটা কাজ করতে চলেছে যাতে সবাই একেবারে কেঁপে উঠবে। আর আমরা সবাই এমনই হাঁদা যে আমরা আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টাই করিনি।

মঁসিয় স্টেপার্ক ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। 'আপনারাও আমার সঙ্গে যাবেন তো?'

'এক্ষুনি,' আমরা সমস্বরে সাড়া দিয়েছি।

'শুধু একমিনিট সবুর করুন। আমাকে কতগুলো নির্দেশ দিয়ে যেতে হবে।'

একজন সার্জেন্টকে ডেকে তারপর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন : একদল সেপাইকে নিয়ে গিয়ে রডারিখ-ভবনের চারপাশে সারাক্ষণ কড়া পাহারা রাখতে। তারপরে নিচুগলায় তাঁর সহকারীর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে কী-সব শলাপরামর্শ করেছেন। তারপর আমরা তিনজনে ঐ কোচগাড়িটায় ক'রেই ডাক্তারের বাড়ি ফিরে গিয়েছি।

দ্বিতীয়বার বাড়িটাকে লণ্ডভণ্ড ক'রে সবকিছু তন্নতন্ন ক'রে খোঁজা হয়েছে, কিন্তু তাতে কোনো লাভই হয়নি। তবে মাইরার ঘরে ঢুকতে গিয়ে মঁসিয় স্টেপার্ক হঠাৎ ব'লে উঠেছেন, 'মঁসিয় ভিদাল, আপনি একটা অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছেন না কি ঘরটায়? এর আগেও এ-গন্ধটা কোথাও যেন নাকে এসেছে।'

আর, সত্যি, মৃদু একটা ঝাপসা গন্ধ ঝিম ধ'রে আছে হাওয়ায়, আর এবারে আচমকা আমার মনে প'ড়ে গেছে। 'হ্যাঁ, মঁসিয় স্টেপার্ক। মনে আছে, স্টোরিৎসের ল্যাবরেটরিতে নীল শিশিটা যখন প'ড়ে গিয়ে ভেঙে গিয়েছিলো, তখন ঠিক এমনি-একটা গন্ধ বেরিয়েছিলো!'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন, মঁসিয় ভিদাল, এটা ঠিক সেই গন্ধ। আর তা থেকে কতগুলো অনুমান করা যায়। যদি এই তরল পদার্থ লোককে অদৃশ্য ক'রে দিতে পারে, তাহ'লে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস সম্ভবত মাদমোয়াজেল রডারিখকে বাধ্য করেছিলো তা পান করতে, তারপর তাকে নিজের মতোই অদৃশ্য ক'রে ফেলে কাঁধে ক'রে নিয়ে গেছে।'

শুনে, আমরা যেন বজ্রাহত হ'য়ে গেছি! হ্যাঁ, তা-ই তো, নিশ্চয়ই এ-রকমই কিছু-একটা ঘটেছে। এখন আমার মনে আর-কোনো সন্দেহই নেই : আমরা যখন তার বাড়িতে

তল্লাশি চালাচ্ছিলুম, তখন ভিলহেল্ম স্টোরিৎস স্বয়ং ল্যাবরেটরি ঘরে অদৃশ্য অবস্থায় ছিলো, আর সে-ই ইচ্ছে ক'রে তখন শিশিটা ঠেলে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে ভেঙে ফেলেছিলো, আর আমাদের হাতে না-প'ড়ে সেই তরল রাসায়নিক পদার্থ তক্ষুনি হাওয়ায় উবে গিয়েছিলো। হ্যাঁ, এটা সেই বিদঘুটে গন্ধটাই! তারই রেশ আমরা পাচ্ছি এ-ঘরে! হ্যাঁ, যাত্রার প্রস্তুতির জন্যে আমরা যখন বারে-বারে দরজা খুলে যাওয়া-আসা করেছি, সে তখন একফাঁকে চুপিসাড়ে এ-ঘরে ঢুকে প'ড়ে মাইরা রডারিখকে গুম ক'রে নিয়ে গেছে।

কী-একখানা রাত্তিরই যে কেটেছে! আমি সারাক্ষণ ব'সে থেকেছি মার্কের পাশে, ডাক্তার রডারিখ থম মেরে ব'সে থেকেছেন মাদাম রড়ারিখের পাশে! কী-যে অধীরভাবে আমরা অপেক্ষা করেছি কখন দিন ফোটে, আলো হয়!

আলো হয়?... কিন্তু দিনের আলোই বা আমাদের কোন কাজে আসবে?... ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের কাছে কি দিনরাত্রির কোনো ফারাক আছে? সে কি জানে না যে তাকে সারাক্ষণ ঘিরে আছে ঘনতামসী, অবতামসী, আঁধার-নিশা?

ভোর না-হওয়া পর্যন্ত মঁসিয় স্টেপার্ক আমাদের সঙ্গেই থেকেছেন, রাজভবনে খবর দিতে পর্যন্ত যাননি। যাবার আগে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছেন —যা বলেছেন তার মাথামুণ্ডু কোনো মানে বুঝতে পারিনি আমি—বিশেষত বর্তমান পরিস্থিতিতে তো তার কোনো অর্থই হয় না—বলেছেন, 'শুধু একটা কথা, মঁসিয় ভিদাল। কিছুতেই হতাশ হবেন না। সব দেখে-শুনে মনে হচ্ছে আপনাদের দুঃসময়ের শেষ হ'য়ে এসেছে।'

এমনতর উৎসাহব্যঞ্জক কথা শুনে হয়তো আমার খুশি হওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু আমার মনে হ'লো এত-সব কাণ্ড দেখে মঁসিয় স্টেপার্কেরও মাথাটা খারাপ হ'য়ে যায়নি তো? এ-কথার কোনো জবাব দেবো কি, আমি বুঝি হাবার মতো ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থেকেছি তাঁর মুখের দিকে। আমি ভুল শুনিনি তো কথাগুলো? এমনিতেই আমার তখন বিমূঢ় দশা, সব শক্তি সব উৎসাহ কেউ যেন নিংড়ে বার ক'রে নিয়ে গিয়েছে আমার মধ্য থেকে।

আটটা নাগাদ খোদ রাজ্যপাল এসে হাজির সান্ত্বনা আর আশ্বাস দিতে। ডাক্তার রডারিখকে তিনি জানিয়েছেন মাইরাকে উদ্ধার করবার জন্যে চেষ্টার কোনোই ত্রুটি হবে না। আমি ডাক্তার রডারিখের মতোই শুধু তেতো-একটু শুকনো হেসে তাঁর আশ্বাস শুনেছি। রাজ্যপাল, বেচারা, তিনিই বা এ-অবস্থায় কী করতে পারেন?

কিন্তু ভোরবেলাতেই দাবানলের মতো মাইরার গুম হবার কথা গোটা রাগৎস্-এ ছড়িয়ে পড়েছে—আর তার যা প্রতিক্রিয়া হয়েছে, সেটা বর্ণনা করার ভাষা বা অভিব্যক্তি —কিছুই আমার নেই।

নটার আগেই লিউটেনান্ট আর্মগাড় এসে বন্ধুকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে-বেচারাই বা কী আর বলবে? তবে কাপ্তেন হারালান কিন্তু বন্ধুকে দেখেই যেন দেহে

প্রাণ ফিরে পেয়েছে। কোমরবন্ধে তলোয়ার ঝুলিয়ে তাকে শুধু একটা কথাই বলেছে: 'এসো।'

সামরিক বাহিনীর এই দুই অফিসার যখন দরজার কাছে গেছে, হঠাৎ আমার মধ্যে অপ্রতিরোধ্য একটি বাসনা জেগেছে তাদের অনুসরণ করার। মার্ককেও তখন আমি ডেকেছি আমাদের সঙ্গে চ'লে আসতে। কিন্তু তার কানে পৌঁছেছিলো কি ডাকটা ? জানি না। জবাবে টু শব্দটিও করেনি সে।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি অফিসার দুজন হনহন ক'রে নদীর তীর ধ'রে হেঁটে চলেছে। পথচারীদের কেউ-কেউ থমকে থেমে রডারিখ-ভবনের দিকে তাকাচ্ছে, তাদের মুখ-চোখে সমবেদনা আর আতঙ্কের একটা মিশ্র ছাপ।

আমি যখন গিয়ে অফিসার দুজনের নাগাল ধরেছি, কাপ্তেন হারালান একবারও আমার দিকে ফিরেও তাকায়নি। আমি যে সঙ্গে-সঙ্গে আসছি, এটা যদি কেউ তাকে তখন বলতো, তবে সে তা বুঝতে পারতো কি না সে-বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। শুধু লিউটেনান্ট আর্মগাড় আমায় জিগেস করেছে, 'আপনিও কি আমাদের সঙ্গে আসছেন ?'

'হ্যাঁ। তবে আপনারা কোথায়...'

লিউটেনান্ট শুধু অস্পষ্ট ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়েছে। কোথায় যাচ্ছি আমরা ?... তার কি কোনো ঠিক ঠিকানা আছে ? যে-দিকে দু-চোখ যায়। এ-অবস্থায় অবশ্য তার চেয়ে ভালো পরিকল্পনা আর কী-ই বা হ'তে পারতো ?

আমরা নীরবে কয়েক পা এগিয়ে যাবার পর, হঠাৎ দুম ক'রে থেমে পড়েছে কাপ্তেন হারালান, কাটা-কাটাভাবে জিগেস করেছে : 'ক-টা বাজে ?

'সোয়া নটা।' তার বন্ধু তার ঘড়ি দেখে বলেছে।

তারপরে ফের আমরা চলতে শুরু করেছি—নীরবে, আর হয়তো—খানিকটা উদ্দেশ্যহীন। মাঝে-মাঝেই কাপ্তেন হারালান এমনভাবে তার পা তুলে হেঁটেছে, মনে হয়েছে কেউ যেন পেরেক ঠুকে তার পা-দুটো মাটির সঙ্গে আটকে দিতে চাচ্ছে। আর বারে-বারে জিগেস করেছে : 'কটা বাজে ?' 'নটা পঁচিশ... সাড়ে নটা... দশটা বাজতে কুড়ি,' বলেছে তার বন্ধু, আর অমনি কাপ্তেন হারালান আবার বিমূঢ় পদক্ষেপে পথ হেঁটেছে। বাঁ-দিকে মোড় ঘুরে আমরা পেরিয়ে এসেছি ক্যাথিড্রালের সামনের চত্বরটা।

মনে হচ্ছে ম'রে গেছে যেন সবাই, রাগ্‌ৎস-এর এই বড়োলোক পাড়ায়, এই অভিজাতপল্লিতে কেউই যেন নেই আর। ক্বচিৎ চোখে পড়ছে দু-একজন পথচারী, বেশির ভাগ দরজা-জানলাই বন্ধ, যেন কোনো সমবেত শোকের দিন।

রাস্তার শেষপ্রান্তে এসে দেখা গেলো লম্বা একটা মরা সাপের মতো প'ড়ে আছে বুলভার তেকেলি। রাস্তাটা ফাঁকা, পরিত্যক্ত, প'ড়ে আছে। সেই অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে সহজে কেউ এই রাস্তায় আর আসে না।

কোন্‌দিকে যাবে এবার কাপ্তেন হারালান? ওপরে, দুর্গের দিকে? না, নিচে, নদীর দিকে? আবারও সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে পথের ওপর, যেন বুঝতে পারছে না কী করবে। আবারও সেই একই প্রশ্ন অস্ফুট বেরিয়ে এসেছে তার মুখ থেকে: 'কটা বাজে, আর্মগাড়?'

'দশটা বাজতে দশ,' উত্তর দিয়েছে লিউটেনান্ট।

'অবশেষে সময় হয়েছে,' ঘোষণাই যেন করেছে হারালান। এবার সে হনহন ক'রে হেঁটে গেছে বুলভার দিয়ে।

ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের বাড়ি ঘিরে যে-বেড়া ছিলো, তার পাশ দিয়ে আমরা হেঁটে গেছি, হারালান কিন্তু হানাবাড়ির ভগ্নস্তূপের দিকে একবারও ফিরেও তাকায়নি। গতি না-কমিয়েই সে আস্ত বাড়িটাকে ঘিরে হেঁটেছে, পেছনের গলিটায় এসে না-পৌঁছুনো অব্দি একবারও থামেনি। সেখান থেকে সাত ফিট উঁচু একটা ভাঙা-পোড়া দেয়াল দিয়ে ধ্বংসস্তূপটা ঘেরা।

'আমাকে একটু তুলে ধরো তো,' সে ইঙ্গিত করেছে, দেয়ালের ওপরটা দেখিয়ে।

ঐ কথা কটিই মুহূর্তে সব হেঁয়ালির সমাধান ক'রে দিয়েছে। মাইরার দুর্ভাগা সহোদর কী করতে চাচ্ছে, চট ক'রেই তখন তা যেন আমি বুঝে গিয়েছি।

বেলা দশটা—দু-দিন আগে আমরা আড়াল থেকে যে-কথাবার্তা শুনেছিলুম, তাতে বেলা দশটাই কি বলেনি ভিলহেল্ম স্টোরিৎস? আর সে-কথা কি আমিই খুলে বলিনি কাপ্তেন হারালানকে? হ্যাঁ, এখুনি ঐ পিশাচ এখানে আসবে, দেয়ালের আড়ালে, যে গুপ্তস্থানে সে লুকিয়ে রেখেছে তার ঐ *অজ্ঞাত* রাসায়নিক তরল, সেখানে গিয়ে ঢুকবে! সে যখন তার দুরভিসন্ধি কাজে খাটাতে ব্যস্ত থাকবে, তখন অপ্রস্তুত তার ওপর আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবো কি?

পরস্পরকে সাহায্য ক'রে ক-মিনিটের মধ্যেই আমরা টপকেছি দেয়ালটা। আমরা গিয়ে নেমেছি ছোট্ট একচিলতে পায়েচলার পথে, তার দু-পাশে ঘন ঝোপঝাড়। এখানে লুকিয়ে থাকলে স্টোরিৎস তো দূরের কথা, খোদ বীলজেবাবেরও হয়তো সাধ্য হবে না যে আমাদের দেখতে পায়।

'এখানে লুকিয়ে পড়ুন,' আস্তে দৃঢ় স্বরে আমাদের বলেছে কাপ্তেন হারালান। বাগানের দেয়ালের গা ঘেঁসে বাড়ির দিকে যেতে-যেতে চট ক'রেই সে আমাদের চোখের আড়ালে চ'লে গেছে।

আমরা প্রায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকেছি একঝলক। তারপর, অপ্রতিরোধ্য কৌতূহলের তাড়ায়, আমরা এগিয়ে গেছি পায়ে-পায়ে—ঝোপের মধ্য দিয়ে, নুয়ে, ঝুঁকে, সন্তর্পণে, চুপিসাড়ে, শেষটায় আমরাও বাড়িটার কাছে চ'লে গেছি। গাছপালার ঝাড় যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকেই আমাদের চোখে পড়েছে হানাবাড়ির ধ্বংসস্তূপ। মাঝে শুধু খোলা জমি আছে বিশ গজ, তারপরেই সেই বাড়ি।

গুঁড়ি মেরে ব'সে, রুদ্ধনিশ্বাসে, আমরা অপলকে, ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে থেকেছি

বাড়িটার দিকে।

বাড়িটা তো নয়, যা আছে তা শুধু তার চার দেয়ালই, আগুনে-পোড়া, কালো। নিচে প'ড়ে আছে ইটপাথর, পোড়া কাঠের টুকরো, দুমড়ে-মুচড়ে বেঁকে-যাওয়া লোহার শিক, ঢিবির মতো ছাইভস্ম, আর আশবাবপত্রের ঝলসানো টুকরো-টাকরা।

অপলকেই আমরা তাকিয়ে থেকেছি সেই ধ্বংসস্তূপের দিকে। ঈশ! বাড়িটার সাথে-সাথে তারা যদি ঐ অভিশপ্ত আলেমানটিকেও জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে পারতো! যদি তার সঙ্গে-সঙ্গেই ধ্বংস হ'য়ে যেতো তার ঐ ভয়াবহ আবিষ্কার?

লিউটেনান্ট আর আমি ব্যগ্র চোখ বুলিয়ে গেছি ঐ খোলা জমির ওপর—আর তার পরেই ভীষণ চমকে গেছি! তিরিশ পাও দূরে হবে না, কাপ্তেন হারালান আমাদেরই মতো গুঁড়ি মেরে আছে একটা ঝোপের পাশে, যেখানটায় গিয়ে সে থেমেছে, তারপরেই ঝোপের সারি বেঁকে গিয়েছে বাড়ির কোণায়, বাড়ির সঙ্গে ঝোপটার ব্যবধান ছ-গজও হবে কি না সন্দেহ। সেই কোণাটার দিকেই অনিমেষলোচনে তাকিয়ে আছে কাপ্তেন হারালান। একটুও নড়ছে না সে। গুঁড়ি মেরে আছে সে, উদ্যত, পেশীগুলো টানটান, যেন কোনো হিংস্র বুনো জানোয়ার—লাফ মারবার ঠিক আগের মুহূর্তটায়।

সে যেদিকটায় তাকিয়েছিলো, আমরাও এবার সেদিকটাতেই তাকিয়েছি। কিছু-একটা আশ্চর্য নিশ্চয়ই ঘটছে সেদিকটায়। আমরা যদিও কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না, তবু বুঝতে পারছি ঐ ধ্বংসস্তূপের ইটকাঠপাথর দুর্বোধ্য কোনো প্রহেলিকার মতোই ন'ড়ে যাচ্ছে! আস্তে, সন্তর্পণে, হুঁশিয়ার হাতে কেউ যেন সেই ইটকাঠপাথর সরাচ্ছে!

আমাদের ঘাড়ে হাত চেপে রেখেছে যেন কোনো পৈশাচিক রহস্য, আমাদের চোখগুলো বুঝি ঠিকরেই বেরিয়ে আসতে চেয়েছে কোটর থেকে। সত্যটা যেন ধাঁধিয়েই দিয়েছে আমাদের চোখ। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস আছে ওখানে। মজুরদের যদি নাও দেখা যায় চোখে, তাদের কাজকর্ম কিন্তু স্পষ্টই চোখে প'ড়ে যায়, হোক না তারা অদৃশ্য।

হঠাৎ যেন খ্যাপার মতো হুংকার দিয়ে উঠলো কেউ... কাপ্তেন হারালান একলাফে ডিঙিয়ে গেছে ফাঁকা জমিটা, যেন কোনো অদৃশ্য বাধার ওপরই লাফিয়ে পড়েছে।... যেন ঢুঁ মারতে চাচ্ছে সে, এগিয়ে যেতে চাচ্ছে, ঠেলা খেয়ে পেছিয়ে আসছে, দুই হাত খুলে কোন্ অদৃশ্যকে যেন সে জড়িয়ে ধরেছে প্রাণপণে, যেন কোনো মল্লযুদ্ধ চলেছে, অদৃশ্যের সঙ্গে কোনো পাঞ্জা,...

'এসো! হাত লাগাও!' চেঁচিয়ে উঠেছে সে, 'বাগে পেয়েছি এবার শয়তানটাকে?

লিউটেনান্ট আর আমার বুঝি একমুহূর্তও লাগেনি ঐ ধস্তাধস্তির কাছে গিয়ে পৌঁছুতে।

'বাগে পেয়েছি বাছাধনকে!' আবারও বলেছে সে, 'হাত লাগান, ভিদাল! আর্মগাড়!'

হঠাৎ আমার মনে হ'লো কার যেন অদৃশ্য হাত প্রচণ্ড জোরে আমায় ধাক্কা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে ফেলতে চাচ্ছে, আমার চোখে-মুখে এসে পড়ছে কার ফোঁস-ফোঁস নিশ্বাস।

হ্যাঁ, এ একেবারে একটা হাতাহাতি লড়াই, ফ্রি-স্টাইল কুস্তি, যেন কোনো নিয়মকানুন না-মানা এক মল্লযুদ্ধ ! এই-তো সে, ঐ ভয়ংকর, *ঐ অদৃশ্য মানুষ*, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস, অথবা অন্যকোনো পিশাচ ! সে যে-ই হোক না কেন, এবার আমরা তাকে কাবু ক'রে ফেলেছি, এবং আমাদের কবল থেকে তার আর উদ্ধার নেই, এবার তাকে বলতেই হবে মাইরাকে নিয়ে সে কী করেছে। আমরা জানি কী ক'রে কাউকে দিয়ে কথা বলাতে হয় !

অর্থাৎ মঁসিয় স্টেপার্ক যা বলেছিলেন, তা-ই ঠিক, সে তার দৃশ্যমানতাকে ধ্বংস করতে পারে বটে, কিন্তু *অশরীরী* হ'য়ে যেতে পারে না। এ-তো আর কোনো ভূতপ্রেত নয়, রক্তমাংসের কোনো শরীর, যেটা এখন প্রাণপণে যুঝছে, ধস্তাধস্তি করছে !

আর অবশেষে আমরা তাকে জব্দ করতে পেরেছি! তার একটা হাত চেপে ধ'রে রেখেছি আমি, আর অন্যহাতটা পাকড়েছে লিউটেনান্ট আর্মগাড়।

'মাইরা কোথায় ? বল, মাইরাকে তুই কী করেছিস ?' যেন জ্বরের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠেছে, এমনভাবে জিগেস করেছে কাপ্তেন হারালান।

কোনো সাড়া নেই। দুর্বৃত্তটি এখনও হাল ছাড়েনি, এখনও সে তার হাতদুটো হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে সটকে পড়তে চাচ্ছে। এই দুর্বৃত্তটি আবার অসীম বলশালীও বটে—আমরা তিনজনে মিলেও যেন তাকে সামলাতে পারছি না। একবার যদি সে আমাদের হাত এড়িয়ে পালাতে পারে, তবে আর তাকে কখনও পাকড়ানো যাবে কি না সন্দেহ।

'মাইরা কোথায় ? বলবি কি না বল !' কাপ্তেন হারালান তখন বুঝি কাণ্ডকাণ্ড জ্ঞানই হারিয়ে ফেলেছে।

'বলবো না ! ককখনো না !'

এই হাঁফাতে-থাকা রূঢ় কর্কশ গলা শুনে আর-কোনো সন্দেহই থাকেনি : এ খোদ ভিলহেল্ম স্টোরিৎস, তার কোনো সাগরেদ নয়!

কিন্তু তিনের সঙ্গে এক আর কতক্ষণ যুঝবে! সে-তো আর চিরকাল এই ধস্তাধস্তি চালিয়ে যেতে পারবে না।

হঠাৎ এক ধাক্কায় ছিটকে পড়েছে লিউটেনান্ট আর্মগাড়; তারপরেই আমার মনে হয়েছে আমার ঠ্যাঙের মধ্যে কেউ যেন আচমকা ল্যাং কষিয়েছে ! আমি *টাল* সামলাতে না-পেরে ছিটকে প'ড়ে গেছি, হাতটা ছেড়ে দিতে হয়েছে আমায়। তারপরেই কেউ যেন সজোরে বিরাশি সিক্কার একটা থাপ্পড় কষিয়েছে কাপ্তেন হারালানের মুখে! সে টলতে-টলতে যেন শূন্যকে আঁকড়েই *টাল* সামলাতে চেয়েছে।

'পালালো ! পালালো !' এ-তো চীৎকার নয়, যেন কোনো হিংস্র জানোয়ারের ক্রুদ্ধ গর্জন।

না, সন্দেহ নেই আর, প্রভুর সাহায্যে কোত্থেকে আচমকা যেন হেরমান এসে উদয় হয়েছে।

আমি কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়েছি, যদিও মাথা তখনও ঘুরছে, জোর চোট

লেগেছিলো! লিউটেনান্ট আর্মগাড় চিৎপাত প'ড়ে আছে ভুঁয়ে, প্রায় সংজ্ঞাহীন—আর আমি ছুটে গেছি তাকে সাহায্য করতে, ভেবেছি তার ওপর হয়তো স্টোরিৎসই চেপে ব'সে আছে। কিন্তু মিথ্যেই আশা করেছি। আমরা যা আঁকড়ে ধরতে পেরেছি তা শুধুই শূন্যতা, একমুঠো খোলাহাওয়া।

ভিলহেল্ম স্টোরিৎস আবারও আমাদের কবল থেকে পালিয়ে গিয়েছে।

তারপরেই হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে জনাকতক সেপাই, অন্যরা টপকে আসছে দেয়াল, কেউ-কেউ যেন বেরিয়ে আসছে ঐ ধ্বংসস্তূপ ফুঁড়েই, পাতাল থেকেই যেন। চারপাশ থেকে দলে-দলে কাতারে-কাতারে আসছে সেপাইরা। শয়ে-শয়ে। কারু পরনে সেপাইয়ের পোশাক, কয়েকজনের গায়ে পদাতিক বাহিনীর উর্দি। মুহূর্তের মধ্যে তারা আমাদের ঘিরে চারপাশে গণ্ডি তৈরি ক'রে ফেলেছে, তারপর বৃত্তটা ক্রমেই সংকুচিত হ'য়ে আসছে, ছোটো, আরো-ছোটো...

আর শুধু তখনই আমি ধরতে পেরেছি মঁসিয় স্টোপার্কের ঐ আশাব্যঞ্জক বাণীর অর্থ। স্টোরিৎস সেদিন নিজের অজান্তেই আমাদের কাছে ফাঁস ক'রে দিয়েছিলো তার দুরভিসন্ধি। তালেগোলে আমি খেয়াল না-করলেও, মঁসিয় স্টেপার্ক কিন্তু মোটেই ভোলেননি স্টোরিৎস কী মৎলব এঁটেছে, আর সেই অনুযায়ীই তিনি ব্যবস্থা করেছেন, *এমনই নিখুঁতভাবে* যে দেখে আমার সত্যি তাক লেগে গিয়েছে। কেননা এই কয়েকশো লোকের একজনকেও কিন্তু আমরা দেয়াল টপকে ভেতরে ঢোকবার সময় দেখতে পাইনি।

বৃত্ত ক্রমেই ছোটো হ'য়ে এসেছে, যেন কেন্দ্রে পৌঁছেছে। এইবারে ফাঁদে পড়েছে স্টোরিৎস আর তার চেলা। আর তাদের রেহাই নেই!

আর এই মোটা কথাটাই যেন ততক্ষণে তার নিজের মাথাতেও গিয়ে ঢুকেছে। কারণ হঠাৎ আমাদের কানের পাশেই কেউ যেন রুদ্ধ আক্রোশে গরর্‌র্‌ ক'রে উঠেছে। তারপর যেই মনে হয়েছে লিউটেনান্ট আর্মগাড় তার জ্ঞান ফিরে পেতে চলেছে, উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, কেউ যেন হ্যাঁচকা একটা টান মেরে তার কোষ থেকে খুলে নিয়েছে তলোয়ারটা, একটা অদৃশ্য হাত সেটা নেড়ে যেন ভয় দেখাতে চাচ্ছে, হাওয়ায় বনবন ক'রে ঘোরাচ্ছে!

এই হাত আর-কারু নয়, নিশ্চয়ই ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের, এভাবেই জনকতককে ঘায়েল ক'রে এবার সে তার গায়ের ঝাল মেটাবে! পালাতেই যখন পারবে না, তখন সে তার শেষ মোক্ষম ঘাটা মেরে যাবে, কাপ্তেন হারালানকেই নিকেশ ক'রে দেবে!...

শত্রুর দৃষ্টান্ত দেখে কাপ্তেন হারালানও কোষ থেকে তখন বার ক'রে এনেছে তার তলোয়ার। যেন কোনো দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে, এমনিভাবে তলোয়ার হাতে তারা দাঁড়িয়েছে পরস্পরের মুখোমুখি—একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অন্যজনকে কেউই দেখতে পাচ্ছে না!... তলোয়ারে-তলোয়ারে ঠোকাঠুকি লড়াই হচ্ছে, ফুলকি উড়ছে, ঝনঝনঝন আওয়াজ হচ্ছে... আর এত দ্রুত শুরু হয়েছে এই দৃশ্য-অদৃশ্যের দ্বন্দ্বযুদ্ধ যে আমরা তাতে কোনো বাধাই দিতে পারিনি। আর এটাও বোঝা

যাচ্ছে যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস অসিযুদ্ধেও দারুণ নিপুণ। সে জানে তলোয়ার কী ক'রে চালাতে হয়। আর কাপ্তেন হারালান? সে খ্যাপার মতো আক্রমণই ক'রে চলেছে, আত্মরক্ষার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করছে না। তার কাঁধে পড়েছে তলোয়ারের কোপ, ফিনকি দিয়ে বেরিয়েছে রক্ত, কিন্তু তবু ঝলসে উঠছে তার তলোয়ার—সামনে কীসের গায়ে যেন বিঁধেছে গিয়ে সেটা সজোরে! একটা আর্তনাদে তালা ধ'রে গেছে যেন আমাদের কানে, তারপরেই আমাদের সামনের জমিতে সমস্ত ঘাস যেন থেঁৎলে চেপটে গিয়েছে...

মানুষের একটা শরীর পড়েছে ঘাসের ওপর প্রচণ্ড জোরে, ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের শরীর, তার বুকে এফোঁড়-ওফোঁড় বিঁধে গিয়েছে তলোয়ারের ফলা... ফিনকি দিয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে রক্ত উঠেছে, আর রক্তের সঙ্গে-সঙ্গে তার দেহটা থেকে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে যেন, আর অমনি রক্তমাংসের শরীর ফিরে পাচ্ছে তার আকৃতি, ত্রিরায়তনিক, চাক্ষুষ, রক্তমাংসের শরীর, মরণযাতনায় থরথর!

কাপ্তেন হারালান তখন নিজেকে ছুঁড়ে ফেলেছে ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের ওপর। চীৎকার ক'রে জিগেস করেছে তাকে : 'মাইরা? মাইরা কোথায়?'

কিন্তু একটা নিষ্প্রাণ লাশ প'ড়ে আছে তখন ঘাসের ওপর, যন্ত্রণায় বিকৃত হ'য়ে গেছে মুখটা, চোখদুটো বিস্ফারিত, ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে যেন, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর দৃশ্যমান মৃত্যুযন্ত্রণায় দুমড়ে-যাওয়া শরীরটা আর-কোনোদিনই কোনো জ্যান্ত মানুষের ভষায় কথা বলবে না।

ভয়ও দেখাবে না!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এইই হ'লো ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের জীবনের শোচনীয় পরিণাম।

তবে, হায়, তার এই মৃত্যু এলো বড্ড-বেশি দেরি ক'রে। এখন যদিও তার কাছ থেকে রডারিখ পরিবারের নতুন ক'রে ভয় পাবার আর কিছু নেই, তবু তার মৃত্যু কিন্তু অবস্থাটার উন্নতি করার বদলে বরং আরো-শোচনীয় ক'রে তুলেছে, কেননা তার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই মাইরাকে ফিরে পাবার সব আশাই হারিয়ে গেছে।

এদিকে এখন এই নতুন হতাশা এসে দখল ক'রে বসেছে হারালানকে—খুশি হবার বদলে সে যেন কি-রকম হতভম্বভাবে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আছে তার এই শত্রুর দিকে। শেষটায় যেন এই অপূরণীয় সর্বনাশকে মেনে নেবার জন্যেই, একটা হালছাড়া ভঙ্গি ক'রে, হাঁটতে শুরু ক'রে দিয়েছে রডারিখ ভবনের দিকে—কী ক'রে যে এই শোচনীয় পরিণামটার কথা সে বাড়ির লোকের কাছে ভাঙবে, তা-ই যেন সে ভাবতে পারছিলো না।

আমি আর লিউটেনাণ্ট আর্মগাড় কিন্তু অকুস্থলেই থেকে গিয়েছি, আর হঠাৎ দেখতে পেয়েছি মঁসিয় স্টেপার্কও যেন কোত্থেকে হঠাৎ এসে উদয় হয়েছেন। প্রায় কয়েকশো লোক ভিড় ক'রে আছে এখানটায়, অথচ সবাই কী-রকম যেন মোহ্যমান আর বিহ্বল হ'য়ে আছে, সকলেরই বুকের ওপর চেপে ব'সে আছে অদ্ভুত-এক স্তব্ধতা, চূড়ান্ত কৌতূহলের সঙ্গে এসে মিশেছে অকথ্য-এক মর্মান্তিক যন্ত্রণা, নীরবে শুধু ঠেলাঠেলি করছে কেউ-কেউ, মুখ বাড়িয়ে দেখতে চাচ্ছে কীভাবে প'ড়ে আছে ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের অসিবিদ্ধ মৃতদেহ।

সকলেরই চোখ চুম্বকের মতো আটকে আছে লাশটার ওপর। একটু বাঁ-কাৎ হ'য়ে আছে দেহটা, রক্তে জামাকাপড় মাখামাখি, মুখটা পাণ্ডুর বিবর্ণ, তার হাতটা তখনও বদ্ধ মুঠোয় আঁকড়ে আছে লিউটেনাণ্ট আর্মগাড়ের তলোয়ারটা, বাঁ-হাত বেকায়দায় প'ড়ে কেমন কিম্ভূতভাবে মুড়ে আছে।

কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল ক'রে মৃতদেহটার দিকে তাগিয়ে থেকে শেষটায় স্তব্ধতা ভেঙে মঁসিয় স্টেপার্ক ব'লে উঠেছেন : 'এ কি তবে সত্যি *সে-ই?*'

সেপাইরা আমাদের কাছে ঘনিয়ে এসেছিলো, তাদের চোখে-মুখে এখনও একটা শঙ্কার চাপ। তারাও ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে চিনতে পেরেছে। যা দেখছেন, তাকে বিশ্বাস করবার জন্যেই যেন মঁসিয় স্টেপার্ক হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখেছেন মৃতদেহটির আপাদমস্তক।

'ম'রে গেছে। ম'রে ভূত হ'য়ে গেছে!' ব'লে, তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন।

চেঁচিয়ে তিনি তারপর একটা নির্দেশ দিয়েছেন সেপাইদের, আর তক্ষুনি জনা-বারো সেপাই ঠিক সেই জায়গাটা থেকেই আবর্জনা সরাতে শুরু করেছে, মরবার আগে ধ্বংসস্তূপের যে-জায়গাটা থেকে স্টোরিৎসই জঞ্জাল সরাতে শুরু করেছিলো।

'আমরা আড়ালে থেকে যে-কথাবার্তা শুনেছি,' মঁসিয় স্টেপার্ক যেন আমার মনের প্রশ্নটা প'ড়ে ফেলেই উত্তর দিয়েছেন, 'তাতে মনে হয় এখানেই সেই গোপন জায়গাটা খুঁজে পেয়ে যাবো। মনে আছে রাস্কেলটা কী বলেছিলো? অনেকটাই তরল রাসায়নিক সে লুকিয়ে রেখেছে এখানে, যার সাহায্যে সে একাই গোটা শহরটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে ব'লে ভেবেছিলো। যতক্ষণ-না সেই গুপ্ত জায়গাটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ এখান থেকে আমি এক পাও নড়ছি না। এখানকার সবকিছু ধ্বংস ক'রে দিয়ে তবেই আমি ছাড়বো। স্টোরিৎস মারা গেছে। বিজ্ঞান আমাকে যে-অভিশাপ দেয় দিক, আমি চাই তার সঙ্গে-সঙ্গে যেন তার সমস্ত গুপ্তরহস্যও খতম হ'য়ে যায়।'

আর তখন আমার মনে হয়েছে : মঁসিয় স্টেপার্ক সম্ভবত সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। যদিও আমার মতো যারা কোনো-না-কোনোভাবে বিজ্ঞান বা প্রকৌশলের সঙ্গে জড়িত, তাদের কাছে অটো স্টোরিৎসের এই অবিষ্কার যথার্থই কৌতূহলোদ্দীপক কিছু, তবু আমার মনে হচ্ছিলো, এর হয়তো ব্যাবহারিক কোনো প্রয়োগ আদপেই নেই—বরং এ হয়তো স্বভাবদুর্বৃত্তদের নতুন-নতুন অপকর্মেই উসকে দেবে।

শিগগিরই ধ্বংসস্তূপের তলা থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা ধাতুর পাত—একটা

ঢাকনাই সেটা, আর ঢাকনাটা তুলতেই তার তলায় দেখা গেছে সরু-একটা সিঁড়ির প্রথম পইঠাগুলো।

আর অমনি কে যেন আমার হাতটা চেপে ধরেছে, আর কাতর স্বরে কে যেন ব'লে উঠেছে : 'দয়া করুন ! দয়া !'

আমি তড়াক ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু কাউকেই চোখে পড়েনি—অথচ আমার হাতটা তখন কেউ চেপে ধ'রে আছে, আর অনুনয়টা তখনও শোনা যাচ্ছে।

সেপাইরা হাতের কাজ ফেলে অবাক হ'য়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ! আমিও যে কতটা বোম্‌কে গিয়েছি তা ব'লে বোঝাতে পারবো না। অন্য হাতটা বাড়িয়ে আমার আশপাশটা হাৎড়েছি আমি তখন। ঠিক আমার কোমর বরাবর আমার হাত যেন কার চুলের ওপর পড়েছে, আর তার একটু-নিচে—কার যেন মুখ, চোখের জলে ভেজা। স্পষ্টই কেউ-একজন যেন নতজানু হ'য়ে আছে এখানে, কান্নাকাটি অনুনয়-বিনয় করছে, অথচ তাকে আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না ! আমি কি-রকম ঘাবড়ে গিয়ে তোৎলাতে-তোৎলাতে বলেছি : 'কে তুমি?'

কে যেন বলেছে : 'হেরমান !'

'তুমি আবার কী চাও ?'

কান্নাভেজা ছোট্ট কতগুলো কথায় স্টোরিৎসের অদৃশ্য সাগরেদ তখন আমাদের বলেছে, সে মঁসিয় স্টেপার্কের সিদ্ধান্তের কথা শুনেছে—এখানে যা-ই পাওয়া যাবে, তা-ই নাকি ধ্বংস ক'রে ফেলা হবে—আর তা যদি হয় তবে সে—হেরমান—সে কী ক'রে আবার তার মানুষী আকৃতি ফিরে পাবে ? তাকে কি সারা জীবন তবে মানুষের মধ্যেই অদৃশ্য হ'য়ে থাকতে হবে—নিঃসঙ্গ, চির-একাকী ? সে অনুনয় ক'রে বলেছে, মঁসিয় স্টেপার্ক যদি কৃপা ক'রে সবগুলো শিশি ধ্বংস ক'রে ফেলার আগে অন্তত একটা শিশি থেকে একঢোঁক যদি তাকে খেতে দেন, তবে সে ব'র্তে যাবে।

স্টেপার্ক তার প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন বটে, তবে হেরমানও তো ফেরারি আসামী, আইনের চোখে সেও অপরাধী, ফলে সে যাতে আর-কোনো ঝামেলা পাকাতে না-পারে, সেইজন্যে তাঁকে যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। তাঁর হুকুমে, চারজন হেঁইয়ো-জোয়ান সেপাই এসে জাপটে ধরেছে *অদৃশ্য মানুষকে*। তারা যে তাকে ককখনো ছেড়ে দেবে না, এ-বিষয়ে শুধু-তখনই আমরা নিশ্চিত হ'তে পেরেছি।

যে-চারজন লোক অদৃশ্য বন্দীকে জাপটে ধ'রে ছিলো, তাদের আগে-আগে আমি আর মঁসিয় স্টেপার্ক নেমেছি ঐ সিঁড়ি দিয়ে, গিয়ে পৌঁছেছি মাটির তলার একটা ভাঁড়ারঘরে, মণিকোঠায়, ওপরের ঢাকনা-দরজা তোলা আছে ব'লে তা দিয়ে ক্ষীণ একটু আলো এসে ঢুকেছে ভেতরে, সেখানে, একসার সরু-সরু তাকের ওপর, পর-পর অনেকগুলো শিশি সাজানো আছে—তাদের কোনোটার গায়ে লেবেল আঁটা—'১', আবার কোনোটার গায়ে লেবেল—'২'।

হেরমান অধীর স্বরে দু-নম্বর একটা শিশি চেয়েছে, আর মঁসিয় স্টেপার্ক নিজেই

সেটা তার হাতে তুলে দিয়েছেন। তারপর অবর্ণনীয় একটি তাজ্জব ব্যাপার ঘটেছে- যদিও এমন-কিছু যে ঘটবে, সেটা আমাদের বোঝা উচিতই ছিলো—আমরা ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে দেখেছি শিশিটা যেন আপনা থেকে শূন্যে উঠে গিয়ে একটা পাক খেলো, তারপর উপুড় হ'য়ে গেলো, যেন কেউ শিশিটা থেকে ঢকঢক ক'রে কিছু পান করছে।

তারপরে ঘটলো আরো-তাজ্জব, আরো-চমকপ্রদ একটা ব্যাপার। যতই সে ঢকঢক ক'রে পানীয়টা পান করছে, ততই যেন শূন্যের মধ্যে আস্তে-আস্তে সাকার হ'য়ে উঠছে হেরমান। প্রথম দেখা গেলো আবছা-একটা আকৃতি, মণিকোঠার আবছায়ায় ঝাপসা তাকে দেখা যাচ্ছে, তারপরেই ক্রমে-ক্রমে স্পষ্ট হ'য়ে, উঠেছে তার আকৃতি, তার পরিণাহ, আর শেষটায় আমি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছি, আমি যেদিন রাগ্‌ৎস এসে পৌঁছেছিলুম, সেদিন সন্ধেবেলায় এই লোকটাই আমার পেছন নিয়েছিলো।

মঁসিয় স্টেপার্কের ইঙ্গিতে বাকি শিশিগুলো কিন্তু তক্ষুনি ভেঙে ফেলা হয়েছে, আর তাদের ভেতর যে-তরল পদার্থ ছিলো তা মেঝেয় ছড়িয়ে প'ড়ে মুহূর্তেই যেন বাষ্প হ'য়ে গিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। এর পরে ফের আমরা সদলবলে ওপরে, দিনের আলোয়, ফিরে এসেছি।

'তাহ'লে ? এবার আপনি কী করবেন ব'লে ভেবেছেন, মঁসিয় স্টেপার্ক ?' তাঁকে জিগেস করেছে লিউটেনান্ট আর্মগাড়।

উত্তর এলো, 'আমি মৃতদেহটা এক্ষুনি টাউনহলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি।'

'প্রকাশ্য দিবালোকে ? সকলের চোখের সামনে দিয়ে ?'

'হ্যাঁ, প্রকাশ্যে, সারা রাগ্‌ৎসেরই জানা উচিত যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস মারা গেছে। নিজের চোখে মৃতদেহটা না-দেখলে তারা সে-কথা বিশ্বাসই করবে না।'

'যতক্ষণ-না কবরে যাচ্ছে,' আমি মন্তব্য করেছি, 'ততক্ষণ-বা তারাই এ-কথা বিশ্বাস করে কী ক'রে ?'

'কবরে যদি যায় *আদৌ*,' বলেছেন মঁসিয় স্টেপার্ক।

'মানে ?' আমি বুঝি ভ্যাবাচাকা খেয়ে কী-রকম তাকিয়ে থেকেছি।

'হ্যাঁ,' মঁসিয় স্টেপার্ক ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন, 'আমার মতে মৃতদেহটা পুড়িয়ে হাওয়ায় ছাইগুলো উড়িয়ে দেয়াই ভালো হবে—যেমন তারা করতো মধ্যযুগে, ডাইনি মারতে গিয়ে।'

তারপর তিনি একটা স্ট্রেচার আনতে বলেছেন মৃতদেহটার জন্যে, আর তাঁর বেশির ভাগ সেপাইকে নিয়ে কয়েদি সমেত চ'লে গিয়েছেন টাউনহলের দিকে। হেরমানকে এখন খুবই সাধারণ নগণ্য লোক হিশেবে দেখাচ্ছে, যেই সে দৃশ্যমান হয়েছে অমনি যেন তার সব জারিজুরিও উধাও হ'য়ে গিয়েছে। আর আমি লিউটেনান্ট আর্মগাড়কে সঙ্গে ক'রে ফিরে গিয়েছি রডারিখ-ভবনে।

কাপ্তেন হারালান এদিকে বাড়ি ফিরে এসে বাবার কাছে সবকিছু খুলে বলেছে। মাদাম রডারিখের শরীর-মনের দশার কথা চিন্তা ক'রে তাঁকে কিছু খুলে বলা হবে না

ব'লেই ঠিক হয়েছে। ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের মৃত্যু তো আর তাঁর মেয়েকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেবে না।

মার্কও এখনও-অব্দি ব্যাপারটা জানে না। তাকে অবশ্য বলতেই হবে সব, আর সেইজন্যেই আমরা তাকে ডেকে পাঠিয়েছি ডাক্তারের পড়ার ঘরে। সে কিন্তু, সব শুনে, প্রতিশোধ নেবার উল্লাসে আদৌ ভ'রে ওঠেনি। বরং আবার ভেঙে পড়েছে কান্নায়, আর ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে নিদারুণ হতাশায় ব'লে উঠেছে : 'ভিলহেল্ম স্টোরিৎস মারা গেছে!... তুমি তাকে হত্যা করেছো!... সে ম'রে গিয়েছে, কিন্তু মারা যাবার আগে কিছুই ব'লে যায়নি!... মাইরা!... আমার মাইরা!... হায়, আমি তাকে আর-কখনও চোখেও দেখবো না!'...

শোকের এই প্রচণ্ড প্রকাশের সামনে কীই-বা সান্ত্বনা দিতে পারতুম আমি!

অথচ তবু আমি চেষ্টা করেছি। না-না, আমাদের সমস্ত আশা হারিয়ে ফেললে চলবে ন। আমরা এখনও জানি না বটে মাইরা কোথায়, তবে একজন লোক সে-খবর জানে, সে হ'লো হেরমান, ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের সাগরেদ, তাকে তো এখন আমরা পাকড়াও করেছি—সে তো এখন হাজতে আছে, তালা বন্ধ। তাকে আমরা জেরা করতে পারি, প্রশ্ন করতে পারি; আর ব্যাপারটায় যেহেতু তার প্রভুর মতো তার কোনো অতিরিক্ত আগ্রহ নেই, একটু চাপ দিলেই সে সবকথা ফাঁস ক'রে দেবে, খুলে বলবে মাইরা কোথায় আছে।... গোড়ায় যদি নাও বলতে চায়, আমরা তাকে নানাভাবে বলতে বাধ্য করতে পারি, যদি দরকার হয় সেজন্যে আমরা বিস্তর টাকাও খরচ করবো। আর তাতেও যদি না-হয় তো তাকে খুব ক'ষে ধোলাই দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। সেপাইরা সবখানেই *থার্ড ডিগ্রি* ব্যবহার করে : কারু পেট থেকে গোপন কথা বার করবার যথেষ্ট উপায় জানে তারা।... মাইরা আবার ফিরে আসবে তার আপনজনের কাছে, তার স্বামীর কাছে, আর সেবা-যত্ন-শুশ্রূষায় আবার সে পুরোপুরি সেরেও উঠবে...

কিন্তু এর একটা কথাও যদি মার্কের কানে গিয়ে থাকে! সে যেন কোনো কথা শুনবে না ব'লেই পণ ক'রে আছে। তার ধারণা, মাইরা কোথায় আছে, সেটা একজনই বলতে পারতো, এবং সে এখন আর বেঁচে নেই। তার পেট থেকে সব কথা আদায় ক'রে নেবার আগে তাকে হত্যা করা আমাদের উচিত হয়নি ।

কেমন ক'রে যে মার্ককে শান্ত করবো, তা-ই আমি বুঝে উঠতে পারছিলুম না, আর এমন সময়ে, হঠাৎ আমাদের কথার চাপান-উতোরে বাধা প'ড়ে গেলো বাইরের তুলকালাম হট্টগোলে। আমরা সবাই ছুটে চ'লে গিয়েছি কোণের জানলায়, তার পাল্লাটা বুলভারের দিকে খোলে।

এখন আবার নতুন ক'রে কী ঘটছে?... আমাদের মনের অবস্থা তখন যা ছিলো, তাতে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যদি পুনর্জীবন লাভ ক'রে এখানে এসে উদয় হ'তো তাতেও বোধহয় আমরা এতটুকু অবাক হতুম না।

কিন্তু তা নয়। সে মৃত্যু থেকে ফিরে আসেনি মোটেই। বরং তার মৃতদেহ নিয়ে

মিছিল চলেছে লাশকাটা ঘরের দিকে। একটা খাটিয়ার ওপর চাপানো হয়েছে মৃতদেহটা, তাকে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে চারজন সেপাই, পেছন-পেছন মস্ত একটা ভিড়। তাহ'লে সারা রাগৎস এক্ষুনি জেনে যাবে যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস মারা গেছে এবং তার বিরচিত আতঙ্কেরও তার রাজত্বের সাথে-সাথেই অবসান হয়েছে।

মঁসিয় স্টেপার্ক শহরের প্রত্যেকটা রাস্তায়, প্রত্যেকটা মোড়ে মৃতদেহটা ঘুরিয়ে দেখাতে চাচ্ছেন। শুধু বুলভার ধ'রেই নয়, সব কটা বড়োরাস্তা ধ'রে যাবে এই মিছিল, যাবে সবচেয়ে জনবহুল পাড়াগুলো দিয়ে, সব-শেষে আসবে টাউনহলে। আমার কিন্তু মনে হচ্ছিলো, মিছিলটা যদি রডারিখ-ভবনের পাশ দিয়ে না-যেতো, তাহ'লেই হয়তো ভালো হ'তো।

মার্কও এসে দাঁড়িয়েছে জানলায়, আমাদের সকলেরই সাথে। সেই রক্তাপ্লুত মৃতদেহটা দেখেই সে আর্ত একটা চীৎকার ক'রে উঠেছে—পারলে সে হয়তো নিজের জীবন দিয়েও এই লাশটায় প্রাণ ফিরিয়ে আনতো।

ভিড় কিন্তু খ্যাপা একটা উল্লাসে ফেটে পড়ছে। বেঁচে থাকলে, তারা নিশ্চয়ই ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে ফাঁসিতে ঝোলাতো। হয়তো খণ্ড-খণ্ড ক'রে কাটতো তাকে কুপিয়ে। ম'রে গেছে ব'লেই তার মৃতদেহটাকে তারা আর ছোঁয়নি। কিন্তু মঁসিয় স্টেপার্ক যেমন ভেবেছিলেন তারাও তেমনি : তাকে সাধারণ মর্তমানবের কবর দিতে তারা রাজি নয়। তারা চাচ্ছে তাকে যেন লাল চকটায় প্রকাশ্যে পোড়ানো হয়, অথবা যেন মৃতদেহটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয় দানিউবের জলে । দানিউব তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে দূরে, কৃষ্ণসাগরের শেষকিনারে।

প্রায় পনেরো মিনিট ধ'রে শতকণ্ঠের উল্লাস বেজেছে বাড়ির সামনে, তারপর আস্তে-আস্তে দূরে মিলিয়ে গেছে মিছিল, আর স্তব্ধতা নেমে এসেছে পরিপূর্ণ।

কাপ্তেন হারালান হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছে সে এক্ষুনি টাউনহলে যাবে। সেখানে সে এক্ষুনি জেরা করবে হেরমানকে, আর একফোঁটাও সময় নষ্ট করা চলবে না। আমরা তার প্রস্তাবে সায় দিতেই, সে তৎক্ষণাৎ হন্তদন্ত হ'য়ে লিউটেনান্ট আর্মগাড়কে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে।

আমি মার্কের পাশেই সময় কাটিয়েছি । অমন শোকাহত প্রহর আমি এর আগে আর-কখনও কাটাইনি।... আমি তো তাকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারিইনি, বরং উলটে তার ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছে, এই বুঝি সে আমাদের হাত ফসকে বিকারের ঘেরের মধ্যে চ'লে যাবে। একবার যদি তার মাথাখারাপ হ'য়ে যায়, তবে তাকে সারানো বিষম মুশকিল হবে। আমার কথা সে কানেই নিতে চাচ্ছে না। তর্ক করারও কোনো সাধ, কোনো প্রবৃত্তি তার নেই যেন । শুধু একটা ভাবনার ঘোরেই সে পাক খাচ্ছে, স্থির অপরিবর্তনীয় এক দুর্ভাবনা : মাইরা কোথায়—এক্ষুনি বেরিয়ে গিয়ে তার খোঁজ করা উচিত। 'আর তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে, আঁরি।' এই তার এক গোঁ।

তাকে, অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে, শুধু এটুকুতেই রাজি করাতে পেরেছি যে কাপ্তেন

হারালানের ফিরে-আসা অব্দি আমরা অপেক্ষা করবো। কাপ্তেন হারালান অবশ্য তার বন্ধুকে নিয়ে চারটের আগে ফিরে আসেনি, আর যে খবর সে নিয়ে এসেছে সেটা আমাদের কাছে আদৌ অপ্রত্যাশিত ছিলো না। হেরমানকে জেরায়-জেরায় জেরবার ক'রে দেয়া হয়েছে, কিন্তু তাতে কোনো ফায়দাই হয়নি। মিথ্যেই হারালান, মঁসিয় স্টেপার্ক, এমনকী খোদ রাজ্যপাল অব্দি, তাকে ভয় দেখিয়েছেন, অনুনয়-বিনয় করেছেন, মিনতি করেছেন। মিথ্যেই তাকে ধনদৌলতের প্রলোভন দেখানো হয়েছে, মিথ্যেই তাকে বলা হয়েছে খবরটা না-ব'লে দিলে কী কঠোর সাজা তাকে দেয়া হবে। কিন্তু তার কাছ থেকে একটাও কথা বার করা যায়নি। হেরমান একবারও তার কাহন বা কৈফিয়ৎ পালটায়নি। সে জানে না মাইরা কোথায় আছে । এমনকী স্টোরিৎস যে তাকে চুরি ক'রে নিয়ে এসেছিলো, সে-তথ্যটাও তার নাকি অজানা ছিলো । তার প্রভু তাকে সব কথা খুলে বলা সম্ভবত সমীচীন বোধ করেনি।

তিন ঘণ্টা ধ'রে যাবতীয় চেষ্টা ও ধস্তাধস্তির পর প্রশ্নকর্তাদের মেনে নিতে হয়েছে তার এজাহার : হেরমান সত্যিকথাই বলছে। সে-যে কিছু জানে না, এ-বিষয়ে সন্দেহ করার কোনো অবকাশই নেই। আর তাই, সহায়হীনা মাইরাকে আবার চোখে দেখার আশা আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে।

কী শোচনীয় সমাপ্তিই না হ'লো দিনটার। বিধ্বস্ত ব'সে থেকেছি আমরা চেয়ারে, দুঃখেতাপে নুয়ে-পড়া, কেউ কোনো কথা বলিনি, আর মুহূর্তের পর মুহূর্ত গড়িয়ে গেছে নীরবে। কীই-বা আর নতুন বলতে পারতুম, যা আমরা আগে অন্তত একশোবার নিজেরাই বলাবলি করিনি ?

আটটার একটু আগে কাজের লোক এসে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। ডাক্তার রডারিখ এখনও তাঁর শোকার্তা স্ত্রীকে স্তোক দিয়ে চলেছেন তাঁর শোবার ঘরে ; ড্রয়িংরুমে ব'সে আছে অফিসার দুজন, আর মার্ক ; আর আমিও সেখানে বেহাল ব'সে আছি। কাজের লোক বাতি রেখে চ'লে যেতেই ঢং-ঢং ক'রে আটটার ঘণ্টা পড়তে শুরু করেছে।

আর ঠিক তক্ষুনি গ্যালারির দরজা দুম ক'রে খুলে গিয়েছে । নিশ্চয়ই দমকা হাওয়ার ঝাপটায় খুলে গিয়েছে পাল্লাটা, কেননা কাউকেই আমি দরজার আশপাশে দেখিনি। কিন্তু যেটা সবচেয়ে চমকপ্রদ সেটা হ'লো পাল্লাদুটোর আপনা থেকেই বন্ধ হ'য়ে যাওয়া।...

আর তারপর—না-না, এ-দৃশ্য আমি জীবনের শেষদিন অব্দি ভুলবো না!—শোনা গেছে—স্পষ্ট শোনা গেছে রিনরিনে গলার স্বর। না, না, কোনো রূঢ় রুক্ষ চোয়াড়ে স্বর নয়, যেটা *ঘৃণাবিদ্বেষের স্তব* গেয়ে অন্য-একটা সন্ধ্যায় আমাদের অপমান করেছিলো —বরং সহজ, সতেজ, উৎফুল্ল, সুরেলা একটা স্বর, যে-গলার স্বর আমাদের চেনা, আমাদের প্রিয়, অর্থাৎ মাইরার কণ্ঠস্বর!

'মার্ক,' ব'লে উঠেছে উৎফুল্ল, সুরেলা, রিনরিনে গলা, 'আর আপনি, মঁসিয়ে অঁরি, আর হারালান—এখানে ব'সে-ব'সে কী নিয়ে গুলতানি হচ্ছে সকলের ? ডিনারের সময়

হ'লো, আর আমি যে খিদেয় ম'রে যাচ্ছি!'

মাইরা, স্বয়ং মাইরাই! মাইরা--যে তার কাণ্ডজ্ঞান ফিরে পেয়েছে। মাইরা—যে-মাইরা এখন সুস্থ, স্বস্থ, সজ্ঞান!... যে-কেউ শুনে বলতো, সে হয়তো এক্ষুনি সহজভাবে নিজের ঘর থেকেই নেমে এসেছে, যেমন রোজ নেমে আসে ডিনারের আগে। এ এমন-এক মাইরা, যাকে আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না!... এ-যে *অদৃশ্য মাইরা*!

মাইরার এই সহজসরল কথাগুলো যেভাবে আমাদের চমকে দিয়েছিলো, তেমন বোধহয় আর-কোনো কথাই পারেনি। চেয়ারে যেন গজাল মেরে কেউ আটকে দিয়েছে আমাদের, হতভম্ব, ভ্যাবাচাকা, আমরা ব'সেই থেকেছি, নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারিনি, কেউই উঠে সেদিকে যাইনি, যেখান থেকে এই গলার স্বর ভেসে আসছিলো। অথচ মাইরা আছে ওখানে, ঐ-তো, জ্যান্ত, সজ্ঞান, আর *অদৃশ্য – কিন্তু ধরা-ছোঁয়ার মধ্যেই*!...

কোত্থেকে এসেছে সে ?... যে-বাড়িতে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়ে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস তাকে লুকিয়ে রেখেছিলো ?... সেখান থেকে সে নিজের বুদ্ধিতেই পালাতে পেরেছে তবে, শহরের মধ্য দিয়ে নিজেই হেঁটে-হেঁটে চ'লে এসেছে বাড়ি ?... আর দরজা ছিলো বন্ধ, কেউই তার জন্যে সাদরে সাগ্রহে দরজা খুলে দেয়নি!

না—তার উপস্থিতির আসলে রহস্যটা বুঝে ফেলতে আমাদের খুব-একটা দেরি হয়নি। যে-ঘরে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস তাকে অদৃশ্য ক'রে রেখে গিয়েছিলো, সেই ঘর থেকেই এসেছে সে। আমরা সারাক্ষণ যখন ভেবেছি তাকে স্টোরিৎস নিশ্চয়ই বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়েছে, সে কিনা তখন তার বিছানা ছেড়েই ওঠেনি। সে প'ড়ে থেকেছে সেখানে, এলায়িত, লম্বালম্বি, নড়তে-চড়তে অক্ষম, সারাক্ষণ স্তব্ধ ও সংজ্ঞাহীন—এই চব্বিশ ঘণ্টাই! এটা কারুই মাথাতেও ঢোকেনি যে সে হয়তো তার বিছানাতেই প'ড়ে থাকতে পারে—আর, সত্যি-তো, এমনটা ভাববেই বা কেন?

ভিলহেল্ম স্টোরিৎস নিশ্চয়ই তক্ষুনি তাকে গুম ক'রে নিয়ে যেতে পারেনি, কিন্তু শেষ অব্দি সে তাঁকে কিডন্যাপ করতোই নিশ্চয়ই—যদি-না, আজ সকালেই, কাপ্তেন হারালানের তলোয়ারের ফলা চিরকালের মতো তার সে-সাধ ঘুচিয়ে দিতো!

আর এখন, এইখানে, অদৃশ্য দাঁড়িয়ে আছে মাইরা—আর সে পাগল নয় এখন—সম্ভবত যে-তরল রাসায়নিক তাকে খাইয়ে দিয়েছিলো ভিলহেল্ম স্টোরিৎস তা-ই তাকে সারিয়ে তুলেছে! আর মাইরা জানেও না সেদিন ক্যাথিড্রালের ঐ কেলেঙ্কারির পর থেকে ঝড়ের বেগে কত-কী ঘ'টে গিয়েছে সারা রাগৎস-এ। মাইরা আমাদেরই মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলছে আমাদের সঙ্গে, আমাদের চোখে দেখতে পারছে। চিনতে পারছে দেখে, কিন্তু এখনও, প্রদোষের আবছায়ায়, এটা বুঝতে পারছে না যে আমরা তাকে চাক্ষুষ দেখতে পারছি না।

মার্ক ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার দুই বাহু প্রসারিত, যেন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চাচ্ছে...

আর মাইরা ব'লে উঠেছে, 'কী ব্যাপার বলো তো, তোমাদের ? আমি তোমাদের

সঙ্গে কথা বলছি, অথচ তোমরা কোনোই সাড়া দিচ্ছে না। আমাকে দেখে যেন ভূত দেখেছো ব'লে মনে হচ্ছে তোমাদের? কী হয়েছে, বলো তো ?... মা-ই-বা এখানে নেই কেন? মা-র কি শরীর খারাপ করেছে?'

আবারও খুলে গিয়েছে দরজা, আর এবার ঘরে এসে ঢুকেছেন ডাক্তার রডারিখ। মাইরা তক্ষুনি নিশ্চয়ই ছুটেই গেছে তাঁর দিকে—অন্তত সেটাই আমরা ভেবেছি, কারণ অবাক হ'য়ে সে ব'লে উঠেছে, 'বাবা !... তোমার আবার কী হ'লো ?... মার্ক আর হারালানকেই বা অমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে কেন ?'

ডাক্তার রডারিখ অমনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, অভিভূত, স্তম্ভিত—চৌকাঠে। মুহূর্তের মধ্যে তিনি বুঝে ফেলেছেন সবকিছু। আর মাইরা তাঁর কাছে গিয়ে আদর ক'রে চুমু খেয়েছে তাঁকে, আবারও জিগেস করেছে, 'কী ব্যাপার, বলো তো ? মা ? মা কই?'

'তোর মা ভালোই আছেন, মাইরা,' বলেছেন ডাক্তার রডারিখ। 'এক্ষুনি নিচে নামবেন । কিন্তু তোর এখন বিশ্রাম করা উচিত, মাইরা, বিশ্রাম।'

সেই মুহূর্তে মার্ক তার স্ত্রীর হাত খুঁজে পেয়েছে, তাকে আস্তে টেনে নিয়েছে নিজের দিকে, যেন কোনো অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে—অথচ মাইরা তো আর মোটেই অন্ধ নয়, সে-ই বরং সবাইকেই দেখতে পাচ্ছে, আমরাই শুধু তাকে দেখতে পাচ্ছি না। মার্ক তাকে নিয়ে গিয়ে তার পাশে বসিয়েছে...

হঠাৎ তার উপস্থিতি এমন-অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে কেন, কিছুই বুঝতে না-পেরে, মাইরা বোধহয় একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলো। বিশেষত এবার যখন মার্ক কাঁপা গলায় অস্ফুট কথাগুলো বলেছে, তখন তো আরো : 'মাইরা !... আমার মাইরা !... এ কি তবে সত্যি তুমি ? এ কি তবে সবই সত্য ? ... আমি তোমাকে ছুঁতে পারছি এখানে... আমার পাশে !... ওহ্, মাইরা, আর আমায় ছেড়ে চ'লে যেয়ো না, কিছুতেই না...'

'মার্ক, তোমায় কেমন যেন বিমূঢ় আর হতভম্ব দেখাচ্ছে—তোমাদের সবাইকেই—যেন আমায় তোমরা ভয় পাচ্ছো !... বাবা, তুমিই বলো । সত্যি বোলো কিন্তু। কোনো কি ঝামেলা পাকিয়েছে?'

মার্কের বুঝি মনে হয়েছে যে সে উঠে যাবার চেষ্টা করছে । সে তাকে আবারও আলতো ক'রে টেনে বসিয়েছে, পাশে। 'না,' সে বলেছে, 'মনখারাপ করার কিছু হয়নি। কোনোই গোল নেই—কোনোই ঝামেলা বাধেনি, কিন্তু মাইরা — আবার-একবার কিছু বলো তুমি—তোমার গলা শুনতে দাও আবার—'

হ্যাঁ; এই দৃশ্য—এটা আমরা ব'সে-ব'সে দেখেছি; এই কথাগুলো—সেও আমরা শুনেছি। আমরা ব'সে থেকেছি সেখানে, অনড়, নিশ্চল, রুদ্ধনিশ্বাস, আর ভয়ে যেন আধমরা হ'য়ে আছি সবাই—শুধুমাত্র যে-লোক মাইরাকে তার দৃশ্যরূপ, চাক্ষুষরূপ, মানুষী-আকৃতি ফিরিয়ে দিতে পারতো, সে এখন আর বেঁচে নেই, আর মরবার সময় তার সব রহস্য সব গুপ্তকথাই সে নিয়ে গেছে পরপারে !

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

এই-যে পরিস্থিতি—যেটা পুরোপুরি আমাদের আয়ত্তের বাইরে চ'লে গেছে—তার কি কোনো মধুর পরিসমাপ্তি হ'তে পারে? কে এমন হাবা আছে যে এ-কথা ভাববে? সাহস ক'রে সে কে এসে এখন বলবে যে মাইরা এখন চিরকালের মতো দৃশ্যপৃথিবী থেকে মুছে যায়নি? তাকে ফিরে পেয়ে আমরা যেমন উল্লাস বোধ করেছি, তেমনি তীব্র মর্মপীড়াতেও ভ'রে গিয়েছি। সে কি তবে কোনোদিনই আর তার শ্রী আর লাবণ্য ফিরে পাবে না?

আর এ-সব প্রশ্ন থেকেই বোঝা যাবে এ-রকম পরিস্থিতিতে রডারিখ পরিবারের জীবন তখন কেমন ক'রে কাটতে পারতো।

পুরো অবস্থাটা বুঝে ফেলতে বেশি সময় লাগেনি মাইরার। ম্যান্টলপীসের ওপরকার আয়নার সামনে দিয়ে যাবার সময় সে তার আপন প্রতিবিম্ব দেখতে পায়নি... কী-এক শঙ্কায় অস্ফুট-একটা আর্তনাদ ক'রে সে সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আমাদের দিকে, বুঝতে পেরেছে যে নিজের ছায়া সে দেখতে পাচ্ছে না...

আর যখন আর্ত কান্নায় সে ভেঙে পড়েছে, আমাদের তাকে খুলে বলতে হয়েছে সবকিছু, আর মার্ক সারাক্ষণ তার চেয়ারের পাশে নতজানু হ'য়ে ব'সে তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছে—মিথ্যেই চেষ্টা করেছে তাকে শান্ত করতে। দৃশ্য-মাইরাকে সে ভালোবাসতো, সে অদৃশ্য-মাইরাকেও ভালোবাসবে। একইরকম। আর এই কথা শুনে মাইরার বুকটা যেন ফেটে গিয়েছে।

পরে, রাত্তিরে, ডাক্তার রডারিখ মাইরাকে চাপ দিয়েছেন, তাড়া দিয়ে বলেছেন একবার তার মায়ের ঘরে যাওয়া উচিত। দূরে-দূরে স'রে-থাকার চাইতে মায়ের কাছাকাছি থাকাই ভালো, অন্তত কথা তো বলতে পারবে।

আর এভাবেই কেটে গিয়েছে কয়েকটা দিন। আমাদের আশ্বাস যে-সান্ত্বনা দিতে পারেনি, সময় সেটা দিয়েছে ; মাইরা মেনে নিয়েছে তার এই নিয়তি। তার মনের জোর নিশ্চয়ই প্রচণ্ড, নইলে আমাদের দিনাণুদৈনিক জীবনযাপনের ধরন আবার সেই অভ্যস্ত পথে ফিরে যেতো কী ক'রে। সারাক্ষণ কথা ব'লেই সে বুঝিয়ে দিতো যে সে আমাদের কাছে-কাছেই আছে। আমার এখনও মনে পড়ে সে কেমন ক'রে শুরু করতো দিন—

'এই-যে বন্ধুরা, শোনো, আমি কিন্তু কাছাকাছিই আছি... কিছু চাই তোমাদের ? ঠিক আছে, আমি এনে দিচ্ছি।... অঁরি, তুমি কী চাচ্ছো, বলো তো?—ওহ্, যে-বইটা টেবিলে ফেলে রেখে এসেছো ?... এই-যে, নাও তোমার কেতাব।... তোমার কাগজ ? সে-তো তোমার পাশেই প'ড়ে গিয়েছে।...

'বাবা, দিনের এই সময়েই রোজ তোমাকে চুমু খেতুম.. হারালান, তুই আবার অমন

দুঃখী-দুঃখী মুখ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে আছিস কেন?... তোকে তো কতবার বলেছি, আমি সবসময় হাসিখুশি থাকি, তাহ'লে তোরই বা অমন মনখারাপ করার কী হ'লো ?' ... আর মার্ক, এই-যে, এই নাও আমার দুই হাত।... বাগানে বেড়াতে যেতে চাও? চলো। ... অঁরি, দেখি, তোমার হাতটা দাও-তো, চলো... বিস্তর গুলতানি করার আছে আমাদের... জবর আড্ডা দেয়া যাবে।'

বাড়ির লোকের অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় কোনো বদল আসুক, এটা সে কিছুতেই চায়নি। সে আর মার্ক অনেকক্ষণ ধ'রে সময় কাটিয়েছে রোজ, আর স্ফুট-অস্ফুট স্বরে কখনও তার মধুর গুঞ্জন সে থামায়নি, কেননা সারাক্ষণ তাকে ভরসা জুগিয়ে যেতে চেয়েছে, সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে ভবিষ্যতের ওপর পূর্ণ আস্থা আছে তার, একদিন নিশ্চয়ই এই অদৃশ্যমানতা ঘুচে যাবে... কিন্তু সত্যি কি ভেতরে-ভেতরে এমনতর কোনো আস্থা তার আছে? বা ছিলো?

একটা বদল, শুধু-একটাই, এসেছে আমাদের জীবনে। মাইরা বুঝতে পেরেছে এ-অবস্থায় তার উপস্থিতি আমাদের কাছে কতটা বেদনাদায়ক হবে, তাই সে খাবারটেবিলে ককখনো এসে আমাদের সঙ্গে বসে না। আমাদের খাওয়া শেষ হ'য়ে গেলে পরই এসে সে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, ড্রয়িংরুমে। দরজা খুলে যায়, বন্ধ হয়, আর সে ব'লে ওঠে: 'এই-যে বন্ধুরা, আমি এসে গেছি!' আর তারপর একেবারে 'শুভরাত্রি' না-জানানো অব্দি সারাক্ষণ আমাদেরই সঙ্গে-সঙ্গে কাটায়।

এটা নিশ্চয়ই বলার দরকার নেই, মাইরা রডারিখের উধাও-হ'য়ে-যাওয়াটা শহরে যে-তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়েছিলো, তার পুনরাগমন—না কি পুনরাবির্ভাব?—শহরে তার চেয়েও ঢের-বেশি হুলুস্থুল তুলেছিলো।

চব্বিশে জুন সকালবেলায় মার্ক আড়ালে ডেকে নিয়ে কথা বলেছে আমার সঙ্গে, আগের চাইতে তার অস্থিরতা অনেক কম এখন। বলেছে, 'অঁরি, আমি যে-সিদ্ধান্তটায় এসে পৌঁছেছি তাতে তোমারও সায় চাই। আমার স্থির বিশ্বাস, এটা তুমি অনুমোদন করবে।'

'তুই পুরো ভরসা রেখেই সব বলতে পারিস আমাকে,' আমি তাকে বলেছি, 'আমি জানি তুই *অযৌক্তিক-কিছু* বলবি না।'

'যুক্তি, তবে মোটেই আবেগহীন নয়, অঁরি। মাইরা তো এখনও, সত্যি-বলতে, আমার আংশিক বউ—আমাদের বিয়ে কিন্তু ক্যাথিড্রালে পুরোপুরি সাঙ্গ হয়নি, চার্চের অনুমোদনের কথাগুলো তখনও বলা বাকি ছিলো। কিন্তু আধাখেঁচড়া বিয়ের তো কোনো মানে নেই, আমি তাই চাচ্ছি এই অবস্থার শেষ হোক। মাইরার জন্যে তো বটেই, তার বাড়ির লোকের জন্যেও ওটা জরুরিই—আর আমাদেরও এটা দরকার।'

আমি আবেগের বশে মার্কের হাত চেপে ধরেছি। 'আমি তোর কথা বুঝতে পারছি, মার্ক, এতে বাধা কোথায়, তা তো আমি ভাবতে পারছি না—'

'যাজক যদি মাইরাকে দেখতেই না-পান,' মার্ক বলেছে, 'ব্যাপারটা কেমনতর যেন

ঠেকবে, তবু তিনি-তো শুনতে পাবেন যে মাইরা নিজের মুখে উচ্চারণ করছে সে আমাকে স্বামী হিশেবে গ্রহণ করতে রাজি আছে। আমিও ঘোষণা করবো যে আমি কাকে আমার বিবাহিতা পত্নী ব'লে গ্রহণ করলুম । চার্চের বিধানকর্তারা এতে কোনো আপত্তি করবেন ব'লে আমার মনে হয় না।'

'আমিও তো আপত্তির কোনো কারণ দেখছি না। তুই মিথ্যে কিছু ভাবিসনে, মার্ক, আমি গিয়ে এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করছি।'

আমি যখন প্রধানযাজকের সঙ্গে দেখা করতে গেছি, তার আগেই আমি তাঁর সহকারীদের সঙ্গে আলাপ ক'রে দেখেছি কোনো মুশকিল দেখা দিতে পারে কি না। বুড়ো যাজক আমায় আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে ব্যাপারটা নিয়ে তাঁরা আগেই একটা ফয়সালা ক'রে নিয়েছেন—খোদ রাগ্‌ৎস-এর আর্চবিশপ বিয়েটার অনুমোদন দিয়েছেন। সে অদৃশ্য হ'তে পারে, কিন্তু এতে তো কোনো সন্দেহই নেই যে নববধূ বেঁচেই আছে, আর সেইজন্যে সে বিয়েও করতে পারে। আগেই তো বিয়ের তিন-চতুর্থাংশ অনুষ্ঠান সরকারিভাবেই ক্যাথিড্রালে সম্পন্ন হয়েছিলো, তাই ঠিক হ'লো আগামী দোসরা জুলাই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে।

পয়লা জুলাই রাতে মাইরা আমায় মনে করিয়ে দিয়েছে, যেমন সে আগের বারও করেছিলো, 'কালকে কিন্তু, অঁরি। ভুলো না যেন!'

প্রথম অনুষ্ঠানটির মতোই দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটিও সম্পন্ন হয়েছে সন্ত মিখায়েলের ক্যাথিড্রালে। আর একইভাবে আসর সরগরম হয়েছে, একই অতিথিরা এসেছে—আর ঝেঁটিয়ে এসেছে শহরের লোক, চার্চ থেকে বাইরেও উপচে পড়েছে ভিড়। এটা ঠিক যে, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস আর বেঁচে নেই। তার সাগরেদ হেরমান এখন কয়েদখানায়। তবু যদি—লোকের বুকের মধ্যে ধুকপুক করছিলো শঙ্কা—সেই জার্মানের প্রেতাত্মা এসে আবার নতুন-কোনো ঝামেলা পাকায়!

কিন্তু আবার নতুন ক'রে ক্রমানুযায়ী পর-পর শেষ হয়েছে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব, আর খ্রিষ্টযাগ শেষ হবার পর, বুড়ো প্রধানযাজক সকলের সামনে কাঁপা-কাঁপা গলায় জিগেস করেছেন :

'মাইরা রডারিখ, তুমি কি এখানে আছো?'

'হ্যাঁ, আমি এখানেই আছি।'

বুড়ো যাজক মার্ককে বলেছেন : 'মার্ক ভিদাল, তুমি কি এখানে-উপস্থিত মাইরা রডারিখকে তোমার বিবাহিতা পত্নী ব'লে গ্রহণ করতে সম্মত আছো?'

'আছি।' বলেছে মার্ক।

'মাইরা রডারিখ, তুমি কি এখানে-উপস্থিত মার্ক ভিদালকে তোমার বৈধ পতি রূপে গ্রহণ করতে স্বীকৃত আছো?'

'আছি।' এমন স্বরে মাইরা কথাটা বলেছে সে ক্যাথিড্রালের মধ্যে সমবেত সকলের কানে গিয়ে পৌঁছেছে কথাটা : 'আছি।'

'মার্ক ভিদাল আর মাইরা রডারিখ।' প্রধানযাজক তখন ঘোষণা করেছেন, 'আমি তোমাদের ধর্মস্বীকৃতভাবে বিবাহিত পতি-পত্নী ব'লে ঘোষণা করছি।'

অনুষ্ঠানের পর, ভিড়, দু-ভাগ হ'য়ে দু-পাশে স'রে গিয়েছে, যাতে নবদম্পতি অনায়াসে হাত-ধরাধরি ক'রে হেঁটে যেতে পারে । বিয়ের অনুষ্ঠানে এমন সময় একটা বিকট হৈ-হট্টগোল হয় সাধারণত, তেমন উৎকট-কিছুই এবারে কিন্তু হয়নি। সবাই চুপ ক'রে থেকে, গলা বাড়িয়ে দেখতে চেয়েছে আশ্চর্য-কিছু, অসম্ভব-কিছু। কেউ নিজের জায়গা ছেড়ে নড়েনি—তবে কেউই আবার সকলের আগেভাগে গিয়ে দাঁড়াতে চায়নি। ... কৌতূহল যেমন তাদের হিড়হিড় ক'রে টেনে এনেছে এখানে, তেমনি কী-একটা অজানা আশঙ্কাও যেন তাদের ঘাড় ধ'রে টেনে রাখতে চেয়েছে পেছনে।

আর একটু-হয়তো-অস্বস্তিতেই ভুগছে এমন দু-ভাগ ভিড়ের মধ্য দিয়ে বর-বধূ, তাদের স্বামীরা, স্বজনবন্ধুরা, সবাই হেঁটে গিয়েছে ক্যাথিড্রালের নথিসেরেস্তা রাখার টেবিলের দিকে, সেখানে খুলে-রাখা সেরেস্তায় মার্ক ভিদালের স্বাক্ষরের পাশে যুক্ত হয়েছে আরো-একটি নাম, মাইরা রডারিখ, যে-নামটি স্বাক্ষর করেছে এমন-একটি হাত, যাকে কেউই দেখতে পায়নি—যাকে কেউই কোনোদিনও দেখতে পাবে না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

এইই ছিলো সেই দিন, দোসরা জুলাই, ১৭৫৭; এই অদ্ভুত কাহিনীর তুঙ্গমুহূর্ত, যেটা কোন-এক আজব খেয়ালে আমি পরে ব'সে-ব'সে লিপিবদ্ধ করেছি। কবুল করি যে সকলেরই এটা অবিশ্বাস্য ঠেকবে—আজগুবি যদি না-ও ঠেকে । আর তা যদি হয় তাকে ধ'রে নিতে হবে এই অনভ্যস্ত লেখকের অক্ষমতা হিশেবে। কাহিনীটা কিন্তু যতই অবিশ্বাস্য ঠেকুক, সর্বৈব সত্য, এর একটি কথাও মিথ্যে নয়—আর যদিও অতীত আখ্যান হিশেবে অদ্বিতীয় ব'লে ঠেকবে, আমি আশা করবো ভবিষ্যতেও এই কাহিনী যেন অদ্বিতীয়ই থেকে যায় । আর-কারু জীবনে এমন-কিছু ঘ'টে যাক, তা আমি চাইবো না।

বাহুল্য হবে বলা যে, মার্ক আর মাইরা আগে যে-পরিকল্পনা করেছিলো, এখন তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। এখন আর ফ্রান্সে যাবার কোনো কথাই ওঠে না, আর এও বুঝতে পেরেছি পরেও শুধু ক্বচিৎ-কখনোই মার্ক পারী আসবে—সে বরং চিরকালের জন্যে এই রাগৎসেই বাসা বাঁধবে। আমার যতই খারাপ লাগুক, এ-ব্যাপারটা শেষ অব্দি আমায় মেনেই নিতে হয়েছে।

মার্ক আর মাইরার পক্ষে সবচেয়ে ভালো হবে তারা যদি ডাক্তার ও মাদাম রডারিখের কাছাকাছিই বাসা বাঁধে । সময় একসময় এই ঘনিষ্ঠতাকেই নিবিড় ক'রে তুলবে, আর

মার্কও এই জীবনে অভ্যস্ত হ'য়ে যাবে। সে-যে সবসময়েই কাছে আছে, এই ধারণাটা তৈরি ক'রে দিতে ক্রমেই পটীয়সী হ'য়ে উঠেছে মাইরা, আমরা সবসময়েই বুঝতে পেরেছি সে কোথায় আছে, কী করছে। সে-ই যেন বাড়ির আত্মা—আর আত্মার মতোই অদৃশ্য।

আর সত্যি-বলতে, তার *পার্থিব* অস্তিত্ব পুরোটাই তো আর ঘুচে যায়নি, মার্ক তার যে-আশ্চর্য ছবিটা এঁকেছিলো, সেটা কি টাঙানো নেই দেয়ালে—সবসময়? মাইরার সবচেয়ে ভালো লাগতো তার পাশে বসতে, আর আশ্বাস দিয়ে বলতে; 'এই-তো আমি, আবারও দৃশ্যমানা, আমি যেমন নিজেকে দেখতে পাচ্ছি তেমনি তোমারও তো আমায় দেখতো পাচ্ছো।'

বিয়ের পর আরো-কয়েকটা সপ্তাহ আমি কাটিয়েছি রাগ্‌ৎস-এ। আর পুরো সময়টাই অন্তরঙ্গভাবে কাটিয়েছি রডারিখ-ভবনে—কী বিষম সংকটেই যে পড়েছিলো এই চমৎকার পরিবারটি। একদিন এদের সবাইকে ছেড়ে চ'লে যেতে হবে ভাবলেই আমার ভারি কষ্ট হ'তো, কিন্তু সবচেয়ে লম্বা ছুটিও তো একদিন শেষ হ'য়ে যায়, আর আমাকেও পারী ফিরে যেতে হবে, আমার জীবিকার ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে।

আবারও আমি নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থেকেছি ফ্রান্সে এসে—লোকে কী ভাবে জানি না, আমার এনজিনিয়ারিং-বিদ্যা এখন আমার আরো-ভালো লেগেছে। অথচ অনিচ্ছুক আমাকে যে-আশ্চর্য ঘটনাগুলোর উত্তাল ঘূর্ণিপাকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিলো, তা ছিলো এতই রহস্যময় ও চমকপ্রদ যে আমি কখনোই ঘটনাগুলো ভুলতে পারিনি। কেবলই থেকে-থেকে, ঘুরে-ঘুরে, ফিরে গিয়েছি ঘটনাচক্রের আবর্তের মধ্যে, আমার মন বারে-বারে উড়ে গিয়েছে রাগ্‌ৎস-এ, মার্ক আর মাইরার কাছে, যারা সবসময়-ই আছে আমার মনের মধ্যে, অথচ শরীরীভাবে কতটাই না দূরে!

পরের বছর জানুয়ারি মাসে আমি যখন আবার সহস্রাধিক-একবার সেই ভয়ানক দৃশ্যটা মনশ্চক্ষুকে দেখছি যেখানে কাপ্তেন হারালানের তলোয়ারের ফলা বিঁধে গিয়েছিলো ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের বুকে, হঠাৎ ধ্বক ক'রে লাফিয়ে উঠেছে আমার উত্তাল হৃৎপিণ্ড! এত সহজ, এত স্বতোপ্রকাশ, এত সরল এই সমাধান যে আমি নিজেই তাজ্জব হ'য়ে গেছি এতদিন কথাটা আমার মাথাতেই আসেনি ব'লে। কী হাঁদা আমি, আকাট বোকা একটা! কোথায় অ্যাদ্দিন চাপা প'ড়ে ছিলো আমার বুদ্ধিশুদ্ধি, যুক্তির বোধ, কোন-সে অন্ধ আবেগের আলোড়নে তা হারিয়ে গিয়েছিলো? দুয়ে-দুয়ে চার করবার কথাটা কি-না একবারও আমি ভাবিনি, অথচ আমি কিনা প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলুম সব ঘটনার!

সেদিন চোখের সামনে ভেলকির মতো ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের অদৃশ্য নিষ্প্রাণ দেহ গলগল ক'রে রক্ত বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে পেয়েছিলো তার দৃশ্যমানতা! যেন হঠাৎ-আলোর-ঝলকানিতে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেলো, দৃশ্যটা আবার চোখের সামনে ফুটে উঠতেই। আরে! যে-রহস্যময় রাসায়নিক রক্তে মিশে গিয়ে তাকে অদৃশ্য ক'রে তুলেছিলো, *রক্তস্রাবের সঙ্গে-সঙ্গে* তা তার শিরাগুলো থেকে বেরিয়ে গেছে, আর তাকে *দৃশ্যমান ক'রে তুলেছে!*

হারালানের অসির ফলা যা করতে পারে, কোনো শল্যচিকিৎসকের ছুরির ফলাও তো তা-ই করতে পারে ! অর্থাৎ যা চাই, তা শুধু কোনো শল্যচিকিৎসকের ওস্তাদ হাতের কারসাজি—একবারে যদি না-ও হয়, একাধিকবার অপারেশনের পর, ব্যবচ্ছেদের পর, তা তো সহজেই সম্ভব! মাইরা যে-রক্ত হারাবে, নতুন রক্ত গজাবে সে-জায়গায়, আর এমন-একদিন তারপর প্রভাত হবে যেদিন ঐ অভিশপ্ত রাসায়নিক আর একবিন্দুও থাকবে না তার ধমনীতে।

তক্ষুনি, প্রায় ভূতে-পাওয়ার মতোই আমি মার্ককে চিঠিতে লিখে জানিয়েছি সব, কিন্তু চিঠিটা ডাকে দেবার আগেই, হঠাৎ দেখি মার্কেরই কাছ থেকে একটা চিঠি এসে হাজির হয়েছে । আর তা প'ড়ে মনে হয়েছে এখন—অন্তত আপাতত—এ-চিঠিটা আর না-পাঠানোই ভালো, কারণ আমার পরামর্শ আপাতত তাদের কোনো কাজেই আসবে না । সে চিঠি লিখে জানিয়েছে, সে বাবা হ'তে চলেছে । এখন কোনো রক্তস্রাব—না মাইরার না তার বাচ্চার পক্ষে ভালো হবে ।

আমার ভাইপো—বা ভাইঝি—জন্মাবে মে মাসের শেষ দিকে । শুনে আমি অমনি সব ব্যবস্থা করেছি, আর ঠিক পনেরোই মে ১৭৫৮-তে গিয়ে ফের হাজির হয়েছি রাগ্‌ৎস-এ। মার্কের মতো, নবজাতকের বা নবজাতিকার জন্যে আমার অধীরতাও খুব-কিছু কম নেই।

জন্ম হ'লো সাতাশে মে—আর সেইদিনটা আমার স্মৃতি থেকে কোনোদিনই আর মুছে যাবে না। লোকে বলে, অঘটন আজও ঘটে, আজও অলৌকিক এসে প্রমাণ ক'রে দেয় ঈশ্বরের অপার করুণা। আর সেদিন যে-অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিলো, আমি আঁরি ভিদাল, এনজিনিয়ার, তার জলজ্যান্ত সাক্ষী।

কেননা অঘটনই এটা—তেমনি অপ্রত্যাশিত ও আশ্চর্য । প্রকৃতি নিজেই মঙ্গল বর্ষায় আমাদের ওপর, মানুষের কোনো উদ্ভাবনী কৌশলের প্রয়োজনই হয় না সবসময়। মাইরা ঐ সাতাশে মে ল্যাজারাসের মতোই কবর থেকে উঠে এসেছে । মার্ক, হতভম্ব, ভ্যাবাচাকা ; উল্লাসে কী-যে করবে ভেবেই পাচ্ছিলো না । একসঙ্গে দুজনের জন্ম দেখেছে সে—তার বাচ্চার এবং বাচ্চার মায়ের—মাইরাকে যেন আরো-সুন্দর দেখাচ্ছে, যেন এতদিন চোখের আড়ালে লুকিয়েছিলো ব'লেই । সন্তানের জন্ম দেবার সময় যে অজস্র রক্তস্রাব হয়েছে, তা থেকেই ফের দৃশ্যমানতায় ফিরে এসেছে মাইরা—আর নতুন ক'রেই তার যেন জন্ম হয়েছে, কোনো শল্যচিকিৎসকের আর সাহায্য লাগেনি । আর, ব'লে রাখি, ভাইপোই হয়েছে আমার।

আর নবজাতক আর তার মাকে দেখতে গিয়ে আমি শুধু মনে-মনে প্রার্থনা করেছি : ঈশ্বর করুন, আর-কেউ যেন কোনোদিনও ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের ঐ গুপ্তরহস্য পুনরাবিষ্কার না-করে। অদৃশ্য হবার কৌশল জেনে আমাদের কোনো লাভ নেই। আমরা চাই দৃশ্যমানকে—ইন্দ্রিয়গম্য কোনো রূপ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো আকৃতি, যাকে আমরা দু-চোখ ভ'রে সারা জীবন দেখতে পারবো।

ভালো। এবং বলাই বাহুল্য তর্কের কোনো স্পষ্ট মীমাংসা হ'লো না। শেষটায় দুজনেই যখন একযোগে নিজের-নিজের নেশা ও খেয়ালের গুণকীর্তন শুরু ক'রে দিলেন, তখন ব্যাঙ্কস মাঝখানে প'ড়ে তাদের বাদ-প্রতিবাদ থামালে।

অবশেষে তর্কটা দাঁড়ালো এইরকম : বনের রাজা কোন জন্তু ? সিংহ, না হাতি, না বাঘ ? লিবিয়ার জঙ্গল বেশি ভয়ংকর, না সুন্দরবন ? ফান খোইত শেষটায় বাঘকেই বনের রাজা ব'লে ঘোষণা করলেন ;—বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের রাজাবাঘের হালুম নিনাদ—তিনি বললেন—অরণ্যের সবচেয়ে *ভয়ংকরসুন্দর* শব্দ। এ-বিষয়ে অবশ্য ক্যাপ্টেন হুডের সঙ্গে তাঁর বিশেষ মতভেদ দেখা গেলো না। এবং জঙ্গলে সবচেয়ে ভীষণ জন্তু যে বাঘই হয়—বিশেষ ক'রে সে যদি কখনও নরমাংসের স্বাদ পেয়ে থাকে—এ-বিষয়েও তাঁরা অবশেষে একমত হলেন। 'মানুষখেকো বাঘের চেয়ে ভীষণ আর-কিছু নেই, এটা সত্যি,' অবশেষে ফান খোইত সিদ্ধান্ত জানালেন, 'তবে স্বভাবকে না-মেনে তাদের উপায় কী ?' একটু হেসে আরো যোগ করলেন, 'তাদেরও তো খেয়ে বাঁচতে হবে।'

তাঁর এই মন্তব্যের পরই আমরা ক্রাল থেকে ফেরবার সময় হয়েছে ব'লে সাব্যস্ত করলুম। কেননা আমাদেরও খেয়ে বাঁচা দরকার ছিলো। বলাই বাহুল্য, ক্রাল থেকে বিদায় নেবার সময় ভাবভঙ্গি দেখে এমনিতে মনে হবার জো নেই যে ফান খোইত আর ক্যাপ্টেন হুডের মধ্যে কোনোদিন বন্ধুতা সম্ভব, অথচ হুড আর ফান খোইতের মধ্যে শেষ পর্যন্ত গলাগলি ভাব হ'য়ে গিয়েছিলো, যদিও দুজনের মতামত ছিলো একেবারেই বিপরীত। একজনের স্বপ্ন তরাই থেকে বন্যজন্তু নির্মূল করা, অন্যজনের জীবিকা তাদের ধ'রে দেশ-বিদেশে চালান দেয়া ; তবু জঙ্গল সম্বন্ধে অন্য-অনেক বিষয়ে দুজনের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দেখা গেলো না। বরং ঠিক হ'লো যে ক্রাল আর স্টীম হাউসের মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন করা চলবে না। ফান খোইত যেমন ক্যাপ্টেন হুডের অভিপ্রায় স্মরণে রাখবেন, তেমনি আমরাও কোনো চিত্তাকর্ষক জন্তু পেলে যেন তাঁকে খবর দিই। ফান খোইত তো তাঁর সব শিকারিকেই ক্যাপ্টেন হুডের হাতে ছেড়ে দিলেন, বিশেষ ক'রে কালোগনি, কারণ তারা এ-অঞ্চলের হালচাল ভালো ক'রে জানে ব'লে সহজেই বন্য জন্তুদের হদিশ দিতে পারবে—আর কালোগনি এদেরই মধ্যে অত্যন্ত চালাকচতুর ও ক্ষিপ্র ; ক্রাল-এর কাজে সদ্য নিযুক্ত হ'লেও তার উপরে অনায়াসে এ-সব বিষয়ে নির্ভর করা যায়। এর বদলে—হুড প্রতিশ্রুতি দিলে—সেও যথাসাধ্য চেষ্টা করবে যাতে ফান খোইত বাকি জন্তুগুলো শিগগিরই পাকড়ে ফেলে তাঁর কোটা পূর্ণ করতে পারেন।

ক্রাল ছেড়ে আসার আগে সার এডওয়ার্ড আবার কালোগনিকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানালেন ; বললেন, যখনই সে স্টীম হাউসে যাবে, তখনই সে সেখানে স্বাগত হবে। শুনে কালোগনি ঠাণ্ডাভাবে তাঁকে একটা সেলাম করলে। লোকটা যেন পাথরে-খোদাই করা ; বাইরেটা দেখে কিছুতেই বোঝবার উপায় নেই ভিতরে-ভিতরে সে কী ভাবছে।